আশফাক হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
পরিচালক, উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ আজম
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

ISBN: 978-984-96777-5-8

ভাষা আন্দোলন
ইতিহাস ও উত্তরাধিকার

সম্পাদক
আশফাক হোসেন
মোহাম্মদ আজম

ভাষা আন্দোলন

ইতিহাস ও উত্তরাধিকার

সম্পাদক
আশফাক হোসেন
মোহাম্মদ আজম

ভূমিকা
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী

সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (CARASS)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

২০২৪ সালের ২৯-৩০শে এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র 'ভাষা আন্দোলন এবং বিশ্বে বাংলাভাষী স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করে। বর্তমান গ্রন্থ ওই কনফারেন্সের নির্বাচিত প্রবন্ধের পরিমার্জিত প্রকাশ।

প্রাবন্ধিকরা ভাষা-দিবস উদ্‌যাপনে বৈচিত্র্য, সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলনকে উপস্থানের সেকাল-একাল, পুথিসাহিত্যে সেমেটিক হরফে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ, ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, নারীর অবদান, বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা চর্চা, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণ ও অবদান নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলো ভাষা, জাতিসত্তা ও সমাজ-রাজনৈতিক রূপান্তরের জটিল বুননে এক গভীর অভিযাত্রার দিকে আমাদের নিয়ে যায়, যেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় কোনো সমাপ্তিবিন্দু নয়, বরং নতুন এক মহাযাত্রা।

ভাষা আন্দোলন কেবল গৌরবজনক ইতিহাস নয়, জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে ভাব-অভিব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এক অমূল্য উপহার। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান বইটি কেবল ইতিহাসচর্চা নয়, এ এক কর্মপন্থার ডাক। বাংলাদেশ যখন বিশ্বায়ন ও ডিজিটাল রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, তখন বইটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়– ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি সম্মিলিত স্মৃতি ও প্রতিরোধের ভিত্তি।

ভাষা আন্দোলন
ইতিহাস ও উত্তরাধিকার

সম্পাদক
আশফাক হোসেন
মোহাম্মদ আজম

উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

ভাষা আন্দোলন
ইতিহাস ও উত্তরাধিকার

সম্পাদক
আশফাক হোসেন
মোহাম্মদ আজম

উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

প্রকাশকাল
আশ্বিন, ১৪৩২
অক্টোবর, ২০২৫

প্রকাশক
সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (CARASS), টিএসসি (TSC) কম্পাউন্ড, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

সম্পাদক (আশফাক হোসেন, মোহাম্মদ আজম) অথবা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (CARASS)-এর পূর্বানুমতি ব্যতীত এই বই বা বইয়ের কোনো অংশ পুনর্মুদ্রণ কিংবা যে-কোনো মাধ্যমে রূপান্তর নিষিদ্ধ।

মুদ্রণ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
press@du.ac.bd

মূল্য
৭০০ টাকা (কথায়: সাতশত টাকা)
২০ ইউএস ডলার

© Center for Advanced Research in Arts and Social Sciences (CARASS), University of Dhaka

ISBN: 978-984-96777-5-8
DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBook

Ashfaque Hossain and Mohammad Azam (Eds.), The Language Movement: History and Legacy, Center for Advanced Research in Arts and Social Sciences (CARASS), TSC Compound, University of Dhaka, Dhaka-1000

Price: 700 BDT, 20 USD

সম্পাদক

আশফাক হোসেন
অধ্যাপক, ইতিহাস বিভাগ
পরিচালক, সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (CARASS)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

মোহাম্মদ আজম
অধ্যাপক, বাংলা বিভাগ, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়
মহাপরিচালক, বাংলা একাডেমি

সহযোগী সম্পাদক
কাজী সামিও শীশ
সিনিয়র রিসার্চ ফেলো,
সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (CARASS)
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

গবেষণা সহযোগী
ডেইজি আক্তার
মোস্তাকিম

ভূমিকা

সব মানুষেরই ভাষা থাকে এবং সবাইকে যে ভাষার ওপর অধিকার রক্ষার জন্য লড়াই করতে হয় তাও নয়; পূর্ববঙ্গের মানুষকে কিন্তু সেটা করতে হয়েছিল। ঘটনাটি ছিল অপ্রত্যাশিত এবং পুরোপুরি বেদনাদায়ক। কারণ, এর সূত্রপাত প্রায় সেই সময়েই ঘটলো যখন পূর্ববঙ্গের মানুষ ভাবতে শুরু করেছেন যে তাঁরা স্বাধীন হয়েছেন।

স্বাধীন পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় সরকারের কাছ থেকে ঘোষণা এলো যে উর্দুই হবে নতুন রাষ্ট্রের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। পূর্ববঙ্গে মানুষ টের পেলেন যে তারা স্বাধীন হয়েও স্বাধীনতা পাবেন না। তারা দ্বিতীয় শ্রেণীর নাগরিক হয়ে যাবেন। ইংরেজ শাসন তাদের ওপর ইংরেজী ভাষা চাপিয়ে দিয়েছিল; সেটা হয়ে দাঁড়িয়েছিল রাষ্ট্রের ভাষা এবং শিক্ষার মাধ্যম। ইংরেজী না জানলে জীবিকা অর্জন কঠিন ছিল। বাঙালীরা অনেক কষ্টে ইংরেজী শিখেছেন, এখন তাদেরকে শিখতে হবে উর্দু। প্রায় দু'শ বছর ধরে তারা ছিল ইংরেজীওয়ালাদের শাসনে, এখন থাকতে হবে উর্দুওয়ালাদের অধীনে। এই রকমের কিছু একটা যে ঘটতে পারে তার আভাস অবশ্য পাওয়া যাচ্ছিল। স্বাধীন হওয়ার পরপরই বাঙালী যখন পোস্ট-অফিসে গেল, তখন দেখল ডাকটিকেটে ইংরেজী ও উর্দু আছে, বাংলা নেই। পোস্টকার্ড কিনে দেখে সেখানেও একই দৃশ্য, পোস্টাল খামেও একই জিনিস; মনিঅর্ডারের ফর্ম নিয়ে দেখে একই ঘটনা। বাঙালী দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হলো। তার কপালে ভাঁজ পড়লো। পরে ১৯৪৮ সালের মার্চ মাসে 'জাতির পিতা' ও গভর্নর জেনারেল জিন্নাহ সাহেব নিজে যখন ঢাকায় প্রথম ও শেষ বারের মতো এসে স্বকণ্ঠে এবং সদম্ভে ঘোষণা করলেন যে উর্দু এবং কেবলমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা তখন শ্রোতাদের অধিকাংশের কানেই ঘোষণাটা একই সঙ্গে ভয়ঙ্কর ও অবিশ্বাস্যে ঠেকেছিল। কেবল ওই শ্রোতারাই নয়, পূর্ববঙ্গে সব মানুষই হতাশ হয়েছিলেন। কিন্তু তাঁরা ভেঙে পড়েননি। আত্মসমর্পণ করেননি। রুখে দাঁড়িয়েছেন। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার জন্য আন্দোলন শুরু হয়ে গেছে; সে আন্দোলন ক্রমাগত শক্তিশালী হয়ে উঠেছে; এবং বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারীতে আন্দোলন যে অনেক দূর এগুবে সে বিষয়টা পরিষ্কার হয়ে গেছে। তারপরে ১৯৫৪'র প্রাদেশিক নির্বাচন, উনসত্তরের গণঅভ্যুত্থান, একাত্তরের মুক্তিযুদ্ধ, সবই ঘটেছে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে তৈরী পথটি ধরেই এবং অভিন্ন ধারাবাহিকতায়। আন্দোলন তার গন্তব্যে পৌঁছেছে স্বাধীন সার্বভৌম বাংলাদেশ নামে একটি নতুন রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে।

ভাষা আন্দোলন আমাদের জন্য মুক্তিসংগ্রামের পথরেখা যেমন তৈরী করে দিয়েছে, তেমনি একটি গৌরবজনক উত্তরাধিকারেও আমাদেরকে সমৃদ্ধ করেছে। ইতিহাস এবং উত্তরাধিকার–দু'টি বিষয়েই আমাদের সচেতন থাকা অত্যাবশ্যক, যাতে করে আমরা নিজেদেরকে চিনতে পারি, বুঝতে সক্ষম হই এবং সামনের দিকে এগিয়ে যেতে পারি।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র' অত্যন্ত প্রয়োজনীয় ও উপকারী একটি কাজ করেছে বর্তমান গ্রন্থটি আমাদেরকে উপহার দিয়ে। গ্রন্থটির পটভূমিতে আছে ওই কেন্দ্রেরই উদ্যোগে আয়োজিত 'ভাষা আন্দোলন এবং বিশ্বে বাংলাভাষী স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব' বিষয়ে একটি সেমিনার। গ্রন্থটিকে ওই সেমিনারেরই প্রসারিত রূপ বলা চলে। এটি সম্পাদনার জন্য সম্পাদক আশফাক হোসেন ও মোহাম্মদ আজমকে আন্তরিক অভিনন্দন। এই গ্রন্থে যাঁদের প্রবন্ধ রয়েছে তাঁরাও

অবশ্যই ধন্যবাদ পাবেন, কেবল যে আনুষ্ঠানিক ভূমিকা-লেখক বর্তমান পাঠকটির কাছ থেকে তা নয়, গ্রন্থের সকল পাঠকদের কাছ থেকেই। এই গ্রন্থ ইতিহাসের চর্চার ব্যাপারেও সহায়ক হবে। দুঃখের ব্যাপার নিশ্চয়ই, তবুও অস্বীকার করবার উপায় নেই যে, ইতিহাসের তো বটেই সাধারণভাবে জ্ঞানের চর্চাই এখন নিম্নগামী। কেবল বাংলাদেশে নয়, বিশ্বজুড়েই এখন ওই ঘটনা ঘটে চলেছে। দাপট চলছে টাকার। এরই মধ্যে জ্ঞানের চর্চার ক্ষেত্রে পদক্ষেপ-গ্রহণ মাত্রেই আশার সঞ্চার করে বৈকি। গ্রন্থটি সেদিক থেকেও মূল্যবান।

গ্রন্থের অভ্যন্তরীণ মূল্যটিই অবশ্য একে স্মরণীয় করে রাখবে। গ্রন্থটিতে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে বিভিন্ন শ্রেণী ও পেশার, প্রতিষ্ঠানের, অঞ্চলের, এমনকি সৃষ্টিশীল মানুষদের ব্যক্তিগত ভূমিকা তুলে ধরা হয়েছে; বাংলাভাষার ইতিহাস, দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার সাথে বাংলার সম্পর্ক বিষয়েও আলোচনা স্থান পেয়েছে। প্রবন্ধগুলোতে তথ্য আছে এবং সে তথ্য জ্ঞানের সামগ্রীতে পরিণত হয়েছে। গ্রন্থটি পাঠকের মনে যে নতুন কৌতূহল এবং প্রশ্ন জাগাবে, সে-ব্যাপরটাও কম গুরুত্বপূর্ণ নয়।

২

প্রথম প্রশ্ন মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ কেন উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করতে অমন ব্যগ্র হলেন। উর্দু তো তাঁর মাতৃভাষা নয়, নিজের মাতৃভাষা গুজরাটিতে তিনি কথা বলতেন না, তাঁর কথাবার্তা ছিল ইংরেজী ভাষাতেই এবং ঢাকার জনসভাতেও বিস্ময়কর ঘোষণাটি তিনি দিয়েছিলেন ইংরেজী ভাষাতেই। যে পাঞ্জাবীদের পক্ষে তিনি ছিলেন, উর্দু তাদেরও মাতৃভাষা নয়। প্রশ্নের উত্তরটা হলো এই যে, উর্দু পশ্চিম পাকিস্তানীদের মাতৃ ভাষা না হলেও যোগাযোগের ও সাহিত্যের ভাষা ছিল বৈকি; কবি ইকবাল নিজে পাঞ্জাবী ছিলেন, কিন্তু তিনি পাঞ্জাবী ভাষায় কবিতা লেখেননি, লিখেছেনে উর্দু ও ফার্সী ভাষাতে। পশ্চিম-পাকিস্তানপন্থীরা উর্দুকে মনে করতেন মুসলমানদের নিজস্ব সম্পত্তি বলে। উর্দুর এই গ্রহণযোগ্যতা ও আভিজাত্য ছিল ওই ভাষার প্রতি জিন্নাহর পক্ষপাতিত্বের একটি কারণ।

তবে তার চেয়েও বড় কারণ হলো ভাষার সাহায্যে একটি নতুন জাতি সৃষ্টি করা যাবে বলে তাঁর আশা। আধুনিক যুগের মানুষ হিসেবে এটা তিনি বিলক্ষণ জানতেন যে, জাতি গঠনে ধর্মের চাইতে অনেক বেশি শক্তিশালী উপাদান হচ্ছে ভাষা। ধর্মভিত্তিক জাতীয়তাবাদের ভিত্তিতেই পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা ঘটেছিল বটে, কিন্তু বারো শত মাইলের ব্যবধানে অবস্থিত রাষ্ট্রের দু'টি অংশকে একটি কেন্দ্রীয় শাসনের অধীনে ঐক্যবদ্ধ রাখতে গেলে ধর্মে যে কুলাবে না, ভাষার সাহায্য যে নিতে হবে, এবং সে-ভাষা যে বাংলা হবে না, হবে উর্দুই, এমনটা বোঝার মতো বাস্তববুদ্ধি মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর ছিল। পাকিস্তানের অধিবাসী শতকরা ৫৬ জনের মাতৃভাষা বাংলাকে হটিয়ে দিয়ে উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করা যে সম্ভব হবে না, বাস্তবতাবাদী জিন্নাহ সাহেব সেটাও বুঝে গেছিলেন; প্রতিবাদের মাত্রা দেখে। ভাষার সাহায্যে জাতি সৃষ্টির ব্যাপারে একই চিন্তাধারার মানুষ আইয়ুব খানের পক্ষেও সেটা বুঝতে কষ্ট হয়নি। পাকিস্তানী শাসকেরা দুই অংশের মধ্যে অগণতান্ত্রিক সংখ্যাসাম্যের (প্যারিটি) ব্যবস্থা এবং 'ওয়ান ইউনিট' গঠন করে পশ্চিম পাকিস্তানের সিন্ধু, উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও বেলুচিস্তানকে পাঞ্জাবের অধীনস্ত করার আয়োজন করেছিলেন সত্য, কিন্তু অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে সাংবিধানিক স্বীকৃতি না দিয়ে পারেননি। আইয়ুব খান তবু আশা ছাড়েননি; তিনি চেষ্টা করেছিলেন উভয় ভাষাকে একটি বর্ণমালার ভেতরে নিয়ে এসে নতুন একটি ভাষায় রূপান্তরিত করা যায় কি না সেটা দেখতে। ওই বর্ণমালা আরবী হলেই তিনি সন্তুষ্ট হতেন, কিন্তু সেটা মুখ ফুটে বলতে পারেননি, রোমান হরফের কথাই বলেছেন। গোটা পাকিস্তানকে ঐক্যবদ্ধ ও এককেন্দ্রিক

শাসনাধীন রাখার জন্যই পাকিস্তানী নামে নতুন একটি জাতি গঠনে তাঁদের অমন আগ্রহ জন্মেছিল; আর সেই পাকিস্তান যে ঔপনিবেশিক চরিত্রের হবে; অর্থাৎ পশ্চিমাঞ্চলের সামরিক-বেসামরিক আমলাতন্ত্রিক শাসনামলের অধীনে পূর্ববঙ্গকে একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশে পরিণত হয়ে যাবে, এটাও ছিল তাঁদের আশা।

ঔপনিবেশিকেরা দখলদারিত্বের একেবারে প্রথম দিকেই যে কাজটা শুরু করেন তা হলো নিজেদের ভাষাকে শাসিতদের ওপর চাপিয়ে দেয়া। ভাষা তো কতগুলো শব্দের সমষ্টি মাত্র নয়, ভাষাতে সংস্কৃতি এবং চিন্তা-চেতনা থাকে; দখলদার শাসকেরা চান নিজেদের সংস্কৃতি ও চিন্তাধারাকে শাসিতদের চিন্তা-চেতনায় এমনভাবে অনুপ্রবিষ্ট করবেন যাতে করে শাসিতেরা শাসকদেরকে উন্নততর প্রাণী হিসেবে বিবেচনা করতে শিখবে এবং বশ্যতাকে স্বাভাবিক বলে মেনে নেবে। শাসকেরা ধর্মান্তরিত করার ব্যাপারে তেমন উৎসাহ দেখান না; সেটা এই জন্য যে, তাঁরা জানেন যে তাতে প্রবল বিরোধিতা আসবে; কিন্তু ভাষা শিখতে মানুষ খুব একটা আপত্তি করবে না, বিশেষকরে যদি কাজটা শিক্ষাব্যবস্থার মাধ্যমে সম্পন্ন করা যায়, কারণ শিক্ষার্থীরা যে দেখবে ওই ভাষা শিখলে শাসকদের কাছাকাছি যাওয়া সম্ভব হচ্ছে এবং সুবিধা পাওয়া যাচ্ছে, সমাজে সম্মান বাড়ছে; ধর্মবিশ্বাসেরও কোনো ক্ষতি হচ্ছে না। ইংরেজ শাসকেরাও ওই কাজটিই করেছেন, ভাষা শিক্ষা দেয়ার মধ্য দিয়ে তারা একটি অনুগত শ্রেণী তৈরী করে নিয়েছেন। পাকিস্তানী শাসকেরাও পূর্ববঙ্গে একটি অভ্যন্তরীণ উপনিবেশ তৈরীর তালে ছিলেন; সেটাই মূল অনুপ্রেরণা যার তাগিদে উর্দুকে চাপিয়ে দিতে তাদের ওই চেষ্টা।

৩

স্বাধীন বাংলাদেশে বাংলা ভাষা রাষ্ট্রভাষা হয়েছে ঠিকই কিন্তু রাষ্ট্রের ভাষা হয়নি। উচ্চ আদালতে এবং উচ্চ শিক্ষায় বাংলার প্রতিষ্ঠা ঘটেনি। প্রশাসনের ওপর তলাতেও ইংরেজীর প্রতি পক্ষপাত বিদ্যমান। তিন ধারার শিক্ষা আগেও ছিল, এখন শুধু যে আছে তা-ই নয়, আরও ব্যাপক ও গভীর হয়েছে। এর মূল কারণ এই যে, শ্রেণীবিভাজন দূর হয়নি বরং আগের তুলনায় আরও গভীর ও কঠিন হয়েছে। সমাজের ওপর তলার লোকেরা ছেলেমেয়েদেরকে ইংরেজী মাধ্যমে পড়তে পাঠায় এবং পরে বিদেশে পাঠানোর ব্যবস্থা করে। হতদরিদ্র মানুষের ছেলেমেয়েরা মাদ্রাসায় যায় এবং সেখান থেকে যে শিক্ষা পায় তাতে কর্মজীবনে যে সুবিধা পাবে এমনটা ঘটে না। তারা গরীবই রয়ে যায়। বেকার হয়, এবং হতাশায় ভোগে। শিক্ষার মূলধারার মাধ্যম বাংলা ঠিকই, কিন্তু সে-ধারা নানা-কারণে এবং আঘাতে দুর্দশাগ্রস্ত।

ভাষা সম্বন্ধে দাবী করা হয় যে সে শ্রেণী, ধর্ম, বর্ণ, কোনো ব্যবধানই মানে না। ভাষা কারও ব্যক্তিগত সম্পত্তি নয়, ভাষার ব্যবহারে সকল ব্যবহারকারীর সমান অধিকার ও সুযোগ থাকা চাই। কিন্তু বাস্তবে তো সেটা সত্য হয় না। বাংলাদেশে বিশেষভাবেই সত্য হয়নি।

বাংলাদেশ একটি প্রান্তিক পুঁজিবাদী রাষ্ট্র এবং এর উন্নতি পুঁজিবাদী পথ ধরেই এগিয়েছে, তার বাইরে যায়নি। পুঁজিবাদী উন্নয়ন বৈষম্য সৃষ্টি করে, বাংলাদেশেও সেটাই করে চলেছে। ফলে নাগরিকদের জন্য সমান অধিকারের কথা সংবিধানে লেখা থাকলেও সমাজে সেটা নেই। আর সমান সুযোগ থাকার তো প্রশ্নই ওঠে না। সকল প্রকারের সুযোগই প্রথমে পায় বিত্তবানরা, বাকিটার কিছু অংশ যায় মধ্যবিত্তের কাছে, চুঁইয়ে যা পড়ে সেটা পায় নিম্নবিত্ত ও দরিদ্ররা। ধনবৈষম্যের এই কারণেই শিক্ষাক্ষেত্রেও বৈষম্য বাড়ছে। শিক্ষা সর্বজনীন হয়নি; দরিদ্র মানুষরা কোনোমতে অক্ষরজ্ঞান যদি লাভ করেনও কিন্তু তার বেশি এগুতে

পারেন না। মাতৃভাষার ব্যবহারের অধিকার ও সুযোগ থেকে তাঁরা বঞ্চিত। আর মাতৃভাষার মাধ্যমে দেশে একটি অভিন্ন শিক্ষা-ধারা গড়ে তোলার স্বপ্নটা তো ইতিমধ্যেই ধূসর হয়ে পড়েছে। অথচ সবাই জানেন ও স্বীকার করেন যে, মাতৃভাষা যদি মাধ্যম না হয় তাহলে শিক্ষা গভীর, স্থায়ী, যথার্থ ও সর্বজনীন হয় না। স্বাধীন বাংলাদেশ মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষার ব্যবস্থা করবে এমন প্রতিশ্রুতি দিয়েছিল। কিন্তু রাষ্ট্র সেটা রক্ষা করতে পারলো না। কারণ যে বুর্জোয়ারা রাষ্ট্রক্ষমতা করতলগত করে ফেললেন তাঁরা দেশপ্রেমিক নন, তাঁরা পুঁজিবাদে বিশ্বাসী। এবং পুঁজিবাদের মূল ভাষা এখন ইংরেজী, যেটিকে আমাদের শাসকেরা অতিশয় আদরের সঙ্গে আঁকড়ে ধরেছেন, কিছুতেই ছাড়বেন না।

বিশ্বে বাংলাভাষীর সংখ্যা এখন কমপক্ষে পঁচিশ কোটি। জনসংখ্যার হিসেবে বাংলা ভাষার বৈশ্বিক অবস্থান পঞ্চম হবার কথা। কিন্তু হয়নি। প্রধান কারণ চর্চার অভাব। কথা ছিল চর্চার ব্যাপারে বাংলাদেশই প্রধান উদ্যোক্তা ও কেন্দ্র হবে। বাংলাদেশ সেটা হতে পারেনি। অখণ্ড বাংলার জন্য মর্মান্তিক ক্ষতি ঘটে গেছে সাতচল্লিশের দেশভাগে। সে সময়ে কলকাতার যে ব্রাহ্মণ্যবাদীরা দেশকে ভাগ করবার ব্যাপারে সবচেয়ে বেশি আগ্রহী ছিলেন তাঁরাই এখন বলছেন যে, হিন্দীর দাপটে পশ্চিমবঙ্গে বাংলা ভাষা যে কেবল কোণঠাসা হয়ে পড়েছে তা-ই নয়, দুর্দশাতেও নিক্ষিপ্ত হয়েছে বটে। হিন্দীর আগ্রাসন অনেকটা ঔপনিবেশিক ধরনেরই। বাংলাদেশেও কিন্তু ঔপনিবেশিকতার অবসান ঘটেনি; স্বদেশী শাসক ও বিত্তবানেরা এখানে এখন ঔপনিবেশিক শাসকদের মতোই আচরণ করেন। দেশের অভ্যন্তরে তাঁরা উৎপাদনে নয় লুণ্ঠনেই অধিক আগ্রহ প্রদর্শন করেন এবং দেশের সম্পদ বিদেশে পাচার করাকে তাঁরা সকল কাজের সেরা কাজ হিসেবে গণ্য করে থাকেন।

একুশে ফেব্রুয়ারী যে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পেয়েছে তার কারণ একটাই; অর্থনৈতিকভাবে দুর্বল দেশগুলোতে মাতৃভাষার দুর্দশা। এবং ওই দুর্দশার কারণও অভিন্ন, সেটা হলো পুঁজিবাদের দুঃশাসন। মাতৃভাষার জন্য আন্তর্জাতিক সংগ্রামটা তাই পুঁজিবাদবিরোধী সংগ্রামেরই অংশ। পুঁজিবাদের করাল কবল থেকে মাতৃভাষাকে রক্ষা করতে হলে পুঁজিবাদকে বিদায় করা ছাড়া বিকল্প কোনো পথ যে নেই আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস সে-কথাটাই স্মরণ করিয়ে দিতে চায়। যে-সংগ্রাম একদিন পূর্ববঙ্গে শুরু হয়েছিল, সেটা এখন বিশ্বব্যাপী হওয়া আবশ্যক। কিন্তু এমনকি পূর্ববঙ্গের মানুষই তো সংগ্রামে জয়ী হয়েও যে হেরে যাবার দশায় পড়েছে, যার কারণ এই যে, পুঁজিবাদ বিদায় করে দিয়ে সম্পত্তির ব্যক্তি মালিকানার পরিবর্তে সামাজিক মালিকানা প্রতিষ্ঠা করা সম্ভব হয়নি।

বাংলাভাষাকে মর্যাদাবান করার জন্য তাই একদিকে যেমন প্রয়োজন জ্ঞানবিজ্ঞানের ও সাহিত্যের চর্চায় তাকে সমৃদ্ধ করে তোলা, অপর দিকে তেমনি আবশ্যক পুঁজিবাদের অবসান ঘটানোর সংগ্রামক বেগবান করে তোলা।

পুঁজিবাদের আগ্রাসন কিন্তু শহীদ দিবস হিসেবে আমাদের সাংবাৎসরিক একুশে ফেব্রুয়ারীর উদ্‌যাপনের ভেতরও ঢুকে পড়েছে। তার একটা প্রমাণ এটা যে, একুশের উদ্‌যাপন সর্বজনীন হয়ে ওঠেনি, মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ভেতরই সীমাবদ্ধ রয়ে গেছে। কেবল তা-ই নয়, উদ্‌যাপনের ব্যাপারে মধ্যবিত্তরাও ক্রমান্বয়ে আগ্রহ হারাচ্ছে। আরেকটি ঘটনা হচ্ছে এই যে, একুশের প্রভাতফেরি এখন চলে গেছে মধ্যরাত্রে। মধ্যরাত্রে অনুষ্ঠান শুরু করাটা বিশ্ব পুঁজিবাদের যে-ধারার সঙ্গে আমরা যুক্ত তার অন্তর্গত মূল দেশগুলোর রীতি;

বাঙালীর রীতি নয়। বাঙালী তার সকল অনুষ্ঠানই শুরু করে প্রত্যুষে; যখন সূর্য ওঠে, প্রকৃতি জাগে, মানুষের ঘুম ভাঙে, পাখিরা গান গেয়ে ওঠে সেই সময়ে। একুশের উদ্‌যাপনও আমরা সূর্যদোয়ের সঙ্গেই শুরু করতাম, মধ্যরাতের করার কথা আমাদের কল্পনাতেও ছিল না। এবং এটাও মোটেই তাৎপর্যবিহীন নয় যে, প্রভাতফেরিকে মধ্যরাত্রে ঠেলে পাঠানোর ঘটনাটির সূত্রপাত ঘটে ১৯৭০ সালে, বাংলাদেশ যখন স্বাধীনতার দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত। রাষ্ট্রীয় স্বাধীনতা আসবে, কিন্তু জনগণের মুক্তি যে অনাগতই রয়ে যাবে ঘটনাটি যে তারই পূর্বভাস দিচ্ছিল এমনটা বলা বোধ হয় অন্যায্য হবে না। ওদিকে আবার পণ্য-ব্যবসায়ীরা এক কাণ্ড ঘটিয়েছেন, তাঁরা 'ভালোবাসা দিবস' নিয়ে এসেছেন; প্রতিবছর যেটা ঘটে একুশের কয়েকদিন আগে।

ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তার উত্তরাধিকার বিষয়ে ভাবতে গেলে ভাষার শত্রু এবং মিত্র উভয়ের কথাই ভাবনায় এসে যায়। মিত্র হচ্ছে বাংলাভাষা যাঁরা ব্যবহার করেন এবং একে সমৃদ্ধকরণে ব্রতী হন তাঁরা; শত্রু হলো পুঁজিবাদ ও তার অনুষঙ্গগুলো।

এ ধরনের নানা চিন্তার উদ্রেককারী হিসেবেও এই গ্রন্থের পঠন-পাঠন যে উপকারী হবে তাতে কোনো সন্দেহ নেই।

সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী
ইমেরিটাস অধ্যাপক, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়

সম্পাদকের কথা

২০২৪ সালের ২৯-৩০শে এপ্রিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র' 'ভাষা আন্দোলন এবং বিশ্বে বাংলাভাষী স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব' শীর্ষক আন্তর্জাতিক কনফারেন্স আয়োজন করে। কনফারেন্সে বিচিত্র শাস্ত্রের শিক্ষার্থী ও শিক্ষক সংশ্লিষ্ট বিষয়ে নিজেদের গবেষণাকর্ম উপস্থাপন করেছিলেন। এর মধ্য দিয়ে একটা বড়ো ঘটনা ঘটেছিল। অংশগ্রহণকারীদের বিষয় ও দৃষ্টিভঙ্গির বৈচিত্র্য কনফারেন্সের শিরোনামকে ছাড়িয়ে খোদ ভাষা আন্দোলন পাঠের নতুন সম্ভাবনা হাজির করেছিল।

ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশ ও এর জনগোষ্ঠীর জীবনে সবচেয়ে দিকনির্ণায়ক ঘটনাগুলোর একটি। যদি স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ক্ষণটিকে দেশের বর্তমান জনগোষ্ঠীর জন্য সবচেয়ে প্রভাবশালী ঘটনা ধরে নিই, তাহলে ভাষা আন্দোলনের প্রবর্ধিত গুরুত্বও স্বীকার করতে হবে। কারণ, যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্য দিয়ে জাতিরাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের আবির্ভাব, তার আনুষ্ঠানিক সূত্রপাত যে ভাষা আন্দোলনে, তাতে কোনো পক্ষের সন্দেহ দেখা যায়নি। কাজেই ভাষা আন্দোলনের জাতীয়তাবাদী পাঠই অন্তত স্বাধীন বাংলাদেশ প্রতিষ্ঠার পরে একচেটিয়া প্রাধান্য পাবে– এতে বিস্ময়ের কিছু নেই। সাক্ষ্য-প্রমাণ থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, স্বাধীনতার আগেও জাতীয়তাবাদী ঝোঁকই ভাষা আন্দোলনের পাঠ ও সংশ্লিষ্ট তৎপরতার প্রধান লক্ষণ ছিল। তবে, তখন অনিশ্চয়তা, দ্বিধা-দ্বন্দ্ব ও বাস্তবের চাপ সংশ্লিষ্ট চৈতন্য ও দৃষ্টিভঙ্গিকে পুরোপুরি একরৈখিক করে তোলেনি, যেমনটি স্বাধীনতার পরে অনেকাংশে ঘটেছিল।

'উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র' ২০২৪-এ যে কনফারেন্সের আয়োজন করেছিল, তাতেও জাতীয়তাবাদী ঝোঁকটাই ছিল প্রধান। তবে শিরোনামে একটা অন্যরকম সম্ভাবনার কথাও ছিল। সারা দুনিয়ার বাংলাভাষী মানুষের একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশ একটি রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা করেছে– এ দাবির ভিন্নতর তাৎপর্য আছে। এর এক দিক দায়িত্বপালন। ভাষা ও তৎসংশ্লিষ্ট বহুবিধ কায়কারবার রাষ্ট্রীয় সীমানার বাইরে গিয়ে ওই ভাষাভাষী সকল মানুষকেই প্রভাবিত করতে পারে। আমরা যখন বলি, বাংলাদেশ ভাষাকেন্দ্রিক জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে, তখন এ দায়িত্বটাও সে কথার মধ্যে প্রতিফলিত হয়। কনফারেন্সে এ বিষয়ে সরাসরি কোনো প্রবন্ধ পঠিত হয়নি। কিন্তু পরোক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনের প্রবর্ধিত তাৎপর্যের দিকে অনেকেই আলোকপাত করেছেন।

কনফারেন্সে উপস্থাপিত প্রবন্ধ থেকে আমরা বইয়ের জন্য কিছু প্রবন্ধ বাছাই করেছি। বর্তমান গ্রন্থ ওই নির্বাচিত প্রবন্ধের পরিমার্জিত প্রকাশ। সেমিনারে বিভিন্ন প্রাবন্ধিক বহুমাত্রিক দৃষ্টিকোণ থেকে ভাষা আন্দোলনকে চিত্রিত করেছেন। প্রাবন্ধিকরা ১৯৫২-র পর থেকে ভাষা আন্দোলনের দিবস উদ্‌যাপনে বৈচিত্র্য, সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলনকে উপস্থানের সেকাল-একাল, পুথিসাহিত্যে সেমেটিক হরফে বাংলা ভাষার বৈচিত্র্যময় প্রকাশ, ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণ, নারীর অবদান, বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা চর্চা, বিভিন্ন শ্রেণিপেশার মানুষের অংশগ্রহণ ও অবদান নিয়ে নানা দৃষ্টিকোণ থেকে বিশ্লেষণমূলক আলোচনা করেছেন। প্রবন্ধগুলো ভাষা, জাতিসত্তা ও সমাজ-রাজনৈতিক রূপান্তরের জটিল বুননে এক গভীর অভিযাত্রার দিকে আমাদের নিয়ে যায়, যেখানে বাংলাদেশ রাষ্ট্রের অভ্যুদয় কোনো সমাপ্তিবিন্দু নয়, বরং নতুন এক মহাযাত্রা। রাষ্ট্রভাষা দিবসের মাহাত্ম্য ও ভাবগাম্ভীর্য থেকে বিচ্যুত হয়ে বর্তমানে ভাষার বিপণনযোগ্য পণ্য হয়ে ওঠা,

প্রাচীন পুথির ঐতিহ্য থেকে শুরু করে আধুনিক ডিজিটাল সংরক্ষণ প্রচেষ্টা, ভাষা আন্দোলনের সম্মিলিত সংগ্রাম থেকে জাতীয় পরিচয় নিয়ে সূক্ষ্ম বিতর্ক– সব মিলিয়ে গ্রন্থটি আমাদের অস্তিত্বের এক বহুবর্ণ রূপপট উন্মোচন করে।

বাংলা ভাষার দাবি ছিল গণতান্ত্রিক এবং এর সহিষ্ণু ও বহুত্ববাদী চরিত্র এটা নির্দেশ করে যে, পূর্ব-বাংলার সংস্কৃতি বরাবরই 'অপর'-কে গ্রহণ করার মানসিকতা ধারণ করে। তৎকালীন পাকিস্তানের অন্তত ছাপ্পান্ন শতাংশ মানুষের ভাষা বাংলা হওয়া সত্ত্বেও ভাষা আন্দোলনে বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি উচ্চারিত হয়নি। সবসময় সামনে এসেছে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি। এটা বাংলাদেশের মানুষের উদার ও গণতান্ত্রিক চরিত্রেরই প্রতিফলন।

বইটির অন্যতম তাৎপর্যপূর্ণ অংশ হলো বাঙালি পরিচয়ের সাংস্কৃতিক ও ভাষাগত স্বাতন্ত্র্য নিয়ে আলোচনা। এ সংকলনে প্রকাশিত প্রবন্ধে গবেষকেরা দেখিয়েছেন, কীভাবে বাংলা ভাষা প্রতিরোধ ও সহিষ্ণুতার ভাষা হিসেবে বিকশিত হয়েছে। দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ায় বাঙালি প্রবাসীদের প্রাচীন ইতিহাস এবং সেখানকার সামুদ্রিক সংযোগ ও সাংস্কৃতিক বিনিময় বাংলা ভাষার সাহিত্য ও মৌখিক ঐতিহ্যকে কীভাবে সমৃদ্ধ করেছে, সে বিষয়টিও এখানে তুলে ধরা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলন একটি বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছিল না, বরং এটি বাঙালির সাংস্কৃতিক আত্মপ্রকাশের ধারাবাহিকতার অংশ। চর্যাপদ থেকে শুরু করে মধ্যযুগে সুলতানি আমলে বাংলা ভাষার শক্তিশালী উত্থান এবং রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, কাজী নজরুল ইসলামসহ বহু বড়ো সাহিত্যিকের সৃষ্টিশীল রচনায় বাংলা ভাষা সৃজনশীল ও চিন্তাশীল প্রকাশের মাধ্যম হিসেবে বারবার নিজের সামর্থ্যের প্রমাণ দাখিল করেছে। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার স্বীকৃতি পাওয়াকে এই বৃহত্তর সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যের বিজয় হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে গ্রন্থভুক্ত কোনো কোনো প্রবন্ধে।

বইটির একটি গুরুত্বপূর্ণ অংশে দেখানো হয়েছে, কীভাবে ভাষাগত জাতীয়তাবাদ একসময় বাংলাদেশি জাতীয়তাবাদে পরিণত হয়। এসরাদ এ. একার অধ্যায়টিতে এই রূপান্তরের রাজনৈতিক বিশ্লেষণ রয়েছে। তিনি যুক্তি দিয়েছেন, ভাষা আন্দোলনই এক আলাদা বাংলাদেশি পরিচয়ের বীজ বপন করে, যা বৃহত্তর ভারতীয় বাঙালি পরিচয় থেকে স্বতন্ত্র। ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধকালে এই রূপান্তর আরও সুসংহত হয়, যেখানে ভাষার অধিকার অর্জনের সংগ্রাম স্বাধীনতার দাবিতে রূপ নেয়।

বইটি ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকারের রাজনৈতিক ব্যবহার বা অপব্যবহার নিয়েও প্রশ্ন তোলে। একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালন করার সময় এটি কীভাবে তার বিপ্লবী মর্মার্থ হারাতে বসেছে এবং কেবল আনুষ্ঠানিকতা বা লোকজ উৎসবে পরিণত হচ্ছে, সে বিষয়েও সতর্ক করে। বইটিতে ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ও আধুনিক গণমাধ্যমে তার উপস্থাপনের বিশ্লেষণ রয়েছে। এখানে একুশে ফেব্রুয়ারির বাণিজ্যিকীকরণের প্রতি মনোযোগ দেওয়া হয়েছে– যেখানে দিনটি পালন করা হয় উৎসব, বাণিজ্যিক পণ্যায়ন, বিজ্ঞাপন ও মিডিয়া কভারেজের মাধ্যমে। এসব উদ্যোগ সচেতনতা সৃষ্টিতে অবদান রাখলেও, সতর্ক না হলে এ ধরনের আয়োজন আন্দোলনের ঐতিহাসিক গুরুত্বকে ছাপিয়ে যেতে পারে বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে।

ডিজিটাল মিডিয়ার ভূমিকা নিয়েও বিশ্লেষণ করা হয়েছে– অনলাইন আর্কাইভ, প্রামাণ্যচিত্র ও সোশ্যাল মিডিয়া আন্দোলনের ইতিহাসকে সংরক্ষণ ও ছড়িয়ে দিতে সাহায্য করছে। তবে 'ডিজিটাল অ্যাকটিভিজম'-এর সম্পৃক্ততা সম্পর্কে সতর্ক করে বইটি একটি গভীর ও সমালোচনামূলক অনুশীলনের প্রয়োজনীয়তার কথা বলে।

ভাষা আন্দোলনের লক্ষ্য আজও পূর্ণ হয়নি। শিক্ষা, আইন ও প্রশাসনে ইংরেজি ভাষার আধিপত্য, বাংলাদেশের বাংলা ব্যতীত অপরাপর ভাষার প্রতি অবহেলা এবং বিশ্বায়নের চাপে বাংলা ভাষার সাহিত্যিক ঐশ্বর্যের ক্ষয়– এগুলো আজকের বাস্তবতা। বইটি ভাষাগত বৈচিত্র্য সংরক্ষণের আহ্বান জানায় এবং বাংলা ভাষাকে একটি জীবন্ত, বিবর্তনশীল ভাষা হিসেবে রক্ষা করার জন্য নতুন প্রতিশ্রুতি চায়। এছাড়া, সমকালীন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সংগ্রামের সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা ও চেতনা কীভাবে যুক্ত করা যায়, সে বিষয়েও আলোচনা করা হয়েছে। দাবি করা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় গণতন্ত্রহীনতা এবং দমন-পীড়নের বিরুদ্ধে একুশের প্রতিরোধ আজকের ন্যায়বিচার ও সাম্যের আন্দোলনেও প্রাসঙ্গিক।

একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষিত হওয়ার পরের এক বাস্তবতার দিকে বইটি বিশেষভাবে আমাদের মনোযোগ আকর্ষণ করে। এটা ঠিক, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের নামের আড়ালে এ আন্দোলনের এক গুরুতর দিক চাপা পড়ে গেছে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন যে মূলত রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন– মাতৃভাষা আন্দোলন নয়, সে কথা ভুলে যাওয়ার বিপদ অনেক। বাংলাদেশে বাংলাকে প্রকৃত রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উচ্চশিক্ষায়, অফিসে এবং আদালতে ব্যবহারের অতি জরুরি কাজটি এ নামের কারণে খানিকটা আড়ালে পড়ে গেছে বলেই মনে হয়। এ বিষয়ে অবশ্য কোনো প্রবন্ধ বর্তমান সংকলনে নেই। তবে অন্য একটি গুরুত্বপূর্ণ প্রসঙ্গ বিশেষভাবে সামনে এসেছে। তা হলো, বাংলাদেশের বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষাচর্চার প্রসঙ্গ। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার একটি ইতিবাচক দিক এই যে, খানিকটা আন্তর্জাতিক মনোযোগের কারণেই বাংলা ব্যতীত অপর মাতৃভাষাগুলোর দিকে মনোযোগ বেড়েছে এবং সমানুপাতে সেগুলোর চর্চাও হয়েছে। এদিকটা আমাদের ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক লেখালেখিতে এখনো বিশেষ মনোযোগ পায়নি। সেদিক থেকে বর্তমান গ্রন্থটি বিশেষ মনোযোগ দাবি করে। তুলনামূলক প্রান্তীয় ইতিহাস সম্পর্কে সচেতনতা এ বইয়ের আরেক উল্লেখযোগ্য বৈশিষ্ট্য।

ভাষা আন্দোলন কেবল গৌরবজনক ইতিহাস নয়, জাতীয় জীবনের সবক্ষেত্রে ভাব-অভিব্যক্তির স্বতঃস্ফূর্ত প্রকাশে উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত এক অমূল্য উপহার। এ প্রেক্ষাপটে বর্তমান বইটি কেবল ইতিহাসচর্চা নয়, এ এক কর্মপন্থার ডাক। নানা সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও এ ধরনের একটা আকাঙ্ক্ষা আমাদের আছে। বইটি প্রশ্ন তুলতে চায়– ভাষা আন্দোলনের উত্তরাধিকার হয়ে কীভাবে বর্তমানের সাংস্কৃতিক পরিচয়, অন্তর্ভুক্তিমূলক শাসনব্যবস্থা এবং কর্তৃত্ববাদ-বিরোধী সংগ্রাম অব্যাহত রাখা যায়। বাংলাদেশ যখন বিশ্বায়ন ও ডিজিটাল রূপান্তরের চ্যালেঞ্জ মোকাবিলা করছে, তখন বইটি আমাদের স্মরণ করিয়ে দেয়– ভাষা কেবল যোগাযোগের মাধ্যম নয়, এটি সম্মিলিত স্মৃতি ও প্রতিরোধের ভিত্তি। বইটিতে সমকালীন গণতন্ত্র ও মানবাধিকারের সংগ্রামের সঙ্গে ভাষা আন্দোলনের শিক্ষা ও চেতনা কীভাবে যুক্ত করা যায়, সে প্রসঙ্গও তোলা হয়েছে।

আমাদের সৌভাগ্য, ভাষা আন্দোলনের বিস্তৃত ইতিহাস লেখা শুরু হয়েছিল বদরুদ্দীন উমরের *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*র মতো অসামান্য গ্রন্থ দিয়ে। দলীয় ঝোঁক খানিকটা বেশি থাকলেও এ বইতে এক বৃহত্তর পটভূমিতে ভাষা আন্দোলনকে স্থাপন করে দেখার দারুণ নজির স্থাপিত হয়েছিল। পরবর্তী বহু রচনা দৃষ্টিভঙ্গির সেই প্রসারতা ও গভীরতা রক্ষা করতে পারেনি। স্বাধীনতার পরে প্রধানত জাতীয়তাবাদী রাজনীতির উপাদান হিসাবে ব্যক্তিকীর্তন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসচর্চায় খুব বড়ো পরিসর দখল করতে থাকে। অথচ এ ধরনের একটি 'ইভেন্ট' হয়ে উঠতে পারত রীতিমতো ইতিহাসচর্চার দিকনির্ণায়ক এলাকা। আমরা আশা করতে পারি, ইতিহাসের তত্ত্ব ও চর্চায় আজকাল যে গভীর সূক্ষ্মতা সঞ্চারিত হয়েছে, দৃষ্টিভঙ্গির যে বহুমাত্রিকতা আবিষ্কৃত হয়েছে, ভাষা আন্দোলনের অনুষঙ্গী হয়ে সেগুলো আমাদের ইতিহাসচর্চার অঙ্গনেও প্রবেশ করবে।

এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, প্রবন্ধের ক্ষেত্রে লেখককে মতপ্রকাশের পুরো স্বাধীনতা দেওয়া হয়েছে। লেখাগুলোর মতামত সম্পূর্ণভাবে লেখকের নিজস্ব। আরও উল্লেখ্য, প্রবন্ধের মানের ক্ষেত্রে তারতম্য পরিলক্ষিত হতে পারে।

গ্রন্থ প্রকাশের ক্ষেত্রে সেন্টারের কার্যনির্বাহী কমিটির সদস্যবৃন্দ আন্তরিক উৎসাহ ও সার্বিক সহায়তা করেছেন। শ্রদ্ধেয় অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর লেখা ভূমিকাটি এই বইয়ের উৎকর্ষ ও গভীরতা বৃদ্ধি করেছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ্য, অধ্যাপক সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী বানান ব্যবহারের ক্ষেত্রে নিজস্ব দার্শনিক ধারণা পোষণ করেন; এই চিন্তার প্রতি সম্মান রেখে ভূমিকাতে তাঁর নিজস্ব বানানরীতি ব্যবহার করা হয়েছে। তবে প্রবন্ধগুলোর ক্ষেত্রে বাংলা একাডেমি প্রবর্তিত বানানরীতি মান্য করা হয়েছে। ইংরেজি প্রবন্ধগুলো সম্পাদনার ক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক ড. সামসাদ মর্তূজা সহায়তা করেছেন। বাংলা একাডেমির অভিধান ও বিশ্বকোষ উপবিভাগের সহকারী সম্পাদক রাজীব কুমার সাহা বইটির বানান এবং প্রয়োজনীয় ভাষা সংশোধন করেছেন।

সার্বিক কাজ সমন্বয় ও তত্ত্বাবধায়ন করেছেন সেন্টারের সিনিয়র রিসার্চ ফেলো কাজী সামিও শীশ। প্রয়োজনীয় গবেষণাকর্মে মেধা ও নিষ্ঠার সঙ্গে সহায়তা করেছেন তরুণ গবেষক ডেইজি আক্তার ও মোস্তাকিম।

সেন্টারের মুদ্রাক্ষরিক সরদার ময়েনউদ্দিন অত্যন্ত ধৈর্যের সঙ্গে গ্রন্থটির কম্পোজের পরিশ্রমসাধ্য কাজটি সম্পন্ন করেছেন। গ্রন্থটি প্রকাশনার কাজ করেছে আমাদের প্রিয় প্রতিষ্ঠান 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রেস'। সংশ্লিষ্ট সকলের প্রতি সেন্টারের পক্ষ থেকে কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করছি।

সূচিপত্র

ভূমিকা	i
সম্পাদকের কথা	vii
সেমেটিক লিপিতে বাংলা পাণ্ডুলিপি: ভাষা-বৈচিত্র্য এবং পাঠাভ্যাস (আনু. ১৬০০-১৯০০ অব্দ) শহিদুল হাসান	০১
ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্যে রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্প: 'কবর' ও 'আরেক ফাল্গুন' মোহাম্মদ আজম	৩১
একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩: উদ্‌যাপন, সাহিত্যসৃজন ও রাজনীতি রাফাত আলম	৪৭
কান্দে বাংলা জননী ঢাকার শহরে: জন্ম, ইতিহাস-অনুষঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'ঢাকার ডাক' রঙিলী বিশ্বাস	৬৭
ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমিকা এম আবদুল আলীম	৮৯
ভাষার লড়াইয়ে নারী: কেন্দ্র থেকে প্রান্তে শান্তা পত্রনবীশ	১০৫
ভাষা আন্দোলন ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ মিলটন কুমার দেব	১৩৫
ভাষা আন্দোলনে জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভূমিকা শামীম আরা	১৪৯
ভাষা আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান চাঁদ সুলতানা কাওছার	১৬৯
ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের চারুশিল্পী সমাজ শাওন আকন্দ	১৮১
চট্টগ্রামের সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২) ফারহানা আজিজ	২০১

সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন ও একুশ নির্মাণ ২১৫
মো. মফিজুর রহমান
মোছা. নাসরিন আক্তার

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি ২৩৩
সানজিদা মুস্তাফিজ

ভাষা আন্দোলন এবং পূর্ব বাংলার মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য ২৪৯
ফোরকান আহমেদ

ভাষা আন্দোলনের চেতনা বিকাশে শহিদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারের অবদান ২৬৫
সুস্মিতা রানী দাস

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা চর্চায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রভাব ২৭৯
আনন্দ বিকাশ চাকমা

চা-শ্রমিকের ভাষা ৩০৭
দীপংকর মোহান্ত
আশফাক হোসেন

Dhaka As the Capital of Bangla Speaking State: Historical Perspective ৩২৩
Sharif Uddin Ahmed

Exploring Earliest Bengali Diaspora and Cultural Penetration to Southeast Asia and Maritime Connectivity (400 BCE-800CE) ৩৩৯
Sharmin Akhtar

The Cultural and Linguistic Affinities in Defining the Identity of Bengal ৩৫১
Md. Abdus Samad
Samia Yesmin

The Shifting from Bengali Nationalism to Bangladeshi Nationalism– A Political Analysis ৩৭৩
Eshrad A. Aeka

লেখক পরিচিতি ৩৯৫

নির্ঘণ্ট ৪০২

চিত্রমালা ৪০৭

সেমেটিক লিপিতে বাংলা পাণ্ডুলিপি: ভাষা-বৈচিত্র্য এবং পাঠাভ্যাস (আনু. ১৬১০-১৯৪৭ অব্দ)

শহিদুল হাসান

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookSahidul

বাংলা ভাষা ও বাংলা লিপিতে পাণ্ডুলিপি অনুলিপির ঐতিহ্য প্রায় সহস্রাব্দ-প্রাচীন। উনিশ শতকের বটতলার ছাপাখানার পুথির মাধ্যমে হাতে লেখা পুথির জনপ্রিয়তা হ্রাস পেতে থাকে। বাংলা পাণ্ডুলিপি বিষয়ক গবেষণায় বিগত পাঁচ দশকে বাংলা লিপির পাশাপাশি সেমেটিক তথা আরবি-ফারসি লিপিতে অনুলিপিকৃত বাংলা ভাষায় রচিত কয়েকটি পাণ্ডুলিপির পাঠ ও সম্পাদনা গ্রন্থাকারে প্রকাশিত হয়েছে। এগুলির মধ্যে রয়েছে *শরীয়ত-নামা*, *নুরনামা* এবং *ফাতেমার সুরতনামা*। কালানুক্রমিক মানদণ্ডে এ তিনটি কাব্যই সপ্তদশ শতকের এবং এদের অনুলিপিগুলি সপ্তদশ থেকে ঊনবিংশ শতকে সৃষ্ট। এছাড়া, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি এবং বাংলা একাডেমির পাণ্ডুলিপি শাখায় আরবি-ফারসি হরফে অনুলিপিকৃত বেশ কিছু বাংলা পুথি রয়েছে। সেমেটিক লিপিজাত আরবি-ফারসি হরফ ব্যবহার করে বাংলা পাণ্ডুলিপি লেখা ও কপি করার প্রয়োজন কেন হয়েছিল? পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠক এবং শ্রোতা কারা? কোন জনপরিসরে এ ধরনের পাণ্ডুলিপির জনপ্রিয়তা ছিল? পাণ্ডুলিপিগুলোর উপস্থাপকদের পারফরমেন্স কেমন ছিল? বর্তমান গবেষণায় সেমেটিক লিপিতে লিখিত বাংলা পুথিসমূহ– পাঠোদ্ধারকৃত এবং প্রকাশিত– আকরসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে উত্থাপিত প্রশ্নগুলোর উত্তর অনুসন্ধানের প্রয়াস নেওয়া হবে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় লাইব্রেরিতে সংরক্ষিত অপ্রকাশিত পুথিগুলিকেও বর্তমান গবেষণায় পুনর্বিবেচনা করা হবে। জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হওয়ার আগে বাংলা ভাষার পুথির বহুত্ববাদী চরিত্র এবং সামাজিক পরিসরে পুথি-পাঠের ইতিহাস তুলে ধরাই বর্তমান গবেষণার উদ্দেশ্য।

> বাল্যকালে দেখেছি, জ্যোৎস্নার রাত্রে গ্রামের গলিতে একদল (দশ-পনেরো বছরের) কিশোর হাডু-ডুডু খেলতো, আর একদল (বিশ-পঁয়তিরিশ) বছরের যুবকও খেলায় রত থাকত; বিকেলবেলায় ঘরের দাওয়ায় বসে পুঁথি পাঠ চলতো, গ্রামের বহু লোক তা শুনতে আসতো। এক ধরনের পুঁথি ছিল শহীদে কারবালা, মেসবাহুল ইসলাম, শাহনামা ইত্যাদি; আর এক ধরনের জঙ্গনামা, আমীর হামজা, হাতেম তাই ইত্যাদি; অন্য ধরনের জৈগুন বিবি, সোনাভান, সূর্যউজাল বিবি ইত্যাদি। ... আমার পিতাও ছিলেন সুকণ্ঠ পাঠক। পুঁথির বহুলাংশ তাঁর মুখস্থ ছিল। হজরত আদম (আ.) থেকে শুরু করে হজরত মুহম্মদ (স.) পর্যন্ত অনেক ঐতিহাসিক ও পৌরাণিক কাহিনী সময়-সময় পুঁথি-পুস্তক না দেখে তিনি আউড়িয়ে যেতেন। তাতে অনেক উপদেশ থাকতো, সেগুলোও অমি মনে রাখবার জন্য একটু বিশেষ যত্ন নিতাম (হোসেন, ২০২২, পৃ. ১৫)।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের খ্যাতিমান শিক্ষক কাজী মোতাহার হোসেনের *স্মৃতিকথায়* সামাজিক পরিসরে পুথিপাঠের এই আসরের স্থানিক ঠিকুজি হলো বর্তমান রাজবাড়ী জেলার পাংশা থানার বাগমারা গ্রাম। কাজী মোতাহার হোসেন তাঁর পিতার মতো নিজেও পুথি পড়ার স্বপ্ন দেখতেন।

তাঁর বর্ণ-পরিচয় হয় সাত বছর বয়সে এবং এ প্রসঙ্গে তিনি লিখেছেন, 'ঐ বয়স উত্তীর্ণ হবার পর আমার নিজের মনেই এসেছিল, আমিও কিতাব পড়ব, আদম-নুহ-ইব্রাহিম-মূসা-ঈসা-হজরত মুহম্মদ সবার বিষয়ে জানবো' (হোসেন, ২০২২, পৃ. ১৫)। নবি-রাসুলদের জীবনচরিত ও *কিস্‌সা* সংকলন *কাসাসুল আম্বিয়া* পুথি পড়ার রেওয়াজ হয়তো এই গণিত বিশেষজ্ঞ-সাহিত্যিকের মনে এরকম ইচ্ছার বীজ বপন করেছিল।

অষ্টাদশ শতকের সত্তরের দশকে বাংলা-বিহার ও উড়িষ্যার খাজনা আদায়ের অনুমতি পায় ব্রিটিশ ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি। কালক্রমে পুরো হিন্দুস্থানে কোম্পানির এবং পরবর্তীকালে ব্রিটিশ রাজের হুকুমত কায়েম হয়। বেনিয়া কোম্পানির ট্যাক্স কালেকশন এবং হাকিমের দণ্ড সবল রাখার তাগিদে প্রয়োজন হয় স্থানীয় সভ্যতা-সংস্কৃতি-কায়দা-কানুন জানার। হুকুমতের স্থায়িত্ব ও অর্থনৈতিক ফায়দাকে পোক্ত করার জন্য স্থানীয়দের জ্ঞানকাঠামোকে পাশ্চাত্যের লেবাসে সাজানোর প্রকল্প গ্রহণ করেন উনিশ-বিশ শতকের ওরিয়েন্টালিস্ট বা প্রাচ্যবিদগণ। উইলিয়াম জোনস কিংবা ভট্ট মোক্ষমূলর (জার্মান ভাষাবিদ ম্যাক্সমুলার)-দের রাহা অনুসরণ করে কালক্রমে দক্ষিণ এশীয় পণ্ডিতরাও নিজেদের অতীত রক্ষার কাজে আত্মনিয়োগ করেন। সংস্কৃত ভাষার পুথি সংগ্রহ, তালিকাভুক্তি, সম্পাদনা ও প্রকাশের মাধ্যমে পুথিবিষয়ক বিদ্যা ক্রমান্বয়ে শাস্ত্রীয় কাঠামোর দিকে অগ্রসর হতে থাকে। এক্ষেত্রে জার্মান দেশীয় রোমান্টিসিজমের হাওয়া এসে দোলা দেয় প্রাচ্যদেশীয় পুথিচর্চায়। বিশ শতকের শুরুতেই (১৯০৬) বাংলা ভাষার আদিরূপ সম্বলিত পাণ্ডুলিপি খোঁজার সাফল্যের মুকুট শিরোধার্য করেন মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী। তালপাতায় লেখা লুইপা, কাহ্নপা এবং সরহপাদের কবিতা উদ্ধার হয় নেপালের রাজদরবার থেকে। হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর সমসাময়িক আরেকজন পুথি-গবেষক তখন চষে বেড়াচ্ছেন পদ্মা, মেঘনা, যমুনাবাহিত গাঙ্গেয় ব-দ্বীপের গ্রামে-গঞ্জে। ঘরের খেয়ে বনের মোষ তাড়ানোর মতো করে হন্যে হয়ে চষে বেড়াচ্ছেন বাংলার আনাচেকানাচে। ১৯০৯ সালে চট্টল ধর্মমণ্ডলী সভা এই পুথিসাধক পণ্ডিতকে উপাধি দিয়েছিল 'সাহিত্যবিশারদ'; কেতাবিভাবে যিনি পরিচিত ছিলেন মুন্সি আবদুল করিম নামে। ইতোমধ্যে কলকাতায় গড়ে উঠেছে চিৎপুর-গগনহাটা-বটতলার পুথির মার্কেট। হাতে লেখা পাণ্ডুলিপি বা 'কলমি পুথি' থেকে বই পড়া বা সামাজিক পরিসরে পুথিপাঠের আসরে স্থান করে নিয়েছে বটতলার ছাপার অক্ষরের কিতাব *কাসাসুল আম্বিয়া*, *য়ুসুফ জোলেখা*, *লাইলা-মজনু*, *বাহার দানেশ*, *শাহনামা* ইত্যাদি (ভদ্র, ২০১১, পৃ. ২০৩-৫৯)।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত বাংলা পাণ্ডুলিপির বেশিরভাগই বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত। ইন্ডিক তথা দেশীয় ভাষার পাণ্ডুলিপির এই সংগ্রহটি সমগ্র দক্ষিণ এশিয়ার সামাজিক, রাজনৈতিক, সাহিত্য-শিল্প এবং চিন্তার ইতিহাসের প্রাথমিক উৎসের খনি। এই সংগ্রহ গড়ে তোলার মূল কারিগর ছিলেন মুন্সি আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ, পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ ও গবেষণা ছিল যাঁর ধ্যান-জ্ঞান-ধর্ম। বাংলা ভাষায় রচিত পাণ্ডুলিপিগুলি শাস্ত্র, কাব্য, ধর্ম, দর্শনসহ নানা প্রকরণে সুবিন্যস্ত। বাংলা বর্ণমালার পাশাপাশি আরবি-ফারসি হরফে বাংলা ভাষায় লেখা পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগ্রহে রয়েছে (চিত্র ১, ২, ৩, ৪ এবং ৫)। যেমন, *ফাতেমার সুরতনামা*, *শরীয়ত-নামা*, *ওফাতে রসূল*, *কোরানের কায়দা*, *নুরনামা*, *সকিনা বিলাপ*, *ফক্করনামা*, *ইবলিশনামা* ইত্যাদি। বাংলা একাডেমির সংগ্রহশালায় সেমেটিক[১] বর্ণমালায় অনুলিপিকৃত পাণ্ডুলিপির সংখ্যা ৪০টি (বিশ্বাস, ১৯৯৫, পৃ. ৮৬, ১৮৮-২১৪)।

সাহিত্যবিশারদ তদীয় সংগৃহীত আরবি-ফারসি লিপিতে বাংলা পুথি লেখার কারণ হিসেবে অধিকাংশ মুসলিমদের বাংলা না জানা এবং আরবি ভাষা জ্ঞানকেই চিহ্নিত করেন। তিনি লিখেছেন:

> পুস্তকের বহুল প্রচার ও মুসলমান পাঠকদিগের সুবিধার নিমিত্তে পূর্বে অনেক পুঁথি আরবীয় বর্ণমালায় লিখিত হইয়াছিল।... বাঙ্গালা বর্ণমালার অনুরূপ আরব্য ভাষায় সকল বর্ণ নাই, কিন্তু পারস্য ভাষায় কতকটা আছে। তদস্থলে পারস্য বর্ণমালার সাহায্যে বাঙ্গালা শব্দগুলি লিখিত হইয়াছে (সাহিত্যবিশারদ, ১৩২১ ব., পৃ. ৬৫-৬৬)।

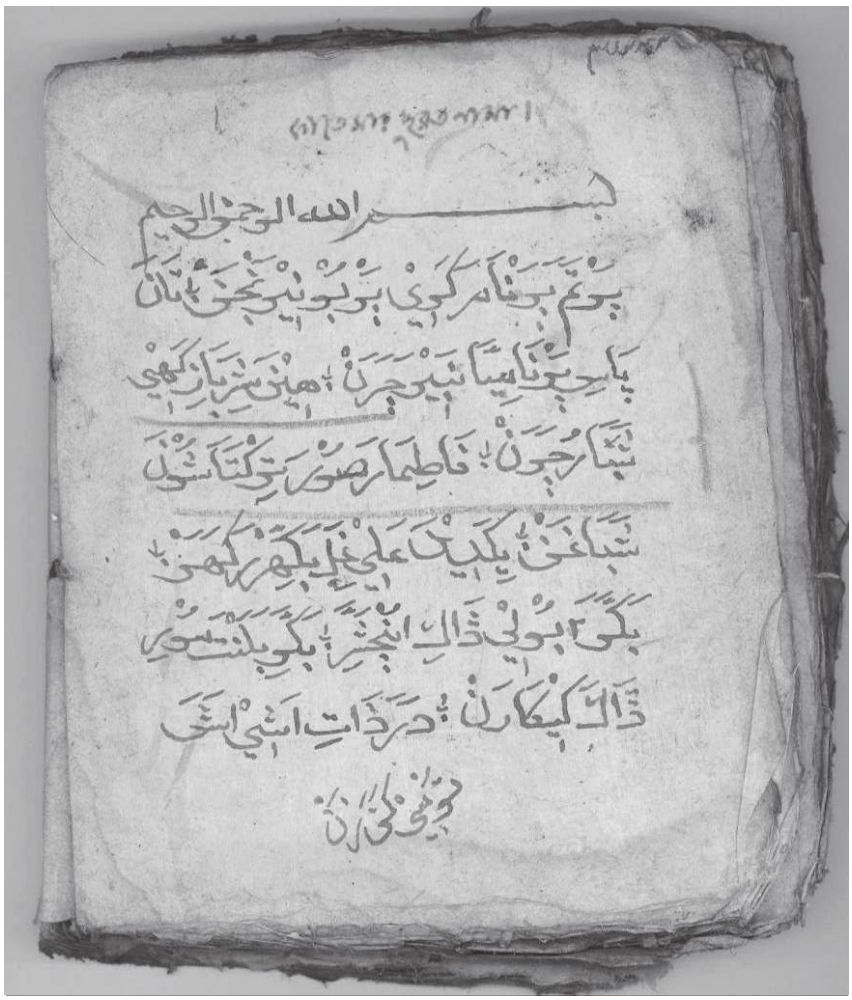

চিত্র ১: *ফাতেমার সুরতনামা*, আরবি হরফে বাংলা পুথি
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)

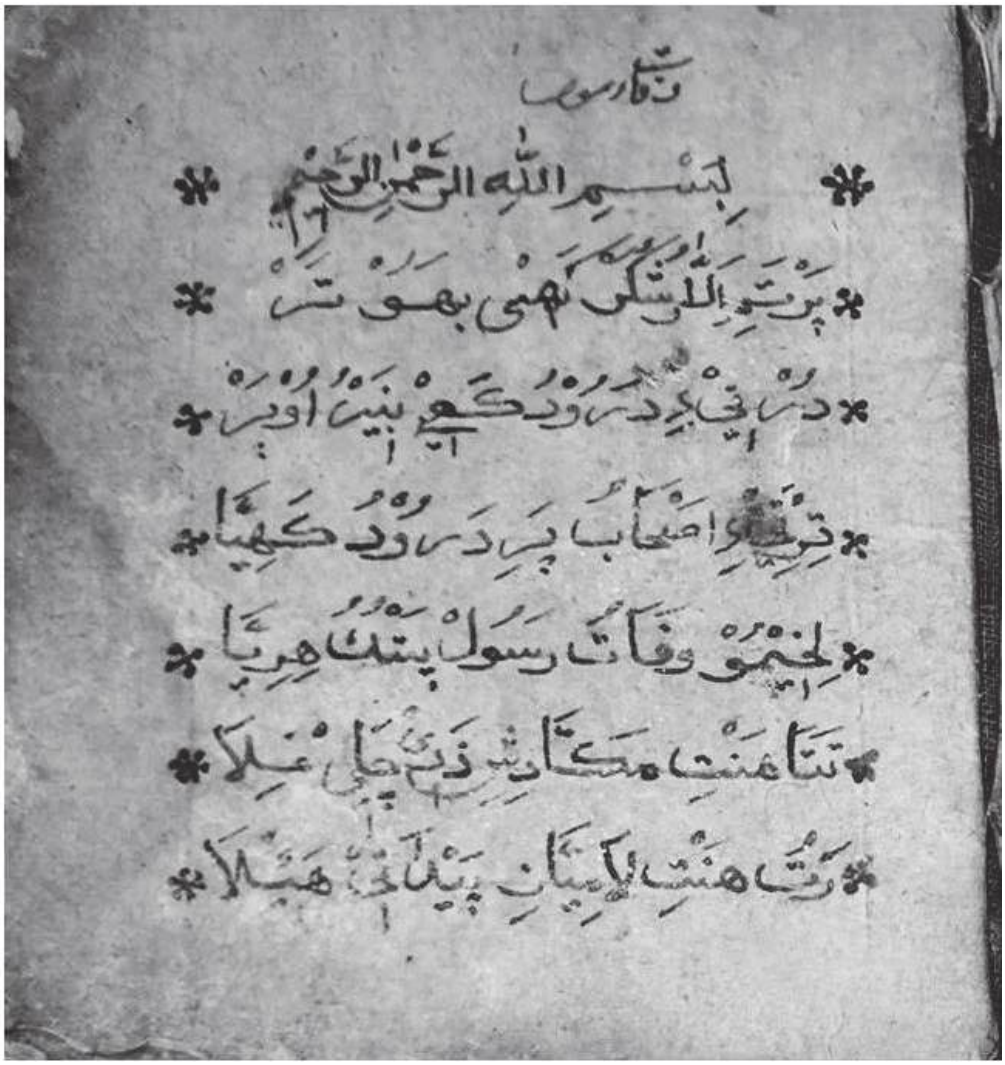

চিত্র ২: সৈয়দ সুলতান রচিত *ওফাতে রসূল*, আরবি হরফে বাংলা পুথি
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)

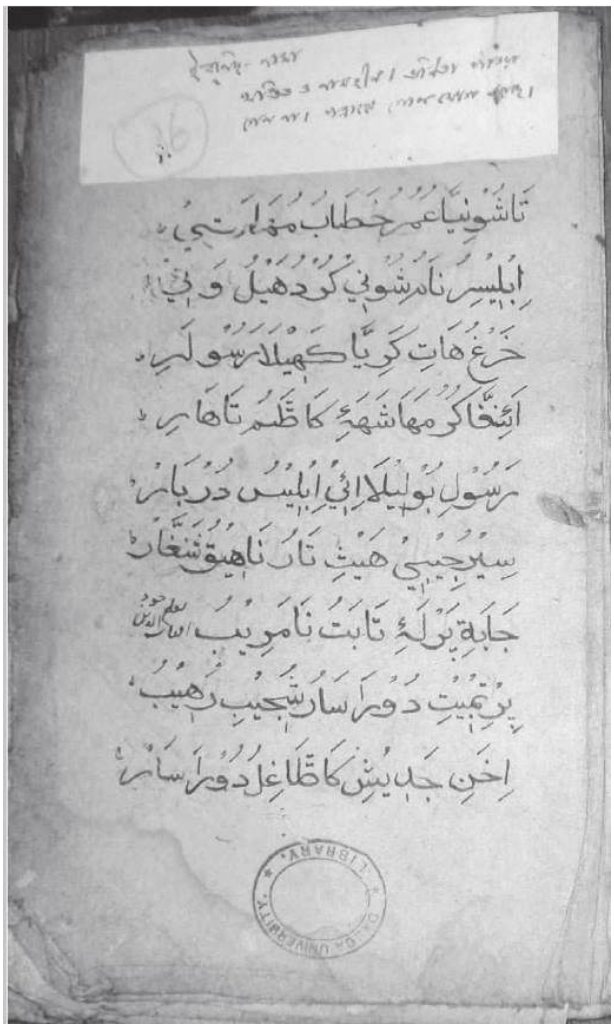

চিত্র ৩: সৈয়দ সুলতান রচিত *ইবলিশনামা*, আরবি হরফে বাংলা পুথি
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)

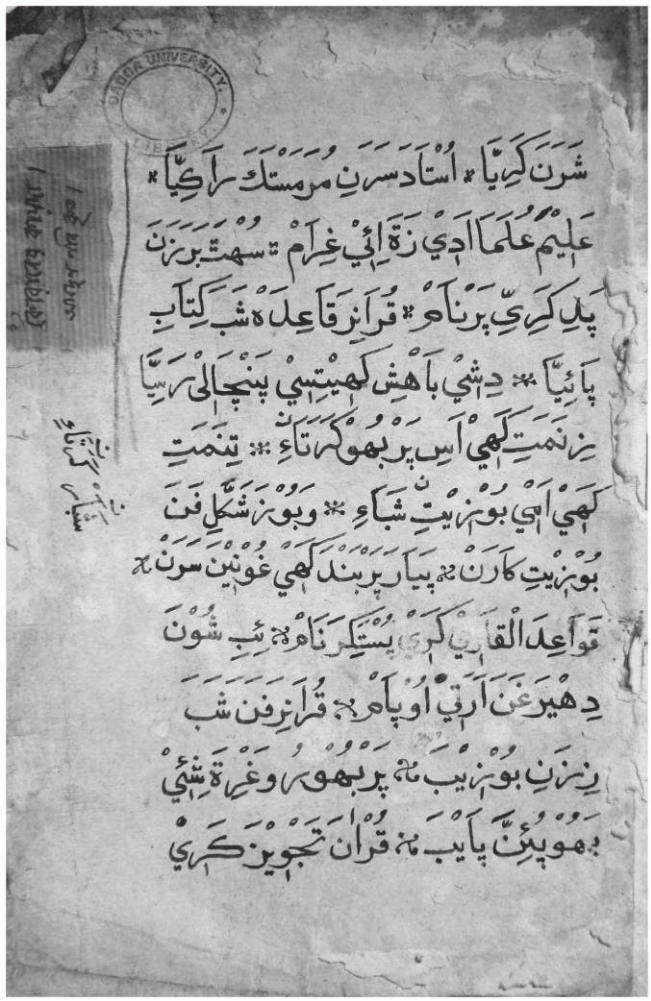

চিত্র ৪: আবদুন নবী রচিত *কোরানের কায়দা*, আরবি হরফে বাংলা পুথি
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)

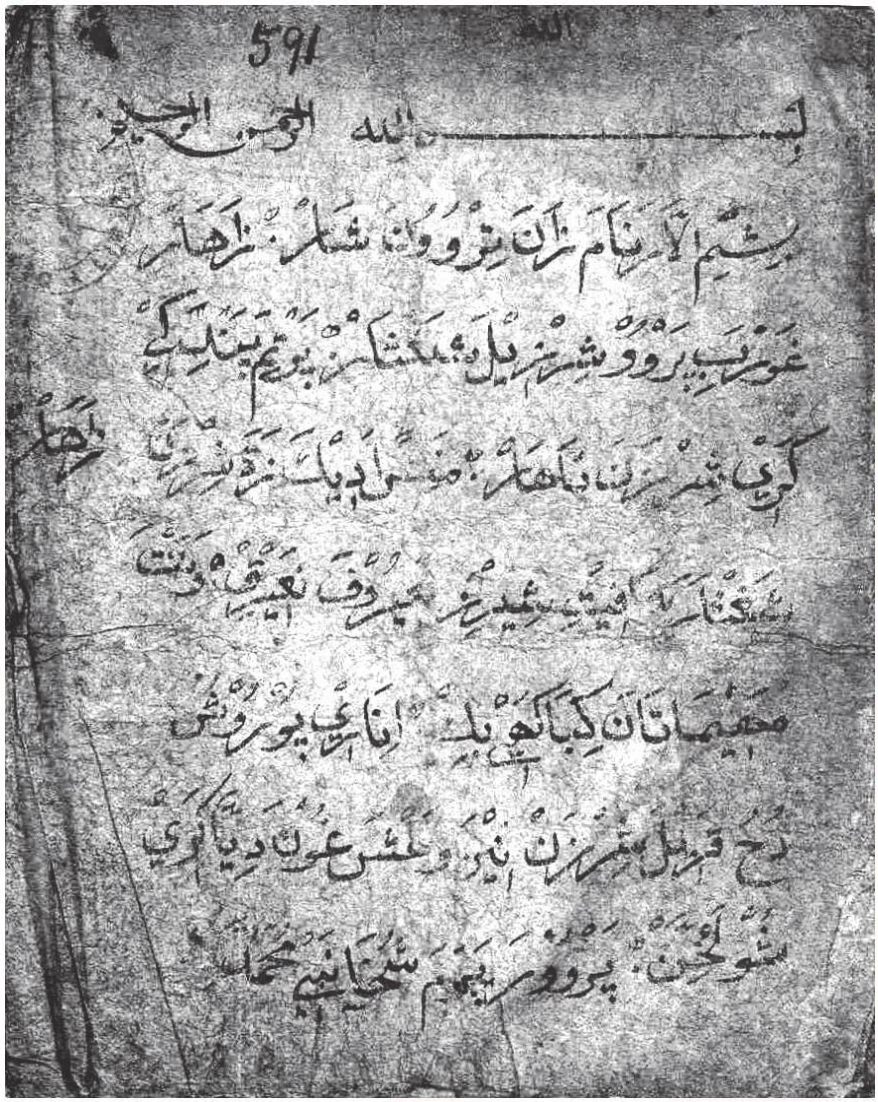

চিত্র ৫: অজ্ঞাত লেখকের *নিকাহ মঙ্গল*, আরবি হরফে বাংলা পুথি
(ছবি: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার)

বাংলা পুথিসাহিত্য এবং লিপিবিষয়ক গবেষক এস এম লুৎফর রহমান সাহিত্যবিশারদের পুথি-সংগ্রহে থাকা আরবি-ফারসি হরফে অনুলিপিকৃত তেত্রিশটি বাংলা পুথির একটি ফর্দ তৈরি করেছিলেন (রহমান,

২০০৫, পৃ. ২৯১-৯৫)। সেমেটিক লিপিজাত আরবি-ফারসি হরফ ব্যবহার করে বাংলা পাণ্ডুলিপি লেখা ও কপি করার প্রয়োজন কেন হয়েছিল? এ ধরনের পুথির বিষয়বস্তু কী ছিল? পাণ্ডুলিপিগুলির পাঠক এবং শ্রোতা কারা? কোন জনপরিসরে এ ধরনের পাণ্ডুলিপির জনপ্রিয়তা ছিল? পুথি পাঠকদের উপস্থাপনের (performance) কায়দা কেমন ছিল?

বাংলা ভাষার বিকাশ ও বাংলা লিপির বিবর্তনের পথে আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা লেখার এ পদ্ধতি কবে থেকে শুরু হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। সেমেটিক লিপিতে লিখিত বাংলা পুথি—পাঠোদ্ধারকৃত এবং প্রকাশিত—আকরসূত্র হিসেবে ব্যবহার করে উত্থাপিত সাওয়ালগুলির জাওয়াব খোঁজার জটিল ভুলভুলাইয়াতে যাওয়ার পাশাপাশি হালফিলের গবেষকদের মতামতকে পুনর্বিবেচনার প্রচেষ্টা বর্তমান প্রবন্ধে করা হয়েছে। প্রায় চার শতকের দীর্ঘ পাটাতনে বর্তমান প্রবন্ধে উত্থাপিত প্রস্তাবনাগুলি লিওপোল্ড ভন র‍্যাঙ্কের অবজেকটিভিটির নিক্তিতে যথাযথ সাক্ষ্য-প্রমাণ সমর্থিত না হবার ঝুঁকি রয়েছে। এ ঝুঁকি মেনে নিয়েই পরবর্তী আলোচনা উপস্থাপন করা হলো।

বর্তমান প্রবন্ধটি ছয়টি অংশে বিভক্ত: ১) পূর্ববর্তী প্রস্তাবনা, ২) নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *শরীয়ত-নামা*, ৩) কবি শেরবাজ রচিত *ফাতেমার সুরতনামা*, ৪) মোহাম্মদ শফি রচিত *নুরনামা*, ৫) সেমেটিক লিপিতে বাংলা পুথির রসম: বহুমাত্রিকতার স্বরূপ অনুসন্ধান এবং ৬) পুথি পাঠ ও পুথি প্রকাশ: শিকড়ের পানে বর্তমানের অনুসন্ধান।

১) পূর্ববর্তী প্রস্তাবনা

বাংলা ভাষায় পাণ্ডুলিপি অনুলিপির কোন পর্যায়ে এবং কী প্রেক্ষাপটে আরবি-ফারসি হরফে বাংলা লিখনরীতি শুরু হয়েছিল, তা নিশ্চিতভাবে বলা যায় না। বাংলা ভাষার এবং লিপির বিবর্তনের ইতিহাস গবেষণায় বিষয়টি নানাভাবে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। কেন এ ধরনের পদ্ধতির প্রয়োজন হয়েছিল? কোন স্থানিক পরিমণ্ডলে এবং কোন জনগোষ্ঠীর জন্য এই রীতিতে পুথি অনুলিপি করা হলো? এ প্রশ্নগুলোর উত্তর পণ্ডিতগণ নানাভাবে দিয়েছেন।

সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের *The Origin and Development of the Bengali Language* গ্রন্থটি বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের ইতিহাসের একটি ধ্রুপদি গবেষণাকর্ম। বাংলা ভাষার বিবর্তনের ইতিহাস নথিভুক্তিতে সুনীতিকুমার অনেক ক্ষেত্রেই আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের কাছে ঋণী। তিনি সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহে থাকা আরবি-ফারসি লিপিতে বাংলা লেখা পুথিগুলিকে পূর্ব-বাংলায় প্রচলিত ভাষার ধ্বনিবিদ্যার জন্য মূল্যবান সূত্র হিসেবে চিহ্নিত করেছিলেন। সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহের পাশাপাশি তিনি বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদের পাণ্ডুলিপি সংগ্রহের মধ্যেও এ ধরনের (পুথি নং ৮৭, ৯৯, ১২৪ এবং ২৭৮) বাংলা পুথি দেখেছিলেন। সুনীতিকুমার প্রস্তাব করেছিলেন, ত্রয়োদশ শতকে—হয়তো এর আগেই— চট্টগ্রাম এলাকার মুসলিম জনগোষ্ঠীর মধ্যে আরবি হরফে বাংলা লেখার রীতি শুরু হয়েছিল। তবে বাংলার অন্যান্য এলাকায় মুসলিমরা বাংলা অক্ষরেই বাংলা পুথি লিখতেন এবং পুথি কপি করতেন। এই রীতির পাণ্ডুলিপিগুলির ভাষা উত্তম বাংলা। পুথিগুলি ইসলাম ধর্মের নানাবিধ ভাবনা সম্বলিত এবং এগুলিতে মুসলমানি শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে বেশি। পুথিগুলিতে আরবি-ফারসি শব্দগুলি আদিরূপেই উপস্থাপিত; তবে বাংলা ও সংস্কৃত শব্দ লেখার ক্ষেত্রে ধ্বনিরূপকেই অনুসরণ করা হয়েছে।

এই পুরোধা ভাষাবিদ তাঁর গ্রন্থে বাংলা অক্ষরগুলির আরবি প্রতিবর্ণীকরণের একটি তালিকাও প্রস্তুত করেছিলেন (Chatterji, 1926, p. 229-31)।

এস এম লুৎফর রহমান মনে করেন, মুসলিম আমলের শেষদিকে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচলন বাড়তে থাকে। কালক্রমে এই প্রবণতা সমগ্র বাংলায় ছড়িয়ে পড়ে। অনেকে মনে করেন, শুদ্ধতাবাদী ধর্মভীরু নিষ্ঠাবান মুসলমানরাই কেবল আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষায় গ্রন্থ রচনা করতেন (রহমান, ২০০৫, পৃ. ২০৯)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত পাণ্ডুলিপিগুলি বিশ্লেষণ করলে দেখা যায় যে, আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষায় ধর্মীয় কিতাবাদির সঙ্গে সঙ্গে গল্প-কল্প-কাব্যও লেখা হয়েছে। পুথি রচনা নয় বরং পুথি অনুলিপির ক্ষেত্রেও আমরা এই লিখনরীতির ব্যবহার দেখেছি। এর সমর্থন পাওয়া যায় লুৎফর রহমানের বক্তব্যে:

> বিদ্যমান পাণ্ডুলিপি পরীক্ষা ক'রলে দেখা যায় – আরবী হরফে বাঙালা ভাষায় কেবল ধর্মীয় কেতাবাদি লেখা হয়নি, সেই সঙ্গে গল্প-কল্পকাহিনীমূলক কাব্যও লেখা হ'য়েছে। এ রীতিতে কেবল ছোট ছোট পুথি নয়, 'আমীর হামজা'র মত বড় বড় কেতাবও লেখা হয়েছে। লেখা হয়েছে – আলাওলের 'পদ্মাবতী'র মত সংস্কৃত-প্রধান বাঙালায় লেখা কাব্যও (রহমান, ২০০৫, পৃ. ২০৯)।

মুহম্মদ এনামুল হক এ ধরনের পুথি-রীতিকে উনিশ শতকীয় প্রবণতা হিসেবে চিহ্নিত করেন। এই গবেষক কর্তৃক ব্যবহৃত কবি জান মুহম্মদের *নমাজ-মাহাত্ম্য* কাব্যের ছয়টি অনুলিপির মধ্যে দুটি ছিল আরবি হরফে লিখিত। ১৮৫২ সালে রচিত *নমাজ-মাহাত্ম্য* কাব্যের ভণিতা অংশে কবি লিখেছিলেন:

> আর এক কথা কহি শুন বন্ধুজন।
> আরবী অঙ্গুলে যদি বাংলা লিখন ॥

এই পাণ্ডুলিপির পাশাপাশি এই গবেষক কবি আলাওলের *পদ্মাবতী* কাব্যের একটি আরবি হরফে অনুলিপিকৃত পুথিকে ব্যবহৃত কাগজ ও লিপিবিদ্যার নিরিখে উনিশ শতকীয় হিসেবে শনাক্ত করেন। তাঁর মন্তব্য হলো: ''ঊনবিংশ শতাব্দীর একেবারে গোড়ার দিক হইতে স্বল্পসংখ্যক বাঙালি মুসলিম কবি ধর্ম-বিষয়ে বাংলা-ভাষায় পুস্তক লিখিতে যাইয়া বাংলা অক্ষরের পরিবর্তে আরবী হরফ প্রবর্তনের চেষ্টা করিতেছিলেন বলিয়া মনে হয়'' (হক, ২০০১, পৃ. ৩৫)। কিন্তু বর্তমান গবেষণায় সময়-নির্ধারক এ প্রস্তাব মেনে নেওয়া বিভ্রান্তিকর হবে; কেননা সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতকে অনুলিপিকৃত এই রীতির একাধিক পুথি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় রয়েছে। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যায়, লুৎফর রহমানের প্রস্তুতকৃত তালিকায় দুটি পুথির তারিখ যথাক্রমে ১৬৭৩ এবং ১৬৮১ খ্রিষ্টাব্দ (রহমান, ২০০৫, পৃ. ২০৯)। সম্ভবত এনামুল হক গুরু সাহিত্যবিশারদের মতকেই অনুসরণ করেছিলেন। সাহিত্যবিশারদ *সওগাত* পত্রিকায় 'বাঙ্গালার প্রাচীন মুসলমান কবি' শিরোনামে প্রকাশিত নিবন্ধে একই পত্রিকায় প্রকাশিত আবদুল কাদিরের প্রস্তাব পুনর্বিবেচনা করেন। আবদুল কাদিরের নিবন্ধের নামও ছিল 'বাঙ্গালার প্রাচীন মুসলমান কবি'। তিনি প্রস্তাব করেছিলেন, কবি আলাওল তাঁর *পদ্মাবতী* কাব্য ফারসি অক্ষরে লিখেছিলেন। এ প্রস্তাবকে নাকচ করে দিয়ে সাহিত্যবিশারদ লিখেছেন:

> আলাওল তাঁহার পুঁথিখানি 'ফারসি' হরফে লিখিয়াছিলেন, প্রকাশকের উক্তি আদৌ সত্য নহে। আলাওল কোন হরফে লিখিয়াছিলেন, সে কথা বলা এখন সম্ভব নহে। যদি

> বাঙ্গালা ভিন্ন অন্য কোন হরফে তিনি লিখিয়াও থাকেন, তাহা 'ফারসী' হরফে নহে 'আরবী' হরফেই বটে। আরবীতে (অক্ষরে) লেখা পদ্মাবতী এবং আরো বহু পুঁথি আমার নিকট সংরক্ষিত আছে। এক সময়ে চট্টগ্রামে আরবী হরফে বাঙ্গালা লেখার একটা রীতি প্রচলিত হইয়াছিল বলিয়া জানা যায় (করিম, ২০২৩, পৃ. ৪০)।

বাংলা লিপিবিশারদ এস এম লুৎফর রহমান সুনীতিকুমারের প্রস্তাব অনুসরণ করে প্রায় একই রকমের মত প্রকাশ করেন। তিনি মনে করেন, মুঘল আমলে এসে বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি, ফারসি, তুর্কি এবং উর্দু শব্দ ব্যবহৃত হতে থাকে। ফলে এ শব্দগুলি আরবি বর্ণমালায় লেখা সহজ ছিল। এই পদ্ধতি অত্যধিক জনপ্রিয় হয়েছিল। এমনকি সংস্কৃত-প্রধান সাহিত্যকর্মগুলির অনুলিপিতে *কাতেব*গণ (মুসলিম ও হিন্দু) সহজেই শত শত পৃষ্ঠা আরবি হরফে বাংলা ভাষায় অনুলিপি করতে অভ্যস্ত ছিলেন। বর্ণমালার প্রতি অনুরাগের পাশাপাশি লুৎফর রহমানের প্রস্তাবে আরেকটি সংযোজন ছিল মধ্যযুগের সামাজিক শ্রেণিবিন্যাস (রহমান, ২০০৫, পৃ. ২৪৭-৪৮)। এই গবেষকের মতে, বাংলা লিপি বর্জনের আরেকটি কারণ হলো এর তান্ত্রিক সংযোগ। এ বিষয়টি বৈদিক ব্রাহ্মণ এবং বাঙালি মুসলমানেরও জানা ছিল। ফলে উভয় সম্প্রদায় এ লিপিকে অবৈদিক ও অনৈসলামিক লিপি বলে পছন্দ করতে পারেননি (রহমান, ২০০৫, পৃ. ২৪৮)।

বর্তমান গবেষক এ প্রস্তাবের সাথে দ্বিমত করছেন। কেননা সমকালীন আকরসূত্রগুলিতে এ ধরনের পছন্দ-অপছন্দের কোনো উল্লেখ পাওয়া যায়নি। লুৎফর রহমানের রচনায় উত্তর ভারতে উর্দু লিপির বহুল প্রচলন অথবা বাংলা ভাষায় বিপুল পরিমাণ আরবি ও ফারসি শব্দের অনুপ্রবেশের কারণে এ ধরনের লিপিরীতি উদ্ভবের পক্ষে প্রামাণিক দলিল নেই। প্রসঙ্গত, *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: জীবন ও কর্ম* গ্রন্থে সেমেটিক লিপিতে বাংলা পুথি আরবি হরফ জ্ঞানসম্পন্নদের জন্য লেখা হয়েছিল বলে মত প্রকাশ করা হয়েছে। লেখকের ভাষায়:

> মুসলমানেরা বাংলা ভাষার চর্চা না করলেও আরবি ও ফারসি চর্চা তাদের মধ্যে ছিল। বাংলা চর্চা যে একেবারে ছিল না তাও বলা যায় না, কারণ উনবিংশ শতাব্দীতেই অনেক প্রাচীন কাব্য আরবি অক্ষরে লিখিত হতে দেখা যায়। মুসলমান শিক্ষিত লোকেরা আরবি অক্ষর চিনত, কারণ তারা আর কিছু না হোক পবিত্র কোরআন পাঠ করতে জানত। তাই আরবি অক্ষরে বাংলা লেখাতে বাংলা অক্ষরের সঙ্গে পরিচিত না হয়েও তারা বাংলা কাব্যের স্বাদ নিতে পারতো (করিম, ১৯৯৪, পৃ. ৫০-৫১)।

২০২০ সালে প্রকাশিত একটি গবেষণায় থিবো দুবের এই লিখনরীতির নানা দিক তুলে ধরেছেন। এ পদ্ধতিতে *আমীর হামজা*, *নবীবংশ*, *জঙ্গনামা*'র মতো পুথি ছাড়াও নানা ক্ষুদ্র কাহিনি বা কাঠামোর পুথি অনুলিপি করা হয়েছে। তিনি এটিকে 'বিস্মৃত অধ্যায়' হিসেবে আখ্যা দিলেও পাঠকের সামনে এর দেশজ রূপ উপস্থাপন করেছেন (দুবের, ২০২০)। তাঁর মতে, ''আঠার শতকের শেষ থেকে উনিশ শতকের মধ্যভাগ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আরবি হরফে লিখিত বেশিরভাগ হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপির অনুলিপি প্রস্তুত করা হয়েছিল ও সংরক্ষণ করা হয়েছিল চট্টগ্রাম এবং আরাকান অঞ্চলে যা আজকের মিয়ানমারের অংশ'' (দুবের, ২০২০, পৃ. ১৪৪৯)। তবে এ রীতির প্রারম্ভিক পর্ব ছিল সপ্তদশ শতক। এ রীতি প্রচলনের কারণ হিসেবে 'স্থানীয় সাহিত্যের ইসলামিকরণ' বলা হলেও থিবো এরকম দৃষ্টিভঙ্গির বাইরে গিয়ে বাংলা লিপির ইতিহাস ও পুথি লেখার পদ্ধতিগত বিবর্তনকে বিশ্লেষণ করছেন। রিচার্ড সলোমনের

Indian Epigraphy: A Guide to the Study of Inscriptions in Sanskrit, Prakrit and the other Indo-Aryan Language গ্রন্থের আলোকে থিবোর প্রস্তাব হলো: পঞ্চদশ শতক থেকেই বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্বের স্থানীয় ভাষাসহ সংস্কৃত পুথির অনুলিপিতে ব্যবহৃত বাংলা বর্ণমালার উদ্ভব হয়েছিল সিদ্ধমাতৃকা অক্ষর থেকে। বাংলা ভারতীয় অক্ষররীতির পাশাপাশি 'সংস্কৃত লেখ্যরীতির বৃহত্তর পরিসরের উত্তরাধিকারী' হয়ে উঠেছিল (দুবের, ২০২০)। তাহলে কেন স্থানীয় বর্ণমালার পরিবর্তে আরবি বর্ণমালায় বাংলা লেখা হলো? এ প্রশ্নের উত্তরে থিবো বলেন, এই কালপর্বে রাজনৈতিক ক্ষমতা ছিল মুসলিম শাসকদের হাতে। শাসকবর্গ নিজেদের আধিপত্য বিস্তারের উদ্দেশ্যে এটি করতে পারেন। এছাড়া আরবি অক্ষরের লিখনরীতি সংস্কৃতের তুলনায় অধিকতর বিজ্ঞানসম্মত। আরবি অক্ষরের ধ্বনি-বৈশিষ্ট্য প্রকাশের সক্ষমতা, বিরামচিহ্নের ব্যবহার, কিংবা ব্যাকরণের নিয়মাবলি ইত্যাদি কারণে আরবি অক্ষর লিপিকরদের পছন্দ। এ পাণ্ডুলিপিগুলির প্রায়োগিক দিক ছিল; এগুলি ছিল পারফরমেন্সের অংশ। পাঠক উচ্চস্বরে পড়তেন এবং শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মতো তা শুনতেন। স্বরধ্বনির উঠা-নামা, দীর্ঘ কিংবা হ্রাসকৃতরূপের মাপকাঠি আরবি লিখনরীতিতে বিদ্যমান, যা বাংলা বা ভারতীয় লিখনরীতিতে নেই। অনুলিপিকার কিংবা রচয়িতারা এ বিষয়টিকেও বিবেচনা করতেন। উল্লেখ্য, আরবি বর্ণমালায় কিছু ধ্বনির বহিঃপ্রকাশ নেই। বাংলায় 'প' কিংবা 'চ' বর্ণের ধ্বনিরূপ বা প্রতিবর্ণীকরণ আরবি বর্ণমালায় দেখা যায় না। এর উত্তরণ সম্ভব হয়েছে ফারসি বর্ণমালাকে যুগলবন্দি করে আরবি-ফারসি উভয় বর্ণমালা ব্যবহারের মাধ্যমে (দুবের, ২০২০, ১৪৫১-৫৬)। থিবোর ব্যাখ্যা অত্যন্ত যৌক্তিক হলেও প্রশ্ন রয়েই যায় যে, লিখনরীতির কত শতাংশ ফারসি? কোন কোন শব্দের ক্ষেত্রে ফারসি লিপির ব্যবহার বেশি? আরবি ব্যাকরণের প্রাধান্য মেনে নিলেও ফারসি বর্ণমালার পাশাপাশি কতটুকু ফারসি ব্যাকরণ নেওয়া হয়েছে? এসব প্রশ্নের উত্তর এখনো অজানা।

২) নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *শরীয়ত-নামা*

আরবি-ফারসি বর্ণমালায় বাংলা পাণ্ডুলিপি প্রথম সম্পাদনা করেছেন ইতিহাসবিদ আবদুল করিম। অর্ধশতাব্দী-কাল আগে (১৯৭৪ সাল) তিনি কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত *শরীয়ত-নামা* কাব্যগ্রন্থটির পাঠ ও সম্পাদনা প্রকাশ করেছিলেন প্রয়াত জাতীয় অধ্যাপক আনিসুজ্জামান সম্পাদিত সাহিত্যবিষয়ক গবেষণা পত্রিকা *পাণ্ডুলিপি*'র ৪র্থ সংখ্যায়। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত (২৫৪ নং) পাণ্ডুলিপিটিকে সম্পাদক আদর্শ পাণ্ডুলিপি হিসেবে গ্রহণ করেছিলেন। বর্তমান চট্টগ্রাম জেলার রাঙ্গুনিয়া থানার ৬ নং ইউনিয়নের পোমরা গ্রামনিবাসী জানে আলী পাণ্ডুলিপিটির লিপিকার। আরবি নাসখ রীতির হরফে লিখিত এ পাণ্ডুলিপিটি অনুলিপি করা হয়েছিল দেশি কাগজে এবং ব্যবহার করা হয়েছিল দেশি কালি। অত্যন্ত সুন্দর হাতের লেখায় অনুলিপি করা পাণ্ডুলিপিটির প্রত্যেকটি হরফে *এরাব* (জের, জবর, পেশ, সাকিন ও তাশদিদ) দেওয়া আছে এবং এর ফলে সম্পাদকের পাঠোদ্ধার করা সহজ হয়েছিল। পাণ্ডুলিপিটির প্রত্যেক ফোলিও দৈর্ঘ্যে এগারো ইঞ্চি এবং প্রস্থে সাত ইঞ্চি, এবং অনুলিপি বা লেখা হয়েছে দৈর্ঘ্যে সাড়ে সাত ইঞ্চি এবং প্রস্থে চার ইঞ্চি। ফোলিওর উভয় দিকেই (মুখ্য ও গৌণ) ১১ লাইনে অনুলিপি করা রয়েছে এবং শ্লোকের সংখ্যা ২০৭৬ (করিম, ১৯৭৪, পৃ. ১৫৫-৫৬)।

লিপিকর বাংলা অক্ষরে লেখা একটি পাণ্ডুলিপির কপি দেখে আরবি অক্ষরের পাণ্ডুলিপিটি নকল করেছিলেন। এই সিদ্ধান্তের সমর্থন কবির লেখনীতেই: 'কন হরফে কন লফজ ন বুঝি এ অর্থ/বাংলা

অক্ষর হেরি আরবীয় পুস্তক।' পাণ্ডুলিপির বিভিন্ন ফোলিওতে আধুনিক বাংলা অক্ষরে এলোমেলোভাবে নিম্নোক্ত নামগুলি লেখা রয়েছে:

> ক) ২০ নং ফোলিওর মুখ্য পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে 'শ্রী ছৈয়দ আমদ পীং সৈয়দ আলীমদ্দিন';
>
> খ) ৩৩ নং ফোলিওর গৌণ পৃষ্ঠায় লেখা রয়েছে 'শ্রী সৈয়দ আলীমদ্দিন পীং সৈয়দ আমিরওদ্দিন সাং পোঁরা পোড়াঙজনা পরকস সহরকিলী'।

রাঙ্গুনিয়া থানার কাউখালী গ্রামের কালা মিয়া পীং করম আলীর কাছ থেকে পাণ্ডুলিপিটি সংগ্রহ করেছিলেন পটিয়া থানার হুলাইন গ্রামস্থ আবদুচ্ছাত্তার মাস্টার। এই সংগ্রাহক চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়কে আরো অসংখ্য বাংলা ও ফারসি পাণ্ডুলিপি সংগ্রহ করে দিয়েছিলেন। পাণ্ডুলিপিটির ২৪ নং ফোলিওর উপরে উল্টো করে লেখা '১২১৪ মঘীর ১৭ই মাঘ'। এছাড়া পাণ্ডুলিপিটির সাথে *রাগমালার* একটি কপি বাঁধাই করা আছে। এ পাণ্ডুলিপিটিও অনুলিপি করা হয়েছিল ১২১৪ মঘী সালে। আবদুল করিমের মতে, উভয় পাণ্ডুলিপির অনুলিপিকার এবং কাল একই; আর তা হলো ১২১৪ মঘী বা ১৮৫২ সাল।

শরীয়ত-নামার বিষয়বস্তু শরিয়া (ইসলামি আইন) অনুসারে *আমর-নেহি* (করণীয়-নিষিদ্ধ)। প্রচলিত চারটি মাজহাবের মধ্যে ইমাম আবু হানিফা প্রদত্ত কিছু বিধি এ কাব্যে তুলে ধরা হয়েছে। পুথি রচনার রীতি অনুযায়ী ভণিতাংশের পরেই নামাজের বৈশিষ্ট্য, নামাজে অবশ্য-করণীয় ইত্যাদি বিষয় তুলে ধরা হয়েছে। এরপরই কবি সমাজে প্রচলিত কিছু কুসংস্কার নিয়ে আলোচনা করে সেগুলি বর্জন করতে বলেছেন। এর মধ্যে রয়েছে: গোবর দিয়ে ঘর লেপা, কুমারী মেয়ের 'নব পুষ্পকালে' ঢোল বাজানো, গান গাওয়া ইত্যাদি। এর পরের বর্ণনাটি নারীদের মাসিক অবস্থায় কী কী কাজ করা যাবে এবং কী কী যাবে না সে বিষয়ক। নারীর পর্দা আদায়ের বিষয়টিও কবি দীর্ঘ পঙ্‌ক্তিমালায় তুলে ধরেছেন। মানুষের মৃত্যু, মৃত ব্যক্তির আত্মীয়দের করণীয়, কাফন দেওয়া ও খাটিয়ায় তোলা, কবরে সমাহিত করার নিয়ম, ফাতেহা পড়া ইত্যাদি তুলে ধরা হয়। সমাজে প্রচলিত নানা ভ্রান্ত ধারণার খণ্ডনপূর্বক কবি রোজা রাখার নিয়ম, কাজা রোজার কায়দা, তারাবি পড়া, রোজা ভঙ্গের কারণ ইত্যাদি প্রসঙ্গ বর্ণনাপূর্বক মূর্খ মাওলানাদের ভণ্ডামি সম্পর্কে সতর্ক করে কাব্যটি শেষ করেন (করিম, ১৯৭৪, পৃ. ২০৭-৯১)।

৩) কবি শেরবাজ খান রচিত *ফাতেমার সুরতনামা*

কোভিড অতিমারির ঠিক আগের মাসে কবি শেরবাজ খানের *ফাতেমার সুরতনামা* কাব্যটি গ্রন্থাকারে (হাসান, ২০২০) প্রকাশিত হয়েছিল।[২] ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত পাঁচটি পুথির মধ্যে সাহিত্যবিশারদের সংগ্রহকৃত ৩০২ সংখ্যক পুথিটি আরবি-ফারসি হরফে লেখা। ৩০৪ নং পাণ্ডুলিপির অনুলিপিকাল লেখা আছে ১১৯৬ মঘী বা ১৮৩৪ খ্রিষ্টাব্দ (Karim & Sharif, 1960, p. 309-10)। আরবি-ফারসি হরফে লেখা পাণ্ডুলিপির ফোলিও সংখ্যা একুশটি যা প্রাপ্ত পাণ্ডুলিপিগুলির মধ্যে সর্বাধিক। দুর্ভাগ্যের বিষয়, এটি ছাড়া অন্য কোনো পাণ্ডুলিপিতে ভণিতাসহ কাব্যটির পূর্ণাঙ্গরূপ পাওয়া যায়নি।[৩]

কবি শেরবাজ হামদ (আল্লাহর প্রশংসা) ও নাতের (রসুলের প্রশংসা) মাধ্যমে তাঁর কাব্য শুরু করেন। এ কাব্য রচনার উদ্দেশ্য হলো রাসুল (স.)-এর কন্যা হযরত ফাতেমা (রা.)-এর রূপ ও সৌন্দর্যের বিবরণ উপস্থাপন। ফাতেমার স্বামী হজরত আলি (রা.) হজরত আবু বকর (রা.)-এর ঘরে গিয়ে তাঁকে

ডাক দিলেন। ঘরের ভিতর থেকে আবু বকর (রা.) জিজ্ঞাসা করলেন, কে তাঁকে ডাকছেন? আলি (রা.) উত্তর দিলেন, আমি আলি। আপনি বাইরে এসে আমার সাথে দেখা করুন। দরজায় এসে আবু বকর (রা.) আলি (রা.)-কে প্রশ্ন করেন, কে তুমি? উত্তরে আলি (রা.) বললেন, আমাকে চিনতে পারলেন না? আমি রসুলের 'দামাদ', হাসান-হোসেনের পিতা এবং ফাতেমা (রা.) অপরূপা আমার স্ত্রী। আবু বকর (রা.) মৃদু হেসে আলিকে বললেন 'তুমি কি ফাতেমার সুরত দেখেছ?' আলি (রা.) অবাক হয়ে আবু বকরকে উত্তর দেন, 'কী অবাক কথা!' ফাতেমা (রা.) 'আমার ঘরনি'! আমি যদি ফাতেমা (রা.)-এর সুরত না দেখি তাহলে আমার দুই পুত্র হলো কীভাবে? তার আর কী সুরত আছে যা আমি জানি না? তখন আবু বকর (রা.) উত্তর দিলো:

এসব সুরত তান দিআছে আল্লাহএ।
ছাপায়ে রাখিছে জান বিবি ফাতেমায়।
কভু তুমি না দেখিছ ফাতেমার রূপ।
রাখিছে সুরত মাএ বেহেস্তের কুলুব।
প্রচার করিবে মাএ হিসাবের দিন।
সুরাতের কথা মায়ের হাসানসেজান।

(ফোলিও নং ০২, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি নং ৩৬৩)

লজ্জায় হজরত আলি ঘরে ফিরে খাটের উপর শুয়ে পড়েন। বিবি ফাতেমা খাবার রান্না করে খাওয়ার জন্য ডাক দিলেন। কিন্তু আলি ফাতেমাকে বলেন তোমার সৌন্দর্য না দেখা পর্যন্ত আমি কোনো কিছু খাব না। উত্তরে ফাতেমা বলেন, আমি তো আপনার সাথেই সবসময় থাকি। আমার যা আছে সেটা তো আপনার দেখা। এ কী কাহিনি বলছেন আপনি। আমার আর কী সুরত আছে? কিন্তু আলি আবার ফাতেমাকে বলেন, তোমার যে নিজ রূপ আছে তা আমি দেখতে চাই। শুনে ফাতেমা চলে গেলেন। তিনি দুই ছেলে হাসান-হোসেনকে পাঠালেন হযরত আলিকে আনার জন্য। দুই ছেলে এসে বাবার কোলে বসে বাবাকে বলল— বাবা, তোমাকে চিন্তিত লাগছে কেন? সত্য করে আমাদের কাছে বল কী হয়েছে? আলি উত্তর দিলেন, বাছা খবর শোন। তোমাদের মায়ের আরও রূপ আছে। হাসান-হোসেন উত্তরে বলল, হ্যাঁ, পবিত্র কোরানে তা বলা আছে। এটা তিনি কিয়ামতের দিন প্রকাশ করবেন। এ কথা শুনে আলি নিশ্চুপ হয়ে গেলেন এবং ফাতেমার সুরত দেখার জন্য ব্যাকুল হলেন।

তিন দিন যাবৎ আলি খাবার বা পানি কিছুই খান না। ফাতেমার সুরত দেখার জন্য তাঁর হৃদয় অস্থির। ফাতেমা ব্যাকুল চিত্তে আলিকে গিয়ে বললেন, তিন দিন ধরে আপনি খাবার খাননি, তাই আপনার দুই ছেলেও কোনো কিছু খায়নি। আলি উত্তর দেন যে তিনি ফাতেমার সুরত দেখার পরেই খাবার খাবেন। ফাতেমা দুঃখ-ভারাক্রান্ত মনে বললেন, যে ব্যক্তি আপনাকে আমার সুরতের খবর দিয়েছে তার ওপর হোক 'জওহর-কওহর'। ফাতেমার মুখে এ কথা শোনার সাথে সাথে আল্লাহ ফেরেশতা জিব্রাইল (আ.)-কে বললেন, 'দেখ ফাতেমা হাসান-হোসেনকে বধিলেন।' নিরুপায় ফাতেমা আলিকে মৃগয়াতে যেতে বললেন। বললেন, অরণ্যের মধ্যেই তিনি সুরত দেখতে পারবেন। ফাতেমার কথায় আলি শিকারে চললেন। সেখানে আলি বিভিন্ন দৃশ্যকল্প বা অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হলেন। সেগুলি হলো:

প্রথম দৃশ্যকল্পঃ একজন নামাজরত ফকিরের পাশে দুইজন বালককে নিয়ে এক কঙ্কালিনী দাঁড়িয়ে আছে।

দ্বিতীয় দৃশ্যকল্পঃ আলি প্রখর সূর্যতাপে জঙ্গলের ভিতর চলছেন। একটি মাঠের মধ্যে গাছের নিচে একজন ফকির সিজদারত। ফকিরের দুই চোখ বেয়ে অশ্রু বের হয়ে আসছে। এখানেও ফকিরের পাশে কঙ্কালিনী দাঁড়িয়ে বাবা-বাবা বলে ডাকছে। ফকির উম্মত উম্মত বলে ক্রন্দনরত এবং তাঁর অশ্রুতে জমিন ভিজে যাচ্ছে।

তৃতীয় দৃশ্যকল্পঃ আলি সামনে অগ্রসর হতে থাকে। তৃতীয় দৃশ্যকল্পে আলি দেখেন জনৈক ফকির আগুনের মাঝখানে বসে আল্লাহর জিকির করছেন। প্রচণ্ড তাপে ফকিরের মাথার মগজ এমনভাবে ফুটছে, যেভাবে আগুনের তাপে হাড়ির চাল সিদ্ধ হয়। ফকিরের মাথার খুলি ফেটে মগজ বের হয়, তা সত্ত্বেও তিনি উম্মত-উম্মত বলে ক্রন্দনরত।

চতুর্থ দৃশ্যকল্পঃ আলি চিন্তিত হয়ে সামনে গিয়ে দেখেন একজন কঙ্কালিনী রুটি বানাচ্ছে। আলি তাকে জিজ্ঞাসা করেন, তুমি কে? কার স্ত্রী তুমি? জঙ্গলে বসে কার জন্য রুটি বানাচ্ছ? কঙ্কালিনী উত্তর দেয়, আমি আমার নিরঞ্জনের জন্য রুটি তৈরি করছি।

পঞ্চম দৃশ্যকল্পঃ ইমাম আলি বনের মাঝে অগ্রসর হতে থাকেন। হঠাৎ তিনি গাছের উপর একটি ময়না পাখি দেখেন, যার মাথায় তাজ, গলায় হাঁসুলি, ললাটের মাঝে সবুজ টিকলি ও দুই কানে দুই মতি পরা। ময়নার শরীরে পবিত্র আল কোরানের অক্ষর লেখা। ময়নার মুখে আল্লাহর জিকির ও কালেমা। ময়নার 'রূপে আলি মোহিত' হয়ে তাকে ধরতে যায়। ময়নার কাছে গিয়ে আলি হাত বাড়িয়ে তাকে ধরতে গেলে ময়না হেসে উড়ে যায়। এভাবে ময়না একডাল থেকে আরেক ডালে উড়তে থাকে। ময়না এভাবে তামাশা করতে থাকে। আলিকে রেখে ময়না উড়ে চলে। ময়না উড়ে যায় সমুদ্রের পানে। আলিও তার পিছনে সাঁতার দিলেন। ময়না মনে মনে ভাবে, একি করছি আমি। আমার জন্য কেন একজন দুঃখ পাবে? এজন্য আমি গুনাহগার হব। এই ভাবনায় ময়না তীরের দিকে ফিরতে শুরু করলে আলিও তার পিছন পিছন সাঁতার কেটে তটে ফিরে আসেন।

ষষ্ঠ দৃশ্যকল্পঃ তীরে ফিরে আলি সুন্দরী ময়নাকে ধরতে যায়। ময়না কিছু দূরে গিয়ে এক মসজিদের ভিতর প্রবেশ করে। ময়নার পিছনে পিছনে আলি মসজিদের নিকটে উপস্থিত হয়ে মসজিদের দরজায় খাটুলিতে শয়নরত একজন বৃদ্ধ নারীকে দেখেন। আলি বৃদ্ধাকে জিজ্ঞাসা করলেন, তুমি কি মসজিদের ভেতর একটি ময়নাকে যেতে দেখেছ? উত্তরে বৃদ্ধা বলেন হ্যাঁ, একটি ময়নাকে যেতে দেখেছি। আলি বৃদ্ধাকে দরজা থেকে সরতে বললেন। বৃদ্ধা বলল, আমার নড়ার শক্তি নেই। আমাকে উঠিয়ে একপাশে রেখে মসজিদের ভিতর গিয়ে তুমি ময়না দেখ। আলি অনেক টানাটানি করেও ব্যর্থ হন। বৃদ্ধা আলিকে বলে, জগতের সকলে তোমাকে 'মহাবলী' বলে, কিন্তু তোমার 'মরদামি' আমি বুঝতে পারলাম। বৃদ্ধা আলিকে খাটুলির নিচ দিয়ে মসজিদের ভিতর দেখার জন্য বলেন। আলি মসজিদের ভিতর আরশ-কুরসি দেখতে পেলেন। তিনি দেখলেন মসজিদের ভিতর দুইজন বালক কোরান পড়ছে এবং তাদের একজনের মুখ কালো এবং অন্যজনের মুখ লাল হয়ে আছে। আলির মনে এই দুই আদম সন্তানের পরিচয় সম্পর্কে প্রশ্ন জাগে। আলি বৃদ্ধার পরিচয় জানতে চাইলে বৃদ্ধা আলিকে পাল্টা প্রশ্ন করে কেন হুজ্জত করেছিলে তুমি? কেন তুমি ফাতেমার সুরত দেখতে চাইলে? এই জঙ্গলে যা দেখলে সবই

আল্লাহর ইচ্ছা। হজরত আলি তার দেখা বিষয়াদির অর্থ *ইলমে মারেফত* ভেবে আল্লাহর নাম জিকির করতে করতে ঘরে ফিরে গেলেন।

আলি ঘরে ফিরলে ফাতেমার সাথে দেখা হয়। ফাতেমা আলিকে জিজ্ঞাসা করলেন, তিনি বনে কী দেখেছেন? কী শুনেছেন? কীসের সাক্ষাৎ পেলেন? আলি উত্তর দিলো, আগে আমাকে সুরত দেখাও। ফাতেমা একে একে সকল বিষয় হযরত আলির কাছে তুলে ধরে বলেন,

প্রথমত, আপনি বনে যখন গিয়েছেন তখন আমিও আপনার সাথে গিয়েছিলাম। বনে দেখা ফকির ছিলেন রসুল (স.)। কঙ্কালিনী আমি এবং আমার সাথে ছিল হাসান-হোসেন।

দ্বিতীয়ত, রাসুল (স.) তাঁর উম্মতের পানাহ চেয়ে নামাজ পড়ে কাঁদছিলেন।

তৃতীয়ত, হাশরের ময়দানে মাথার উপর যখন সূর্য থাকবে তখন রাসুল (স.) তাঁর উম্মতের পানাহ চেয়ে কাঁদবেন।

চতুর্থত, জঙ্গলের কিনারে রুটি বানিয়েছে যে কঙ্কালিনী তিনি হলেন ফাতেমা স্বয়ং। ফাতেমাই আলির জন্য রুটি বানাচ্ছিলেন এবং আলিই ফাতেমার একমাত্র নিরঞ্জন।

পঞ্চমত, জঙ্গলে যে ময়না আলি দেখেছে সেটি হজরত ফাতেমা। তিনি ময়না হয়ে জঙ্গলে গিয়েছিলেন। ময়নার শিরের তাজ হলো প্রভু-করতার। 'গলার হাঁসুলি ছিল দ্বীন-রসূল'। ময়নার দুই কানের মতি হলো হাসান-হোসাইন। ময়নার কপালের টিকলি হযরত আলি।

ষষ্ঠত, ফাতেমাই বৃদ্ধার রূপ ধারণ করে মসজিদের দরজায় গিয়েছিলেন। আলি তখন ফাতেমাকে প্রশ্ন করলেন, তাহলে আমি তোমাকে তুলতে পারলাম না কেন? ফাতেমা বললেন, ত্রি-ভুবনের আঠারো হাজার মাখলুকাত আমার ওপর ভর করেছিল। তুমি কীভাবে তুলবে? মসজিদের ভিতর কোরান তেলাওয়াতরত দুই বালকের কথা শুনে ফাতেমা পুত্র পুত্র বলে কাঁদতে লাগলেন। হায় হায় করে বুক চাপড়ায়ে বলতে লাগলেন, কেন আমি এই মুখে জহর-কহর বলে গালি দিয়েছিলাম?

কিছুক্ষণ পর শান্ত হয়ে ফাতেমা আলিকে রুটি খেতে অনুরোধ করেন। আলি আবার বলেন, আগে সুরত দেখাও। ফাতেমা উত্তর দিলেন, আর কেমন সুরত দেখবে? কঙ্কালিনী, ময়নাবতী এবং বৃদ্ধা রূপে আমি গিয়েছিলাম। এসবই আমার সুরত। আলি বলেন, এসব কথা আমি শুনব না তোমার সকল সুরত দেখেই আমি খাবার খাব। ফাতেমা আলির কথা শুনে অত্যন্ত দুঃখ পেলেন। ফাতেমা রাসুল (স.)-এর কাছে গিয়ে এ ঘটনা বললেন। রাসুল (স.) আলির কাছে এসে বললেন, আল্লাহ স্বয়ং ফাতেমাকে সুরত দিয়েছেন এবং তা ইলমে বাতেন, যা কেবল কিয়ামতের দিন প্রকাশিতব্য। যদি তুমি সেই সুরত দেখ তাহলে তার জ্যোতিতে তুমি জ্বলে যাবে; জ্বলে যাবে আরশ কুরসি, ত্রিভুবন, তোমার দুই 'ফরজন' হাসান-হোসেন।

আলি উত্তর দিলেন, যদি মৃত্যুবরণ করি তাও আমি ফাতেমার সুরত দেখব। হাসান-হোসেন দুই ভাইও পিতাকে বোঝাতে লাগল। মায়ের সুরতের জ্যোতি তারা সহ্য করতে পারবে না। সেই জ্যোতিতে তারা দুই ভাই পুড়ে যাবে। আল্লাহর কাছে মা কী উত্তর দিবে। তারা বারবার বাবাকে 'হুজ্জত' করতে নিষেধ করল (পুথি নং ৩৬৩: ফোলিও নং ২১, মুখ্য ও গৌণ পৃষ্ঠা)।[৪] হাসান-হোসেনের অনুরোধ সত্ত্বেও আলি

ফাতেমার সুরত দেখার জিদ বজায় রাখেন। ফাতেমা আলিকে সতর্ক করেন যে সুরতের জ্যোতিতে তার মৃত্যুবরণ করার সম্ভাবনা রয়েছে। 'অলি-আল্লাহর দোহাই' দিয়ে সুরত দেখানোর জন্য ফাতেমাকে অনুরোধ করে। ফাতেমা পেরেশান হয়ে রসুলের কাছে যায়। এ-সময় ফাতেমা বলেন, সুরত দেখানোর জন্য যদি 'মাজার তিন বন্ধ' খোলে তাহলে সাথে সাথে তিনি 'মুহচিত' হয়ে যাবেন।[৫] কবির ভাষায়:

তবে সে ফাতেমা বিবি হইআ পেরসানি
নবির গেচরে জাই কহে স বানি
জখনে মাজা বন্ধ খুলিতে লাগিমু
এক বন্ধ খুলি দুই বন্ধ খুলিমু
তিন বন্ধ খুলিতে যে মুহুচিত হইমু।
(পুথি নং ৩০৩, ফোলিও নং ১৩)

ফাতেমা বিসমিল্লাহ বলে এক বন্ধ খুলে ফেললেন। সাথে সাথে বিজলি চমকে উঠল। ফাতেমা আলিকে অনুরোধ করলেন, এবার আমায় ক্ষমা কর। আলি উত্তরে বললেন, আমি কিছুই শুনব না। আমি তোমার সুরত দেখব। দুই বন্ধ খোলার পর বিজলি চমকে উঠল। ফাতেমা আবার আলির কাছে নিবেদন করেন। আলি নাছোড়বান্দা। ফাতেমা ক্রোধে তিন বন্ধ খুলে ফেললেন। চারদিকে তখন আগুনের মতো বিজলি চমকালো। ফাতেমার সুরত দেখে আলি টলে পড়লেন। হাসান-হোসেন দুই ভাইকে ডাকতে লাগলেন। রাসুল (স.) মুহচিত হয়ে পড়লেন। অতঃপর রাসুল উঠে বসলেন। মা মা বলে তিনবার ডাক দিলেন। বাবার ডাক শুনে কন্যা ফাতেমার চেতনা ফিরে আসল। নিজের শরীরের দিকে তাকিয়ে লজ্জা পেলেন। সাথে সাথে জামা বেঁধে নিলেন। দেখলেন 'হাসান-হোসেন মূর্ছা' গেছেন। 'আলি পড়ে আছে। রসুল হতচকিত' হয়ে আছেন। ফাতেমা ভাবতে থাকলেন, কী করবেন তিনি? কার যত্ন নেবেন আগে? প্রথমে তিনি পিতার মুখ ধুয়ে দিলেন। তারপর স্বামী আলিকে শান্ত করলেন। সবশেষে দুই ছেলে হাসান-হোসেনকে ... (পুঁথি নং ৩০৩)।[৬] আলি সুরত দেখে সন্তুষ্ট হলেন এবং আল্লাহর শুকরিয়া করে নামাজ পড়লেন।

৪) মোহাম্মদ শফি রচিত *নুরনামা*

শিকাগো বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক থিবো দুবের *Meaningful Rituals Persian, Arabic, and Bengali in the Nurnama Tradition of Eastern Bengal* গ্রন্থটিতে তিনটি পাণ্ডুলিপি সম্পাদনা ও বিশ্লেষণের মাধ্যমে 'নুরে-মোহাম্মদি'কে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা সাহিত্য গবেষক-মহলে উপস্থাপন করেছেন। পাণ্ডুলিপি তিনটি হলো: **ক**) প্যারিসের বিবলিওথিক ন্যাশনালে সংরক্ষিত অজ্ঞাত লেখকের ফারসি ভাষায় রচিত *নুরনামা*, **খ**) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগারে সংরক্ষিত চট্টগ্রামের কবি আবদুল হাকিম রচিত *নুরনামা* (আনুমানিক ১৬৬০ সা. অব্দ) এবং **গ**) বাংলা একাডেমিতে সংরক্ষিত মোহাম্মদ শফি রচিত আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষায় লেখা *নুরনামা*। গ্রন্থের চতুর্থ অধ্যায়ে প্রথমে আরবি হরফকে রোমান হরফে প্রতিবর্ণীকরণ করে মোহাম্মদ শফির *নুরনামা* পাঠোদ্ধার এবং তার ইংরেজি অনুবাদ উপস্থাপন করা হয়েছে। মোহাম্মদ শফির *নুরনামা* হচ্ছে 'esoteric' বা গূঢ় সাহিত্য, যা গুরু বা আধ্যাত্মিক নেতার উপস্থিতিতে পাঠ করা হতো। থিবোর অনুমান, মোহাম্মদ শফি সৈয়দ সুলতানের শিষ্য বা আত্মীয়। কবি সৈয়দ সুলতান ছিলেন বাংলা ভাষায় এ সাহিত্যধারার অগ্রপথিক। যোগ বা

সাধন-সাহিত্যে স্থানীয় রীতির মাধ্যমে সুফিরা ধর্মবচন প্রচার করতেন। বর্তমান বাংলাদেশ ও ভারতের পশ্চিমবঙ্গে আরবি সাহিত্যের *দাকায়েকুল আখবার* এবং ফারসি *নুরনামা* অনুসরণে এই রীতির বিকাশ। এর কেন্দ্রীয় বিষয় হজরত মুহাম্মদ (স.) এবং বিশ্বজগতের সৃষ্টিনামা। *নুরনামায়* সৃষ্টিতত্ত্ব ও সৃষ্টির মৌলিক চারটি উপাদান পানি, আগুন, বায়ু ও মাটি (সৃষ্টির আদি উপাদান) নিয়ে আলোচনা করা হয়েছে। *নুরনামাকে* বলা হয়েছে সকল কিতাবের আদি উৎস। আবদুল হাকিমের মতে, *নুরনামা* পাঠকারীদের দেওয়া হবে শহিদের থেকেও অধিক মর্যাদা এবং মৃত্যুর পরে তাঁর জন্য জান্নাতের দরজা খুলে যাবে। *নুরনামার* পাঠক-মুমিনদের আল্লাহ খারাপ মানুষদের জবান এবং প্রতারণা থেকে রক্ষা করবেন। এছাড়া আল্লাহ তাঁদেরকে জাদুকরের জাদুটোনা ও ভূমিকম্পসহ সকল প্রকার আসমানি ও দুনিয়াবি বালা-মুসিবত থেকে রক্ষা করবেন। যারা *নুরনামা* পড়তে পারে না (নিরক্ষর) কিন্তু পাঠ শুনবে, তারাও একই রকম ফজিলত ভোগ করবেন। *নুরনামা* পাঠকারী ও সংরক্ষণকারী এবং সৃষ্টিকর্তার মধ্যে কোনো পর্দা বা মাধ্যম থাকবে না। রবিবার, বৃহস্পতিবার এবং শুক্রবার সন্ধ্যায় *নুরনামা* পাঠ করলে আল্লাহর কাছে যা চাওয়া হয় তাই পাওয়া যায়। এ ধরনের রচনার প্রথমে থাকত *হামদ* ও *নাত* এবং তারপর সৃষ্টিতত্ত্ব সম্পর্কে আলোচনা। মধ্যযুগে বাংলায় এ রীতিতে সাহিত্য রচিত হয়েছে ষোড়শ শতকের দ্বিতীয়ার্ধ থেকে অষ্টাদশ শতক পর্যন্ত– চট্টগ্রাম, কুমিল্লা এবং ময়মনসিংহ অঞ্চলে (d'Hubert, 2022, p. 9-10, 50-56, 46-124)।

৫) আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা লিখন-রীতি: বহুমাত্রিকতার স্বরূপ অনুসন্ধান

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত আরবি-ফারসি বর্ণমালায় অনুলিপিকৃত কয়েকটি বাংলা পুথির উপস্থাপনগত বৈশিষ্ট্য এবং এগুলির বহুমাত্রিকতা সংক্রান্ত কিছু প্রস্তাবনা নিচে তুলে ধরা হলো:

আবদুল করিম এবং আহমদ শরীফ রচিত *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim's Collection* গ্রন্থে নথিভুক্ত ১২৪-১২৫ নং (সা. বি. ৩ ও ৪) পাণ্ডুলিপির লেখক অজানা এবং শিরোনাম দেওয়া হয়েছিল *সকিনার বিলাপ* (Karim & Sharif, 1960, p. 132)। পাঠোদ্ধারকৃত পাণ্ডুলিপিতে লিপিকারের নাম উল্লেখ থাকলেও ভণিতা ও সমাপনী অংশে রচয়িতার নাম অনুপস্থিত। পাণ্ডুলিপিটির অনুলিপিকার সম্ভবত এই রীতিতে অনুলিপির কাজে সিদ্ধহস্ত ছিলেন। কেননা আরবি-ফারসি অক্ষরে লেখা পাণ্ডুলিপিতে অক্ষর কাটা বা অক্ষর পরিত্যক্তের কোনো চিহ্নও নেই। পাণ্ডুলিপির শেষে পাওয়া তথ্য অনুযায়ী 'ওয়াজউদ্দিন পীছরে আফতাবউদ্দিন' এটির অনুলিপি করেছিলেন। লিপিকরের 'সাকিন নোয়াপাড়া'। সাহিত্যবিশারদের সংগৃহীত অধিকাংশ পাণ্ডুলিপি বর্তমান বাংলাদেশের কুমিল্লা, নোয়াখালী, ফেনী, চট্টগ্রাম জেলা এবং ভারতের ত্রিপুরা থেকে প্রাপ্ত। এই তথ্য বিবেচনায় আলোচ্য পাণ্ডুলিপিটির লিপিকরের সাকিন এখনকার চট্টগ্রাম জেলার মিরসরাইয়ের নোয়াপাড়া হওয়ারই সম্ভাবনা প্রবল। দশ ফোলিওর এ পাণ্ডুলিপির প্রতিটির উভয় দিকেই আরবি-ফারসি অক্ষরে বাংলা ভাষায় কারবালার শহিদ কাসেমের বিবি সকিনার হাহাকার তুলে ধরা হয়েছে। কারবালার প্রান্তরে কাশেমের সাথে সকিনার বিয়ে হয় এবং বর বিয়ের পরপরই শাহাদাত বরণ করেন।

কারবালার প্রান্তরে যুদ্ধের দামামা চলছে; শত্রু-নিনাদে প্রকম্পিত কারবালার ময়দান। ফোরাত নদী শত্রুর কব্জায়। তৃষ্ণার্তের আহাজারিতে কারবালার আকাশ বাতাস ভারী হয়ে আছে। হযরত আলি

(রা.)-এর পরিবারের অনেক সদস্য বীরবেশে লড়াই করে শহিদ হয়েছেন। পিতৃব্য হোসেন (রা.)-এর সম্মান রক্ষায় রণাঙ্গনে বীরবিক্রমে ঝাঁপিয়ে পড়তে নববিবংশের প্রদীপ কাসিম রণসাজে প্রস্তুত। এ শ্বাসরুদ্ধকর পরিস্থিতিতেও হজরত হোসেন স্বীয় অগ্রজ হাসানের সাথে কৃত প্রতিশ্রুতি রক্ষার তাগিদে কাসিম ও সকিনার বিবাহের বন্দোবস্ত করলেন। একদিকে রণভেরির ভীষণ শব্দ, আরেকদিকে প্রতিশ্রুতি রক্ষায় বিয়ের আয়োজন। নব্য বিবাহিত স্বামী-স্ত্রীর একান্তে মধুর মিলন কিংবা বাসরসজ্জায় নিরালায় কিছু সময়যাপনের সুযোগ কোথায়?

নববধূ সকিনার হৃদয়রাজ্যে পতি-বিচ্ছেদের বেদনার ঢেউ। সকিনা বিনয়াবনত চিত্তে প্রাণপতি কাসিমের কাছে মিনতি করলেন, যদি যেতেই হয় যুদ্ধে তবে সঙ্গে করে তাকেও যেন নিয়ে যায়। স্বামী উত্তরে বলেন, রণাঙ্গন প্রস্তুত, আমাকে বিদায় কর। যদি যুদ্ধে প্রাণ থাকে তবে ফিরে তোমার দেখা পাব; আর যদি রণাঙ্গনে জীবন চলে যায় তবে স্বর্গে হবে মধুর মিলন। নববধূ সকিনা অস্থির হয়ে ভাই আলি আকবরকে অনুনয় করে বলেন: 'আলী আকবর ভাই, সত্য করে বল, পরাণপতির কী উপায় হবে বল' (ফোলিও ৩, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি নং ১২৪)। আলি আকবর নীরব থাকেন। ভাইয়ের নির্লিপ্ততায় 'মা মা' চিৎকারে ক্রন্দনে ফেটে পড়েন সকিনা বিবি এবং বলতে থাকেন, এ যন্ত্রণা কী করে সইব আমি? এর চেয়ে বরং আগুনের মাঝে ঝাঁপ দেব। নববধূর বিলাপে শোকাবহ পরিবেশে আরো শোকের ছায়া নেমে আসে। ক্রন্দনরত সকিনার শিওরে আসেন কাসিম। স্বামী কাসিমকে কাছে পেয়ে সকিনা যেন জীবন ফিরে পেল। আকাশের চাঁদ এখন তার হাতে। প্রিয় স্বামীর কাছে বারবার মিনতি করে বলেন, 'অভাগিনীরে নিরাশ করো না গো প্রাণপতি। আমার মনকে শান্ত কর গো আমার অধিপতি' (ফোলিও ৪, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি নং ১২৪)।

স্ত্রীর মিনতিতে মহাবীর কাসিম কিছুটা হতাশ হয়ে পড়েন। যুদ্ধের দামামা বেজেই চলছে; সেখানে আজ বিলাপের সময় নেই। কাসিম সকিনাকে জড়িয়ে ধরে এবং হাতে চুমো দিয়ে বলে, আমি যুদ্ধে চললাম। সকিনার অশ্রুতে কাসিমের শরীর ভিজে যায়। কাসিম যুদ্ধে চললেন। সকিনার মন মানে না (ফোলিও ৫, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)। সকিনার শোকার্ত বিলাপ ইথারে ইথারে ভেসে চলে কারবালার প্রান্তরে। কারবালার বাতাসে মিশে যায় পতি-বিচ্ছেদের করুণ আকুতি। কাসিমের অশ্বধ্বনি ধীরে ধীরে মিলে যায় দৃষ্টির আড়ালে। সকিনার বিলাপ-ধ্বনি ক্রমশ বাড়তে থাকে। ধুলায় লুটিয়ে পড়ে তার দেহখানি। ভেঙে যায় সকিনার পায়ের নূপুর; অঙ্গসজ্জাহীন হয়ে ধুলায় লুটিয়ে এলোকেশে কন্যা পিতা-ভ্রাতার কাছে অনুযোগ তোলেন (ফোলিও ৭, গৌণ পৃষ্ঠা; ফোলিও ৮, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)।

সকিনার ক্রন্দন রোলে বনের পশুপাখিও শোকে কাতর হয়ে পড়ে। কারবালার আকাশে কালো মেঘের ঘনছায়া নিকষ কালো হয়ে ঘনীভূত হয়ে যায়। পিপাসার্ত নারী-শিশুর আর্তনাদ আর কান্নার রোল সাত আসমান ভেদ করে চলে যায় ঊর্ধ্বলোকে। আসমানেও যেন নেমে এসেছে নিকষ কালো বিষাদের ছায়া। রণাঙ্গন থেকে কাসিমের শাহাদাতের সংবাদ আসে। কাসিমের নিথর দেহ তার মায়ের কোলে আনা হয়। পুত্রের মৃতদেহ দেখে মায়ের হৃদয় চূর্ণবিচূর্ণ হয়ে পড়ে। হোসেনের শিবিরে কান্নার রোল পড়ে যায়। হযরত আলির (রা.) পরিবারের রমণীরা পুত্রশোকে বিলাপ শুরু করে। শোকাতুর জননী মৃত পুত্রের মাথা কোলে নেন। প্রাণপতির রক্তাক্ত শির দেখে সকিনা কেঁদে কেঁদে বললেন, 'হা হা মোর পরাণ পতি। কেনে হইল হেন গতি। কোন পাপে করিল নিদান।' সকিনা স্বামীর দেহে লুটিয়ে পড়ে

চেতনা হারালেন। শোকবিহ্বল সকিনার চেতনা ফিরে এলে বলেন, 'যদি নিতা সঙ্গে করি পক্কি রূপ ছায়া ধরি/আমি নারী করিতুম বাতাস' (ফোলিও ৯, গৌণ পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)।

প্রিয় স্বামীকে হারিয়ে সকিনার জীবন বিপন্ন। পৃথিবীর যাবতীয় সুখ তার জন্য বিষাদে পরিণত হয়েছে। শোকসাগরে ভাসিয়ে তার প্রাণনাথ চলে গেছে অজানা দেশে। তিনি যোগিনী বেশে বাকিটা জীবন কাটিয়ে দেওয়ার ইরাদা করেন। তিনি রোম-শ্যাম দেশে ঘুরে বেড়াবেন। 'পরাণপতি'র কথা মনে করে পাহাড়-পর্বত-জঙ্গলে সন্ন্যাসী রূপে তার বাকি জীবন কাটবে। কবিতার ভাষায়,

প্রতি দেশে করিমু বিচার ধরিয়া যোগিনী বেশ
উড়মি চাহি নানান দেশ রোম শাম করিমু বিচার।
সন্যাসির ধরি বেশ যাবত জীবন শেষে
পরাণ পতি করিমু স্মরণ।
নাতু দুই শোকে লইয়া পাহাড়ে চড়িমু গিয়া।
হাটে ঘাটে করিমু বিচার।
(ফোলিও ১০, মুখ্য পৃষ্ঠা, পুথি ১২৪)

কবি নববধূর পতি-বিয়োগের শোক আর বৈরাগ্য গ্রহণের হাহাকার জানিয়ে *সকিনা-বিলাপ* কাব্যটির ইতি টানেন। ইরাকের ফোরাতের তীরে কষ্ট পাওয়া কন্যার আত্মা শান্তির প্রত্যাশা করে প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের নানা দেশে। বৈরাগীর আত্মা হাহাকার করে কারবালার অন্যায়ের প্রতিকার চায় বাংলার 'হাটে-ঘাটে'। কবির শব্দজালে কারবালার প্রান্তরের ত্যাগ ও আত্মবলিদানের বেদনা স্ফুরিত হয় বাংলার স্থানিক পাটাতনে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত কবি সৈয়দ হামজা রচিত *আমির হামজার* একটি পুথি আরবি অক্ষরে অনুলিপিকৃত (সাহিত্যবিশারদ সংগ্রহ, পুথি নং ১০)। এ পাণ্ডুলিপির প্রথম দুই ফোলিওর পর থেকে পৃথক হস্তলিপি ব্যবহৃত হয়েছে। প্রথম দুটিতে *নাসখ* রীতি লক্ষ করা গেলেও পরের অংশগুলিতে *নাসতালিক* রীতি দেখা যায়। একই পাণ্ডুলিপিতে একাধিক রকমের লিপিরীতি বাংলা কিংবা সংস্কৃত পাণ্ডুলিপিতেও দেখা যায়। সম্ভবত প্রথম দুই ফোলিওর অনুলিপিকার আর কাজটি করেননি। এ কারণে নতুন কেউ পরবর্তী অংশগুলি লিখেছেন। কিন্তু কোন কারণে এটি হয়েছিল তা অনুসন্ধানের সুযোগ একেবারেই নেই। তবে এটি ইঙ্গিত করছে, বহুভাষা ও লিপিরীতিতে দক্ষ অনুলিপিকার শ্রেণির উপস্থিতি তখন সমাজে ছিল।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত ৩৬ নম্বর পুথিটি আলোচ্য রীতিতে কপিকৃত সৈয়দ সুলতানের *ইবলিশনামা*। এ পুথির শেষ তিন ফোলিওতে দেখা যায়, বাংলা অক্ষরে মূল আরবি লেখার পাশে অংকে ১, ২, ৩– এভাবে ১২ পর্যন্ত লেখা আছে। প্রতিটি অক্ষরের পার্শ্ববর্তী লাইনে বাংলায় 'পরথমে', 'দ্বিতীয়ে', 'তৃতীয়ে' এইভাবে 'দ্বাদশে' পর্যন্ত লেখা আছে। সম্ভবত একাকী পুথি পাঠ এবং জনপরিসরে পুথি উপস্থাপন বা পারফরমেন্সের সময় বিষয়গুলি বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচরে আনার জন্য পাশে অঙ্কে লিখে দেওয়া হয়েছিল। পুথির অনুলিপিকরের পাশাপাশি পাঠকও বাংলা ও আরবি উভয় লিপির সাথে পরিচিত– এ অনুমানের সমর্থন পুথিটির এ তিন ফোলিওতে মেলে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাণ্ডুলিপি শাখায় সংরক্ষিত সাহিত্যবিশারদ সংগৃহীত কবি সৈয়দ সুলতানের *ওফাতে রসূল* কাব্যের একটি পাণ্ডুলিপির (নম্বর ৪৮) প্রত্যেকটি লাইনের শুরু এবং শেষে ক্ষুদ্রাকার চার বা ছয় পাপড়ি সম্বলিত চিহ্ন দেওয়া হয়েছে। অঙ্কিত চিহ্নগুলি পবিত্র কোরান শরিফের আয়াত লেখার ক্ষেত্রে দেওয়া বিরতি বা সমাপ্তির সাথে সাদৃশ্যপূর্ণ। প্রতিটি আয়াতের শেষে যেমন সমাপ্তি চিহ্ন তেমনি এ পাণ্ডুলিপির প্রতিটি লাইনের শেষেও রয়েছে সমাপ্তি চিহ্ন। এটি পাণ্ডুলিপির উপস্থাপনগত সৌন্দর্যের পাশাপাশি সমাপ্তি প্রকাশের প্রতিষ্ঠিত রীতির প্রতিফলন। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে সংরক্ষিত *জ্ঞান-সাগর* পুথির একটি পাণ্ডুলিপির (সা. বি. ১৪৬) কয়েকটি ফোলিওতে ডান দিকের খালি জায়গায় আড়াআড়িভাবে বাংলা অক্ষরে মালিকের নাম লেখা: 'এই পুস্তকের মালিক শ্রীআবদুলকাদেরফজরআলীসাংহুসাইন থানাপটিয়াজিলাচট্টগ্রাম'। পুথির ভাষ্য এবং মালিকের নাম একই কালিতে লেখা। সাকিন উল্লেখ করতে গিয়ে 'থানা' ও 'জিলা' শব্দদ্বয় ইঙ্গিত করে যে পুথিটির মালিক উনিশ শতকের শেষ দিকের একজন ব্যক্তি।

উপর্যুক্ত দৃষ্টান্তগুলি বিচ্ছিন্ন এবং এক্ষেত্রে উপস্থাপিত সিদ্ধান্তগুলির ভিত্তি সুদৃঢ় করার জন্য প্রয়োজন এ জাতীয় পাণ্ডুলিপির একটি সর্বাত্মক জরিপের মাধ্যমে ডিজিটাল ডাটাবেজ প্রস্তুত করা। এ বিষয়ক প্রস্তাবের উপসংহার টানাও অত্যন্ত ঝুঁকিপূর্ণ কাজ। তবে এটি স্পষ্ট যে, দোভাষী পুথি কিংবা সংস্কৃত ও বাংলা ভাষায় রচিত পুথিবিষয়ক গবেষণার কেন্দ্রীয় স্রোতধারায় আরবি-ফারসি হরফে লেখা বাংলা পুথি সম্পর্কে গবেষণার উপস্থিতি অনেকটাই হঠাৎ বৃষ্টির মতো। মুসলিম-শাসনের শুরু হতেই এই রীতি প্রচলিত ছিল এটি মেনে নেওয়ার কোনো যুক্তিযুক্ত প্রমাণ অদ্যাবধি পাওয়া যায় না। এ রীতির কোনো পুথিকে ত্রয়োদশ-পঞ্চদশ শতক কালপর্বে রচিত বলে শনাক্ত করা যায়নি। মুঘল আমলে সুবা বাংলায় এই রীতি ছিল– এ অনুমান বিবেচনা করা যেতে পারে। ১৫৬৫ সালে রাজমহলের যুদ্ধে বিজয়ের মাধ্যমে বাংলার উত্তর-পশ্চিম এলাকায় মুঘল আধিপত্য প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু দক্ষিণ-পূর্বাংশসহ সমগ্র বাংলা মুঘলদের অধীনে আসে সপ্তদশ শতকের দ্বিতীয় দশকে। সেক্ষেত্রে থিবো প্রস্তাবিত কালপর্বের গ্রহণযোগ্যতা অধিক মনে হয়েছে। আরবি-ফারসি শব্দের আধিক্য এ পদ্ধতিতে পুথি কপি করার প্রক্রিয়াকে সহজ করেছিল। বহুভাষাদক্ষ গবেষক থিবো দুবেরের গবেষণার সূত্র ধরে আমরা দেখার চেষ্টা করেছি, আরবি-ফারসি লিখনরীতি অনুসরণ করে সৃষ্ট এ পুথিগুলির বিষয়বস্তুর বৈচিত্র্য, আঙ্গিক এবং পাঠক-শ্রোতা উভয়গোষ্ঠীর বহু-ভাষা দক্ষতা। এটি মানতেই হবে, বিষয়বৈচিত্র্যের কারণে এ রীতির পুথিগুলিকে শাস্ত্রকথার বা ধর্ম-পরিচয়ের তকমা লাগানো যায় না। হয়তো আরবি ভাষার ব্যাকরণের লিখিত কাঠামো এ রীতির পুথি রচনার অন্যতম কারণ। কিন্তু ফারসির বিষয়টিকেও আলাদাভাবে দেখার প্রয়োজন রয়েছে। মধ্যযুগের বাংলায় বিভিন্ন ধর্মের অনুসারী এবং সম্প্রদায়ের মধ্যে পারস্পরিক আদান-প্রদান ও সমন্বয়ের প্রবণতা লক্ষ করা যায়। হয়তো সমাজ, ধর্ম ও সংস্কৃতির এ সমন্বয়বাদী ও বহুত্ববাদী চরিত্রের বহিঃপ্রকাশ ঘটেছিল এভাবে পুথি অনুলিপির মাধ্যমে। পুথি-পাঠক বা পারফর্মারের বহুভাষিক দক্ষতার পাশাপাশি বাংলা পুথির বহুত্ববাদী চরিত্রকে অস্বীকার করার অবকাশ নেই। বাংলা পুথি-প্রস্তুতের ইতিহাসে এ ধরনের বহুত্ববাদী ভাবনার বিকাশকে থিবো সমসাময়িক স্থানিক (local) এবং বৈশ্বিক (global) পাটাতনে ব্যাখ্যা করেছেন। তাঁর মতে, আবদুল হাকিম এবং মোহাম্মদ শফি উভয়েই দক্ষিণ-পূর্ববঙ্গ বা চট্টগ্রাম এলাকার কবি। *নুরনামা*র বেশ কিছু অনুলিপি চট্টগ্রাম অঞ্চল থেকে পাওয়া গেছে। তাই বলা যায়, চট্টগ্রামসহ পূর্ব-বাংলার মুসলমানরা *নুরনামা* পাঠ করতে

পারত এবং শুনে বুঝতে ও অনুধাবন করতে পারত। *নুরনামা* বহুভাষিক (multilingual) এবং এ অঞ্চলের মানুষ বহুভাষিক শব্দের সাথে সতেরো শতক থেকেই পরিচিত। দক্ষিণ এশীয় ভাষার ইতিহাসে একটি প্রচলিত প্রস্তাব হলো, আরবি-ফারসি মূলত রাজদরবারের ভাষা এবং শহুরে পরিবেশে প্রচলিত ছিল। কিন্তু *নুরনামা* মূলত গ্রামীণ পরিবেশে গ্রামীণ রীতি অনুসারে অনুলিপিকৃত এবং মূলত গ্রামাঞ্চলেই পঠিত হতো। এ বিবেচনায় থিবোর সিদ্ধান্ত হলো, সতেরো শতক থেকে শহুরে অঞ্চলের পাশাপাশি পূর্ব ও দক্ষিণ বাংলার গ্রাম-গ্রামান্তরে আরবি-ফারসি ভাষা জানা শিক্ষিত জনগোষ্ঠী ছিল। এর পাশাপাশি দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়া যেমন, মালয়, জাভা প্রভৃতি সমুদ্র-উপকূলীয় এলাকাগুলিতে আরবির বিস্তারে 'oceanic domain' প্রভাবক হিসেবে কাজ করেছিল। যার ফলে এসব অঞ্চলে স্থানীয় ভাষার সাথে আরবি ভাষার সমন্বয়ের মাধ্যমে নতুন ধরনের রীতি তৈরি হয়েছিল। আরবি হরফে তামিল লেখার প্রচলনের সাথে আরবি হরফে বাংলা লেখার প্রচলনের ক্ষেত্রে সাদৃশ্য হলো সমুদ্র সম্পর্কজাল (oceanic connections)। সমুদ্রপথে বাণিজ্যিক যোগাযোগের কারণে আরবি শব্দ গ্রহণের প্রক্রিয়া শুরু হতে পারে (d'Hubert, 2022, p. 8-22)। আরবি হরফ থেকে বাংলায় রূপান্তরের সময় বটতলার পুথির ভূমিকাতে আরবি হরফে বাংলা ভাষাকে 'চট্টগ্রামের ভাষা' বলা হয়েছে। কারণ এসব পাঠের ভাষার সাথে চট্টগ্রামের কথিত ভাষার মিল রয়েছে। আবদুল করিম *শরীয়ত-নামা* সম্পাদনাকালে মন্তব্য করেছিলেন যে কাব্যটিতে 'প্রচুর আরবী, ফার্সী এবং চট্টগ্রামে প্রচলিত শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে' (করিম, ১৯৭৪, পৃ. ২০৫)। কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের বহুভাষিক দক্ষতা ও কাব্য রচনার ক্ষেত্রে মুনশিয়ানার সাথে সেই দক্ষতার প্রয়োগ জাহির হয় সম্পাদক মহোদয়ের নিম্নোক্ত বক্তব্যে:

> কবি নসরুল্লাহ খোন্দকারের ... কবিত্ব শক্তি সম্পর্কে সন্দেহের অবকাশ অল্প। তাঁর ছন্দ-চাতুর্য পাঠককে মুগ্ধ করে এবং আরবি-ফার্সি শব্দের বহুল ব্যবহার সত্ত্বেও ছন্দ-চাতুর্য বিশেষ ব্যাহত হয়নি; আরবি-ফার্সি শব্দ বাংলা শব্দের সঙ্গে একাকার হয়ে মিশে গেছে। কবি চট্টগ্রামের অধিবাসী ছিলেন এবং সেই কারণে অনেক চট্টগ্রামী শব্দ বা শিষ্ট শব্দের চট্টগ্রামী রূপ গ্রন্থের প্রায় প্রত্যেক পৃষ্ঠাতেই পাওয়া যায়। আরবী ভাষার প্রভাবে চট্টগ্রামী চলিত ভাষায় নেতিবাচক শব্দে 'না' আগে ব্যবহৃত হয়; শরীয়ত-নামা গ্রন্থে এর প্রমাণ অহরহ পাওয়া যায় (করিম, ১৯৭৪, পৃ. ১৯৫-৯৬)।

গবেষক থিবো দুবের এবং আবদুল করিমের মতের মধ্যে কিছুটা সাযুজ্য খুঁজে পাওয়া যায়। ফলে এ রীতির উত্থানে আরবি ভাষা, বৃহত্তর সামুদ্রিক সাংস্কৃতিক বলয় এবং স্থানীয় পটভূমির যৌগিক মিশ্রণ অনস্বীকার্য। ফলে নিরাপদে উপসংহার টানা যায় যে, মধ্যযুগে বাংলা পুথি লেখা ও অনুলিপি করার ক্ষেত্রে সেমেটিক লিপি (আরবি ও ফারসি) ব্যবহারের মাধ্যমে বাংলা ভাষা একটি বৃহৎ সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের অন্তর্ভুক্ত হয়েছিল। আরবি-ফারসি ভাষা ও লিপি বাংলা সাহিত্যের আঞ্চলিক রীতি তৈরিতে বা নবরূপে বিকাশে বিশেষ ভূমিকা রেখেছিল। এর মাধ্যমে সৃষ্টি হয়েছিল বহুভাষিক সাংস্কৃতিক বলয় এবং পুথিরীতিও এর ব্যতিক্রম ছিল না।

৬) পুথি পাঠ ও পুথি প্রকাশ: শিকড়ের টানে বর্তমানের অনুসন্ধান

উনিশ শতকের ষাটের দশকে ফাদার রেভারেন্ড লং বাংলা বইয়ের তালিকা প্রদান করেন। ১৮৫৯ সালে তার লেখা 'Returns Relating to Publications in the Bengali Language in 1857' নিবন্ধে

তিনি বাংলা ভাষায় প্রাপ্ত পুস্তকাদির পরিচয়, সেগুলির ভাষা বৈশিষ্ট্য, বিষয়াদি এবং বাঙালির বই পড়ার অভ্যাসকে চিত্রায়িত করেছিলেন নিম্নোক্ত ভাষায়:

> Though few Musalmans will attend English schools or allow themselves to be cast in the Saxon mould, yet there is a considerable amount of intelligence among them, of a love of reading on oriental subjects, then minds are not dead but dreaming, much might be done in preparing books for them got up tastefully. They speak Bengali but with a considerable intermixture of Persian or Urdu-terms, the books called Musalman Bengali are prepared on this plan, the idioms of terms are Persian, the language Bengali, it is in fact a compromise between Persian of Hindu, but as Bengali in the language of the court of the vernacular of the schools, this dialect will probably die away gradually. In Lord Cornowallis days Bengali Gentlemen wrote even on domestic affairs in Persian. These books are read chiefly by boatmen, who like Venice Gondoleers, are fond of song, by Musalman servants, shopkeepers. (Long, 1859, p. XXX-XXXI)

১৮৫৯ সালে প্রকাশিত পাদ্রী লঙের কথায় বাংলার মাঝি মাল্লার, কিংবা দোকানদার শ্রেণির পাঠাভাসে পুথির অর্ন্তভুক্তির প্রমাণ পাওয়া যায়। এ ধারণাটি থিবোর উপস্থাপিত প্রতর্ক, বাংলার শহুরে দুনিয়ার বাউন্ডারি ছাড়িয়ে পূর্ব-বাংলার গ্রামীণ সমাজেও পাঠ (পুথি পাঠ) তথা শিক্ষার বিস্তার ঘটেছিল এবং তা শক্তিশালী করছিল।

প্রবন্ধের শুরুতে কাজী মোতাহার হোসেনের বাল্যকালের যে স্মৃতি পাঠকের সামনে উপস্থাপন করা হয়েছে তা বিশ শতকের শুরুতে বাংলার গ্রামীণ সমাজে বিদ্যমান পুথি পাঠাভাসের সাক্ষ্য। পাদ্রী লঙ এবং কাজী মোতাহার হোসেনের বক্তব্যের সূত্র ধরে শিকড়ের পানে ছোটার একটি প্রয়াস এই লেখার পরবর্তী অংশে নেওয়া হয়েছে। পুথি পাঠ, জারি গান এবং বাংলা পাঁচালি বিষয়ক বৈচিত্র্যময় গবেষণা করেছেন টনি কে স্টুয়ার্ট (Stewart, 2019), ইন্সিতা হালদার (Halder, 2023), ডেভিড কাসুন (Cashin, 1995), সাইমন জাকারিয়া (জাকারিয়া ও মর্তুজা, ২০১২) প্রমুখ গবেষকগণ। তাদের আলোচনার রাহা অনুসরণ করে চট্টগ্রাম অঞ্চলের পুথি-পাঠের কয়েকটি সামাজিক স্মৃতি নিচে উপস্থাপন করা হলো।

আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের স্মৃতিতে উনিশ শতকের শেষ দশকে তার নিজ এলাকায় পুথি-পাঠের যে চিত্র পাওয়া যায় তাতে মনে হয় তখনও পুথি-পাঠের আসর গ্রাম বাংলার সামাজিক পরিসরের অবিচ্ছেদ্য অনুষঙ্গ ছিল। সাহিত্যবিশারদের নিম্নোক্ত বুলিতে বিষয়টি উঠে আসে:

> নিজ বাড়িতে ও পাড়া প্রতিবেশীর বাড়িতে তখন হামেশাই পুথি পড়ার মজলিশ বসিত। কিছু না বুঝিলেও সেই মজলিসে গিয়া আলাওলের পুথি পড়া শুনিতাম। শুনিয়া শুনিয়া আমার ভাবপ্রবণ কিশোর হৃদয়ে যে আনন্দ জন্মিত তাহার স্মৃতি এখনও মুছিয়া যায় নাই। এইভাবে বাঙ্গালা সাহিত্যের প্রতি আমার একটা অনুরাগ জন্মে। তাহাই ক্রমশঃ বাড়িতে বাড়িতে মনকে সাহিত্যের বিশেষতঃ প্রাচীন সাহিত্যের রসাস্বাদনে একান্ত লোলুপ করিয়া তোলে।... প্রাচীন পুথির সন্ধান ও আবিষ্কার আমার যেন ধ্যানের বস্তু হইয়া ওঠে। সারা জীবন আমি ধ্যাননিমগ্ন যোগীর ন্যায় সেই এক ধ্যানেই কাটাইয়াছি (করিম, ১৯৯৪, পৃ. ২১৯)।

উনিশ শতকের দ্বিতীয়ার্ধে বাংলার সামাজিক জীবনে পুথি-পাঠের প্রমাণ পাওয়া যায় উপর্যুক্ত বক্তব্যে। ইতিহাসবিদ আবদুল করিম বিগত শতকের ত্রিশের দশকের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে স্বীয় আত্মজীবনীতে নিজ গ্রামের সামাজিক কিছু রীতি তুলে ধরেছিলেন। এ রীতিগুলির মধ্যে বাংলা পুথি-পাঠের স্মৃতি খুব প্রবল। তিনি লিখেছেন:

> শীতকালে শীত পিঠা ধূমধাম করে খাওয়া হত; অবস্থাপন্ন লোকেরা বাটির সবাইকে অন্ততঃ একবার শীত পিঠা খাওয়াত। গ্রামে খেজুর গাছ ছিল, এবং প্রত্যেক পরিবারেই কিছু কিছু খেজুর গাছ থাকত; খেজুর রসের সংমিশ্রণে পিঠা খাওয়া উৎসবের মত ছিল। বিশেষ করে ... ভাপের পিঠা খাওয়ার প্রচলন খুব বেশি ছিল। গরম কালে রাতে পুঁথি পাঠের আসর বসত; পুঁথি পাঠের জন্য বিশেষ লোক ছিল; অল্প শিক্ষিত হলেও সুর করে পুঁথি পাঠে তারা পারদর্শী ছিল, তাদের সমাদরও বেড়ে যেত। পুঁথির মধ্যে জঙ্গনামা, আমীর হামজার পুঁথি, ভেলুয়া সুন্দরী ইত্যাদি বেশ জনপ্রিয় ছিল। মাঝে মাঝে পদ্মাবতী, সিকান্দারনামাও পাঠ করা হত। অশিক্ষিত লোকেরা মনগড়া ব্যাখ্যা দিয়ে এই পুঁথিগুলিকে এমন হৃদয়গ্রাহী করে তুলত যে, না শুনলে বিশ্বাস করা যায় না। বিয়ে শাদী, খতনা, মেয়েদের কান বা নাক ফোঁড়নের সময়ও পুঁথি পাঠের আয়োজন করা হত। হিন্দু প্রধান গ্রামে শীতকালে নাচগানের আসর বসত, ছেলেরাই নাচত এবং গান করত; আমাদের গ্রামের ছেলেরা লুকিয়ে সেখানে গিয়ে নাচগান উপভোগ করত (করিম, ২০১৪, পৃ. ১৯)।

করিম আরো লিখেছেন, জন্ম-মৃত্যু-বিয়ের আচার অনুষ্ঠানে ঢোল বাজনার ব্যবস্থা করা হতো। ঢোল বাজাবার সামর্থ্য না থাকলে অন্ততপক্ষে পুথি-পাঠ ও শহেলা গীতের (মেয়েলি গীত) ব্যবস্থা করতো। পুথি-পাঠে তেমন আপত্তি না থাকলেও শহেলা গীতে মৌলবি সাহেবের ঘোর আপত্তি ছিল। কেননা সাধারণত নারীরাই এ ধরনের গান করতো (করিম, ২০১৪, পৃ. ৩১)। আবদুল করিমের লেখায় বিশ শতকের ত্রিশের দশকেও পুথি-পাঠ বা পুথি বিষয়ক পাণ্ডিত্যের উচ্ছ্বসিত প্রশংসা পাওয়া যায়। তাঁর নিজের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান বৈলছড়ি জুনিয়র মাদ্রাসার ইংরেজি-বাংলা এবং অঙ্কের তুখোড় শিক্ষক ছিলেন আবদুল কুদ্দুছ চৌধুরী। আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়াশুনা করা এই পণ্ডিত এত সুন্দর পড়াতেন যে তাঁর বিষয়ে বাড়ি গিয়ে আর পড়তে হতো না। করিমসহ অন্য শিক্ষার্থীদের মনে হতো যেন সকল অঙ্ক তাঁর মুখস্থ। এছাড়া প্রাচীন বাংলা পুথিসাহিত্যেও তাঁর অগাধ পাণ্ডিত্য ছিল এবং আলাওলের *পদ্মাবতী*তে তিনি একজন বিশেষজ্ঞ ছিলেন (করিম, ২০১৪, পৃ. ৪৮)।

ডিজিটাল ক্যামেরা আর মোবাইল ফোনের যুগে যে-কোনো সামাজিক ইভেন্ট রেকর্ড করা এখন মানুষের হাতের মোয়া। উনিশ-বিশ শতকের পুথি-পাঠের সামাজিক পরিসরকে ভিডিও রেকর্ড করার কোনো সুযোগ ছিল না। কিন্তু জহির রায়হানের জাদুকরি কলমের ছোঁয়ায় *হাজার বছর ধরে* উপন্যাসে গ্রাম-বাংলার সামাজিক পরিসরে পুথি-পাঠের আসর হয়ে ওঠে জীবন্ত। উপন্যাস থেকে পুথি-পাঠের প্রাসঙ্গিক অংশটুকু নিচে উদ্ধৃত করা হলো:

> চারপাশে ঝি ঝি পোকার অবিশ্রান্ত ডাক। মাঝে মাঝে গাছের মাথায় দু একটি পাখি হঠাৎ পাখা ঝাঁপটিয়ে আবার নীরব হয়ে যাচ্ছে। আকাশে ভরা চাঁদ হাসছে খলখলিয়ে। বাড়ির কাছে এসে পৌঁছতেই সুরত আলীর সুর করে পুঁথি পড়ার শব্দটা কানে এলো মন্তর।
>
> কইন্যা দেইখা গাজী মিয়ার চমক ভাঙ্গিলো।

কন্যার রূপেতে গাজী বেহুঁশ হইল।

উঠোনে বেশ বড় রকমের জটলা বেঁধেছে একটা। মাটিতে চাটাই বিছিয়ে বসেছে সবাই। আর তার মাঝখানে পিদিমের আলোতে পুথি পড়ছে সুরত। পুরুষরা তার ঘনিষ্ঠ হয়ে বসলেও মেয়েরা বসেছে একটু দূরে। যাদের বয়স কম তারা বসেছে আরো দূরে। দাওয়ার ওপরে। বুড়ো মকবুল গুড়ুম গুড়ুম হুঁকো টানছে আর বারবার প্রশংসা করছে সুরত আলীর পুথি পড়ার। বড় সুন্দর পুথি পড়ে সুরত আলী। এ গাঁয়ের সেরা পুথি পড়ুয়া সে। আকাশে যখন জোছনার বান ডাকে। ভরা চাঁদ খলখলিয়ে হাসে। দক্ষিণের মৃদুমন্দ বাতাস অতি ধীরে তার চিরুনি বুলিয়ে যায় গাছের পাতায়। কাক ডাকে না। চড়ুই আর শালিক কোন সাড়া দেয় না। গ্রামের সবাই সারা দিনের কর্মব্যস্ততার কথা ভুলে গিয়ে হাত-পা ছড়িয়ে বিশ্রাম নেয়। নিঃশব্দ নিঝুম রাতে কুঁড়েঘরের ছায়াগুলো ধীরে ধীরে হেলে পড়ে উঠোনের মাঝখানে। তখন সুর করে পুথি পড়ে সুরত আলী। গাজী কালুর পুথি। ভেলুয়া সুন্দরীর পুথি।

শুন বন্ধুগণরে, শুন দিয়া মন।
ভেলুয়ার কথা কিছু শুন সর্বজন ॥
কি কহিব ভেলুয়ার রূপের বাখান।
দেখিতে সুন্দর অতিরে রসিকের পরাণ ॥
আকাশের চন্দ্র যেনরে ভেলুয়া সুন্দরী।
দূরে থাকি লাগে যেন ইন্দ্রকূলের পরী ॥

উৎকর্ণ হয়ে শোনে সবাই। সুরত আলী পড়ে। ঢুলে ঢুলে সুর করে পড়ে সে। পুরুষেরা গুড়ুম গুড়ুম তামাক টানে। মেয়েরা পান চিবোয়। মাঝে মাঝে কমলার পুঁথিটাও পড়ে শোনায় সুরত। কমলার কিচ্ছা বর্ণনা সবার কাছে। কিচ্ছা নয়, একেবারে সত্য ঘটনা। হিরণ্য নগরের মেয়ে ছিল কমলা। যেমন রূপ তেমনি গুণ। ভোজ উৎসব করে ঢাক-ঢোল পিটিয়ে একদিন বিয়ে হয়ে গেলো তার হিরণ্য নগরের রাজকুমারের সাথে ।

... ...

পুথি পড়া শেষ হয়। কমলা সুন্দরী আর ভেলুয়া সুন্দরীর জন্যে অনেক অনেক আফসোস করে মেয়ে বুড়োরা। আঁচল দিয়ে চোখের পানি মোছে আমেনা। টুনির চোখ জোড়াও পানিতে টলটল করে ওঠে। ফকিরের মা একটা দীর্ঘশ্বাস ছেড়ে বলে, সব খোদার ইচ্ছা, খোদা মাইরবার চাইলে কিনা করতে পারে। বুড়ো মকবুল কিছুক্ষণের জন্য হুঁকো টানতে ভুলে যায়। সে চুপ করে কি যেন ভাবে আর নীরব দৃষ্টি মেলে তাকিয়ে থাকে আকাশের পানে। (রায়হান, ১৯৮৪, পৃ. ১৮-১৯)।

বাংলা পুথিবিষয়ক এ *কিসসা* খতম করতে চাই ২০২৪ সালের জানুয়ারি মাসের একটি ফিল্ড-সার্ভের অভিজ্ঞতার মাধ্যমে। বর্তমান গবেষক অতীতের সূত্র ধরে পুথি ছাপানোর বর্তমান হালচাল বোঝার জন্য বাংলাবাজার-চকবাজারের বই-বাজারে পুথি-প্রকাশনা সংস্থা হামিদিয়া লাইব্রেরি এবং সুলেমানিয়া লাইব্রেরির খোঁজ করেন।[৭] গুগল ম্যাপের সাহায্যে সুলেমানিয়া লাইব্রেরির অবস্থান বাংলাবাজার জানা গেলেও হামিদিয়া লাইব্রেরির অবস্থান জানা যাচ্ছিল না (গুগল কখনো দেখাচ্ছিল হামিদিয়া লাইব্রেরি চকবাজারে। আবার কখনো দেখাচ্ছিল চকরোড, বাংলাবাজার)। চকবাজার শাহি মসজিদের পাশে হামিদিয়া লাইব্রেরির সাইনবোর্ডের সন্ধান মেলে; সাইনবোর্ডের মতো লাইব্রেরির অবস্থাও জীর্ণ।

লাইব্রেরির ভিতরে প্রবেশ করে মালিকের সাথে সংক্ষিপ্ত বাতচিতে উঠে আসে পুথি-প্রকাশের হালফিলের অবস্থা। মালিকের ভাষ্য হলো, ''আমাদের কাছে এখন পুথি নেই। ২০০৭-২০০৮ সাল পর্যন্ত পুথির চাহিদা ছিল। তবে স্মার্টফোন আসার ফলে মানুষের পুথির প্রতি আকর্ষণ কমে যায় এবং একপর্যায়ে পুথি বিক্রি বন্ধ হয়ে যায়। তাই আমরাও পুথি ছাপানো বন্ধ করে দেই। এছাড়া পুথি ছাপানোর ছাঁচগুলোও আমরা পুড়িয়ে ফেলেছি প্রয়োজন না থাকায়।''

হামিদিয়া লাইব্রেরির মালিক প্রদত্ত তথ্যের সূত্র ধরে চকবাজার শাহী মসজিদের নিচতলায় অবস্থিত মার্কেটে খুঁজে পাওয়া যায় আল আমিন লাইব্রেরি। বেচাকেনায় ব্যস্ত লাইব্রেরির মালিক জানান, তারাও আর পুথি ছাপান না এবং তাদের সংগ্রহেও কোনো পুথি নেই। আল আমিন এবং হামিদিয়া উভয় লাইব্রেরি এখন কোরআন শরিফ ও অন্যান্য ধর্মীয় কিতাব ছাপায় এবং বিক্রি করে। আল আমিন লাইব্রেরির মালিক বলেন, ''পুথি বিক্রি করত যেসব দোকান, ওই দোকানগুলো এখন তাদের ব্যবসা বন্ধ করে দিয়েছে। তবে বাংলাবাজারে গেলে হয়তো পুথির সন্ধান পেলেও পেতে পারেন।'' তিনি সোলেমানিয়া লাইব্রেরির কার্ড বর্তমান গবেষককে দিয়ে বলেন, ''এই দোকানে পুথি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে।''

পুরাতন ঢাকার বাংলাবাজারের বইয়ের মার্কেটে সোলেমানিয়া লাইব্রেরিতে (৩৬ বাংলা বাজার) বেশ কিছু ছাপানো পুথি পাওয়া যায়। মধ্যযুগে প্রচলিত এসব পুথি একুশ শতকেও বিরাজমান: *ছয়ফল মুল্লুক বদিউজ্জামাল*, *খায়রুল হাশর*, *আমির সওদাগর ও ভেলুয়া সুন্দরীর পুঁথি*, *গাজি কালু ও চম্পাবতী কন্যার পুথি*, *জঙ্গনামা*, *দেলদার কুমার ও শাহাজাদী দিল পিঞ্জির কিচ্ছা*, *দোয়ায়ে গাঞ্জল আরশ*, *বড় ছায়েত নামা*। সোলেমানিয়া বুক হাউসের বর্তমান কর্ণধার বলেন, ''কিছু বয়স্ক মানুষ এখনো শখের বসে পুথি পাঠ করেন। তাই তারা নিকটস্থ ডিলারদের শরণাপন্ন হন পুথি কেনার জন্য। এসব ডিলার আবার তাদের কাছ থেকে পুথি নিতে আসেন। তাই তারা কিছু কপি বিক্রির উদ্দেশ্যে এখনো রেখেছেন। তবে এসব পুথির চাহিদা আগের মতো না থাকায় আমরা নতুন করে ছাপানো বন্ধ করে দিয়েছি এবং পুথি ছাপানোর ছাঁচগুলোও পুড়িয়ে ফেলেছি।'' তাদের কাছে জারি বা নবি-রাসুল সংক্রান্ত পুথি আছে কি না জানতে চাইলে বলেন, ''এখন এসব পুথি নেই এবং এই মার্কেটে অন্য দোকানেও থাকার সম্ভাবনা নেই।''

আর্টিফিসিয়াল ইন্টেলিজেন্স আর ফেসবুকের যুগে সন্ধ্যা বা রাতে বৈদ্যুতিক বাতির কিংবা মোবাইল ফোনের ফ্ল্যাশ লাইট জালিয়ে পুথিপাঠের আসর খুঁজে বেড়ালে তা হয়তো 'অন্ধকার ঘরে কালো বেড়াল' খুঁজে বেড়ানোর মতোই হবে। বাংলা পুথি (বাংলা কিংবা সেমেটিক বর্ণমালা) অনুলিপি করার প্রয়োজন ফুরিয়ে গেছে। কাজী মোতাহার হোসেন কিংবা আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের পুথিপাঠের সামাজিক স্মৃতির দুনিয়া বর্তমানে বেদখল হয়েছে পাবজি আর ফায়ার ফক্সের মায়াজালে। গ্রাম-বাংলার কৈশোরের দুরন্তপনা আর *কাসাসুল আম্বিয়া* শোনার বদলে শর্টরিল আর ফেসবুক ভাইরাল যখন সামাজিক প্রবণতা, তখন হয়তো ভাষার সীমানা অতিক্রম করে বাংলা ভাষার বহুভাষিক চরিত্রের বহমানতা খোঁজা নিরর্থক। কিন্তু আজ থেকে দুই দশক আগেও নোকিয়া, সাজেম কিংবা মটোরোলা বাটন মোবাইল ফোন ব্যবহার করে বন্ধু বা প্রিয়জনকে জানানো বাংলা নববর্ষের শুভেচ্ছা এসএমএস 'shubha nabarasha' কি ইংরেজি লিপিতে বাংলা লিখনরীতির প্রমাণ ছিল? এ যেন ইতিহাসের পুনর্জীবন। একুশ শতকে বাংলা

লেখার নতুন উপায়; প্রযুক্তির আর ভাষার বোঝাপড়ার নতুন দিগন্ত। এ বিষয়ে নানা সাওয়াল ওঠা খুব স্বাভাবিক। কিন্তু এ তো বাংলা ভাষারই বহুত্ববাদী চরিত্র।

টীকা

১. ইংরেজি Semite নামবাচক শব্দ থেকে গুণবাচক 'সেমেটিক' শব্দটি বাংলায় সেমেটীয় প্রতিশব্দ হিসেবে ব্যবহৃত হয়। *Oxford English Dictionary*-তে এ শব্দটির অর্থ দেওয়া আছে, "a member of any of the peoples mentioned in Genesis 10:21–31 as descended from Shem, one of the sons of Noah, traditionally interpreted as including the Hebrews, Aramaeans, Assyrians, and Arabs. Subsequently also: a member of any of the peoples who speak or spoke a Semitic language." (Oxford, 2024) সেমেটিক রিলিজিওন, সেমেটিক কালচার, সেমেটিক ল্যাঙ্গুয়েজ ইত্যাদি ইংরেজি শব্দের বহুল বাংলা অনুবাদ করা হয়েছে সেমেটিক ধর্ম, সেমেটিক সংস্কৃতি এবং সেমেটিক ভাষা থেকে। সেমেটিক ধর্ম বলতে সচরাচর ইসলাম ও ইহুদি ধর্ম এবং সেমেটিক ভাষা বলতে আরবি ও হিব্রু ভাষাকেই নির্দিষ্ট করা হয়। বর্তমান মধ্যপ্রাচ্য কিংবা প্রাচীন ফারটাইল ক্রিসেন্টে (দজলা-ফোরাত) সৃষ্ট সভ্যতাগুলির উত্তরসূরি আক্কাদিয়ান, ফনেশিয়ান, আরব ও ইহুদিদের সংস্কৃতি, ভাষা কিংবা ধর্ম বিষয়ক আলোচনা আম্ব্রেলা টার্ম হিসেবে সেমেটিক শব্দটি প্রচলিত। আরবি ভাষা ও লিপি যে সেমেটিক ভাষাগোষ্ঠীর অন্তর্ভুক্ত, এ বিষয়ে দ্বিমত নেই (Gacek, 2009)। কিন্তু ফারসি ভাষার বিষয়টি কিছুটা ব্যাখ্যা করা প্রয়োজন। প্রায় তিন সহস্রাব্দ প্রাচীন ভাষা। প্রাক সাধারণ অব্দ ষষ্ঠ শতকে আকামেনীয় শাসনকালে (৫২২-৪৮৬ প্রাক সা. অব্দ) ফারসিকে ইরানে দাপ্তরিক ভাষা হিসেবে নেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীকালে নবম শতকে আরবি লিপি ব্যবহার করে ফারসি লেখা হতে থাকে। ফারসি ভাষার বিবর্তনের ইতিহাসে দশম-একাদশ শতক হলো 'ক্লাসিক্যাল' বা ধ্রুপদী ফারসির সময়। ভাষার বিবর্তনের বিভিন্ন পর্যায়ে ফারসি কিউনিফর্ম, আরামিক, আবেস্তীয়, সিরিল্লিক এবং ল্যাটিন লিপিতে লেখা হয়েছে। ক্ল্যাসিকাল পর্যায় থেকে আরবি লিপির ২৮টি বর্ণের সাথে আরও ৪টি যোগ করে ফারসি ভাষা লিখিত কাঠামো দেখা যায়। (Orsatti, 2019) বলাই বাহুল্য এই রীতি এখনও চলমান। শিরোনামে ব্যবহৃত সেমেটিক শব্দটিকে বাংলা পুথি লিখনে আরবি ও ফারসি হরফের ব্যবহার নির্দেশ করতেই সেমেটিক প্রত্যয়টিকে আম্ব্রেলা টার্মের মতো ব্যবহার করা হয়েছে।

২. পাঁচটি পাণ্ডুলিপির সাহায্যে এই পাঠ প্রকাশ করা হয় (হাসান, ২০২০)। পাণ্ডুলিপিগুলির এক্সসেশন নাম্বার হলো: ক) নং ৩০২, এমএস ১৩৩, খ) নং ৩০৩, এমএস ১২৩ গ) নং ৩০৪, এমএস ৫৩৪ (Karim and Ahmad Sharif, 1960: 309-10) ঘ) নং ৩৬৩, এমএস ১২৪ এবং ঙ) সা.-বি. ৭৮৪ (Parvin, 2013: 28) ।

৩. বর্তমান গবেষণায় তিনটি পাণ্ডুলিপির (পুথি নং ৩০৩, ৩০৪ এবং ৩৬৩) সাহায্যে কাব্যটির কাহিনি-সংক্ষেপ পুনর্গঠন করার চেষ্টা করা হয়েছে (Karim and Ahmad Sharif, 1960, p. 309-10, 367)।

৪. পুথি নং ৩৬৩ [সাহিত্য বিশারদ ক্যাটালগ], এখানেই পুথিটির পৃষ্ঠা শেষ। এর পরের কাহিনি ৩০৩ নং পুথি থেকে পুনর্গঠন করা।

৫. ৩০৩ নং পুথির শেষ ফোলিওতে মুহচিত শব্দটি একাধিক বার পাওয়া যায়। মধ্যযুগের কাব্যে শব্দটি মুর্চ্ছা যাওয়া বা জ্ঞান হারানো অর্থে ব্যবহৃত হয়েছে।

৬. পুথি নং ৩০৩ [সাহিত্য বিশারদ ক্যাটালগ] থেকে কাহিনির এ অংশটুকু পুনর্গঠন করা, এখানেই পুথিটির ফোলিও শেষ। এর পরের কাহিনি ৩০৪ নং পুথি থেকে পুনর্গঠন করা।

৭. বাংলা পুথি ছাপা ও প্রকাশনার তথ্য সংগ্রহের জন্য ২২ ডিসেম্বর ২০২৩ তারিখে বর্তমান গবেষকের নেতৃত্বে চকবাজার ও বাংলা বাজার এলাকার প্রকাশনা সংস্থাগুলির উপর একটি মাঠ জরিপ পরিচালনা করা হয়। এ জরিপে সহকারী তথ্যসংগ্রাহক ছিলেন জনাব মোস্তাফিজুর রহমান পলাশ (ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী)।

আকর সূত্র (primary sources)

অজ্ঞাত। *সকিনা বিলাপ*। সা.বি. ১২৪, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

অজ্ঞাত। *সকিনার চৌতিসা*। সা.বি. ৯১, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

খান, মুহাম্মদ। *কাসেমের লড়াই বা সকিনার চৌতিসা*। সা.বি. ৯০, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

তনু শেখ। *ফাতেমার সুরত নামা* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)। পুঁথি নং ৩০২, এমএস ১৩৩, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

তনু শেখ। *ফাতেমার সুরত নামা* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)। পুঁথি নং ৩০৩, এমএস ১২৩, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

তনু শেখ। *বিবি ফাতেমার সুরত নামা* (অপ্রকাশিত পাণ্ডুলিপি)। পুঁথি নং ৩০৪, এমএস ৫৩৪, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

রাজা, আলি। ওরফে কানু ফকির *জ্ঞান সাগর*। সা.বি. ১৪৬, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

সুলতান, *সৈয়দ*। *ইবলিশ নামা*। সা.বি. ৩৬, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

সুলতান, সৈয়দ। *ওফাতে রসূল*। সা.বি. ৪৮, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

হামজা, সৈয়দ। *আমির হামজা*। সা.বি. ১০, পাণ্ডুলিপি শাখা, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার।

তথ্যসূত্র

করিম, আবদুল (১৯৯৪)। *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ: জীবন ও কর্ম*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

করিম, আবদুল (২০১৪)। *সমাজ ও জীবন: আত্মজীবনী*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

করিম, আবদুল (২০২৩)। *আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদের প্রবন্ধ সংগ্রহ (বিষয়: আলাওল)*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

করিম, আবদুল (১৩৮১ বঙ্গাব্দ)। 'কবি নসরুল্লাহ খোন্দকার রচিত শরীয়ত-নামা'। আনিসুজ্জামান (সম্পাদিত)। *পাণ্ডুলিপি*, ৪র্থ খণ্ড, পৃ. ১৫৩-৩০৬।

কাইউম, মোহাম্মদ আব্দুল (২০০০)। *পাণ্ডুলিপি পাঠ ও পাঠ-সমালোচনা*। ঢাকা: গতিধারা।

জাকারিয়া, সাইমন ও নাজমীন মর্তুজাল (২০১২)। *ফোকলোর ও লিখিতসাহিত্য: জারিগানের আসরে বিষাদ-সিন্ধু আত্তীকরণ ও পরিবেশন পদ্ধতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

দুবের, থিবো (২০২০)। 'দেশি বচনের বিস্মৃত পাঠ: আরবি হরফে বাংলা হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি'। *ভাবনগর*, খণ্ড ১২, সংখ্যা, ১৩-১৪: ১৪৪৮-৬২।

পারভীন, সৈয়দা সুলতানা, সুলতানা, শাহীন এবং আকবর, সৈয়দ আলী (সম্পা.) (২০০৬)। *পাণ্ডুলিপি পরিচয়*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় লাইব্রেরি।

মিয়া, মুহম্মদ শাহজাহান (১৯৮৪)। *বাংলা পাণ্ডুলিপি পাঠসমীক্ষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রহমান, এ. এ. (২০০৫)। *বাঙালা লিপির উৎস ও বিকাশের অজানা ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রায়হান, জহির (১৯৮৪)। *হাজার বছর ধরে*। ঢাকা: সন্ধানী প্রকাশণী।

সাহিত্যবিশারদ, আবদুল করিম (১৩২১ বঙ্গাব্দ)। *পুথির বিবরণ*। কলিকাতা: বঙ্গীয় সাহিত্য পরিষদ।

হক, এনামুল (৩য় সংস্করণ ২০০১)। *মুসলিম বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

হাসান, শহিদুল (২০২০)। *ফাতেমার সুরতনামা শেরবাজ খান পাঠ ও সম্পাদনা*। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার।

হোসেন, কাজী মোতাহার। (২০২২, চতুর্থ মুদ্রণ, প্রথম প্রকাশ ২০০৪)। *স্মৃতিকথা*। ঢাকা: নবযুগ প্রকাশনী।

Cashin, David H (1995). *The Ocean of Love: Middle Bengali Sufi Literature and the Fakirs of Bengal*. Stockholm: Association of Oriental Studies, Stockholm University.

Chatterji, S. K. (1926). *Origin and Development of Bangla Language.* Calcutta: Calcutta University Press.

d'Hubert, T. (2022). *Meaningful Rituals: Persian, Arabic, and Bengali in the Nurnama Taradition of Eastern Bengal.* Delhi: Primus Books.

Gacek, Adam (2009) *Arabic Manuscripts A Vademecum For Readers Handbook Of Orient*, Leiden/Boston: Brill.

Halder, Ipsita (2023). *Reclaiming Karbala Nation, Islam and Literature of the Bengali Muslims*. New York: Routledge.

Irani, A. A. (2021). *The Muhammad Avatara: Salvation History, Translation, and the Making of Bengali Islam.* New York: Oxford University Press.

Karim, A., & Sharif, A. (1960). *A Descriptive Catalogue of Bengali Manuscripts in Munshi Abdul Karim's Collection.* Dhaka: Dhaka.

Long, Rev. J. (1859). 'Returns Relating to Publications in the Bengali Language in 1857', *Selections from the Records of the Bengal Government*. No. XXXII. Calcutta: Calcutta Gazette Office.

Mannan, Q. A. (1974). (2nd rep) *The Emergence and Development of Dobhashi Literature in Bengal (upto 1855 A.D.).* Dhaka: Bangla Academy.

Orsatti, Paola 'Persian Language in Arabic Script: The Formation of the Orthographic Standard and the Different Graphic Traditions of Iran in the First Centuries of the Islamic Era' in Dmitry Bondarev, Alessandro Gori and Lameen Souag (eds.), *Creating Standards Interactions with Arabic script in 12 Manuscript Cultures*, Berlin/Boston: CPI books GmbH, Leck 2019: 40-70 *Oxford English Dictionary*, https://www.oed.com/dictionary/semite_n accessed on 11 November, 2024.

Parvin, Syeda Farid (compiled) (2013). An Alphabetic Index of Bengali Manuscripts. Abdul Karim Sahity Bisharad's Collections, Part III. Dhaka: Dhaka University Library.

Roy, A. (1983). *Islamic Syncretistic Tradition in Bengal.* Dhaka: Academic Publisher.

Stewart, T. K. (2019). *Witness to Marvels: Sufism and Literary Imagination.* California: University of California Press.

ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্যে রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্প: *কবর* ও *আরেক ফাল্গুন*

মোহাম্মদ আজম

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookAzam

১

জাতীয়তাবাদী উপাদান হিসাবে ভাষা আন্দোলনের গভীর কার্যকরতার এক অব্যবহিত প্রমাণ এই যে, শিল্পকলার জগতে ঘটনাটি যথেষ্ট আলোড়ন তুলেছিল। এ বিষয়ে প্রবন্ধ রচিত হচ্ছিল আগে থেকেই, আর একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার পরে কথাসাহিত্য, নাটক, কবিতা, গান ও চলচ্চিত্রে বিচিত্রভাবে ওই ঘটনার ছায়া পড়তে থাকে। জাতীয় রাজনীতিতে ঘটনাটি যে খুব প্রভাবশালী হয়ে উঠেছিল, তার প্রত্যক্ষ প্রমাণ চুয়ান্নর নির্বাচনের একুশ দফা। ওই নির্বাচনী ইশতাহারের বেশ কয়েকটি দফা প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনকে ঘিরে রচিত হওয়ায় প্রমাণিত হয়, ঘটনার অনতিবিলম্বে এটি জাতীয় চৈতন্যের অঙ্গ হয়ে উঠেছিল। সাহিত্যে তার যে নানামাত্রিক প্রতিফলন ঘটবে, তাতে বিস্ময়ের কিছু নেই।

কোনো ঘটনা, ইতিহাস বা রাজনৈতিক তৎপরতার সাহিত্যিক রূপায়ণ সাধারণভাবে কিছু অতিরিক্ত মাত্রা স্পর্শ করে। সাহিত্যে একদিকে কাঠামোগত বাস্তবতার সাপেক্ষে ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের অন্তরঙ্গ উন্মোচন ঘটে, অন্যদিকে পুরো প্রক্রিয়াটি সংঘটিত হয় ভাষার আধারে, যে ভাষা জনগোষ্ঠীর ব্যষ্টিক-সামষ্টিক যাপিত জীবনের প্রধান প্রকাশ। সাহিত্যিক ভাষা তার সামগ্রিক রূপ বা ফর্মের সাথে অঙ্গাঙ্গিভাবে সম্পর্কিত। রূপের আধারে কাঠামোভুক্ত ব্যক্তি বা ব্যক্তিদের যাপিত জীবনের যে অন্তরঙ্গতা সঞ্চারিত করা সম্ভবপর হয়, তা উদাহরণ হিসাবে বলা যাক, ইতিহাস বা সমাজবিজ্ঞানে অধিকাংশ ক্ষেত্রেই দুরূহ হয়ে ওঠে। ভাষার যে ব্যঞ্জনা বা বহু-অর্থকতা সাহিত্যের সহজাত, তার ভিত্তিতেই একদিকে জীবনযাপনের অন্তরঙ্গ কোণগুলোতে আলো ফেলা সম্ভবপর হয়, অন্যদিকে বর্তমানময়তার ভাঁজে ভাঁজে এঁকে দেওয়া সম্ভব হয় ভবিষ্যতের ইশারা ও আকাঙ্ক্ষার মানচিত্র। সাহিত্যিক রূপকল্পে জনগোষ্ঠীর রাজনৈতিকতা বা রাষ্ট্রকল্পের মতো সামষ্টিক মননের উপকরণ শনাক্ত করা এ কারণেই অন্যরকম তাৎপর্য বহন করে। রূপকল্প ও ভাষার নন্দনতাত্ত্বিক বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে সামষ্টিক মনে ক্রিয়াশীল ভাবনা-বোধির তুলনামূলক বিশদ ও গভীর উন্মোচন সম্ভব।

উল্লিখিত তত্ত্ব-কাঠামোর ভিত্তিতে ভাষা আন্দোলনের রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের কিছু অন্তরঙ্গ ছবি আমরা অনুসন্ধান করব ভাষা আন্দোলনভিত্তিক সাহিত্যকর্মের আধারে। সম্ভাব্য অনেকগুলো বিকল্প থেকে এখানে আমরা বেছে নিয়েছি মুনীর চৌধুরীর নাটিকা '*কবর*' (১৯৫৩) এবং জহির রায়হানের উপন্যাস '*আরেক ফাল্গুন*' (১৯৬৯)। এগুলো বেছে নেওয়ার অন্যতম কারণ, দুটি রচনাই নিজ গুণে বহু-পঠিত এবং বিশ্লেষিত। বাংলাদেশ রাষ্ট্রের আবির্ভাবের পেছনে ক্রিয়াশীল যে জাতীয়তাবাদী গল্প প্রায় সর্বব্যাপী স্বীকৃতি পেয়ে আসছে, তার সাপেক্ষে এ দুই টেক্সটের জনপ্রিয়তা ও গ্রহণযোগ্যতার বিশেষ গুরুত্ব আছে। জনপ্রিয়তাই প্রমাণ করে, এ দুই গ্রন্থে উপস্থাপিত ভাষা আন্দোলন অন্তত মূলধারার বয়ানকে যথেষ্ট পরিমাণে ধারণ করে। কিন্তু

জাতীয়তাবাদী বয়ান সাধারণভাবে চলে বেশ উপরিতলে, তুলনামূলক দৃশ্যমান স্তর থেকেই সে তার সুবিধাজনক উপাদানগুলো সংগ্রহ করে নেয়। সাহিত্যিক ভাষা ও রূপকল্প সাধারণত যাপনের যেসব সূক্ষ্ম স্তরে ক্রিয়াশীল হয়, জনপ্রিয় জাতীয়তাবাদী আখ্যান সে পর্যন্ত পৌঁছাতে চায় না। এ দুই টেক্সটের ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে। বিশেষত, বর্তমান রচনায় এ দুটো টেক্সট যে বিশেষ প্রেক্ষাপট ও দৃষ্টিভঙ্গি থেকে বিশ্লেষিত হবে, তার সমরূপ নজির পূর্বতন পাঠে বা সমালোচনায় দেখা যায় না। তাহলে একদিকে দুটি টেক্সটের জনপ্রিয়তা প্রমাণ করে, এদের বহিঃকাঠামোয় প্রতিফলিত ঘটনা ও ইশারা জাতীয়তাবাদী সিদ্ধরসকে লঙ্ঘন করে না; অন্যদিকে সাহিত্যিক ভাষা ও রূপকল্পে সঞ্চারিত অন্যতর তাৎপর্যের সম্ভাবনাও তাতে পূর্ণমাত্রায় হাজির।

কিন্তু এ দুটো সাহিত্যকর্ম বেছে নেওয়ার এটাই একমাত্র কারণ নয়। *কবর* নাটক রচিত হয়েছিল ১৯৫৩ সালে, ভাষা আন্দোলনের ঠিক পরের বছর, যখন ঘটনার অব্যবহিত তাপ-ভাপ এবং সামষ্টিক মনস্তত্ত্বে জায়মান ঝোঁক ও প্রবণতা বেশ পরিমাণে তাজা ছিল। ষাটের দশকের ঘটনাপ্রবাহ যেভাবে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন-সংগ্রাম ও মনোবৃত্তিকে একমুখী করে ঘনীভূত করেছিল, ১৯৫০-এর দশকের গোড়ায় তা একেবারেই অভাবনীয় ছিল। এমতাবস্থায় *কবর* নাটকে ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত অভিজ্ঞতার এমন ছাঁচ ও প্রবণতা মুদ্রিত হওয়া স্বাভাবিক, যা জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রত্যক্ষ চাপে বিবর্তিত হয়নি। সেদিক থেকে এমনকি তথ্য-উপাত্তের চেয়েও এ টেক্সটের সাক্ষ্য কোনো কোনো ক্ষেত্রে অধিকতর নির্ভরযোগ্য হওয়ার কথা।

অন্যদিকে, *আরেক ফাল্গুন* রচিত হয়েছে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের তুলনামূলক পরিপক্ব অবস্থায়, আন্দোলন-সংগ্রামের প্রত্যক্ষ আঁচে বসে। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন জাতীয়তাবাদের প্রধান চিহ্ন হিসাবে পরিগঠিত হওয়া তখন একপ্রকার নিশ্চিত। আর এ ধরনের পরিস্থিতিতেই ১৯৬৯ সালে জহির রায়হান ১৯৫২-র অপেক্ষাকৃত বলীয়ান রেপ্লিকা হিসাবে উপস্থাপন করেছেন ১৯৫৫ সালের ফেব্রুয়ারি-উদ্‌যাপনকে, যেখানে 'আসছে ফাল্গুনে দ্বিগুণ হওয়ার' প্রত্যয় নিঃসন্দেহে ১৯৬৯-এর সম্ভাবনাকেই প্রত্যয়ন করে, যে সম্ভাবনা উপন্যাসটির রচনাকালে অনেকটাই বাস্তব হয়ে উঠেছে। কাজেই এ টেক্সটে রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্প যে নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে তুলনামূলক একরোখা বাঁক নেবে, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। *কবর* ও *আরেক ফাল্গুন* এভাবে পাকিস্তান আমলের প্রায় পুরো সময়টিকে একদিক থেকে চিহ্নিত করে এবং রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের তুলনামূলক প্রসারিত মানচিত্র প্রণয়নের সুযোগ তৈরি করে।

ব্যক্তি-লেখকের দিক থেকে *কবর* এবং *আরেক ফাল্গুন*-এর অন্যতর গুরুত্বও আছে। দু'জন লেখকই বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের প্রত্যক্ষ অংশীদার। দু'জনই এ বাবদ রাষ্ট্রপক্ষের জুলুম ও নিপীড়নের শিকার। মুনীর চৌধুরী ১৯৫২ সালে ইংরেজি বিভাগের শিক্ষক থাকাকালে বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষকদের সভায় একুশে ফেব্রুয়ারির 'হত্যাকাণ্ডের সমালোচনা করে বিবৃতি পাশ করানোর অভিযোগে' কারাবরণ করেন (ইসলাম, ১৯৭২, পৃ. ১৭-১৮)। জহির রায়হান বায়ান্নর ভাষা-আন্দোলনে একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভঙ্গকারী দশজনের প্রথম দলের সদস্য হিসাবে গ্রেফতার হন (আহমদ, ২০২০, পৃ. ৮০); আবার পঞ্চান্নর 'আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী এবং গ্রেফতারকৃত ছাত্রদেরও তিনি একজন (ইসলাম, ২০১৬, পৃ. ৩৪)। তদুপরি, 'জহির রায়হান সম্ভবত বাংলাদেশের একমাত্র কথাসাহিত্যিক, যাঁর উদ্ভবের পেছনে আছে বায়ান্নোর ভাষা-আন্দোলন, যাঁর স্বপ্ন কল্পনা জীবন ভরে আছে ভাষা-আন্দোলনের স্মৃতি ও দ্রোহে' (আজাদ, ২০১২, পৃ. ২৭৫)। কাজেই তাঁদের সাহিত্যিক বয়ানের অন্তরঙ্গতায় ঘাটতি থাকার সম্ভাবনা নিতান্তই কম।

বর্তমান প্রবন্ধে 'রাজনৈতিকতা' কথাটা ব্যবহৃত হয়েছে বহিঃস্তরে রাজনৈতিক তৎপরতা আর অন্তঃস্তরে ক্ষমতা-সম্পর্কের প্রতিশব্দ হিসাবে। রাজনৈতিকতার কোনো কোনো দিক তৎপরতা হিসাবে উপরিতলে প্রকাশিত হয়। রাজনৈতিক দল-গঠন, কর্মসূচি প্রণয়ন ও কর্মসূচি বাস্তবায়নজনিত তৎপরতা এ স্তরে পড়বে। কিন্তু এর অনেক গভীরে; রাজনৈতিক তৎপরতার কার্যকারণ হিসাবে– অন্তঃস্তরে ক্রিয়াশীল থাকে ক্ষমতা-সম্পর্কের নানা রূপ। বিদ্যমান ক্ষমতাতন্ত্র এবং নতুন ক্ষমতার প্রস্তাব– এ দু'য়ের দ্বৈরথ গভীরভাবে শনাক্ত করা যায় ভাবাদর্শিক স্তরে তল্লাশি চালালে। জনগোষ্ঠীর সামষ্টিক অস্তিত্বের চিহ্ন হিসাবে তা প্রকাশিত হয় নানামাত্রিক ভাষিক চিহ্ন-ব্যবস্থায়। কথা বলার ভাষা তার এক প্রকাশ মাত্র। অন্য অনেক মাত্রা প্রকাশিত হয় সামগ্রিক মানব-সম্পর্কে। একে বলতে পারি ভাষার তুলনামূলক গভীর স্তর। সাহিত্য বস্তুত কাজ করে এ স্তরের চিহ্নায়ন, সূত্রায়ন ও আকার দেওয়ার মধ্য দিয়ে। প্রত্যক্ষত রাষ্ট্রকল্প উপস্থাপিত না হলেও ভাষার এ স্তরে অনুসন্ধান করলে বিদ্যমান রাষ্ট্র-ব্যবস্থায় অসন্তোষ ও কাঙ্ক্ষিত রাষ্ট্র-কাঠামোর সম্ভাবনার দিকগুলো উন্মোচিত হয়। ভাষিক চিহ্নে এ ভাবাদর্শিক অবস্থান মুদ্রিত থাকে।

সাহিত্যিক ভাষা ও রূপ চিহ্ন-ব্যবস্থা হিসাবে পঠিত হওয়ার সুযোগ প্রবল। উচ্চারণের ঝোঁক ও বাগ্‌বিধিগত তাৎপর্য বিশ্লেষণের মধ্য দিয়ে দেখানো সম্ভব যে, বিদ্যমান ক্ষমতা-সম্পর্ককে নানা মাত্রায় চ্যালেঞ্জ করে রচনা-দুটি রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের অন্তর্লীন কিন্তু শক্তিশালী রূপরেখা প্রণয়ন করে। সাহিত্যপাঠের বিবিধ কায়দাকানুন ও সাহিত্যিক ভাষার অর্থ-উৎপাদন-কৌশল পরীক্ষা করার পাশাপাশি ডিসকোর্স এনালাইসিসও এ কাজে কার্যকর ভূমিকা পালন করে। চিন্তাভাবনার যেসব অন্তর্নিহিত ঝোঁক ভাষার প্রকাশ্য স্তরে মুদ্রিত হয়ে গভীর অন্তর্দেশের বার্তা বহন করে, প্রধানত সেগুলো উন্মোচনের মাধ্যমেই রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের রূপরেখা প্রণীত হতে পারে।

২.১

সাধারণভাবে রাজনৈতিক তৎপরতা বলতে আমরা যা বুঝি, *কবর* নাটকে তার প্রত্যক্ষ হাজিরার সুযোগ সীমিত। তবে গোরস্থানে মঞ্চস্থ দৃশ্যাবলির ফাঁকে ফাঁকে নাট্যকার সূক্ষ্ম মুনশিয়ানায় একুশে ফেব্রুয়ারির পুরো ঘটনাই সংক্ষেপে উপস্থাপন করেছেন। কাজেই পরোক্ষভাবে হলেও রাজনৈতিক কর্মসূচি, তার বাস্তবায়ন এবং কর্মসূচি-বিরোধী রাষ্ট্রপক্ষের ভূমিকা ভালোভাবেই পাওয়া গেছে। সেখানে রাষ্ট্রপক্ষকে বস্তুত দমন-পীড়নে সিদ্ধহস্ত এক দানব হিসাবেই পাওয়া যায়। হাফিজ যখন বলে, 'কটাই বা লাশ আর। গোর-খুঁড়েগুলোকে নিয়ে আমি একলাই সব সাফসুফ করে রাখতাম' (পৃ. ৩৯)[১]। তখন আসলে এক ভয়ানক নিপীড়ক কাঠামোর দাঁত ও নখর উন্মোচিত হয়। নেতার প্রত্যক্ষ উক্তিতে আর হাফিজের মনোভঙ্গি ও উচ্চারণে রাষ্ট্রপক্ষের এ 'কর্মসূচি' বারবার সামনে এসেছে।

আন্দোলনকারীদের কর্মসূচি আছে পরোক্ষ বয়ানে– একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার নানামাত্রিক উপস্থাপনায়। তবে প্রত্যক্ষভাবে প্রধানত নেতার সংলাপে নিপীড়িত মানুষের এক তৎপরতার কথা বারবার উচ্চারিত হয়ে প্রায় প্রতীকী মর্যাদায় উন্নীত হয়েছে। এর নাম 'মিছিল'। গোরস্থানে হাফিজের মুখে গোলমালের কথা শুনে নেতার তৎক্ষণাৎ মিছিলের কথাই মনে হয়। মিছিলই প্রতিবাদ-প্রতিরোধের একমাত্র ভাষা, যা তার কল্পনায় সহসা ধরা দেয়। হাফিজের কাছে তার জিজ্ঞাসা: 'গোলমাল? গোরস্থানের মুর্দারাও মিছিল করতে শিখেছে নাকি?' তাই তার দিক থেকে দমন-পীড়নের মূল লক্ষ্যও হয়ে দাঁড়ায় মিছিল বন্ধ করা। হেলুসিনেশনে বিবেক-চরিত্রের মতো আবির্ভূত মুর্দা ফকিরের জন্য তার একই দাওয়াই: 'পুঁতে ফেল। দশ-পনেরো বিশ-পঁচিশ হাত

– যত নীচে পারো...। যেন মিছিল করতে না পারে, শ্লোগান তুলতে না পারে, যেন চ্যাঁচাতে ভুলে যায়।' (পৃ. ৪৫)

কবর নাটক এভাবে মিছিলকে কর্মসূচির এক কার্যকর প্রতীকে পরিণত করে। পাকিস্তান আমলের পরবর্তী দিনগুলোতে এ মিছিলই হয়ে উঠেছিল রাজনৈতিক তৎপরতার প্রধান চিহ্ন। আহমদ ছফার *ওঙ্কার* (১৯৭৫) বা আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের *চিলেকোঠার সেপাই* (১৯৮৬) উপন্যাসে, কিংবা শামসুর রাহমানের কবিতায় উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থানকালে মিছিলের অবিস্মরণীয় আয়োজন আমাদের সে কথাই মনে করিয়ে দেয়।

২.২

মোটেই কাকতালীয় নয়, *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসেও মিছিল এক কেন্দ্রীয় চরিত্র। কর্মসূচির নানা বৈচিত্র্যের মধ্যেও মিছিলের বিশেষ শক্তি ও মাদকতা ভুলে থাকার জো নাই। এর বাইরে দেয়ালিকা প্রকাশ, কালো ব্যাজ ধারণ, তিন দিনের 'খালি পায়ে থাকা' কর্মসূচি, রোজা রাখা, কালো পতাকা উত্তোলন, সমাবেশসহ বেশ অনেকগুলো তৎপরতার ছবি পাওয়া যায় এখানে। ১৯৫৫-র একুশে ফেব্রুয়ারির আগের রাতে আন্দোলনকারীরা এক ভিন্ন ধরনের কর্মসূচি গ্রহণ করে। রাস্তায় মিছিল ও স্লোগানের ব্যাপারে নিষেধাজ্ঞার জবাবে হল, হোস্টেল ও বাড়ির ছাদে দাঁড়িয়ে একত্রে স্লোগান দেয়ার কর্মসূচি নেয়। সাফল্যের সাথে পালিত হয় সে কর্মসূচি।

রাজনৈতিক কর্মসূচি ও তৎপরতার দিক থেকে *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের অন্যতম প্রধান প্রবণতা বায়ান্নর একুশে আন্দোলনের সাথে একটা সমান্তরলতা তৈরির চেষ্টা। পঞ্চান্নের এ আন্দোলনের অনেক নেতা-কর্মী বায়ান্নতেও সক্রিয় ছিল। কাজেই স্মৃতিচারণ বা বর্ণনা করার ছলে তিন বছর আগের বনিয়াদি ঘটনাটিকে জীবন্ত করে তোলা গেছে। যেমন, কবি রসুল বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারির বর্ণনা দিচ্ছিল নতুন আসা একদল ছেলেকে। দীর্ঘ বর্ণনা। জহির রায়হানের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতার ছাপ থাকায় সে বর্ণনার বিশেষ গুরুত্ব আছে। এ বর্ণনায় স্বভাবতই পার্টি-শৃঙ্খলার পরিচয় পাওয়া যায় না, টের পাওয়া যায় আন্দোলনের বিশৃঙ্খল শক্তি ও তেজোদ্দীপ্তি। এখানে গণতান্ত্রিকভাবে সিদ্ধান্ত নেওয়ার কথা আছে; স্বাক্ষর-সংগ্রহের মতো কর্মসূচির ব্যর্থতার কথা আছে। আছে আরেক দফা মন্ত্রী-এমপিসহ কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দের সমালোচনা।

সেবার আন্দোলনের কলাকৌশল হিসাবে তারা গ্রেফতার হওয়ার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল। দশজনের ছোটো ছোটো দল গঠন করে গেট অতিক্রম করে গ্রেফতার হওয়াই ছিল সেদিনের পরিকল্পনা। কিন্তু সংখ্যাধিক্যের কারণে যেখানে আন্দোলনকারীদের দাবির ন্যায্যতা সম্পর্কে সরকারের নিশ্চিত হওয়ার কথা ছিল, সেখানে তারা বুলেটের প্রতাপে মিছিল আর আওয়াজ থামিয়ে দেওয়ার কৌশল অবলম্বন করে। আন্দোলনকারীদের গণতান্ত্রিক কর্মসূচির বিপরীতে এভাবে রাষ্ট্রপক্ষের ফ্যাসিবাদী তৎপরতা স্পষ্ট হয়। অন্যভাবে পঞ্চান্নের আন্দোলনেও সমরূপ কর্মসূচি পালিত হয়েছে। প্রবণতার দিক থেকে পঞ্চান্নের আন্দোলনকে বায়ান্নের প্রসারণও বলা সম্ভব।

কালো ব্যাজ পরিধান করা নিষিদ্ধ করেছে বলে মেয়েরা পরেছিল কালো শাড়ি। 'দেখি ওরা আমাদের শাড়ি পরা ব্যান্ড করতে পারে কিনা' (পৃ. ১৮৫)[২]। সহকর্মীদের সাথে আলাপকালে বলেছে এক নারী আন্দোলনকারী। আন্দোলন সবসময়ই তৈরি করতে থাকে নানা চিহ্ন। নিরীহ ঘটনা বা প্রতীক নতুন তাৎপর্যে উদ্ভাসিত হয়ে পেতে থাকে নতুন মাত্রা। একটা গুরুত্বপূর্ণ কর্মসূচি ছিল দেয়াল পত্রিকা টানানো। বিদ্যালয়ের

নোটিশ-বোর্ডের পাশে লাল কালিতে লেখা দেয়ালিকাটি সবার দৃষ্টি আকর্ষণ করে। রাতে রুমের লাইট নিবিয়ে প্রায় গেরিলা কায়দায় নীলা-বেনুরা তৈরি করেছিল এই দেয়াল পত্রিকা। দেয়ালিকার প্রতি– এবং এ ধরনের অন্য কর্মসূচিগুলোর প্রতি– শিক্ষার্থীদের প্রবল আগ্রহ মধ্যবিত্ত পরিসরে আন্দোলনটির জনপ্রিয়তার ইঙ্গিত দেয়।

এ উপন্যাসে রাষ্ট্রপক্ষের তৎপরতাও খানিকটা বিশদ আকার পেয়েছে। একটা পুলিশি রাষ্ট্রে তৎপরতাও নিশ্চয়ই পুলিশি নির্যাতনকে ঘিরেই আবর্তিত হবে। পুলিশ কর্মকর্তা কিউ খানের বাসায় ইন্সপেক্টরদের রাত-দুপুরে ডেকে পাঠানো, আর পুরো শহর তল্লাশি করে আন্দোলনের উদ্যোক্তাদের গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত বস্তুত তারই প্রকাশ। অবশ্য আন্দোলনকারীর সংখ্যা যথেষ্ট বেশি হওয়ায় ইন্সপেক্টর রশীদের সন্দেহ হয়, ধরাধরি করে সুবিধা করা যাবে কি না। কর্মসূচির দিক থেকে সরকারপক্ষ খুব প্রস্তুত– তার পুলিশ ও মিলিটারি বাহিনীসহ। মুনিম ও অন্যদের বাসায়ও পুলিশ গেছে, যদিও তারা আগেভাগে অন্যত্র সরে থাকায় ধরা পড়েনি।[৩]

৩

তবে রাজনৈতিক কর্মসূচি আর তৎপরতার এ জাহেরি স্তর ছেড়ে আমরা যদি রাজনৈতিকতার তুলনামূলক বাতেনি স্তরে প্রবেশ করি, তাহলে ভাবাদর্শিক অবস্থান ও বিরোধের নানা মাত্রা দেখতে পাব। বস্তুত, ভাবাদর্শিক পর্যালোচনা থেকেই পৌঁছানো যাবে রাষ্ট্রকল্পে– যে রাষ্ট্র সবসময়, অন্তত আলোচ্য দুই টেক্সটে, ভাবিকালের দিক-নির্দেশক।[৪]

৩.১

নেতা যখন বলে, 'গত চার-পাঁচ বছরের মধ্যে ভয় কখনই মনে ঢুকতে পারেনি' (পৃ. ৩৮)। তখন পরিষ্কার বোঝা যায়, সাতচল্লিশোত্তর পর্বে পাকিস্তান রাষ্ট্রকাঠামো বস্তুত জনপ্রতিনিধিত্বের বাইরে থেকে জনবিচ্ছিন্ন নির্বাহীদের অগণতান্ত্রিক কর্তৃত্বে পরিচালিত হয়েছে। এ রাষ্ট্রকাঠামোই আরো স্পষ্টভাবে মূর্ত হয়, যখন নেতাকে বলতে শোনা যায়, 'ওরা আমার বিশ্বাসী লোক। আপনার সারা অফিস ঢুড়লেও অমন লোক জুটতো না' (পৃ. ৩৯)। বোঝা যায়, কোনো কাঠামোগত স্থিতি নয়, নিয়মতান্ত্রিক আমলাতন্ত্র বা পুলিশ-প্রশাসন নয়, 'বিশ্বাসী' লোকের 'পেট্রন-ক্লায়েন্ট' সম্পর্কের ভিত্তিতেই রাষ্ট্র পরিচালিত হচ্ছিল। 'আধুনিক' কথাটার যে অর্থই করা হোক না কেন, তার কোনোটার খোপেই এ ধরনের একটা রাষ্ট্রকাঠামোর সংস্থান হতে পারে না। স্বভাবতই, যে নিয়মতান্ত্রিক অঙ্গ-বিভাজনের উপর আধুনিক রাষ্ট্রকাঠামো প্রতিষ্ঠিত, *কবর* নাটকের বিদ্যমান রাষ্ট্রতন্ত্রে তার ছিটেফোঁটাও ছিল না। একমাত্র এরকম একটা রাষ্ট্র-কাঠামোর মধ্যেই নেতার পক্ষে বলা সম্ভব: 'টাকার জন্য চিন্তা করবেন না। যা দরকার তার চেয়ে বেশী ছড়িয়ে যান। সরকারের অনুমোদন আমি যোগাড় করে দেবো' (পৃ. ৪১)। এ উচ্চারণ কেবল এক নীতি-নৈতিকতাহীন বিশৃঙ্খল রাষ্ট্রতন্ত্রের পরিচয় দেয় না, এমন এক পিছিয়ে-পড়া রাষ্ট্রের কথাও বলে, যে রাষ্ট্র-কাঠামো দলীয় রাজনীতি এবং আইনানুগ নির্বাহীর মধ্যে কোনো ফারাক করতে জানে না।

নেতা চরিত্র প্রণয়নে জিন্নাহর ব্যাপক ছায়াপাত আছে। 'এসব কাজে নার্ভাস হলে এত বড় প্রতিষ্ঠানের নেতা হতে পারতাম না' (পৃ. ৪১)। নেতার এ সংলাপ স্পষ্টতই ক্ষমতাসীন দলের নেতৃস্থানীয় পদের ইশারা দেয়। অন্যত্র কথাটা বলা হয়েছে আরো খোলাখুলি। কবর থেকে উঠে আসা বেয়াড়া তরুণকে বশীভূত করতে গিয়ে

নেতা বলেছে, 'দেখ ছেলে, আমার বয়স হয়েছে। তোমার মুরব্বিরাও আমাকে মানে। বহুকাল থেকে এদেশের রাজনীতি আঙ্গুলে টিপে টিপে গড়েছি, শেপ দিয়েছি। কওমের বৃহত্তম রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানের, বলতে পার, আমিই একচ্ছত্র মালিক! কোটি কোটি লোক আমার হুকুমে ওঠে বসে' (পৃ. ৫২)। পাকিস্তান রাষ্ট্রের তৎকালীন বাস্তবতায় এ কথা– মিমিক্রি এবং ব্যঙ্গের প্রবলতা সত্ত্বেও– একমাত্র জিন্নাহর পক্ষেই বলা সম্ভব। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা ঘটার বহু আগেই জিন্নাহ গত হয়েছেন। এমতাবস্থায় এ সংলাপ আদতে পাকিস্তান রাষ্ট্রকেই কেবল চিহ্নিত করতে পারে। ইতিহাসের জিন্নাহ যেমনই হোক, তাঁর ছায়ায় নির্মিত *কবর* নাটকের নেতা এক প্রবঞ্চক চরিত্র বৈকি। আর রাষ্ট্রটিও অন্যায্যতার মূর্ত প্রতীক। এখানে নেতা, রাষ্ট্র আর প্রশাসন যৌথভাবে কাজ করে বেআইনিভাবে। পাকিস্তান রাষ্ট্রের এ পরিচয় পরবর্তী বাংলাদেশের ইতিহাসে-সাহিত্যে বহুবার নির্মিত হয়েছে। *কবর* সম্ভবত এর সর্বপ্রাচীন নমুনা। এর বিপরীত রাষ্ট্রমূর্তি এ নাটকে উচ্চকিত হয়েছে মুখ্যত মুর্দা ফকির আর শহিদদের উচ্চারণে। নিশ্চিতভাবে তা এক গণতান্ত্রিক, সহনশীল আর কল্যাণকামী রাষ্ট্র।

এই মুর্দা ফকিরের মাধ্যমেই নাট্যকার উপস্থাপন করেছেন এ নাটকের সবচেয়ে কার্যকর ভাবাদর্শিক ডিসকোর্স। 'জীবিত' ও 'মৃত' শব্দ দুটির বিদ্যমান অর্থ বদলে দিয়ে প্রতিষ্ঠা করেছেন রাজনৈতিকতার এক কাঙ্ক্ষিত সত্য। নেতা ও হাফিজকেই সাব্যস্ত করেছেন মৃত ব্যক্তি বলে, যারা অন্যায়ভাবে বেঁচে থেকে ক্ষমতা-সম্পর্কের উঁচু মোকামগুলোর দখল নিয়ে অনর্থ সৃষ্টি করছে। অন্যদিকে, যে মৃতরা কবরে গেছে তাজা বারুদের গন্ধ বুকে ধারণ করে, মুর্দা ফকির বলছে, তারা কিছুতেই কবরে থাকবে না। যতই গোপনে আর গভীরে চালান করা হোক না কেন, ঠিকই উঠে আসবে মাটি ফুঁড়ে, প্রতিষ্ঠা করবে নতুন দিনের নতুন রাষ্ট্র। অন্যভাবে বললে, যে দাবি জনলগ্ন, আর যার উৎপত্তি মানুষের ন্যায্যতার গভীর থেকে, তার ভাবাদর্শিক জোর আর বিস্তারধর্মী বিশিষ্টতা আসলে অপ্রতিরোধ্য। কাজেই আগামীর রাষ্ট্রতন্ত্রে তার সাফল্যও পরম কাঙ্ক্ষিত। *কবর* নাটকে এভাবে চিত্রিত হয়েছে বিশ শতকের চল্লিশ ও পঞ্চাশের দশকের আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও বুর্জোয়া চিন্তাচেতনা। মুর্দা ফকির যে বলেছে, যারা মারা গেছে তারাই বরং জীবিত, তা আসলে বর্তমান জরাজীর্ণ রাষ্ট্রের বিপরীতে সম্ভাব্য বুর্জোয়া রাষ্ট্রেরই আকাঙ্ক্ষা।

৩.২

জহির রায়হান মানুষের লড়াই-সংগ্রামকে দেখতে চান স্থান ও কালের বড়ো প্রেক্ষাপটে। বিশেষত, সময়ের দিক থেকে পূর্বতন তৎপরতার সাথে বর্তমানের একটা সংযোগ তাঁর বহু রচনায় দেখা যায়। এর ফলে নিপীড়ন ও প্রতিরোধ– উভয়ই এক ভিন্ন মাত্রায় উদ্ভাসিত হয়। *আরেক ফাল্গুন*ও এর ব্যতিক্রম নয়। উপন্যাসটি শুরু হয়েছে ভিক্টোরিয়া পার্ক এলাকা থেকে। এ সূত্রে লেখক এ পার্কের সাথে যুক্ত ব্রিটিশ-নিপীড়ন আর প্রতিরোধ-সেনাদের ইতিবৃত্ত টেনেছেন। ইতিহাসের তথ্য-উপাত্তে না গিয়ে আশ্রয় নিয়েছেন প্রধানত লোকমুখে প্রচলিত কাহিনির। তাতে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীদের 'পাপে'র ব্যাপারে লোকমনে জাগরূক নিশ্চয়তার বিবরণ আছে। প্রাকৃতিক ন্যায়ের কথাও উচ্চারিত হয়েছে জনমানুষের বরাতে। উপন্যাসটিতে ন্যায্যতার পক্ষে লড়াইরত মানুষদের উপর রাষ্ট্রপক্ষের যে অন্যায় জুলুম, ভিক্টোরিয়া পার্ককে উপলক্ষ্য করে রচিত কথামালা নিঃসন্দেহে তার এক পূর্ব-দৃষ্টান্ত হাজির করে এবং এভাবে বর্তমান নিপীড়নকেই চিহ্নিত করে।

এ নিপীড়নে রাষ্ট্রপক্ষ যতটা স্পষ্ট তারচেয়ে অনেক বেশি প্রকট 'ওরা'। নিঃসন্দেহে উপন্যাসটির রচনাকালে যে জাতীয়তাবাদী বিভাজন ও প্রত্যয় খুব সুস্পষ্ট হয়ে উঠেছিল, উনিশশো পঞ্চান্ন সালের ভাষ্য প্রস্তুত করতে

গিয়ে তারই প্রবল ছায়াপাত ঘটেছে। ফলে 'দেশ' ও 'দেশের মানুষ' এখানকার রাজনৈতিকতায় খুব গুরুতর হয়ে উঠেছে, যার অনিবার্য পরিণতি জাতীয়তাবাদী অভীপ্সা ও রাষ্ট্রকল্প। মূল কর্মসূচির আগের রাতে ছাদে স্লোগান চলার কালে শাহেদ সালমাকে মনে করিয়ে দেয়, আগের নির্বাচনের সময়ও এ ধরনের কর্মসূচি পালিত হয়েছিল। কিন্তু যারা নির্বাচিত হয়ে গেছে, তারা এখন আন্দোলনকারীদের কোনো সাহায্য করছে না। প্রতিবেশী রাজ্জাক সাহেব যেন সালমার পক্ষ থেকে উত্তর দেয়, ভালো মানুষ নিশ্চয়ই আছে, তাদের খুঁজে বের করাই আসল কাজ। সে আশাতেই হয়তো এখন সবাই ছাদে স্লোগান দিচ্ছে– 'সবাই যেন এককণ্ঠে আশ্বাস দিচ্ছে, দেশ আমার, ভয় নাই' (পৃ. ১৯১)।

উপন্যাসটিতে এ আকাঙ্ক্ষা এবং বাস্তবতার পরিচয় বারবার এসেছে। আন্দোলনকারী নেতা-কর্মীদের মধ্যে ছাত্র-ছাত্রীদের একচ্ছত্র প্রাধান্য সত্ত্বেও বলার চেষ্টা আছে যে, ব্যাংকের কেরানি, সরকারি অফিসার কিংবা সাধারণ মানুষের মধ্যে ছাত্র-আন্দোলনের প্রতি এক সর্বৈব সমর্থন আছে। কিছু একটা হবে, সে আকাঙ্ক্ষা আছে। অন্যদিকে, বায়ান্নর আন্দোলন যে এই তিন বছরে অনেক বেশি অংশগ্রহণমূলক হয়েছে, বিপুল সংখ্যক মেয়ে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছে এবার, অহেতু নিপীড়নের শিকার হয়ে আন্দোলনের অংশ হয়ে উঠছে রশীদ চৌধুরীর মতো অরাজনৈতিক ছাত্রও, আর 'আসছে ফাল্গুনে' দ্বিগুণ হওয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করছে আন্দোলনকারীরা– সে প্রসারণ নিঃসন্দেহে জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষারই সাফল্য।

কবর নাটকে অতটা নয় কিন্তু *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসে জাতীয়তাবাদী বিভাজন ও অপরায়ণটা বেশ স্পষ্ট হয়ে গেছে। 'ওদের' অন্যায় ও জুলুমই বিভাজনের উৎস। স্বাভাবিক মানবিক জীবনের আকাঙ্ক্ষা ও সে আকাঙ্ক্ষায় রাষ্ট্রপক্ষের অন্যায় বাধার কথা বারবার বলা হয়েছে। একেবারে শেষ দৃশ্যে রাষ্ট্রপক্ষকে পরোক্ষে 'বিদেশি' আখ্যা দেয়ার মধ্য দিয়ে ঘটেছে তার চূড়ান্ত প্রকাশ। এখানে আবার সেই মাঠের উল্লেখ করা হয়েছে। একশ বছর আগের কাহিনির সাথে মিলিয়ে লেখক যে ভাষায় বর্তমান ঘটনার বর্ণনা দিয়েছেন, তাতে তাঁর মনোভঙ্গি মোটেই গোপন থাকেনি: 'যেখানে এককালে সেই একশো বছর আগে দেশী সিপাহীরা বিদ্রোহ করেছিল বিদেশি বেনিয়াদের বিরুদ্ধে' (পৃ. ২১০)।

তবে জাতীয়তাবাদী 'অপরায়ণ' যেন একমাত্রিক 'আমরা'র অন্ধ গলিতে বিপথগামী না হয়, সে ব্যাপারে লেখক সতর্ক ছিলেন বলেই মনে হয়। সীমান্তের ছেলে ওসমান খানকে প্রতিবাদী ছাত্রদের তালিকায় যোগ করে লেখক জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতার দিকেও আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। 'ছাত্রদের বেপরোয়া মারতে দেখে সে আর স্থির থাকতে পারলো না। বারান্দা থেকে লাফ দিয়ে ঝাঁপিয়ে পড়লো পুলিশের মাঝখানে। ইয়ে সব ক্যায় হোতা হ্যায়, হামলোগ ইনসান নাহি হ্যায়'– বলে পুলিশকে জড়িয়ে ধরে মাটিতে গড়িয়ে পড়ে ওসমান খান (পৃ. ২০১)।

ওসমান খানের উর্দুসমেত এ আন্দোলনে যোগদান এভাবে এক ভিন্ন বাস্তবতার দিকে আমাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। ভাষা ও জাতীয়তার প্রশ্নটিকে জটিলতাসহ ভাবতে উদ্‌বুদ্ধ করে। ঐতিহাসিক তথ্য-উপাত্তও অবশ্য এ দৃষ্টিভঙ্গির অনুকূল। ঢাকার সর্দাররা এ আন্দোলনে সমর্থন জানিয়েছিল, আর এ আন্দোলন ঢাকার উর্দুভাষী জনগণের সমর্থনও লাভ করেছে। তাছাড়া, পুরো আন্দোলনে বরাবরই এ দাবিই উচ্চারিত হয়েছে যে, একমাত্র বাংলা নয় বরং উর্দুর পাশাপাশি বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হোক।[৫] *আরেক ফাল্গুন* তার জাতীয়তাবাদী জোশের মধ্যেও সে বাস্তবতার স্থান-সংকুলান করেছে।

৪

উপরে রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের যে পরিচয় দেওয়া হয়েছে, তার বাইরেও এমন অনেক প্রসঙ্গ আছে, যেগুলো সামগ্রিক অবস্থানের নিগূঢ় পরিচয়ের জন্য খুব জরুরি। অন্যভাবে বলা যায়, মানুষের ব্যষ্টিক-সামষ্টিক যাপিত জীবনের পটভূমিতে যখন এ ধরনের বিষয়গুলো পরীক্ষিত হয়, তখন রচয়িতার উদ্দিষ্ট 'সত্য'র বাইরেও এমন অনেক 'সত্য' জমে ওঠে, যেগুলো মূল উদ্দিষ্টে ভিন্নকৌণিক আলো ফেলতে পারে। বলা যায়, ওসব এলাকায় রচয়িতার সচেতন সত্তার পাশাপাশি অচেতনও সক্রিয় থাকে। পাঠ-ক্রিয়ায় সচেতন অনুসন্ধানের মধ্য দিয়ে তার কার্যকর স্বরূপ উন্মোচন করা সম্ভব।

যেমন, প্রশ্ন তোলা যায়, ভাবাদর্শিক উপাদান হিসাবে 'ধর্ম' এ দু'টো টেক্সটে কী ধরনের গুরুত্ব পেয়েছে। পাকিস্তান আমলের রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্প পর্যালোচনায় এ প্রশ্নের গুরুত্ব এই যে, ইসলাম রাষ্ট্রটির ঘোষিত ভাবাদর্শ হিসাবে বিশেষভাবে ব্যবহৃত এবং অপব্যবহৃত হয়েছে। পূর্ব-পাকিস্তান তথা পূর্ব-বাংলা মুসলমান-প্রধান এলাকা হওয়ায় এবং সাতচল্লিশ-পূর্ব রাজনীতিতে 'ধর্ম' বর্গের অধীনে এ অঞ্চলের সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষ পাকিস্তান আন্দোলনকে সমর্থন করায়, এখন নতুন জাতীয়তাবাদী বয়ানে ওই বর্গের অবস্থান বিশেষভাবে কৌতূহল-উদ্দীপক হয়ে ওঠে।

দুটি টেক্সটের ক্ষেত্রেই মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠীর উপর 'মাত্রাতিরিক্ত' নির্ভরতাও এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন হিসাবে হাজির হতে পারে। তৎকালীন বাংলাদেশের জনমিতির বিবেচনায় শিক্ষিত নাগরিক মধ্যবিত্ত জনগোষ্ঠী দেশের সামগ্রিক জনগোষ্ঠীর প্রতিনিধিত্ব কীভাবে, কতটা করে, সে প্রশ্ন মোটেই অমূলক নয়।

কবর ও *আরেক ফাল্গুন*-এর ক্ষেত্রে আরেকটি প্রশ্নও খুব প্রাসঙ্গিক। গ্রন্থ-দুটির লেখক যথাক্রমে মুনীর চৌধুরী এবং জহির রায়হান বলেই। মুনীর চৌধুরী বামপন্থি রাজনীতি খুব বেশিদিন করেননি; তবে যখন করেছেন, 'ভীষণভাবে করেছেন'। এ রাজনীতির জন্যই তিনি ১৯৪৮ সালে কারাবাস করেন (রফিকুল, ১৯৭২ পৃ. ১১-১২)। অন্যদিকে, জহির রায়হানের উক্ত রাজনৈতিক অবস্থান শেষ পর্যন্ত কম-বেশি অক্ষুণ্ন ছিল। দুটি টেক্সটেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সেক্ষেত্রে প্রশ্ন দাঁড়ায়, এখানে বামপন্থা ও জাতীয়তাবাদ ঠিক কীভাবে কাজ করেছে এবং এ দু'য়ের আপসরফা কীভাবে হয়েছে? সার্বিক মতাদর্শিক বিবেচনায় এ দু'য়ের বড়ো ধরনের বিরোধ আছে। আর সে কারণেই ঢাকার বিশেষ বাস্তবতায় এ দুই টেক্সটে এ দু'য়ের সহাবস্থান কীভাবে, কতটা ঘটেছে, সে পর্যালোচনার বিশেষ তাৎপর্য আছে।

৪.১

দুটি টেক্সটের জন্যই রাজনৈতিকতার খুব স্পর্শকাতর এলাকা ছিল ধর্ম। পাকিস্তান রাষ্ট্রটি ধর্মের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত হয়– স্পর্শকাতরতার এটাই একমাত্র কারণ নয়। বরং সত্য এই যে, ক্রমশ রাষ্ট্রটি তার প্রায় একমাত্র 'ইডিয়লজিকেল স্টেট অ্যাপারেটাস' হিসাবে ধর্মকে প্রতিষ্ঠা দিচ্ছিল। এমতাবস্থায় ছদ্ম-আদর্শিকতার এ বর্গটিকে সমস্যায়িত না করে পাকিস্তান রাষ্ট্রের কোনো মর্মগত সমালোচনা দাঁড় করানো আসলে অসম্ভব। অপরদিকে, জনজীবনের ধার্মিকতা এবং ধর্মের 'প্রকৃত' আদর্শিক বয়ান এর ফলে যেন ক্ষুণ্ন না হয়, সেদিকেও কড়া নজর রাখতে হয়েছে। তবে এ ব্যাপারে দুই টেক্সটের মোকাবেলার ধরন একরকম নয়।

কবর নাটকের সংলাপে প্রযুক্ত হাস্যরস ও ব্যঙ্গ রাষ্ট্র-ক্ষমতার কুশীলবদের ভালোভাবেই স্পর্শ করেছে। মদ্যপানের কথাই ধরা যাক। স্পষ্টতই, মদ্যপান নাটকটির অন্যতম প্রধান কলা ও কৌশল। এ অর্থে যে,

কেবল অবিশ্বাস্য পরিমাণে মদপান করিয়েই দু'জনের সামষ্টিক হেলুসিনেশন সম্ভবপর হয়েছে। কিন্তু উপরি হিসাবে ক্রমাগত মদপান অন্য নানা মাত্রাও তৈরি করে। যে রাষ্ট্রের নেতারা ইসলামকে মতাদর্শিক অস্ত্র হিসাবে ব্যবহার বা অপব্যবহার করে রাষ্ট্রশাসন করে, তাদের মদ্যপ-দশা নিঃসন্দেহে মঞ্চে এক কমিক আবহ তৈরি করে। পুলিশ-প্রশাসক হিসাবে হাফিজও এর বাইরে থাকে না।

তবে, পাকিস্তান রাষ্ট্রের ঘোষিত রাষ্ট্রাদর্শটি যে আদতে কপটাচার, সে সত্য তুলে আনতে নাট্যকার মোটেই ইতস্তত করেননি। কাজটা তিনি প্রথমে করেছেন 'অশিক্ষিত' কিন্তু স্বাভাবিক ধর্মজ্ঞানে স্নাত গোরখোদকদের দিয়ে। তারা প্রশ্ন তুলেছে মৃতের ধর্মীয় কৃত্যের অধিকার নিয়ে। স্পষ্টতই রাষ্ট্রতন্ত্র সে অধিকার দিতে সম্মত ছিল না। তদুপরি এমন কোনো লক্ষণও প্রকাশিত হয়নি, যাতে মনে হতে পারে, ব্যাপারটাকে তারা গুরুতর মনে করে। তবে পরিস্থিতির কারণে সেদিকে অগ্রসর হতে পারছে না। 'একটা বড়-মতোন গর্ত করে সবগুলো তার মধ্যে ঠেসেঠুসে পুরে মাটি চাপা দিয়ে দিলেই হয়' (পৃ. ৪১) –ইন্সপেক্টর হাফিজের এ প্রস্তাব আর নেতার সোৎসাহ সমর্থন তাদের সে ধর্মনীতিহীন অবস্থানকেই সামনে নিয়ে আসে। উল্লেখ্য, মৃতের সৎকার মুনীর চৌধুরীর *রক্তাক্ত প্রান্তর* নাটকেরও অন্যতম নির্ণায়ক বর্গ। তবে ওই নাটকে যেমন, তেমনি *কবর* নাটকেও বর্গটি ধর্মীয় পোশাক ছেড়ে আশ্রয় নিয়েছে নিখিল মানবাধিকারের বর্গে। এভাবে ধর্মীয় বর্গের, বলা যায়, সেক্যুলারায়ন ঘটেছে, আর মানবিকতার নিক্তিতেই পাকিস্তানি রাষ্ট্রপক্ষের সমালোচনা সম্ভবপর হয়েছে।

এর পরেই সামনে আসে মুর্দা ফকির। চরিত্রটি নিঃসন্দেহে লেখকের কাঙ্ক্ষিত অবস্থানের প্রতিনিধি এবং বিবেক ধরনের চরিত্র। তার পরিচয় দিতে হাফিজ বলেছে: 'লোকটা এমনিতে ভালো লেখা-পড়া জানে। ভালো আলেম...' (পৃ. ৪৩)। মুর্দা ফকিরের পরিচয়ে 'আলেম' শব্দটির প্রয়োগ একেবারেই জরুরি ছিল না। স্পষ্টতই আদর্শিক বুলি হিসাবে রাষ্ট্রপক্ষের ধর্ম-ব্যবহারের বিপরীতে এই 'আলেম' শব্দটি আরেকটি বর্গ খাড়া করে, যেখানে ধর্মের স্বাভাবিক আদর্শিকতা রক্ষিত হয়েছে এবং যা মানবিক অবস্থানের রক্ষক। এভাবে তা পরোক্ষে গণতান্ত্রিক বুর্জোয়া রাজনীতির সঙ্গেও সঙ্গতি রক্ষা করে।

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে ধর্মীয় অনুষঙ্গ আন্দোলনের কর্মসূচি হিসাবেই উপস্থিত হয়েছে। একুশে ফেব্রুয়ারির পরে অন্যতম কর্মসূচি হিসাবে গায়েবি জানাজা পড়া হয়। আর উপস্থিত জনতার মুখে পাকিস্তান রাষ্ট্রের নিপীড়নের জন্য খোদার কাছে আহাজারি শোনা যায়: 'গায়েবি জানাজা পড়ার জন্য সমবেত হয়েছিল ওরা। আর বুড়ো ইমাম সাহেব মোনাজাত করতে গিয়ে ডুকরে কেঁদে উঠে বললেন, যারা আমাদের কচি ছেলেদের গুলি করে মারলো, খোদা তুমি তাদের ক্ষমা করো না' (পৃ. ১৭৭)।

আন্দোলনের আরেকটি কর্মসূচি রোজা রাখা। কর্মসূচি হিসাবে এর কৌশলগত সুবিধা খুবই চমৎকার। একদিকে ধর্ম যেহেতু পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রধান ভাবাদর্শ, তাই ধর্মীয় অনুষঙ্গ আন্দোলনকারীদের সামাজিক গ্রহণযোগ্যতা তৈরির ক্ষেত্রে খুবই কার্যকর ভূমিকা রাখতে পারে। আবার সামষ্টিক কর্মসূচি হিসাবেও তা খুব অংশগ্রহণমূলক এবং আন্তরিক। লক্ষণীয়, এ কর্মসূচি আন্দোলনকারীরা খুব আন্তরিকভাবেই পালন করেছে। সেহরি না খেয়েও রোজা রেখেছে অনেকে, কিন্তু রোজা রাখার কপটতা করেনি। মালতি বলেছে, এখানে যারা রোজা রেখেছে তারা না খেয়েই রেখেছে। 'রোজা রেখেছিল শুনলে অমনি চাকরি নট হয়ে যাবে' (পৃ. ১৮৪)। রোজা রাখায় চাকরি যাবে– এ ভাষা নিশ্চয়ই রাষ্ট্র-কাঠামোর উপর বড়ো ধরনের চাপ তৈরি করে।

তবে, দুই টেক্সটের কোনোটিতেই দৈনন্দিন চর্চার অংশ হিসাবে বা জনজীবনে ধর্মপালনের ব্যাপারটি প্রাধান্য পায়নি। এমনকি রাষ্ট্রপক্ষীয় 'ভিলেন'দের মধ্যেও এ বস্তু দেখা যায়নি। নবাগত যে নতুন স্পর্শকাতরতা,

মূল্যবোধ এবং জীবনবীক্ষা *কবর* ও *আরেক ফাল্গুন*'-এর কাঙ্ক্ষিত জনগোষ্ঠীর মূল স্বভাব, তার সাথে এ অনুপস্থিতির যোগ থাকা অসম্ভব নয়। আমরা এখন সে জনগোষ্ঠীর খবর নেব।

৪.২

কবর নাটকের সংলাপে মূর্ত ভাষিক তাৎপর্যের এক মাত্রা এই যে, 'প্রমিত' বাংলা এখানে আধুনিক ও প্রগতিপন্থি তরুণদের ভাষা হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হয়েছে। নেতা ও হাফিজের ফারসি-আরবি ও সামন্তগন্ধী ভাষার বিপরীতে মুর্দা ফকির ও শহিদ তরুণদের শব্দ আর ভাষারূপ প্রণয়নে ব্যতিক্রমহীনভাবে 'প্রমিত' বাংলার প্রশ্রয় এ তাৎপর্যকে দ্বিধাহীনভাবে প্রতিষ্ঠা দেয়। হাফিজের দুটি সংলাপ উদ্ধৃত করে শব্দ-ব্যবহার ও ভাষারূপের ভাবাদর্শিক প্রকাশ দেখানো যাক।

বিশ্বাসী লোকের অভাব প্রসঙ্গে নেতার আফসোসের জবাবে হাফিজ বলে: 'সব একেবারে হারামীর বাচ্চা। বেতনটাকে পাওনা দাবী হিসেবে আদায় করতে চায়, নিমক বলে মানে না' (পৃ. ৩৯)। আবার রাতের এ গোপন মিশনে গার্ডের মতো উটকো লোক নিয়ে আসা ঠিক হয়নি– এ মতের পক্ষে যুক্তি হিসাবে সে বলে: 'তবু কিছু কাজ আছে স্যার, যা বিবির সামনেও বেপর্দা করতে নেই' (পৃ. ৩৯)। দুটি সংলাপেই শব্দরূপের বাহ্য অবয়ব খুব স্পষ্ট। কিন্তু গভীর-স্তরে প্রযুক্ত শব্দের সাথে সম্পর্কিত ডিসকোর্স উপস্থিত হয় রাজনৈতিকতা ও রাষ্ট্রকল্পের একেবারে অন্দরমহলের খবরসহ। প্রথম সংলাপের 'নিমক' কথাটাই ধরা যাক। শব্দটি আন্তঃব্যক্তি-সম্পর্কের যে ধরন সাব্যস্ত করে, তা নিঃসন্দেহে আধুনিক-পূর্ব, আর রাষ্ট্রের সাথে নাগরিকের সম্পর্কের ক্ষেত্রে ব্যবহৃত হওয়ায় এবং একজন পুলিশ অফিসারের মুখে ব্যবহৃত হওয়ায় তা খোদ রাষ্ট্রেরই চিহ্নায়ক হয়ে দাঁড়ায়। দ্বিতীয় সংলাপের 'বিবি' ও 'বেপর্দা' কথা দুটি সাংস্কৃতিক বার্তায় খুবই ভারাক্রান্ত– অনাধুনিক যদি নাও হয়, মোটেই সর্বজনীন নয়। কিন্তু সংলাপের ভিতর-কাঠামোয় ধৃত সংবাদটি আরো মর্মান্তিক। রাষ্ট্রীয় কাজে বিশেষ গোপনীয়তা রক্ষা করতে হয়– এ সংজ্ঞাপন এর লক্ষ্য নয়; লক্ষ্য আসলে এক অবৈধ কর্মযজ্ঞের ব্যাপারে নিজেদেরই স্বীকৃতি। লক্ষণীয়, মৃত তরুণ ও মুর্দা ফকিরের সংলাপে এ ধরনের শব্দ নেই; আর যদি অনুরূপ শব্দ থাকেও, তা কিছুতেই সমরূপ তাৎপর্যে ব্যবহৃত হয়নি।

হুমায়ুন আজাদ লক্ষ করেছেন (২০১২, পৃ. ২৭৮-৭৯), একুশের অন্যতম প্রধান তাৎপর্য এই যে, এটি বাংলাদেশের বাংলা ভাষাকে পরিস্রুত করেছে। এ বিবৃতি 'ভাষারূপের স্বৈরতন্ত্রের সম্ভাবনা'র দিক থেকে যতই সমস্যাপূর্ণ হোক না কেন, *কবর* নাটকের পূর্বোক্ত ভাষা-চৈতন্য আজাদের কথাকে সম্পূর্ণরূপে অনুমোদন করে।

কিন্তু সেক্ষেত্রে সমস্যা তৈরি হয় অন্য জায়গায়। নাটকে নিম্নবর্গের প্রতিনিধি হিসাবে উপস্থিত গার্ডের সংলাপে ব্যবহৃত কথ্য-আঞ্চলিক বাংলা এক গভীর অপরায়ণের সুযোগ তৈরি করে দেয়। শুধু বাস্তবতা রক্ষার তাগিদ দিয়ে এ ধরনের ভাষা-নির্বাচনকে ব্যাখ্যা করা যাবে না। কারণ, নাগরিক পরিসরে কাজ করা একজন গার্ডের জন্য সরল নাগরিক কথ্য বাংলা বাছাই করা– অন্তত কেতাবি শব্দ ও ভঙ্গি বাদ দিয়ে, মোটেই অস্বাভাবিক হতো না। কোনো সন্দেহ নাই, গার্ডের সংলাপের জন্য ব্যবহৃত এ ভাষারূপ গৃহীত হয়েছে একদিকে সংলাপে বৈচিত্র্য তৈরির অনুরোধে, অন্যদিকে হাস্যরস সৃষ্টির অভিপ্রায়ে। নাটকটির রসগত বৈচিত্র্যের জন্য এবং 'কমিক রিলিফ'র জন্য এ নির্বাচন যথেষ্ট কার্যকর হয়েছে। কিন্তু 'প্রমিত' বাংলা প্রকল্পিত রাষ্ট্রের প্রতীকী বৈশিষ্ট্য হিসাবে প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় নিম্নবর্গের মানুষদের জন্য ওই রাষ্ট্রে 'অপরায়ণে'র একটা বড়ো সুযোগ তৈরি হয়ে যায়।

বস্তুত, বায়ান্নকেন্দ্রিক রাষ্ট্রপ্রকল্পের যেসব মূর্তি আমরা জাতীয়তাবাদী বয়ানে বা সৃষ্টিশীল চর্চায় প্রতিষ্ঠিত দেখি, তার প্রায় সবটাতেই এ সংকট বিদ্যমান। আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী হিসাবে কোথাও কোথাও শ্রমিকশ্রেণির উপস্থিতি আছে সত্য কিন্তু নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্তের স্বরের প্রতাপে সেখানে শ্রমিক বা নিম্নবর্গের অন্য কারো স্বর উচ্চকিত হওয়া দূরের কথা, সমান্তরাল স্বর হিসাবেও শ্রুত হয়নি। আদতে 'একুশের ও তার পরের সমস্ত আন্দোলনে তারাও যোগ দিয়েছে, যাদের বলা হয় 'সাধারণ মানুষ'। কিন্তু ওই সাধারণ মানুষের স্বপ্ন, আকাঙ্ক্ষা, স্বার্থ কখনোই বড়ো হয়ে ওঠেনি। তাই একুশ আমাদের দিয়েছে একগুচ্ছ মধ্যবিত্ত চেতনা' (আজাদ, ২০১২, পৃ. ২৭২)। *কবর* নাটকের মতো এ সংকট *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের রাষ্ট্রকল্পেও সুস্পষ্টভাবে উপস্থিত।

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসের জগৎ বিশুদ্ধত নাগরিক শিক্ষিত মধ্যবিত্ত ও উচ্চমধ্যবিত্তের জগৎ। রাজনৈতিক তৎপরতার বিচারে ব্যাপারটা আরো সংকীর্ণ হয়ে কেবল শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মধ্যেই সীমিত থেকেছে। স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে কবি রসুল ও মুনিম বায়ান্নের আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত সর্বশ্রেণির মানুষদের কথা বলেছে বটে, তবে তাতে ছাত্রদের কেন্দ্রিকতা মোটেই ক্ষুণ্ন হয়নি। আবার, তিন বছর পরের অর্থাৎ পঞ্চান্ন সালের আন্দোলনে পূর্বতন অভিজ্ঞতা সঞ্চারিত হতে দেখা যায় না। দু-একবার কর্মজীবী মানুষদের সমর্থনের ও আকাঙ্ক্ষার কথা উচ্চারণ করা হলেও তৎপর মানুষদের মধ্যে তাদের কাউকে দেখা যায়নি। তারচেয়ে বড়ো কথা, আন্দোলনের কর্মসূচি ও কাঠামোর মধ্যে অন্যদের অংশগ্রহণের কোনো সুযোগও ছিল না।

উপন্যাসের শুরু থেকে একেবারে শেষ পর্যন্ত রাজনৈতিক কর্মসূচির সাথে সাধারণ জনগণের প্রকট বিচ্ছিন্নতার পরিচয় পাওয়া যায়। শুরুর দৃশ্যেই দেখা যায়, মুনিম ভিক্টোরিয়া পার্কের পাশ দিয়ে হেঁটে যাচ্ছে। ধোপদুরস্ত জামা-কাপড়ের সাথে তার খালি পা এক প্রচণ্ড বিসদৃশ দৃশ্য তৈরি করে। লেখক এ বাবদ কিছু সময় ব্যয় করেছেন, প্রধানত চারপাশের মানুষজন এ দৃশ্যে কীভাবে সাড়া দিচ্ছিল তার বর্ণনা করতে গিয়ে। লোকেরা অনেকগুলো অনুমান করেছে। যা তাদের অভিজ্ঞতার মধ্যে ছিল, তার সবই সেখানে এসেছে। কিন্তু একটা রাজনৈতিক কর্মসূচি হিসাবে জুতা না-পরার তথ্যটা তারা কেউই জানত না। ঘটনাটা ঘটেছে তখনকার ঢাকার একেবারে প্রাণকেন্দ্রে– ভিক্টোরিয়া পার্ক থেকে নবাবপুর রোড পর্যন্ত জায়গায়। গুলিস্তান পৌঁছাতে পৌঁছাতে তাদের সংখ্যা দশে উন্নীত হয়। এ দীর্ঘ গমনপথে মুনিমদের খালি পায়ে থাকার কারণটা একটা লোকেরও জানা ছিল না– এ তথ্য জনবিচ্ছিন্নতার দিক থেকে খুব নির্মম এক সত্য প্রকাশ করে। গুলিস্তান এলাকায় একত্র হওয়ার পরে তাদের কেউ কেউ যে বলছিল, একা হাঁটার সময় তাদের ভয় লাগছিল, সে ভয় নিশ্চয়ই কেবল পুলিশের নয়, চারপাশের সাথে সম্পর্কহীনতারও। সমকালীন রাজনীতির চিত্র হিসাবে এটা আংশিকতার লক্ষণাক্রান্ত হতেও পারে কিন্তু লেখকের দৃষ্টিভঙ্গির মধ্যবিত্তকেন্দ্রিকতায় কোনো ভুল হওয়ার সুযোগ নাই।

আরেক ফাল্গুন'-এর রাজনৈতিকতায় 'বাবা-সন্তান' অর্থাৎ প্রজন্ম-ব্যবধান একটা খুব গুরুতর ব্যাপার। নতুন প্রজন্ম নতুন দিনের চাহিদা ও রুচির পক্ষে শক্ত অবস্থান নিতে পারে, যা পুরনো প্রজন্ম পারে না বা পারার কথা নয়– এ ধরনের এক পুনরাবৃত্ত দাবি দেখা যায় এ উপন্যাসের বয়ানে। পিতৃহীন সালমার চাচা এর এক প্রমাণ। আসাদও ব্যতিক্রম নয়। আসাদের 'ঘরে মা নেই, বাবা আছেন' (পৃ. ১৮৪)। 'রাজনীতি করা' নিয়ে আসাদের সাথে বাবার গোলমাল। বাবা এমনকি তাকে সাজা দেওয়ার জন্য খরচপত্রও বন্ধ করে দেয়।

সালমার চাচার দৃষ্টিভঙ্গি খুবই স্পষ্ট। যে সময়টা নিজের ক্যারিয়ার গড়ার বয়স, তখন দেশের বা দশের নামে জেলে পচে মরলে পরে কে তাদের দেখবে? কিন্তু আসাদের ক্ষেত্রে 'রাজনীতি করা'টা ঠিক অত সরল মামলা নয়। বামপন্থি বা সরকার-বিরোধী রাজনীতির কোনো ইশারা কি এখানে আছে? তৎকালীন বাস্তবতার সাপেক্ষে তা অসম্ভব নয়। কিন্তু যে কথাটা জোর দিয়ে বলা যায় তা দৃষ্টিভঙ্গি সংক্রান্ত। বলা হয়েছে, এ তরুণরা কাজ করছে দেশের জন্য। তাহলে তাদের বাবারা কি দেশের জন্য কাজ করতেন না, বা দেশের জন্য কাজ করার গুরুত্ব বুঝতেন না? স্পষ্টতই এ এক নতুন দেশ, যার মর্মার্থ কেবল নতুন প্রজন্মই বুঝতে পারবে। তদুপরি, এর সাথে শিক্ষার অনিবার্য যোগ। নিঃসন্দেহে, জহির রায়হানের বাম প্রকল্পই বলি, আর জাতীয়তাবাদী আকাঙ্ক্ষা– সর্বত্র 'ছাত্র-ছাত্রী'দের প্রবল প্রতাপের অন্যতম কারণ এই 'আধুনিক' শিক্ষাজনিত নতুন ধ্যান-ধারণা।

যদি বিচ্ছিন্ন ঘটনা হিসাবে একুশে ফেব্রুয়ারিকে দেখা হতো, তাহলে এসব প্রশ্ন এত গুরুতর হয়ে উঠত না। কিন্তু তা তো নয়। দুটি পুস্তকেই সঙ্গতভাবেই ফেব্রুয়ারির ভাষা-আন্দোলনকে বৃহত্তর পটভূমিতে দূরসঞ্চারী ঘটনা হিসাবেই চিহ্নিত-চিত্রিত করা হয়েছে। *কবর* নাটকের চিহ্নায়নে জাতীয়তাবাদ প্রকট না হলেও সামষ্টিক অভীপ্সা এবং নতুন দিনের নতুন রাজনীতির প্রস্তাবনা অত্যন্ত পরিষ্কারভাবে হাজির। আর *আরেক ফাল্গুন*'-এর রাজনীতি তো ঘোষিতভাবেই জাতীয়তাবাদী। কাজেই শ্রেণি ও গোষ্ঠীগত সংকীর্ণতার যে-কোনো আলামত এখানে রাজনৈতিক তাৎপর্য বহন করে।

৪.৩

কবর নাটকে ক্ষমতা-সম্পর্কের একটি বাস্তবতা বিশেষভাবে লক্ষ করার মতো। রাষ্ট্রতন্ত্রের বিরুদ্ধে যে প্রবল সংগ্রামে লিপ্ত হয়েছে মুখ্যত ছাত্ররা, তাদের প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সহায়ক হিসাবে মুরব্বি গোছের মানুষজন থাকার কথা। ক্ষমতা-সম্পর্কের বিচারে সমাজের তুলনামূলক ভালো অবস্থানে আছে, এমন মানুষদের একাংশের সমর্থন থাকার কথা। কিন্তু এ নাটকের কোথাও তার ইশারা নাই। সে কারণে পুরো ঘটনার দুই পক্ষ এবং তার মূল্যায়নে এক শয়তান-ফেরেশতা ধরনের বাইনারি তৈরি হয়েছে। এ ধরনের বিভাজন এত নিশ্চয়তার সাথে করা যায় যখন একটি রাষ্ট্রকাঠামোকে তার মতাদর্শিক ভিত্তিসহ নাকচ করা হয়। বুর্জোয়া বা লিবারেল বা গণতান্ত্রিক রাজনীতিতে এটা সম্ভব নয়। যদিও *কবর* নাটকের প্রকল্পিত রাষ্ট্রাদর্শ নিশ্চিতভাবেই 'উদারনৈতিক-গণতান্ত্রিক',[৬] কিন্তু রাজনৈতিক তৎপরতার রূপরেখা থেকে মনে হয়, মুনীর চৌধুরীর বামপন্থি ঝোঁক ওই রূপরেখা প্রণয়নে চেতনে বা অচেতনে বড়ো ধরনের ভূমিকা পালন করেছে।

পারিপার্শ্বিক অবস্থা এবং তথ্য-উপাত্তও এ অনুমানের সহায়ক। পাকিস্তান রাষ্ট্রে কম্যুনিস্ট আন্দোলন কেবল নিষিদ্ধই ছিল না, রাষ্ট্রের সবচেয়ে উল্লেখযোগ্য শত্রুদের অন্যতম হিসাবেও গণ্য হয়েছে। বামপন্থি নেতা-কর্মীরা তাই রাষ্ট্রতন্ত্রকে প্রতিপক্ষ ধরে করা যেকোনো আন্দোলনে ব্যাপকভাবে অংশ নিয়েছিল– সে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনই হোক, আর অসন্তোষজনিত গোষ্ঠীকেন্দ্রিক আন্দোলন হোক। বায়ান্নর আন্দোলনে বামপন্থিদের ব্যাপক অংশগ্রহণ ও নেতৃত্বদান ঐতিহাসিক তথ্য হিসাবেই সর্বজনস্বীকৃতি পেয়েছে। সরকার নিজেই একে 'কমিউনিস্ট ও ভারতীয় এজেন্ট'দের কাজ বলে প্রচার করে (বিশ্বাস, ১৯৮৮, পৃ. ২৯২)। মুনীর চৌধুরী নিজেও এ 'অপরায়ণে'র শিকার হয়েছেন। তাঁর 'দুষ্ট ছেলে', 'ফিট কলাম' ইত্যাদি রচনায় রাষ্ট্রবিরোধী 'দুষ্ট' হিসাবে 'বামপন্থি' তরুণের রাষ্ট্র কর্তৃক এবং সমাজের মুরব্বিদের দ্বারা নিপীড়িত হওয়ার বাস্তবতা ফুটে উঠেছে। *কবর* নাটকে চিত্রিত একুশে ফেব্রুয়ারির এক আন্দোলনকারীর পরিচয় দিতে গিয়ে

নেতা পরিষ্কারভাবে সে উল্লেখ করে: 'জীবিত থাকতে তুমি দেশের আইন মানতে চাওনি। মরে গিয়ে তুমি এখন পরপারের কানুনকেও অবজ্ঞা করতে চাও। কম্যুনিজমের প্রেতাত্মা তোমাকে ভর করেছে, তাই মরে গিয়েও এখন তুমি কবরে যেতে চাও না' (পৃ. ৫২)।

আরেক ফাল্গুন উপন্যাসে এ ধরনের অনুমানের পরিসর আরো ব্যাপক। এখানকার আন্দোলনকারী প্রধান চরিত্রগুলো যে বামপন্থি গোপন রাজনীতির সাথে যুক্ত, তার বিস্তর পরোক্ষ ও আধা-প্রত্যক্ষ ইশারা আছে। মুনিমের রাজনৈতিক আদর্শের উল্লেখ না করেই বজলে তার সম্পর্কে বলেছে, ওর আদর্শকে সে 'ঘৃণা' করে। বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক রাজনৈতিক আদর্শ বজলে অপছন্দ করতে পারে কিন্তু ঘৃণা করার কথা নয়। সালমার স্বামী, ভাই ও বোন সবাই তখন জেলবন্দি। বিশেষত তার স্বামী রওশন প্রসঙ্গে আটচল্লিশের ভাষা আন্দোলন ও পরবর্তীকালীন জেলজীবন সম্পর্কে যা বলা হয়েছে, তাতে তার রাজনীতি চিনতে ভুল হবার জো নাই। *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের ছাত্র-নেতৃবৃন্দ যে বিশেষ দলের সাথে যুক্ত, সম্ভবত কম্যুনিস্ট পার্টির সঙ্গে, তা তাদের চলাফেরা, কর্মসূচি এবং পারস্পরিকতা থেকেই বোঝা যায়। স্পষ্ট করেও বলা হয়েছে দু-একবার। সালমার ছোটো ভাই শাহেদ তার কাছে আসাদের পরিচয় জানতে চায়। ইউনিভার্সিটির ছাত্র শুনে জিজ্ঞাসা করে, 'তোমাদের দলের লোক বুঝি?' সালমা অস্বীকার করলেও শাহেদ বলে, 'না বললেই হলো। আমি দেখলে চিনি নে যেন' (পৃ. ১৮৯)। আসলেই চেনা যায়। জহির রায়হান যে ভাষা আন্দোলনের এক প্রত্যক্ষদর্শীর প্রতিবেদন রচনা করতে গিয়ে মূল কেন্দ্র হিসাবে বামপন্থিদের দিকেই আলো ফেলেছেন, তাতে কোনো সন্দেহ নাই। প্রশ্ন হলো, এক জাতীয়তাবাদী বয়ানে কঠোর বামপন্থি কর্মীদের জান-বাজি-রাখা সক্রিয়তাকে লেখক কীভাবে আঁটিয়ে ফেললেন? বিপরীতক্রমে প্রশ্ন তোলা যায়, এ বাস্তবতার কারণে কি জাতীয়তাবাদী ভাবধারায় কোনো বিশিষ্টতা সঞ্চারিত হয়েছে?

মুনিমের ফুফাতো বোন জাহানারার অধ্যাপক স্বামী একদিকে মুনিমদের আন্দোলনের সহমর্মী, অন্যদিকে রাজনীতির হালচাল সম্পর্কে তীক্ষ্ণভাবে সচেতন। তার সাথে মুনিমের কথোপকথনে রাজনৈতিক কাঠামো সম্পর্কে বেশ পরিচ্ছন্ন ধারণা পাওয়া যায়। মুনিম এবং অধ্যাপক একমত হয়, নেতারা এ আন্দোলনে সমর্থন দেবে না। তারা কেবল ক্ষমতা-দখলের জন্যই রাজনীতি করে। তাদের লক্ষ্য রাজনীতিকে ব্যবহার করে আখের গোছানো। মুনিম বায়ান্নের স্মৃতিচারণে গায়েবি জানাজা আর 'সমুদ্রের মতো' মিছিলের কথা স্মরণ করে। তখনো 'নেতারা কেউ ছিলেন না'। আগের মতো এবারের আন্দোলনেও মুনিমরা নেতাদের সহযোগিতা চেয়েছে। কিন্তু ওরা ভয়ে পিছিয়ে গেছে। বিব্রত গলায় অনুরোধ করেছে, মুনিমরা যেন সাংঘাতিক কিছু করে না বসে। যেন শান্তি ভঙ্গ না করে। উনিশশ পঞ্চান্ন সালের এ আলাপের আগেই চুয়ান্নর নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট সরকার গঠিত হয়েছে এবং তা বাতিলও হয়েছে। তবু, ওই সরকারের নেতৃবৃন্দের প্রতি এতটা নিরাসক্তি কেবল তখনি থাকতে পারে, যখন মতাদর্শিকভাবে তার সাথে বিরোধ থাকে।[৭]

গোপন রাজনীতির যেসব নমুনা এ উপন্যাসে বর্ণিত হয়েছে, তা থেকে নিশ্চিতভাবে বলা যায়, ছাত্রমহলের এ আন্দোলন-সংগ্রামে বামপন্থি ছাত্র-আন্দোলন খুব জোরালোভাবে হাজির ছিল; এমনকি তারাই ছিল নেতৃত্বের ভূমিকায়। কিন্তু এক্ষেত্রে অন্য একটি ঘটনা ঘটেছে। পার্টি-লাইন আর আন্দোলন এ দু'টোর মধ্যে পরিষ্কার ফারাক ঘটে গেছে। আন্দোলনের তুঙ্গ দশায় পার্টি-লাইন বেশ খানিকটা ধূসর হয়ে গিয়ে, বা মুলতুবি হয়ে গিয়ে বড়ো হয়ে ওঠে আন্দোলনের কর্মসূচি। এখানেও দেখা যাচ্ছে, পার্টি-লাইনের ভাষা পরিবর্তিত হয়ে জাতীয়তাবাদী আকার ধারণ করেছে। অধ্যাপক ও মুনিম দু'জনই নেতাদের যে ভাষায় দুষেছেন, তাতে শ্রেণি-রাজনীতির কোনো ইশারা নাই, দু'জনই বরাত দিয়েছেন দেশপ্রেমের আর দেশের মানুষের মুক্তির।

স্পষ্টতই এ ভাষা জাতীয়তাবাদী রাজনীতির। এভাবে বামপন্থা আর জাতীয়তাবাদী রাজনীতি একাকার হয়ে শেষ পর্যন্ত জাতীয়তাবাদী ভাষা-কাঠামোকেই উচ্চকিত করেছে।

তবে কার্যকারণ যাই হোক, বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে নাগরিক পরিসরের যে প্রবল প্রাধান্য, বিশ্ববিদ্যালয় ও শিক্ষার্থী-নির্ভরতা, বামপন্থি উপকরণের বাহুল্য– তার প্রভাব নিশ্চয়ই এখানকার সমকালীন ও পরবর্তী রাজনীতিতে পড়েছে। উনিশশ উনসত্তরে প্রকাশিত *আরেক ফাল্গুন*'-এর ক্ষেত্রে হয়তো আক্ষরিক অর্থে পঞ্চান্ন সালের বাস্তবতা বজায় থাকেনি, কিন্তু আটচল্লিশ থেকে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন এবং ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক পরবর্তী জাতীয়তাবাদী রাজনীতি অন্তত গণ-অভ্যুত্থানের আগে পর্যন্ত এসব বৈশিষ্ট্য দ্বারা যে প্রবলভাবে প্রভাবিত ছিল, তার জোরালো পরিচয় পাওয়া যায় এসব সাহিত্যকর্মে।

৫

সাতচল্লিশ থেকে একাত্তর পর্যন্ত বাংলাদেশের প্রায় প্রথম দিকের এবং প্রায় শেষ পর্যায়ের রাজনৈতিক সংবেদনশীলতার পরিচয় পাওয়া যায় *কবর* এবং *আরেক ফাল্গুন*-এ। ভাষা আন্দোলন এ সময়খণ্ডের সবচেয়ে প্রভাবশালী ঘটনা হওয়ায় এবং রাজনীতির অভিমুখ-নির্ধারক প্রধান ঘটনা হওয়ায়, এ আন্দোলনকেন্দ্রিক সাহিত্যকর্ম দুটিতে ওই সময়ের বাংলাদেশের রাজনীতি, রাজনৈতিকতা এবং রাষ্ট্রকল্পের কিছু বুনিয়াদি ধারণার প্রকাশ ঘটেছে। তাতে মুখ্যত এক নিপীড়ক রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে লড়াইরত নিপীড়িত মানুষের ছবি পাওয়া যায়। 'আমরা' আর 'ওরা'– এ দুই সুস্পষ্ট ভাগের আওতায় দুই পক্ষের কর্মসূচি ও তৎপরতা চিহ্নিত হওয়ায় অন্তত নিপীড়িত পক্ষের রাজনীতি যে সম্পূর্ণরূপে জাতীয়তাবাদী চরিত্র পরিগ্রহ করেছিল, তাতে কোনো সন্দেহ নাই।

দুটি টেক্সটেই নিপীড়ক রাষ্ট্রের যে প্রতিচ্ছবি নির্মিত হয়েছে তাতে আধুনিক, গণতান্ত্রিক ও মানবিক প্রত্যয়গুলোর অনুপস্থিতিই প্রধান হয়ে উঠেছে। এ রাষ্ট্রের বিপরীতে সংগ্রামরত মানুষের মধ্যে পাওয়া যায় ওইসব সংবেদনশীলতা, যেগুলোকে এক নামে গণতান্ত্রিক-বুর্জোয়া রাষ্ট্রের মূল্যবোধ বলতে পারি। কাজেই পার্টি-সংগঠন ও কর্মসূচির মধ্যে প্রত্যক্ষত উল্লিখিত না হলেও প্রকল্পিত রাষ্ট্রকে এ নামেই চিনতে পারা যায়।

জাতীয়তাবাদী আবেগ-অনুভূতিতে জোরারোপ সত্ত্বেও দুটি টেক্সটই নিজ নিজ ধরনে জাতীয়তাবাদী সংকীর্ণতা কাটিয়ে ওঠার ব্যাপারে তৎপর ছিল। *কবর* নাটকে তেতাল্লিশের মন্বন্তর-প্রসঙ্গ এবং মুর্দা ফকিরের জীবন-মৃত্যুর নতুন সংজ্ঞায়ন ওই প্রসারতার দিকেই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। তুলনামূলক 'অধিক জাতীয়তাবাদী' টেক্সট *আরেক ফাল্গুন* একদিকে উর্দুভাষী চরিত্রকে আত্মীকৃত করে রাজনৈতিকতার সীমা প্রসারিত করে, অন্যদিকে আবার নাগরিক মধ্যবিত্ত আবহে বিকশিত নতুন প্রজন্মের বড়ো প্রেক্ষাপটকে উচ্চকিত করার মধ্য দিয়ে রাজনৈতিকতার অনুভূতিতে ভিন্ন মাত্রা সঞ্চারিত করে। দুটি টেক্সটই পাকিস্তানের রাষ্ট্রীয় ভাবাদর্শের পরিপ্রেক্ষিতে ইসলাম-প্রশ্ন নিয়ে নিজের আওতার মধ্যে লিপ্ততা দেখিয়েছে।

তবে মধ্যবিত্ত-নির্ভরতা এবং বিশেষত ছাত্র-নির্ভরতা দুটি রচনার ক্ষেত্রেই আন্দোলন-সংগ্রামের এক দুরপনেয় ঘাটতির ইশারা দেয়। তাছাড়া, বামপন্থা ও বুর্জোয়া-গণতান্ত্রিক আকাঙ্ক্ষার মধ্যে কোনো সন্তোষজনক মীমাংসাও এসব রচনায় প্রস্তাবিত হয়নি। দু'টো রচনাই পাঠককে এমন ভাবতে প্রলুব্ধ করে যে, পাকিস্তান রাষ্ট্রে গোপন রাজনীতিতে বাধ্য হওয়া বামপন্থিরা 'রাষ্ট্র-বিরোধী' কর্মসূচিতে নিজেদের মতো করে অংশ নিয়েছে এবং নেতৃত্ব দিয়েছে; তবে সামগ্রিক ভাব-ভাষায় জাতীয়তাবাদী প্রচণ্ড টান তাদের কর্মকাণ্ডকে শেষ

পর্যন্ত আকারে-প্রকারে জাতীয়তাবাদী সুরত গ্রহণে বাধ্য করেছে। এ ব্যাপারে লেখকদের বিশেষ আপত্তি হয়তো ছিল না। তার এক প্রমাণ এই যে, 'রাষ্ট্রভাষা' দাবির তুলনামূলক সূক্ষ্ম এলাকা পরিহার করে দুটি টেক্সটই 'মায়ের ভাষা' লজ ব্যবহার করেছে, আর রাষ্ট্রীয় নিপীড়নের মূল ক্ষেত্র হিসাবে 'মায়ের ছেলে' বর্গটিকেই উচ্চকিত করেছে। একুশে ফেব্রুয়ারি-আন্দোলনে দাবির বৈচিত্র্য যতই থাকুক, আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক দিগন্তে তার দাবি যতই প্রসারিত হোক, পূর্ব বাংলার জাতীয়তাবাদী সুর সেখানে প্রধান হয়ে উঠতে এক মুহূর্তও দেরি হয় না। আলোচ্য টেক্সট দুটিও বস্তুত গভীরভাবে তারই সাক্ষ্য বহন করছে।

টীকা

১. *কবর* নাটকের পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশিত হয়েছে (চৌধুরী, ১৯৮২ থেকে)।

২. *আরেক ফাল্গুন* উপন্যাসের পৃষ্ঠা-সংখ্যা নির্দেশিত হয়েছে (রায়হান, ২০০৯ থেকে)।

৩. ভাষা আন্দোলনের ঐতিহাসিক বিবরণীগুলোর সাথে মিলিয়ে পড়লে দেখা যায়, *আরেক ফাল্গুন* মোটামুটি বিশ্বস্তভাবে আন্দোলনের ঐতিহাসিকতা রক্ষা করেছে। (বানু, ২০০৮)

৪. মুনীর চৌধুরী নিজেই *কবর* নাটকের বাড়তি তাৎপর্য নির্দেশ করতে গিয়ে বলেছিলেন, 'শুধুমাত্র কবর নাটকটিতে একুশের তাৎপর্য খোঁজা হলে খানিকটা ভুলই বরং করা হবে। হয়তো আরো বেশী কিছু বলার চেষ্টা করেছি আমি।' (ইমাম, ১৯৭৭, পৃ. ১৩৫) এটা খুবই সম্ভব যে, নাট্যকার এখানে নাটকে প্রতিফলিত ভাবাদর্শিক দিকের ইঙ্গিত দিয়েছেন।

৫. 'আমাদের মাইক্রোফোনে উর্দুতেও বক্তৃতা দেওয়া হতো। পরিষ্কারভাবে বুঝানো হয় যে উর্দুভাষার বিরুদ্ধে আমাদের লড়াই নয়, আমাদের দাবী বাংলাভাষার স্বীকৃতির জন্য, গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য।' [আবুল মাল আবদুল মুহিতের স্মৃতিচারণ, সলিমুল্লাহ হলের সুবর্ণ জয়ন্তী স্মরণিকা (৫৬-৫৮ পৃ.) থেকে উদ্ধৃত, বানু, ২০০৮, পৃষ্ঠা, ২৮৪]।

৬. *কবর* নাটকটি বামপন্থি বিপ্লবী রাজনীতির পটভূমিতে পাঠ করেছেন অনেকেই এবং স্বভাবতই সে কাঠামোয় খাপ খাওয়াতে না পেরে হতাশ হয়েছেন (দ্র. জয়নুদ্দীন, ১৯৯৮, পৃ. ৫৬)। বস্তুত, প্রতিরোধ-আন্দোলনের কর্মীদের অনেকেই নানামাত্রায় কম্যুনিস্ট আদর্শের সাথে যুক্ত ছিলেন– এ বাস্তবতার বাইরে নাটকের ভাবাদর্শগত দিক থেকে ওই আদর্শের সাথে সংযুক্তি দেখানোর সম্ভবত উপায় নেই।

৭. সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দের সাথে একশ চুয়াল্লিশ ধারা ভাঙার বিষয়ে ছাত্রদের যে মতবিরোধ হয়েছে, সে কথা ভাষা-আন্দোলনের প্রায় সব বিবরণীতেই পাওয়া যায়। জহির রায়হানের উপন্যাসে এ বিরোধ সরাসরি জাতীয় নেতৃবৃন্দের দিকে গেছে।

তথ্যসূত্র

আজাদ, হুমায়ুন (২০১২)। 'একুশের চেতনা ও তিন দশকের উপন্যাস'। *নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আহমদ, সহুল (২০২০)। *জহির রায়হান: মুক্তিযুদ্ধ ও রাজনৈতিক ভাবনা*। ঢাকা: গ্রন্থিক প্রকাশন।

ইমাম, আলী (১৯৭৭)। 'কবর' প্রসঙ্গে মুনীর চৌধুরীর সাক্ষাৎকার *থিয়েটার*। রামেন্দু মজুমদার সম্পাদিত, ৫ম বর্ষ, ১ম সংখ্যা, ঢাকা।

ইসলাম, রফিকুল (১৯৭২)। *মুনীর চৌধুরীর জীবনকথা*। মুনীর চৌধুরী, মোফাজ্জল হায়দার চৌধুরী, আনোয়ার পাশা, আকরম হোসেন সম্পাদিত। বাংলা বিভাগ: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ইসলাম, রফিকুল (২০১৬)। *বাংলাদেশের সাহিত্যে ভাষা আন্দোলন ও মুক্তিযুদ্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

চৌধুরী, মুনীর (১৯৮২)। *কবর*, *রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, আনিসুজ্জামান সম্পাদিত। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

জয়নুদ্দীন, মোহাম্মদ (১৯৯৮)। *মুনীর চৌধুরীর সাহিত্যকর্ম*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

বানু, আরজুমন্দ আরা (২০০৮)। *শহীদুল্লা কায়সার ও জহির রায়হানের কথাসাহিত্য: বিষয় ও প্রকরণ*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ।

বিশ্বাস, সুকুমার (১৯৮৮)। *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা ও নাটকের ধারা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রায়হান, জহির (২০০৯) [১৯৮০]। *রচনাবলী*, ১ম খণ্ড, ৬ষ্ঠ মুদ্রণ। আশ্‌রাফ সিদ্দিকী সম্পাদিত। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউস।

একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩: উদ্‌যাপন, সাহিত্যসৃজন ও রাজনীতি

রাফাত আলম

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMRafat

বাংলাদেশের রাজনৈতিক ইতিহাসে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির অবস্থান সুচিহ্নিত। বাঙালি জাতিসত্তার রাজনৈতিক উন্মেষ ও বাংলাদেশ রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠার অনিবার্য ঘটনাক্রম হিসেবে এর রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক তাৎপর্যও অনেকখানি সুসংজ্ঞায়িত। বায়ান্নর একুশের চেতনা বাঙালি জাতিসত্তার স্বরূপ নির্ধারণে একটি অফুরন্ত শক্তির আধার হিসেবেও বিবেচিত হয়; যা প্রকাশিত হয় একুশের উদ্‌যাপনে, একুশের রাজনীতিতে। ১৯৫২ থেকে ১৯৫৩– এই এক বছরের মধ্যে পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতিতে সংঘটিত হয় গুণগত পরিবর্তন। একুশকে উপলক্ষ্য করে রচিত হয় উল্লেখযোগ্য সংখ্যক সাহিত্যকর্ম– কবিতা, গান, গল্প, প্রবন্ধ, নাটক; সরকারি প্রতিবন্ধকতা উপেক্ষা করে প্রকাশিত হয় একাধিক সাহিত্য-সংকলন। এগুলো এক অর্থে উদ্‌যাপনেরই অংশ; কিন্তু এসব সাহিত্যসৃজনের রাজনৈতিক তাৎপর্যও অনস্বীকার্য। এছাড়া এক বছর পর ভাষাশহিদদের স্মরণ তথা প্রভাতফেরি, একুশের গান, শহিদ-সমাধি ও শহিদ মিনারে গমন ইত্যাদির ধরনের ভিত্তিতে ওই কালের জনসংস্কৃতির একটি পরিচয়-লাভ সম্ভব। বর্তমান গবেষণাকর্মের প্রাথমিক ও প্রধান উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হবে ওই কালপর্বে প্রকাশিত একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকার খবর, খবরের শিরোনাম ও সম্পাদকীয় মন্তব্য। এর সঙ্গে সম্পূরক হিসেবে যুক্ত হবে একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে বিভিন্ন সাহিত্যসৃষ্টি, ভাষাসৈনিক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের স্মৃতিচারণ ও আত্মকথন এবং সাহিত্য-সংকলনের পরিচয় ও গুরুত্ব।

১৯৫২ সাল হাজার বছরের বাংলা ও বাঙালির ইতিহাসে আর দশটি বছরের মতো নয়। বাংলাভাষী এই জনাঞ্চলের একটি রাজনীতিচিহ্নিত বছর ১৯৫২ এবং তার একুশে ফেব্রুয়ারি। বাঙালি জাতির সুদীর্ঘ ইতিহাসে এ এমন এক ক্ষণ, যে মুহূর্তে সে বুঝতে পারে সে বাঙালি। বলা যায় বাঙালির আত্মপরিচয় আবিষ্কারের সূচনা-মুহূর্ত বায়ান্নর একুশ। বায়ান্নর একুশ কেবল আর সন-তারিখের পরিধিতেই সীমাবদ্ধ থাকে না; পরিণত হয় একুশের চেতনায়। যে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৭ থেকে শুরু হয়, অতঃপর ১৯৪৮-এর ১১ই মার্চ এবং অতিক্রম করে নানা পর্যায়, ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তা একটি সামূহিক রূপ লাভ করে। রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন পরিণত হয় পূর্ববাংলার নিপীড়িত জনতার শোষণমুক্তির প্রতীকে। ফলে এর প্রভাব বিরাজমান থাকে বায়ান্নর পরেও। এক অর্থে চেতনাগতভাবে বায়ান্নর পরেই একুশের চেতনা বেশি ফলবান। একুশের এই প্রতিবাদী চেতনাকে সঙ্গে নিয়েই পাকিস্তান-পর্বের বাকি দুই দশকে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক সংগ্রাম পরিচালিত হয়েছে। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও একুশের চেতনা বাংলাদেশের জাতীয়তাবাদী ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। রাষ্ট্রক্ষমতায় বিভিন্ন রাজনৈতিক গোষ্ঠীর উত্থান-পতনের সমান্তরালে একুশের তাৎপর্যও রূপান্তরিত হয়েছে। সেই অর্থে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন বা একুশের চেতনা বাংলাদেশের রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক ও সাহিত্যিক প্রেক্ষাপটে একটি অনিবার্য বিষয়। ফলে যে একুশের চেতনার উৎসারণ ঘটে ১৯৫২ সালে, তার প্রভাব, স্থায়িত্ব, গুরুত্ব নির্ভর করে অব্যবহিত

কালে জনমানুষের কাছে গ্রহণযোগ্যতার মধ্যে। যে-কোনো সফল রাজনৈতিক আন্দোলনকে সফল হিসেবে প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্গে অব্যবহিত সময়ে তার উদ্‌যাপনের ধরন, তাকে আবর্ত করে সাহিত্যসৃজন এবং বৃহত্তর রাজনীতিতে তার আবেদনের মাত্রার ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রয়েছে। তাই বায়ান্নর ফেব্রুয়ারিকে ১৯৫৩ সালে কীভাবে বিবেচনা করা হয়, তার মধ্য দিয়ে একুশের চেতনার একটি বাস্তববাদী স্বরূপ উপলব্ধি করা সম্ভব। প্রবন্ধের বিষয় নির্বাচনে সচেতনভাবে কেবল ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে বিবেচনা করা হয়েছে; মূলত পূর্ববাংলার জনসমাজে ভাষা আন্দোলনের অব্যবহিত প্রভাব ও স্বরূপ অন্বেষণের জন্য। এই প্রবন্ধের তথ্যগত উপাদান-উৎস হিসেবে প্রধানত বদরুদ্দীন উমর রচিত *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (৩ খণ্ড) (প্রথম প্রকাশ: ১৯৭০), *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল* (খণ্ড ১ ও খণ্ড ২) (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৪), বশীর আল্‌হেলাল রচিত *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৮৫), আবদুল মতিন ও আহমদ রফিক রচিত *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৯১), বাংলা একাডেমি প্রকাশিত *স্মৃতিচারণ'৮০* ও *স্মৃতিচারণ'৮১*, *একুশের স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৪* বইগুলো এবং তৎকালীন দৈনিক *আজাদ* ও সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* গুরুত্বের সঙ্গে বিবেচিত হবে। এই প্রবন্ধ রচনায় গবেষণাপদ্ধতি হিসেবে দালিলিক ও ঐতিহাসিক পদ্ধতি এবং নব্য ইতিহাসবাদী দৃষ্টিকোণ প্রযুক্ত হয়েছে।

উদ্‌যাপন

১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি পালিত হয় 'শহিদ দিবস' হিসেবে। লক্ষণীয়, প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি কেবল শহিদ দিবস হিসেবেই পালিত হয়– 'শোক দিবস' নয়, 'মাতৃভাষা দিবস' নয়, এমনকি 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসেবেও নয়। অবশ্য সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ১৯৫২ সালের ৫ই মার্চ 'শহিদ দিবস' ঘোষণা করেছিল এবং পূর্ববাংলা-ব্যাপী হরতাল পালনের আহ্বান জানিয়েছিল; কিন্তু তা পূর্ণমাত্রায় পালিত হয়নি (উমর, ২০১২, পৃ. ৩৫২)। অন্যদিকে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চের স্মরণে প্রতিবছর ওই দিনকে 'রাষ্ট্রভাষা দিবস' হিসেবে পালন করা হচ্ছিল; ১৯৫৩ সালেও। 'শহিদ দিবস' শব্দবন্ধের মধ্যেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলার প্রতিষ্ঠার সঙ্গে পূর্ববাংলার জনমানুষের সামূহিক অধিকার আদায়, বৈষম্যমুক্তি এবং জাতীয়তার প্রশ্ন জড়িত ছিল। পরবর্তী কয়েক দশকের চর্চা ও তৎপরতার মধ্য দিয়ে 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ' শব্দবন্ধ যেভাবে প্রতিষ্ঠা ও পরিচিতি লাভ করেছে, তা ১৯৫২ বা ১৯৫৩ সালে উচ্চারণের মধ্য দিয়ে প্রকাশিত না হলেও তার বহুমাত্রিক উপাদান বিদ্যমান ছিল এর সকল উদ্‌যাপনে। ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের খবর ও বিশ্লেষণ গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশ করে সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*, *সৈনিক*, *নও-বেলাল* ও *পূর্ব-বাংলা* পত্রিকা। এদের মধ্যে ব্যতিক্রম বলা যায় দৈনিক *আজাদ*-কে। *আজাদ* একুশে ফেব্রুয়ারি খবর প্রকাশ করেছিল; কিন্তু এর প্রতি অকুণ্ঠ সমর্থন প্রকাশিত হয়নি। তৎকালে *আজাদ* ছিল বহুল প্রচারিত দৈনিক।

১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিতে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের নেতৃত্বের দুর্বলতা এবং ৭ই মার্চে কর্মপরিষদের গোপন সভা থেকে অধিকাংশ নেতার গ্রেফতার হওয়ার পর ২৭শে এপ্রিল ১৯৫২ সম্মেলনের মাধ্যমে 'পূর্ব-পাকিস্তান সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ' নতুনভাবে গঠিত হয়; এর আহ্বায়ক হন আতাউর রহমান খান (১৯০৫-১৯৯১) (উমর, ২০১২, পৃ. ৩৭৭)। কেন্দ্রীয় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারিকে 'শহিদ দিবস' রূপে উদ্‌যাপনের আহ্বান জানায়। কর্মপরিষদের পক্ষ

থেকে আহ্বায়ক আতাউর রহমান খানের বিবৃতিটি ১৯৫৩ সালের ৮ই ফেব্রুয়ারি *ইত্তেফাক* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। সেখানে উল্লেখ করা হয়:

> আসন্ন ২১শে ফেব্রুয়ারীকে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করিবার জন্য আমি পাকিস্তানের শান্তি, স্বাধীনতা ও গণতন্ত্রকামী জনতার নিকট আবেদন জানাইতেছি। দেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট, সভা, শোভাযাত্রা, শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ ও শহীদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধাজ্ঞাপনপূর্বক অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও সকল রাজবন্দীর বিনাশর্তে মুক্তির দাবীকে বজ্রকঠিন কণ্ঠে ঘোষণা করিবার জন্য আমি দেশবাসীর প্রতি আবেদন জানাইতেছি। দেশের সকল দল ও সংগঠনের প্রতি আমার আবেদন – আপনারা সর্বত্র সংযুক্ত ফ্রন্ট মারফত অটুট ঐক্যের মধ্য দিয়া জনতার সুদৃঢ় সংহতি গড়িয়া তুলুন 'শহীদ দিবস'কে সার্থক ও জয়যুক্ত করিয়া তুলুন (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮১)।

ইত্তেফাক'-এর ওইদিনের (*ইত্তেফাক*, ৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩; *আজাদ*, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩) সংখ্যা থেকে জানা যায়– আওয়ামী মুসলিম লীগের ভারপ্রাপ্ত সাধারণ সম্পাদক শেখ মুজিবুর রহমানও (১৯২০-১৯৭৫) ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শহিদ দিবস পালনের আহ্বান জানান। বিবৃতিতে শেখ মুজিব বলেন, ''শান্তিপূর্ণভাবে শহিদ দিবস উদ্‌যাপনের উপর দেশের গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সাফল্য নির্ভর করছে।'' জনাব রহমান অন্য এক বিবৃতিতে বলেন যে, ''শহিদ দিবস অবশ্যই উদ্‌যাপন করিতে হইবে– শান্তিপূর্ণভাবে ও শাসনতন্ত্রসম্মত পদ্ধতিতে উহা পালন করিতে হইবে''– এপিপি (*আজাদ*, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)। ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক (১৯২৯-২০০৯) জানান (১৯৮০, পৃ. ১৫৪)– ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি ১৯ ও ২০ ফেব্রুয়ারি রোজা রাখার আহ্বান জানায়। ২০শে ফেব্রুয়ারি শুক্রবার ঢাকার বিভিন্ন মসজিদে শহিদদের আত্মার মাগফেরাত কামনা করে মোনাজাত করা হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের অনেক ছাত্র এদিন রোজা রাখেন (*ইত্তেফাক*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)। ১৯৫২ সালের শেষদিকে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত পাকিস্তান সাহিত্যসংসদ ১৯৫৩ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি এক জরুরি সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারিতে আহূত 'শহিদ দিবস'-এর কর্মসূচির প্রতি সমর্থন জ্ঞাপন করে (*আজাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩)।

১৯৫৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* প্রথম একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের খবর প্রকাশ করে। ভাষা আন্দোলন-গবেষক বশীর আল্‌হেলাল *ইত্তেফাক* থেকে নিজের ভাষায় থেকে সেইদিনের ঘটনাক্রমের বর্ণনা দিয়েছেন:

> একুশে ফেব্রুয়ারি সেবার শনিবার। উদ্‌যাপিত হচ্ছে শহীদ দিবস। রাজধানী ঢাকার প্রত্যেকটি দোকানপাট, বাস, রিক্সা, গাড়িঘোড়া, বাজার বন্ধ। স্টেট ব্যাঙ্ক, ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক, লয়েড ব্যাঙ্ক-সহ সকল ব্যাঙ্ক হরতাল পালন করে। রেল, সিনেমা বন্ধ থাকে। হাজার-হাজার ছাত্র, কর্মী গম্ভীর পরিবেশে কালো ব্যাজ ধারণ করে রাস্তায় টহল দিচ্ছেন। শহীদদের ত্যাগের কথা স্মরণ করে গোটা শহর যেন চরম ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। ছাত্রছাত্রীদের মধ্যে অপূর্ব প্রেরণা। স্কুল-কলেজ বন্ধ। ভোরে ছাত্র-জনতা যখন দলে-দলে 'প্রভাত-ফেরি' করে শহীদদের মাজারে পুষ্প অর্পণ করতে যাচ্ছিলেন তখন শহরে করুণ পরিবেশের সৃষ্টি হয়। সকলের চোখে পানি, কিন্তু চোখে-মুখে ফুটে উঠেছে দৃঢ় প্রত্যয়। সকাল ৫টা থেকে বিভিন্ন ছাত্রাবাসের ছাত্র ও মহল্লার মানুষ আজিমপুর গোরস্তানে গিয়ে শহীদদের সমাধিতে মালা দেন (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮২)।

আরও জানা যায়– সকাল ১০টা থেকে ১২টার মধ্যে অনেক মিছিল এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রাঙ্গণে মিলিত হয়। বেলা ১টার দিকে ৩০ হাজারের বেশি শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষের মিছিল বের হয়। 'সকলে কালো ব্যাজ ধারণ করে। মেডিক্যাল কলেজের সামনে এক মিনিট দাঁড়িয়ে শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন ও মাগফেরাত কামনা করা হয়' (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৩)। আরও লক্ষণীয় বিষয় ছিল– 'বাড়িতে বাড়িতে উড়ছিল কালো পতাকা। কোথাও কোথাও মেয়েরা বাড়ির ছাদ থেকে মিছিলের ওপর ফুল ছড়িয়ে দিচ্ছিলেন। প্রতিটি বাড়ির ছাদে দাঁড়ানো নানা বয়সী মেয়েরা' (মতিন ও রফিক ২০১৭, পৃ. ২২৩)। মিছিলটি ছিল বিশাল এবং সুষ্ঠু ও সুশৃঙ্খল। এই মিছিলের নেতৃত্বে ছিলেন আতাউর রহমান খান, শেখ মুজিবুর রহমানসহ অন্যান্য সংগঠনের নেতৃস্থানীয় প্রতিনিধিবৃন্দ। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সাধারণ সম্পাদক এম এ ওয়াদুদ (১৯২৫-১৯৮৩) মিছিল পরিচালনায় স্বেচ্ছাসেবকদের নেতৃত্ব প্রদান করেছিলেন। মিছিল শেষে আরমানিটোলা ময়দানে সভা অনুষ্ঠিত হয়।

লক্ষাধিক মানুষের এই সভায় সভাপতিত্ব করেছিলেন কর্মপরিষদের আহ্বায়ক আতাউর রহমান খান। 'সভায় শহীদদের অমর স্মৃতির উদ্দেশ্যে মোনাজাত করা হয়' (হক, ১৯৮০, পৃ. ১৫৬)। জনতার কণ্ঠে স্বতঃস্ফূর্ত যে স্লোগানগুলি সেদিন উচ্চারিত ও অনুরণিত হয়েছিল, সেগুলো হলো: 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই! রাজবন্দীদের মুক্তি চাই! শহীদ স্মৃতি অমর হোক! জালেম লীগশাহী ধ্বংস হোক! গণপরিষদ ভেঙে দাও! সাম্রাজ্যবাদ ধ্বংস হোক! লীগশাহীর দালাল মর্নিং নিউজ ধ্বংস হোক! ইত্যাদি' (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৪)। এই স্লোগানগুলোর প্রতিফলন দেখা যায় সভায় যুগ্ম-আহ্বায়ক জমিরুদ্দিন আহমদ কর্তৃক উত্থাপিত কয়েকটি দাবিযুক্ত প্রস্তাবে; যেগুলো সভা থেকে সর্বসম্মতভাবে গৃহীত হয়। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠা, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট রাজবন্দিদের মুক্তি দাবি, মুসলিম লীগ সরকারের গণবিরোধী তৎপরতার বিরুদ্ধে জনসাধারণের অব্যাহত সংগ্রাম এবং বিশেষত অসুস্থ (মরণাপন্ন) মওলানা ভাসানীর বিনা শর্তে মুক্তি দাবি ছিল উক্ত প্রস্তাবের মূল উপজীব্য। সভায় যাঁরা বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, সৈয়দ আবদুর রহিম, কাজী গোলাম মাহবুব, আবদুস সামাদ, মাহমুদ আলী, সোলায়মান খান, হেদায়েতুল ইসলাম, এম. এ. ওয়াদুদ, গাজীউল হক, মতিয়ুর রহমান, আখতারুদ্দিন আহমদ, মিস হালিমা খাতুন, ইব্রাহিম তাহা, হেদায়েতুল ইসলাম সেলিম, খোন্দকার মোহাম্মদ ইলিয়াস, সদর আলী' (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৫)। 'সন্ধ্যায় ব্রিটানিয়া সিনেমা হলে [বর্তমান বঙ্গবন্ধু অ্যাভিনিউ] যে অনুষ্ঠান হয় সেখানেই প্রথম 'আমার সোনার বাংলা' গানটি গাওয়া হয়। আবদুল লতিফের সুরে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর 'আমার ভায়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি' গানটি ঐ অনুষ্ঠানে প্রথম গাওয়া হয়' (ইসলাম, ১৯৮১, পৃ. ২২-২৩)। অন্যদিকে, '২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার কেন্দ্রীয় কারাগারে মওলানা ভাসানী, আবুল হাশিম, মওলানা তর্কবাগীশ, খয়রাত হোসেন, ওসমান আলী, অলি আহাদ-সহ সকল রাজবন্দী একদিনের জন্য অনশন করেন এবং খোরাকির টাকা কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের কাছে প্রেরণ করতে অনুরোধ করেন' (*ইত্তেফাক*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩; আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৫)। একুশের প্রথম বার্ষিকী উদ্‌যাপনে কারাগারের অভ্যন্তরে রাজবন্দিদের কর্মতৎপরতা সম্পর্কে আরও বিশদ জানা যায় ওইসময়ে রাজবন্দি ফজলুল করিমের আত্মজৈবনিক গ্রন্থ *বায়ান্ন'র কারাগার* (প্রথম প্রকাশ: ১৯৯৭) থেকে। তাঁর বর্ণনা অনুসারে জানা যায় 'অজিত গুহের সিল্কের মোজা কেটে তৈরি হয়েছিল কালো ব্যাজ; সে ব্যাজ তাঁরা পরেছিলেন। তোয়াহার উলের কার্ডিগানকে বানানো হলো কালো পতাকা। বাইরে মিছিল যাওয়ার সময়ে তাঁরা স্লোগান দিতেন

ভেতর থেকে' [(করিম, ২০১৪, পৃ. ৫ (মুখবন্ধ, আনিসুজ্জামান)]। কারাগার-রাজপথ, ভেতর-বাহির সব একাকার হয়ে যায় একুশের চেতনামুখর স্লোগানে, উচ্চারণে, গানে ও প্রাণে।

১৯৫৩ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপন নির্বিঘ্ন ছিল না। গাজীউল হক (১৯৮০, পৃ. ১৫৪) জানান– ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ বিশ্ববিদ্যালয় সংগ্রাম কমিটির ছাত্রনেতাদের সেক্রেটারিয়েটে ডেকে পাঠানো হয়। পূর্ববাংলার তৎকালীন চিফ সেক্রেটারি মোহাম্মদ ইসহাক, পুলিশের আইজি দোহা এবং সামরিক বাহিনীর জিওসি মেজর জেনারেল আদমের সঙ্গে সংগ্রাম কমিটির আবদুস সালাম, মোহাম্মদ সুলতান, আখতারউদ্দিন, শামসুল হক, জিল্লুর রহমান, ইব্রাহিম তাহা ও গাজীউল হক দেখা করেন। তাঁদের মধ্যে গ্রেফতারের আশঙ্কাও ছিল। একুশে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি নিয়ে তাদের মধ্যে তর্কবিতর্ক হয়। কিন্তু ছাত্রনেতাদের দৃঢ় অবস্থানের কারণে প্রশাসনের পক্ষ থেকে আহূত কর্মসূচিতে বাধা প্রদান না করার আশ্বাস দেওয়া হয়। যদিও ২০ তারিখ দৈনিক *আজাদ*-এ সরকারের পক্ষ থেকে একটি 'ইশতাহার' প্রচার করা হয়েছিল; শিরোনাম: 'আইন ও শৃঙ্খলা রক্ষার জন্য জনগণের সহযোগিতা আহ্বান'। ওই ইশতাহার বক্তব্যটি উল্লেখ করা হলো:

> ২১শে ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের ইশতাহার। ২১শে ফেব্রুয়ারী বিক্ষোভ প্রদর্শনের প্রস্তুতি সম্পর্কে পূর্ব্ববঙ্গ সরকারের এক এশতেহারে শান্তি বিপন্ন হইতে পারে, এমন কাজ হইতে বিরত থাকার জন্য রাজনৈতিক দলগুলিকে আহ্বান জানান হইয়াছে। এশতেহারে আরও বলা হইয়াছে যে, সকল নাগরিকের "জানমালের নিরাপত্তা বিধান সরকারের প্রধান ও প্রথম কর্ত্তব্য।" এই কর্ত্তব্য পালনের জন্য যদি "সরকার অনিচ্ছা সত্ত্বেও কোন কাজে হস্তক্ষেপ করিতে বাধ্য হন, তাহা খুবই পরিতাপের বিষয় হইবে। সুতরাং আইন ও শৃঙ্খলা বজায় রাখার কাজে সহযোগিতা করার জন্য সরকার জনসাধারণকে গভীর আগ্রহের সহিত আহ্বান জানাইতেছেন" (*আজাদ*, ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)।

অর্থাৎ সরকারের পক্ষ থেকে পরোক্ষ চাপ ও নজরদারি ছিল। তথাপি 'বিশ্ববিদ্যালয়, মেডিকেল কলেজ, জগন্নাথ কলেজ, ঢাকা কলেজ ও ইডেন কলেজে শহিদ দিবস পালনের জন্য বিপুল উদ্দীপনা সৃষ্টি হয়। কিন্তু তখন পর্যন্ত স্থায়ী কোনো স্মৃতিস্তম্ভ বা শহিদ মিনার ছিল না। 'মেডিকেল কলেজের রাজনৈতিক ছাত্ররা মিলে বিলুপ্ত স্মৃতিস্তম্ভের স্থানটিতে কালোকাপড় আর লালকাগজ দিয়ে তৈরি করেন এক প্রতীকী শহিদ মিনার। হুবহু প্রথম শহিদ মিনারের প্রতিকৃতি। তেমনি একটি প্রতীকী মিনার গড়ে ওঠে কার্জন হল প্রাঙ্গণে' (মতিন ও রফিক, ২০১৭, পৃ. ২২২)। 'ঢাকার কার্জন হলে ও মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেলের ছাত্ররা একটি করে 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' নির্মাণ করেন। কার্জন হলেরটি সাড়ে তিন ফুট উঁচু ছিল' (*ইত্তেফাক*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)। ঢাকা কলেজের ছাত্ররা এবং ইডেন কলেজের মেয়েরাও তাদের কলেজ প্রাঙ্গণে শহিদ মিনার স্থাপনের উদ্যোগ গ্রহণ করেছিল। কিন্তু উভয় কলেজ-প্রশাসন তাতে বাধা প্রদান করে। ফলে তারা পুরোপুরি সফল হতে পারেনি। এ-প্রসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রত্যক্ষদর্শী এবং ওই আন্দোলনের আলোকচিত্র ধারণ করে যিনি ঐতিহাসিক দায়িত্ব পালন করেছিলেন, অধ্যাপক রফিকুল ইসলাম (১৯৩৪-২০২১) তাঁর (১৯৮১, পৃ. ২২-২৩) স্মৃতিচারণ থেকে উল্লেখ করা যায়:

> ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি আমরা 'শহীদ দিবস' উদ্‌যাপন করব ঠিক করলাম। সে সময় ঢাকা কলেজ ছিল রেল স্টেশনের [ফুলবাড়িয়া] পেছনে সিদ্দিক বাজারে। তখন ইডেন কলেজের ল্যাবরেটরী ছিল না, ইডেনের ছাত্রীরা ঘোড়াগাড়ী করে ঢাকা কলেজে যেত প্র্যাকটিক্যাল করতে।

ইডেন কলেজের ছাত্রীরা এবং ঢাকা কলেজের ছাত্ররা মিলে ঠিক করলো যে, তারা কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার গড়বে। সন্ধ্যা বেলা শহীদ দিবস উপলক্ষে তাঁরা একটা সভার আয়োজন করে। সে সময় ইডেনের অধ্যক্ষা ছিলেন মিসেস ফজিলাতুন নেসা জোহা আর ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন খুব সম্ভবতঃ ইতিহাসের অধ্যাপক জহিরুল ইসলাম। ঢাকা কলেজের ছাত্র ইকবাল আনসারী খান, আতিকুল ইসলাম, এনাম আহমেদ চৌধুরী প্রমুখের নেতৃত্বে কলেজ প্রাঙ্গণে শহীদ মিনার তৈরি হতে থাকে। সেখানে ইডেন কলেজের অধ্যক্ষা মিসেস ফজিলাতুন নেসা, ঢাকা কলেজের অধ্যক্ষ জহিরুল ইসলাম এবং উর্দুর অধ্যাপক আহসান আহমদ আস্‌ক গিয়ে ছাত্র-ছাত্রীদের বাধা দেন। ছাত্ররা শহীদ মিনার সম্পূর্ণ করতে পারেনি, তাদেরকে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়া হয়। সে ঘটনার পর বেশ কিছু সংখ্যক ছেলের দু'বছরের জন্য রাস্‌টিকেট হয়।

ছবি ১: প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ (শহিদ মিনার); ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২

ছবি ২: ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে নির্মিত শহিদ মিনার। *একুশের স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৪*-তে এর অবস্থান হিসেবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ঢাকা হল (ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ হল) উল্লেখ করা হলেও বর্তমান প্রবন্ধকারের অনুমান– এটি মেডিক্যাল কলেজের হোস্টেলের সামনে নির্মিত ধ্বংসকৃত প্রথম স্মৃতিস্তম্ভের (শহিদ মিনার) অনুরূপ শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ

ছবি ৩: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে [কার্জন হল] নির্মিত 'শহীদ স্মৃতি স্তম্ভ'; ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

ছবি ৪: ইডেন কলেজের ছাত্রীদের উদ্যোগে শহিদ মিনার নির্মাণচেষ্টা ও অধ্যক্ষ কর্তৃক বাধা প্রদান

ছবি ৫: রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ছাত্র-জনতার মিছিল, ২১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩

[ছবি ১ ইন্টারনেট থেকে সংগৃহীত; ছবি ২, ৩, ৪ ও ৫-এর উৎস বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত *একুশের স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৪*]

একুশে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে পত্রিকা প্রকাশের ক্ষেত্রেও মুখোমুখি হতে হয় প্রতিবন্ধকতার। সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক* আগের কয়েকটি সংখ্যায় পাঠককে জানিয়ে আসছিলেন, তাঁরা বিশেষ সংখ্যা বের করবেন। কিন্তু সরকার সম্পাদককে ডেকে সংখ্যাটি সম্পর্কে কিছু 'অনুরোধ' করেন (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৯)। পরে বিশেষ সংখ্যা না বের হলেও ২৩শে ফেব্রুয়ারি নিয়মিত সংখ্যায় দুই পৃষ্ঠা যোগ করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি তারিখে প্রকাশিত হয় আবদুল গফুর (জ. ১৯২৯) সম্পাদিত *সৈনিক* পত্রিকার 'ভাষা আন্দোলন ও শহীদ সংখ্যা'– কলেবর ১৬ পৃষ্ঠা– ওইসময়ের বিবেচনায় বড় ও সাহসী আয়োজন। মাহমুদ আলী (১৯১৯-২০০৬) সম্পাদিত *নও-বেলাল* পত্রিকার বিশেষ সংখ্যা প্রকাশিত হয় ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে, যেখানে 'কালো রেখা বেষ্টিত সম্পাদকীয়টি মুদ্রিত হয় প্রথম পৃষ্ঠায়, তার বৃহৎ টাইপের শিরোনাম ছিল: 'ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারির শহীদ দিবসের সংগ্রামী শপথ' (আল্‌হেলাল, ২০১৬, পৃ. ৫৮৯)। সেই সম্পাদকীয় নিবন্ধের কিছু অংশ উদ্ধৃত হলো:

> প্রতি বৎসরেই এই একুশে ফেব্রুয়ারী আসিবে, আবার শেষ হইয়া যাইবে। কিন্তু যে ঘৃণা আর ক্রোধের আগুন দেশবাসীর হৃদয়ে জ্বলিয়াছে, তাহার শেষ নাই– তাহা বারবার এমনিভাবে প্রজ্বলিত হইয়া উঠিবে। ঐতিহাসিক একুশে ফেব্রুয়ারীতে মাতৃভাষার পূর্ণ মর্যাদা প্রতিষ্ঠার জন্য আত্মাহুতি দিয়া শহীদগণ যে রক্তোজ্জ্বল ঐতিহ্য সৃষ্টি করিয়াছেন, তাহা জাতির স্বাধীনতা, শান্তি ও গণতন্ত্রের প্রত্যেকটি লড়াইকে সুনিশ্চিতভাবে অনুপ্রাণিত করবে।

এই কয়েকটি বাক্য থেকে একুশে ফেব্রুয়ারি শক্তির জায়গাটি উপলব্ধি করা যায়। একুশ যে কেবল ভাষা-চেতনার মধ্যেই সীমাবদ্ধ ছিল না তৎকালে বরং জাতিগত মুক্তির একটি অন্যতম শক্তিতে পরিণত হয়েছিল, তার স্পষ্ট প্রকাশ আছে এখানে। সাপ্তাহিক *পূর্ব-বাংলা* পত্রিকাও ২৬শে ফেব্রুয়ারি তারিখে 'অমর শহীদ স্মৃতি সংখ্যা' প্রকাশ করে। কিন্তু *আজাদ* পত্রিকায় একুশে ফেব্রুয়ারি উপস্থাপিত হয়েছে সতর্কমূলক দৃষ্টিকোণ থেকে। বহুল প্রচারিত দৈনিক *আজাদ*'র সম্পাদক ছিলেন আবুল কালাম শামসুদ্দীন (১৮৯৭-১৯৭৮)। ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে শেষ পাতায় এক কলামে তিন ইঞ্চি জায়গা বরাদ্দ করে 'শহীদ দিবস উদ্‌যাপন' শীর্ষক খবর প্রচার করা হয়, যেখানে কেবল আতাউর রহমান খান ও শেখ মুজিবুর রহমানের বিবৃতির অংশবিশেষ উল্লেখ করা হয়। ২১ তারিখ প্রথম পৃষ্ঠায় একুশে ফেব্রুয়ারি বিষয়ক কোনো সংবাদ বা রিপোর্ট নেই। দ্বিতীয় পৃষ্ঠায় প্রথম কলামে ছাপা হয় সম্পাদকীয়, শিরোনাম ছিল 'একুশে ফেব্রুয়ারী':

> একুশে ফেব্রুয়ারী
>
> গতবার ঠিক এই দিনে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা-সম্পর্কিত দাবি লইয়া সারা পূর্ব্ব পাকিস্তানের ছাত্রসমাজ বিক্ষুব্ধ হইয়া উঠে। ঢাকায় এই বিক্ষোভ অবাঞ্ছিত পরিণতি লাভ করে। পুলিশের গুলীতে কয়েক জনের মৃত্যু হয়। আজ এক বৎসর পরে সেই মর্ম্মন্তুদ ঘটনার স্মৃতিবার্ষিকী উদ্‌যাপনের আয়োজন হইয়াছে। ছাত্রদের তরফ হইতে হরতাল পালন, শোভাযাত্রা পরিচালন এবং সভা-সমিতি অনুষ্ঠানের সিদ্ধান্ত ঘোষণা করা হইয়াছে।
>
> এই শ্রেণীর সিদ্ধান্ত কার্য্যকরী করার অধিকার সকল গণতান্ত্রিক দেশের নাগরিকদের সাধারণ অধিকার। এই অধিকার যেখানে বাধাগ্রস্ত, জনসাধারণের গণতান্ত্রিক অধিকার সেখানে নাই। সুখের বিষয়, পূর্ব্ব-পাক সরকার জন-সাধারণের এই গণতান্ত্রিক অধিকার মানিয়া লইয়াছেন। তবে তাঁদের তরফ হইতে এক এশতেহারে এ-কথা সুস্পষ্টভাবেই জানাইয়া দেওয়া হইয়াছে যে, জনগণের অধিকারের স্বীকৃতি যেমন সরকারের কর্ত্তব্য, তেমনি শান্তি-শৃঙ্খলা রক্ষাও তাঁদের অন্যতম

> অপরিহার্য্য কর্ত্তব্য। গণতন্ত্রমনা কোনো বুদ্ধিমান নাগরিক এ-কথা অস্বীকার করিতে পারেন না। তাই এই 'দিবসে'র অনুষ্ঠাতাদের নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিদের বিবৃতিসমূহেও আমরা অনুরূপ সতর্ক-বাণী উচ্চারিত হইতে দেখিতেছি। শান্তি ও শৃঙ্খলা বজায় রাখিয়া কাজ করিতে হইবে। কাজেই আমরা আশা করিতে পারি, আজিকার 'দিবসে'র অনুষ্ঠানাদি শান্তি ও শৃঙ্খলার সাথে উদ্‌যাপিত হইবে (*আজাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩)।

এবং ওইদিনের *আজাদ*'র শেষ পৃষ্ঠায় এক কলামে 'অদ্য শহীদ দিবস পালন' শীর্ষক একুশে ফেব্রুয়ারি পালনের কর্মসূচির বর্ণনা দেওয়া হয়। যদিও সফল ও শান্তিপূর্ণভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের পরদিন *আজাদ* প্রথম পৃষ্ঠায় তিন কলাম-ব্যাপী 'ভাষা আন্দোলনে শহীদগণের প্রতি ঢাকার নাগরিকদের শ্রদ্ধাঞ্জলি' শীর্ষক শিরোনাম ও নিচে দুই কলাম-ব্যাপী স্টাফ রিপোর্টার কর্তৃক 'শনিবার স্বতঃস্ফূর্ত্ত হরতাল শোভাযাত্রা ও সভার অনুষ্ঠান' 'বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার ও বন্দীমুক্তির দাবী জ্ঞাপন' শীর্ষক সংবাদ প্রকাশ করে। ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি *আজাদ*-সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দীন 'পুলিশের জুলুমের প্রতিবাদে' গণপরিষদের সদস্যপদ থেকে ইস্তফা দিয়েছিলেন এবং ২৬ তারিখ প্রথম শহিদ মিনার আনুষ্ঠানিকভাবে উদ্‌বোধন করেছিলেন। যদিও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ *আজাদ*-এ প্রকাশিত হয়:

> বেলা দুইটার দিকে একটি বিরাট শোভাযাত্রা লালবাগের দিক হইতে '*আজাদ*' অফিসের সম্মুখ দিয়া মোছলেম হলের দিকে যাইবার সময় শোভাযাত্রাটির কিছুসংখ্যক লোক 'আজাদ' অফিসের কর্মচারীদের উপর প্রস্তর নিক্ষেপ করিয়া শাসাইতে থাকে। '*আজাদ*' কর্তৃপক্ষ ও কর্মচারীগণ কর্তৃক ছাত্রদের দাবী সম্পর্কে যথাসাধ্য চেষ্টা করা হইতেছে বলিয়া আশ্বাস দেওয়া সত্ত্বেও প্রস্তর নিক্ষেপকারীগণ বিক্ষোভ করিতে থাকে। অতঃপর শোভাযাত্রার কতিপয় ছাত্রকর্মীর হস্তক্ষেপের ফলে ও তাহদের পরামর্শে বিক্ষোভকারিগণ ক্ষান্ত হইয়া সম্মুখে অগ্রসরে হয়।

এ-থেকে ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গে *আজাদ* পত্রিকার অবস্থান ও ছাত্র-জনতার দৃষ্টিভঙ্গির পরিচয় পাওয়া যায়।

১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনের কয়েকটি বিষয় বিশেষভাবে চেতনাচিহ্নিত। একুশে ফেব্রুয়ারির প্রথম বার্ষিকী যে ছিল জনমানুষের স্বতঃস্ফূর্ত উদ্‌যাপন, আলোচিত ঘটনাক্রম তার নিঃসন্দেহ সাক্ষ্য দেয়। নেতৃবৃন্দও তাদের দ্বিধার বৃত্ত ভেঙে জনমানুষের স্পন্দনকে বুঝতে ও গুরুত্ব দিতে সমর্থ হয়। এখানে চেতনাগতভাবে লক্ষ্যণীয় বিষয় হলো– রোজা রাখা, মোনাজাত করা, ভাষাশহিদদের কবর জিয়ারত করা, শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ, ছাদ থেকে মেয়েদের পুষ্পবৃষ্টি, কালো ব্যাজ পরিধান, ছাদে কালো শাড়ি ওড়ানো, সভা, স্লোগান– এই সবই ঘটেছে একুশ উদ্‌যাপনের অংশ হিসেবে। এই জনাঞ্চলের অধিকারসচেতন লোকায়ত ঐতিহ্যও এখানে প্রকাশিত হয়েছে। রোজা রাখা আর শহিদ মিনারে ফুল দেওয়ার মধ্যে কোনো বিরোধ নেই সেখানে। রোজার মতো ধর্মীয় বিষয়ও যুক্ত হয়েছে ভাষা আন্দোলনের মতো একটি সম্পূর্ণত ইহলৌকিক কর্মসূচির আওতায়। ফলে একুশ এখানে আরও বেশি লৌকিক ও প্রায়োগিক হতে পেরেছে জনমানুষের বিশেষত মুসলমানি ঐতিহ্যিক অনুষঙ্গগুলোকে সহজে আত্মীকরণের মধ্য দিয়ে। একুশের চেতনা ১৯৫৩ সালেও ছিল সম্পূর্ণত সেক্যুলার বৈশিষ্ট্যমণ্ডিত; কিন্তু তা থেকে ধর্মীয় চেতনা বাদ যায়নি। বরং দেখা যায় ধর্মীয় উপাদানগুলোও অর্জন করে সেক্যুলার চারিত্র্য। একই শ্রেণির সচেতন শিক্ষিত জনতা যেমন শহিদের জন্য রোজা রাখে, মোনাজাত করে, কবর জিয়ারত

করে; এই শ্রেণিই স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণে সংগ্রাম করে, পুষ্পাঞ্জলি অর্পণ করে এবং 'আমার সোনার বাংলা' বা 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো' গানে কণ্ঠ মেলাতে কুণ্ঠিত হয় না।

মুসলমান অধ্যুষিত পূর্ববাংলা অর্থাৎ বাংলাদেশের বাঙালিদের আত্মপরিচয় নির্মাণে পাড়ি দিতে হয়েছে দীর্ঘ পথ। বাঙালি মুসলমান না বাঙালি– এই দ্বিধা বাঙালিত্বের মীমাংসায় এক জটিল সমীকরণ। একুশ নির্ধারণ করে দেয় নিপীড়ক রাষ্ট্রযন্ত্র ও অধিকারসচেতন নাগরিকের পক্ষ-বিপক্ষ অবস্থানের একটি সুচিহ্নিত সমীকরণ। একই সঙ্গে একুশ উপলক্ষ্যে শ্রেণিভিত্তিক কর্মতৎপরতা এবং ঢাকার নাগরিক বা নাগরিক-উন্মুখ তরুণদের মধ্যে এমন কিছু প্রগতিশীল চিত্র, কর্মক্রিয়া ও নৈতিক অবস্থান লক্ষ যায়, যা বিস্ময়কর ও একইসঙ্গে আশা জাগানিয়া। সেখানে ঘটে ধর্মবোধ ও রাজনৈতিক বোধের অপূর্ব মিথস্ক্রিয়া। যে মুসলমান বঙ্গসন্তানরা একসময় প্যান-ইসলামিক ধারণায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পাকিস্তান-আন্দোলনে ঝাঁপিয়ে পড়েছিল, রাজনৈতিক গতিধারার পরিবর্তনের ফলে তারাই রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে আত্মদানকারী শহিদদের স্মরণে রোজা রাখে; সেটা রমজান মাসে না, ফাল্গুন মাসে। রোজা রাখার তাৎপর্য এইখানে যে– বাংলা মুসলমানের ভাষা কি না তা নিয়েই যখন একসময় দ্বিধা ছিল, সেখানে বাংলা ভাষার জন্য প্রাণবিসর্জনকারীদের প্রতি শোক ও প্রতিবাদ হিসেবে মুসলমান তরুণ-তরুণীরা রোজা রাখে। এই রোজা রাখা যতটা না ধর্মীয়, তার চেয়ে বেশি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক। বাংলার জনমানুষের ধারাবাহিক সংগ্রামে বায়ান্ন-পরিস্রুত এই বোধকে সমালোচক অভিহিত করেছেন নতুন রেনেসাঁস হিসেবে:

> ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে একটি সিনথেসিসে পৌঁছায় এই সংগ্রাম। সৃষ্টি হয় নতুন চেতনা, অসাম্প্রদায়িক ধর্মনিরপেক্ষ ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবোধ। এর মধ্য দিয়ে ঢাকাকেন্দ্রিক এক রেনেসাঁসের জন্ম হয়। সাহিত্য-সংস্কৃতির সর্বক্ষেত্রে সূচিত হয় নবজাগরণ (হক, ২০২২, পৃ. ৪৬)।

বায়ান্নর রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনটি ছিল সম্পূর্ণ রাজনৈতিক; এর সঙ্গে জড়িত রাষ্ট্র ও জনতার স্বার্থ এবং দুইয়ের টানাপোড়েন। একুশে ফেব্রুয়ারিজাত যে চেতনা এই জনাঞ্চলের মানুষকে সামনের দিকে ধাবিত করে, তা হলো সম্প্রদায়-নিরপেক্ষ চেতনা। এক অর্থে একুশে ফেব্রুয়ারি বাঙালির প্রথম সেক্যুলার রাজনৈতিক ঘটনা, যা সম্ভব হয়েছিল পূর্ববাংলায়। জলবায়ু ও জীবনযাপন পদ্ধতির আভ্যন্তর উদারতার মধ্যে বিকশিত এই জনাঞ্চলে এমন লোকায়ত সব ধর্মচিহ্ন ও ইহলৌকিক উদ্‌যাপনচিহ্নের মিথস্ক্রিয়া সম্ভব হয়েছিল। ধর্মীয় বোধকে সঙ্গে করে নিয়েও এই জনাঞ্চলের চিরায়ত লোকায়ত ঐতিহ্যে লালিত মানুষ অধিকার আদায়ে, অর্থনৈতিক মুক্তির প্রশ্নে, গণতন্ত্রায়ণে বেশি ক্রিয়াশীল।

সাহিত্যসৃজন

বাংলাদেশের সাহিত্য পর্যালোচনাসূত্রে এ-কথা বলা যায়, বাংলাদেশের ইতিহাস ও রাজনীতির সঙ্গে বাংলাদেশের সাহিত্যের সম্পর্ক সমান্তরাল। ইতিহাস ও রাজনীতির পাঠের মতো সাহিত্যও তৈরি করে একটি জনাঞ্চলের পাঠ ও পাঠান্তর। অপরাপর জাতি ও ভাষার সাহিত্যের মতো বাংলাদেশের সাহিত্যও দেশ-কাল ও সমাজ-সাপেক্ষ। সৃজনশীল সাহিত্যকরা তাঁদের সৃষ্টিশীল রচনায় হয়েছেন রাজনৈতিক ঘটনা ও তৎপরতার অনুগামী। এ-কথা চল্লিশের দশকের পাকিস্তান আন্দোলন, চল্লিশের দশকের শেষ থেকে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলন, উনসত্তরের গণ-অভ্যুত্থান, ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ প্রভৃতি রাজনীতি-সংশ্লিষ্ট সাহিত্যকর্ম সম্পর্কে বলা যায়। তবে একুশে ফেব্রুয়ারি সেই বিষয়কে আরও সুচিহ্নিত করে দেয়।

একুশের প্রথম কবিতা হিসেবে স্বীকৃত মাহবুব উল আলম চৌধুরীর (১৯২৭-২০০৭) 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবি নিয়ে এসেছি'; রচিত হয়েছিল ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায়, চট্টগ্রামে। 'সেই রাত্রেই কোহিনূর ইলেক্ট্রিক প্রেসে কবিতাটি ছাপিয়ে ফেলা হয়। শেষরাত্রে পুলিশের হামলা ঘটলে কম্পোজ করা ম্যাটার তড়িঘড়ি ভেঙ্গে ফেলা হয়েছিল ঠিকই, কিন্তু ততক্ষণে ১৫ হাজার কপি মুদ্রণ সম্পন্ন হয়েছিল। পরের দিন ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে লালদীঘির ময়দানে আয়োজিত বিশাল প্রতিবাদসভায় ঐ কাব্যপুস্তিকা বিলি করা হয় এবং সভায় কবিতাটি আবৃত্তি করে শোনান আজকের প্রবীণ ন্যাপ নেতা চৌধুরী হারুনর রশীদ' (মামুদ, ১৯৮৫, পৃ. ২৬)। প্রকাশের কয়েকদিন পর সরকার কবিতাটি বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। ২৬শে ফেব্রুয়ারি আলাউদ্দিন আল আজাদ (১৯৩২-২০০৯) লিখেন 'স্মৃতির মিনার' কবিতা; মূলত প্রথম শহিদ মিনার ভাঙার প্রতিবাদে। হাসান হাফিজুর রহমানের (১৯৩২-১৯৮৩) 'অমর একুশে' কবিতাটি রচিত হয়েছিল ১৯৫২ সালের মার্চ/এপ্রিলের দিকে। এরপর একুশ নিয়ে কবিতা লিখেছেন বাংলাদেশের প্রথম সারির প্রায় সব কবি। ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত একুশের প্রথম সাহিত্যসংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*'তে 'একুশের কবিতা' শীর্ষক অভিন্ন শিরোনামে এগারোজন কবির এগারোটি কবিতা প্রকাশিত হয়। কবিতায় একুশের উপস্থিতি ও উপস্থাপন অপরাপর সাহিত্যসৃজনের চেয়ে বেশি প্রত্যক্ষ, সজীব ও শক্তিশালী।

একুশের সংকলন

১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনকে ঘিরে সাহিত্য-সংকলন প্রকাশ ওই কালে একুশের আবেদনের সামূহিক মাত্রাকে চিহ্নিত করে। একুশের প্রথম সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী* হলেও ঢাকা থেকে একুশের প্রথম স্মরণিকা ঢাকা কলেজ ছাত্রাবাসের পক্ষ থেকে প্রকাশিত 'জাতীয় জীবনে চিরস্মরণীয় ২১শে ফেব্রুয়ারী মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার সংগ্রামে যারা প্রাণ দিয়েছেন, সেই বীর *শহীদদের স্মরণে*; প্রকাশকাল: ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩। তখনকার প্রশাসনের বিরুদ্ধ অবস্থানের কারণেই হয়তো উক্ত স্মরণিকায় কোনো রচয়িতা, সংকলক, সম্পাদক বা প্রকাশকের নাম প্রকাশিত হয়নি। চার পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় উল্লেখযোগ্য দিক হচ্ছে ভূমিকা অংশ শুরু হয়েছে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের কবিতা দিয়ে 'উদয়ের পথে শুনি কার বাণী ভয় নাই ওরে ভয় নাই / নিঃশেষে প্রাণ যে করিবে দান ক্ষয় নাই তার ক্ষয় নাই' এবং শেষে কাজী নজরুল ইসলামের কবিতা 'বন্দী থাকা হীন অপমান', 'হাঁকবে যে বীর তরুণ/ শীরদাঁড়া যার শক্ত তাজা রক্ত যাহার অরুণ...', 'আমাদের কথা', 'ভুলি নাই রক্ত রাঙা একুশের কথা', 'একুশের গান'– এভাবে বিন্যস্ত হয়েছে স্মরণিকাটি। 'আমাদের কথা' অংশের শেষ অনুচ্ছেদটি উল্লেখযোগ্য:

> আজ ২১শে ফেব্রুয়ারীর সেই রক্তরঞ্জিত সূর্য্যের লোহিত-কিরণ-চ্ছটা পূর্বাচলকে উদ্ভাসিত করিয়াছে। আবার আসিল ২১শে ফেব্রুয়ারী, আজ শহীদদের আদর্শ আমরা স্মরণ করি, প্রণতি জানাই তাহাদের দুর্গম-দুঃসাহসিক অভিযানকে। কারাপ্রাচীরের দুঃসহ বন্ধনে যাহাদিগের অমূল্য জীবনকে তিলে তিলে দগ্ধ করা হইয়াছে, তাহাদেরও আজ স্মরণ করি। লক্ষ হৃদয়ের তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে আজ জাগাই আমাদের শাশ্বত আদর্শের রুদ্রভেরী। কণ্ঠে কণ্ঠে আজ আওয়াজ তুলি– 'রাষ্ট্রভাষা, বাংলা চাই' (মোমেনীন, ১৯৯১, পৃ. ৯)।

বহুল প্রচারের জন্য স্মরণিকায় মুদ্রিত ছিল– 'নিজে পড়িয়া অপরকে পড়িতে দিন'। একুশের গানের রচয়িতা যে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী (১৯৩৪-২০২২) এটি এই স্মরণিকায় জানা না গেলেও অব্যবহিত পরবর্তী সংকলন *একুশে ফেব্রুয়ারী*'তে অভিন্ন গানটি রচয়িতার নামসহ প্রকাশিত হয়।

'একটি মহৎ দিন হঠাৎ কখনো জাতির জীবনে আসে যুগান্তরের সম্ভাবনা নিয়ে। পূর্ব-পাকিস্তানের ইতিহাসে একুশে ফেব্রুয়ারী এমনি এক যুগান্তকারী দিন। শুধু পাক-ভারত উপমহাদেশের ইতিহাসে নয়, একুশে ফেব্রুয়ারী সারা দুনিয়ার ইতিহাসে এক বিস্ময়কর ঘটনা'– এই কথাগুলো দিয়ে সূচিত হয়েছে হাসান হাফিজুর রহমান (১৯৩২-১৯৮৩) সম্পাদিত একুশের প্রথম সংকলনগ্রন্থ *একুশে ফেব্রুয়ারী*'র ভূমিকাংশ। ১৯৫২ সালের এই রক্তিম অথচ প্রাণদায়িনী একুশে ফেব্রুয়ারির এক বছর পর ১৯৫৩ সালে একুশের শোক, ক্ষোভ, প্রতিবাদ ও সামূহিক সম্ভাবনা নিয়ে প্রকাশিত হয় একদল দুঃসাহসী তরুণের রক্তের অক্ষরে লেখা সাহিত্য-সংকলনগ্রন্থ *একুশে ফেব্রুয়ারী*। সম্পাদক হিসেবে ঐতিহাসিক দায়িত্বটি পালন করেন পঞ্চাশের দশকের অন্যতম প্রধান কবি হাসান হাফিজুর রহমান। 'ভাষা আন্দোলনের শিল্পিত আবেগপুঞ্জকে সংরক্ষিত করার এই কর্মোদ্যোগ, নিষ্ঠা ও দায়িত্ববোধ হাসান হাফিজুর রহমানের জীবনচেতনার এক গৌরবোজ্জ্বল প্রান্ত। জাতীয় ইতিহাসের এক মহত্তম অধ্যায়ের রক্তাক্ত অনুভূতিপুঞ্জকে গ্রন্থবদ্ধ করে বাঙালি জাতির জীবন ও শিল্পচেতনায় পটভূমিতে তিনি মর্যাদার স্থায়ী আসনে অধিষ্ঠিত হয়েছেন' (খান, ১৯৯৩, পৃ. ২৪)। এই সময়ে খুব সহজ ছিল না এমন একটি সাহিত্য-সংকলনগ্রন্থ প্রকাশ করা। একদিকে পাকিস্তানি শাসকশ্রেণির রক্তচক্ষু, অপরদিকে স্বাধিকার চেতনার অগ্নিমন্ত্রে জেগে ওঠার শক্তি। শেষ পর্যন্ত আগ্নেয়গিরির জ্বলন্ত লাভার মতো বেরিয়ে এলো ওই সময়ের তরুণপ্রাণ কবি-সাহিত্যিকদের রক্তস্নাত শব্দাবলি– *একুশে ফেব্রুয়ারী*। *একুশে ফেব্রুয়ারী* প্রকাশ করতে প্রথমত ও প্রধানত সবচেয়ে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন হাসান হাফিজুর রহমান। আন্তরিক প্রণোদনা থেকেই তাঁর এই কর্মোদ্যোগ। সংকলন প্রকাশের ব্যয় নির্বাহ করতে তিনি পৈতৃক জমি বিক্রি করে টাকা সংগ্রহ করেছিলেন। এই তথ্যটি দিয়েছেন সংকলনের প্রকাশক ও ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মোহাম্মদ সুলতান (১৯৮৩, পৃ. ৬৩)।

[*একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনগ্রন্থের প্রচ্ছদ; উৎস: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগার]

একুশে ফেব্রুয়ারী প্রকাশিত হয় ১৯৫৩ সালের মার্চ মাসে। এই তথ্যটি পাওয়া যায় *একুশে ফেব্রুয়ারী*'র ১৯৮৯ সংস্করণের প্রকাশক সুস্মিতা সুলতানার 'প্রকাশিকার নিবেদন' থেকে। প্রকাশের অব্যবহিত পরেই তৎকালীন সরকার একে বাজেয়াপ্ত ঘোষণা করে। পরবর্তীকালে ১৯৫৪ সালে পূর্ব পাকিস্তানে প্রাদেশিক নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট জয় লাভ করে ও সরকার গঠন করে। তাদের শাসনামলে, ১৯৫৬ সালে সেই নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হয়। *একুশে ফেব্রুয়ারী* প্রকাশ করে পুঁথি পত্র প্রকাশনী। প্রকাশক মোহাম্মদ সুলতান (১৯২৬-১৯৮৩)। প্রচ্ছদ এঁকেছেন আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১১) এবং ভেতরে বেশ কয়েকটি রেখাঙ্কন ও ছাপচিত্র এঁকেছেন মুর্তজা বশীর (১৯৩২-২০২০) ও অন্যান্য। সংকলনটির প্রথম সংস্করণ ক্রাউন সাইজে তৈরি করা হয়েছিল। পৃষ্ঠা সংখ্যা ছিল ১৮৩। দাম দু টাকা আট আনা। পরবর্তীকালে বিভিন্ন প্রকাশনা সংস্থা এর একাধিক সংস্করণ প্রকাশ করেছে।

একুশে ফেব্রুয়ারী সংকলনগ্রন্থে হাসান হাফিজুর রহমানের ভূমিকাসহ মোট তেইশটি রচনা স্থান পায়, যার মধ্যে একটি প্রবন্ধ, এগারোটি কবিতা, পাঁচটি গল্প, দুটি নকশা, দুটি গান, 'একুশের ঘটনাপঞ্জী' শীর্ষক একুশের ইতিহাস। আনিসুজ্জামানের (১৯৩৭-২০২০) হস্তাক্ষরে মুদ্রিত হয়েছে উৎসর্গপত্র (ঘোষ, ২০১৪, পৃ. ১৩৪), যখন তিনি ষোল বছরের কিশোর। উৎসর্গপত্রে লেখা ছিল:

যে অমর দেশবাসীর মধ্যে থেকে জন্ম নিয়েছে
একুশের শহীদেরা,
যে অমর দেশবাসীর মধ্যে অটুট হয়ে রয়েছে
একুশের প্রতিজ্ঞা,
তাঁদের উদ্দেশ্যে

অর্থাৎ প্রবল স্বজাত্যবোধ, দেশ ও দেশের মানুষের প্রতি দায়বদ্ধতা অনুভব করে, একুশের শহিদদের প্রতি অকৃত্রিম শ্রদ্ধাবোধ নিয়ে এই সংকলন প্রকাশের উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল। এই বোধের প্রকাশ সংকলনভুক্ত প্রতিটি রচনার মধ্যে স্পষ্ট। সম্পাদকীয় বা ভূমিকাংশে হাসান হাফিজুর রহমান সংহত বাণীবন্ধনে একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক তাৎপর্যকে লিপিবদ্ধ করেন। তাঁর উচ্চারণে প্রকাশিত হয়– একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন কেবল ওই সময়ের জন্যই তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠেনি; বরং তা হয়েছিল ভবিষ্যৎমুখী:

> একুশে ফেব্রুয়ারী পূর্ব পাকিস্তানের প্রতিক্রিয়াশীল শক্তির প্রথম ব্যাপক পশ্চাদপসরণের সূচনা করেছে। সূচনা করেছে জনতার ঐক্যবদ্ধ গণতান্ত্রিক আন্দোলনের বিজয়াভিযান এবং সুদূরপ্রসারী সাংস্কৃতিক নবজাগরণের। একুশে ফেব্রুয়ারী তাই পূর্ব পাকিস্তানের ইতিহাসে একটি অশেষ গৌরবমণ্ডিত ক্রান্তিকালের দিন (রহমান, ১৯৮৯, পৃ. ৩)।

বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার আন্দোলন জন্ম দিয়েছিল একুশে ফেব্রুয়ারিকে। *একুশে ফেব্রুয়ারী* সেই আন্দোলনের একটি ঐতিহাসিক দলিল, যার প্রধান কাণ্ডারি হাসান হাফিজুর রহমান। তিনি কেবল সম্পাদনাই করেননি, বাঙালির আত্মপরিচয়গত সংকট-মোচনে ও নতুন পরিচয় নির্মাণের ক্রান্তিকালে পালন করেছেন ঐতিহাসিক দায়িত্ব। একটি সাম্রাজ্যবাদী শক্তির অন্যায়ের বিরুদ্ধে অসংকোচে ও সামষ্টিকভাবে প্রতিবাদ করতে পেরেছিল তখনকার তরুণরা। আশঙ্কা ও নতুন আশাবাদের সন্ধিক্ষণে দাঁড়িয়ে রাষ্ট্রভাষা-আন্দোলন তথা একুশে ফেব্রুয়ারির প্রজ্বলিত চেতনাকে সফলভাবে শিল্পরূপ দিতে পেরেছিলেন তাঁরা।

এ দুই স্মরণিকা-সংকলন প্রকাশেরও আগে ১৯৫২ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার বালিগঞ্জ থেকে প্রকাশিত *ওরা প্রাণ দিল* শীর্ষক একটি একুশের স্মরণিকা সম্পর্কে জানা যায় ফজলুল করিমের *বায়ান্ন'র কারাগার* বইয়ের পরিশিষ্ট অংশে। প্রিন্টার্স লাইন থেকে জানা যায়, সেই সংকলনের প্রকাশক শিবব্রত বর্মণ, বেণু প্রকাশনী, ২০ বি, বালীগঞ্জ স্টেশন রোড, কলিকাতা-১৯; ছেপেছেন: প্রিন্টার্স কংগ্রেস লিঃ, ৩ ব্রিটিশ ইণ্ডিয়ান স্ট্রীট, কলিকাতা-১; প্রথম প্রকাশ: আশ্বিন ১৩৫৯। ২০ পৃষ্ঠার এই স্মরণিকায় কবিতা লিখেছিলেন বিমলচন্দ্র ঘোষ, সৈয়দ আবুল হুদা, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, মূর্তজা বশীর, নিত্য বসু, তানিয়া বেগম এবং 'সহকর্মী' ছদ্মনামে সম্পাদক নিজেই। তবে পরবর্তীকালে ফজলুল করিম (২০১৪, পৃ. ৭১) জানিয়েছেন এই সহকর্মী মূলত মানিকগঞ্জের বামপন্থি রাজনৈতিক কর্মী প্রমথ নন্দী। স্মরণিকার প্রথমেই ভাষাশহিদ সফিউর রহমানের ছবি মুদ্রিত হয়েছিল। এরপর কয়েকটি বাক্যে উল্লেখ করা হয়েছিল: 'মাতৃভাষার জন্যে শহীদ হয়েছেন ছাব্বিশ জন। আহত হয়েছেন একশ পঁচিশ জন। বন্দি হয়েছেন ন'শ জন।' প্রকাশের কিছুদিন পর পূর্ববঙ্গ সরকার এক বিশেষ গেজেট বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে এই স্মরণিকাটি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে (করিম, ২০১৪, পৃ. ৭২)। ফজলুল করিমের দাবি ও দৃষ্টান্ত অনুযায়ী *ওরা প্রাণ দিল* একুশের প্রথম স্মরণিকা।

[একুশের প্রথম স্মরণিকা *ওরা প্রাণ দিল*-র প্রচ্ছদ। ছবি: ফজলুল করিম রচিত *বায়ান্ন'র কারাগার* গ্রন্থ (২০১৪, পৃ. ৭৩)]

একুশের গান

পূর্বেই উল্লেখ করা হয়েছে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর লেখা একুশের গান ১৯৫৩ সালের একাধিক স্মরণিকা-সংকলনে প্রকাশিত হয়েছিল। *একুশে ফেব্রুয়ারী* সংকলনগ্রন্থ থেকে সবচেয়ে বড়ো প্রাপ্তি আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরী রচিত একুশের গান 'আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি'। এই গান ও একুশে ফেব্রুয়ারি এখন অভিন্ন সূত্রে গ্রথিত। এই গান আলোড়িত করেছিল পুরো বাঙালি জাতিকে। এই গান মুক্তিযুদ্ধপূর্ব সময়ে বাঙালির জাতীয়তাবাদী বোধকে করেছিল শানিত। একুশের সংকলনগ্রন্থে প্রকাশ পাবার আগেই গানটিতে সুরারোপ করেন আবদুল লতিফ (১৯২৭-২০০৫)। তাতে ছিল রণসংগীতের সুর। পরবর্তীকালে সংগীতপরিচালক আলতাফ মাহমুদ (১৯৩৩-১৯৭১) এতে খ্রিষ্টীয় প্রার্থনা-সংগীতরীতির সুর প্রদান করে গানের ব্যঞ্জনাকে বাঙালির সত্তায় গেঁথে দেন। গানটির সম্পূর্ণ অংশ বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য:

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।
ছেলেহারা শত মায়ের অশ্রু-গড়া এ ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।
আমার সোনার দেশের রক্তে রাঙানো ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি।

জাগো নাগিনীরা জাগো নাগিনীরা জাগো কাল বোশেখিরা
শিশু-হত্যার বিক্ষোভে আজ কাঁপুক বসুন্ধরা,
দেশের সোনার ছেলে খুন করে রেখে মানুষের দাবি
দিন বদলের ক্রান্তিলগ্নে তবু তোরা পার পাবি?
না, না, না, না খুনরাঙা ইতিহাসে শেষ রায় দেওয়া তারই
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি ॥

সেদিনও এমনি নীল গগনের বসনে শীতের শেষে
রাত জাগা চাঁদ চুমো খেয়েছিলো হেসে;
পথে পথে ফোটে রজনীগন্ধা অলকনন্দা যেনো,
এমন সময় ঝড় এলো এক, ঝড় এলো খ্যাপা বুনো ॥

সেই আঁধারে পশুদের মুখ চেনা,
তাহাদের তরে মায়ের, বোনের, ভায়ের চরম ঘৃণা
ওরা গুলি ছোঁড়ে এদেশের প্রাণে দেশের দাবিকে রোখে
ওদের ঘৃণা পদাঘাত এই বাংলার বুকে
ওরা এদেশের নয়,
দেশের ভাগ্য ওরা করে বিক্রয়
ওরা মানুষের অন্ন, বস্ত্র, শান্তি নিয়েছে কাড়ি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি।

তুমি আজ জাগো তুমি আজ জাগো একুশে ফেব্রুয়ারি
আজো জালিমের কারাগারে মরে বীর ছেলে বীর নারী
আমার শহীদ ভাইয়ের আত্মা ডাকে
জাগো মানুষের সুপ্ত শক্তি হাটে মাঠে ঘাটে বাটে
দারুণ ক্রোধের আগুনে আবার জ্বালবো ফেব্রুয়ারি
একুশে ফেব্রুয়ারি, একুশে ফেব্রুয়ারি॥
(আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর হস্তলিপি থেকে গৃহীত পাঠ; উদ্ধৃত, চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ১৪-১৫)

গানটি বেশ দীর্ঘ– ত্রিশ পঙ্‌ক্তি বিশিষ্ট; তবে গীত হয় প্রথম কয়েকটি পঙ্‌ক্তি। এ-নিয়ে আবদুল গাফ্‌ফারের অভিযোগ আছে। তিনি জানান:

> আমার দুঃখ গানটির যে অংশ উদ্দীপনামূলক সেই অংশটি ক্রমশ বর্জিত হচ্ছে। যে অংশটি শোকমূলক-শোকগাথামূলক সেটুকু শুধু গাওয়া হচ্ছে। উদ্দীপনাময় অংশ গাইতে Establishment ভয় পায়। আমি পাকিস্তান আমল থেকে দেখছি যে উদ্দীপনামূলক অংশটুকু তারা গায় না। ... আমার গানটিও খণ্ডিতভাবে গাওয়া হয় বেশিরভাগ ক্ষেত্রে। পুরো গানটি গাইতে Establishment ভয় পায়। এই ভীতি থেকেই একুশকে আমরা স্মৃতি করে ফেলেছি (চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ২৪-২৬)।

আবদুল গাফ্‌ফারের এই পর্যবেক্ষণ অনুষ্ঠানসর্বস্ব একুশে ফেব্রুয়ারি তথা 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনের ধারাবাহিকতার মধ্যেও উপলব্ধি করা যায়।

একুশের গান হিসেবে আবদুল গাফ্‌ফার চৌধুরীর গানটি বহুল জনপ্রিয়তা পেলেও প্রথম একুশের গানের রচয়িতা ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক। 'বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত ঘটনার পর একুশের প্রথম গান রচনা করেছিলেন ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক। ... গানটির সুর দেওয়া হয়েছিল হিন্দি 'দূর হাঁটো দূর হাঁটো। ঐ দুনিয়াওয়ালে, হিন্দুস্তান হামারা হায়'-এর অনুকরণে' (এম আর মাহবুব, উদ্ধৃত, আলীম, ২০২০, পৃ. ৪৩২)। ১৯৫২ সালের পরের কয়েক বছর প্রভাতফেরিতে তাঁর রচিত এই গান গাওয়া হতো। গানটি হুবহু উদ্ধৃত হলো:

ভুলবনা ভুলবনা এই একুশে ফেব্রুয়ারী
ভুলবনা।
লাঠিগুলি, টিয়ার গ্যাস, মিলিটারী আর মিলিটারী
ভুলবনা ॥
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই এই দাবীতে ধর্মঘট,
বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার রাজপথ,
ভুলবনা ॥
স্মৃতি সৌধ ভাঙ্গিয়াছ জেগেছে পাষাণে প্রাণ,
মোরা কি ভুলিতে পারি খুন রাঙা জয় নিশান?
ভুলবনা॥ (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ১২৭)।

এতে সুরারোপ করেছিলেন তাঁর অনুজ নিজাম উল হক। ভাষা আন্দোলনে শহিদদের উদ্দেশে গাজীউল হক আরও একটি গান রচনা করেছিলেন। বদরুদ্দীন উমরের কাছে পাঠানো চিঠিতে তার উল্লেখ পাওয়া যায় (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ১২৭)।

একুশের নাটক

একুশের প্রথম নাটক মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) রচিত *কবর*। এর রচনাকাল ১৯৫৩ সালের জানুয়ারি মাস। মুনীর চৌধুরী তখন ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির গণহত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকেরা এক প্রতিবাদ ও শোকসভা করেছিলেন ২৪শে ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরাতন ভবনে। ঐ সভায় বক্তব্য দিয়েছিলেন রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী (১৯২২-১৯৭৮), ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক খান সারওয়ার মুরশিদ (১৯২৪-২০১২) এবং মুনীর চৌধুরী (উমর, ২০১২, পৃ. ৩২০)। ২৬শে ফেব্রুয়ারি অধ্যাপক মুজাফ্ফর আহমদ চৌধুরী ও মুনীর চৌধুরীকে গ্রেফতার করা হয় এবং ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে আটক রাখা হয়। তাঁরা ১৯৫৪ সালে মার্চ মাসে যুক্তফ্রন্ট সরকার ক্ষমতাসীন হবার আগ পর্যন্ত ছাড়া পাননি (ইসলাম, ২০০৪, পৃ. ২৬৫)। কারাগারে বন্দি থাকা অবস্থায় আরেক রাজবন্দি বামপন্থি রাজনৈতিক রণেশ দাশগুপ্তের (১৯১২-১৯৯৭) গোপন চিঠির অনুরোধে '১৯৫৩ খ্রিস্টাব্দের ১৭ জানুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে বন্দি অবস্থায় মুনীর চৌধুরী *কবর* নাটকটি রচনা করেন' (জয়নুদ্দীন, ১৯৯৮, পৃ. ১০৮)। মুনীর চৌধুরীর নাটক রচনায় মুনশিয়ানা ছিল। তারই সার্থক প্রকাশ ঘটে জেলে বন্দিদের কুশীলব করে, নারীচরিত্র বর্জিত, স্বল্প আলোতে জেলখানার মতো একটি বিশেষ পরিস্থিতিতে ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি রাত দশটার পর *কবর* নাটক মঞ্চায়নের মধ্য দিয়ে। নাটকটির পরিচালনা করেন ফণী চক্রবর্তী। পুলিশ ইন্সপেক্টর হাফিজ, নাম-হীন নেতা, মুর্দা ফকির, গার্ড ও কয়েকটি মূর্তির সহযোগে মুনীর চৌধুরী যে একাঙ্কিকা রচনা করলেন এবং সকল গোপনীয়তা রক্ষা করে যে সফলভাবে মঞ্চস্থ করলেন, সে-কারণে *কবর* কেবল নাট্যসাহিত্য বা শিল্পের বিষয় হয়ে থাকে না, পরিণত হয় বাংলাদেশের ইতিহাসের অনিবার্য অনুষঙ্গে। 'রাজনৈতিক আন্দোলননির্ভর শিল্পসৃষ্টির সঙ্গে অভিন্ন হয়ে গেছে *কবরের* নাম। *কবর* মানে রাজনৈতিক সচেতনতায় উদ্দীপ্ত জনমনে গভীরভাবে প্রোথিত, প্রত্যয়বোধে ঋদ্ধ একটি সফল শিল্পরূপ' (আনিসুজ্জামান, ১৯৮৬, পৃ. ১০৫)। একবছর পূর্বের একুশের শোক ও ক্ষোভ শিল্পের আধারে ধরা পড়ে *কবর* নাটকে, যেখানে শ্রেণিচরিত্র নির্মাণের মধ্য দিয়ে শোষক ও শোষিতের অবস্থানটি সুচিহ্নিত করে দেন মুনীর চৌধুরী।

একুশের উদ্‌যাপন কখনোই সরল ছিল না। তেপ্পান্নর উদ্‌যাপন ভবিষ্যতের আন্দোলন ও রাজনৈতিক গতিধারার একটি পথরেখা নির্মাণ করে। তার অব্যবহিত পরেই দেখা যায় একে একে রাজবন্দিদের মুক্তি প্রদান, যুক্তফ্রন্ট গঠন, যুক্তফ্রন্টের ইশতাহারে একুশের স্মরণে একুশ দফা, নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের বিপুল বিজয় তথা মুসলিম লীগের পরাজয়– এমন আরও অনেক রাজনৈতিক ঘটনাক্রম। এর তাৎপর্য সম্পর্কে রফিকুল ইসলাম লিখেছেন:

> ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে রাষ্ট্রভাষা দিবসে [শহীদ দিবসে] সমগ্র বাংলাদেশে যে বিক্ষোভ অনুষ্ঠিত হয়েছিল, তাতে নূরুল আমিনের পরাজয় সূচিত হয়েছিল; আর ১৯৫৩ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত বারটার সময় সারা বাংলাদেশব্যাপী রাষ্ট্রভাষা বাংলার যে শ্লোগান উঠেছিল, সে শ্লোগান সরকার এবং মুসলিম লীগকে মানসিক দিক দিয়ে বিপর্যস্ত করে দিয়েছিল (মামুদ, ১৯৮৫, পৃ. ৩০)।

১৯৫৩ আর ২০২৪– এই দুই প্রান্তের উদ্‌যাপন থেকে উপলব্ধি করা যায়– কত যোজন যোজন ব্যবধান। 'শহীদ দিবস' এসে ঠেকেছে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' উদ্‌যাপনে। মর্মমূলে প্রবেশ না করে

অনুষ্ঠানসর্বস্বতা কেবল হাল আমলের বিষয় নয়; এর শুরু আরও আগে। ১৯৮১ সালে লিখিত এক প্রবন্ধে আবুল কাসেম ফজলুল হক (১৯৯৮, পৃ. ৩৯) জানাচ্ছেন:

> মর্মগত দিকদিয়ে জনগণের সেই চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা ১৯৫২ সনের 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ', ১৯৫৪ সনের 'যুক্তফ্রন্ট', ষাটের ও সত্তরের দশকের 'আওয়ামী লীগ' ও 'বাকশাল', এবং বর্তমানের 'বিএনপি' প্রভৃতি সংগঠনের নেতৃবর্গের চেতনা ও আশা-আকাঙ্ক্ষা থেকে ভিন্ন। প্রতিবছর একুশে ফেব্রুআরিতে রাত ১২টা ১ মিনিটের সময় আজিমপুর গোরস্তানে কিংবা শহীদ মিনারে কার আগে কে ফুল দেবে, তা নিয়ে যাঁরা ঠেলাঠেলি, ধাক্কাধাক্কি, মারামারি করেন, সংবাদপত্রের কিংবা টেলিভিশনের ক্যামেরার সামনে আসার জন্য ভীষণ কাণ্ড ঘটিয়ে বসেন, তাঁরা সব কিছুই নগদ নগদ আদায় করে ছাড়েন।

এই প্রবণতা হাল আমলে বেড়েছে বৈ কমেনি। তবে একাত্তর-পূর্বকালে একুশ যেভাবে বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলন তথা শোষণের বিরুদ্ধে, নিপীড়নের বিরুদ্ধে প্রধান প্রতিবাদী অনুষঙ্গ হতে পেরেছিল, একাত্তর-পরবর্তীকালে তার চেতনাগত স্বরূপের পরিবর্তন ঘটতে থাকে।

১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সাহিত্যসৃজন মূলত একুশে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপনেরই অংশ। স্বতন্ত্র শিল্প হিসেবে এসবের মূল্য নিশ্চয়ই আছে। কিন্তু একুশে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে রচিত কোনো সাহিত্যকর্মের বিচার কেবল 'শিল্পের জন্য শিল্প' দৃষ্টিকোণ দিয়ে করা যায় না। একুশে ফেব্রুয়ারি প্রথম বার্ষিকীকে ঘিরে যে রাজনৈতিক তৎপরতা, সাংগঠনিক কর্মকৌশল এবং একইসঙ্গে শিল্পসৃষ্টি, সাহিত্যসৃজন কিংবা উপস্থাপন– এ-সবগুলো মিলে যে চিহ্নসমষ্টি তৈরি করে তাকে বলা যায়– উদ্‌যাপনের রাজনীতি। প্রথম বার্ষিকী থেকে বর্তমান পর্যন্ত এর উদ্‌যাপনের ধরন বিভিন্ন সময়ে নানা রূপ পরিগ্রহ করেছে। দৈশিক ও বৈশ্বিক রাজনীতি ও সংস্কৃতির গতিপ্রকৃতি এর সঙ্গে যুক্ত থেকেছে। কিন্তু ১৯৫৩ সালের একুশে ফেব্রুয়ারি নানামাত্রিক কারণেই বিশেষ। প্রতিকূল পরিস্থিতি, পরোক্ষ চাপ ও বাধা সত্ত্বেও একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩-এর সর্বপ্লাবী উদ্‌যাপন কেবল উদ্‌যাপনের মধ্যেই সীমাবদ্ধ থাকে না; এর কতকগুলো চিহ্ন বাংলাদেশ জনাঞ্চলের জনস্পন্দন ও সাংস্কৃতিক মূল্যবোধের শনাক্তি– সর্বোপরি রাজনৈতিক দিঙ্‌নির্দেশনা প্রদান করে। এই সামূহিক কারণে একুশে ফেব্রুয়ারি ১৯৫৩ বাংলাদেশের ইতিহাসে গুরুত্বপূর্ণ ক্ষণবিন্দু।

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান (১৯৮৬)। *বাংলাদেশের নাট্যচর্চা*। ঢাকা: মুক্তধারা।

আল্‌হেলাল, বশীর (২০১৬)। *ভাষা-আন্দোলনের ইতিহাস*, তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আলীম, এম আবদুল (২০২০)। *ভাষা-আন্দোলন-কোষ*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

ইসলাম, রফিকুল (১৯৮১)। *স্মৃতিচারণ'৮১*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

ইসলাম, রফিকুল (২০০৪)। 'বাঙলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: সংক্ষিপ্ত রূপরেখা'। *বাঙলাদেশ*, দ্বিতীয় সংস্করণ। মনসুর মুসা [সম্পা.]। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম পুনর্মুদ্রণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১২)। *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* (খণ্ড ৩)। ঢাকা: সুবর্ণ।

করিম, ফজলুল (২০১৪)। *বায়ান্ন'র কারাগার*, তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

খান, রফিকউল্লাহ (১৯৯৩)। *হাসান হাফিজুর রহমান: জীবন ও সাহিত্য*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

খান, শামসুজ্জামান ও অন্যান্য [সম্পাদিত] (১৯৮৪)। *একুশের স্মারকগ্রন্থ ১৯৮৪*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ (২০১৪)। *কথামালা*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

চৌধুরী, আসাদ (২০১৫)। *আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী: একুশের গান ও আড্ডা*। প্রথম প্রকাশ। ঢাকা: প্রিয়মুখ প্রকাশন।

মতিন, আবদুল ও রফিক, আহমদ (২০১৭)। *ভাষা আন্দোলন : ইতিহাস ও তাৎপর্য*, পঞ্চম মুদ্রণ। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

মামুদ, হায়াৎ (১৯৮৫)। 'একুশে উদ্‌যাপনের ইতিহাস'। শামসুজ্জামান খান ও অন্যান্য [সম্পাদিত]। *একুশের স্মারকগ্রন্থ '৮৫*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মোমেনীন, আমিরুল [সংকলিত ও সম্পাদিত] (১৯৯১)। *একুশের সংকলন : গ্রন্থপঞ্জী [১৯৫৩-১৯৮৯]*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

রহমান, হাসান হাফিজুর [সম্পাদিত] (১৯৮৯)। *একুশে ফেব্রুয়ারী*, প্রথম প্রকাশের অনুরূপ সংস্করণ। ঢাকা: পুথি পত্র প্রকাশনী।

সুলতান, মোহাম্মদ (১৯৮৩)। 'অন্তরঙ্গ কথামালা', *হাসান হাফিজুর রহমান*। খালেদ খালেদুর রহমান [সম্পা.]। ঢাকা।

হক, আবুল কাসেম ফজলুল (১৯৯৮)। *একুশে ফেব্রুআরি আন্দোলন*। ঢাকা: জাগৃতী প্রকাশনী।

হক, গাজীউল (১৯৮০)। *স্মৃতিচারণ'৮০*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০২২)। 'পঞ্চাশের দশকের ঔপন্যাসিক: নবতর চেতনায় উজ্জ্বল'। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় পত্রিকা*। হারুন রশীদ [সম্পা.]। সংখ্যা ১০২-১০৩। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

পত্রিকা

দৈনিক *আজাদ*, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, ১৯৫৩।
সাপ্তাহিক *ইত্তেফাক*, ফেব্রুয়ারি, ১৯৫৩।

কান্দে বাংলা জননী ঢাকার শহরেঃ জন্ম, ইতিহাস-অনুষঙ্গ ও প্রাসঙ্গিকতায় হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'ঢাকার ডাক'

রঙিলী বিশ্বাস

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookRongili

প্রাক্‌কথন

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ২১শে ফেব্রুয়ারির গান 'ঢাকার ডাক'। গাইছি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে। ৩০শে এপ্রিল, ২০২৪। আমার সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সংগীত বিভাগের ছাত্ররা: নোবেল, কমল, কাফি, পিয়াল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কোনো অনুষ্ঠানে আমার ফিরে যাওয়া ৩৩ বছর পর, হেমাঙ্গ বিশ্বাস ঢাকায় যাবার ৪৪ বছর পর। সে-সময় (ফেব্রুয়ারি/মার্চ, ১৯৮০) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে কেন্দ্র করে বিভিন্ন অনুষ্ঠান ছাড়াও টঙ্গীতে হাজার হাজার শ্রমিক জমায়েতের সামনে তাঁর দল 'মাস্ সিঙ্গারস্'কে নিয়ে গান গেয়েছিলেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। 'ডাকসু', 'উদীচী', 'গণতান্ত্রিক লেখক শিবির'-এর মতো সংগঠন এবং বদরুদ্দীন উমর, শাহরিয়ার কবীরের মতো ব্যক্তিত্বের উদ্যোগে ঢাকার বিভিন্ন জায়গার অনুষ্ঠানে যে দুটি গান সবচেয়ে বেশি নাড়া দিয়েছিল তা হলো 'আমরা তো ভুলি নাই শহীদ' আর 'ঢাকার ডাক'। এ নিয়ে বিস্তারিত লেখা পরে, কিন্তু এবার ঢাকায় গিয়ে 'ঢাকার ডাক' গাওয়ার মুহূর্তগুলি, যখন দোহারকিতে রয়েছে সে-বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা আর যখন 'কান্দে বাংলা জননী ঢাকার শহরে'র মতো পঙ্‌ক্তিতে এসে ধুয়ো ধরছেন উপস্থিত সবাই, তখন সামগ্রিকভাবে যা হয়ে উঠছে তা আমার গায়কজীবনেও অনাস্বাদিতপূর্ব এক অভিজ্ঞতা।

ফিরে আসার পর জুন-জুলাই-এর উত্তুঙ্গ বাংলাদেশে– যাকে অনেকেই জুলাই অভ্যুত্থান বা দ্বিতীয় স্বাধীনতার আখ্যা দিয়েছেন– এই গানের কথাগুলোর এক আশ্চর্য পুনরুত্থান ঘটল। যেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস আবার লিখছেন এ গান, যেন এ লেখা একভাবে পূর্বনির্দিষ্ট ছিল:

ও ভাইরে ভাই– রফিকুলের মাথার খুলি
উড়ায় গরম শিশির গুলিরে
যেমন ফোরাত নদীর পাড়ে আজগর
বিষ তীর খাইয়া মরে।

অথবা,

ও ভাইরে ভাই-নিয়া আজিমপুরের গোরস্থানে
রাইতের নেশায় অতি গোপনে রে
বিনা জানাজা বিনা কাফনে
মাটি দিল কবরে।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'দিনব্যাপী সেমিনারে পরিচয় হয়েছিল পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপনারত এম. আব্দুল আলীম-এর সঙ্গে– যিনি বহু বছর ধরে ভাষা আন্দোলন ও তার পারিপার্শ্বিক দিক নিয়ে গবেষণারত। শেষদিনের সান্ধ্য-আড্ডার অবকাশে তিনি আমাকে দ্বিতীয়বার বলেন, ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে যে যে সংকলন প্রকাশিত হয়েছে, অদ্যাবধি তার সর্বপ্রথমটি বস্তুত কলকাতা থেকেই প্রকাশিত। দ্বিতীয়বার বললাম, কারণ প্রথমবার এ বিস্ময়কর (না কি ততটা নয়?) খবরটি আমাকে দিয়েছিলেন বাংলাদেশেরই একজন বহুবছর আগে আচম্বিতে এবং দূরাভাষে– এবং আমার কাছে তিনি এ-বিষয়ে বিশদ তথ্য জানতে চেয়েছিলেন। বলা বাহুল্য, আমি কিছুই বলতে পারিনি, বলেছিলাম বরং আপনি যদি আরো কিছু তথ্য কখনও পান, আমাকে জানাবেন।

কলকাতা ফিরে আসার পর প্রতিশ্রুতি অনুযায়ী তিনি আমাকে বইটির প্রচ্ছদ, সম্পূর্ণ গান এবং ভূমিকার কিছু অংশ পাঠান। তাঁর লেখা থেকে জানতে পারি:

> আমরা এতদিন ধরে জেনে আসছি একুশের প্রথম সংকলন হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত 'একুশে ফেব্রুয়ারী' (মার্চ ১৯৫৩)। কিন্তু এর আগে 'ওরা প্রাণ দিল' (সেপ্টেম্বর ১৯৫২) নামে একুশের একটি সংকলন প্রকাশিত হয় ভারতের কলকাতার বালিগঞ্জ স্টেশন রোডের বেনু প্রকাশনী থেকে। প্রকাশক শিবব্রত সেন। সংকলনটির সম্পাদক ছিলেন মানিকগঞ্জের কমিউনিস্ট-কর্মী প্রমথ নন্দী। চিত্রশিল্পী সোমনাথ হোড় প্রচ্ছদ এঁকেছিলেন। সংকলনটিতে মোট সাতটি কবিতা স্থান পায়: কবিতাগুলো হলো– হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'ঢাকার ডাক', মুর্তজা বশীরের 'পারবে না', নিত্য বসুর 'জননী গো', বিমল চন্দ্রের 'শহীদ বাংলা', সৈয়দ আবুল হুদার 'জন্মভূমি', তানিয়া বেগমের 'বন্ধুর খোঁজে' এবং প্রমথ নন্দীর 'প্রিয় বন্ধু আমার'। পূর্ববঙ্গ সরকার ১৯৫৩ সালে সংকলনটি নিষিদ্ধ করে। মোহাম্মদ সুলতানের পুঁথিঘর প্রকাশনীতে পুরনো কাগজপত্রের মধ্যে এটি খুঁজে পেয়েছিলেন ফজলুল করিম। পরে তিনি তাঁর 'বায়ান্ন'র কারাগার' গ্রন্থের শেষে এটি মুদ্রিত করেন।

এবার ঢাকা সফর ব্যতীত সরাসরি এই তথ্য আমার পক্ষে সংগ্রহ করা সম্ভব ছিল না। এই বই-এর প্রচ্ছদের ছবিটি রইল সঙ্গে।

সম্পূর্ণ গানটি ছিল এরকম

ঢাকার ডাক

হেমাঙ্গ বিশ্বাস

(পূর্ব বঙ্গের গাথার ঢঙে রচিত)

শোনো দেশের ভাই ভগিনী
শোনো আচানক কাহিনী।
কান্দে বাংলা জননী
ঢাকার শহরে।

ও ভাইরে ভাই- ছিল বুড়ীগঙ্গার মরা পানি
তার বুকে কে আনিলো জোয়াণী রে
কার কইলজার খুনে বয় উজানী
শুকনা বালুর চরে।

ও ভাইরে ভাই- একুশে ফেব্রুয়ারি দিনে
সুখের মতো নয়া ফাগুনে রে
হঠাৎ দিন দুপুরে অমানিশার
ঢাকলো অন্ধকারে ॥

ও ভাইরে ভাই- যে ভাষায় আমার ফুটে বুলি
ফুটে আমার প্রাণের কলি রে
সেই গুলবাগে চালাইলো গুলি
নিতে সেই ফুল ছিঁড়ে ॥

ও ভাইরে ভাই- যত ইস্কুল কলেজ বিদ্যালয়ে
ধ্বংসের আগুণ দিল জ্বালাইয়ে রে
কত বাপের আশা, মায়ের ভাষা
সেই অনলে পুড়ে ॥

ও ভাই রে ভাই- কত ছাওয়াল ছাত্র দেশের রত্ন
ছিল তাদের কতই স্বপ্ন রে
(কুহু) কুহ না ডাকিতে কোকিল
লুটায় লহুর ধারে ॥

ও ভাইরে ভাই- রফিকুলের মাথার খুলি
উড়ায় গরম শিশির গুলিরে
যেমন ফোরাত নদীর পাড়ে আজগর
বিষ তীর খাইয়া মরে ॥

ও ভাইরে ভাই- পরের দিন শহীদ মিছিলে
বিদ্রোহের বান্ধ গেল খুলেরে
ছাত্র মজুর কেরাণী মিলে
জন সমুদ্দুরে ॥

ও ভাইরে ভাই- আইল যখন হাইকোর্টের ধারে
আচমকা ঝাপাইয়া পড়েরেজ-
তাজা রক্ত মাংস খাইল ছিঁড়ে
(যত) হিংস্র জানোয়ারে ॥

ও ভাইরে ভাই (তবু) খুনি কসাইর মিটেনা তিয়াস
হাটে, বাটে জমলো লাশরে
রমনার সবুজ মাছ ঘাসের মাটি
লাল হইল রুধিরে ॥

ও ভাইরে ভাই-নিয়া আজিমপুরের গোরস্থানে
রাইতের নেশায় অতি গোপনে রে
বিনা জানাজা বিনা কাফনে
মাটি দিল কবরে ॥

ও ভাইরে ভাই তবু শোন আজব ব্যাপার
ওঠে রাতারাতি শহীদ মিনার রে
দুশমন যত ভাঙ্গে তারে
ওঠে সে বারে বারে ॥

ও ভাইরে ভাই শহীদের খুনের রাঙা পিরান
নিশান হইয়া ছাইলো আসমান রে
সেই নিশানে কেয়ামতের নিশানী
দিল জালিমেরে ॥

ও ভাইরে ভাই (সেদিন) চাকা বন্ধ হইল রেলে
নারায়ণগঞ্জের সুতা কলে রে
সে দিন উঠল না ঢেউ পদ্মার জলে
সুজন নাইয়ার সুরে ॥

ও ভাইরে ভাই- ঘরের বধূ কুল-ললনা
বেহুস হইয়া আর কান্দে না রে
(আইল) হাজার হাজার বিবি সাকিনা।
লড়াই এর প্রান্তরে ॥

ও ভাইরে ভাই- ফুটল লাল ফাগুনে আগুনের ফুল
শহীদ আবুল বরকত রফিকুল রে
মেঘনার দুই কুল হইল আকুল

জীবনের জোয়ারে ॥

কাইন্দনা মা কাইন্দো না আর বঙ্গ জননী
তুমি যে বীর প্রসবিনী গো তুমি ফাতেমা জননী ॥

কে বলে তোমার অনাথিনী, অবলা রমনী
শত ক্ষুদিরাম, কানাই এর তুমি গর্ভধারিনী
নয়া-বাংলার কারবালায় কারা জান দিল কোরবাণী
শুনাও মাগো শুনাও সেই কাহিনী ॥

আইজ আনন্দের মহরম মা গো খুশীর আগমনী
পদ্মার বুকে মিলল ভাইয়া গঙ্গানদীর পানি
মহরুম আত্মার করে মোনাজাত বাংলার ভাই ভগিণী'
মুছ মাগো মুছ চক্ষের পানি ॥

কৃত্তিবাস চন্ডীদাস, আলোয়াল একই বৃক্ষের ফুল
মধু শরৎ রবীন্দ্রনাথ কায়কোবাদ নজরুল
এই বাংলা ভাষায় গাইয়া গেল যত আউল বাউল
(আইজ) ঢাকার সহরে তাদের সম্মিলনী ॥

যে ভাষায় আমি কান্দি হাসি, ভাষা আমার জান
যে ভাষায় রাখাল বাজায় বাঁশী, মাঝি ধরে টান
(আজ) মেশিনগান কি রুখতে পারে মোদের বাংলা গান
জান যাবে তো, যাবে না জবানী ॥

শহীদ স্তম্ভ ভাঙে কারা সাধ্য আছে কার
মোদের সিনায় সিনায় ওঠে শহীদের মিনার
সেই মিনারে মোয়াজ্জীনের নয়-জমানার
শোনো ভোরের শোনো আজান ধ্বনি ॥[১]

(বানান ও যতিচিহ্ন অপরিবর্তিত)

গানের শুরুতে পূর্ববঙ্গের গাথার ঢঙে লেখা বলে যা বলা হয়েছে তা বস্তুত এক শোকগাথা এবং অত্যুক্তি হয় না যদি বলি, এই গাথায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস জারিগানের এক আদল রাখতে চেয়েছেন। 'ময়মনসিংহের ব্যালাড গাইবার রীতি-অনুসারী গান বলে যখন একে হেমাঙ্গ বিশ্বাস পরে অভিহিত করছেন, তখন সম্ভবত এর দিকেই তিনি দিঙ্‌নির্দেশ করছেন। এটাও বোধকরি মনে রাখা উচিত যে, মহরম মাসে সারা বাংলাদেশে জারিগানের যে-সব আসর অনুষ্ঠিত হয়ে থাকে, আজও তার মধ্যে নেত্রকোণা ও কিশোরগঞ্জ

অঞ্চল সমধিক পরিচিত। অর্থাৎ, মহরম মাসে আহাজারিমূলক দিনরাতের জারিগানে ময়মনসিংহের বয়াতিদের অবস্থান এখনও খানিকটা বিশেষ। নেত্রকোণা, জারিগান এবং এই গাথার সম্পর্ককে নিয়ে পরে আরো কিছুটা আলোচনা করছি।

কিন্তু আরো গুরুত্বপূর্ণ; একসময়ের এই অতিখ্যাত গান, যা খানিকটা বিস্মৃতির দিকে চলে গেছেও বটে চর্চার অভাবে, সে-গান রচনা সম্পর্কে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখার দিকে ফিরে তাকানো।

গণনাট্য সংঘ, লোক-উপাদান ও বাহিরানা

তাঁর গান রচনার ঐতিহাসিক ভিত্তিভূমিটি একটু ফিরে দেখা যাক:

> ...১৯৪১ সালে হিটলার সোভিয়েত রাশিয়া আক্রমণ করার পর দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের চরিত্র বদলে যায়। তখন আন্তর্জাতিক স্তরে প্রধান শত্রু হয়ে দাঁড়ায় ফ্যাসিস্টরা, গড়ে ওঠে ফ্যাসিবিরোধী ফ্রন্ট। এরই মধ্যে ১৯৪৩ সালে আনুষ্ঠানিকভাবে 'গণনাট্য সংঘ'র জন্ম হয়। প্রগতি লেখকশিল্পী সঙ্ঘ (১৯৩৬) থেকে স্বতন্ত্র সংগঠন হিসাবে গণনাট্য সংঘের আত্মপ্রকাশের কারণ ছিল। লেখকদের কারবার লিখিত শব্দ নিয়ে, তাঁদের আবেদন সীমাবদ্ধ শিক্ষিতদের মধ্যে। কিন্তু আমরা যারা গান গাইতাম, নাটক করতাম তাদের আবেদন এই নিরক্ষর দেশে অনেক ব্যাপক জনতার সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের। সুতরাং গণনাট্য সংঘের আলাদা সংগঠন হিসাবে আত্মপ্রকাশের প্রয়োজন ছিল।

তাঁর 'গণনাট্য ও আত্মকথা' (*উজান গাঙ বাইয়া*)-য় লিখছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস।

গণনাট্যের জন্মের শুরু থেকেই একথা একভাবে স্বীকৃত ছিল যে, শিল্পীদের সাংস্কৃতিক দিকগুলিকে যদি মানুষের সঙ্গে যোগাযোগের মাধ্যম হিসাবে উঠে আসতে হয়, তাহলে গান, নাচ, ছায়ানাট্য, নাটক বা এ-ধরনের পারফর্মেটিভ আর্টে এ দেশের বিভিন্ন লোকজ আঙ্গিককে ব্যবহার করাই শ্রেয়, কারণ এগুলো মানুষের চেনা, এদের সঙ্গে সাধারণ মানুষের আত্মিক যোগাযোগ বহু শতাব্দীর। গণনাট্যের শিল্পীরা যদি মানুষেরই কাছে গিয়ে শিখতে পারেন সে-আঙ্গিক, আত্তীকৃত বা প্রয়োগ করতে পারেন তাদের নিজস্ব শিল্পে, সেটা তাঁদের কাজকে যে ব্যাপ্তি দেবে তা অন্য কোনোভাবে পাওয়া সম্ভব নয়।

আজকের স্বল্প পরিসরে বিষয়টির সম্পূর্ণ আলোচনা অসম্ভব। শুধু এটুকু বলা যেতে পারে যে, এই শিল্পগত আদর্শ একক বা যৌথভাবে যাঁরা পালন করার চেষ্টা করেছেন এবং সফল হয়েছেন তাঁদের মধ্যে বহু লোকশিল্পী (একইসঙ্গে শ্রমজীবী মানুষ) আছেন। যেমন নিবারণ পণ্ডিত, গুরুদাস পাল, দাশরথি লাল, আন্নাভাও শাঠে, অমর শেখ, আছেন শহরে বাস-করা শিল্পীরাও, যাঁরা কমিউনিস্ট পার্টি বা গণনাট্য বা উভয়েরই সদস্য পদে আসীন থেকে বা না থেকে লোকজ ধারা থেকে নানা উপাদান আহরিত করে নিজেদের প্রতিবাদী সৃষ্টিকে সমৃদ্ধ রেখেছিলেন নিবারণ পণ্ডিত বা গুরুদাস পালের মতো। এই শেষোক্ত মানুষদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখের দাবি রাখেন ঋত্বিক ঘটক, ভুপেন হাজারিকা, উৎপল দত্ত, বিজন ভট্টাচার্য, বিনয় রায় এবং অবশ্যই হেমাঙ্গ বিশ্বাস। লোকসুর, লোকনাট্যের ধরন, দেশজ আঙ্গিককে আত্তীকরণে হেমাঙ্গ বিশ্বাস, ঋত্বিক ঘটক, ভুপেন হাজারিকা, বিজন ভট্টাচার্য বা বিনয় রায়কে সম্ভবত আলাদা করে মাথায় রাখতেই হয়নি যে এটা তাঁদের সম্মিলিত শিল্পীমঞ্চের বা সময়ের দাবি। লোক-ঐতিহ্যের সঙ্গে তাঁদের প্রতিনিয়ত দেওয়া-নেওয়ার সম্পর্ক এতখানিই তীব্র ছিল যে, দুর্ভিক্ষ-পরাধীনতা-দেশভাগ-দাঙ্গা-আকীর্ণ দ্রোহকালের যে ছবি তাঁরা নানা মাধ্যমে এঁকেছেন, তাতে অনায়াসে এসেছে বিভিন্ন

লোক-আঙ্গিকের যৌথ স্মৃতি বা প্রতীক। উদাহরণস্বরূপ, যদি হেমাঙ্গ বিশ্বাসকে আমরা নিই, দেখব গণনাট্য প্রতিষ্ঠার (এবং মন্বন্তরের) বছর ১৯৪৩– বা তার আগে ১৯৪২ সালেই তিনি রচনা করেছেন তাঁর সুবিখ্যাত গান "তোমার কাস্তেটারে দিয়ো জোরে শান, কিষান ভাই রে" যা সে-সময় কৃষকদের কণ্ঠে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে অতিদ্রুত ছড়িয়ে গিয়েছিল এবং যে-গান তাঁকে এক বিপুল পরিচিতি দিয়েছিল সাধারণ মানুষের মধ্যে। গানটির সুরসংযোজনায় লুলা নদীতে এক মাঝির গলায় শোনা সারিগানের আদল ব্যবহার করেছিলেন তিনি। হেমাঙ্গ বিশ্বাস পরে লিখেছেন, এ-গানের এমন অভূতপূর্ব সাফল্য তাঁকে একটা ব্যাপারে সুনিশ্চিত করেছিল যে, জনগণের চেনাশোনা, পরিচিত আঙ্গিকে বিপ্লবী বিষয়বস্তু পৌঁছে দেওয়াই হলো ঠিক রাস্তা। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের ক্ষেত্রে এর একটা অন্য দিকও ছিল। 'আঞ্চলিকতা' শব্দটা তাঁর লোকসংগীতের তত্ত্বায়নের সাপেক্ষে এক বিশেষ তাৎপর্য বহন করে। তিনি মনে করতেন, লোকসংগীতের নির্যাসটুকু ধরা আছে এই শব্দে। এক অঞ্চলের ইতিহাস-ভূগোল-ভাষা-সুর-তাল-লয়-বাজনা-গায়কী, তার কথা বলার ধরন, কাজের ছন্দ, প্রতিদিনের জল-হাওয়া-রোদ-বাতাসে মিশে থাকা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম লোক-ঐতিহ্যের নিজস্বতা সে-অঞ্চলের লোকসংগীতের প্রাণভ্রমরা। এককথায়, আঞ্চলিকতা বা (তাঁর সৃষ্ট শব্দ) 'বাহিরানা'কে বাদ দিয়ে লোকসংগীত-চর্চা সম্ভব নয়।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস: গণনাট্য আন্দোলন, লোকসংগীত ও আত্মসমীক্ষা

হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর 'গানের বাহিরানা' বইতে 'লোকসংগীতের কয়েকটি আধুনিক সমস্যা' প্রবন্ধে লিখছেন:

> ... কোনো বিশেষ রচয়িতা যদি আজকের কৃষক-বিদ্রোহের বা তেভাগা আন্দোলনের অমর শহিদদের আত্মদানের অনুপ্রেরণায় লোকসংগীত রচনা করেন– লৌকিক সুর ও রচনার ভঙ্গি অব্যাহত রেখে যা লক্ষ লোকের মনে আলোড়ন তোলে, যা জনসাধারণ গ্রহণ করে তাদের নিজের গান বলে তবে আপত্তির কি আছে? বরঞ্চ এটাই লোকসংগীতের রূপান্তরের স্বাভাবিক ধারা। অথচ আমাদের কিছু গোঁড়া লোকসাহিত্য গবেষক রাজনীতি আছে বলে আঁতকে ওঠেন। কেউবা বলেন, লোকসংগীতে এসব হলো প্রক্ষিপ্ত। সিপাহী-বিদ্রোহে যে অসংখ্য লোকগীতি উত্তর ভারতে ছড়িয়ে পড়েছিল, তাতে কি রাজনীতি নেই। ভগৎ সিং-এর উপর যে অসংখ্য গান পাঞ্জাবে ছড়িয়ে আছে, মনিরাম দেওয়ান-এর ফাঁসির উপর যে অসংখ্য গান আসামে ছড়িয়ে আছে তাতে কি রাজনীতি নেই! জাতীয় মুক্তি আন্দোলনজাত গানকে কেউ কেউ স্বীকৃতি দিলেও কৃষকের শ্রেণীসংগ্রামজাত গানকে তারা কিছুতেই গ্রহণ করতে নারাজ। ভারতের অসংখ্য কৃষি-বিদ্রোহে জনসমাজে বহু গান রচিত হয়েছে। আমাদের গবেষকদের অধিকাংশের প্রতিক্রিয়াশীল গোঁড়ামির জন্য ওই সব গান সংগৃহীত হয়নি এবং অনেক লোপ পেয়েছে।
>
> এখানেই গণনাট্য সংঘ বিশেষ ভূমিকা নিয়ে অবতীর্ণ হয়। সারা ভারতে কৃষক ও শ্রমিকের গণশ্রেণি-সংগ্রাম যত নতুন জীবনবোধে শত শত গান সেদিন রচিত হয়, তার এক অংশ কৃষক আন্দোলনে নিয়োজিত আমাদের মতো শিক্ষিত শ্রেণির রচয়িতা, অন্য অংশ নিরক্ষর চাষীর আপন ঘরেই রচয়িতা। আরেকটি বড়ো অংশ হলো যারা প্রত্যক্ষ আন্দোলনে ছিলেন না, যারা আউল-বাউল নামেই খ্যাত ছিলেন তাদের ভাবধারায় সেদিনের আন্দোলনের জোয়ারের ধাক্কা পড়েছিল এবং তারাও স্বতঃস্ফূর্ত গান রচনা করেছিলেন। তাই নেত্রকোণায় লক্ষ কৃষক-এর সমাবেশ আমাদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠানে রবাহূত রসিদউদ্দিন, জামসেদউদ্দিন প্রমুখ আউলিয়া গায়করা আমাদের সকলকে বিস্মিত করে ময়মনসিংহের 'ব্যালাড' গাইবার বিশেষ ঢঙে যখন গান ধরলেন:

আমার দুঃখের অন্ত নাই
দুঃখ কার কাছে জানাই
সুখের স্বপন ভাঙলো রে
চুরাই বাজারে
ভাইরে ভাই তেরশো পঞ্চাশের কথা মনে কেউর পরে গো
মনে কি কেউর পরে
ক্ষুধার জ্বালায় বুকের ছাওয়াল মায়ে বিক্রি করে
চুরাই বাজারে।[২]

> তখন বুঝতে পারি, আউলিয়াদের 'আবহাওয়াতের' ত্রিবেণী সংগমের সাধনা থেকে বিক্ষুব্ধ গণসমুদ্র সংগ্রামে টেনে এনেছে চোরাইবাজার ও দুর্ভিক্ষ। জনসাধারণের অবিচ্ছেদ্য অংশ হিসাবে তাঁরাও গণবিক্ষোভের শরিকদার। নতুন প্রাণপ্রবাহে লোকসঙ্গীত সমৃদ্ধ হলো। ...আমাদের মতো শিক্ষিত রচয়িতাদেরও কিছু গান লোকসঙ্গীতেই অঙ্গীভূত হয়ে আজও বেঁচে আছে। সে-সময় আমাদের দৃষ্টি খুব স্বচ্ছ ছিল না। সচেতনভাবে ততটা গান করিনি, আন্দোলনের তাগিদে যতটা করেছি। লোকসঙ্গীত রচনা করব বলে করিনি। এজন্য তার মধ্যে কতকগুলি লোকসঙ্গীত হিসেবে উৎরে গেছে কথায়, সুরে ও ঢঙে। সে-সময় গণনাট্য রচনার অধিকাংশই লোকসঙ্গীতের অন্তর্ভুক্ত হতে পারেনি। লৌকিক রূপরীতি ও ঢঙ-এর বিচারে আমরা তাকে বলি 'গণসংগীত'। কিন্তু নিবারণ পণ্ডিত, বিশু পণ্ডিত, রমেশ শীল প্রমুখ সত্যিকার লোকশিল্পীদের সেদিনকার বহু রচনা লোকসঙ্গীতের ধারার সঙ্গেই মিশে গিয়েছিল। সর্বভারতীয় এই আন্দোলন লোকসঙ্গীতে নতুন প্রাণসঞ্চার করেছিল। কিন্তু গণনাট্য আন্দোলনের একজন আদি উদ্যোক্তা হিসেবে আমাকে স্বীকার করতেই হয়, আমাদের সেদিন ঘনিষ্ঠ গণসংযোগে থাকলেও লোকসংস্কৃতির ও লৌকিক ঐতিহ্যের অধ্যয়নে যে নিষ্ঠা ও অধ্যবসায় দরকার তার সুযোগ ও সময় আমাদের ছিল না। জনসাধারণের সঙ্গে গভীরভাবে মিশবার সুযোগ পেলেও সে তুলনায় সংগ্রহ করতে পারিনি। ফলে আন্দোলনের ঢেউ পলিমাটি যথেষ্ট বয়ে আনলেও সে তুলনায় ফসল আহরণ আমরা করতে পারিনি (বিশ্বাস, ২০১২)।

এই আত্ম-অবলোকন, এই সমালোচনার ভঙ্গিমা তাঁর বই *উজান গাঙ বাইয়া*-র বিভিন্ন আলোচনা বা টুকরো স্মৃতিকথায় বারংবার এসেছে। মূলত নিজের গান নিয়েই কিন্তু অনেক ক্ষেত্রে আন্দোলনের গান নানাবিধ কারণে যে-সব খাতে বইছিল, তা নিয়েও। এ-কথা মূল আলোচনা থেকে খানিকটা সরে গিয়েই আমি বললাম, কারণ এর পরের অংশে নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলন, হাজং বিদ্রোহ এবং নিবারণ পণ্ডিতের গানের প্রসঙ্গের অবতারণা যখন করব, বিশদভাবে আলোচনার অবকাশ না থাকলেও সে-সব গান নিয়ে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের বিশ্লেষণাত্মক লেখার কিছু সূত্রের প্রতি দিঙ্‌নির্দেশ করব আমি। যাঁরা বিশেষভাবে অবহিত হতে চান এ-প্রসঙ্গ তাঁদের জন্য।

নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলন

১৯৪৫ সালে নেত্রকোণার নাগড়ায় তিনদিনব্যাপী সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয় ৮/৯ এপ্রিল। স্থান পারার মাঠ। ইতিহাস-সূত্র থেকে পাচ্ছি (রাশেদা, ২০২১):

১৯৩৮ সালে বিশিষ্ট আইনজীবী কামিনী দত্তের উদ্যোগে কুমিল্লায় প্রথম সারা ভারত কৃষক সম্মেলন হয়েছিল। ১৯৪৫ সালে সারা বাংলায় কৃষক সম্মেলন অনুষ্ঠানের জন্য ময়মনসিংহ জেলা দায়িত্ব নিতে পারে বলে কমরেড মুজফ্ফর আহমদ প্রাদেশিক কমিটির সভায় প্রস্তাব দেন মণি সিংহকে লক্ষ্য করে। উত্তরে মণি সিংহ বলেছিলেন, ''আমাদের কমিটিতে এটি আলোচিত হয়নি।'' মুজফ্ফর আহমদ বলেছিলেন, ''আমি বিশ্বাস করি আপনারা এটা পারবেন। অন্য কোনো জেলা এখন পারবে না।" ময়মনসিংহ জেলা কমিটির সভায় সম্মেলনটি নেত্রকোণায় করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হলো।

মণি সিংহের নিজের কথায়:

নেত্রকোণা শহরের নদীর অপরপারে প্রায় একশত একরের একটি মাঠ সম্মেলনের জন্য নেওয়া হলো। মালিক খুশিমনে তা দিলেন এবং কিছু দূরে তার বাড়িতে সব নেতাদের থাকার ব্যবস্থা করবেন বলে জানালেন। পাহাড় থেকে একশ পঁচিশজন ভলান্টিয়ার আনা হলো। তারা সভাস্থলে বেড়া দেবে, মঞ্চ তৈরি করবে, তাছাড়া হাসপাতাল বানাবে। পঞ্চাশ হাজার ডলু ও তরুই বাঁশ কৃষক ভাই ও জনসাধারণ দান করলেন। এক বাঁশের শহর তৈরি হতে লাগলো। পঁচিশটি টিউবওয়েল পোঁতা হলো। পাঁচশত লাইট বিভিন্ন স্থান থেকে সংগ্রহ করা হলো। এক মাড়োয়ারি রিলিফ কমিটি আমাদের অনুরোধে হাসপাতালের খরচ দিতে রাজি হলেন। গুদামঘর করা হলো। বিভিন্ন স্থান থেকে কৃষক ও জনসাধারণ চাল দিয়ে এবং অন্যান্যভাবেও সাহায্য করলেন। চাল এসে গুদামে জমা হতে লাগল। লাকড়ির জন্য জেলা বোর্ডের রাস্তার দুইপাশের গাছ থেকে ডাল কাটার অনুমতি নেওয়া হলো। আমরা নদীর ওপর তিনটি পুল বানালাম। এই সকল পরিকল্পনায় ছিলেন অজিত মিত্র। ইঞ্জিনিয়ারিং বিষয়ে তার ভালো জ্ঞান ছিল। বিভিন্ন জেলা থেকে কমরেডরা সাহায্য করার জন্য এগিয়ে এলেন। তাঁদের প্রতিদিন প্রচারকাজে লাগানো হলো। ব্যাপক প্রচারকাজ যখন চলছে, তখন কংগ্রেস ও মুসলিম লীগ হতে দুইটি ইশতেহার বিলি করে ঐ সভায় জনগণকে যোগদান করতে নিষেধ করা হলো। আমাদের সমর্থক উকিলরা বললেন, 'আপনি মুসলিম লীগ নেতা উকিল কবির উদ্দীনের সাথে দেখা করে আপনার বক্তব্য বলেন।' আমি তাই করলাম। বললাম যে, আমরা টংক উচ্ছেদের আন্দোলন করছি- এটা আপনাদের বিরুদ্ধে আন্দোলন না। কবির উদ্দীন বললেন, 'আপনারা সভা করুন, আমরা বাধা দেব না।' আমি কংগ্রেসের প্রেসিডেন্টের সাথে আলাপ করলাম। তিনিও বললেন, 'যাও তোমরা সারা ভারত সম্মেলন করতে পার, আমরা আর কিছু বলব না, দূর থেকে দেখব।' সম্মেলনের কিছুদিন আগে জুঁইফুল রায়ের নেতৃত্বে একদল মহিলা গ্রামে-গ্রামে মহিলাদের মধ্যে প্রচারে বের হয়ে গেলেন। এই সময়ে আমার দিদি নির্মলা স্যান্যালও পশ্চিমবঙ্গ থেকে এসে প্রচারের কাজে অংশগ্রহণ করলেন। নির্মলা স্যান্যাল ছিলেন মেদিনীপুর কমিউনিস্ট পার্টির জেলা কমিটির সভ্য। নেত্রকোণা শহরবাসীরা সম্মেলনের আয়োজনের বিশালতা দেখে বিস্মিত, বিমুগ্ধ ও বিব্রতবোধ করছিলেন। কৃষ্ণ নগর (পশ্চিমবঙ্গ) থেকে লক্ষ্মীপাল নামে একজন কারিগর এসে আটফুট উঁচু একটি মূর্তি তৈরি করলেন– হৃদয় নামে এক হাজং কমরেডের আদলে। মূর্তিটির হাতের শৃঙ্খল ভেঙে গিয়েছে বটে, কিন্তু পায়ের শৃঙ্খল এখনও আছে। সভামঞ্চ তৈরি করলেন নেত্রকোণার কুশলী কারিগররা। এটা যেমন বৃহৎ, তেমনি অত্যন্ত সুন্দর। পাহাড় অঞ্চলে প্রচার চলেছে কৃষক সভা ও সারা ভারত সম্মেলনের। সেখানে সকলের মধ্যে এমন উৎসাহ সৃষ্টি হলো যে, মেয়ে-পুরুষ, বৃদ্ধ, বাড়ির সকলেই আসবে। আমি বুঝিয়ে বললাম, বৃদ্ধারা বাড়িতে থাকবে আর মেয়ে-পুরুষেরা সভায় আসবে।' ...তখনও দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ চলছে। রেজকির (খুচরা পয়সা) অভাব প্রচণ্ড। কীভাবে সমাধা

করা যায় তা নিয়ে দোকানদারদের সঙ্গে আলাপ করলাম। আমরা বললাম, আমরা কাগজে এক আনা, দুই আনা, চার আনা, আট আনা ছাপিয়ে অভ্যর্থনা কমিটির সিলমোহর করে দিব। আপনারা ঐগুলি পেলে রেখে দিবেন এবং সন্ধ্যার পর অভ্যর্থনা কমিটির হিসাবরক্ষকের কাছ থেকে টাকা নিয়ে যাবেন। সব দোকানদার এতে রাজি হলেন। ফলে আমাদের রেজকির সমস্যার সমধান হলো। যাতায়াতেরও সমস্যা ছিল। ট্রেন ছিল, কিন্তু প্রচণ্ড ভিড়। নেতাদের ময়মনসিংহ থেকে বাস রিজার্ভ করে আনা হলো। গোটা ভারতের বিভিন্ন প্রান্ত থেকে এলেন বিখ্যাত নেতৃবৃন্দ। পি সি যোশী, ভবানী সেন, বঙ্কিম মুখার্জী, কৃষ্ণ বিনোদ রায়, সোমনাথ লাহিড়ি, গুরুমুখ সিং, হরকিষণ সিং সুরজিৎ, ভাগসিংহ, চন্দ্রিকা সিংহ গাড়োয়ান, গোদাবেরী পারুলেকর, সুন্দরায়া, কেরোলিয়ান, ড. জেড. এ. আহমদ, যদুনন্দন শর্মা, বড় ঠাকুর, ইরাবত সিং মণিপুরি, বিষ্ণু রাতা, কল্পনা যোশী প্রমুখ...

বিপুল-সংখ্যক হাজং উপজাতি মেয়েরা পিঠে তাদের শিশুসন্তান বেঁধে সত্তর/আশি মাইল হেঁটে এসেছিলেন। পথে তাদের অবশ্য খাবারের ব্যবস্থা করা হয়েছিল। তাছাড়া ছিল হাজংদের এক বিশাল ভলান্টিয়ার বাহিনী। কিশোরগঞ্জ থেকে দীর্ঘ পথ হেঁটে হিন্দু ও মুসলমান কৃষকদের বিরাট বাহিনী এসে উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া ঢাকা জেলা থেকেও কৃষক বাহিনী এসেছিলেন। তাছাড়া মণিপুরের প্রখ্যাত নেতা ইরারত সিং-সহ ভারতের বিভিন্ন প্রদেশ থেকে যাঁরা আসেন, তাঁদের মধ্যে পাঞ্জাবের দীর্ঘ ও সবলদেহী শিখরা সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ...তাছাড়া হাজার-হাজার উপজাতি মেয়েদের দেখে নেত্রকোণাবাসী তো বিস্ময়ে অভিভূত। ...কমিউনিস্টদের কৃষক সংগঠনের শক্তি ও শৃঙ্খলা দেখে সকলেই আশ্চর্য হলেন। প্রকাশ্য বিশাল জনসভায় সমাগম হয় প্রায় এক লাখ লোকের। বেশিরভাগই ছিলেন মুসলমান কৃষক। তাছাড়া হিন্দু ও উপজাতি কৃষকরাও উপস্থিত ছিলেন। জনসমুদ্রের সে এক অভূতপূর্ব দৃশ্য। ইতিপূর্বে স্মরণকালের মধ্যে এত বিশাল কৃষক সমাবেশ বাংলায় আর হয়নি। প্রতিবেলা একুশ হাজার লোক আহার করতো। পল্লী গায়কদের গান দিয়ে সভা শুরু হয়। হিন্দু-মুসলমান অনেক পল্লীগীতির রচয়িতা, গায়ক, শিল্পী ঐ সভায় উপস্থিত ছিলেন। এদের মধ্যে বিনয় রায়, নির্মলেন্দু চৌধুরী, অখিল চক্রবর্তী, হেমাঙ্গ বিশ্বাস, হেনা দাস, জিতেন সেনের নাম উল্লেখযোগ্য। অনেক মুসলমান গায়কও ছিলেন। এদের গান শুনে সকলে ভূয়সী প্রশংসা করেন। এই সম্মেলনের ফলে আমাদের প্রভাব পরিচিতি ও সংগঠনের শক্তি বহুগুণে বেড়ে যায়। নেত্রকোণার খুসু রায়, সুকুমার ভাওয়াল, শশী চক্রবর্তী, ক্ষিতিশ চক্রবর্তী সকলেই সম্মেলন সফল করার জন্য কাজ করেন। ...ময়মনসিংহের আলতাব আলী প্রয়োজনমতো বিভিন্ন জিনিস সরবরাহের ব্যবস্থা করে যথেষ্ট সাহায্য করেন। গুরুদাস তালুকদার, রবি নিয়োগীরা ছিলেন রন্ধনশালার তদারকে। ...ঢাকার আটশত কর্মীদের পরিবেশনের দায়িত্ব দেওয়া হয়। এভাবে বিভিন্ন জেলার কমরেডরা বিভিন্ন দায়িত্বে ছিলেন। ময়মনসিংহ জেলার নেতৃবৃন্দ প্রায় সকলেই সামরিক পোশাকে সুসজ্জিত ছিলেন, খোকা রায় ছিলেন ভলান্টিয়ার বাহিনীর অধিনায়ক। অবশ্য একমাত্র আমি বাদে ভলান্টিয়ারগণও অনুরূপ পোশাকে সজ্জিত ছিলেন। সম্মেলনে বিশজনের মতো চিকিৎসক ছিলেন। এই বিরাট সম্মেলন সমাপ্ত হয় এবং সম্মেলনের যে মূল উদ্দেশ্য; এদেশের নিপীড়িত কৃষকদের সংগঠিত করা– তা সম্পূর্ণ সফল ও সার্থক হয় এবং টংক প্রথার উচ্ছেদ, তেভাগা আন্দোলন সম্পর্কে প্রস্তুতি ও অধিক ফসল উৎপাদন প্রভৃতি বিষয়ে প্রস্তাব গ্রহণ করা হয়।

মুহম্মদ আবদুল্লা রসুল তাঁর *কৃষকসভার ইতিহাস* বইতে লিখেছেন:

এই বছর (১৯৪৫) সালে সারা ভারত কৃষক সম্মেলনের নবম অধিবেশন বসে নেত্রকোণায়। কমরেড মুজফ্‌ফর আহ্‌মদ সভাপতি নির্বাচিত হন। এই সম্মেলনের আয়োজন ও সফলতার জন্য সমস্ত দায়িত্ব নিতে হয় প্রাদেশিক কৃষকসভাকে এবং তার মধ্যে বিশেষ করে ময়মনসিংহ জেলা কৃষক সমিতিকে। প্রায় এক লক্ষ করে কৃষকের সমাবেশ হয় দুদিন। এই সম্মেলনে আদিবাসী হাজং কৃষকদের, বিশেষত হাজং মেয়েদের এবং পার্শ্ববর্তী বৃহৎ গ্রাম বালির মুসলিম কৃষকদের যে বিপুল ও অকুণ্ঠ সাহায্য পাওয়া গিয়েছিল তা ছিল সাংগঠনিক দিক থেকে সম্মেলনের সফলতার পক্ষে অত্যন্ত মূল্যবান অবদান। তিন বছর পূর্বে কিন্তু এই হাজং মেয়েদের অধিকাংশই জীবনে কখনও রেলগাড়ি দেখেনি এবং বালির মুসলিম কৃষকদের ওপর কৃষকসভার কোনো প্রভাব পড়েনি। তিনবছরের মধ্যেই অবস্থার বহু পরিবর্তন ঘটে গিয়েছিল। এই সম্মেলনও কৃষকদের মধ্যে যথেষ্ট উৎসাহ সৃষ্টি করেছিল।

ব্রিটিশ আমলে কৃষক বিদ্রোহ, পাগলপন্থি বিদ্রোহ, টংক, তেভাগার মতো বিদ্রোহ বারবার সংঘটিত হয়েছে এ-অঞ্চলে। অমর মিত্রের উপন্যাস *মোমেনশাহী উপাখ্যান*– যার বিষয়গুলির মধ্যে অন্তর্ভুক্ত গারো পাহাড়ের কোলে সোমেশ্বরী নদীর তীরের সুসঙ্গ দুর্গাপুর অঞ্চলের রাজা, জমিদার, ভূম্যধিকারীর বিরুদ্ধে হাজং পাহাড়িয়া জাতির হাতিখেদা বিদ্রোহ, ভূমির অন্যায্য চুক্তি টংক প্রথার বিরুদ্ধে হাজং জাতি ও অন্যান্য কৃষকের বিদ্রোহ। সেখানে পড়ি, "এখন অতীনের কাছে বাকিটা শুনে নেওয়া যাক। বাকিটা মানে ১৯৪৫-এ নেত্রকোণায় কৃষক সম্মেলন। মনি সিং-এর ডাকে গারো চাষারা, মুসলমান চাষারা, নমঃশূদ্র চাষারা চলল নেতেরক'ণা।"

কিশোরগঞ্জের কবিয়াল নিবারণ পণ্ডিত গান বাঁধল মণি সিং-কে নিয়ে:

শুনেন যত দেশবাসী, শুনেন ভাই গরিব চাষী, শুনেন সর্বজন,
কৃষক দরদী অধি মনি সিংহের বিবরণ
সংক্ষেপেতে দু এক কথা হে করিব বর্ণন।

কী কথা, না রাজবাড়ীতে মনি সিং রাজার ভাগিনেয় দেখে টংক ধান দিতে এসে হাজং চাষাদিগের কী না হয়রানি। নব্বই তোলায় ফের ওজন ধান নিয়ে এসে শোনে রাজার পেয়াদা একশো তোলায় সের চায়। না দেবে তো ধান নেবে না। বসে থাক। রাজা বলেছেন বৈকালে বাহিরে আঙিনায় আসবেন। তখন বিচার হবে একশো তোলায় সের নেব না নব্বই তোলায় সের। থেমে থাকা আন্দোলন আবার শুরু হলো। রব উঠল:

নব্বই তোলায় সের সের
কত ঠকাইসো, ঢের ঢের ॥
মনি সিং ডাক দিয়েছে
টঙ্ক দিতা না কহিছে।
টঙ্ক দিবা না টঙ্ক না
মিছিল যায় নেতেরক'ণা।

মিছিল চললো নেত্রকোণা। মৈমনসিংহ তখন বাংলার সবচেয়ে বড়ো জেলা। সারা ভারত কৃষক সম্মেলন সেখানে। নেত্রকোণায় কত মানুষ এসেছিল? লক্ষাধিক মানুষ। অতীনের দাদা নীতিন তখন বছর বারো। নীতিনের খুব মনে আছে সেই সম্মেলনের কথা (মিত্র, ২০১৯)।

ব্যক্তিগতভাবে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের লেখায় অন্য প্রসঙ্গে নিজের এ সম্মেলনে অংশগ্রহণ সম্পর্কে দু-এক লাইন আমরা পেয়েছি।[৩] এবং একটি লেখায় বেশ খানিকটা পেয়েছি। এই সব ক'টি প্রসঙ্গই খুব নিবিড়ভাবে নিবারণ পণ্ডিতের প্রসঙ্গে লেখা। বিস্তারিত লেখাটি বস্তুত 'লোককবি নিবারণ পণ্ডিত' নামে এক সম্মাননা-নিবন্ধের অংশবিশেষ।

পঁয়তাল্লিশ ইংরেজিতে ময়মনসিংহের নেত্রকোনায় সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনে নিবারণ বাবুর সাথে আবার দেখা হলো। পদ্মকে যেমন দেখতে হয় দিঘীর জলে, লোককবিকে তেমনি চিনতে হয় জনতার মাঝখানে। কলকাতার বিদগ্ধ সাহিত্যিক সমাবেশে এই নীরব নম্র মানুষটি অনেককেই হতাশ করেছিল। তাছাড়া সুগায়ক বলতে যা বোঝায়, নিবারণ বাবু তা নন। নেত্রকোণায় পেশিবহুল আদুল গায়ে কোমরে গামছা বাঁধা লুঙ্গি পরা মুসলমান কৃষকদের জারি নাচের দলের মাঝখানে যখন তাদের কবিকে দেখলাম, সেদিন চিনলাম জনগণের জাদুকরকে! পঁচিশ-ত্রিশজনের জারি নাচের দল নেচে নেচে গাইছিল নিবারণবাবুর জারি গান:

কপালের দুঃখ ঘুচাবো কত দিনে রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায়রে বুঝলাম না বুঝলাম না ভাইরে ঘরে রইলাম বইয়া
চৈতন্য হইল শেষে সংকটে পড়িয়া
অখাদ্য কুখাদ্য ঝাইয়া রোগে অনাহারে
মরছে যখন মা বোন শিশু হাজারে হাজারে রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায়রে সংকটে পড়িয়া তখন হিন্দু মুশ্লীম যত।
গ্রামে গ্রামে কিছু কিছু হইল মিলিত
খাদ্য দাও বলিয়া দেশে চলল আন্দোলন
দরখাস্ত পড়িল যত গভর্মেন্ট সদন
সস্তা দ্বরে গরিবদের জিনিসপত্র দাও
অন্ন বস্ত্র কুইনাইন দিয়া গরিবেরে বাঁচাও রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায়রে তারপরে চাপে পড়ে বুদ্ধিমান সরকার
মিটাইতেছি দাবী কিঞ্চিৎ করিল স্বীকার
ঘুষখোর আর চোরাদের সামিলে রাখিয়ে
ছালার মুখ বান্ধিয়া ঢালে উভুত করিয়া
(হলো) 'দেড় ছটাক' কন্ট্রোলের দোফায় গরীব বাঁচিবার
শাহীদার হইল যত প্রেসিডেন্ট মেম্বার রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।
হায় হায়রে মুখ চিনিয়া বিলি হইল কন্ট্রোলের কুইনাইন
ট্যাক্স নাই যার কার্ড পাইবো না শাহীদারের আইন

রিলিফের কাপড়ে হইল বালিশের উষার
কেউ পায় না ছিড়া তেনা কেউ করে বাহার রে
হায় দুঃখ সয়না প্রাণে রে।

একলক্ষ কিষাণের বিরাট জমায়েতের সামনে সভাপতির মঞ্চ থেকে নিবারণ বাবুর গান ময়মনসিংহের বিখ্যাত পল্লীগায়ক অখিল চক্রবর্তীর অনুপম কণ্ঠে ধ্বনিত হয়ে উঠল:

একসাথে চল গড়ব মোরা রাঙ্গা দুনিয়া
সবে মিলে থাকব সেথা বিভেদ ভুলিয়া বিভেদ ভুলিয়া
একসাথে চল গড়ব মোরা রাঙ্গা দুনিয়া ॥
নতুন সমাজ গড়ব মোরা দুঃখ করব দূর
হাটে মাঠে তুলব রে ভাই আনন্দেরি সুর
আলো করব আঁধার রাতি
ঘরে ঘরে জ্বালব বাতি
গাইব নব গান
দুঃখ করব অবসান
নতুন সমাজ গড়বে কে রে আয়রে ছুটিয়া, আয়রে ছুটিয়া।

নতুন সমাজ গড়বার সংকল্প ও শপথ লক্ষ লোকের প্রাণে সঞ্চারিত হলো।

ইতোমধ্যে একদিকে কৃষক আন্দোলনের ব্যাপকতা, অন্যদিকে নিবারণবাবুর নেতৃত্বে নব-লোকসংস্কৃতির আন্দোলনের প্রভাবে ময়মনসিংহের বহু পেশাদারি লোকশিল্পীর ভিতরে এক নতুন জীবনবোধ জাগ্রত হলো। নেত্রকোনা কৃষক সম্মেলনে এরকম বহু লোকশিল্পীর সমাবেশ হয়েছিল। ঐতিহাসিক কৃষক মিছিলের সঙ্গে দোতরা, একতারা নিয়ে প্রায় ত্রিশ-পঁয়ত্রিশজন বাউলও গান গাইতে গাইতে যোগ দিয়েছিলেন। তাদের অগ্রণী ছিলেন রসিদউদ্দীন, জামসেদউদ্দীন ও মজিদ। জামসেদউদ্দীন যখন গান ধরলেন:

আমার দুঃখের অন্ত নাই দুঃখ কার কাছে জানাই
আমার সুখের স্বপন ভাঙল রে চোরাই বাজারে ॥
মিয়া হোসেন মুন্সী গান ধরলেন
দেশে কোন দেশের হাওয়া এলো গো
দেশে কোন দেশের হাওয়া এলো
লবণ কেরোসিন, চিনি, কন্ট্রোলে হয় বিকিকিনি
এই কথাডা সবাই জানি, অনেক লোকেই কইলো
ধনী মানী গুণী কয়জন, একমিলে চলিল।
কাঙ্গালের নাম খাতায় জমা, চিনির মজাডা তারাই মারল
দেশের হাওয়া এলো গো
দেশে কোন দেশের হাওয়া এলো।

সহস্র সহস্র কৃষকের প্রাণে সেদিন দেখেছিলাম তার কি প্রতিধ্বনি! আমরা গণনাট্যের মধ্যবিত্ত গায়কেরাও সেখানে গান করেছিলাম কিন্তু বারবার মনে হচ্ছিল এইসব লোকশিল্পীর ক্ষমতার কাছে

> আমরা সমস্ত আমাদের সমস্ত সুরের কারিগরী সত্ত্বেও কত দুর্বল, গণমনে প্রবেশের গোপন পথটির এরা সহজ উত্তরাধিকারী, আমাদের তা আয়ত্ত করতে এসব শিল্পীর পায়ের কাছে বসে অনেক কষ্টে তা শিখতে হবে। [৪] (বিশ্বাস, ২০১২)।

গীতিকবিতার আঙ্গিক: সুরের উৎস

জারিগানের কথা বলছিলাম একটু আগে। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নেত্রকোণা ও নিবারণ পণ্ডিত প্রসঙ্গে উপরিউক্ত লেখা পড়লে সন্দেহ থাকে না, জারিগানের আদলকে একাধারে শোক এবং প্রতিবাদের গানে পরিণত করার একটা সম্ভাবনা এই সময় থেকে তাঁর মনে এসেছিল এবং তার সঙ্গে আউলিয়া ও বাউলদের গানের সুর ও পরিবেশনের ঢঙকে তিনি ব্যবহার করতে চেয়েছিলেন এক নতুন উন্মেষে। গানটির প্রথম অংশের সুর নিশ্চয়ই জামসেদউদ্দীনদের গানের দ্বারা প্রভাবিত। কিন্তু 'তুমি যে বীর প্রসবিনী গো' থেকে (অর্থাৎ গানের আধাআধি সময় থেকে) সে প্রভাব দুর্বল হয়ে এক অপূর্ব বিলম্বিত ভাটিয়ালির রেশে মিশে যায়, যার নানা খাঁজে আর ঝোঁকগুলির মধ্যে হেমাঙ্গ বিশ্বাসের নানা নিজস্বতার ছাপ থাকে। আর 'কাইন্দো না মা কাইন্দো না আর' এবং তার পরবর্তী স্তবকগুলি এক উদ্‌যাপন, যেন শোকেরই এক অনন্য উদ্‌যাপন হয়ে ওঠে হোরি বা সারির সুর প্রক্ষেপণে।[৫]

এই গান রচনার সময় তার ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপট এবং গণনাট্য সংঘের অবস্থান নিয়ে আরেকটু বিশদে লিখছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস তাঁর 'গণনাট্য ও আত্মকথা' (তৃতীয় পর্ব: ভাঙা বন্দরের যুগ) প্রবন্ধে:

> ... তখন আমাদের বিফল করে রেখেছে দেশ বিভাগের ঘটনা এবং পূর্ব-বাংলা থেকে আগত লক্ষ লক্ষ উদ্‌বাস্তু মানুষের অসহায়তা, বিশেষ করে আমরা যারা পূর্ব-বাংলার মানুষ, তাদের কাছে এটা একটা বিরাট যন্ত্রণার উৎস হয়ে উঠেছিল। এই সময়ে লেখা 'মন কান্দে পদ্মার চরের লাইগ্যা' গানটি আমার নিজের বিশেষ প্রিয়। প্রধানত বাংলার বারোমাস্যা রীতিতে ভাটিয়ালি আঙ্গিকে রচিত এই গানটির কিছু অংশ:
>
> আমার মন কান্দে রে পদ্মার চরের লাইগা দরদী রে
> মন কান্দে পদ্মার পাড়ে লাইগা
> আমার শান্তির গৃহ সুখের স্বপন রে দরদী -
> কে দিল ভাঙ্গিয়া।
> দরদী রে, আশ্বিন মাসে কত খুশিতে
> ভাইধন আইত নাইওর নিতে
> ভরা গাঙে রঙ্গিলা নাও বাইয়া।
> আইজ কুলে আমার লক্ষীন্দর
> বিষে অঙ্গ জ্বর জ্বর
> আমি বেহুলা চলছি ভেলায় ভাসিয়া...
>
> এইরকম একটা হতাশার সময়ে পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনের ওপর চলল গুলি। প্রাণ দিলেন মুসলমান বাঙালিরা। 'মুসলমান' কথাটা সচেতনভাবেই ব্যবহার করছি। বাংলা-বিভাগের ঠিক পরবর্তী সেই সময়টাতে পশ্চিমবাংলার হিন্দু মধ্যবিত্ত মানুষের মধ্যে সম্প্রদায়িকতা বেশ খানিকটা ছড়িয়ে ছিল। দেশবিভাগের জন্য মুসলমানরাই দায়ী, এরকম একটা মনোভাব ছিল ব্যাপক।

> সেইরকম আবহাওয়ায় পূর্ব-বাংলা থেকে ভেসে এলো সংবাদ– বাংলা ভাষার মর্যাদা দাবি করে শহিদ হয়েছে আবুল বরকত, রফিক। সাম্প্রদায়িকতার ভিত্তিমূলে এ একটা মস্ত আঘাত।
>
> প্রচণ্ড একটা নাড়া লাগল মনে। ঠিক করলাম, পালা গান লিখব। কিন্তু এত বড়ো ঘটনাকে ধরি কোন সুরে? গুণগুণ করতে করতে মনে হলো ঐতিহাসিক ঘটনাকে ব্যালাডের সুরেই বোধহয় ধরা যাবে। মনে পড়ল নেত্রকোণার নিখিল ভারত কৃষক সম্মেলনের রসিদউদ্দীন ও জামসেদউদ্দীনের কথা। সেদিন সমাগত শ্রোতাদের মধ্যে থেকে এই দুই গায়ক অনাহূত হয়ে এগিয়ে এসেছিলেন গান গাইতে: 'আমার দুঃখের অন্ত নাই/দুঃখ কার কাছে জানাই।/ সুখের স্বপন ভাঙলো রে/ চুরাই বাজারে।' জনতার মধ্যে স্বতঃস্ফূর্ত প্রতিধ্বনি জাগিয়েছিল তাঁদের এ-গান। সেই সুরেই রচলাম 'ঢাকার ডাক'
>
> গান রচনা করতে করতে এমনই অভিভূত হয়ে পড়িনি কোনোদিন। জানি এখানে সুরহীন কথাগুলি দিয়ে তা প্রকাশ করা যাবে না (বিশ্বাস, ২০১২)।

এই গানের রচনার সঙ্গে আরেকজন যুগপুরুষ জড়িয়ে আছেন ঋত্বিক ঘটক। হেমাঙ্গ বিশ্বাসের অন্যত্র লিখেছেন:

> ১৯৫১/৫২ সালের ঋত্বিকের সঙ্গে কলকাতায় যখন প্রথম পরিচয় হয় তখন গণনাট্যের নাট্যকার অভিনেতা হিসেবেই সকলে তাকে জানত। কিন্তু আমি তাকে অতি ঘনিষ্ঠভাবে পেয়েছিলাম লোকসংগীত-এর একজন সত্যিকারের সমঝদার হিসেবে। আমার তখনকার ওয়েলেসলির সাময়িক আস্তানায় প্রায়ই বিনা নোটিশে হাজির হতো ঋত্বিক। এসময় ঘটল অভাবিত ঘটনা ঢাকার একুশে ফেব্রুয়ারি। ...সাম্প্রদায়িকতায় বিভক্ত বাঙালিচিত্তে সম্পূর্ণ নতুন সংহতির উদ্দীপনা। লিখলাম পূর্ববাংলার ব্যালাডের ঢঙে:
>
> ছিল বুড়ীগঙ্গার মরা পানি
> তার বুকে কে আনিলো জোয়াণী রে
> কার কইলজার খুনে বয় উজানী
> শুকনা বালুর চরে।
> কান্দে বাংলা জননী
> ঢাকার শহরে।
>
> এই দীর্ঘ ব্যালাড রচনার সময় প্রতিটি মুহূর্তে ঋত্বিক ছিল আমার সাথী ও সমঝদার (বিশ্বাস, ২০১২ (ক))।

সাংস্কৃতিক আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ১৯৫২ সালেই পার্ক সার্কাসে Peace Cultural Conference-এর এক বিরাট অনুষ্ঠান হয়। তাতে সারা ভারত থেকে শিল্পীরা এসেছিলেন। ওমর শেখ সেই প্রথম কলকাতায় জনসমক্ষে গান করেন। এই অনুষ্ঠানে দশহাজার লোকের সামনে 'ঢাকার ডাক' বিশেষভাবে অভিনন্দিত হয়েছিল। মনে আছে পৃথ্বীরাজ কাপুর তিনি বাংলা বুঝতেন খুবই ভালো, অনুষ্ঠান শেষে আমায় জড়িয়ে ধরে বলেছিলেন, 'Undoubtedly the best production from West Bengal'. এভাবে অভিনন্দিত হওয়ার কারণ ছিল। কিছু অসাধারণ ভালো গায়ক ও বাদকের সমাবেশ হয়েছিল মঞ্চে। মহানন্দ দাস– যিনি রাস্তায় গান গেয়ে জীবিকা নির্বাহ করতেন, তার মতো মিষ্টি মেঠো কলা আমি

জীবনে কমই শুনেছি। ঠিক তেমনি পেয়েছিলাম উত্তরবঙ্গের একটি ভাওয়াইয়া কণ্ঠ– আলপনা দেবী। অন্ধ টগর অধিকারী বাজিয়েছিলেন বাঁশি। সে এক স্মরণীয় অভিজ্ঞতা (বিশ্বাস, ২০১২ (ক))।

এ গান ঘিরে যাঁরা আছেন

এই অসাধারণ গায়ক ও বাদকদের কিছুটা পরিচয় আজ না দিলে, আজকের আলোচনা কোনোভাবে সম্পূর্ণ হবে না। সম্পূর্ণ হবে না যে বাউল আর আউলিয়াদের কথা বারবার নেত্রকোণার আলোচনায় হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখছেন, তাদের পরিচয় কিছুটা অন্তত না দিলে।

রশীদউদ্দিন

জন্ম: ১১ই জানুয়ারি ১৮৮৯। মৃত্যু: ১০ই সেপ্টেম্বর ১৯৬৪। বাহির চাপরা, নেত্রকোণার বাউল শিল্পী, কবি ও গীতিকার। রশিদ উদ্দিন ১৫/১৬ বছর বয়সে পার্শ্ববর্তী পুখুরিয়া গ্রামের টাকনা মিস্ত্রির সান্নিধ্যে এসে একটু একটু করে একতারা বাজিয়ে বাউলগান শিখতে শুরু করেন। তখন বাহিরচাপড়া গ্রামে কৃষ্ণলীলা গান শুরু হয়। রশিদ উদ্দিন কৃষ্ণের অভিনয় করে ব্যাপক সুনাম অর্জন করেন। এ সময় পার্শ্ববর্তী বাংলা বেতাটিসহ সর্বত্র কবিগানের ব্যাপক প্রসার ছিল। দুর্গাপূজা, কালীপূজা, দোলপূজাসহ হিন্দু ধর্মীয় বিভিন্ন আচার-অনুষ্ঠানে কবিগান ছিল এ অঞ্চলে এক বিশেষ আকর্ষণ। পাশাপাশি টিপু পাগলের নেতৃত্বে ১৮২৭ সনে পরিচালিত ফকির বিদ্রোহের ব্যর্থতার পর ল্যাংটা ফকিরদের জলসা ছিল নিত্যদিনের ব্যাপার। তখন বাহিরচাপড়া গ্রামে কিশোরগঞ্জের কটিয়াদি থেকে এক ল্যাংটা পিরের আগমন ঘটে। ১৯০৯ সালে রশিদ উদ্দিন এ ল্যাংটা শাহের শিষ্যত্ব গ্রহণ করে নিজ বাড়িতে হালকা-জিকিরের জলসায় মেতে ওঠেন। বাউল সাধক রশিদউদ্দিন তাঁর বড়ো ছেলে আরশাদ উদ্দিনের দুইবছর বয়সে তাকে মৃত্যুশয্যায় রেখে হঠাৎ একরাতে গৃহত্যাগ করেন। গৃহত্যাগী হয়ে তিনি প্রথমে আসেন তাঁর ওস্তাদ কটিয়াদির ল্যাংটা শাহের আখড়ায়। সেখান থেকে তিনি ল্যাংটা শাহকে সাথে নিয়ে চলে যান আসামের লাউরের পাহাড়ে। একবছর সেখানে অবস্থানের পর চলে আসেন সিলেটের শাহ পরানের মাজারে। মারিফতি গানের গুণী শিল্পী রসিদউদ্দিনের গান গ্রামোফোন রেকর্ডে ধরা আছে। পরে তিনি নিজে বাউল গানের একটি দল তৈরি করেন।

মজিদ

সম্ভবত আব্দুল মজিদ তালুকদারের কথাই বলছেন হেমাঙ্গ বিশ্বাস। জন্ম: ১৫ই জানুয়ারি ১৮৯৮। মৃত্যু: ৮ই জুন ১৯৮৮। নেত্রকোণার বাউল শিল্পী, গীতিকবি ও সুরকার।

জামসেদউদ্দিন

নেত্রকোণার আটপাড়ার বাউল শিল্পী।

মিয়া হোসেন মুন্সী

কিশোরগঞ্জ সদর থানার পাটধা কুড়েরপাড় গ্রামের অধিবাসী মিঞা হোসেন ছিলেন বিখ্যাত বয়াতি (কিন্তু প্রসঙ্গ থেকে এটা পরিষ্কার নয়, এঁর কথাই বলছেন কি না হেমাঙ্গ বিশ্বাস)

আলপনা গুপ্ত

একসময়ের প্রখ্যাত ভাওয়াইয়া গায়ক, চলচ্চিত্রাভিনেত্রী। বহু গুণীজনের সঙ্গে কাজ করেছেন। মঞ্চে, ছবিতে, গানে। যখন গান গাইতেন, চারপাশে কেউ নড়তে পারত না। এক অপূর্ব টিম্বার ছিল গলায়, গাওয়ার সবিশেষ এক ভঙ্গি, আঞ্চলিকতার ঐশ্বর্যে পরিপূর্ণ গলা। তেমনই উচ্চারণ। তাঁর গলায় শোনা ভাওয়াইয়া, 'দিনের শোভা সুরুয রে মন/ রাইতের শোভা চাঁদ/হালুয়ার শোভা হাল-কৃষি/ জমিনের শোভা ধান' এখনও আমার কানে ভাসে। নিখিলকুমার চন্দ লিখিত *টগর অধিকারী* শীর্ষক বইতে– যার প্রসঙ্গে আমি একটু পরেই আবার ফিরব, এ'কথা উল্লিখিত আছে যে 'দিনের শোভা সুরুয রে মন/ রাইতের শোভা চাঁদ' টগরের রচিত ভাওয়াইয়া, যদিও এতদিন আমরা অনেকেই একে প্রচলিত/পরম্পরাগত ভাওয়াইয়া বলেই জানতাম।

মহানন্দ দাস

হেমাঙ্গ বিশ্বাসের 'লোকসঙ্গীতের দরদি সমঝদার ঋত্বিক' শীর্ষক প্রবন্ধে যে-টুকু লিখেছেন, তার বাইরে আমি তাঁর সম্পর্কে খুব কিছু পাইনি। সেই অংশটুকু তুলে দিচ্ছি:

> ঋত্বিকের প্রথম ছবি নাগরিক-এর পরিকল্পনার সময়ে দৈনন্দিন আলোচনা আমার সঙ্গে করতো। সে-সময় কেওড়াতলা শ্মশানঘাটে দেশবন্ধুর স্মৃতি-মন্দিরের নিচে বসে একটি উদ্‌বাস্তু পল্লী শিল্পী গান গেয়ে ভিক্ষা করতো। তার কণ্ঠ ছিল অসাধারণ। সারিন্দা বাজিয়ে সে গান করতো। বাড়ি তার ময়মনসিংহের কিশোরগঞ্জে। সে ছিল আমার এক অমূল্য আবিষ্কার; নাম তার মহানন্দ দাস। সে-সময় শহরের বিভিন্ন অনুষ্ঠানে আমার পাশে মহানন্দকে নিয়ে দাঁড়াতাম। নাগরিক গুমোট পরিবেশে তার কণ্ঠ নিয়ে আসত পূর্ববঙ্গের বিস্তীর্ণ প্রান্তরের শীতল হাওয়া। ঋত্বিক তার গান শুনে পাগল হয়ে গেল। আমাকে বলল, 'এই তো মাটির গলা। আমি ওকে আমার প্রথম ফিল্মে ব্যবহার করব। একটা পথের ভিক্ষু গায়কের রোলই তাকে দেব'। নাগরিক-এর আউটডোর শুটিংয়ের তাঁবুতে কলকাতার বাইরে মহানন্দকে সঙ্গে নিয়ে গেল। সঙ্গে ছিলেন তখনকার দু-তিনজন নামকরা চিত্রতারকা। মহানন্দ শুটিংয়ের শেষে কলকাতায় এসে ঋত্বিকের প্রশংসায় পঞ্চমুখ। বড়ো বড়ো শিল্পীর সমানই মহানন্দের খাতির ছিল– কোনো তারতম্য তো দূরের কথা। রাত্রের আসরে মহানন্দের সুর ঝংকৃত দোতারায় প্রায় ঢলে পড়ত ঋত্বিক। প্রথম ছবির ঋত্বিক প্রায় শূন্য হাতে আরম্ভ করেছিল কিন্তু মহানন্দের অবস্থা সে জানত তাই মহানন্দকে অন্তত পরিশ্রমের দিক দিয়ে খুশি করে দিয়েছিল।

টগর অধিকারী

বিখ্যাত গায়ক, গীতিকার, দোতরাবাদক, গণনাট্যের একসময়ের একনিষ্ঠ কর্মী। জন্ম: দেবগ্রাম, কুচবিহার জেলা। দোতরা ব্যতীত ব্যানা, বাঁশি, সারিন্দা বাজনায় ছিলেন পারদর্শী। বিজন ভট্টাচার্য তাঁর *মরাচাঁদ* নাটক উৎসর্গ করে গেছেন টগরকে। নাটকের মূল চরিত্রও তাঁকে অনুসরণ করেই চিত্রিত। তুলসী লাহিড়ির *ছেঁড়াতার* নাটকে আবহসংগীতেও ছিলেন টগর। জন্মান্ধ টগর তেভাগা, খাদ্য আন্দোলন এবং নানা গণ-আন্দোলনের পুরোভাগে শিল্পী-যোদ্ধা হিসাবে কাটিয়েছেন জীবনের অধিকাংশ সময়। [৬]

শেষ-কথা

শুধু এখানে যে-লেখার অংশ উদ্ধৃত করেছি সেগুলো নয়, তাঁর প্রায় প্রতি লেখায়, বলায় বা গায়নের ছত্রে ছত্রে হেমাঙ্গ বিশ্বাস বিধৃত করেছেন যে পল্লীশিল্পী– গীতিকার-সুরকারেরা তাঁর গান রচনার মূল প্রেরণা, তাঁদের কথা। তপতী মুখোপাধ্যায়কে লেখা একটি চিঠিতে তিনি জানাচ্ছেন:

> ...আমার প্রতি আপনাদের মরম ও ভালবাসাই আমার পুরষ্কার। ...কিন্তু সে ভালবাসাকে প্রকাশ্য মঞ্চের আলোকসম্পাতে দাঁড় করানোতে আমি পরাঙমুখ। আজকালকার পুরষ্কারের হাটে আমাকে না টানলে খুশী হবো। তাছাড়া কে বললো আমি শ্রেষ্ঠ লোকসঙ্গীতজ্ঞ? অজ্ঞাত, অখ্যাত গ্রাম-বাংলার এমন কিছু লোকসঙ্গীতজ্ঞকে জানি, যাদের পায়ের কাছে বসে এই বয়সেও শিক্ষাগ্রহণ করতে পারি। কাজেই এ সম্মান আমি দাবী করতে পারি না। (১১.১১.১৯৭৮)

একটি গানের সূত্র ধরে আমি যে এই অজ্ঞাত, অখ্যাত বা অধুনাবিস্মৃত কয়েকজন লোকশিল্পী/লোকসংগীতজ্ঞের সম্পর্কে খুব সামান্য হলেও লিখতে পারলাম, তা স্বস্তিদায়ক। কিন্তু তার থেকেও গুরুত্বপূর্ণ, যে-অর্থে গণনাট্য সংঘের বা কমিউনিস্ট পার্টির শ্রমিক-কৃষক সভা/সম্মেলনগুলি দরিদ্র-প্রান্তিক আঞ্চলিক এবং শহরের মধ্যবিত্ত শিল্পীদের আদানপ্রদানের নির্মাণভূমি হয়ে উঠেছিল, আরো নির্দিষ্ট করে বললে যে-অর্থে শহরের শিল্পীরা প্রতি মুহূর্তে শিখছিলেন, প্রভাবিত হচ্ছিলেন এবং প্রয়োগের চেষ্টা করছিলেন আঞ্চলিক শিল্পীরীতিগুলি, যা গণনাট্যের লোক-আঙ্গিককে প্রতিবাদের হাতিয়ারে রূপান্তরের শিক্ষণরীতির সর্বাগ্রগণ্য বিষয়, তার (অলিখিত) ইতিহাস লেখার সামূহিক প্রয়োজন হয়ে পড়েছে আজ। হেমাঙ্গ বিশ্বাস বহু গানে তাঁর এই ঋণস্বীকার করে গেছেন, অন্তত এ-সূত্র রেখে গেছেন কীভাবে, কোথায় অনুসন্ধান করলে মূল সুর, রীতি, লয়, ঢংগুলিকে পাওয়া সম্ভব, দেখা সম্ভব কী ছিল আন্দোলনকে কেন্দ্র করে সে-সব বিনিময়ের ধরন এবং অবশ্যই, কারা ছিলেন তার প্রকাশ্য বা নেপথ্যের শিল্পী-কারিগর।

হেমাঙ্গ বিশ্বাস আর্কাইভের মূল কাজ এটাই এবং ভবিষ্যতেও তা হওয়া উচিত বলেই আমার মনে হয়।[৭]

টীকা

১. হেমাঙ্গ বিশ্বাস নিজে এক জায়গায় লিখেছেন: মূল গানটি আরো অনেক দীর্ঘ ছিল। তাকে বিনয় রায়ের কথায় ছোটো করি। সম্ভবত এই মূল গানটির সাপেক্ষেই তিনি এই কথা লিখেছেন।

২. কোনো এক জায়গায় যখন হেমাঙ্গ বিশ্বাস লিখেছেন, "ময়মনসিংহের এই ভাটিয়ালির উত্তরাঙ্গের প্রকারের আকুতিটা লক্ষ করুন..." তখন তিনি এই গানকে ভাটিয়ালি বলে বলছেন বলে আমার মনে হয় না। Theme-wise ভাটিয়ালি বলছেন একে বা সুরকাঠামোকে ভাটিয়ালি-আশ্রয়ী বলে অবহিত করেছেন সম্ভবত।

৩. নিবারণ পণ্ডিত, মণি সিং এবং হাজং বিদ্রোহের গানের বিষয়ে ভিন্নমতের গুরুত্বপূর্ণ আলোচনার জন্য দেখুন হেমাঙ্গ বিশ্বাসের গ্রন্থ *উজানগাং বাইয়া*। *গণণাট্য সংঘ বনাম গণনাট্য আন্দোলন*, পৃ. ১৪৪-১৪৭ এবং *আমার জবানবন্দি*, পৃ. ১৫৫-১৫৬।

৪. ইতোমধ্যে পর্বত কেশরী ইরাবত সিং সিলেট জেল থেকে মুক্তি পেয়ে আমাদের মধ্যে আসেন। মণিপুরে প্রবেশদ্বার নিষিদ্ধ ছিল, সেজন্য প্রথমে তিনি সিলেট ও পরে কাছাড়ে চলে যান। তার নেতৃত্বে সিলেট, বিশেষ করে কাছাড়ের মণিপুরী কৃষক সংগঠন যেমন গড়ে উঠল তেমনি তাদের

মধ্যে আমাদের সাংস্কৃতিক প্রভাব ছড়িয়ে পড়ল। ইরাবত সিং যে শুধু মণিপুরের জননেতা ছিলেন তা নয়, তিনি ছিলেন একজন বিখ্যাত পোলো খেলোয়াড়, নাট্যকার ও নৃত্যবিদ। মণিপুরের আধুনিক নাটকের জনক ললিত সিং-এর তিনি ছিলেন দক্ষিণহস্ত। মণিপুরের প্রথম আধুনিক নাটক *আরেপ্পামারূপ*-এর তিনি ছিলেন নায়ক। কাজেই তিনি শুধু কৃষক নেতা নন, সাংস্কৃতিক নেতাও হয়ে ওঠেন। আমাদেও জনপ্রিয় গানগুলি মণিপুরী ভাষায় অনুবাদ করে মণিপুরী কৃষকদের মধ্যে ছড়িয়ে দিলেন। ১৯৪৫-এ আমাদের একটি সাংস্কৃতিক দল নেত্রকোণা সর্বভারতীয় কৃষক সম্মেলনে যোগদান করে। সেখানে নিবারণ পণ্ডিত, অখিলচক্রবর্তী, রমেশ শীল প্রমুখদের সঙ্গে কৃষাণ সম্মেলনের মুক্তমঞ্চে লক্ষজনতার সামনে অনুষ্ঠান করি। সেখানে কাছাড় থেকে দলবল নিয়ে ইরাবতও গিয়েছিলেন। সেখানে অনেকরকম গানের মধ্যে সাধন দাশগুপ্তের -

চাষী দে তোর লাল সেলাম
তোর লাল নিশান রে
আন্ধার পথে আলো দেয় সে
মুশকিল আসান করে।

গানটি সর্বাপেক্ষা জনপ্রিয় হয়
(হেমাঙ্গ বিশ্বাস (২০১২) (ক))।

৫. গানের অংশ পাবেন ('সকাল সকাল' অনুষ্ঠান, ডিডিবাংলা, প্রসঙ্গ: হেমাঙ্গ বিশ্বাসের জন্মদিন ১৪ই ডিসেম্বর উপলক্ষে অনুষ্ঠান, ২০১৫)।
https://www.youtube.com/watch?v=ypYW5kL6-Y

৬. (নেত্রকোণা) সম্মেলনের সফলতার জন্য ভারতীয় গণনাট্য সংঘের কর্মীরা যোগ দিয়েছিলেন। টগর অধিকারীও ওই দলে ছিলেন। এর আগে ওখানে নিবারণ পণ্ডিত গান গেয়ে বেড়াতেন, বিশেষত টংক প্রথার বিরুদ্ধে। ... নিবারণ পণ্ডিতের গান নেত্রকোণা অঞ্চলে দারুন জনপ্রিয় ছিল। এখানে যেসব গান গাওয়া হয়, টগর সেসব গানে দোতারা নিয়ে অংশগ্রহণ করেছিলেন। গানগুলির মধ্যে উল্লেখযোগ্য: 'হারে ও কৃষক ভাই/ মোদের কি আর বাঁচবার উপায় নাই।/ হায় হায়রে/ থালা বাসন হাঁড়িকুড়ি গৃহস্থের বেসার/ ক্রমে ক্রমে বিক্রি করে চলেছে সংসার/ অভাবগ্রস্ত প্রায় সমস্ত গৃহস্থ বেকার/ অস্থি চর্মসার হইয়াছে থাকি অনাহার।' সমবেত সংগীতে টগর যে গানটিতে অংশ নিয়েছিলেন তা মূলত জারিগান। নিবারণ পণ্ডিতের এই গানটি অসম্ভব জনপ্রিয় হয়েছিল। গানটি: 'কপালের দুঃখ ঘুচবে কতদিনে রে...' নেত্রকোণা কৃষক সম্মেলন থেকেই নিবারণ পণ্ডিতের সাথে টগরের হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। ১৯৫০-এ ডিসেম্বরে নিবারণ পণ্ডিত পশ্চিম বাংলায় চলে আসেন। আলিপুরদুয়ারে বসবাস শুরু করেন। কামাখ্যাগুড়ি অঞ্চলে ছিন্নমূল মানুষের মধ্যে নিবারণ পণ্ডিতের গান জনপ্রিয় ছিল। নিবারণ পণ্ডিত কোচবিহারের আঞ্চলিক ভাষায় অনেকগুলো গান রচনা করেন। তারমধ্যে একটি গান 'হামারগুলা হালুয়া কিষাণ কামাই করি খাং' (কথা: নিবারণ পণ্ডিত, সুর: টগর অধিকারী)। জীবনের শেষ প্রান্তে দারুণ দারিদ্র্যের মধ্যেও টগর নিবারণের গানগুলোকে গাইতেন আপন মনে। 'ও বাহে দেওয়ালির ব্যাটা...' তার

মধ্যে উল্লেখযোগ্য। টগর অধিকারী ও নিবারণ পণ্ডিতের জীবনী একই ট্র্যাজেডি। তাই হয়তো ওদের মধ্যে নিবিড় সম্পর্ক গড়ে উঠেছিল (চন্দ, ২০০৪)

৭. অধিকাংশ ক্ষেত্রেই গণনাট্য আন্দোলনের প্রেরণায় সেদিনের লেখা বহু গান লোকসংগীতের ভাণ্ডারে অমূল্য সম্পদ হয়ে জমা রয়েছে। ... পূর্ব-পাকিস্থানের তথা বাংলা ভাষার মোড় ফেরানো ঘটনা ২১শে ফেব্রুয়ারিকে কেন্দ্র করে ময়মনসিংহের চারণ সুরে রচিত ব্যালাড 'ঢাকার ডাক' কবি জসিমউদ্দীনকে শোনানো হলো। সমস্ত অন্তর তাঁরা (শিল্পীরা) সেদিন ঐ গানে ঢাকার প্রতিনিধির সামনে ঢেলে দিয়েছিলেন..... ভাষা আন্দোলনের ঘটনার ও শহিদদের আত্মদানের বর্ণনা সুরের আশ্রয়ে যে পরিবেশ সৃষ্টি করেছিল তাতে কবি জসিমউদ্দীন একেবারে অভিভূত হয়ে পড়েন। গান এগিয়ে চলছিল... গান শেষ হবার পর অনেকক্ষণ স্তব্ধ হয়ে থেকে কবি মুখর হয়ে ওঠেন। তিনি বলেন লৌকিক ঢঙে যে এই বিষয় নিয়ে এমন গান তৈরি হতে পারে তিনি তা ভাবতে পারেননি...। (বিশ্বাস, ২০১২ (খ))।

তথ্যসূত্র

মিত্র, অমর (২০১৯)। *মোমেনশাহী উপাখ্যান*। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

রাশেদা, এ. এন (২০২১)। 'অগ্নিযুগের বিপ্লবী মণি সিংহের জীবন সংগ্রাম: যুব সমাজের কাছে আজও প্রাসঙ্গিক'। ঢাকা: সাপ্তাহিক *একতা*।

চন্দ, নিখিলকুমার (২০০৪)। 'টগর অধিকারী'। *লোকশিল্পী পরিচয় গ্রন্থ*, ৪। লোকসংস্কৃতি ও আদিবাসী সংস্কৃতি কেন্দ্র, তথ্য ও সংস্কৃতি বিভাগ, পশ্চিমবঙ্গ সরকার।

মোস্তাফা, মো. গোলাম (সংগ্রহ ও সম্পাদনা) (২০১৩)। *রশীদ গীতিকা*। ঢাকা: ঝিঙেফুল প্রকাশনী।

রসুল, মুহম্মদ আবদুল্লা (১৯৬৯)। *কৃষকসভার ইতিহাস*। কলকাতা: নবজাতক প্রকাশন।

বিশ্বাস, রঙিলী (২০২৪)। 'গণনাট্য, একটি নাটকের গান এবং এক মহাফেজখানার ভগ্নাবশেষ'। কলকাতা: *ভান পত্রিকা*। শারদসংখ্যা, ১৪৩১।

বিশ্বাস, হেমাঙ্গ (২০১২)। 'গণনাট্য ও আত্মকথা'। *উজান গাঙ বাইয়া*। সম্পা: মৈনাক বিশ্বাস। কলকাতা: অনুষ্টুপ।

বিশ্বাস, হেমাঙ্গ (২০১২)। 'গণনাট্য আন্দোলন ও লোকসংগীত' এবং 'বাংলার লোকসংগীতের সংকটের স্বরূপ', 'লোকসংগীতের দরদী সমঝদার ঋত্বিক', 'লোকসংগীতের একাল না আকাল?'। *হেমাঙ্গ বিশ্বাস রচনাসংগ্রহ-১*। সম্পা: প্রণব বিশ্বাস ও রঙিলী বিশ্বাস। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং।

পত্রিকা

চৌধুরী, ফারুকুর রহমান (২০১৬)। 'নেত্রকোণার বিশিষ্ট কণ্ঠ শিল্পীগণ'। *ফারুকুর রহমান চৌধুরী ব্লগ*। সাইটে প্রবেশ: ২৮শে জুলাই, ২০২৫।

জাহান, জাহাঙ্গীর আলম (২০১৯)। 'কিশোরগঞ্জে সঙ্গীত চর্চা'। *কিশোরগঞ্জ নিউজ*। সাইটে প্রবেশ: ২৮শে জুলাই, ২০২৫।

ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমিকা

এম আবদুল আলীম

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookAleem

প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কারা?

সাধারণত কেন্দ্রীয় নয়, সমাজের প্রান্তস্থিত সাধারণ জনগোষ্ঠীকেই প্রান্তিক[১] জনগোষ্ঠী বলা হয়। তাত্ত্বিক কাঠামোয় অনেকে এদের 'নিম্নবর্গ'[২] বলে অভিহিত করে থাকেন। তাত্ত্বিক দৃষ্টিকোণ থেকে পর্যালোচনা না করে সাধারণভাবে যাদের আমজনতা বলা হয়, সেই কিষান-কিষানি, শ্রমিক, দিনমজুর, তাঁতি, কামার, কুমার, ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী, ক্ষুদে ব্যবসায়ী, দোকান কর্মচারী তথা সাধারণ মানুষদের ভাষা আন্দোলনে অবদানের স্বরূপ অন্বেষণেই এ প্রবন্ধের অবতারণা। ভাষা আন্দোলনের শুরুতে তেমন সম্পৃক্ততা না থাকলেও চূড়ান্ত পর্যায়ে তাদের অংশগ্রহণ ছিল স্বতঃস্ফূর্ত এবং বাঁধভাঙা জোয়ারের মতো। প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ আকস্মিক ব্যাপার ছিল না– এর মূলে ছিল দীর্ঘ শোষণ-বঞ্চনাজাত ক্ষোভ ও যন্ত্রণার অভিপ্রকাশ। তাছাড়া ভাষা আন্দোলন তো নিছক একটি সাংস্কৃতিক আন্দোলন ছিল না; এর সঙ্গে পূর্ববঙ্গের জনগণের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের গভীর সম্পর্ক বিদ্যমান ছিল (উমর, ২০১৭, ৩ পৃ. ৩৯৩)। আন্দোলন যতদিন রমনা অঞ্চলে সীমাবদ্ধ ছিল, ততদিন তা প্রবল রূপ ধারণ করেনি। বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারির পর রমনা পার হয়ে পুরান ঢাকা এবং পুরান ঢাকা থেকে সমস্ত পূর্ববঙ্গের আনাচে-কানাচে পৌঁছে যায় এ আন্দোলন। এতে ছাত্রদের সঙ্গে যুক্ত হয় বিক্ষুব্ধ কৃষক-শ্রমিক তথা সাধারণ মানুষ। আর তখনই ভাষা আন্দোলন হয়ে ওঠে দুর্দমনীয় (চৌধুরী, ২০০৮, পৃ. ২২০-২২১)। এ বিষয়ে অনুসন্ধান, পর্যালোচনা ও মূল্যায়ন করতে গেলে সঙ্গত কারণেই কয়েকটি প্রশ্ন সামনে আসে: প্রথমত, কোন আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক বাস্তবতায় সাধারণ মানুষ ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল? দ্বিতীয়ত, কারা তাদের সংগঠিত করেছিল? তৃতীয়ত, শাসকদের রক্তচক্ষু উপেক্ষা করে কীভাবে তারা দলে দলে এ আন্দোলনে শামিল হয়েছিল? চতুর্থত, শেষ পর্যন্ত তাদের অর্জনটাই-বা কী ছিল? এসব প্রশ্ন সামনে রেখে নির্দিষ্ট গবেষণা-পদ্ধতির আলোকে এ প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর ভূমিকার স্বরূপ তুলে ধরা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের আর্থ-সামাজিক পটভূমি

বাঙালি চিরকালের বিদ্রোহী জাতি (চক্রবর্ত্তী, ২০১১, পৃ. ৫৫)। বাংলার প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ, প্রতিরোধ, সংগ্রাম এবং বিদ্রোহের ইতিহাস দীর্ঘকালের; এবং সে ইতিহাস অতীব গৌরবদীপ্ত। অত্যাচারী জমিদার, নীলকর, মহাজন এবং জুলুমবাজ শাসক-শোষকের বিরুদ্ধে তারা কালে কালে প্রতিবাদ করেছে এবং সশস্ত্র বিদ্রোহের ডাক দিয়েছে। কৈবর্ত-বিদ্রোহ, কৃষক-বিদ্রোহ, নীলবিদ্রোহ, নৌবিদ্রোহ, নানকার-বিদ্রোহ, তেভাগা আন্দোলন– এসবের প্রতিটির সঙ্গেই সাধারণ মানুষের প্রতিবাদ-প্রতিরোধ, ত্যাগ-তিতিক্ষা ও শৌর্য-বীর্য জড়িয়ে রয়েছে।[৩] এসবের পেছনে কাজ করেছে আর্থ-সমাজিক-রাজনৈতিক শোষণ-বঞ্চনাজাত নানা ক্ষোভ ও যন্ত্রণা। ভাষা আন্দোলনের সময়কার দেশ-কাল-সমাজের

ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, সাধারণ মানুষ তখন নানাভাবে বঞ্চিত ছিল। খাদ্য, বস্ত্র, বাসস্থানের সংকটের পাশাপাশি ছিল বহুমাত্রিক শোষণ-নিপীড়ন। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসন-শোষণের জাঁতাকল থেকে মুক্তি পেতে না পেতেই নতুন মাত্রায় শুরু হয় পাকিস্তানি দুঃশাসন; যা তাদের জীবনকে অতিষ্ঠ করে তোলে। এমন বাস্তবতায় ভাষা-সংস্কৃতির আগ্রাসনে জীবন-মান, স্বকীয় সত্তা সবকিছু পঙ্গু করার দুরভিসন্ধি তারা মেনে নিতে পারেনি। মূলত, অস্তিত্ব টিকিয়ে রাখার তাগিদেই তারা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়। এ প্রসঙ্গে হাসান হাফিজুর রহমান লিখেছেন:

> মেকি আজাদীর রঙিন ছটা আর উজ্জ্বল নতুন দিনের সোনালী স্বপ্ন কোথায় মিলিয়ে গিয়েছে– জাতির জীবনে, সমগ্র দেশের বুকে নেমে এসেছে নীরন্ধ্র অন্ধকারের কালো বিভীষিকা। সামন্তবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের দোসর প্রতিক্রিয়ার দানবীয় নিষ্পেষণে দেশের অর্থনৈতিক জীবন পঙ্গু, শিক্ষার অধিকার, ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাধীনতা বিপর্যস্ত, গণতন্ত্র নির্বাসিত। আর এই নিঃসীম অন্ধকারের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে জনতার জীবন গভীর হতাশায় আচ্ছন্ন। এমনি দুর্দিনে এক ঝলক আশীর্বাদের আলোর মতোই এলো একুশে ফেব্রুয়ারী। দিনে দিনে যে বিপুল বিক্ষোভ পুঞ্জ পুঞ্জ হয়ে জমেছিল মানুষের মনে মনে, শহীদের পবিত্র রক্তের স্পর্শে যেন কোন মন্ত্রগুণে তার বাঁধ গেল ভেঙে – উচ্ছল জোয়ারের কলধ্বনি ছড়িয়ে পড়ল সারা দেশ জুড়ে (রহমান, ২০১৬, পৃ. ১১)।

বাস্তবেই মেকি আজাদীর রঙিন ছটা অল্প দিনের মধ্যেই ফিকে হয়ে যায়। যে স্বপ্ন, আশা-আকাঙ্ক্ষা বুকে ধারণ করে এ অঞ্চলের মানুষ স্বতন্ত্র আবাসভূমি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামে অবতীর্ণ হয়েছিলেন, নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে সেগুলোর কোনোটিই পূরণ হয়নি। বিপরীতে আর্থিক শোষণ, সামাজিক নিপীড়ন, বাক্‌স্বাধীনতা হরণ, জেল-জুলুম-নির্যাতন, ক্ষুধা-দারিদ্র্য প্রভৃতি তাদের নিত্যসঙ্গী হয়; যার অভিঘাত কেন্দ্র থেকে প্রান্ত সর্বত্র বিস্তৃত হয়। এক কথায়, পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বৈষম্যমূলক আচরণ ও আগ্রাসি নীতির কারণেই সাধারণ মানুষের জীবন হয়ে ওঠে দুর্বিষহ।

শুরুতেই পাকিস্তান রাষ্ট্রটির দায়িত্বভার কব্জা করেন অবাঙালি পুঁজিপতি, অভিজাত সামন্ত-ভূস্বামী, সাম্রাজ্যবাদের তল্পীবাহক রাজনীতিবিদ ও আমলারা। নিজেদের একচ্ছত্র কর্তৃত্ব প্রতিষ্ঠা করতে গিয়ে তারা শিল্প-কারখানা, ব্যবসায় কেন্দ্র, ব্যাংক-বিমা প্রতিষ্ঠান, শাসনকার্য পরিচালনার দপ্তরসমূহ সবকিছু স্থাপন করে পশ্চিম পাকিস্তানে। ন্যাশনাল ব্যাংক অব পাকিস্তান, জুট বোর্ড প্রভৃতি প্রতিষ্ঠা করে একচেটিয়াভাবে চাকরি দেওয়া হয় করাচি-লাহোরের লোকদের, তাতে বাঙালিরা হয় উপেক্ষিত। অন্যান্য সরকারি-বেসরকারি চাকরির ক্ষেত্রেও পশ্চিম পাকিস্তানিরা প্রাধান্য লাভ করে। সর্বোপরি চাকুরির পরীক্ষা থেকে বাদ দেওয়া হয় বাংলা ভাষা। এর ফলে পূর্ববঙ্গের যুবকেরা বেকারত্বের অভিশাপে পর্যুদস্ত হয়। কৃষক পাট ও অন্যান্য ফসলের ন্যায্য মূল্য পায় না। বাজেট বরাদ্দের ক্ষেত্রেও করা হয় বিমাতাসুলভ আচরণ।[৪] চাকরি, শিক্ষা, শিল্প, স্বাস্থ্য সবকিছুতেই সীমাহীন বৈষম্য এ অঞ্চলের মানুষকে হতাশ করে। এভাবে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর একচোখা নীতির কারণে প্রতিটি ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ে পূর্ববঙ্গ। অঞ্চলটি যেন পরিণত হয় তাদের কলোনিতে। সাধারণ মানুষ হাড়ভাঙা পরিশ্রম করে ক্রমে কঙ্কালসার হয়ে গেলেও তাদের ভাগ্য-পরিবর্তনের আশা সুদূর পরাহত হতে থাকে। ঐ সময়ের চিত্র তুলে ধরে সরলানন্দ সেন লিখেছেন:

> ব্রিটিশের উপনিবেশের বদলে আজ করাচীর উপনিবেশে পরিণত হচ্ছে এই দেশ। আমাদের চাষী মজুর হাড়ভাঙ্গা খাটুনী খেটে রোদে পুড়ে, বর্ষায় ভিজে, শীতে কেঁপে সাঁতার পানি বিলে ডুব দিয়ে পাট কাটে, ফসল তোলে, সোনার ধানে গোলা ভরে, স্বর্ণসূত্রে দিগন্ত ঝলসে দেয়। কিন্তু, তাদের

> দুর্দৈব ঘুচে কৈ? পরণে সেই তিন হাত গামছা, মাটির শানকীতে নুন আর পান্তা, পান্তা আর নুন, ছালন বলতে শুক্‌নো লঙ্কা পোড়া! এই দারিদ্র্য পীড়ত দুঃখ-দগ্ধ জীবনের ভার আমাদের বাপ-চাচারা আর বইতে পারছেন না। রোগ শোক দুর্ভিক্ষ ও প্লাবনের নিয়মিত কশাঘাত আমাদের মনুষ্যত্ব বোধ লোপ করে দিচ্ছে (সেন, ১৯৭১, পৃ. ৬)।

বন্যা, খরা ইত্যাদি প্রাকৃতিক দুর্যোগের সঙ্গে সরকারি অব্যবস্থাপনা, শোষণ এবং মুনাফালোভীদের দৌরাত্ম্যে পূর্ববঙ্গে খাদ্যসংকট প্রকট আকার ধারণ করে। খাদ্যের চাহিদা মেটাতে সাধারণ গৃহস্থ পরিবারের লোকেরা সোনা-রুপার অলংকার, এমনকি কাঁসার থালা-বাসন পর্যন্ত বন্ধক রাখে। তিনবেলা ভাত জোটাতে না পেরে ভাতের মাড়, আটার জাউ এসব খেয়েছে। বহু মানুষ দিনের পর দিন একবেলা খেয়ে, সময় সময় না খেয়েও দিনাতিপাত করেছে। স্থানে স্থানে লঙ্গরখানা খোলা হয়েছে। খাদ্যের অভাবে অনেক মানুষ মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়েছে। খাদ্যের অন্বেষণে গ্রাম ছেড়ে দলে দলে শহরেও পাড়ি জমিয়েছে অনেকে। সরকার কর্ডন প্রথা চালু করলে দাওয়ালরাও সংকটে পড়ে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের মানুষের যে দুরবস্থা সৃষ্টি হয়, সে-সম্পর্কে বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় সংবাদ ও প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়। *সাপ্তাহিক নও-বেলাল* প্রকাশ করে, 'দুর্ভিক্ষের কবলে জগন্নাথপুর'সহ বেশ কয়েকটি প্রতিবেদন।[৫] নিত্যপ্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের দাম মাত্রাতিরিক্তি বৃদ্ধি পায়। সাধারণ কৃষক, দিনমজুর, শ্রমিক সকলের জীবনই দারিদ্র্যের কশাঘাতে বিপর্যস্ত হয়। নানা স্থানে অর্থ-সংকট প্রকট আকার ধারণ করে। পাটের দরপতন ঘটে। প্রতিমণ বিক্রি হয় ৫ থেকে ৮ টাকায়। অন্যদিকে চাউলের মূল্য বেড়ে দাঁড়ায় মণপ্রতি ২৮-৩০ টাকায়। সুদূর পল্লি অঞ্চলে দুর্ভিক্ষের পদধ্বনি শোনা যায় (সেন, ১৯৭১, পৃ. ২০১০)। এ সংকটে সরকারি ও বিরোধী দলীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ একে অপরকে দোষারোপ করেন। পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে এ নিয়ে চলে তুমুল বাক্‌যুদ্ধ। রাজপথেও নানা কর্মসূচি পালিত হয়। ১৯৪৯ সালের সেপ্টেম্বর মাসে পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান পূর্ববঙ্গ সফরে আসেন। তখন ব্যাপক খাদ্যসংকট চলছিল। এর প্রতিবাদে এবং দুর্ভিক্ষ দূরীকরণের দাবিতে আরমানীটোলা ময়দানে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ এক জনসভা আয়োজন করে। এতে বক্তব্য দেন মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী, শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান প্রমুখ। শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর বক্তৃতায় দুর্ভিক্ষের প্রসঙ্গ উল্লেখ করে বলেন, একজন অন্যজনকে খুন করলে তার ফাঁসি হয়– যে নূরুল আমীন শত শত লোক খুন করছে, তার কী হওয়া উচিত? তাকে এই মাঠের মধ্যে এনে গুলি করা উচিত (উমর, ২০১৭ : ১, পৃ. ১০৯)। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে আয়োজন করা হয় ভুখা মিছিল ও প্রতিবাদ-সভা। অর্থনৈতিক সংকটের সঙ্গে পাল্লা দিয়ে বাড়ে সামাজিক ও রাজনৈতিক সংকট। জমিদারি প্রথা বিলুপ্ত হলেও সাধারণ মানুষের ওপর অত্যাচার-নির্যাতন অব্যাহত থাকে। আগে জমিদারের গোমস্তা, কর্মচারী ও লাঠিয়ালরা অত্যাচার করলেও তাদের জায়গায় আবির্ভূত হয় সার্কেল অফিসার, তহশিলদার, চৌকিদার। খাজনা আদায়সহ নানা কাজে তারা সাধারণ মানুষকে হয়রানি ও অত্যাচার করে (উমর, ২০১৭: ১, পৃ. ১৫৬)। সমাজ ও রাষ্ট্রজীবনের সর্বত্র কর্কট-রোগের মতো ছড়িয়ে পড়ে অবক্ষয়-নৈরাজ্য। হানাহানি, হিংসা-বিবাদ, আধিপত্য বিস্তার, দুর্নীতি-স্বজনপ্রীতি মানুষের জীবনে সীমাহীন সংকট সৃষ্টি করে। সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রার নিম্নমান, অন্নকষ্ট ও চিকিৎসার অভাব ভয়াবহ পরিস্থিতি সৃষ্টি করে। কলেরা-মহামারীতে বহু গ্রাম মৃত্যুপুরীতে পরিণত হয়। ১৯৪৮ সালে পূর্ববঙ্গে কেবল কলেরাতেই মৃত্যুবরণ করে ২৯, ৭০০ মানুষ (সেন, ১৯৭১, পৃ. ২৩২)।

পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর এই সর্বব্যাপী শোষণ, অব্যবস্থাপনা ও শাসনকাজে ব্যর্থতায় সাধারণ মানুষের জীবনে যে দুর্ভোগ নেমে আসে, তা-ই তাঁদের ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার নেপথ্যে কাজ করে। বস্তুত,

ভাষা আন্দোলন তৈরির পেছনে মূল শক্তি জুগিয়েছিল পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর ভাঁওতাবাজির শিকার পূর্ব-বাংলার কৃষক-শ্রমিকরাই (রহমান, ২০০০, পৃ. ১৪২)। তাছাড়া এ আন্দোলনের অগ্রভাগে থেকে যাঁরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান অধ্যয়নরত সেই ছাত্র-ছাত্রীদের সিংহভাগই ছিলেন পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ মানুষদের সন্তান। ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি হতাহতের পর আন্দোলন বিস্ফোরণরূপ ধারণ করলে সরকার ব্যাপক গ্রেপ্তার-হয়রানি শুরু করে। তাতেও আন্দোলন দমন করতে না পেরে অনির্দিষ্টকালের জন্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ করে দেওয়া হয়। এ সময় ছাত্ররা নিজ এলাকায় গিয়ে সাধারণ মানুষদের সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলন বেগবান করেন।

ভাষা আন্দোলনের ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত ভাষ্য

১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলন চূড়ান্ত রূপ পরিগ্রহ করলেও এর সূত্রপাত ১৯৪৭ সালের দেশভাগের অব্যবহিত পরে। এর আগে হিন্দি, উর্দু, বাংলা ভাষা নিয়ে চলে বহুমাত্রিক তর্ক-বিতর্ক। বাংলা ভাষার দাবিও পিছিয়ে থাকে না। ১৯৩৭ সালে মওলানা আকরম খাঁ বলেছিলেন, 'বাঙ্গালা সব দিক দিয়াই ভারতের রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী করিতে পারে'।[৬] ১৯৪৪ সালে আবুল হাশিম প্রাদেশিক মুসলিম লীগের কাউন্সিলে মাতৃভাষা বাংলার মাধ্যমে শিক্ষাদানের বিষয়টি অতীব গুরুত্বের সঙ্গে তুলে ধরেন (হোসেন, ২০১৪, পৃ. ৫১৭)। এতৎসত্ত্বেও হবু রাষ্ট্র পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে তা নিয়ে মুসলিম লীগ নেতৃবৃন্দ এবং তাদের অনুসারী বুদ্ধিজীবীগণ ভাবতে শুরু করেন। পাকিস্তান সৃষ্টির পর একপ্রকার আগ্রাসি মনোভাব থেকেই মুসলিম লীগ সরকার দেশটির মোট জনসংখ্যার শতকরা ৫৬.৪০% লোকের মাতৃভাষা বাংলাকে উপেক্ষা করে ৩.৩% লোকের ভাষা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব করে (কবির, ২০১৪, পৃ. ২)। এর প্রতিবাদে আবদুল হক, মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্, মুহম্মদ এনামুল হক, আবুল কাসেম, আবুল মনসুর আহমদ, কাজী মোতাহার হোসেন, ফররুখ আহমদ, মাহবুব জামাল জাহেদী প্রমুখ লেখনী ধারণ করেন এবং বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার যৌক্তিকতা তুলে ধরেন। এ সময় বুদ্ধিজীবী ও সচেতন-মহল উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চাপিয়ে দেওয়ার প্রতিবাদ করলেও সাধারণ মানুষ এ বিষয়ে সচেতন ছিল না বললেই চলে। শুধু তাই নয়, অনেকে প্রকাশ্যে উর্দুর সমর্থক ছিলেন।[৭]

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক, প্রগতিশীল রাজনৈতিক নেতা-কর্মী ও সচেতন ছাত্ররা লেখনী সঞ্চালন ও সেমিনারে বক্তৃতা-আলোচনার মাধ্যমে ক্রমে বাংলা ভাষার দাবিকে জোরালো করতে থাকেন। কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, গণ-আজাদী লীগ, তমদ্দুন মজলিস, গণতান্ত্রিক যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ প্রভৃতি সংগঠন রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবির পক্ষে ছাত্রদের সংগঠিত ও জনগণকে সচেতন করতে থাকেন। ভাষা আন্দোলন রাজনৈতিক রূপ পরিগ্রহ করে ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শেষ সপ্তাহে পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা-বিষয়ক প্রস্তাব নাকচ হওয়ার পর (আনিসুজ্জামান, ২০১৮, পৃ. ১৭)। তিনি ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও পাকিস্তান গণপরিষদের ভাষা হিসেবে ব্যবহারের সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানসহ মুসলিম সদস্যদের বিরোধিতায় প্রস্তাবটি নাকচ হয়ে যায়। এরপর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা রাজপথে নেমে আসে। পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন স্থানে প্রতিবাদ-কর্মসূচি পালিত হয়। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট পালিত হয়। এতে ছাত্রদের সঙ্গে ঢাকা ও ঢাকার বাইরের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের নানা তথ্য পাওয়া যায়।[৮] ১১ই মার্চ ঢাকায় পিকেটিং করার সময় গ্রেপ্তার করা হয় শেখ মুজিবুর রহমান, শামসুল হক, এম এ ওয়াদুদ, কাজী গোলাম মাহবুব, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদসহ পঁচাত্তর জন

ছাত্রনেতাকে (রহমান, ২০১৭, পৃ. ২০৬)। পরে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের সঙ্গে ৮-দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষর করে বন্দিদের মুক্তি দেন। এরপর পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ পূর্ববঙ্গ সফরে এসে প্রথমে রেসকোর্স ময়দানের সংবর্ধনাসভা এবং পরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেন। তাঁর সামনেই ছাত্ররা প্রতিবাদ করেন (মতিন, ২০০৩, পৃ. ৪২-৪৩)। জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ সফর এবং সরকারি দমন-পীড়নের পর প্রথম পর্বের ভাষা আন্দোলন ক্রমে থেমে যায়। এরপর সরকার আরবি হরফে বাংলা প্রচলন এবং উর্দু ভাষার প্রসারে নানা উদ্যোগ গ্রহণ করলেও পূর্ববঙ্গের মানুষ তা গ্রহণ করেনি।

ভাষা আন্দোলন প্রবল রূপ ধারণ করে ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে। নানাবিধ শোষণ-বঞ্চনায় পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে ক্ষোভ বিদ্যমান থাকায় পরিবেশ তৈরিই ছিল। শুধু দরকার ছিল একটু উস্কানির। আর সে কাজটিই করেন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীন। তিনি ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানের জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে ছাত্ররা রাজপথে নেমে আসে। আন্দোলন যথাযথভাবে পরিচালনার জন্য কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে গঠন করা হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এর আগে আবদুল মতিনকে আহ্বায়ক করে গঠন করা হয় 'ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দ এবং পূর্ব পাকিস্তান যুগলীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, কমিউনিস্ট পার্টি, তমদ্দুন মজলিস, ইসলামী ভ্রাতৃসংঘ প্রভৃতি সংগঠন ছাত্র-জনতাকে সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে নিয়ে যান। এরপর আসে সূর্যবিস্ফোরণের দিন, ২১শে ফেব্রুয়ারি (মতিন ও রফিক, ২০০৫, পৃ. ৯৫)। প্রদেশব্যাপী ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। আন্দোলন দমনে সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা প্রশ্নে দফায় দফায় বৈঠক হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি সমস্ত পূর্ববঙ্গে ধর্মঘট পালিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সমাবেশে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার ঘোষণা দিয়ে দলে দলে আইন পরিষদ অভিমুখে যাত্রা করলে পুলিশের সঙ্গে সংঘর্ষ বেঁধে যায়। ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর, অহিউল্লাহ, আউয়ালসহ অনেকে। আহত ও গ্রেপ্তার করা হয় অগণিত নেতা-কর্মীকে। ছাত্রহত্যার প্রতিবাদে ভাষা আন্দোলন গণ-আন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনের পূর্বাপর ঘটনা পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে সরকারের সঙ্গে শিক্ষক-বুদ্ধিজীবীদের একাংশ ও ছাত্রদের যে বাদ-প্রতিবাদ ও সংঘর্ষ হয়, তাতে সাধারণ জনগণের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। কিন্তু বায়ান্নতে এসে দেখা যায় আন্দোলনের ভিন্ন রূপ। ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি ও তারপরে ঢাকার বাইরে মফস্বলে অসংখ্য প্রতিবাদ-সভা ও বিক্ষোভ-মিছিল হয় (আল্‌হেলাল, ২০০৩, পৃ. ৪৬৮)। বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন:

> ১৯৪৮ সালে আন্দোলনকারী ছাত্রেরা তৎকালীন নবাবপুর রেলক্রসিং পার হলে ঢাকার স্থানীয় লোকদের দ্বারা অনেক নিগৃহীত হয়েছেন। কিন্তু ১৯৫২ সালে আমরা দেখি পুরাতন ঢাকার জনগণকে আন্দোলনে খুব সক্রিয় অংশগ্রহণ করতে। শুধু তাই নয়, সে সময় সাধারণ মানুষের এই সক্রিয়তা ব্যতীত ২২শে ফেব্রুয়ারী ও তার পরবর্তী পর্যায়ে আন্দোলন যেভাবে বিস্তার লাভ করেছিলো এবং যেভাবে বিকশিত হয়েছিল সেটা কিছুতেই সম্ভব হতো না। এ ছাড়া ঢাকার বাইরে ব্যাপক গ্রামাঞ্চলে আন্দোলনের বিস্তার যেভাবে ঘটেছিলো তার থেকেই প্রমাণিত হয় যে, ১৯৫২ সালে জনগণের সামাজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক জীবনের বিভিন্ন মৌলিক সমস্যাগুলির সঙ্গে এই আন্দোলনের একটা গভীর ঐক্যসূত্র ইতিপূর্বেই স্থাপিত হয়েছিলো। এবং এই ঐক্যের সূত্র ধরেই

> ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পরিগ্রহ করেছিলো এক অদৃষ্টপূর্ব ব্যাপকতা (উমর, ২০১৭ : ৩, পৃ. ৩৮৪-৩৮৫)।

কাজেই এ কথা নির্দ্বিধায় বলা যায় যে, মুসলিম লীগ সরকারের আর্থ-সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক শোষণ-বঞ্চনায় পূর্ববঙ্গের মানুষের মধ্যে ধীরে ধীরে যে ক্ষোভের সঞ্চার ঘটেছিল, তা-ই তাদের ব্যাপকভাবে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করেছিল।

ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠী তথা শ্রমিকদের ভূমিকা

পূর্ববঙ্গের ভাষা আন্দোলনে অগণিত সাধারণ মানুষ তথা প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণের তথ্য পাওয়া যায় ঐ সময়কার পত্র-পত্রিকা, ভাষাসংগ্রামীদের সাক্ষাৎকারসহ বিভিন্ন দলিলপত্রে। নতুন রাষ্ট্র পাকিস্তানে সরকার ডাকটিকেট, খাম, স্ট্যাম্প প্রভৃতি থেকে বাংলা ভাষাকে বাদ দিলে প্রথম যাদের পক্ষ থেকে প্রতিবাদ ওঠে, তাদের মধ্যে বিশেষভাবে উল্লেখ করা যায় পলাশী ব্যারাকে বসবাসরত সরকারি কর্মচারীদের কথা। বাংলা ভাষার পক্ষে অবস্থান গ্রহণ করায় পুরনো ঢাকার উর্দুভাষী উচ্ছৃঙ্খল একদল লোক গাড়িতে এসে তাদের ওপর হামলা চালায়। এতে ব্যারাকের একজন দারোয়ানের নাক ভেঙে যায়। হামলার প্রতিবাদে পলাশী ব্যারাকের কর্মচারীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল ও ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজের ছাত্রদের সঙ্গে ঐক্যবদ্ধ হয়ে মিছিল নিয়ে সচিবালয় ঘেরাও করে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। ভাষার দাবিতে ঢাকার বুকে সাধারণ মানুষের মিছিলে অংশগ্রহণ এটাই প্রথম (উমর, ২০১৭ : ১, পৃ. ৩৪)। ১৯৪৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় ভাষা আন্দোলনের মিছিলে মুসলিম লীগ কর্মীরা হামলা চালালে তার প্রতিবাদে ৩রা মার্চ স্থানীয় আলতাফুন্নেসা মাঠে দশ-বারো হাজার লোকের সমাবেশ হয়।[৯] পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব নাকচ হওয়ার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি পাবনায় হরতাল পালিত হয়। সকাল থেকেই এডওয়ার্ড কলেজের ছাত্ররা মিছিল নিয়ে শহর প্রদক্ষিণ করলে তাদের সঙ্গে যোগ দেন হোসিয়ারি শিল্পের শ্রমিক, বিড়ি শিল্পের শ্রমিক, দোকানের কর্মচারী ও সাধারণ মানুষ (আলীম, ২০২১, পৃ. ৬৭২)। ১১ই মার্চ ধর্মঘটের দিন যশোর এম এম কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল বের করলে তাদের সঙ্গে যোগ দেন অনেক পথচারী, দোকানদার ও রিকশাচালক (রহমান, ১৯৮৬)। নারায়ণগঞ্জের লক্ষ্মীনারায়ণ কটন মিলসহ বিভিন্ন কারখানার শ্রমিকরা ছাত্রদের সঙ্গে পিকেটিং ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে।[১০]

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষের এমন বিক্ষিপ্ত অংশগ্রহণ আরও বিভিন্ন জেলায় পাওয়া গেলেও তা ছিল প্রধানত ছাত্র ও প্রগতিশীল যুবকদের আন্দোলন। কিন্তু ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের পর দৃশ্যপট সম্পূর্ণ বদলে যায়। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল থেকেই ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে ঢাকাই জনতার ঢল নামে। ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণে গায়েবানা জানাজায় অংশগ্রহণ করেন হাজার হাজার মানুষ। ঐদিন রায় সাহেবের বাজারের নিকটস্থ মসজিদেও অনেক সাধারণ মানুষ গায়েবানা জানাজায় শরিক হন। ছাত্রদের সঙ্গে শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ ছাড়াও ঢাকাসহ সমস্ত পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন মসজিদে জুম্মার নামাজের পর হাজার হাজার মুসল্লি শহিদদের

আত্মার মাগফেরাত করে মোনাজাত করে। উত্তেজিত জনতা এক পর্যায়ে সরকার-সমর্থক পত্রিকা *মর্নিং নিউজ*-এর অফিস পুড়িয়ে দেয়। বিকেলে তিন-চার হাজার মুসল্লি আজিমপুর কবরস্থানে গিয়ে শহিদদের কবর জিয়ারত করে। সাধারণ মানুষের সঙ্গে সেক্রেটারিয়েট ও অ্যাকাউন্ট্যান্ট জেনারেল অফিসের কর্মচারীরাও এদিন গায়েবানা জানাজা ও শোভাযাত্রায় অংশগ্রহণ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে শহিদ হন রিকশাচালক আবদুল আউয়াল এবং অহিউল্লাহ নামের এক কিশোর। ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি সরকারি নির্মমতার প্রতিবাদে আবুল হাশিম যে বিবৃতি দেন তাতে উল্লেখ করেন, 'গত বৃহস্পতিবার ও শুক্রবারের মর্মান্তিক ঘটনার জন্য দায়ী ব্যক্তিরা যে আল্লাহ ও জনসাধারণের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করিয়াছেন সে বিষয়ে কোনই সন্দেহ নাই'।[১১] এরপর ঢাকা ও ঢাকার বাইরে পালিত লাগাতার হরতাল ও প্রতিবাদ-কর্মসূচিতে সাধারণ মানুষ প্রত্যক্ষভাবে অংশগ্রহণ করে।

ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর যে অংশগ্রহণ, তাতে শ্রমিকদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। রিকশাশ্রমিক, বিড়িশ্রমিক, চা-শ্রমিক, হোসিয়ারি শিল্পের শ্রমিক, পাট ও বস্ত্রকলের শ্রমিক, গরু ও মহিষের গাড়ির শ্রমিক, দৈনিক মজুরির ভিত্তিতে কাজ করা কৃষিশ্রমিক সকলেই এ আন্দোলনে স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে হতাহতের প্রতিবাদে বিবৃতি দেন পাকিস্তান শ্রমিক ফেডারেশনের সভাপতি নুরুল হুদা। বিবৃতিতে তিনি বলেন– মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য বহু লোক প্রাণ বিসর্জন দিয়েছে, শত শত লোক আহত ও গ্রেপ্তার হয়েছে। দমননীতি উপেক্ষা করে জনসাধারণ বুলেটের গুলি বুক পেতে নিতে এবং কারাবরণ করতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞা করেছে। তিনি আরও বলেন, শ্রমিকদের মধ্যে প্রবল বিক্ষোভের সৃষ্টি হয়েছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে করণীয় ঠিক করতে তিনি ২৮শে ফেব্রুয়ারি নিজ বাসভবনে এক সভা আহ্বানের কথাও বিবৃতিতে উল্লেখ করেন।[১২] ২২শে ফেব্রুয়ারি নায়ারণগঞ্জের হরতাল ও বিক্ষোভ-কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করে শহরতলীর ঢাকেশ্বরী ১ নং, ২ নং চিত্তরঞ্জন, লক্ষ্মীনারায়ণ, আদর্শ কটন মিলস ও আদমজী জুট মিল, নারায়ণগঞ্জ কো. প্রভৃতি শিল্পকারখানার প্রায় পনেরো হাজার শ্রমিক। বিকেলে শ্রমিক নেতা ফয়েজ আহম্মদের সভাপতিত্বে নারায়ণগঞ্জে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। এতে প্রায় বিশ হাজার লোক উপস্থিত ছিলেন।[১৩] চট্টগ্রামের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্য ছিলেন শ্রমিক নেতা মোসলেম উদ্দিন, নুরুজ্জামান এবং মিছির আহমেদ। এখানকার ভাষা আন্দোলনের কর্মসূচিগুলোতে শ্রমিকদের অংশগ্রহণ ছিল চোখে পড়ার মতো। ১লা মার্চ লালদীঘি ময়দানের বিশাল জনসভায় বক্তব্য দেন শ্রমিকনেতা জহুর আহমদ চৌধুরী। তিনি ঘোষণা করেন, যে পর্যন্ত বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা না করা হয়, পূর্ববঙ্গের শ্রমিকগণ ততদিন শান্তিপূর্ণভাবে আন্দোলন চালিয়ে যাবে। তিনি বলেন, বাংলা ভাষার সঙ্গে উর্দুর কোনো বিরোধ নেই, তাই উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকেও রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আরও বলেন, পাকিস্তানের শতকরা ৫৫ ভাগ অধিবাসী বাংলা ভাষায় কথা বলে, তাদের ন্যায্য দাবিকে দাবিয়ে রাখা যাবে না। সরকার পরিস্থিতি মোকাবেলায় ব্যর্থ হয়েছে বিধায় তাদের পদত্যাগ করা উচিত বলে তিনি মনে করেন। সবশেষে বলেন, দেশ স্বাধীন হওয়ার পরেও পুলিশের গুলিতে আমাদের ছাত্র ভাইদের অমূল্য জীবন হারাতে হলো। জনাব জহুর আহমদ গুলিবর্ষণে জড়িতদের তদন্তপূর্বক শাস্তির দাবি জানান।[১৪] পাবনার হোসিয়ারি ও বিড়িশিল্পের শ্রমিকেরা ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়। দেশবিভাগের পূর্বে এসব শিল্পের কাঁচামালের সিংহভাগ আসতো কলকাতা থেকে। বিশেষ করে, বিড়িশিল্পের কাঁচামাল আসতো ভারত থেকে। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর তা বন্ধ হয়ে যায়। ফলে এ শিল্পে বিপর্যয় নেমে আসে। তাই এর সঙ্গে সংশ্লিষ্ট মালিক, শ্রমিক ও ব্যবসায়ীগণ

ক্ষতিগ্রস্ত হন (আলীম, ২০১৮, পৃ. ৫৭)। এক ধরনের ক্ষোভ থেকেই হোসিয়ারি ও বিড়িশিল্পের বিক্ষুব্ধ শ্রমিকরা এখানকার ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে মুসলিম লীগ সরকারের বিরুদ্ধে তাদের অবস্থান তুলে ধরে। সিরাজগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে ওতপ্রোতভাবে যুক্ত ছিলেন এখানকার বিড়ি-শ্রমিক, রিকশাশ্রমিক, গরুর গাড়ির শ্রমিক, টমটম শ্রমিক, কুলি-কামার ও দিনমজুর শ্রেণির অনেক মানুষ (হোসেন, ২০০০, পৃ. ১৯৯)। তারা নিয়মিত সভা-সমাবেশে অংশ নিতেন, মিছিল করতেন এবং স্লোগান দিতেন (শামীম, ২০১৭, পৃ. ৫২)। সিরাজগঞ্জের রিকশাশ্রমিক ইউনিয়নের সাধারণ সম্পাদক নূর মোহাম্মদ বোচা ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হতে এখানকার শ্রমিকদের সংগঠিত করেন। এখানে প্রথম শহিদ মিনার নির্মাণে তিনি বিশেষ ভূমিকা পালন করেন। তাঁর শিশুপুত্র জিন্নাত আলীকে দিয়ে শহিদ মিনারের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করা হয় (আলীম, ২০১৮, পৃ. ১৩৯)।

ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের অংশগ্রহণের পেছনে কাজ করেছিল তাদের ভেতরে গুমোট-বাঁধা শোষণ-বঞ্চনাজাত ক্ষোভ। তাদের সংগঠিত করে আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও ছাত্রসংগঠন প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে কাজ করে। এক্ষেত্রে কমিউনিস্ট পার্টি, পূর্ব পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ প্রভৃতি সংগঠন ব্যাপক অবদান রাখে। বিশেষ করে, কমিউনিস্ট পার্টি শ্রমিকদের ভাষা আন্দোলনে যুক্ত করতে সবচেয়ে বেশি অবদান রাখে। পাকিস্তানের কমিউনিস্ট পার্টি পূর্ববঙ্গ শাখা ১৯৫২ সালের ১১ই ফেব্রুয়ারি সার্কুলার জারি করে ২১শে ফেব্রুয়ারির ধর্মঘট সফল করার জন্য বাঙালি-অবাঙালি রেলমজুরদের ঐক্যবদ্ধভাবে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে এগিয়ে আসার আহ্বান জানায়। পার্টির কর্মীদের নির্দেশ দেওয়া হয় লিফলেট, পোস্টার এবং ছোটো ছোটো বৈঠক করে রেলমজুর ও অন্যান্য মজুর শ্রেণিকে সংগঠিত করার (উমর, ২০১৭ : ১, পৃ. ৩১০)। এ রাজনৈতিক দলের নেতা-কর্মীরা পার্টির এ নির্দেশ বাস্তবায়নে নানাভাবে কাজ করে। ফলে ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে হতাহতের পর রেলশ্রমিকরা হরতাল, ধর্মঘট ও মিছিল-সমাবেশে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করে। বিভিন্ন স্থানে রেলস্টেশন অবরোধ করা হয়। এতে ছাত্র ও সাধারণ মানুষের সঙ্গে রেলশ্রমিকরাও অংশগ্রহণ করে। ব্রাহ্মণবাড়িয়ার বাঘাচং রেলস্টেশন অবরোধ করে উত্তরবঙ্গগামী বাহাদুরাবাদ মেইল ট্রেনটি টানা পাঁচদিন আটকে রাখা হয়। এতে ঢাকা-চট্টগ্রাম, ঢাকা-সিলেট এবং চট্টগ্রাম-সিলেটের সঙ্গে পুরো উত্তরবঙ্গের রেল-চলাচল বন্ধ থাকে (ভূঁইয়া, ২০১৯)।

ভাষা আন্দোলনে কৃষকসমাজের অংশগ্রহণ

ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের যে ভূমিকা, তা ছিল মূলত শহরকেন্দ্রিক। এর কারণ পাটশিল্প, বস্ত্রশিল্প, বিড়িশিল্প, হোসিয়ারি শিল্প প্রভৃতির সঙ্গে সম্পৃক্ত শ্রমিকরা শহরে বসবাস করতো। রিকশাশ্রমিকদের বেলায়ও একই কথা প্রযোজ্য। শ্রমিক সংগঠনগুলো শহরের শিল্প এলাকাতেই অধিক তৎপর ছিল। এবার অনুসন্ধান করা হবে গ্রামের বৃহত্তর যে জনগোষ্ঠী, সেই কৃষক এবং প্রান্তিক চাষি ও দিনমজুরেরা কীভাবে এবং কেন ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিল? আগেই উল্লেখ করা হয়েছে, ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে পূর্ববঙ্গের সাধারণ মানুষের আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক সংকট নানাভাবে কাজ করেছে। বাঙালিদের ওপর উর্দু ভাষা চাপিয়ে দেওয়ার প্রচেষ্টায় সমাজের উঁচুতলার মানুষের শিক্ষাদীক্ষা, অর্থনৈতিক ও রাজনৈতিক জীবনকে যতটা করে তারচেয়ে বেশি বিপর্যস্ত করে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জীবনকে। রাষ্ট্রীয় নানা সুযোগ-সুবিধার ক্ষেত্রে এমনিতেই তারা বঞ্চিত ছিল। তাতে মরার ওপর খাঁড়ার ঘা-এর মতো মাতৃভাষার পরিবর্তে আরেকটি ভাষা চাপিয়ে

দেওয়াতে তারা নিজেদের বিপন্ন মনে করেছে। আর সে কারণেই গ্রামের সাধারণ কৃষক-কিষানিরা ব্যাপক ও স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছে। বৃহত্তর জনগোষ্ঠীর এমন স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণ এর আগে আর কোনো আন্দোলনে লক্ষ করা যায়নি (উমর, ২০১৭ : ৩, পৃ. ৩৯২-৩৯৩)। শ্রমিকদের মতো কৃষকদের আন্দোলনে যুক্ত করতেও কমিউনিস্ট পার্টি ভূমিকা রাখে। পার্টির পক্ষ থেকে সার্কুলার জারি করে সাধারণ জনগণকে এই বলে সচেতন করা হয় যে, মজুর ও কৃষক শ্রেণিকে অশিক্ষার অন্ধকারে ডুবিয়ে রেখে শাসকগোষ্ঠী তাদের শোষণ-ব্যবস্থাকে টিকিয়ে রাখার মতলব করছে। তাই গ্রামাঞ্চলের কৃষকশ্রেণি যাতে আন্দোলনে এগিয়ে আসে সেজন্যে পার্টির পক্ষ থেকে বিশেষ উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি এবং তার পরবর্তী দিনগুলোতে গ্রামাঞ্চলের হাট-বাজারগুলোতে হরতাল পালন, জনসভা আয়োজন প্রভৃতির মাধ্যমে কৃষকদের আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার প্রয়াস চালানো হয় (উমর, ২০১৩ : ৩, পৃ. ৩১০)।

পাকিস্তান সরকার ডাকটিকেট, মনিঅর্ডার ফরম, স্ট্যাম্প, চাকরির পরীক্ষা প্রভৃতি থেকে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়ায় সাধারণ মানুষ আশাহত হয়। এটা যে তাদের ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হওয়ার পেছনে কাজ করেছিল, তা জানা যায় ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত কর্তৃক উত্থাপিত তাঁর ভাষাবিষয়ক সংশোধনী প্রস্তাবের ওপর প্রদত্ত আলোচনা থেকে। তিনি বলেছিলেন, পাকিস্তানের ৬ কোটি ৯০ লাখ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৮০ লাখ বাংলা ভাষায় কথা বলে। এই বাংলা ভাষাভাষী সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের বাস পূর্ববঙ্গে। সেই মানুষেরা যখন মনিঅর্ডার করতে ডাকঘরে যায়, তখন তাদের হাতে তুলে দেওয়া হয় উর্দু এবং ইংরেজিতে লিখিত ফরম। গ্রামের গরিব কৃষক সেই ফরমের সাহায্যে তার বিশ্ববিদ্যালয় পড়ুয়া সন্তানের কাছে টাকা পাঠাতে গিয়ে সমস্যায় পড়ছে। একইভাবে তারা জমি বিক্রি করতে গিয়ে যে স্ট্যাম্প ক্রয় করছে, তার ভাষাও ইংরেজি ও উর্দু। এমনকি, গণ-পরিষদের যে ভাষা তাতে লিখিত কার্যবিবরণীও তারা বুঝতে অক্ষম।[১৫] সাধারণ মানুষের এসব সমস্যার কথা তুলে ধরে তিনি ইংরেজি ও উর্দুর পাশাপাশি বাংলা ভাষাকে গণপরিষদের ভাষা এবং পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দেওয়ায় প্রান্তিক জনগোষ্ঠী কতটা বিপন্ন বোধ করেছে, তা জানা যায় পূর্ববঙ্গের প্রত্যন্ত অঞ্চলগুলোর ভাষা আন্দোলনের সংগঠকদের সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ থেকে। লালমণিরহাটের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক জহির উদ্দিন আহম্মদ বলেছেন:

> মিছিল ও জনসভায় হাজার হাজার লোক যোগ দিত। নারী, পুরুষ, বালক, শিশু, বৃদ্ধ সবাই আসত। নারীরা আসত এজন্য যে, আমরা তাদের বুঝিয়ে ছিলাম বাংলা ভাষা কেড়ে নেওয়া হচ্ছে, উর্দু ছাড়া কথা বলা যাবে না। সাধারণ মানুষ তো উর্দু জানত না। তারা মাতৃভাষা হারানোর ভয়ে দলে দলে আমাদের শোভাযাত্রা ও জনসভায় যোগ দিত (আহম্মদ, ২০২১, পৃ. ১১৪১)।

বহুমাত্রিক বঞ্চনার কারণে সাধারণ মানুষদের মধ্যে এমনিতেই ক্ষোভ ছিল, ২১শে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ড তাদের সে ক্ষোভকে দাবানলের মতো ছড়িয়ে দেয় সর্বত্র। শহিদের আত্মত্যাগ ভাষা আন্দোলনকে এমন পবিত্র মহিমায় মহিমান্বিত করে যে, দেশের আপামর জনসাধারণ শাসকের রক্ষচক্ষুকে উপেক্ষা করে আন্দোলনে যুক্ত হতে দ্বিধা করেনি। একুশে ফেব্রুয়ারির পর এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে দেশের আনাচে-কানাচে, গ্রাম-গ্রামান্তরের সুদূরতম প্রান্তে। শহীদের রক্ত যেন ডাক দিল প্রদেশের কিষাণের শক্তিকে, মধ্যবিত্তের শক্তিকে – এক কথায় দেশের প্রতিটি দেশপ্রেমিক মানুষকে (রহমান, ২০১৬, পৃ. ১১-১২)। এক কথায়, ঐ সময় ভাষা আন্দোলন ব্যাপক গণভিত্তি লাভ করেছিল এবং তা পূর্ববঙ্গের মানুষকে ঐক্যবদ্ধ করে তাদের গণতান্ত্রিক চেতনার বিস্তার ঘটিয়েছিল (মতিন ও রফিক, ২০০৫, পৃ. ১২৭)। স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা তো ছিলই;

তাদের সঙ্গে দলে দলে যোগ দিয়েছিল গ্রামের সর্বস্তরের মানুষ– কৃষক, শ্রমিক, নারী, শিশু। সমস্ত পূর্ববঙ্গই হয়ে উঠেছিল প্রতিবাদ-বিক্ষোভে উত্তাল। তখনকার পত্র-পত্রিকায় রয়েছে এর বিস্তারিত বিবরণ।[১৬] লেখক-গবেষকদের অনুসন্ধান এবং পর্যালোচনায়ও উঠে এসেছে সে-চিত্র। হাসান আজিজুল হক লিখেছেন:

> যে অসম্ভব দ্রুততার সঙ্গে ২১ ফেব্রুয়ারির ঢাকার সংবাদ বাংলাদেশের গ্রাম-গ্রামান্তরে ছড়িয়ে পড়ে এবং প্রতিবাদ, বিক্ষোভ ও আক্রোশের আগুন গোটা দেশকে তাতিয়ে তোলে– তা অকল্পনীয়। সমগ্র দেশ যেন জ্বলন্ত বারুদের কারখানায় রূপান্তরিত হয়ে যায়। ... সমগ্র বাংলাদেশ ক্রোধে ক্ষোভে টগবগ করে ফুটতে থাকে। অসংখ্য শোভাযাত্রা, প্রতিবাদসভা অনুষ্ঠিত হতে থাকে – গ্রামে-গঞ্জে, শহরে শহরে, মহকুমা মহকুমা, জেলায় জেলায়। ক্রুদ্ধ মিছিলের ঢল নামে রাস্তায় (হক, ১৯৮৪, পৃ. ১৬-২০)।

ভাষার দাবি রুখতে গিয়ে পুলিশ ছাত্র-জনতার বুকে গুলি চালালে, তা পূর্ববঙ্গের মানুষকে শোকার্ত, আবেগী এবং প্রতিবাদী করে তোলে। সকল ভয় উপেক্ষা করে তারা রাজপথে নেমে আসে। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'নূরুল আমীনের কল্লা চাই', 'পুলিশি জুলুম চলবে না'– এসব স্লোগানে চারদিক মুখরিত হয়। দেয়ালে দেয়ালে প্রতিবাদী পোস্টার ছেয়ে যায়। মাইক এবং চুঙোয় দেওয়া হয় জ্বালাময়ী বক্তৃতা। সড়ক অবরোধ, মুসলিম লীগ নেতাদের বাসভবনে হামলা, রেল-চলাচল বন্ধসহ অফিস-আদালত, কল-কারখানা, ব্যবসায়ী প্রতিষ্ঠান সব বন্ধ করে দেওয়া হয়। হাজার হাজার কৃষক মাঠের কাজ ফেলে যোগ দেয় মিছিল-সমাবেশে। হাট-বাজারের বেচা-কেনা পর্যন্ত বন্ধ রাখে। এমন প্রতিবাদে বাঙালি এর আগে আর কখনোই রুখে ওঠেনি। টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া সর্বত্রই প্রতিবাদ ও বিক্ষোভের তথ্য পাওয়া যায়। সুদূর চট্টগ্রামের রাউজানের কোয়েপাড়া ও আশাপাশের গ্রামের কৃষক-জনতা যেন একুশের ডাকের জন্য প্রস্তুত হয়ে ছিল। তারা হাটে-বাজারে, পাড়ায় পাড়ায় মিছিল বের করে।[১৭] নেত্রকোণার কৃষকরা হাট বাদ দিয়ে হরতাল পালন করে। ঢাকায় ছাত্র-জনতার শহিদ হওয়ার খবর শুনে হাটে আসা অনেক কৃষক শোকে-বেদনায় কান্না শুরু করে। আঞ্চলিক ভাষায় তারা নানা ক্ষোভ প্রকাশ করে।[১৮]

কৃষকদের পাশাপাশি প্রত্যন্ত পল্লির দিনমজুরেরাও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিল। তারা মিছিল-সমাবেশে যোগ দিয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদ করে। দিন হাজিরার কাজ বাদ দিয়ে ক্ষুধাপীড়িত এই মানুষেরা হরতাল পালন করে। এমন দৃশ্য দেখা যায় খুলনার মোরেলগঞ্জ থেকে আট/দশ কিলোমিটার দূরের কাঁটাখালি গ্রামে। সেখানে দুর্ভিক্ষের পর টেস্ট রিলিফের কাজ চলছিল। তাতে প্রতিদিন পাঁচ আনা হাজিরায় কাজ করছিল পঞ্চাশজন দিনমজুর। ২২শে ফেব্রুয়ারি তারা কেউ কাজে যোগ দেয়নি। ঢাকায় ছাত্রহত্যার খবর শুনে তারা হরতাল পালন করে।[১৯] ভাষা আন্দোলন কতটা জনভিত্তি লাভ করেছিল, অভাব-অনটনে জর্জরিত দিনমজুরদের কাজ বাদ দিয়ে হরতাল পালন তার বাস্তব দৃষ্টান্ত। পূর্ববঙ্গের প্রান্তিক মানুষেরা সেদিন বুঝেছিল যে, ক্ষুণ্নিবৃত্তির চেয়ে ভাষার অধিকার তথা আত্মপরিচয় নিয়ে বেঁচে থাকা অনেক মর্যাদার।

ভাষা আন্দোলনে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ও যৌনপল্লির নারীদের অবদান

ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হওয়ার কারণে অনেক প্রান্তিক মানুষ গ্রেপ্তার, হয়রানি ও পুলিশি জুলুমের শিকার হয়েছিলেন। যশোরে শত শত নিরীহ মানুষকে গ্রেপ্তার ও কারাগারে আটক রাখা হয়। ময়মনসিংহের পাহাড়ি অঞ্চলের সাধারণ মানুষকে পুলিশ ব্যাপক নির্যাতন করে। ২১শে ফেব্রুয়ারির পর এখানকার শহর থেকে

গ্রাম– সর্বত্র হরতাল পালিত হয়। হালুয়াঘাট, কলসিন্দুর, দুর্গাপুর প্রভৃতি প্রত্যন্ত পল্লিতে মিছিল ও প্রতিবাদ-সমাবেশ আয়োজন করা হয়। আন্দোলন দমনে পুলিশ গ্রামে গ্রামে হানা দেয়। দুর্গাপুর-হালুয়াঘাটা থানার সীমান্তবর্তী গ্রাম নোয়াপাড়া, ভাইয়াপাড়া ও রায়পুরের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী পল্লির বাড়ি বাড়ি তল্লাশী চালিয়ে গ্রেপ্তার করা হয় দেবেন মাস্টার, বিজয় সাংমা ও ধীরেন সাংমাকে। দেবেন সাংমার যুবতী কন্যা তারামণিকে পুলিশ ক্যাম্পে নিয়ে লাঞ্ছিত করা হয়।[২০] পটুয়াখালীর কালাপাড়ার রাখাইন যুবক উ সুয়ে হাওলাদার বরিশাল ব্যাপ্টিস্ট মিশন হাইস্কুলে অধ্যয়নকালে বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। এ কারণে তিনি ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করতে পারেননি (হাওলাদার, ২০২১, পৃ. ৮৬৩)।

ভাষা আন্দোলনে প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর অংশগ্রহণে বিশেষ মাত্রা যুক্ত হয় যশোর ও বগুড়ার যৌনপল্লির নারীদের সম্পৃক্ততায়। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে যশোরে সর্বাত্মক ধর্মঘট পালনকালে পুলিশি জুলুম চরম মাত্রায় পৌঁছে। পুলিশ ছাত্রদের ঘিরে লাঠিপেটা শুরু করলে শহরের ঝালাই পট্টির যৌনপল্লির নারীরা প্রায় চল্লিশজন ছাত্রকে একটি ঘরে লুকিয়ে তালাবদ্ধ করে রাখে। এতে তারা পুলিশের নির্যাতন ও গ্রেপ্তারের হাত থেকে রেহাই পায় (হাননান, ২০০৬, পৃ. ৯৮)। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতালে ছাত্র-ছাত্রী, বুদ্ধিজীবী, বিড়িশ্রমিক– এমনকি বগুড়ার সর্বস্তরের মানুষদের সঙ্গে মিছিলে শামিল হয়েছিল সেখানকার যৌনপল্লির নারীরাও। তারা চাঁদা তুলে ভাষা আন্দোলনের তহবিলে প্রদান করে।[২১] কেবল যৌনপল্লির নারীরাই নয়, ঢাকাসহ পূর্ববঙ্গের বিভিন্ন অঞ্চলের সাধারণ নারীরাও দলে দলে ভাষা আন্দোলনে যুক্ত হয়েছিল।[২২] কাজেই ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্রবাদী দৃষ্টিভঙ্গিতে দীর্ঘকাল যেভাবে কিছুসংখ্যক ছাত্র ও বুদ্ধিজীবীর আন্দোলন বলে অভিহিত করা হয়েছে, তা গ্রহণ করা যায় না; কারণ এ আন্দোলনে পূর্ববঙ্গের কৃষক, শ্রমিক ও সাধারণ মেহনতি জনগণের ভূমিকা অতি গুরুত্বপূর্ণ।[২৩]

ভাষা আন্দোলন: প্রান্তিক জনগোষ্ঠীর জাগরণ ও অর্জন

মানবসভ্যতার অগ্রযাত্রার পেছনে সবচেয়ে বেশি অবদান রেখেছে সাধারণ মানুষ। তাদের শ্রমে ও ঘামে গড়ে উঠেছে সভ্যতার পর সভ্যতা, নগর-বন্দর-জনপদ। কিন্তু এ মানুষগুলো সবসময় থেকেছে বঞ্চিত। সেই বঞ্চনা থেকে জমেছে ক্ষোভ, ক্ষোভ থেকে এসেছে প্রতিবাদ-প্রতিরোধ। ভাষা আন্দোলনেও সে চিত্র পরিদৃষ্ট হয়। এক অর্থে, এ আন্দোলনে সবচেয়ে বেশি ত্যাগ শিকার করেছে নিম্নবর্গের মানুষ। ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি যাঁরা শহিদ হয়েছিলেন; সেই সালাম, বরকত, রফিক, জব্বার, শফিউর, অহিউল্লাহ, আউয়ালের যে পারিবারিক পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় সকলেই ছিলেন নিম্নবর্গের মানুষ।[২৪] জেল-জুলুম-নির্যাতনের শিকার হওয়াদের মধ্যেও এ শ্রেণির মানুষের সংখ্যাই ছিল বেশি। ভাষা আন্দোলনে নিম্নবর্গের মানুষের অংশগ্রহণ স্বতঃস্ফূর্ত হলেও তাদের সংগঠিত করতে বিভিন্ন সংগঠন অবদান রেখেছে। কমিউনিস্ট পার্টি বিভিন্ন অঞ্চলে কৃষক ও শ্রমিকদের অধিকার-সচেতন করে তুলেছিল। তেভাগা আন্দোলন, নানকার বিদ্রোহ, হাজং বিদ্রোহ প্রভৃতির মূলে ছিল কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীদের সাংগঠনিক প্রয়াস। রেলশ্রমিক, রিকশাশ্রমিক, বস্ত্রশিল্পের শ্রমিকদের অধিকার আদায়ের প্রশ্নে তারা কাজ করেছে। এছাড়া পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগ, পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ, পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ, তমদ্দুন মজলিস প্রভৃতি সংগঠন ছাত্র, তরুণ ও সাধারণ মানুষকে মুসলিম লীগের দুঃশাসনের বিরুদ্ধে জাগ্রত করে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছে। জেলায় জেলায় গঠিত 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নেতৃবৃন্দ লিফলেট বিতরণ, পাড়া-মহল্লা-হাট-বাজারে গণসংযোগ এবং সভা-সমাবেশ ও মিছিলের

আয়োজন করে বৃহত্তর জনগোষ্ঠীকে আন্দোলনে শামিল হতে সহায়তা করে। সবকিছুর ওপরে ছিল পাকিস্তানি দুঃশাসন। এতে সকল প্রকার মৌলিক অধিকার বঞ্চিত নিম্নবর্গের মানুষ ক্ষুব্ধ ছিল। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তারা জেগে ওঠে এবং ঐক্যবদ্ধ হয়ে পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে রাজপথে নেমে আসে।

নিম্নবর্গ তথা সাধারণ মানুষের ভাষা আন্দোলনে এই স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের ফল ছিল সুদূরপ্রসারী। এর ফলে তাদের মধ্যে যে জাগরণ ও ঐক্য গড়ে ওঠে, তার প্রতিফলন লক্ষ করা যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। এ নির্বাচনে তারা ব্যালটের মাধ্যমে মুসলিম লীগকে জানিয়ে দেয় তাদের প্রতিবাদী রায়। শুধু তাই নয়, ভাষা আন্দোলন তাদের চেতনায় পাকিস্তানি ভাবধারার বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তা বোধের উন্মেষ ঘটায়। সে বোধ ধাপে ধাপে স্বাধিকার সংগ্রামের জন্ম দেয় এবং তা থেকে নিম্নবর্গের মানুষের মধ্যে গড়ে ওঠা ইস্পাত-কঠিন ঐক্য থেকে আসে সত্তরের নির্বাচনের নিরঙ্কুশ বিজয়; এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে রক্তক্ষয়ী মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে অর্জিত হয় স্বাধীন-সার্বভৌম বাংলাদেশ।

টীকা

১. 'প্রান্তিক' শব্দের অর্থ– প্রান্তবর্তী, কেন্দ্রীয় নয়, আশপাশের, সামান্য প্রভৃতি। – আহমদ, শরীফ সম্পা. (২০১৭)। *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। দ্বাদশ মুদ্রণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমি। পৃ. ৩৭১

২. 'নিম্নবর্গ' শব্দটি এসেছে ইংরেজি 'Subaltern' থেকে। সাবঅল্টার্ন সামরিক শব্দ। অধস্তন মর্যাদার সৈন্য বা মর্যাদায় অধস্তন কাউকে বোঝাতে শব্দটি ব্যবহার করা হয়। অন্তোনিও গ্রামসি এ শব্দটি ব্যবহার করে সোভিয়েত ইউনিয়নের সেই শ্রেণির মানুষদের বুঝিয়েছিলেন, যারা শাসকশ্রেণির আধিপত্যের অংশ ছিল। কৃষক, শ্রমিক এবং ক্ষমতার বাইরে থাকা বঞ্চিত মানুষেরা এ শ্রেণির অন্তর্গত। ভারতবর্ষে উপনিবেশবাদী, সাম্রাজ্যবাদী ও জাতীয়তাবাদী ইতিহাসতত্ত্বের বিপরীতে নিম্নবর্গের ইতিহাসচর্চার গোড়াপত্তন করেন রণজিৎ গুহ। তিনি নিম্নবর্গ বলতে সমস্ত জনসংখ্যা থেকে উচ্চবর্গের অন্তর্গতদের বাদ দিয়ে অবশিষ্টদের বুঝিয়েছেন। তাঁর মতে, 'শহরের শ্রমিক ও গরিব, সর্বোচ্চপদের আমলাদের বাদ দিয়ে মধ্যবিত্তের বাকি অংশ, গ্রামের ক্ষেতমজুর গরিব চাষী ও প্রায়-গরিব মাঝারি চাষী ও নিম্নবর্গের মধ্যেও গণ্য।'–গুহ, রণজিৎ (১৯৮১)। *নিম্নবর্গের ইতিহাস*। *এক্ষণ*। কলকাতা। পৃ. ১৬

৩. 'বাঙ্গালীর বিধাতা চির-বিদ্রোহীর শোণিতের তিলক তাহার কপালে লিখিয়া দিয়াছেন।' – সেন, দীনেশচন্দ্র (২০০৬)। *বৃহৎ বঙ্গ*। প্রথম খণ্ড। তৃতীয় মুদ্রণ। কলকাতা: দে'জ পাবলিশিং। বাংলার সাধারণ মানুষের এই বিদ্রোহের ইতিহাস লিপিবদ্ধ হয়েছে সুপ্রকাশ রায়ের *ভারতের কৃষক-বিদ্রোহ ও গণতান্ত্রিক সংগ্রাম*, প্রমোদ সেনগুপ্তের *নীল বিদ্রোহ ও বাঙালী সমাজ*, সত্যেন সেনের *বিদ্রোহী কৈবর্ত*, মুনতাসীর মামুনের *বিদ্রোহী বাঙালি*, হোসেন উদ্দীন হোসেনের *বাঙলার বিদ্রোহ* প্রভৃতি গ্রন্থে।

৪. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: সেন, সরলানন্দ (১৯৭১)। 'কেন্দ্রীয় বাজেটে পূর্ববঙ্গ'। *ঢাকার চিঠি*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: মুক্তধারা। পৃ. ৬১-৬২

৫. 'সম্প্রতি সমগ্র জগন্নাথপুর থানা এবং সুনামগঞ্জ ও ছাতক থানার কয়েকটি সার্কেলে ভীষণ দুর্ভিক্ষ দেখা দিয়েছে। এই বৎসর আমন ফসল সমূলে বিনষ্ট হওয়ায় এই ভয়াবহ অবস্থার উদ্ভব হইয়াছে। প্রায় এক লক্ষ

লোক অন্নাভাবে করাল মৃত্যুর সম্মুখীন হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে কলেরা ও গো মোড়ক দেখা দিয়েছে। লোকের দুরবস্থার কথা ভাষায় বর্ণনা করা দুঃসাধ্য।' – *সাপ্তাহিক নও-বেলাল*, ১১ই মার্চ ১৯৪৮

৬. *দৈনিক আজাদ*, ২৩শে এপ্রিল ১৯৩৭।

৭. 'সকলেই জানেন দেশ বিভাগের পর পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কি হইবে তাহা লইয়া মাথা ঘামাইবার মত লোক খুব কমই ছিল। শুধু তাহাই নয়, তখন অনেকে প্রকাশ্য ও অপ্রকাশ্যভাবে উর্দুরই সমর্থক ছিল।'– কাশেম, আবুল (১৯৮০)। 'স্মৃতিচারণ'। *একুশের সংকলন'৮০*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি। পৃ. ১

৮. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার সম্পাদিত (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি; রফিক, আহমদ (২০১৯)। *ভাষা আন্দোলন: টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন; আলীম, এম আবদুল (২০২১)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জেলাভিত্তিক ইতিহাস*। আগামী প্রকাশনী।

৯. *দৈনিক আজাদ*, ৭ই মার্চ ১৯৪৮।

১০. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ১৫ই মার্চ ১৯৪৮।

১১. *দৈনিক আজাদ*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১২. *দৈনিক আজাদ*, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১৩. *আনন্দবাজার পত্রিকা*, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

১৪. *দৈনিক আজাদ*, ২রা মার্চ ১৯৫২।

১৫. দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ (২০১১)। গণপরিষদের অধিবেশনে বাংলা ভাষাকে অন্তর্ভুক্তকরণের প্রশ্নে বিতর্ক, পাকিস্তান গণপরিষদ, ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধ: দলিলপত্র*। প্রথম খণ্ড। তথ্য মন্ত্রণালয়, গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার। ঢাকা। পৃ. ৫৪-৫৫

১৬. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ১৫ই মার্চ-এর *দৈনিক আজাদ*, *আনন্দবাজার পত্রিকা*, *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, *সাপ্তাহিক নও-বেলাল*, *সাপ্তাহিক সৈনিক*, *সাপ্তাহিক যুগান্তর* প্রভৃতি পত্রিকা।

১৭. ''ঢাকার রাজপথে যেদিন একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনার অবতারণা হয়, সেদিন আমি ছিলাম রাউজান থানার কোয়েপাড়া গ্রামে।... রেডিওতে রাষ্ট্রভাষা সমাবেশের ওপর মুসলিম লীগ সরকারের গুলিবর্ষণে ছাত্র হত্যার খবর পাই। এ অবস্থায় স্থানীয় পার্টি কমিটির সাথে আলোচনা করে আমরা রাষ্ট্রভাষার সমর্থন ও ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে হাট-বাজারে হরতাল, রাতে পাড়ায় পাড়ায় মিছিল, স্কুল ও কলেজে ধর্মঘট ইত্যাদি সংগঠিত করি।... এতদিন রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সীমাবদ্ধ ছিল রাজধানী, জেলা শহর ও বন্দরে। এবার সে আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ল গ্রামাঞ্চলে। জনগণের সাড়া মিলল অভাবনীয়। মনে হলো যেন একুশের ডাকের জন্য কৃষক-জনতা প্রস্তুত হয়ে ছিল অনেক আগে থেকে।'' – দস্তিদার, শরদিন্দু (২০১৯)। *জীবনস্মৃতি*। অখণ্ড পূর্ণাঙ্গ সংস্করণ। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ। পৃ. ১২৪-১২৫

১৮. ''আমরা আমরার পুলাপানরে শহরে পাঠাই লেখাপড়া শিখনের লাই আর সেখানে গিয়া গুলি খাইয়া মরব এই অবস্থা যদি চলে তাইলে শুনতেছি তারা নাকি ভোট চাইতে আসব। ভোট নাকি অব, তাই ভোট চাইতে গেলে ভোটের বদলে ঝাড়া মারা লাগবো। আজকে আপনারা হাটে-বাজারে যাবেন না। আইজের জন্য আমরা হরতাল করলাম।'' – সরকার, যতীন (২০১৫)। 'ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে উপেক্ষিত মফস্বল'। *দৈনিক যুগান্তর*। ঢাকা। ৫ই ফেব্রুয়ারি।

১৯. প্রান্তিক মানুষদের এমন প্রতিবাদের খবর পাওয়া যায় ঐ সময় খুলনার মোরেলগঞ্জে নিয়োজিত টেস্ট রিলিফ অফিসার কিউ. কিউ. এম. জহুরের স্মৃতিচারণ থেকে। তিনি লিখেছেন: ''আমি তখন চাকরী করি খুলনায়, মোরেলগঞ্জে। টেস্ট রিলিফের চার্জে ছিলাম, সাব ডেপুটি কালেক্টর। ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত্রে ৮টার সময় খবর পেলাম, কলকাতা রেডিওতে। ঢাকায় গুলিতে তিন জনের মৃত্যুর খবর বললো। পরের দিন। মোরেলগঞ্জ একটা থানা হেড কোয়ার্টার। সেখান থেকে ৮/১০ মাইল দূরে কাঁটাখালিতে, একেবারে গণ্ডগ্রাম, রিলিফের কাজ হচ্ছিলো। সেখানে কাজ করতে গেলাম। দৈনিক ৫ আনা মজুরীতে কাজ হতো। ৫০ জনের মতো। দুর্ভিক্ষের পর সাহায্যের জন্য কাজ। সেদিন কেউ নেই কাজে। খুঁজে কয়েকজনকে বের করলাম। জিজ্ঞেস করায় তারা বললো, হরতাল করছি। ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি চলা ও ছাত্র মারা যাওয়ার ফলে।'' – উদ্ধৃত, উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*। দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: বাংলা একাডেমি। পৃ. ৩৬৫।

২০. *সাপ্তাহিক মতামত*। ১৯৫২, ৫ই এপ্রিল।

২১. ''... তৎকালীন মুসলিম লীগ বগুড়ায় একুশে ফেব্রুয়ারির হরতাল না মেনে নিলেও বগুড়ার ছাত্র, বুদ্ধিজীবী, ব্যবসায়ী, বিড়ি শ্রমিক, পতিতারা রাস্তায় নেমে আসে এবং একুশে ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় কোনো দোকান, ব্যবসা প্রতিষ্ঠান, অফিস-আদালত না খোলায় হরতাল পালন হয়। এই হরতালে বগুড়ার আশপাশের কৃষকরা হাল নিয়ে মাঠে যায়নি। আন্দোলনকারীদের অনেকেই ঘর ছেড়ে আত্মগোপন করেন। ... স্থানীয় পতিতারা চাঁদা তুলে সহযোগিতা করেছেন এবং আন্দোলনের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করেছিলেন। বিড়ি শ্রমিকদের একটা অংশ যোগ দেওয়ার পরে সর্বস্তরের শ্রমিকরা রাস্তায় নেমে পড়লে বগুড়ায় আন্দোলন ফুঁসে ওঠে।'' – কবীর, আমানুল্লাহ ও ইসলাম, ফাইজুল সম্পা. (২০১১)। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। সপ্তম প্রকাশ। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স। পৃ. ১০৬

২২. বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৪)। *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*। বাংলা একাডেমি। ঢাকা; রফিক, আহমদ (২০১৯)। *ভাষা আন্দোলন: টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

২৩. উমর, বদরুদ্দীন (২০১৯)। *বাঙলাদেশে ইতিহাস চর্চা*। তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: কথাপ্রকাশ। পৃ. ১০৪

২৪. বিভিন্ন সূত্রে ভাষা আন্দোলরনর শহীদদের যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাতে দেখা যায় – শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদের পিতা আবদুল লতিফ ছিলেন ঢাকার বাতামতলীর প্রিন্টিং প্রেসের মালিক। তার আর্থিক অবস্থা খুব ভালো ছিল না। রফিক ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ইন্টারমিডিয়েট শ্রেণিতে পড়ালেখার পাশাপাশি পিতার ব্যবসায়ে সহযোগিতা করতেন। শহীদ শফিউর রহমান ছিলেন ঢাকা হাইকোর্টের হিসাবরক্ষণ শাখার কেরানি, পাশাপাশি বি. এ. শ্রেণিতে পড়তেন। আবদুস সালাম অষ্টম শ্রেণি পর্যন্ত পড়ালেখা করেন। তিনি পূর্ব পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টরেট অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগে পিয়ন পদে চাকুরি করতেন। আবদুল জব্বার

পরিবারের দারিদ্র্যের কারণে পঞ্চম শ্রেণি পর্যন্ত লেখাপড়া করে আর পড়তে পারেনি। প্রথম দিকে পিতাকে কৃষিকাজে সহযোগিতা করলেও পরে বার্মা গিয়ে জাহাজঘাটে চাকুরি নেন। এরপর গ্রামে ফিরে এসে ন্যাশনাল গার্ড বাহিনীতে যোগ দেন এবং ছোট-খাটো ব্যবসায় করে জীবিকানির্বাহ করেন। ভাষাশহীদ আওয়াল ছিলেন রিকশাচালক। কিশোর অহিউল্লাহর পিতা ছিলেন রাজমিস্ত্রী। বিস্তারিত দ্রষ্টব্য: খান, শামসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.) *ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা*। দ্বিতীয় পুনর্মুদ্রণ, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, ২০১৫; উমর, বদরুদ্দীন (২০১৭), *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, তৃতীয় খণ্ড, ঢাকা: সুবর্ণ সংস্করণ; আল্‌হেলাল, বশীর (২০০৩) *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*, দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান (২০১৮)। *স্মরণ ও বরণ*। ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমী।

আল্‌হেলাল, বশীর (২০০৩)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আলীম, এম আবদুল (২০১৮)। *সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আলীম, এম আবদুল (২০১৮)। *পাবনায় ভাষা আন্দোলন*। পরিবর্ধিত ও পরিমার্জিত সংস্করণ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আলীম, এম আবদুল (২০২১)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জেলাভিত্তিক ইতিহাস*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আহ্‌মদ, কামরুদ্দীন (২০১৪)। *পূর্ববাংলার সমাজ ও রাজনীতি*। দ্বিতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

আহম্মদ, জহির উদ্দিন (২০২১)। 'সাক্ষাৎকার: ১২ই এপ্রিল ২০২০'। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জেলাভিত্তিক ইতিহাস*। এম আবদুল আলীম [সম্পা.]। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১৩)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: প্রথম সুবর্ণ প্রকাশ।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১৭: ১)। *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ঢাকা: সুবর্ণ সংস্করণ।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১৭: ৩)। *পূর্ববাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ঢাকা: সুবর্ণ সংস্করণ।

কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৪)। *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চক্রবর্ত্তী, রতন লাল (২০১১)। 'ভাষা আন্দোলন : আঞ্চলিক ইতিহাস', *ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*। দ্বিতীয় মুদ্রণ। আহমদ রফিক ও বিশ্বজিৎ ঘোষ [সম্পা.]। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (২০০৮)। 'একুশের প্রশ্ন, আমনরা কে কোন পক্ষে', *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ড. মোহাম্মদ হারুন রশীদ [সম্পা.]। ঢাকা: সূচীপত্র।

মতিন, আবদুল (২০০৩)। *জীবনপথের বাঁকে বাঁকে*। ঢাকা: সাহিত্যিকী।

মতিন, আবদুল ও রফিক, আহমদ (২০০৫)। *ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও তাৎপর্য*। তৃতীয় সংস্করণ। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

রহমান, আতিউর সম্পা. (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের আর্থ-সমাজিক পটভূমি*। দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

রহমান, শামসুর (১৯৮৬)। 'যশোরে ভাষা আন্দোলন', *বিচিত্রা*। বর্ষ ১৪, সংখ্যা ৩৯। একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা, ঢাকা।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১৭)। *কারাগারের রোজনামচা*। পঞ্চম মুদ্রণ। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রহমান, হাসান হাফিজুর সম্পা. (২০১৬)। 'একুশে ফেব্রুয়ারী', *একুশে ফেব্রুয়ারী*। বিশেষ মুদ্রণ। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

শরিফ, আহমদ সম্পা. (২০১৭)। *বাংলা একাডেমি সংক্ষিপ্ত বাংলা অভিধান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

শামীম, ইমতিয়ার (২০১৭)। *রক্তে জেগে ওঠে: মুক্তিযুদ্ধের আঞ্চলিক ইতিহাস সিরাজগঞ্জ*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

সেন, সরলানন্দ (১৯৭১)। *ঢাকার চিঠি*। প্রথম খণ্ড। কলকাতা: মুক্তধারা।

হক, হাসান আজিজুল (১৯৮৪)। 'বায়ান্নোর একুশ: ঢাকার বাইরে'। *একুশের প্রবন্ধ ১৯৮৪*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হাওলাদার, উ সুয়ে (২০২১)। 'সাক্ষাৎকার : ১৫ই সেপ্টেম্বর ২০১৪', *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন: জেলাভিত্তিক ইতিহাস*। এম আবদুল আলীম [সম্পা.]। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

হাননান, ড. মোহাম্মদ (২০০৬)। *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস ১৮৩০ থেকে ১৯৭১*। তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার সম্পা. (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হোসেন, আশফাক (২০১৪)। *বাংলাদেশের ইতিহাসের রূপরেখা*। তৃতীয় প্রকাশ। ঢাকা: জে. কে. প্রেস অ্যান্ড পাবলিকেশন্স।

সাক্ষাৎকার

ভূঁইয়া, নাসির উদ্দিন (২০১৯)। 'সাক্ষাৎকার: ২২শে ফেব্রুয়ারি'। *ঢাকা টাইমস*, ঢাকা।

ভাষার লড়াইয়ে নারীঃ কেন্দ্র থেকে প্রান্ত

শান্তা পত্রনবীশ

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookShanta

ভূমিকা

ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকেই এ আন্দোলনের সাথে নারীসমাজের সম্পৃক্ততা ছিল। ১৯৪৭ সালের জুলাই থেকেই বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় এবং বিবৃতিতে উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বক্তব্য উপস্থাপন করার প্রেক্ষাপটে এদেশের বহু নারী প্রতিবাদমুখর হয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে বক্তব্য উপস্থাপন করতে থাকেন (হেলাল, ১৯৮৪)। যশোর মাইকেল মধুসূদন কলেজের ছাত্রী ও ছাত্র ফেডারেশন কর্মী হামিদা রহমান কলকাতা থেকে প্রকাশিত কমিউনিস্ট পার্টির মুখপত্র *স্বাধীনতা* পত্রিকায় ১০ জুলাই 'পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক একটি পত্রে বাংলা ভাষার বিরোধিতাকারীদের প্রচেষ্টার প্রতিবাদ জানান (হান্নান, ১৯৮৬)। এর কিছুদিন পরই ১৯৪৭ সালের ১ সেপ্টেম্বর ঢাকায় প্রতিষ্ঠিত হয় তমদ্দুন মজলিশ। পরবর্তীসময়ে ২রা সেপ্টেম্বর সিলেটে বাংলা ভাষার সমর্থকরা প্রথমে যে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করে, সেখানেও নারীর সক্রিয় উপস্থিতি ছিল। এই পরিষদের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন জোবেদা খাতুন, হাজেরা মাহমুদ প্রমুখ (পারভিন, ২০০৭)। সেই সময় সারাদেশেই রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে বহু আলোচনা, সভা-সমিতি, তর্ক-বিতর্ক হচ্ছিল এবং নারীরাও তাতে অংশগ্রহণ করেছিলেন। ৫ই অক্টোবর *আজাদ* পত্রিকার মহিলা মাহফিলে আয়েশা বেগমের 'ভাষা সমস্যা' শিরোনামে আলোচনা প্রকাশিত হয়। পরবর্তীসময়ে ১৩ই নভেম্বর তমদ্দুন মজলিশের উদ্যোগে রাষ্ট্রভাষারূপে বাংলা প্রচলন করার সমর্থনে আয়োজিত সভায়ও নারীর অংশগ্রহণ ছিল। প্রাথমিক পর্যায়ে ভাষা আন্দোলন পত্রিকাতে বিবৃতি, আলাপ-আলোচনা ও সভা-সমিতির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকলেও ১৯৪৮ সালে এতে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। এক্ষেত্রে সিলেটের নারীরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ১১ই জানুয়ারি পাকিস্তানের যোগাযোগ মন্ত্রী আব্দুর রব নিশতার সিলেট সফরে যান। সেখানকার নারীদের একটি প্রতিনিধিদল তার সাথে দেখা করে বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান। একই বছর ২২শে ফেব্রুয়ারি সিলেট মহিলা মুসলিম লীগের জেলা কমিটির সভানেত্রী বেগম জোবেদা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা শাহের বানু, সৈয়দা লুৎফুন্নেসা খাতুন, সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন, সিলেট রাজকীয় বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষিকা রাবেয়া খাতুন, জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, সামসী কাইসার রশীদ, নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন, মাহমুদা খাতুন, শামসুন্নেসা খাতুন ও অন্যান্য বিশিষ্টজন (নারী) পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের কাছে প্রেরিত এক স্মারকলিপিতে বাংলা ভাষাকে পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানান (পারভিন, ২০০৭)। এ ধরনের উদ্যোগ নেওয়ার জন্য জোবেদা খাতুনের বিরুদ্ধে সিলেটের দৈনিক *ইস্টার্ন হেরাল্ড* পত্রিকা বিরূপ মন্তব্য করে। এর প্রতিবাদ জানিয়ে সৈয়দা নজিবুন্নেসা খাতুন বলেন:

> যাহারা পূর্ব পাকিস্তানের বাংলা ভাষাভাষী হইয়া মাতৃভাষার বিরুদ্ধাচরণ করেন তাহারা মাতৃভাষার বিশ্বাসঘাতক কু-পুত্র তুল্য। অনেকে আবার না বুঝিয়া ধর্মের দোহাই শুনিয়া উর্দুর সমর্থন করেন।...আমাদের বক্তব্য ছিল যে, উর্দু ভাষাভাষী অধিকসংখ্যক শিক্ষয়িত্রী নিযুক্ত করিয়া পর্দানশীল

> মহিলাদের শিক্ষা ব্যবস্থা অসম্ভব। ফলে অল্পশিক্ষিতা নারী জাতি অশিক্ষিতা হইয়া যাইবেন এবং স্বামী-পুত্রের সহযোগিতা করিতে পারিবেন না (বেগম, ১৯৮৯, পৃ. ১৩১)।

তাদের স্মারকলিপির পরিপ্রেক্ষিতে তমদ্দুন মজলিশের সম্পাদক আবুল কাশেম মহিলা লীগের সভানেত্রী জোবেদা খাতুনের কাছে অভিনন্দনপত্র প্রেরণ করেন। পত্রে লিখেছিলেন, 'আজ সত্যি আমরা অভূতপূর্ব আনন্দ এবং অশেষ গৌরব অনুভব করছি, সিলেটের পুরুষরা যা পারেনি আপনারা (মহিলারা) তা করেছেন' (মোহাম্মদ, ১৯৯৪, পৃ. ২৬)।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব-বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু এবং ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহারের প্রস্তাব উত্থাপন করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি এই প্রস্তাব বিষয়ে আলোচনার সময় গণপরিষদে তুমুল বিতর্কের সৃষ্টি হয় এবং অনেকেই এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করেন। পূর্ব-পাকিস্তান থেকে নির্বাচিত সদস্য খাজা নাজিমউদ্দীন ছিলেন এই বিরোধিতার শীর্ষে। নাজিমউদ্দীনের সক্রিয় সমর্থনে এই বিলটিকে পাকিস্তানের অধিবাসীদের মধ্যে বিরোধ সৃষ্টি করা এবং একটি সাধারণ ভাষার মাধ্যমে ঐক্য স্থাপনের প্রচেষ্টা থেকে মুসলমানদের বিচ্ছিন্ন করার চেষ্টা আখ্যায়িত করে প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এর তীব্র বিরোধিতা করেন এবং বিলটি বাতিল করা হয়। এ ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে ১৯৪৮ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাজশাহী, ২৮শে ফেব্রুয়ারি দিনাজপুর, পাবনা এবং মুন্সিগঞ্জের ছাত্র-ছাত্রীরা বাংলা ভাষার দাবিতে ধর্মঘট করেন এবং বিরাট মিছিল বের করেন। একই দিনে পূর্ব-পাকিস্তান থেকে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার যুব সম্মেলনে যে প্রতিনিধি দল যোগ দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে হাজেরা মাহমুদ ও লায়লা আর্জুমান্দ বানু কলকাতায় এক বিবৃতি দিয়ে পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনকে সমর্থন করে খাজা নাজিমউদ্দীনের গণপরিষদের উক্তির প্রতিবাদ করেন (হেলাল, ১৯৮৪)।

ইতোমধ্যে ২৮শে ফেব্রুয়ারি তমদ্দুন মজলিশ ও পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সভায় ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বলা হয়, গণপরিষদের সরকারি ভাষা-তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকেটে বাংলা ব্যবহার না করা ও নৌবাহিনীতে নিয়োগের পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়ার প্রতিবাদে এবং অবিলম্বে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা ও পূর্ব-পাকিস্তানের সরকারি ভাষারূপে ঘোষণা করার দাবিতে এই ধর্মঘট করা হবে। এই সাধারণ ধর্মঘট পালনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন নারীরা। ১৯৪৭-৪৮ সময়ে বাংলা ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে আন্দোলন শুরু হয়েছিল সে আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের মাধ্যমে তাদের মধ্যে সচেতনতা বৃদ্ধি পেয়েছিল। দেশ বিভাগের আগে সাধারণ নারীরা ঢাকায় বিশেষভাবে কোনো আন্দোলন সংগ্রামে অংশগ্রহণ করেননি। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন হচ্ছে এ জাতীয় প্রথম আন্দোলন যেখানে নারীসমাজ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। এরই ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্যায়ে নারীসমাজের ব্যাপক অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায়। মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের প্রতিটি স্তরেই বাংলার নারীসমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এই পর্যায়ের ভাষা আন্দোলন শুধু ঢাকা শহরেই সীমাবদ্ধ থাকেনি। ঢাকার বাইরে জেলা ও মহকুমা শহর অতিক্রম করে প্রত্যন্ত গ্রামে-গঞ্জে তা ছড়িয়ে পড়ে। তাই বর্তমান প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনে এলাকাভিত্তিক (কেন্দ্র থেকে প্রান্ত) নারীর ভূমিকা আলোচিত হবে।

গবেষণা-কৌশল

বর্তমান প্রবন্ধটি প্রধানত তথ্য অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার সংগ্রামের প্রতিটি স্তরে নারীর ভূমিকার ঐতিহাসিক বিবরণ ও বিশ্লেষণ দুইই এ গবেষণায় স্থান পেয়েছে। এই গবেষণা-কাজে প্রাথমিক (সাক্ষাৎকার, স্মৃতিকথা ও আত্মকথা, পত্রিকার প্রতিবেদন) ও দ্বৈতীয়িক (প্রবন্ধ, গ্রন্থ) উভয় প্রকার উৎসই ব্যবহার করা হয়েছে।

ঢাকা বিভাগ

ঢাকা

পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের ঘোষণার পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণের লক্ষ্যে ৩১শে জানুয়ারি ঢাকা বার লাইব্রেরিতে একটি সর্বদলীয় সভা আহ্বান করা হয়। উক্ত সভায় অন্যান্য বক্তার সাথে ইডেন কলেজের ছাত্রী মাহবুবা খাতুনও বক্তৃতা করেন। মাহবুবা খাতুন বক্তৃতায় বলেন, ''বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি স্বীকার করিয়ে নেওয়ার জন্য প্রয়োজন হলে মেয়েরা তাদের রক্ত বিসর্জন দেবে'' (*আজাদ*, ১ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। এ সভায় কাজী গোলাম মাহবুবকে আহ্বায়ক করে *সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ* গঠিত হয়। এই পরিষদের অন্যতম সদস্য ছিলেন আনোয়ারা খাতুন, লিলি খান প্রমুখ। *রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ* উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা এবং আরবি অক্ষরে বাংলা ভাষা প্রচলন করার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ হিসেবে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা শহরে ছাত্র-ধর্মঘট, সভা ও শোভাযাত্রার কর্মসূচি ঘোষণা করে (হেলাল, ১৯৮৪)। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও ঢাকা শহরের স্কুল-কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ পূর্ণ ধর্মঘট পালন করেন। শহরের বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দ শোভাযাত্রা করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে আসেন। ইডেন কলেজের ছাত্রী শরীফা খাতুনসহ কয়েকজন ছাত্রী হোস্টেল থেকে পালিয়ে মিছিল করতে করতে বিশ্ববিদ্যালয় মাঠে গিয়ে ছাত্রজনতার সমাবেশে যোগদান করেন (আবদুল্লাহ, ১৯৯৭)। এই সভা শেষে ছাত্রজনতার এক বিরাট মিছিল সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। সে সময় ছাত্রীদেরও একটা মিছিল বের হয়। শহরের তিন শতাধিক ছাত্রী বিশ্ববিদ্যালয় হতে মূল শোভাযাত্রার সঙ্গে বের হয়ে সেক্রেটারিয়েট ভবনের নিকট হতে তাদের নিজস্ব একটি শোভাযাত্রা-সহকারে বিক্ষোভ করতে করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে সমবেত হয়ে ছত্রভঙ্গ হয় (ইসলাম, ১৯৮৪)।

ভাষা আন্দোলনের তৎপরতাকে বিস্তৃত করতে ১২ ও ১৩ই ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস হিসেবে পালন করা হয়। এ সময় পাঁচশত পোস্টার লেখার দায়িত্ব দেওয়া হয় নাদেরা বেগম এবং শাফিয়া খাতুনকে। তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আবাসিক ছাত্রী ও অন্য ছাত্রীদেরকে সঙ্গে নিয়ে সে দায়িত্ব পালন করেন (হক, ২০০০)। নূরুন্নাহার কবীরের হাতের লেখা সুন্দর ছিল বলে তিনি বেশিরভাগ পোস্টার লেখার দায়িত্বে ছিলেন। তাকে সাহায্য করতেন রওশন আরা বাচ্চু, মাহফিল আরা, রাবেয়া ইসলাম, নূরজাহান বেগম, সুফিয়া খাতুন, কায়সার লিলিসহ আরও অনেকে (আবদুল্লাহ, ১৯৯৭)। এরই মধ্যে ৪ঠা ফেব্রুয়ারি 'সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ'র সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি সারা প্রদেশব্যাপী সাধারণ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়েছিল। এ ধর্মঘটকে সফল করার জন্য প্রস্তুতিও চলছিল। প্রস্তুতিতে উল্লেখযোগ্য হারে নারীর অংশগ্রহণ ছিল। বিশেষ করে লায়লা সামাদ, শাফিয়া খাতুন, শামসুন নাহার, সারা তৈফুর, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা রহমান, হালিমা খাতুন প্রমুখ ছাত্রীগণ ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান; যেমন মুসলিম গার্লস স্কুল, বাংলা বাজার গার্লস স্কুল, কামরুন্নেসা গার্লস স্কুল প্রভৃতি প্রতিষ্ঠানে গিয়ে ছাত্রীদের আন্দোলনের পক্ষে

উদ্‌বুদ্ধ করেন (আহমেদ, ২০১৬)। সেই সময় আন্দোলন ছড়িয়ে দিতে অর্থের প্রয়োজন হয়। তখন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক আব্দুল মতিন অর্থ সংগ্রহের দায়িত্ব দেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রী রোকেয়াকে। রোকেয়া অন্য কয়েকজন ছাত্রীসহ প্রায় দশ হাজার টাকা সংগ্রহ করেছিলেন (মতিন ও রফিক, ১৯৯১)।

২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ব্যাপক প্রস্তুতি চলতে থাকে। কিন্তু ২০শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার জেলা ম্যাজিস্ট্রেট মি. শামসুল হক কোরেশী সমগ্র ঢাকায় ১৪৪ ধারা জারি করেন। এই পরিপ্রেক্ষিতে *সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ*'-এর উদ্যোগে আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করা হবে কি না সে বিষয়ে আলোচনা হয়। উক্ত সভায় উপস্থিত ছিলেন বেগম আনোয়ারা খাতুন (উমর, ১৯৯৫)। ২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় গাজীউল হকের সভাপতিত্বে সভা শুরু হয়। এই সভায় ঢাকার বিভিন্ন স্কুল-কলেজ থেকে ছাত্রীরা যোগদান করে। মুসলিম গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের মধ্য থেকে পঁচিশ-ত্রিশ জন ছাত্রী সমাবেশে যোগদান করেন। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন সারা তৈফুর (আবদুল্লাহ, ১৯৯৭)। সেই সময় মুসলিম গার্লস স্কুল, বাংলা বাজার গার্লস স্কুল, কামরুন্নেসা স্কুল, ইডেন কলেজ, আনন্দময়ী গার্লস হাইস্কুলসহ বিভিন্ন স্কুল কলেজের ছাত্রীদের সংগঠিত করে সমাবেশে যোগদান করানোর ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন শাফিয়া খাতুন, হালিমা খাতুন, সুফিয়া খান, আমিনা মাহমুদ, শামসুন নাহার, সুফিয়া ইব্রাহিম, রওশন আরা বাচ্চু, সুফিয়া করিম (কামাল, ১৯৮৭)।

২১শে ফেব্রুয়ারি সকালে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সভায় ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে-বিপক্ষে বক্তৃতা চলতে থাকে এবং এক পর্যায়ে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে সভায় সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। এই সিদ্ধান্ত জানিয়ে ঢাকা কলেজ, জগন্নাথ কলেজ ও অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোতে চিঠি পাঠানোর ব্যবস্থা করা হয়। আর এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন অষ্টম শ্রেণির ছাত্রী জাহানারা লাইজু। জাহানারা লাইজু সাইকেল চালাতে পারতেন বলে তাকে এবং গাজীউল হকের ছোটো ভাই নিজামকে চিঠি বহন করে বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ে যাবার দায়িত্ব দেওয়া হয় (হেলাল, ১৯৮৪)। সিদ্ধান্ত অনুযায়ী দশজন করে ছাত্র-ছাত্রীর দল ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিলে যোগদান করবে বলে স্থির হয়। গ্রুপে গ্রুপে ভাগ হয়ে মিছিলের প্রচেষ্টা শুরু হয়ে যায়। বিশ্ববিদ্যালয় গেটের সামনে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়ানো সশস্ত্র পুলিশ ছেলেদের গ্রুপ বের হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই তাদেরকে আটক করে ট্রাকে তুলে নেওয়ায় ছেলেরা আর সামনে যেতে পারেনি। এর পরপরই সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, রওশন আরা বাচ্চু, শামসুন্নাহার, সারা তৈফুর প্রমুখ বেশ কয়েকজন ছাত্রী কয়েকটি দলে বিভক্ত হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে রাস্তায় বের হন। ধারণা ছিল তখনকার রক্ষণশীল পরিবেশে পুলিশ মেয়েদের এগিয়ে যেতে বাধা দিবে না বা লাঠিচার্জ করবে না। রওশন আরা ও অন্যরা গেট থেকে বের হওয়ার সময় স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা বিশ্ববিদ্যালয়েই অবস্থান করছিলেন কিন্তু তাদের এগিয়ে যেতে দেখে অন্য ছাত্রীরাও বের হতে শুরু করেন। এভাবে কিছুটা মিছিলের আকার ধারণ করলে দেওয়াল টপকে এসে কিছু ছাত্রও মিছিলের পেছনে যোগদান করেছিলেন। তারা মেডিক্যালের বর্তমান প্রবেশদ্বারের কাছে আসতেই পুলিশের লাঠিচার্জ আর কাঁদানে গ্যাসের শেল নিক্ষেপের ফলে রওশন আরা বাচ্চুর গায়ে লাঠির আঘাত লাগে। রওশন আরা বাচ্চু আকস্মিক আঘাতে হুমড়ি খেয়ে মাটিতে পড়ে যান। রাস্তার পাশে রেস্টুরেন্টের কাছে কয়েকটি ভাঙা রিকশা ছিল। তিনি সেখানে গিয়ে আত্মরক্ষার চেষ্টা করেন। এরপর ছুটে যান সাইন্স এনেক্সের কম্পাউন্ডে সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের প্রভোস্ট ওসমান গণির বাসভবনের দিকে। সেখানে বাসভবনের বারান্দায় সুফিয়া ইব্রাহিম,

শামসুন নাহার ও সারা তৈফুরও আশ্রয় নিয়েছিলেন। অনেকক্ষণ পর পরিস্থিতি কিছুটা শান্ত হলে অধ্যাপক মুনীর চৌধুরীর সহায়তায় তারা হোস্টেলে ফিরে আসেন (পারভিন, ২০০৭, পৃ. ৩১-৩২)।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-ঘোষিত কর্মসূচিকে সফল করার জন্য ঢাকার বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীগণ অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রীদের পাশাপাশি ইডেন কলেজের ছাত্রীরাও ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তারা পোস্টার বিতরণ, স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের উদ্‌বুদ্ধ করা এবং পিকেটিংয়ের কাজেও সম্পৃক্ত ছিলেন। ইডেন কলেজের যেসকল ছাত্রী ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন, তাদের মধ্যে রয়েছেন শরীফা খাতুন, সুফিয়া করিম, রওশন জাহান হেনা, মাহবুবা খাতুন, উম্মে সাঈদা সিদ্দিকী, মনোয়ারা ইসলাম, গুলে ফেরদৌস, চেমন আরা, মনু, হেনা, রহিমা, দুলু, লুৎফুন্নেসা বেগম, আমিরুন্নেসা, শাহাদৎ আরা, রাজিয়া চৌধুরী, ফিরোজী বেগম, রাহাত আরা প্রমুখ। এদের মধ্যে অধিকাংশই ছিলেন হোস্টেলের ছাত্রী। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রীরা প্রচারপত্র দিয়ে গেলে ইডেন হোস্টেলের ছাত্রীরা তা বিলি করতেন। তারা পোস্টার বিলি, স্কুলে গিয়ে ছাত্রীদের উদ্‌বুদ্ধ করার কাজও করতেন। প্রথম দিকে হোস্টেল প্রশাসন আন্দোলনকারীদের প্রতি কঠোর ছিলেন। হোস্টেলের গেটে তালা দেওয়া সত্ত্বেও ছাত্রীরা দেওয়াল টপকে অথবা দারোয়ানের সহযোগিতায় বের হয়ে মিটিং-মিছিলে যোগ দিতেন (খাতুন, ২০১৮)। ১৯৫২ সালে হোস্টেল সুপার ছিলেন আরবির অধ্যাপক হালিমা খাতুন। ইংরেজি বিভাগের অধ্যাপক আফিয়া খাতুন মাঝে মাঝে হোস্টেল সুপারের বাসায় থাকতেন। আফিয়া খাতুন ছিলেন আওয়ামী মুসলিম লীগের সাধারণ সম্পাদক শামসুল হকের স্ত্রী। এই পরিবেশে ভাষা আন্দোলনের কার্যক্রমে হোস্টেল প্রশাসন কিছুটা নমনীয়তা প্রদর্শন করেন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে ইডেন কলেজের অনেক ছাত্রীই অংশ নেন। ভাষা আন্দোলনে ইডেন কলেজের শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণ বিষয়ে শরীফা খাতুন বলেন:

> ... ২১ তারিখ সকালে ৯টার দিকে আমরা নাস্তা করে আমতলায় যাওয়ার প্রস্তুতি নিলাম। সকালে ইডেনের গেট বন্ধ ছিল। আমরা কেউ দেয়াল, কেউ গাছ বেয়ে দেয়াল পার হলাম। সেদিন হোস্টেল থেকে আমরা ৩০ জনের মত ছাত্রী গিয়েছিলাম। সঙ্গে ব্যানার ছিল। ১৪৪ ধারা তো আমরা কয়েকজন কয়েকজন করে গিয়েছি। সবাই একসঙ্গে যাই নি। রাস্তায় পুলিশ দেখতে পেলাম। হাফপ্যান্ট পরা, হাতে লাঠি। আমতলায় গিয়ে দেখি অনেক লোকজন। মুসলিম স্কুল থেকেও মেয়েরা এসেছে। কামরুন্নেসা স্কুলের ছাত্রীরাও ছিল। শ'খানেক মেয়ে ছিল মনে হয়। আমরা আমতলার একপাশে বসলাম। ... ভাষা আন্দোলনে নারী শুধু সক্রিয়ভাবে অংশই নেননি বরং নিজের গায়ের গয়না এবং টাকা দিয়ে সাহায্যও করেছেন। এমনকি ইডেন কলেজের আমরা একদিন রান্না করে জেলখানায় পাঠিয়েছি (*ভোরের কাগজ*, ৫ ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)।

ইডেন কলেজের স্নাতক পর্যায়ের ছাত্রী মনোয়ারা ইসলাম ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য অর্থসংগ্রহের কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন। হোস্টেলের মেয়েদের কাছ থেকে চাঁদা তুলে আন্দোলনে অর্থের জোগান দিতেন তিনি। সেই সময় সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে পুলিশ তল্লাশি করবে এমন খবর ছড়িয়ে পড়লে সেই হলের এক ছাত্রের দেওয়া একটি প্যাকেট আমগাছের গোড়ায় গর্তের ভেতর পাতা দিয়ে লুকিয়ে রেখেছিলেন তিনি। প্যাকেটে ছিল হ্যান্ড মাইক, যা দিয়ে সাধারণ মানুষকে ভাষা আন্দোলনের বিষয়ে জানানো হতো। এভাবেই সব বিপদ উপেক্ষা করে ভাষা আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন তিনি (সাদিয়া, ২০১৬)।

এছাড়া তৎকালীন কন্ট্রোলরুম হিসেবে খ্যাত সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের সঙ্গে যোগাযোগ রেখে ইডেন কলেজের ছাত্রীবৃন্দ আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যান। এ সম্পর্কে ইডেন কলেজের হোস্টেলের তৎকালীন

ছাত্রী ভাষাসংগ্রামী গুলে ফেরদৌস বলেন, ''আমরা হোস্টেলের মেয়েরা কোঁচড় ভরে খাবার নিয়ে জানালা গড়িয়ে আন্দোলনরত ছাত্রদের তুলে ধরা সার্টের ভিতর খাবার ঢেলে দিয়েছি। কারণ সলিমুল্লাহ হল পুরোটা পুলিশ দ্বারা পরিবেষ্টিত ছিল। লুকিয়ে লুকিয়ে আবাসিক ছাত্ররা রাতের অন্ধকারে আমাদের কাছ থেকে খাবার নিয়ে যেত'' (আবদুল্লাহ, ১৯৯৭, পৃ. ৪৪)। ইডেন কলেজের ছাত্রীগণ মেডিক্যাল হোস্টেলে আহতদের কাছেও খাবার পৌঁছে দিতেন। এই দলে অন্যতম ছিলেন রওশন জাহান হোসেন। এক পর্যায়ে হোস্টেল সুপারের আদেশে হোস্টেলের গেটে তালা ঝোলানো হয়, যাতে ছাত্রীরা ভেতরে না যেতে পারে। তখন তারা ইট জোগাড় করে গেট টপকিয়ে ভেতরে ঢুকলেন। এভাবেই সব বাধা, রক্ষণশীলতা উপেক্ষা করে ছাত্রীগণ ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী স্কুল ছাত্রীদের মধ্যে কামরুন্নেসা গার্লস স্কুলের ছাত্রী মালেকা খান, রওশন আহমদ দোলন, কাজী খালেদা খাতুন, জুলেখা হক, হাবিবা খাতুন ভাষা আন্দোলনে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন। মুসলিম গার্লস স্কুল ও বাংলা বাজার স্কুলের ছাত্রীরাও ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রেখেছিলেন।

একুশে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদের আহত হওয়ার ঘটনা পরবর্তী দিন অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারি আনোয়ারা খাতুন পূর্ববঙ্গ আইন পরিষদে বক্তব্য প্রদান করেন। তিনি বলেন:

> ... এ অত্যাচার থেকে মেয়েরা পর্যন্ত রেহাই পায় নাই – ছেলেদের কথা আর নাই বল্লাম, যে জাতি মাতৃজাতির সম্মান দিতে জানেনা সে জাতির ধ্বংস অনিবার্য। এ অত্যাচারের বর্ণনা দেওয়া সম্ভবপর নয় – দু'একটি কথায় কিছুটা পরিষ্কার করতে চেষ্টা করব – মিলিটারী মেয়েদের গাড়ীতে করে নিয়ে কুর্মিটোলায় ছেড়ে দিয়েছে। যে Ministry-র আমলে এই সমস্ত অত্যাচার হয়– যারা মাতৃজাতির সম্মান দেয় না, তাদের পতন অবশ্যম্ভাবী। পুলিশের লাঠি চার্জে মেয়েরা Wounded হয়েছে। আমি তাদের মধ্যে দু'জনার নাম দিচ্ছি। একজন হলো ঢাকা হাইকোর্টের জাস্টিস ইব্রাহিম সাহেবের মেয়ে মিস সুফিয়া ইব্রাহিম। আর একজন হলো মিস রওশন আরা থার্ড ইয়ার বি.এ। মেয়েদের Total wounded এর সংখ্যা হল ৮ জন। মন্ত্রীসভা এমন একটা আবহাওয়ার সৃষ্টি করেছেন যাতে নাকি মেয়েরা পর্যন্ত লাঞ্ছিত হয়েছে (*Proceedings of the East Bengal Legislative Assembly*, ১৯৫২, p. ৯৮)।

একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে আন্দোলন পরিচালনা এবং আহতদের চিকিৎসার জন্য অর্থ সংগ্রহের প্রয়োজন হয়। চাঁদা তুলে অর্থ সংগ্রহের ক্ষেত্রে ভূমিকা পালন করেছিলেন ছাত্রীরা। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুফিয়া ইব্রাহিম, শাফিয়া খাতুন, শামসুন্নাহার, রওশন আরা, আমেনা মাহমুদ, কায়সার সিদ্দিকী, খোরশেদী আলমসহ আরও অনেক ছাত্রী এই চাঁদা তোলার দায়িত্বে নিয়োজিত ছিলেন। ২২শে ফেব্রুয়ারি সুফিয়া খাতুন ও মোসলেমা খাতুন শান্তিনগর আর মালিবাগ এলাকায় চাঁদা তুলতে গিয়েছিলেন। সেখানে তারা যে যে বাড়িতে গিয়েছিলেন, সব বাড়িতেই তারা ছাত্রদের জন্য সহানুভূতি পেয়েছেন। গৃহিণীরা তাদের সাধ্যমত চাঁদা দিয়ে সাহায্য করেছেন। অনেক বাড়িতে নারীরা গুলিবিদ্ধ ছেলেদের কথা বলে আপনজন হারানোর মতো কেঁদেছেন (আবদুল্লাহ, ১৯৯৭, পৃ. ৩৭)। ২৩শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৫শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত টিকাটুলি, আজিমপুরসহ ঢাকার বিভিন্ন এলাকায় চাঁদা তোলা হয়। সারা তৈফুর, সুফিয়া ইব্রাহিম, হালিমা খাতুন, শামসুন্নাহারসহ বিশ্ববিদ্যালয় ও ইডেন কলেজের ছাত্রীরা চাঁদা তোলায় নেতৃত্ব দেন। ইডেন গার্লস কলেজ ছাত্রী সংসদের সাধারণ সম্পাদিকা সুফিয়া করিম মহল্লায় মহল্লায় গিয়ে চাঁদা তোলার কাজে সম্পৃক্ত ছিলেন (পারভিন, ২০০৭)। উত্তোলিত চাঁদা সলিমুল্লাহ হলে ভাষা আন্দোলনের কন্ট্রোলরুমে পাঠিয়ে দেওয়া হতো। এছাড়া

২৩শে ফেব্রুয়ারি মেডিক্যাল কলেজের সামনে নির্মিত শহিদ মিনারে অনেক নারী পুষ্পস্তবক অর্পণের পাশাপাশি হাতের কানের অলংকার খুলে দিয়েছিলেন ভাষা আন্দোলন চালানোর জন্য। শিক্ষাবিদ, লেখক আনিসুজ্জামানের মা সৈয়দা খাতুন শহিদ মিনারের পাদপ্রান্তে সোনার হার নিবেদন করেছিলেন (আনিসুজ্জামান, ২০১৫)। এভাবেই ছাত্রী থেকে শুরু করে গৃহিণীরা পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেন এবং সমর্থন করেন।

নারায়ণগঞ্জ

১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারি মাসের শুরু থেকেই নারায়ণগঞ্জে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন সংগঠিত হতে থাকে। ২১শে ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জ ছিল প্রতিবাদ, মিছিল, বিক্ষোভ ও সমাবেশের শহর। এ দিনও সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানে ধর্মঘট পালিত হয় এবং বিকেলে রহমত উল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউট মাঠে এক বিশাল জনসভা হয়। সভা চলাকালীন নারায়ণগঞ্জবাসী জানতে পারেন, ঢাকায় ছাত্রদের উপর গুলি করা হয়েছে এবং কয়েকজন ছাত্র শহিদ হয়েছেন। এই খবর শোনামাত্রই জনসভা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। তখন মর্গ্যান স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম একটি মিছিল সহকারে সমাবেশে অংশগ্রহণ করেন। সভা শেষে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে যে বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে তাতে তিনি এবং তার নেতৃত্বে মর্গ্যান স্কুলের ছাত্রীসহ নারায়ণগঞ্জের নারীরাও যোগদান করেন। এই ঘটনার প্রত্যক্ষদর্শী ভাষাসংগ্রামী আবুল গফুর চৌধুরী বলেন, ''ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে নারায়ণগঞ্জে এটাই ছিল মহিলাদের প্রথম মিছিল। এতে আন্দোলন গতি লাভ করে এবং অন্যান্য কর্মীরা উৎসাহিত হয়'' (মাহবুব, ২০১১, পৃ. ২৭-২৮)। ২২শে ফেব্রুয়ারি ছিল ভাষা-আন্দোলনে নারায়ণগঞ্জের ইতিহাসে আরেকটি স্মরণীয় দিন। ঐ দিন সকাল থেকেই নারায়ণগঞ্জ মিছিলের শহরে পরিণত হয়। শ্রমিকনেতা ফয়েজ আহম্মদের সভাপতিত্বে চাষাড়া মাঠে এক জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। শহর ছাড়াও আশেপাশের অঞ্চল থেকে হাজার হাজার শ্রমিক জনসভায় যোগ দেয়। এ জনসভায় মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে নারীদের একটি দল শোভাযাত্রা সহকারে অংশগ্রহণ করে (*আজাদ*, ২৩ ফ্রেব্রুয়ারি ১৯৫২)। মমতাজ বেগম এই আন্দোলনকে জোরদার করার জন্য সমকালীন রাজনীতিবিদ ও শ্রমিকদের সাথে গোপন বৈঠক করেন, যেন এ আন্দোলন শ্রমিক ও সাধারণ জনগণের মধ্যে ছড়িয়ে দেওয়া যায়। তিনি শ্রমিকদের বোঝাতে সক্ষম হয়েছিলেন যে, এ আন্দোলন সফল না হলে শুধু ভাষা নয়, বাঙালির অস্তিত্বই বিপন্ন হবে। মমতাজ বেগমের এ দূরদর্শী ও দক্ষ সাংগঠনিক কর্মকাণ্ডের ফলেই আদমজী জুট মিলের শ্রমিকরা দলে দলে ভাষা আন্দোলনে যোগ দিয়েছিলেন। এই সব ঘটনার মধ্য দিয়েই মমতাজ বেগম নারায়ণগঞ্জ ভাষা আন্দোলনের অবিসংবাদিত নেত্রী হিসেবে আবির্ভূত হন।

২৩-২৮শে ফেব্রুয়ারি আন্দোলন ক্রমাগত জোরালো হতে থাকে। প্রতিদিনই শহরের বিভিন্ন এলাকায় মিছিল, মিটিং ও প্রতিবাদ সভা চলতে থাকে। জনগণ ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে বিক্ষোভ প্রদর্শন করে। এসব বিক্ষোভে নারীরাও যোগদান করে। এই বিক্ষোভ অব্যাহত থাকার মধ্যেই ২৯শে ফেব্রুয়ারি নারায়ণগঞ্জের ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক মমতাজ বেগমের গ্রেফতারকে কেন্দ্র করে পরিস্থিতি গণবিক্ষোভের আকার ধারণ করে। নারায়ণগঞ্জ মহকুমা প্রশাসন মমতাজ বেগমের সাংগঠনিক শক্তি ও সাহসে ভীত হয়েই ২৯শে ফেব্রুয়ারি সকালে তাকে গ্রেফতার করে নারায়ণগঞ্জ আদালতে নিয়ে যায়। এর প্রতিবাদে মর্গ্যান স্কুলের ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে রাস্তা অবরোধ করেন। খবর পেয়ে অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-ছাত্রীরা, সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ এবং শ্রমিকরাও ছুটে আসেন। তারা কোর্ট এলাকায় এসে বিনাশর্তে মমতাজ

বেগমের মুক্তি দাবি করে এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ধ্বনি দিতে থাকে। এই পরিস্থিতিতে মহকুমা হাকিম ইমতিয়াজী বাইরে এসে বলেন, ''রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সাথে মমতাজ বেগমের গ্রেফতারের কোনো সম্পর্ক নেই, তাকে স্কুলের তহবিল তসরুফের দায়ে গ্রেফতার করা হয়েছে''। কিন্ত জনতা তা বিশ্বাস না করে বলতে থাকে, মমতাজ বেগম নারায়ণগঞ্জ রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের অন্যতম প্রধান কর্মী বলেই পুলিশ তাকে গ্রেফতার করেছে। তাই তাকে বিনা শর্তে মুক্তি না দেওয়া পর্যন্ত তারা আদালত প্রাঙ্গণ ছেড়ে যাবে না। এই পরিস্থিতিতে পুলিশ তাকে ভ্যানে তুলে নিয়ে ঢাকার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলে বিপুল সংখ্যক জনতা চাষাড়া স্টেশনের কাছে রাস্তায় গাছ কেটে ব্যারিকেড তৈরি করে পুলিশ ভ্যান আটক করলে অবস্থা আয়ত্তে আনার জন্য পুলিশ লাঠিচার্জ করে। এর ফলে জনতা আরও ক্ষিপ্ত হয়ে উঠে। শেষ পর্যন্ত ঢাকা থেকে বিপুল সংখ্যক পুলিশ ঘটনা স্থলে পৌঁছালে জনতা পুলিশ সংঘর্ষ বাঁধে। সন্ধ্যার দিকে জনতা কিছুক্ষণের জন্য ছত্রভঙ্গ হলে পুলিশ সেই সুযোগে মমতাজ বেগমকে নিয়ে ঢাকায় চলে আসে। পুলিশের সাথে সংঘর্ষে প্রায় ৪৫ জন আহত হয়। পুলিশ ঐদিন আন্দোলনের মূল কর্ণধার, নেতৃস্থানীয় অনেক ব্যক্তিকেই গ্রেফতার করে। একই দিনে গ্রেফতার হয়েছিলেন ছাত্রী ইলা বক্শী ও আয়েশা আক্তার বেলু (*আজাদ*, ১ মার্চ ১৯৫২)। ঐদিন রাতে নারায়ণগঞ্জে ১৪৪ ধারা জারি করা হয় এবং ৭ই মার্চ পর্যন্ত সান্ধ্য আইন বলবৎ থাকে। মমতাজ বেগমের গ্রেফতারের সূত্র ধরে মোট ১৪৪ জনকে গ্রেফতার করে পুলিশ। মমতাজ বেগমকে গ্রেফতারের প্রতিবাদে নারায়ণগঞ্জে বিক্ষোভ সংক্রান্ত এক খবরে বলা হয়, ''One hundred and fifteen persons including two girl students have been arrested. So far in connection in the disturbances as Narayangonj that brookout after the arrest of Mrs. Mumtaz Begum Headmistress of the Morgan Girls High English School on February 29." (*The Statesman*, ৩ মার্চ ১৯৫২)।

মুসলিম লীগ সরকার মমতাজ বেগমকে কারাগার থেকে মুচলেকার শর্তে মুক্তি দিতে চেয়েছিল। কিন্তু তিনি সে প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করেন। এর ফলে তিনি তার সরকারি চাকরি হারান। তার স্বামী আবদুল মান্নাফ তখন ঢাকার সিভিল সাপ্লাই অফিসের উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। সরকার আবদুল মান্নাফকে চাকরি হারাবার ভয় দেখিয়ে চাপ প্রয়োগ করেছিল যেন মমতাজ বেগম বন্ড সইয়ে স্বাক্ষর করেন। আবদুল মান্নাফ জেলখানায় গিয়ে মমতাজ বেগমকে সরকারের শর্ত মেনে নেয়ার জন্য অনুরোধ করেন। কিন্তু তিনি তা করতে অস্বীকৃতি জানান। ১৯৫৩ সালের মে মাসের চতুর্থ সপ্তাহের প্রথম দিকে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগার থেকে মমতাজ বেগম মুক্তি পান। কিন্তু নারায়ণগঞ্জ পৌর এলাকায় তিনি আরও কিছুদিন অন্তরীণ ছিলেন। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই তার স্বামীর সাথে তার দূরত্ব সৃষ্টি হয় এবং ১৯৫৯ সালে তাদের বিবাহ বিচ্ছেদ হয় (মাহবুব, ২০১১, পৃ. ৩১-৩৮)। নিজের মাতৃভাষার সম্মান রক্ষার্থে তিনি এতটাই দৃঢ় প্রত্যয়ী ছিলেন যে এর জন্য তিনি নিজের চাকরি, স্বামী, সংসার সব কিছু ত্যাগ করতে পিছপা হননি। নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ছিল নারীসমাজের অংশগ্রহণ। মিছিল, সভা, সমাবেশে নারীদের অংশগ্রহণের পাশাপাশি শহরের গৃহিণীদের স্বতঃস্ফূর্ত আর্থিক সহায়তাও এই ভাষা আন্দোলন সফল করেছে। নারীদের সংগঠিত করে আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত করার ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেন মমতাজ বেগম।

টাঙ্গাইল

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি টাঙ্গাইলে ধর্মঘট ও প্রতিবাদ-সভা পালনের প্রস্তুতি চলতে থাকে এবং এই উপলক্ষ্যে একটি মিটিংও করা হয়। এক্ষেত্রে কেএন ছাকেরের মেয়ে রুবি, আব্দুল করিম খানের মেয়ে জ্যোৎস্না, ঝর্ণা এবং মহেড়ার সৈয়দ ডাক্তারের মেয়ে ছালেহা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন (হোসেন,

২০১১)। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে কুমুদিনী মহিলা কলেজের ছাত্রীরা মিছিল ও সভায় অংশগ্রহণের মাধ্যমে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। ছালেহা খাতুন নামে এক ছাত্রী দেওয়াল টপকে ছাত্রীদেরকে নিয়ে ২১শে ফেব্রুয়ারির মিছিলে অংশ নিয়েছিলেন। কলেজের ছাত্রীদেরকে সংগঠিত করতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন রাবেয়া সিরাজ। ধৈর্য ও বিচক্ষণতার সাথে তিনি ছাত্রীদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের বীজ বপন করতে সক্ষম হন। তিনি কলেজের ছাত্রীদের নিয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত ছিলেন (সাদিয়া, ২০১৬)। ২২শে ফেব্রুয়ারি কুমুদিনী মহিলা কলেজে ছাত্রীদের এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। তৃতীয় বর্ষের ছাত্রী কোহিনূর ইউসুফ শাহীর সভাপতিত্বে সভায় কিছু প্রস্তাবও গৃহীত হয়। সভায় রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে এবং আরবি হরফে বাংলা লেখার বিরুদ্ধে প্রস্তাব গৃহীত হয় (*আজাদ*, ২৬ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। কুমুদিনী কলেজের ছাত্রী আজিজা বেগম এবং মাহমুদা খানমও ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে টাঙ্গাইলের আরও যে সকল ছাত্রী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন রুবী, সুফিয়া বেগম প্রমুখ (পারভিন, ২০০৭)।

মুন্সিগঞ্জ

১৯৪৮ সাল থেকেই মুন্সিগঞ্জে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। ১৯৪৮ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা হরতাল পালন করে। আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারী ব্যক্তিদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ছাত্রীনেত্রী স্মৃতিকণা গুহ। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে স্থানীয় অ্যালবার্ট ভিক্টোরিয়া যতীন্দ্রমোহন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরাও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে (রফিক, ২০১৯)।

নরসিংদী

১৯৫২ সালে নরসিংদীর পলাশ থানার দশম শ্রেণির ছাত্রী লীলা চক্রবর্তী পত্রপত্রিকার মাধ্যমে ঢাকার ভাষা আন্দোলনের খবর পেয়ে স্কুল থেকে মিছিল নিয়ে সারা এলাকা প্রদক্ষিণ করেছিলেন (পারভিন, ২০০৭)। তাছাড়া বামপন্থি আন্দোলনের সাথে সম্পৃক্ত নরসিংদীর রানু চ্যাটার্জি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে এবং অন্যান্য বৈষম্যমূলক আচরণের বিরুদ্ধে প্রতিবাদস্বরূপ কারাভোগ করেন (মাহবুব, ২০১৫)।

মানিকগঞ্জ

১৯৪৮ সালে মানিকগঞ্জ ছিল ঢাকা জেলার একটি মহকুমা। তখন থেকেই মানিকগঞ্জে ভাষার প্রশ্নে সচেতনতা সৃষ্টি হয়েছিল। ১৯৫২ সালের আন্দোলনেও মানিকগঞ্জের জনসাধারণ সক্রিয় ভূমিকা পালন করেন। মার্চ মাসের শেষ দিকে স্থানীয় কালীবাড়ি প্রাঙ্গণে ছাত্র-বুদ্ধিজীবীদের উদ্যোগে এক প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। এ সভায় বক্তৃতা প্রদান করেছিলেন জাহানারা বেগম (রফিক, ২০১৯)। ১৯৫৪ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি মানিকগঞ্জে প্রথম শহিদ মিনার নির্মিত হয়। এক্ষেত্রে অন্যদের সাথে সক্রিয় ভূমিকা পালন করেছিলেন রোকেয়া সুলতানা। এই কারণে তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানাও জারি করা হয়েছিল। এই শহিদ মিনারটি নির্মাণের জন্য উম্মে সাহারা খাতুন তার বাড়ির সামনে (বর্তমান মানিকগঞ্জ সরকারি বালিকা বিদ্যালয়) জমি দান করেছিলেন (রায়, ২০০০)।

ময়মনসিংহ বিভাগ

ময়মনসিংহ

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহে সমাবেশ, মিছিল, হরতাল ও বিক্ষোভ পালিত হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি ময়মনসিংহ গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীরা ক্লাস বর্জন করে বিদ্যালয়ে কালো পতাকা উত্তোলন করে। সামনে কালো পতাকা নিয়ে শহরের গুরুত্বপূর্ণ রাস্তাগুলো প্রদক্ষিণ করে তারা। স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলন এবং ছাত্রীদের সংগঠিত করে বিক্ষোভ মিছিল বের করার কর্মসূচিতে নেতৃত্ব দিয়েছিলেন ছালেহা বেগম (মোহাম্মদ, ২০১৭)। আন্দোলনে নেতৃত্ব দানের অপরাধে তিন বছরের জন্য স্কুল থেকে বহিষ্কৃত হয়েছিলেন তিনি। ১৯৫২ সালে ময়মনসিংহের ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেছিলেন হালিমা খাতুন। তিনি ছাত্রীনিবাসের মেয়েদেরকে সংগঠিত করে প্রধান ফটকের তালা ভেঙে মিছিলে অংশগ্রহণ করেছিলেন। তার হাতে ছিল কালো পতাকা। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বিনে স্বদেশী ভাষা মিটে কি আশা' স্লোগান দিতে দিতে তিনি এগিয়ে গিয়েছিলেন। তার হাতে কালো পতাকা থাকায় তার বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করা হয়। তাই তিনি ছাত্রীনিবাসে ফিরে গেলে বিদ্যাময়ী স্কুলের প্রধান শিক্ষিকা হাসিনা বেগম রাত ১০টার দিকে তাকে হোস্টেল থেকে বের করে দেন। ভাষা আন্দোলনের উত্তাল সময়ে আন্দোলনের প্রতিটি পদক্ষেপেই নিজেকে সম্পৃক্ত রেখেছিলেন তিনি (সাদিয়া, ২০১৬)। ময়মনসিংহের আর এক ভাষাকন্যা তাহমীদা সাঈদা। তিনি ১৯৫২ সালে বিদ্যাময়ী গার্লস হাইস্কুল থেকে ম্যাট্রিক পাস করে ময়মনসিংহ আনন্দমোহন কলেজে ভর্তি হন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি তার নেতৃত্বে নারীদের একটি দল কলেজ থেকে বেরিয়ে বিদ্যাময়ী স্কুলের সামনে জড়ো হয়। বিদ্যাময়ী স্কুল কর্তৃপক্ষের প্রহরা ভেদ করে ছাত্রীরা রাজপথে এগিয়ে আসে। ছাত্রী-মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার অপরাধে পনের দিনের জন্য নজরবন্দি করা হয় তাহমীদা সাঈদাকে (সাদিয়া, ২০১৬)। এভাবেই নারী-পুরুষের যৌথ পদচারণায় ভাষার দাবিতে ময়মনসিংহের রাজপথ প্রকম্পিত হয়েছিল।

নেত্রকোণা

১৯৪৮ সাল থেকেই নেত্রকোণার প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক ব্যক্তিত্ব, রাজনৈতিক কর্মী ও ছাত্রদের মধ্যে ভাষার প্রশ্নটি গুরুত্বের সাথে আলোচিত হতে থাকে। ১৯৫২ সালে এই বিষয়ে সাংগঠনিক উদ্যোগ লক্ষ করা যায়। নেত্রকোণাতে ভাষা আন্দোলনে যারা বিভিন্নভাবে ভূমিকা পালন করেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন ছায়া রায় (শিক্ষক), কনক চক্রবর্তী (শিক্ষক), মোহিনী সেন (উকিল) প্রমুখ (বিশ্বাস, ২০০০)।

শেরপুর

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন শেরপুরে তেমন জোরালো প্রভাব ফেলেনি। শেরপুরে সত্যিকারভাবে ভাষা আন্দোলন দানা বাঁধে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে। ভাষা আন্দোলনের এই পর্যায়ে শেরপুরের যে সমস্ত স্কুল, কলেজের ছাত্র-ছাত্রীরা প্রতিবাদমুখর হয়েছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল শেরপুর গার্লস হাই স্কুলের ছাত্রীরা (হাসান, ২০০০)।

জামালপুর

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে *ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ*'র নেতৃত্বে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিতে জামালপুর শহরে একটি মিছিল বের হয়। এই মিছিলে জামালপুর বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীরাও যোগ দিয়েছিলেন। বালিকা বিদ্যালয়ের যে-সকল ছাত্রী ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তাদের মধ্যে অন্যতম জান্নাত আরা (জামান, ২০০০)।

সিলেট বিভাগ

সিলেট

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার দাবিতে সিলেটেও সভা সমাবেশ চলছিল। ঐ দিন বিকেলে টেলিগ্রাফের মাধ্যমে সিলেটে ঢাকার মিছিলে গুলিবর্ষণের সংবাদ আসলে সিলেটের জনসাধারণের মধ্যে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই মিছিল বের হয়ে বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করতে থাকে। এই মিছিলে নারীদেরও অংশগ্রহণ ছিল। অনিল কুমার সিংহ সেদিনের ঘটনা বর্ণনা করে বলেন:

> ... সেদিনের মিছিল জিন্দাবাজার হয়ে পয়েন্ট থেকে পূর্বদিকে গিয়ে নয়াসড়ক, ধোপাদিঘীর পাড়, নাইওরপুল, রংমহলের সামনে দিয়ে এসে গোবিন্দচরণ পার্কের দক্ষিণ গেট দিয়ে পার্কের ভিতর জমা হয়েছিল। এই মিছিলের বিশেষত্ব ছিল ছাত্রীরা মিছিলের পুরোভাগে আর ছাত্র জনতা ছিল মিছিলের পেছনের সারিতে। সেই মিছিলের স্লোগান ছিল 'খুনের বদলে খুন চাই', 'নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি। গোবিন্দচরণ পার্কের ভিতরের লাইট পোস্টের নীচে গোল করে মেয়েরা বসে পড়েছে। ছেলেরা দূরত্ব বজায় রেখে মেয়েদের পেছনে দাঁড়িয়ে আছে (কবির, ২০১৮, পৃ. ১৩০)।

২২শে ফেব্রুয়ারি নারী নেতৃবৃন্দ শহরের পাড়ায় পাড়ায় প্রচারণা চালান এবং ২৩শে ফেব্রুয়ারি নারীরা শহরে এক বিরাট মিছিল বের করেন। সিলেট শহরে নারীদের এত বড়ো মিছিল এর আগে হয়নি। মিছিলটি সকাল এগারোটায় শুরু হয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে গোবিন্দচরণ পার্কে এসে শেষ হয়। মিছিল শেষে পার্কে একটি সভাও অনুষ্ঠিত হয়। এতে বক্তৃতা করেন জোবায়দা খাতুন চৌধুরী এবং অন্যান্য নারী ও ছাত্রী নেতৃবৃন্দ। বিকেলে নারীদের আরেকটি সভা অনুষ্ঠিত হয় সিলেটের কেন্দ্রীয় মুসলিম সাহিত্য সংসদ এর মূল সভাকক্ষ জিন্নাহ হলে, যা বর্তমানে শহিদ সুলেমান হল হিসেবে পরিচিত (মোহাম্মদ, ২০১৭)। পরবর্তীসময়ে ২৭শে ফেব্রুয়ারি সিলেটে নারীদের একটি শোভাযাত্রা বের হয়। এতে অনেক সম্ভ্রান্ত নারীসহ স্কুল কলেজের ছাত্রীরাও যোগদান করেন। তারা ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের তদন্ত এবং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন (*আজাদ*, ২৮ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। পরবর্তী সময়ে ১লা মার্চ পর্যন্ত সিলেটে সাধারণ ধর্মঘট হয়। ৫ই মার্চ হরতাল পালিত হয়। এ সময় আন্দোলন সিলেট শহর ছাড়িয়ে মহকুমা ও থানা শহরেও ছড়িয়ে পড়েছিল। এই আন্দোলনগুলোতেও নারীর অংশগ্রহণ ছিল। সিলেটের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের মধ্যে ছিলেন জোবায়দা খাতুন চৌধুরী, সৈয়দা শাহার বানু চৌধুরী, সৈয়দা লুৎফুন্নেছা খাতুন, রাবেয়া আলী, যোবেদা খাতুন, রাবেয়া খাতুন, ছালেহা খাতুন প্রমুখ। এছাড়া শরিফুনেছা খান চৌধুরী, সামসি খানম চৌধুরী, জাহানারা মতিন, রোকেয়া বেগম, নূরজাহান বেগম, সৈয়দা খাতুন, মাহমুদা খাতুন প্রমুখ ভাষা আন্দোলনের পক্ষে অবদান রেখেছেন (আহমদ, ২০১১)। এদের মধ্যে ছালেহা খাতুন স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের জন্য তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিলেন (মোহাম্মদ, ২০১৭)।

মৌলভীবাজার

মৌলভীবাজারে ভাষা আন্দোলন সংগঠনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মৌলভীবাজারের বিখ্যাত সৈয়দ বংশের মেয়ে সৈয়দা নাজিবুন্নেছা খাতুন (মোহাম্মদ, ২০১৭)।

সুনামগঞ্জ

ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায় সুনামগঞ্জকে তেমন প্রভাবিত করতে না পারলেও ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ঢেউ এখানেও পৌঁছে যায়। সুনামগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন শাহেরা বানু চৌধুরী। এছাড়া হাজেরা মাহমুদ সুনামগঞ্জের ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষভাবে ইতিবাচক ভূমিকা রেখেছিলেন (রফিক, ২০১৯)।

হবিগঞ্জ

ভাষা আন্দোলনের সূচনায় হবিগঞ্জ অগ্রসর ভূমিকা না রাখলেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে হবিগঞ্জের ছাত্র-ছাত্রীদের সক্রিয় ভূমিকা লক্ষণীয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি স্থানীয় ছাত্রদের দ্বারা গঠিত ভাষা কমিটির উদ্যোগে 'বাংলা অন্যতম রাষ্ট্রভাষা' দিবস পালন করা হয়। স্থানীয় স্কুল এবং কলেজের ছাত্রছাত্রীরা এবং ব্যবসায়ীরা পূর্ণ হরতাল পালন করে (*আজাদ*, ২৭ ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। এছাড়া ভাষা সংগ্রাম কমিটির সাথে যোগাযোগ রেখে হবিগঞ্জের ভাষা আন্দোলন পরিচালনায় যারা ভূমিকা রেখেছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য শান্তি দত্ত (ইসমাঈল, ২০১৯)।

চট্টগ্রাম বিভাগ

চট্টগ্রাম

১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আন্দোলনে চট্টগ্রামের নারীগণ ভাষা-আন্দোলনের জনমত গঠন, পোস্টার তৈরি ও লাগানো, চোঙ্গা দিয়ে প্রচারণা, মিটিং, মিছিল প্রভৃতি কাজে অংশগ্রহণ করে আন্দোলনকে ত্বরান্বিত করেছেন। চট্টগ্রামে পোস্টার লেখা ও লাগানোর কাজে জড়িত ছিলেন জওশন আরা রহমান, মিরা সেন, প্রভিতা মুৎসুদ্দি, জাহানারা রহমান, হোসনে আরা মাক্ষী প্রমুখ।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে পূর্ণরূপে হরতাল পালিত হয়। শহরের সমস্ত দোকানপাট, যানবাহন, সরকারি অফিস-আদালত, স্কুল-কলেজ বন্ধ ছিল। তখন নারীদের রাস্তায় বের হয়ে মিছিল করা সহজ ব্যাপার না হলেও বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে নারীরাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে সারা দেশের মতো চট্টগ্রামও উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। চট্টগ্রাম কলেজের ছাত্র সংসদের নেতা এজহার, মাসুদুর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে একটি প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে হালিমা খাতুনের নেতৃত্বে ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের কিছু ছাত্রী এসে যোগ দেয়। মিছিলটি অর্পণাচরণ গার্লস কলেজের সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে আরও কিছু ছাত্রী মিছিলে অংশ নেয়। ছাত্রীদের একটি ট্রাকে উঠিয়ে দিয়ে অন্যরা পেছনে সাইকেল চেপে বা পায়ে হেঁটে মিছিলটি এগিয়ে নিয়ে যায়। এভাবে জনতা শহর প্রদক্ষিণ করে। পরের দিন ২৩শে ফেব্রুয়ারি অসংখ্য শোকমিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। ২৪শে ফেব্রুয়ারি হরতাল ও জনসভা সফল করার জন্য ঘোড়ার গাড়িতে চড়ে চোঙ্গা দিয়ে মিছিল সহকারে প্রচার কাজ চলে এবং পোস্টারিং করা হয় ও প্রচারপত্র বিতরণ করা হয়। এসব প্রচার প্রচারণায় মেয়েরাও অংশগ্রহণ করেন এবং আন্দোলন সফলভাবে পরিচালনার জন্য চাঁদাও তুলেছেন (চৌধুরী, ২০০০)।

২৫শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম শহরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ছাত্রীদের স্বতন্ত্র মিছিল। সেদিন চট্টগ্রাম কলেজ থেকে প্রতিভা মুৎসুদ্দি, তালেয়া রহমান প্রমুখ ছাত্রীর একটি ছোট্ট মিছিল নিয়ে ডা. খাস্তগীর বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে আসেন। ভাষা আন্দোলনে অংশ নেওয়ার অপরাধে ঢাকার ছাত্রদের ওপর পুলিশি জুলুমের

কথা এবং ছাত্র হত্যার কথা ছাত্রীদের জানান। সেখানে থেকে জওশন আরা রহমান, হালিমা খাতুনসহ অন্যেরা মিছিলে যোগ দেন। এরপর অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের ছাত্রীরাও যোগ দেন। মিছিলকারী ছাত্রীরা ট্রাকে করে 'মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করেন। চট্টগ্রামের ইতিহাসে নারীদের এই ধরনের স্বতন্ত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন এটাই প্রথম (চৌধুরী, ২০০০)। তাদের সঙ্গে যোগ দেয় বিভিন্ন নারী সংগঠন। চট্টগ্রামের সর্বদলীয় কর্মপরিষদের হয়ে সেদিন রাজপথে নামেন শেলী দস্তিদার, প্রণতি দস্তিদার (পূর্ণেন্দু দস্তিদারের বোন), মীরাসহ সিনিয়র শিক্ষার্থী সুলেখা, মিনতিসহ আরও অনেকে (ভৌমিক, ২০১২)। পরে এক সমাবেশে ছাত্রীরা ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ জানান এবং মন্ত্রিসভার পদত্যাগ দাবি করেন। গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা রূপে স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাবার অঙ্গীকার ব্যক্ত করেন। ২৬ ফেব্রুয়ারিতেও চট্টগ্রাম শহরে হরতাল পালিত হয় এবং হাটহাজারী, নাজিরহাট, পটিয়া ও অন্যান্য স্থানের ছাত্র-ছাত্রীরা বাস ও ট্রেনযোগে শহরে এসে মিছিলে যোগ দেন। ২৭শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে সভা-সমাবেশ ও মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৮ তারিখ হরতাল পালিত হয়। ঐদিন চট্টগ্রামের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা খালি পায়ে এক মিছিল বের করেন এবং 'মন্ত্রিসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করেন (চৌধুরী, ২০০০)।

ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নারী সদস্যরাও যার যার অবস্থান থেকে তৎপর ছিলেন। ফরিদা হাসান, রমা দত্ত, আরতি দত্ত, প্রণতি দস্তিদার, জওশন আরা বুলবুল, খালেদা খান, জাহানারা জুবলী, গীতা দত্ত (কল্পনা যোশীর ছোটোবোন), কবিতা, হালিমা, সেলিনা, আখতার বানু, বিজয়লক্ষ্মী, নূরুন নাহার, মালেকা আজিম খান, খুরশীদা আজিম খান, লতিফা আজিম খান, ডা. লায়লা, চেমন আরা বেগম, ফৌজিয়া সামাদ প্রমুখ ডা. খাস্তগীর স্কুল থেকে সংগঠিত হয়ে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫১ সাল থেকে আরতি দত্ত এবং প্রণতি দস্তিদার আত্মগোপনে চলে যান। কিন্তু আত্মগোপনে থেকেও তারা আন্দোলনে সক্রিয় ছিলেন (খান, ২০০১)। চট্টগ্রামে ব্রিটিশ-বিরোধী আন্দোলন থেকে শুরু করে সকল প্রগতিশীল আন্দোলনেই নারীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছেন।

কুমিল্লা

১৯৫২ সালে বাংলা ভাষার প্রশ্নে সারা দেশ যখন উত্তপ্ত তখন কুমিল্লাও সক্রিয় হয়ে ওঠে। ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর কুমিল্লায় পৌঁছালে কুমিল্লা শহরে শোকের ছায়া নেমে আসে। বাড়ি বাড়ি কালো পতাকা উত্তোলন করা হয়। সবাই কালো ফিতা ধারণ করে। ২২শে ফেব্রুয়ারি সকাল আটটায় টাউন হল লোকে লোকারণ্য হয়ে পড়ে। ভিক্টোরিয়া কলেজ থেকে বিরাট মিছিল বের হয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। এই মিছিলে কুমিল্লার ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেন। সেই সময় ফয়জুন্নেছা বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের ছাত্রী লায়লা রহমানের স্মৃতিচারণ থেকে ছাত্রীদের ভূমিকার উজ্জ্বল চিত্র পাওয়া যায়:

> .... ফয়জুন্নেসা ছিল কুমিল্লাতে নামকরা স্কুল, ছাত্রী সংখ্যাও বেশি। ছাত্ররা স্কুলের সামনে শ্লোগান দিতে লাগল-বোনেরা আমার, ঢাকাতে আমাদের ভাইয়েরা গুলিবিদ্ধ হয়েছে, তাদের রক্তে রাজপথ রঞ্জিত। আমরা এর প্রতিবাদ করছি, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, বাংলা চাই, বাংলা চাই, মায়ের মুখের ভাষা কেড়ে নেওয়ার বৃথা আশা। ইতিমধ্যে দারোয়ান গেটে তালা দিয়েছে, শ্রেণীকক্ষ থেকে বাইরে আসার সাহস কারো নাই। আমি সেদিন অসুস্থ থাকায় স্কুলে যাইনি। এরপর কি ভেতরে বসে থাকা সম্ভব? দৌড়ে গেটের কাছে এলাম ততক্ষণে যেভাবেই হোক কিছু ছাত্রী বাইরে বের হয়ে এসেছে।

> আমাকে পথ আগলে দাঁড়ালেন মেট্রোন খালাম্মা। গেটে তালা। আমার ভেতরটা তখন দাউদাউ করে জ্বলছে। গেটের পাশেই ছিল একটা কাঠগোলাপের কাছ। আমি তরতর করে ঐ গাছ বেয়ে দেয়ালে উঠলাম। আর চোখের পলকে দেয়ালের ঐ পাড়ে চলে গেলাম। স্কুলের পুকুর পাড়ের দিকে একটু জায়গা বেড়া ভাঙ্গা ছিল, আমি ঐ পথে স্কুলে ঢুকলাম এবং সবার বাধা অগ্রাহ্য করে মাঠের মধ্যে চিৎকার করে সবাইকে বাইরে আসতে বললাম, তারা কি তখন আর আটকা থাকে? সবাই মাঠে নেমে এলো। এবং ঐ ভাঙ্গা বেড়ার ফাঁক দিয়ে যেদিকে পারল বের হয়ে গেল। তারপর দেখা গেল অনেক ছাত্র-ছাত্রীই রাস্তায় নেমে পড়েছে (সিদ্দিকী, ২০১৫, পৃ. ৮৭)।

পরবর্তী সময়ে মিছিলটি শৈলরাণী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে স্লোগানরত ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে সারা শহর প্রদক্ষিণ করে। ভিক্টোরিয়া কলেজের ছাত্রনেতৃবৃন্দ মেয়েদের নিরপত্তার জন্য সর্তক ছিলেন। বিকেলে অভিভাবকদের কাছে তাদের মেয়েদের বুঝিয়ে দেওয়া হয়। কোনো কোনো মেয়েকে বাড়ি পৌঁছিয়ে দেওয়া হয়েছিল। লায়লা রহমানের স্মৃতিচারণ থেকে আরও জানা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারিতে ঢাকায় ছাত্রহত্যার খবরে ফয়জুন্নেছা স্কুলের হোস্টেলের কোনো ছাত্রী ভাত খায়নি। ভাতসহ থালা ছুড়ে ফেলে দিয়েছিল। রাতে হোস্টেলের মধ্যেই মিছিল করে স্লোগান দিয়েছিল (সিদ্দিকী, ২০১৫)। এছাড়াও ২৫শে ফেব্রুয়ারি কুমিল্লা ভিক্টোরিয়া কলেজের দ্বিতীয় বর্ষের ছাত্রী মিস সাবিহা খাতুনের সভাপতিত্বে কুমিল্লার স্কুল কলেজের ছাত্রীদের এক সভা হয়। সভায় ঢাকার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয় (*আজাদ*, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। কুমিল্লায় একুশে উদ্‌যাপনেও নারীর ভূমিকা ছিল। ১৯৫৩-৫৪ সালে একুশে উদ্‌যাপনে অংশগ্রহণ করেন ফাতেমা খায়ের, ফরিদা মীর্জা এবং ছালেহা খাতুন।

ব্রাহ্মণবাড়িয়া

বায়ান্ন সালের ভাষা আন্দোলনে ব্রাহ্মণবাড়িয়ায় স্বাভাবিকভাবেই তৎপরতা বেশি ছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল দশটা থেকে স্থানীয় শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোর ছাত্র-ছাত্রীরা একটি শোভাযাত্রা বের করেন, সেখানে উল্লেখযোগ্য হারে ছাত্রীদের অংশগ্রহণ লক্ষ করা যায় (সাকী, ২০০০)। ভাষা আন্দোলনে স্থানীয় সরোজিনী গার্লস স্কুলের ছাত্রীদের ভূমিকা স্মরণীয় হয়ে আছে। এই স্কুলের দশম শ্রেণির ছাত্রী কবি আবদুল কাদিরের কন্যা সুলতানার নেতৃত্বে স্কুলের অন্য ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন কর্মসূচিতে অংশগ্রহণ করেন (রফিক, ২০১৯)। সুলতানা মিছিল নিয়ে কলেজ-মাঠ প্রাঙ্গণে আসতে চাইলে কর্তৃপক্ষের বাধার সম্মুখীন হন। এ সময় তিনি অন্য ছাত্রীদের সঙ্গে নিয়ে গেট ভেঙে কলেজ-মাঠে উপস্থিত হয়েছিলেন। এছাড়া আম্বিয়া খাতুন, হোসনে আরা খান, রওশন আরা হেনা, রহিমা খাতুন, মোহসেনা বেগম, নূরজাহান বেগমসহ অনেক ছাত্রী ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন।

ফেনী

২১শে ফেব্রুয়ারি ফেনীতে মিছিল, ধর্মঘট ও সমাবেশ শান্তিপূর্ণভাবে হয়। কিন্তু ঐ দিন রাতে ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের মিছিলে পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত হওয়ার খবর আসার পরিপ্রেক্ষিতে পরদিন 'ছাত্র হত্যার বিচার চাই', 'খুনী নুরুল আমিনের কল্লা চাই' স্লোগানে ফেনী শহর প্রকম্পিত হয়ে ওঠে এবং সর্বত্র স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন ফেনী বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীগণও আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন (আহমদ, ২০০০)।

টেকনাফ

পঞ্চাশের দশকের যাতায়াত ব্যবস্থার বিবেচনায় টেকনাফ দুর্গম এলাকা হিসেবে গণ্য হতো। সরাসরি টেকনাফ-কক্সবাজার কোনো সড়ক যোগাযোগ ছিল না, যাতায়াতের একমাত্র উপায় ছিল জলপথ ও জলযান। টেকনাফের মতো অনুন্নত, দুর্গম অঞ্চলেও ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনের মিছিলে অংশগ্রহণ করে, যখন সেখানে কোনো হাইস্কুলও ছিল না। এ ঘটনা এতটাই সাড়া ফেলেছিল যে, সংবাদ প্রতিবেদনে সংবাদ-শিরোনাম হয়েছিল, 'টেকনাফে মিছিল করেছিল ছাত্রীরা' (রফিক, ২০১৯)।

রাজশাহী বিভাগ

রাজশাহী

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি রাজশাহীতে দিনব্যাপী হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন বিকেলে ভুবন মোহন পার্কে ডা. এস. এম এ গাফ্ফারের সভাপতিত্বে এক জনসভা হয়। এই জনসভায় জাহানারা বেগম, 'বিচারপতি তোমার বিচার করবে যারা– আজ জেগেছে সেই জনতা' গানটি পরিবেশন করেন (হক, ১৯৯৫)। ২১শে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের ঘটনা রাজশাহীতে ছড়িয়ে পড়লে ২২শে ফেব্রুয়ারি আতাউর রহমানের নেতৃত্বে রাজশাহীতে হরতাল, বিক্ষোভ-মিছিল এবং প্রতিবাদ-সভার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরের দিনের মিছিল এবং প্রতিবাদ-সভায় নারীদের অংশগ্রহণের জন্য হাফিজা বেগম, ফিরোজা বেগম, হাসিনা বেগম, খুকু এরা সকলে মিলে একটি পালকি-গাড়িতে করে মাইকের পরিবর্তে চোঙ্গা নিয়ে প্রচারণায় বের হন (বানু, ২০০৪)। ২২শে ফেব্রুয়ারি বিরাট প্রতিবাদ মিছিল বের হলে সেই মিছিলে ছাত্রীরাও অংশগ্রহণ করেন। ছাত্রীদেরকে মিছিলে অংশগ্রহণ করানোর ক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন পি. এন. গার্লস স্কুলের নবম শ্রেণির ছাত্রী মনোয়ারা বেগম। মনোয়ারা বেগম স্বৈরাচারী শাসকের বিরুদ্ধে এবং মিছিলে গুলিবর্ষণের বিরুদ্ধে বক্তৃতা দিয়ে ছাত্রীদেরকে বুঝিয়ে মিছিলে অংশ নেওয়ার জন্য একত্র করার চেষ্টা করেন। তার কথা শুনে ক্লাস বর্জন করে ছাত্রীরা মিছিলে অংশ নেন। মিছিল পরিচালনায় সহযোগিতা করেন দশম শ্রেণির ছাত্রী হাফিজা বেগম টুকু, জাহানারা বেগম, মহসিনা বেগম ও অন্যরা। শিক্ষক-শিক্ষিকারা আন্দোলনের পক্ষেই সমর্থন দেন। শিক্ষিকাদের মধ্যে ছিলেন প্রধান শিক্ষিকা নূরমহল খাতুন, হাজেরা বেগম, মনসুরা বেগম, মিনতি, স্নেহ, গীতা, হালিমা, নিরুপমা প্রমুখ। লম্বা মিছিলটি স্কুল থেকে বেরিয়ে সাগরপাড়া ঘুরে কল্পনা হল হয়ে আলুপট্টির মোড় ঘুরে জুবিলী স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীদের নিয়ে ভুবনমোহন পার্কে যায়। সেখানে গিয়ে অন্যান্য ছাত্রের সাথে বক্তব্য দিয়েছিলেন মনোয়ারা বেগম, ডা. মহসিনা বেগম প্রমুখ। এ বিষয়ে ভাষাসংগ্রামী আখতার বানুর স্মৃতিচারণ:

> পার্কের খোলা বাঁধানো মঞ্চে ছাত্র ভাইদের সাথে জ্বালাময়ী ভাষায় বক্তৃতা দিলেন মনোয়ারা আপা, মহসিনা আপা। কি তীব্র ঝাঁজালো সেই বক্তৃতার কথা। ঢাকায় গুলিবিদ্ধ শহীদ ভাইদের নিহত হবার খবর, পুলিশী নির্যাতন আর তৎকালীন শাসকদের অন্যায় অত্যাচারের বর্ণনা শুনে বুকের ভেতরটায় যেন কষ্টের ঝর্ণা ধারা থেকে ফোঁটায় ফোঁটায় পানি ঝরে বুক ভেজাতে লাগলো। সব কথা বুঝিনা, অত শক্ত শক্ত কথার মানেও জানি না, কিন্তু অবুঝ এক ভাবাবেগ মনটাকে অনবরত দলিত মথিত করতে লাগলো। জাহানারা বেগমের কণ্ঠস্বরও সকলকে কাঁপিয়ে কাঁপিয়ে একাকার করে তুললো (বানু, ১৯৯৯, পৃ. ১০৬)।

রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনের একটি উল্লেখযোগ্য দিক আন্দোলনে নারীর ব্যাপক অংশগ্রহণ। মিছিল, সভা ও সংগঠনে উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছিলেন জাহান আরা বেগম, বেগম মনোয়ারা রহমান, মোহসিনা

বেগম, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম, রওশন আরা, খুরশীদা বানু, ফিরোজা বেগম, ফুলু, নুরমহল খাতুন, হাজেরা, আবেদা, মিনতি, স্নেহ, গীতা, মনোয়ারা বেগম, হাসনা বেগম, হালিমা, মনসুরা, নিরুপমা, সারা খন্দকার, বীণাপাণি বসাক, আরজু, জুলেখা বেগম, আখতার বানু (ইসলাম, ২০০০)। রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে নারীদের সরব এবং সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। রাজশাহীর অন্যতম ভাষাসংগ্রামী আব্দুর রাজ্জাক এ প্রসঙ্গে বলেন, ''নারীরা মিটিং মিছিলে অংশগ্রহণ করত এবং আর্থিক অনুদান সংগ্রহেও তারা ভূমিকা রেখেছে। তাদের বড় ভূমিকা ছিল চিঠি আদান প্রদানে। তারা কুরিয়ার হিসেবেও কাজ করেছে। তাদের অংশগ্রহণ ছিল প্রগতির সপক্ষে একটি বড় পদক্ষেপ। পরবর্তী আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণের সহায়ক শক্তি হিসেবে এটি কাজ করেছে'' (কবির, ২০১৮, পৃ. ১২৫)।

রাজশাহীতে আন্দোলন সংগঠন থেকে শুরু করে পোস্টার তৈরি ও বিতরণ, অর্থ-সংগ্রহ, সংবাদ আদান-প্রদান, মিটিং মিছিলে যোগদান ইত্যাদি কাজে নারীগণ সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। রাজশাহী সিটি কর্পোরেশনের উদ্যোগে নির্মিত রাজশাহীতে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের নামফলকে নারী ভাষাসংগ্রামীদের মধ্যে জাহানারা বেগম বেগু, মহসিনা বেগম, জেরিনা বেগম, কুলসুম বেগম, মনোয়ারা বেগম, হাফিজা বেগম টুকু, হাসিনা বেগম ডলি এবং রওশন আরা খুকুর নাম পাওয়া যায় (স্মৃতিফলক, ২০০৫)।

নাটোর

নাটোরে ভাষা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন বেগম শামসুন্নাহার। তাঁর নেতৃত্বে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নাটোরে 'মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতি' গঠন করা হয়। সমিতির উদ্যোগে নাটোরের বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে এবং প্রকাশ্য মাঠে জনসভার আয়োজন করে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে জনমত গড়ে তোলা হয়। ঢাকায় ছাত্রদের মিছিলে গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে নাটোর 'মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতি'র উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি এক বিরাট মিছিল, বিক্ষোভ প্রদর্শন করে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। পরবর্তী সময়ে চৌধুরী সাহেবের মাঠে বেগম শামসুন্নাহারের সভাপতিত্বে এক সভা হয়। সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি করা হয়। এই সংবাদ *দৈনিক আজাদ* পত্রিকায় প্রকাশিত হয়:

> নাটোর, ২৯ ফেব্রুয়ারি। ঢাকায় গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে নাটোর মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতির উদ্যোগে অদ্য এক বিরাট মিছিল বিক্ষোভ প্রদর্শন করতে করতে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। অতঃপর বেগম শামসুন্নাহার সাহেবার সভানেতৃত্বে চৌধুরী সাহেবের মাঠে এক সভা হয়। সভায় বক্তৃতাদির পর গুলিবর্ষণ সম্পর্কে নিরপেক্ষ তদন্ত ও দায়ী ব্যক্তিদের বিচার এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা দানের দাবি করা হয়। (*আজাদ*, ১লা মার্চ ১৯৫২)

নাটোরে আগে থেকেই বিভিন্ন সেবামূলক কাজের জন্য বেগম শামসুন্নাহারের গ্রহণযোগ্যতা ছিল। তাই তার আহ্বানে নাটোরের নারীরা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে স্বতঃস্ফূর্তভাবে এগিয়ে এসেছিলেন। তার সাথে অন্য যারা ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন তাদের মধ্যে ছিলেন আনোয়ারা খাতুন, জাহানারা বেগম, সালেহা খাতুন প্রমুখ। এদের সবাই 'নাটোর মহিলা ভাষা আন্দোলন সমিতি'র সদস্য ছিলেন (সাদিয়া, ২০১৬)। এছাড়া নাটোরের ভাষা আন্দোলনে নাটোর গার্লস হাই স্কুলের (বর্তমানে সরকারি বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়) ছাত্রীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ লক্ষণীয়। ক্লাস বর্জন এবং মিছিলে অংশগ্রহণের মাধ্যমে ছাত্রীরা ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত ছিলেন (রফিক, ২০১৯)।

ঈশ্বরদী

ঢাকার ছাত্র-মিছিলে গুলিবর্ষণের খবর পাবনায় আসলে ঈশ্বরদীর ছাত্রনেতাদের মধ্যে ব্যাপক প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। এই ঘটনার প্রতিবাদে তারা স্কুলের সকল ছাত্রদের একত্র করে বর্তমান খবিরের চায়ের দোকানের মোড়ে একটি পুরানো বটগাছের নিচে এক সমাবেশের আয়োজন করেন। সমাবেশ শেষ করে মিছিল করে বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ে গিয়ে ছাত্রীদের ক্লাস বর্জনের আহ্বান জানানো হয়। ছাত্রীরাও তাদের সাথে একাত্মতা প্রকাশ করেন। আন্দোলনে যেসব ছাত্রী সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন, তাদের মধ্যে সুফিয়া বেগম, জাহানারা প্রধান, নূরজাহান বেগম, হালিমা খাতুন, রাবেয়া খাতুন এর নাম উল্লেখযোগ্য (চাদু, ২০০০)।

বগুড়া

ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই বগুড়া সংশ্লিষ্ট ছিল। ১৯৫২ সালের ২৮শে ফেব্রুয়ারি বগুড়ায় স্থানীয় উচ্চবিদ্যালয় ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা মিছিল ও বিক্ষোভ সভার আয়োজন করে। বগুড়ায় নারীদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বে ছিলেন রহিমা খাতুন ও সালেহা খাতুন (খোকন, ২০০০)। কবি আতাউর রহমানকে আহ্বায়ক করে গঠিত 'বাংলা ভাষা সংগ্রাম কমিটি'র সদস্য ছিলেন তারা। ভাষা আন্দোলনে তাদের ভূমিকা বিষয়ে গাজীউল হকের স্মৃতিচারণ:

> পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিতের পর মুসলিম পরিবার থেকে এ দু'জন ছাত্রীর দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা সেদিন বগুড়াবাসীকে বিস্মিত না করে পারেনি। রহিমা খাতুন সম্পর্কে একটি কথা না বলে পারছি না। তিনি যখন আমাদের এ কমিটির বৈঠকে উপস্থিত হলেন তখন তার সম্পর্কে সংশয়হীন হওয়ার জন্য আমরা তার অভিভাবক ডাক্তার মুজাফফর রহমানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করি। মুজাফফর সাহেব আমাদের কথা শুনে বললেন, 'বাংলা ভাষা আন্দোলনের জন্য আমার বোন সংগ্রাম কমিটির সদস্য হয়েছে এতে আমি গর্ববোধ করছি' (হক, ১৯৯৯, পৃ. ৮৯-৯০)।

তাদের এই সাহসী পদক্ষেপ অন্য নারীদের ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণে অনুপ্রাণিত করেছিল।

সিরাজগঞ্জ

বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে পিছিয়ে ছিলেন না সিরাজগঞ্জের নারীরাও। সিরাজগঞ্জ ভাষা আন্দোলন কমিটির তত্ত্বাবধায়নে সালেহা ইসহাক স্কুলের ছাত্রী বিজলী, মেহের নিগার প্রমুখ ছাত্রীর নেতৃত্বে সিরাজগঞ্জে প্রথম ছাত্রীদের মিছিল হয় (জিন্নাহ, ২০০০)। ২২শে ফেব্রুয়ারি থেকে ২৬শে ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সিরাজগঞ্জে যে প্রতিবাদ মিছিল হতো তাতে প্রতিদিনই সালেহা ইসহাক স্কুলের ছাত্রীরাও অংশ নিতেন (আলীম, ২০১৮)। ভাষা আন্দোলন অব্যাহত রাখতে তহবিল সংগ্রহের কাজেও সম্পৃক্ত ছিলেন সিরাজগঞ্জের নারীরা। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'শহিদ স্মৃতি অমর হোক' ব্যাজ ছাপিয়ে বিক্রি করতেন তারা। এদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য ছিলেন ইরা (ডা. মোস্তফা নূরুল ইসলামের স্ত্রী), হেনা (আমির হোসেন উকিলের মেয়ে), বিজলী (শামসুজ্জোহা মল্লিক উকিলের মেয়ে), মনিকা (খোরশেদ আলমের বোন), মেহের নিগার (আবুল মনসুর নূরে এলাহীর মেয়ে) (খান, ২০১১)। অর্থাৎ অর্থ সংগ্রহ থেকে শুরু করে মিছিল, ধর্মঘট সকল ক্ষেত্রেই সিরাজগঞ্জের নারীদের সক্রিয় অংশগ্রহণ লক্ষণীয়।

রংপুর বিভাগ

রংপুর

রংপুরের ঐতিহ্যবাহী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান রংপুর কারমাইকেল কলেজ থেকেই রংপুরে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়। বাংলা ভাষা প্রতিষ্ঠার দাবিতে মিছিল কারমাইকেল কলেজ ছেড়ে শহর অভিমুখে যাত্রা করলে শহরের অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্রছাত্রী, শিক্ষক এবং জনসাধারণ এতে যোগদান করেন। আন্দোলনের এক পর্যায়ে রংপুরে ভাষা আন্দোলনের সংগঠক অধ্যাপক গোলাম আযম এবং অধ্যাপক জমিরউদ্দিন আহম্মেদকে গ্রেফতার করা হয়। তাদের গ্রেফতারের খবরে রংপুরের ছাত্র-জনতা বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কারমাইকেল কলেজ ক্যাম্পাসে প্রতিবাদ সভার আয়োজন করা হয়। এই সভায় অন্যদের সাথে বক্তব্য প্রদান করেছিলেন মিলি চৌধুরী এবং নীলুফার বানু ডলি (ভৌমিক, ২০১১)। সভার পরপরই কলেজ থেকে ছাত্র, শিক্ষক, জনতার একটি বিশাল মিছিল শহর অভিমুখে যাত্রা করে। মিছিলটি যখন জেলা জজ কোর্টের সামনে পৌঁছল, সেই মুর্হূতে জজ সাহেব ইংরেজিতে একটি মামলার রায় ঘোষণা করছিলেন। তখন মিলি চৌধুরী এজলাসে প্রবেশ করেন এবং চিৎকার করে বললেন ইংরেজিতে নয়, বাংলায় রায় ঘোষণা করতে হবে। এক পর্যায়ে তিনি জেলা জজ সাহেবের হাত থেকে কলম কেড়ে নিয়ে তা ভেঙে ফেলেন। এ ঘটনায় জেলা জজসহ এজলাসের সবাই কিংকর্তব্যবিমূঢ় হয়ে পড়েন (ভৌমিক, ২০১১)। ২৭শে ফেব্রুয়ারি পাটগ্রাম হাইস্কুল এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রীগণ শোভাযাত্রা বের করে এবং 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'গুলি বর্ষণের তদন্ত চাই', 'আটক ছাত্রদের মুক্তি চাই' স্লোগান দিতে দিতে বন্দরের চতুর্দিক প্রদক্ষিণ করে। মিলি চৌধুরী ছাড়া রংপুরের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের মধ্যে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছিলেন মাসুদা চৌধুরী এবং মিসেস ডলি (ইসলাম, ১৯৯৬)। এছাড়া নেপথ্যে থেকে যারা সবরকম সাহায্য, সহযোগিতা ও পৃষ্ঠপোষকতা দান করেছেন তাদের মধ্যে বেগম আফতাবুন্নাহারের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য (ইসলাম, ১৯৯৯)। ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করেই রংপুরে একটি প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক গোষ্ঠী গড়ে উঠেছিল। সাহিত্য-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের মাধ্যমে তারা ছাত্রছাত্রী এবং জনসাধারণকে প্রতিনিয়ত উৎসাহিত করেছেন। এই সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালনায় যে সকল নারী অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন সাজেদা রহমান, শামিমা জামান, মিসেস ডলি, মিসেস মিলি চৌধুরী, প্রতিভা সমাদার, চিত্রা দাসগুপ্তা প্রমুখ (ইসলাম, ১৯৯৬)। তাদের পরিচালিত সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডই জনসাধারণের মাঝে ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনাকে ধারণ করতে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল।

নীলফামারী

১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি নীলফামারীতে ভাষা আন্দোলন শুরু হয়। নীলফামারী উচ্চ বিদ্যালয় এবং নীলফামারী বালিকা উচ্চ বিদ্যালয়ের প্রায় সব ছাত্রছাত্রী ধর্মঘট, মিছিল-মিটিংয়ে অংশ নেয়। এই দিনেই নীলফামারীর ইতিহাসে ছাত্রীরা প্রথমবারের মতো প্রকাশ্য মিটিং-মিছিলে অংশগ্রহণ করে (নিখিল, ২০১১)। ৭ই ফেব্রুয়ারি নীলফামারীতে হরতাল পালিত হয়। জনসাধারণ এবং ছাত্রছাত্রীরা বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানিয়ে মিছিলসহ শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে জাকিউল আলমের সভাপতিত্বে জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। জনসভায় অন্যদের সাথে বক্তব্য রাখেন সুফিয়া, রাহেলা এবং ফিরোজা বেগম (ইসলাম, ১৯৯৯)। সম্পূর্ণ ফেব্রুয়ারি মাসেই ধর্মঘট, বিক্ষোভ-মিছিল এবং সমাবেশ অব্যাহত থাকে। সকল কর্মসূচিতেই উল্লেখযোগ্য হারে নারীরা অংশগ্রহণ করেছিল।

গাইবান্ধা

রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে গাইবান্ধার জনগণ ১৯৪৮ সাল থেকে তেমন সক্রিয় না হলেও সীমিত আকারে ভাষা আন্দোলনে জড়িয়ে পড়ে। ১৯৫২ সালে গাইবান্ধায় ভাষা আন্দোলন সক্রিয় রূপ লাভ করে। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে পূর্ণ হরতাল পালিত হয়। সকাল থেকেই শহরের সমস্ত দোকানপাট বন্ধ থাকে। স্থানীয় স্কুল, কলেজ এবং বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্র-ছাত্রীগণ ধর্মঘট পালন করে। সকাল এগারটায় প্রায় পনেরশত ছাত্র-ছাত্রীর এক শোভাযাত্রা বিভিন্ন স্লোগান দিতে দিতে শহর প্রদক্ষিণ করে (*আজাদ*, ২৭ শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২)। গাইবান্ধায় ভাষা আন্দোলনের সাথে যে-সকল নারী সম্পৃক্ত ছিলেন তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন দৌলতননেছা খাতুন (তোতা, ২০০০)।

পঞ্চগড়

তৎকালীন জনবিরল পঞ্চগড়েও ভাষা আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল। তবে ছাত্রসমাজ সূচিত এই ভাষা আন্দোলন শান্তিপূর্ণ ধর্মঘট, মিছিল, সভা এবং কখনো পিকেটিং এ সীমাবদ্ধ ছিল। পঞ্চগড়ে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদানকারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন রেজিয়া খাতুন (সাজ্জাদ, ২০১১)।

খুলনা বিভাগ

খুলনা

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ প্রদেশব্যাপী যে সাধারণ ধর্মঘটের ডাক দেওয়া হয়েছিল তখন থেকেই খুলনায় ভাষা আন্দোলনের সূচনা হয়েছিল। এই উপলক্ষ্যে মুসলিম ছাত্রলীগ, ছাত্র ফেডারেশন, ছাত্র কংগ্রেস ও কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের প্রতিনিধিদের মধ্যে বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে একটি প্রচারপত্র তৈরি করা ও পুরানো খবরের কাগজে আলতা দিয়ে পোস্টার লেখার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়। পরবর্তীসময়ে যে প্রচারপত্রটি ছাপা এবং বিতরণ করা হয়েছিল তাতে বাংলা ভাষা সমর্থনকারী যেসব সংগঠনের নাম ছিল তাদের মধ্যে অন্যতম ছিল মহিলা আত্মরক্ষা সমিতি (বিশ্বাস, ২০০০)। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনে ছাত্রীদের মধ্যে যারা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন তারা হলেন আনোয়ারা খাতুন, রেবা, লুৎফুননাহার, ফাতেমা চৌধুরী, রাবেয়া খাতুন, সাজেদা হেলেন, কৃষ্ণাদাস, সুফিয়া আলী প্রমুখ (কবির, ২০১৮)।

ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়েও খুলনায় নারীদের উল্লেখযোগ্য অংশগ্রহণ ছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি খুলনা করোনেশন গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা নিজেদের উদ্যোগে স্কুলের দেয়ালে বাংলা ভাষার পক্ষে হাতে লিখে পোস্টার লাগান। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকার মিছিলে গুলিবর্ষণ ও ছাত্র হত্যার খবর ২২শে ফেব্রুয়ারি খুলনায় আসলে খুলনায় ভাষা আন্দোলনে নতুন মাত্রা যুক্ত হয়। খুলনার ছাত্রী সমাজও এই সময় ভাষা আন্দোলনে তৎপর হয়ে ওঠেন। এই সম্পর্কে খুলনার করোনেশন গার্লস স্কুলের ছাত্রী নেত্রী রোকেয়া মাহবুব শিরি বলেন:

> ২২ ফেব্রুয়ারি স্কুলে এসে জানতে পারি যে, সালাম, রফিক, বরকতসহ বেশ কয়েকজন ছাত্র জনতা ২১ ফেব্রুয়ারি ঢাকার পুলিশের গুলিতে শহীদ হয়েছেন। এই কথা শোনোর পর স্কুলের ছাত্রীরা কালো ব্যাজ ধারণ করার সিদ্ধান্ত নেয়। কিন্তু কোথাও কালো কাপড় পাওয়া যাচ্ছিল না। লাইলী নামে একজন ছাত্রী কালো কাপড় পরে স্কুলে এসেছিল। ছাত্রীরা তখন অন্য শাড়ী এনে তাকে পরতে দেয়। আর তার কালো শাড়ী কেটে ব্যাজ বানিয়ে ছাত্রীরা ধারণ করে (বিশ্বাস, ২০০০, পৃ. ২১১)।

২৩শে ফেব্রুয়ারিও রাষ্ট্রভাষার দাবিতে খুলনায় হরতাল, প্রতিবাদ-সভা এবং মিছিল হয়। মাজেদা আলী, আনোয়ারা বেগম, রোকেয়া খাতুন (শিরি), লুৎফুন নাহার (হেলেন), রাবেয়া, কৃষ্ণা, ফরিদা মজুমদার, খায়রুল নাহার বেবী প্রমুখ ছাত্রী নেতৃবৃন্দের নেতৃত্বে এই মিছিলে প্রায় ৫/৬শ ছাত্রী অংশ নেন। এটা ছিল শহরে মেয়েদের প্রথম মিছিল (মিয়া, ২০১০)। এ বিষয়ে আন্দোলনের অন্যতম নেত্রী আনোয়ারা বেগম লিখেছেন:

> ... তখন খুলনায় একটিই মাত্র মেয়েদের কলেজ ছিল। খুলনা মহিলা কলেজের নাম ছিল আর কে গার্লস কলেজ। সর্বমোট আইএ, বিএ ক্লাসের ছাত্রী মিলে ছিল পয়ত্রিশ জনের মত। আমরা বিএ ক্লাসের ছাত্রী ছিলাম। মেয়েদের জন্য হাইস্কুল ছিল করোনেশন গার্লস হাইস্কুল আর রেলওয়ে বি আর সিং গার্লস স্কুল। আমরা মেয়েদের নিয়ে ক্লাস বর্জন করে মিছিল করি। বি আর সিং গার্লস স্কুলের শিক্ষয়িত্রীগণ আমাদেরকে সহায়তা করেন। বাধা দেন করোনেশন গার্লস স্কুলের হেড মিস্ট্রেস তসলিমা আবেদ। তসলিমা আপার সাথে আমাদের কথা কাটাকাটি হয়। তিনি পুলিশের ভয়ও দেখান। আমরা মেয়েদের বের করে আনতে সমর্থ হই (বেগম, ১৯৯২,পৃ. ৪৪)।

ঐদিন দিনের বেলায় প্রকাশ্যে সরকারবিরোধী পোস্টারও লাগানো হয়। ঐদিন ছাত্রীদের মিছিল সম্পর্কে আর. কে মহিলা মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী মাজেদা আলীর স্মৃতিচারণ:

> দু'জন করে সারিবদ্ধভাবে পোষ্টার হাতে পি.টি. আই স্কুলের মোড় থেকে মহেন্দ্র হীল (বর্তমান বাংলাদেশ ব্যাংকের মোড়) পর্যন্ত (পুরা আহসান আহমেদ রোড) মিছিলটি লম্বা হয়েছিল। রত্না ও কৃষ্ণা শ্লোগান বলার জন্য বড় বড় চোঙা যোগাড় করেছিল। শ্লোগানের ভাষা ছিল 'নুরুল আমিন গদি ছাড়ো', 'রাষ্ট্র ভাষা বাংলা চাই', 'শহীদের রক্ত বৃথা যেতে দেব না', 'ফ্যাসিষ্ট শাহী গদি ছাড়ো', 'রাষ্ট্রভাষা উর্দু কিছুতেই মেনে নেবো না' ইত্যাদি (আলী, ২০১৯)।

মিছিলটি আহসান আহমদ রোড, যশোর রোড, পিকসার প্যালেসের মোড় ঘুরে এসে তৎকালীন মহিলা পার্ক মহেন্দ্র হিলে আসে। মহেন্দ্র হিলে ছাত্রী নেতৃবৃন্দের বক্তৃতার মাধ্যমে মিছিল এবং সভা শেষ হয়। এ মিছিল শহরে বিশেষ সাড়া জাগায়। রাস্তার দুই পাশের মানুষ তাদের করতালি দিয়ে উৎসাহিত করে।

২৩শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে এম. এ. গফুরের সভাপতিত্বে মিউনিসিপ্যাল পার্কে বিরাট জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি এম. এ. গফুরকে আহ্বায়ক করে খুলনায় সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি গঠন করা হয় এবং কমিটির উদ্যোগে হরতাল ও জনসভা অনুষ্ঠিত হয়। ধীরে ধীরে আন্দোলন খুলনার মফস্বল এলাকাতেও ছড়িয়ে পড়ে। ১৯৫৩ সালের ভাষা দিবসেও খুলনার মেয়েরা পৃথকভাবে মিছিল করে পার্কে একত্র হয়ে সভা করে। সভায় বক্তৃতা করেছিলেন রোকেয়া মাহবুব শিরি। এ প্রসঙ্গে তিনি বলেন:

> ১৯৫৩ সালে যখন আবার একুশে ফেব্রুয়ারি এসেছে তখন মেয়েরা খুব স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করেছে। আলতা দিয়ে ফেস্টুন লিখেছিল, ব্যাজ পরিধান করেছিল। অনেককে বাড়ী থেকে আসতে দিতে চায় নি। তারা ভোর রাতে উঠে চলে এসেছে। স্কুলের সামনে এসে মেয়েরা জড়ো হয়েছিল কিন্তু স্কুলের দরজা বন্ধ ছিল। ফলে হোস্টেল থেকে মই এনে স্কুলের দেয়াল পার করে মেয়েদের হোস্টেলে এনেছি। ফলে ১৯৫৩ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি মেয়েদের মিছিল খুব বড় হয়েছিল। অবশ্য মিছিল শুরু হলে অনেক অভিভাবক এসে মেয়েদের হাত ধরে মিছিল থেকে টেনে নিয়ে গেছে। এরপরও বহু মেয়ে মিছিলে অংশগ্রহণ করে। মিছিল করে লেডিস পার্ক গিয়ে আমরা ভাষা আন্দোলন

> সম্পর্কে সভা করি। মোটামুটি নেত্রী গোছের সবাই বক্তৃতা করে। আমিও বক্তৃতা দিয়েছিলাম (কবির, ২০১৮, পৃ. ১১৭)।

খুলনায় ভাষা আন্দোলনের সকল পর্যায়ে নারীদের তাৎপর্যপূর্ণ অংশগ্রহণ দেখতে পাই। সেই সময়ের সামাজিক রক্ষণশীলতা, পারিবারিক বাধা-নিষেধ সব কিছুকে অতিক্রম করে নারীরা ভাষার লড়াইয়ে অংশ নিয়েছিলেন।

বাগেরহাট

ভাষা আন্দোলনের গোড়ার দিকে এই এলাকার জনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা ছিল খুবই কম। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাদেশে ধর্মঘট আহ্বান করা হলে বাগেরহাটের স্কুল ও কলেজে (মুসলিম হাইস্কুল ব্যতীত) ধর্মঘট পালিত হয়। ১৯৫২ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি বাগেরহাটের স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা শোক মিছিল বের করেন। পিসি কলেজ সংলগ্ন তৎকালীন রামনারায়ণ পার্কে এসে বিভিন্ন স্কুল ও কলেজের ছাত্রছাত্রীরা সমবেত হন। দুপুরে সমাবেশ হয় এবং সেখানে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবি ছিল বক্তাদের মূল কথা (পিন্টু, ২০০০)।

সাতক্ষীরা

ভাষা আন্দোলনের সময় রাজধানীর সাথে সাতক্ষীরার সড়ক যোগাযোগ ছিল অনুন্নত। তাই ভাষা আন্দোলনের শুরুতে এই অঞ্চলের জনগণের অংশগ্রহণ ও সচেতনতা খুবই কম ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতিতেও সাতক্ষীরার ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ ছিল। সাতক্ষীরায় ভাষা আন্দোলনে নারীদের মধ্যে এগিয়ে এসেছিলেন স্কুল ছাত্রী গোলেরা বেগম ও সুলতানা চৌধুরী (বাসার ও ব্যানার্জী, ২০০০)।

যশোর

১৯৪৮ সালে যশোরে তীব্র আন্দোলন গড়ে ওঠে। যশোর থেকে বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে কুৎসা রটনার প্রথম প্রতিবাদ জানান মাইকেল মধুসূদন মহাবিদ্যালয়ের ছাত্রী, ছাত্র ফেডারেশন কর্মী হামিদা রহমান। তিনি যশোরে ভাষা আন্দোলনের নেতৃস্থানীয় একজন সংগঠক ছিলেন। ১৯৪৮ সালের ১৩ই মার্চ ভাষার দাবিতে যশোরবাসী চূড়ান্তভাবে সংগ্রামমুখর হয়ে ওঠেন। ঐদিন সকাল আটটার মধ্যেই কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে মিছিল বের হয়। ঐ মিছিলে মেয়েদের নেতৃত্ব দেন হামিদা রহমান। তাকে সাহায্য করেছিলেন রুবী আহমেদ এবং সুফিয়া খাতুন। এর বাইরে ঐদিন গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে শহরের ঝালাইপট্টি পতিতালয়ের মেয়েরা। পুলিশ এক পর্যায়ে এই এলাকাটি ঘিরে ফেললে প্রায় চল্লিশজন ছাত্রকে পতিতারা তাদের ঘরে লুকিয়ে রেখে বাইরে থেকে তালাবদ্ধ করে দেয় (আলম, ২০০০)। ভাষা আন্দোলনের প্রথম পর্যায়ে যশোর অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করলেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন এখানে তেমন ব্যাপকতা পায়নি। ২৩ এবং ২৪শে ফেব্রুয়ারি রাজনৈতিক দলগুলোর অনুষ্ঠিত সভায় ঢাকায় গুলিবর্ষণের ঘটনার তদন্ত দাবি করা হয় এবং বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয়। ২৮শে ফেব্রুয়ারি যশোর শহরে শহিদ দিবস পালিত হয়। ঐদিন সকাল দশটায় মধুসূদন কলেজ থেকে মিছিল বের হয় এবং মিছিল শেষে বেলা একটায় টাউন হল ময়দানে জনসভা হয় (আলম, ২০০০)। উক্ত শোভাযাত্রা এবং জনসভায় নারী শিক্ষার্থী ও সংস্কৃতিকর্মীদের উপস্থিতি ছিল।

নড়াইল

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি নড়াইলের আলমডাঙ্গা আতিকুজ্জামান হাইস্কুলে হরতাল পালিত হয়। ২২শে ফেব্রুয়ারি রূপগঞ্জ কলেজ থেকে একটি মিছিল বের হয়ে নড়াইলের দিলরুবা স্কুলের সামনে এসে স্কুলের ছাত্রীদের মিছিলে অংশগ্রহণ করার আহ্বান জানায়। এই মিছিলে রিজিয়া বেগম, বেবি, রবি, রুবি, শেফালী, বুলবুল প্রমুখ অংশগ্রহণ করেন (ভট্টাচার্য, ২০০০)।

কুষ্টিয়া

মফস্বল শহর কুষ্টিয়া ও তার পার্শ্ববর্তী এলাকাতেও ভাষা আন্দোলনের তৎপরতা দেখা যায়। ১৯৫২ সালের গোড়ার দিকে স্কুলছাত্রী শাহিদা খাতুন ভাষা প্রশ্নে কুষ্টিয়াবাসীকে ঐক্যবদ্ধ করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের খবর কুষ্টিয়ায় ছড়িয়ে পড়লে জনগণ বিক্ষুব্ধ হয়ে ওঠে। কুষ্টিয়ার বিভিন্ন স্থানে ২২ ও ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রতিবাদ-সভা, বিক্ষোভ মিছিল অনুষ্ঠিত হয়। ২৩শে ফেব্রুয়ারি বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। এই সকল আন্দোলনে ছাত্রীগণও অংশগ্রহণ করেন। এক্ষেত্রে অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিলেন কুষ্টিয়া ইংরেজি বালিকা বিদ্যালয়ের ছাত্রীবৃন্দ। ২৩শে ফেব্রুয়ারি তারা পূর্ণ হরতাল পালন করেন। শাহিদা খাতুনের সভপতিত্বে এক শোকসভায় ঢাকায় ২১শে ফেব্রুয়ারির মিছিলে ছাত্রছাত্রীদের উপর সরকারের দমননীতির তীব্র নিন্দা করা হয় এবং শহিদ ব্যক্তিদের আত্মীয়স্বজনের প্রতি সহানুভূতি জ্ঞাপন করা হয়। ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ২৮শে ফেব্রুয়ারি এবং ৫ই মার্চের আন্দোলনেও ছাত্রীগণ অংশগ্রহণ করেন (নিশির, ২০০০)।

চুয়াডাঙ্গা

১৯৪৮ এবং ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন চুয়াডাঙ্গাকেও স্পর্শ করেছিল। ১৯৫২ সালের ২রা জানুয়ারি রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে ৫০-৬০ জনের একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিল শেষে একটি সভা হয় এবং উক্ত সভায় বক্তব্য রেখেছিলেন উষা চ্যাটার্জী (আলাউদ্দিন, ২০০০)। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি টাউন হলে একটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার প্রয়োজনে আত্মদানের জন্য প্রস্তুত থাকতে বলা হয়। আন্দোলনে স্থানীয় গার্লস স্কুলের ছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে অংশগ্রহণ করে। ছাত্রীদের একটি মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে (রফিক, ২০১৯)। ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় গুলিবর্ষণের সংবাদ সংবাদপত্রের মাধ্যমে চুয়াডাঙ্গাবাসী জানতে পারেন। ২৩শে ফেব্রুয়ারি ভি. জে. স্কুল, গার্লস স্কুলসহ চুয়াডাঙ্গার ছাত্রছাত্রীদের নিয়ে বিশাল প্রতিবাদ-মিছিল বের করা হয়। ছাত্রীদের মধ্যে বেলা, পান্না, পাখি মিছিল পরিচালনায় অংশগ্রহণ করেন। ২৫শে ফেব্রুয়ারি চুয়াডাঙ্গায় ছাত্র ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্রছাত্রীরা স্বতঃস্ফূর্তভাবে এতে যোগদান করেন। মিছিল শেষে আলী হোসেনের আমবাগানে সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় বক্তৃতা দেন উষা চ্যাটার্জী, ইলা হক, বেলা, হেনা প্রমুখ। ২২শে মার্চ ভি. জে. স্কুলের ছাত্ররা একটি মিছিল নিয়ে গার্লস স্কুলে আসেন এবং ছাত্রীদের মিছিলে অংশগ্রহণ করতে আহ্বান জানান। রেবার নেতৃত্বে ছাত্রীরা মিছিলে যোগদান করেন। রেবা ছাড়াও ছাত্রীদের নেতৃত্বে ছিলেন রুবী, হেনা, আনোয়ারা, বেলী, বুলবুলি, পাখী, বেলা, পান্না প্রমুখ। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করায় বেলার লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়েছিল (আলাউদ্দিন, ২০০০)। চুয়াডাঙ্গার ভাষা আন্দোলনের মূল চালিকাশক্তি ছিল ছাত্রছাত্রীবৃন্দ আর আন্দোলনের কেন্দ্রবিন্দুতে ছিল ভি. জে. স্কুল ও গার্লস স্কুল।

বরিশাল বিভাগ

বরিশাল

বরিশালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা ১৯৪৮ সালে হলেও আন্দোলনে নারীরা অংশগ্রহণ করেন মূলত ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে অর্থাৎ ১৯৫২ সালে। বরিশালে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত নারীদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন বেগম শামসুন্নাহার, রাণী ভট্টাচার্য, হোসনে আরা বেগম (নিরু), মঞ্জুশ্রী সেন, আনজিরা বেগম, সবিতা সাহা, দিবা সরকার, হালিমা খাতুন, নূরজাহান, লুৎফা জাহান, মাহেনুর বেগম, মিসেস অবনিনাদ ঘোষ, বীণা ঠাকুর প্রমুখ। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বরিশালের অধিকাংশ শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে হরতাল পালিত হয়। ঐ দিন জগদীশ সারস্বত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষিকা রাণী ভট্টাচার্য ঐ স্কুলের ছাত্রীদের নিয়ে এক বিরাট মিছিল বের করেন। এ বিষয়ে রাণী ভট্টাচার্য বলেন, ''আসলে মনের মধ্যে গেঁথে গিয়েছিল বাংলাকেই রাষ্ট্রভাষা করতে হবে। আমরা যে ভাষায় কথা বলতে পারছি সেই ভাষা ছাড়া অন্য কোনো ভাষা রাষ্ট্রভাষা হবে, তা মেনে নিতে পারছিলাম না। তাই নিজের বিবেকের তাড়নায় সেদিন আমি আর এক শিক্ষিকা মঞ্জুশ্রী মিছিলে গিয়েছিলাম। সকলের নিষেধ থাকা সত্ত্বেও'' (সাদিয়া, ২০১৬, পৃ. ৭৮)। তাঁর স্মৃতিচারণ:

> ... ১৯৫২ সালে আমি তখন জগদীশ সারস্বত উচ্চ বালিকা বিদ্যালয়ের শিক্ষক। আমি শিক্ষকদের বললাম ২১ ফেব্রুয়ারির মিছিলে যোগ দিতে, কিন্তু কেউই সাহস পায়নি। আমি মেয়েদের নিয়ে স্কুল থেকে বের হয়ে গেলাম। তখন সদর গার্লস স্কুল সরকারি হয়নি। সে স্কুলের কাছে মিছিল নিয়ে গেলাম। কিন্তু তাদেরকে স্কুল হতে বের হতে দেয়নি। আমরা টাউন হল থেকে মিছিল করে কাঠপট্টি পর্যন্ত গিয়েছিলাম। বিরাট মিছিল। এগারটা থেকে পাঁচটা পর্যন্ত বিভিন্ন রাস্তায় মিছিল করেছি (কবির, ২০১৮, পৃ. ১২২)।

বরিশালের অন্যতম বৃহৎ এ মিছিলে বিভিন্ন এলাকা থেকে বিদ্যালয়ের ছাত্রছাত্রী এবং নারীরা অংশ নেয়। প্রায় বিশ হাজার ছাত্র-ছাত্রী এবং নারী-পুরুষের অংশগ্রহণে অনুষ্ঠিত এ মিছিলটি সমগ্র বরিশাল অঞ্চলে সাড়া ফেলতে সক্ষম হয়। মিছিলটি টাউন হল থেকে বের হয়ে বাজার রোড, বান্দ রোড, ক্লাব রোড, পুলিশ লাইন হয়ে বগুড়া রোড দিয়ে টাউন হলে এসে সমাপ্ত হয়। এ মিছিলে নারীদের নেতৃত্ব দিয়েছিলেন বেগম হামিদউদ্দিন এবং হোসনে আরা নিরু (আলী, ২০১১)।

২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র-জনতা হত্যার প্রতিবাদে বরিশাল শহরে বিরাট প্রতিবাদ মিছিল হয়। অশ্বিনী কুমার টাউন হলের সামনে ভোর হতেই ছাত্র-জনতা জড়ো হতে থাকে। গ্রাম হতে আগত জনতা ছাড়াও শহরের শত শত নারী বেগম শামসুন্নাহারের নেতৃত্বে প্রথম শোভাযাত্রা করেন। মিছিলের প্রথম দিকে ছিলেন মেয়েরা, তারপর সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ। বৃহত্তম এই মৌন মিছিলটি টাউন হল হতে শহরের বিভিন্ন রাস্তায় প্রদক্ষিণ করে সার্কিট হাউজ ময়দানে শেষ হয় (ফিরোজা, ২০০০)। ২২শে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন থেকেই সাধারণ নারীরা ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়েছিলেন। চাঁদা তুলে আন্দোলনকে এগিয়ে নিয়ে যেতে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছিলেন ছাত্রীরা। তাছাড়া বিভিন্ন স্কুল ও বাসায় গিয়ে নারীদেরকে সংগঠিত করে মিছিলে যোগদান করার জন্য উদ্‌বুদ্ধ করতেও তারা ভূমিকা রাখেন। এই ভাষা আন্দোলনের সময়েই প্রথম বারের মতো বরিশালের নারী-পুরুষ সম্মিলিতভাবে মিছিলে, আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেন।

ঝালকাঠি

ভাষা আন্দোলনের সময় ঝালকাঠিতে কোনো কলেজ না থাকায় স্কুলের ছাত্র-ছাত্রীবৃন্দই আন্দোলনের মূল চালিকা শক্তি ছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঝালকাঠি স্কুলগুলোতে হরতাল পালনের চেষ্টা করা হলেও তা সফল হয়নি। কিন্তু ঢাকার মিছিলে ছাত্রহত্যার খবর ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে ঝালকাঠিতে পৌঁছানোর সাথে সাথে উত্তেজিত ছাত্ররা বাইরে বেরিয়ে আসে। সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের নেতৃত্বে ঝালকাঠি সরকারি বালক বিদ্যালয় থেকে একটি মিছিল বের হয়। মিছিল বালিকা বিদ্যালয় পর্যন্ত পৌঁছালে ছাত্রদের কাছ থেকে ঢাকায় গুলিবর্ষণের খবর ছাত্রীরা পান এবং ষষ্ঠ শ্রেণির ছাত্রী লাইলী বেগমের নেতৃত্বে ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিলে যোগ দেন। বিক্ষোভ মিছিল উদ্‌বোধন বিদ্যালয়ের কাছে আসলে সেখান থেকেও ছাত্রছাত্রীরা মিছিলে অংশগ্রহণ করেন। মিছিল শেষে ঝালকাঠি বালিকা বিদ্যালয় মাঠে অনুষ্ঠিত সভায় বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি জানানো হয় (সরকার, ২০০০)।

মূল্যায়ন

ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই পূর্ব-বাংলার জনগণ জাতিরাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার প্রথম সোপান অতিক্রম করে। পাকিস্তানি শাসকের বিরুদ্ধে মাতৃভাষার দাবি প্রতিষ্ঠার এই সংগ্রামের প্রতিটি স্তরেই বাংলার নারী-সমাজের সক্রিয় অংশগ্রহণ ছিল। এ আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকেই *বেগম* পত্রিকায় বেশকিছু সম্পাদকীয়, প্রবন্ধ, চিঠিপত্র প্রভৃতির মাধ্যমে নারীরা রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে তাদের মনোভাব ব্যক্ত করেন। তাদের অনেকেই পূর্ব-পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না হলে এই অঞ্চলের নারী-শিক্ষা ব্যাহত হবে বলে মনে করেন। পাশাপাশি অনেক নারী শিক্ষার মাধ্যম বাংলা না হলে তাদের সন্তানকে শিক্ষিত করতে পারবেন না এরূপ আশঙ্কা ব্যক্ত করেন। নারী-সমাজের এরূপ ভাবনা ভাষা আন্দোলনে সর্বস্তরের নারীর অংশগ্রহণকে ত্বরান্বিত করে। নারীরা ভাষা আন্দোলনে মিছিল-মিটিংয়ে অংশগ্রহণ ও বক্তৃতা প্রদান, বিশেষ করে স্কুল-কলেজের ছাত্রছাত্রীদের উদ্‌বুদ্ধকরণ এবং তাদেরকে মিছিল-মিটিংয়ে যোগদান করানোর ক্ষেত্রে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার ক্ষেত্রেও মেয়েরা অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনের প্রচারণায়ও তাদের ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। ভাষা আন্দোলনকে সফলভাবে পরিচালনা করতে অর্থ-সংগ্রহের জন্য নারীরা বিভিন্ন স্থানে বাড়ি বাড়ি গিয়ে চাঁদা তুলেছেন। এর বাইরে তারা পোস্টার এবং লিফলেট লেখা ও লাগানো এই কাজগুলোর সাথে সম্পৃক্ত ছিলেন। শুধু ঢাকা শহরে নয়, বিভিন্ন বিভাগীয় শহরেও আন্দোলন-সংগ্রামে নারীরা তাৎপর্যপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। সেই অনগ্রসর সমাজে, কুসংস্কারের বেড়াজাল ভেঙে মফস্বল শহর বা মহকুমাতে কলেজ ও স্কুলের ছাত্রীসহ সাধারণ নারীরাও অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছেন। কোনো কোনো স্থানে শিক্ষিকাদের অনেকেই ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন। নারায়ণগঞ্জে আন্দোলনের অগ্নিকন্যা ছিলেন মর্গ্যান বালিকা বিদ্যালয়ের প্রধান শিক্ষক মমতাজ বেগম। কেউ কেউ ছাত্রীদের মিছিল ও সভাতে অংশ নিতে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। কোনো কোনো অঞ্চলে নারীরা নেতৃত্ব দিয়েছেন, সংগ্রাম কমিটিতেও যুক্ত ছিলেন কেউ কেউ। শুধু ১৯৫২ সালের আন্দোলনেই নয় পরবর্তী সময়ে অর্থাৎ ১৯৫৩-১৯৫৬ সালে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি আদায় পর্যন্ত প্রতি বছর নারীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করেন।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে তাদেরকে সম্মুখীন হতে হয়েছিল নানা ধরনের প্রতিবন্ধকতার। সামাজিক, পারিবারিক, প্রাতিষ্ঠানিক, ধর্মীয় বিভিন্ন দিক থেকেই প্রতিনিয়ত নানা বাধার সম্মুখীন হয়েছিলেন তারা।

তখনকার রক্ষণশীল সমাজে মেয়েদের আন্দোলন-সংগ্রামে অংশগ্রহণকে মোটেই স্বাভাবিকভাবে গ্রহণ করা হতো না। তখন ঢাকা, নারায়ণগঞ্জে পর্দাঘেরা ঘোড়ার গাড়ি ও রিকশায় নারীরা চলাফেরা করতেন। নারীদের ঘরের মধ্যে এক প্রকার অবরুদ্ধ অবস্থায় থাকতে হতো। ঢাকার বাইরে বিভাগীয় অন্য শহরগুলোতে অবস্থা ছিল আরও খারাপ। সিলেটের মতো রক্ষণশীল সমাজে ভাষা আন্দোলনে নারীদের অংশগ্রহণ সম্পর্কে আবুল মুহিত বলেন, 'এক হিসেবে নারীরা নেতৃত্বের ভূমিকা পালন করে। তাদের ভূমিকা অসাধারণ, সেই ১৯৪৮ সালে যখন নারীরা রাতে রাস্তায় হাঁটত, দিনে কেউ হেঁটে বের হত না, দিনে রিক্সায় চড়লে শাড়ি দিয়ে রিক্সা ঢেকে যেত। সেই অবস্থায় আন্দোলন করা সিলেটের মত জায়গায়, তা ছিল অসাধারণ ভূমিকা' (কবির, ২০১৮,পৃ. ১৩১)। সামাজিক রক্ষণশীলতার সাথে যুক্ত হয়েছিল পারিবারিক প্রতিবন্ধকতাও। পারিবারিক প্রতিবন্ধকতা সম্পর্কে ভাষাসংগ্রামী তালেয়া রহমান বলেন, ''মূল প্রতিবন্ধকতা ছিল পরিবার। পরিবার থেকে বাইরে যেতে বাধা দিত। আমি লুকিয়ে লুকিয়ে গিয়েছি'' (কবির, ২০১৮, পৃ. ১৩৭)।

অবশ্য এর বিপরীত চিত্রও যে ছিল না তা নয়। অনেকেই পরিবার থেকে আন্দোলনে অংশগ্রহণের উৎসাহ পেয়েছেন, সহযোগিতা পেয়েছেন। সকল প্রতিবন্ধকতাকে জয় করে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীদের বেশিরভাগকেই স্বদেশ কোনো মূল্য না দিলেও, এই আন্দোলনে অংশগ্রহণের অনেক মূল্য তাদের অনেককেই দিতে হয়েছে। নারায়ণগঞ্জে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের অপরাধে চাকরিচ্যুত হয়েছিলেন মমতাজ বেগম। শুধু তাই নয়, এ ঘটনার সূত্র ধরেই তাঁর বিবাহ-বিচ্ছেদ হয়। অনেকের লেখাপাড়াও বন্ধ করে দেওয়া হয়। চুয়াডাঙ্গায় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করার অপরাধে স্কুল-ছাত্রী বেলার লেখাপড়া বন্ধ করে দেওয়া হয়। একই অপরাধে খুলনার ভাষাসংগ্রামী মাজেদা আলীকে হোস্টেল থেকে বের হয়ে যেতে হয়। স্কুলে কালো পতাকা উত্তোলনের অপরাধে তিন বছরের জন্য বহিষ্কৃত হয়েছিলেন সিলেটের ভাষাকন্যা ছালেহা খাতুন। তবে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা এ সকল প্রতিবন্ধকতা সাহসের সাথে মোকাবেলা করেছেন। তারা মাতৃভাষার লড়াইয়ে যেকোনো মূল্য দিতে প্রস্তুত ছিলেন।

ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী নারীরা এই ত্যাগ, সাহসের উপযুক্ত মূল্য, যথাযথ স্বীকৃতি পেয়েছে কি? প্রশ্নের উত্তর খুব একটা আশাব্যঞ্জক নয়। ঢাকায় এবং অন্যান্য বিভাগীয় শহরগুলোতে ভাষা আন্দোলনের সাথে যে-সকল নারী জড়িত ছিলেন, তাঁদের অনেকেই পেয়েছেন রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি (একুশে পদক) এবং বিভিন্ন প্রতিষ্ঠানের (তমদ্দুন মজলিস, উদীচী, বঙ্গমাতা ফজিলাতুন্নেসা মুজিব সংগঠন, পদাতিক নাট্য গোষ্ঠী, বরিশাল পৌরসভা, Steps Towards Development, Democracy watch, Rotary club) স্বীকৃতি। এসব প্রতিষ্ঠান ভাষা-সংগ্রামীদের সম্মাননাপত্র, সনদ এবং ক্রেস্ট প্রদানের মাধ্যমে তাদেরকে সম্মানে ভূষিত করেছে। তবে এক্ষেত্রে লক্ষণীয় যে, শিক্ষিত, উচ্চবিত্ত ও উচ্চ মধ্যবিত্ত এবং অভিজাত পরিবারের নারীরা স্বীকৃতিপ্রাপ্তির দিক থেকে এগিয়ে আছেন। কিন্তু অবহেলিত থেকে গেছেন বিভিন্ন মহকুমা (বর্তমানে জেলা) ও মফস্বলের নারীরা। এদের অনেকের নামও আমরা জানি না। অনেক ভাষাকন্যা এখনো অন্তরালেই রয়ে গেছেন, হারিয়ে গিয়েছেন অনেকেই। কিন্তু আঞ্চলিক পর্যায়ের বা মফস্বলের এই ভাষাসংগ্রামীদের অন্তরাল থেকে বের না করে ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস রচনা করা সম্ভব নয়।

তথ্যসূত্র

আবদুল্লাহ, তুষার (১৯৯৭)। *বাহান্নর ভাষাকন্যা*। ঢাকা: নারী গ্রন্থ প্রবর্তনা।

আনিসুজ্জামান (২০১৫)। *কাল নিরবধি*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

আলম, আকসাদুল (২০০০)। 'যশোর'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

আলাউদ্দিন, এম. এম. (২০০০)। 'চুয়াডাঙ্গা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

আলাউদ্দিন, এম. এম (২০০০)। 'চুয়াডাঙ্গা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

আলী, বেগম মাজেদা (২০১৯)। *শিউলী ঝরা দিনগুলো*। খুলনা: লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

আলী, জি এম বাবর (২০১১)। 'ভাষা আন্দোলেনে বরিশালবাসীর ছিল উজ্জ্বল ও গৌরবময় ভূমিকা'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

আলীম, এম আবদুল (২০১৮)। *সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আহমদ, খালেদ (২০১১)। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রথম জনসভা হয়েছিল সিলেটে'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

আহমদ, জমির (২০০০)। 'ফেনী'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ইসমাঈল, তরফদার মুহাম্মদ (২০১৯)। *ভাষা আন্দোলনে হবিগঞ্জ*। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

ইসলাম, তসিকুল (১৯৯৯)। *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ইসলাম, তসিকুল (২০০০)। 'রাজশাহী'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ইসলাম, নূরুল (১৯৯৬)। 'রংপুরে ভাষা আন্দোলনের কিছু স্মৃতি কথা'। *দৈনিক যুগের আলো*। একুশে ফেব্রুয়ারি সংখ্যা। রংপুর।

ইসলাম, মুস্তাফা নূরউল (১৯৮৪)। *মাতৃভাষা চেতনা ও ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থকেন্দ্র।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ৩য় খণ্ড। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

কবির, মোহাম্মদ হুমায়ুন (২০১৮)। *ভাষা-আন্দোলন ও নারী*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

কামাল, মোস্তফা (১৯৮৭)। *ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*। ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি।

খান, রফিকুল আলম (২০১১)। 'সিরাজগঞ্জে ভাষা আন্দোলনের সময় মাইক না থাকায় টিনের চোঙ্গা ব্যবহার করা হয়েছিল'।

খান, সুমি (২০০১)। 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম'। *সাপ্তাহিক ২০০০*। ২৩ ফেব্রুয়ারি।

খোকন, আবুল হোসেন (২০০০)। 'বগুড়া'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চাদু, আবদুল কুদ্দুস (২০০০)। 'পাবনা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী (২০০০)। 'চট্টগ্রাম'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

জামান, শফিক (২০০০)। 'জামালপুর'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

জিন্নাহ, মোহাম্মদ আলী (২০০০)। 'সিরাজগঞ্জ'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

তোতা, শাহাবুল শাহীন (২০০০)। 'গাইবান্ধা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

নিখিল, ভুবন রায় (২০১১)। 'ভাষা আন্দোলনে নীলফামারী: জনতার সংগ্রাম'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

নিশির, শাহ আরিফ (২০০০)। 'কুষ্টিয়া'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

পারভিন, শাহনাজ (২০০৭)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা যুদ্ধে নারীর অবদান*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

পিন্টু, শরিফুজ্জামান (২০০০)। 'বাগেরহাট'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ফিরোজা, বেগম (২০০০)। 'বরিশাল'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বানু, আখতার (১৯৯৯)। 'রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা'। তসিকুল ইসলাম [সম্পা.]। *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বানু, আখতার (২০০৪)। 'স্মৃতিচারণ: রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলনে মহিলাদের ভূমিকা'। তসিকুল ইসলাম [সম্পা.]। *রাজশাহীতে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: বাতায়ন প্রকাশন।

বাসার, পল্টু ও ব্যানার্জী, কল্যাণ (২০০০)। 'সাতক্ষীরা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বিশ্বাস, অচিন্ত্য (২০০০)। 'খুলনা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বিশ্বাস, কুণ্ডল (২০০০)। 'নেত্রকোনা'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বেগম, আনোয়ারা (১৯৯২)। 'ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি ভোলার নয়'। খোন্দকার আবুল হাশেম (সম্পা.)। *অমর একুশে*। খুলনা: সাহিত্য পরিষদ পত্রিকা।

বেগম, মালেকা (১৯৮৯)। *বাংলার নারী আন্দোলন*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

ভট্টাচার্য, প্রদ্যোৎ (২০০০)। 'নড়াইল'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ভৌমিক, রীতা (২০১২)। *২৪ জন ভাষাসংগ্রামীর জীবন কথা*। ঢাকা: ধ্রুবপদ।

ভৌমিক, সুশান্ত (২০১১)। 'ভাষা আন্দোলনে পিছিয়ে ছিল না রংপুর'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

মতিন, আব্দুল ও রফিক, আহমদ (১৯৯১)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

মাহবুব, এম. আর (২০১১)। 'ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম: জীবন ও কর্ম'। এম. আর. মাহবুব [সম্পা.]। *ভাষাসংগ্রামী মমতাজ বেগম*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ।

মাহবুব, এম. আর (২০১৫)। *নরসিংদীতে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ।

মিয়া, শেখ গাউস (২০১০)। *ভাষা আন্দোলন খুলনা ও বাগেরহাট জেলা*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

মোহাম্মদ, তাজুল (১৯৯৪)। *ভাষা আন্দোলনে সিলেট*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

মোহাম্মদ, তাজুল (২০১৭)। *ভাষা সংগ্রামীদের কথা; বৃহত্তর সিলেট*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

রফিক, আহমদ (২০১৯)। *ভাষা আন্দোলন টেকনাফ থেকে তেঁতুলিয়া*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

রায়, প্রদীপ কুমার (২০০০)। 'মানিকগঞ্জ'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সরকার, শ্যামল চন্দ্র (২০০০)। 'ঝালকাঠি'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সাজ্জাদ, সাজ্জাদুর রহমান (২০১১)। 'জনবিরল পঞ্চগড়েও ভাষা আন্দোলনের ঢেউ লেগেছিল'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

সাকী, গোলাম সাকলায়েন (২০০০)। 'ব্রাহ্মণবাড়িয়া'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সাদিয়া, সুপা (২০১৬)। *বায়ান্নর ৫২ নারী*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

সিদ্দিকী, মামুন (২০১৫)। *কুমিল্লায় ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

স্মৃতিফলক (২০০৫)। 'ভাষা আন্দোলনে রাজশাহীতে স্মরণীয়-বরণীয় যাঁরা'। ভুবন মোহন পার্ক, রাজশাহী সিটি কর্পোরেশন, ফলক উন্মোচন: ২১শে ফেব্রুয়ারি ২০০৫।

হক, গাজীউল (১৯৯৯)। 'স্মৃতিচারণ'। তসিকুল ইসলাম [সম্পা.]। *বরেন্দ্র অঞ্চলে ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হক, গাজীউল (২০০০)। *আমার দেখা আমার লেখা*। ঢাকা: মেরী প্রকাশন।

হক, মুহম্মদ একরামুল (১৯৯৫)। *রাজশাহী জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হান্নান, মোহাম্মদ (১৯৮৬)। *বাংলাদেশের ছাত্র আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

হাসান, এ. কে. এম. রিয়াজুল (২০০০)। 'শেরপুর'। আবু মোহাম্মদ দেলোয়ার হোসেন [সম্পা.]। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হেলাল, বশীর আল্ (১৯৮৪)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হোসেন, মহব্বত (২০১১)। 'টাঙ্গাইলের ভাষা সৈনিকদের অনুপ্রেরণায় ছিলেন মওলানা ভাসানী'। আমানুল্লাহ কবীর ও ফাইজুল ইসলাম [সম্পা.]। *জেলায় জেলায় ভাষা আন্দোলন ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*। ঢাকা: মিজান পাবলিশার্স।

Proceedings of the East Bengal Legislative Assembly (1952) 22nd February, Vol. vii.

দৈনিক পত্রিকা

দৈনিক আজাদ, ১লা ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ২৩শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ১লা মার্চ ১৯৫২।

ভোরের কাগজ, ৫ই ফেব্রুয়ারি ২০১৬।

সাক্ষাৎকার

আহমেদ, সুফিয়া (১৮ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৬)। গবেষক কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

খাতুন, শরীফা (১৩ই ফেব্রুয়ারি, ২০১৮)। গবেষক কর্তৃক গৃহীত ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকার।

ভাষা আন্দোলন ও রাজরোষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ

মিলটন কুমার দেব

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookMilton

ভূমিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় বাংলাদেশের শ্রেষ্ঠ বিদ্যাপীঠ। এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা হয়েছিল ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শক্তির বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের ক্রান্তিলগ্নে (চক্রবর্তী, ২০২২)। ১৯২১ সালের ১লা জুলাই যে কয়টি বিভাগ নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে, তার মধ্যে ইতিহাস বিভাগ অন্যতম। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় একটি সর্বজনীন ও সকল প্রকার সংকীর্ণতামুক্ত শিক্ষামূলক প্রতিষ্ঠান (দেব, ২০২৪)। আর প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে সমাবেশ ঘটেছিল ভারত ও বাংলার মেধাবী, শিক্ষিত ও সচেতন ব্যক্তিবর্গের। পাশাপাশি এখানে সম্মিলন হয় স্বাধীনতাকামী ও প্রগতিশীল ধ্যান-ধারণার অধিকারী যুবক সম্প্রদায়ের। তাই শুধু জ্ঞানের সুদীপ্ত মশাল জ্বালানোর মধ্যেই ইতিহাস বিভাগের কর্মকাণ্ড সীমাবদ্ধ ছিল না। এর চেতনার ধারালো তরবারি চমকিত হয়েছে জাতীয় প্রয়োজনে। ১৯৩০ সালে চট্টগ্রাম অস্ত্রাগার দখলের ঘটনার সাথে যুক্ত একজন বিপ্লবী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে হাজির হলে সে সময়ে ইতিহাস বিভাগের সভাপতি রমেশচন্দ্র মজুমদার তাঁকে উষ্ণ আলিঙ্গনে জড়িয়ে ধরে বলেন, "You are the maker of history, I am a mere writer." (দেব, ২০২৪)। এ ঐতিহ্যের উত্তরাধিকার হিসেবে ১৯৪৮ থেকে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত মহান ভাষা আন্দোলনের দুটি পর্বেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের সদস্যগণ উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। তাঁদের চরম আত্মত্যাগের ও স্বার্থত্যাগের মধ্য দিয়েই বাংলা ভাষা আজ বিশ্ব দরবারে মর্যাদার আসনে আসীন হয়েছে। পঞ্চাশের দশকে পাকিস্তানি ঔপনিবেশিক শাসনামলে রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে পূর্ব-বাংলার জনগণের মাতৃভাষা বাংলাকে প্রতিষ্ঠিত করার আন্দোলন সেখানকার আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক বিকাশের ক্ষেত্রে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা। বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের বৃহত্তর জনমানুষের ভাষা হিসেবে অন্যতম রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দানের জন্য যে মরণপণ সংগ্রাম সূচিত হয়, তার সাথে রয়েছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের এক সুগভীর সম্পর্ক। ভাষা আন্দোলন নিয়ে বহু গ্রন্থ রচিত হলেও এ আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের ভূমিকা, অবদান ও প্রতিক্রিয়া নিয়ে সুসংবদ্ধ ও বস্তুনিষ্ঠ পর্যালোচনা নেই বললেই চলে।

উল্লেখ্য, বাংলা ভাষা নিয়ে পাকিস্তান গণপরিষদের সিদ্ধান্ত এবং এ সংক্রান্ত পাকিস্তান সরকার ও সরকারি দলের অন্যায় কার্যকলাপের প্রতিক্রিয়ায় ১৯৪৮ সালের মার্চে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত হয় 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। এ পরিষদের প্রতিষ্ঠালগ্নে ইতিহাস বিভাগের প্রথম মুসলমান ছাত্রী আনোয়ারা খাতুন অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া এ বিভাগের শিক্ষার্থী গাজীউল হক, হাবিবুর রহমান শেলী, জিল্লুর রহমান, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং শিক্ষক হিসেবে পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রাখেন। এজন্য তাঁদের সকলকে শিকার হতে হয় রাজরোষের এবং অনেককেই বরণ করতে হয় কারাবাস। এখানে 'রাজ' শব্দটি একটি বিশেষ প্রশাসনিক প্রতিষ্ঠান ও প্রশাসনিক সময়কাল হিসেবে উল্লিখিত, যার মূল চরিত্র হলো ক্ষমতা জাহির করা। 'রাজ'-এর পরম কাঙ্ক্ষিত বিষয় হলো নিপাট আনুগত্য, অপ্রয়োজনীয় তোষামোদি

ও স্তাবকতা। এটি সকলেরই জানা যে, দ্বিজাতি তত্ত্বের উপর ভিত্তি করেই সৃষ্টি হয় পাকিস্তান। ১৯৪০ সালে উত্থাপিত লাহোর প্রস্তাবে স্বাধীন রাষ্ট্রসমূহ (states) গঠনের লক্ষ্য থাকলেও সেখানে 'পাকিস্তান' নামের উল্লেখ ছিল না। পরবর্তী সময়ে মুদ্রণপ্রমাদের কথা বলে পাকিস্তান নামে একটি রাষ্ট্রের সৃষ্টি হয়। এরপর সরকারি পর্যায়ে পূর্ববাংলার পাকিস্তানিকরণ প্রক্রিয়ার প্রতি দেয়া হয় বিশেষ প্রাধান্য। কিন্তু এ প্রক্রিয়াকে বাস্তবায়নের ক্ষেত্রে প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়ায় বাংলা ভাষা, বাঙালি সংস্কৃতি ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাঙালি ছাত্র-শিক্ষক। এই ছাত্র-শিক্ষক দেশমাতৃকাকে ভালোবাসতে গিয়ে সীমাহীন অত্যাচার ও দুর্ভোগের শিকার হয়েছেন। প্রবন্ধে উল্লিখিত ব্যক্তিবর্গের প্রত্যেকের ঘটনা পৃথক কিন্তু সকলের রাজরোষের পটভূমি অভিন্ন। এ প্রবন্ধের দ্বারা সেসব রাজরোষের প্রামাণ্য দলিলও উপস্থাপনের প্রয়াস নেওয়া হয়েছে।

গাজীউল হক (১৯২৯-২০০৯)

১৯৪৮ সালে বগুড়া আজিজুল হক কলেজ থেকে ইন্টারমিডিয়েট পরীক্ষা পাস করে গাজীউল হক ভর্তি হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে, বিএ (সম্মান) শ্রেণিতে (সুলতান, ২০২০)। ১৯৫১ সালে তিনি সম্মানসহ স্নাতক পাশ করেন। সে-সময়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে গাজীউল হকের সরব উপস্থিতি ছিল। ১৯৫০ সালের প্রারম্ভে বিশ্ববিদ্যালয়ে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটি' গঠিত হয়, যার উদ্যোগে ১১ই মার্চ পালিত হয় রাষ্ট্রভাষা দিবস। এ কমিটি ১১ই মার্চ, ১৯৫১ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয়েও রাষ্ট্রভাষা দিবস পালন করে (সুলতান, ২০২০)। ইতিহাস বিভাগের ছাত্র গাজীউল হক এ সময়ে ভাষা আন্দোলনের প্রতিটি কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করেন। গাজীউল হক এ সম্পর্কে নিজেই লিখেছেন:

> ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি সলিমুল্লাহ মুসলিম হলের ৫৪ নং ঘরে বৈঠক হয়। সেই কক্ষেই আমি থাকতাম। পাশের ৫২ নং ঘরে থাকতেন জনাব মাহবুব জামাল জাহেদি। তোয়াহা সাহেব, মাহবুব জামাল জাহেদি, আলী আহমদ, আব্দুস সামাদ মিলে ছোট ঐ বৈঠকে যুবলীগের এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার ব্যাপারে এবং তার কর্ম তৎপরতা সারাদেশে ছড়িয়ে দেয়ার ব্যাপারে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। এখানে একটি বিষয়ে আমরা একমত হয়েছিলাম যে, ভাষার দাবির প্রশ্নে নিরবতা এবং আন্দোলন বিমুখতা কোনোটাই সুষ্ঠু গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সহায়ক নয়। সুতরাং এ অবস্থায় পরিবর্তন বাঞ্ছনীয়। আমরা আরও ঠিক করেছিলাম যে, বাংলাভাষা আন্দোলনকে সামনে রেখে আমরা সক্রিয় হবো। অবশ্য বাংলা ভাষা আন্দোলন বুঝাতে তখন বুঝাতো ১১ই মার্চের আন্দোলন (হক, ২০০০)।

১৯৫২ সালে বাংলাভাষা আন্দোলন নতুন করে সংগঠিত হয় এবং চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হয়। ২৬শে জানুয়ারি খাজা নাজিমুদ্দীনের দম্ভোক্তি 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা'-এর প্রতিক্রিয়ায় ছাত্রদের মুখে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান উঠে আসে। সৃষ্টি হয় বাঙালি জাতির গৌরবোজ্জ্বল এক অধ্যায়, বিশ্বমানবের উজ্জ্বল এক উত্তরাধিকার। ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতালের কর্মসূচি নেওয়া হয়। গাজীউল হক তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেন:

> যুবলীগের কর্মীদের সিদ্ধান্ত মোতাবেক ফেব্রুয়ারি কর্মসূচি পালিত হলো। মিছিলবিরোধী পূর্বপাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের সদস্যরা যাতে কোনো প্রকার সুযোগ না পায় তার জন্য যুবলীগ ও অন্যান্য প্রগতিশীল ছাত্ররা বেশ তৎপর ছিলেন। মধুর রেস্তোরাঁ থেকে বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় একটি ছোট টেবিল আনা হয়। এ সময় হাস্যকর দৃশ্যের অবতারণা হয়েছিল। মধুর রেস্তোরাঁ থেকে টেবিল আনার পর চেয়ারের অপেক্ষা করছেন খালেক নেওয়াজ খান। পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগের অন্য কর্মীরাও অপেক্ষা করছেন। চেয়ার এসে সভাস্থলে পৌঁছানোর আগেই এম আর আখতার টেবিলের

> ওপরে লাফিয়ে উঠে সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাব করে দিলেন। তিনি যখন সভাপতির নাম প্রস্তাব করছেন তার মতলব বুঝতে পেরে সৈয়দ নুরুল আলম এম আর আখতার মুকুলের প্যান্ট ধরে টেনে নামাবার চেষ্টা করছিলেন। এ টানা-হ্যাঁচড়ায় বেচারা মুকুলের প্যান্টের কয়েকটি বোতামই ছিঁড়ে যায়, কিন্তু তা সত্ত্বেও এম আর আখতার মুকুল সভাপতি হিসেবে আমার নাম প্রস্তাবের কাজ সমাধা করেন। এরপরেই পুরো ছয়ফুট লম্বা কামরুদ্দীন শহুদ পায়ের আঙুলের উপর ভর দিয়ে উঁচু হয়ে হেঁড়ে গলায় প্রস্তাবটি সমর্থন করেন। ... আমি সভাপতির আসন নিলাম। চেয়ারের জন্য অপেক্ষা করতে পারলাম না। টেবিলের ওপর লাফিয়ে উঠলাম এবং দুই মিনিট বক্তৃতা করেই মিছিলের কর্মসূচি ঘোষণা করলাম (প্রথম আলো, ২০০২)।

২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ বেলা ৩টায় মধুর রেস্তোরাঁয় বসে আগামী দিনের কর্মপরিকল্পনা নিয়ে কাজ করেছিলেন গাজীউল হকসহ বেশ কয়েকজন। কারণ ভাষা আন্দোলন যখন তুঙ্গে, তখন তা দমনে ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে সরকারি আদেশে ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়। এমন পরিস্থিতিতে সার্বিক অবস্থা নিয়ে আলোচনা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারির কর্মপরিকল্পনা নির্ধারণ করার লক্ষ্যে ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতে ৯৪, নবাবপুর রোডে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী মুসলিম লীগ কার্যালয়ে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া বহু ছাত্রনেতৃবৃন্দের অংশগ্রহণে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে-বিপক্ষে মতামত দেন। এখানে সংখ্যাগরিষ্ঠ সদস্যের মতামত ছিল ১৪৪ ধারা ভাঙার বিপক্ষে। এ সংবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলোতে ক্ষুব্ধ ছাত্রবৃন্দ কয়েক দফা বৈঠক করেন। সলিমুল্লাহ মুসলিম হল, ফজলুল হক মুসলিম হলসহ ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রগণ পৃথক পৃথক বৈঠক করে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন। ওই রাতে ১২টার দিকে ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মধ্যবর্তী স্থানে যে পুকুর আছে, তার পূর্বধারে গাজীউল হকসহ নানাজন মিলিত হয়ে স্থির করেন যে, যে-কোনোভাবেই হোক তারা ১৪৪ ধারা ভাঙবেন (আনিসুজ্জামান, ২০১৫)। ২১শে ফেব্রুয়ারি ছিল আগুনঝরা ফাগুনের দিন। এদিন সকাল ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্রগণ ঐতিহাসিক সভায় মিলিত হন। এতে সভাপতিত্ব করেন গাজীউল হক। এ সম্পর্কে গাজীউল হক লিখেছেন:

> সভাপতি হিসেবে আমি প্রথমে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষ থেকে শামসুল হককে তার বক্তব্য রাখার আহ্বান জানাই। কিছু ছাত্র এতে বাধা দিলেও শেষ পর্যন্ত তিনি তার বক্তব্য রাখেন। জনাব হক বাগ্মী ছিলেন। চমৎকার বলতে পারতেন। ১৪৪ ধারা না ভাঙার পক্ষে তিনি যুক্তি উপস্থাপন করে ছাত্রদের বোঝানোর চেষ্টা করেন। কিন্তু জনাব হকের কোনো যুক্তিই আমতলায় সমবেত ছাত্ররা মানতে রাজি ছিল না। দুয়েকজন অবশ্য তার বক্তব্যকে সমর্থন করতে যাচ্ছিলেন। কিন্তু সম্মিলিত ছাত্রদের উত্তপ্ত বিক্ষোভের জন্য তা সম্ভব হয়নি। এরপর আবদুল মতিনকে বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির পক্ষ থেকে বক্তব্য রাখার জন্য আহ্বান জানানো হয়। আবদুল মতিন শান্তভাবে যুক্তি দিয়ে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে বক্তব্য রাখেন। সবশেষে সভাপতি হিসেবে আমি আমার বক্তব্য রাখি। আমার মনে পড়ে আমি বেশি উত্তেজিত হয়ে পড়েছিলাম। আমার সেদিনের বক্তব্যের সব কথা মনে পড়ে না। যুক্তির চেয়ে আবেগই ছিল বেশি। তবে মোটামুটিভাবে শেষাংশ বোধহয় এরকম ছিল, 'নূরুল আমীন সরকার বিশ্ববিদ্যালয়ের বাইরে পুলিশ মোতায়েন করেছে। ১৪৪ ধারা ভাঙা হলে নাকি গুলী করা হবে – ছাত্রদের গুলী করে হত্যা করা হবে। আমরা নূরুল আমীন সরকারের চ্যালেঞ্জ গ্রহণ করছি। ১৪৪ ধারা আমরা ভাঙব। আমরা দেখতে চাই নূরুল আমীন সরকারের বারুদাগারে কত বুলেট জমা আছে।' আমার বক্তৃতা শেষ করার সঙ্গে সঙ্গে চারদিকে থেকে ধ্বনিত হলো '১৪৪ ধারা মানি না, মানি না'। ঠিক এমনই সময় আবদুস সামাদ আজাদ চিৎকার করে বললেন, 'আমরা

> সত্যাগ্রহ করব এবং কীভাবে করব – কয়জন করে?' তিনি একটি প্রস্তাবও আনলেন ১০ জন ১০ জন করে সত্যাগ্রহ করা হবে, ১৪৪ ধারা ভাঙা হবে। প্রস্তাবটি গৃহীত হলো। সত্যাগ্রহীরা শান্তিপূর্ণভাবে ভাষার দাবিতে শ্লোগান দিয়ে ভবনের দিকে যাবে (শেলী, ১৯৮০)।

মহান ভাষা আন্দোলন তথা একুশের স্মৃতিসুধায় গাজীউল হক লিখেছেন একুশের প্রথম গান:

ভুলব না, ভুলব না, সেই একুশে ফেব্রুয়ারি ভুলব না
লাঠি-গুলি-আর টিয়ারগ্যাস, মিলিটারি আর মিলিটারি ভুলব না
রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই, এই দাবীতে ধর্মঘট
বরকত সালামের খুনে লাল ঢাকার রাজপথ
ভুলব না,
শহীদ স্মৃতি ভাঙ্গিয়াছে, জেগেছে পাষাণে প্রাণ
মোরা কি ভুলিতে পারি খুন রাঙা
জয় নিশান? (হক, ২০০০)।

এই গানটির ঐতিহাসিক মূল্য অশেষ। এখানে একুশ, মিলিটারি ও ভাষা-শহিদের প্রসঙ্গ এসেছে। এ গানটির একটি পঙ্‌ক্তি 'মোরা কি ভুলিতে পারি'র অনুকরণেই পরবর্তী সময়ে আবদুল গাফফার চৌধুরী লিখেছেন:

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো
একুশে ফেব্রুয়ারি, আমি কি ভুলিতে পারি

ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনে গাজীউল হকের সফল ভূমিকার কারণে তাঁকে রাজরোষের শিকার হতে হয়েছে। ১৯৫২ সালে ইতিহাস বিষয়ে এমএ ডিগ্রি লাভের পর ১৯৫৩ সালে তিনি আইনশাস্ত্র অধ্যয়নের জন্য ভর্তি হন। সে-বছরই ১৪ই এপ্রিল বিশ্ববিদ্যালয় থেকে চার বছরের বহিষ্কারাদেশ দিয়ে তাঁকে কারাগারে প্রেরণ করা হয়। এখানেই শেষ নয়। কেড়ে নেওয়া হয় তাঁর এমএ ডিগ্রি। কিন্তু তীব্র ছাত্র-আন্দোলনের কারণে কর্তৃপক্ষ তাঁর ডিগ্রি ফিরিয়ে দিতে বাধ্য হয়।

মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান শেলী (১৯২৮-২০১৪)

ইতিহাস বিভাগের কৃতী ছাত্র মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান ভাষা আন্দোলনের অন্যতম নেতা। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভাঙার প্রথম মিছিলটি হয় তাঁরই নেতৃত্বে। আর এজন্য তাঁকে ভোগ করতে হয় রাজরোষ। ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত-পর্বের সময়ে তিনি ছিলেন ফজলুল হক হল সংসদের সহ-সভাপতি। ভাষা আন্দোলনে তিনি তাঁর সমসাময়িক ছাত্রনেতা গাজীউল হক, জিল্লুর রহমানসহ অন্যদের সাথে যোগদান করেন (রেজা, ২০০৪)।

১৪৪ ধারা প্রথম ভঙ্গ করার অপরাধে হাবিবুর রহমানকে গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠানো হয়। তাঁর ভূমিকা সম্পর্কে গাজীউল হক লিখেছেন:

> সে রাতে বৈঠকে আরও একটি গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নেয়া হয়েছিল। তা হলো আন্দোলনে যারা নেতৃত্ব দেবেন তাঁদের মধ্যে একমাত্র হাবিবুর রহমান (শেলী) ছাড়া পারতপক্ষে কেউ গ্রেপ্তার বরণ করবেন না। আন্দোলনের স্বার্থের খাতিরে তাঁদেরকে বাইরে থাকার চেষ্টা করতে হবে। কেননা, সর্বদলীয়

> রাষ্ট্রভাষা কর্ম-পরিষদের সিদ্ধান্তের পরিপ্রেক্ষিতেই সংগ্রামী ছাত্র নেতাদের অংশটি আন্দোলনকে বাঁচিয়ে রাখার স্বার্থে গ্রেফতার এড়িয়ে যাওয়া প্রয়োজন। হাবিবুর রহমান শেলীর বেলায় সিদ্ধান্তটি অন্যরকম। বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যে সত্যাগ্রহী দলটি বের হবে তাদের মধ্যে প্রথম গ্রুপের বা ব্যাচের নেতৃত্ব দেবেন হাবিবুর রহমান শেলী। কারণ শেলী ছিলেন তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের সেরা ছাত্রদের একজন। তাঁর জীবনের যে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ আছে সে উজ্জ্বল ভবিষ্যৎকে উপেক্ষা করে তিনি গ্রেফতার বরণ করবেন। মধ্যবিত্ত উচ্চাকাঙ্ক্ষীদের ভাষায় তার উজ্জ্বল ভবিষ্যৎ সম্মুখে। কিন্তু সেদিন বাংলা ভাষা আন্দোলনের স্বার্থে তিনি আমাদের সিদ্ধান্ত জেনে শুনে মেনে নিয়েছিলেন। এর ফলশ্রুতিতে তাঁকে বহু ঝড় ঝাপটা পোহাতে হয়েছিল। ভাষা আন্দোলনের জন্য তিনি গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গেলেন। জেল থেকে বের হয়ে আসার পর চাকুরির জন্য তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দরখাস্ত করলেন কিন্তু তাঁকে সে চাকুরী দেয়া হলো না। তার প্রতিবাদে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামনে তিন দিন পান সিগারেটের দোকান সাজিয়ে দোকানদারী করেছিলেন। বাংলা ভাষা আন্দোলনে সেই ২১শে ফেব্রুয়ারিতে তিনি যে অবদান রেখে গেছেন তা বিশেষভাবে স্মরণীয় (চক্রবর্তী, ২০১৫)।

হাবিবুর রহমান কর্তৃক ১৪৪ ধারা ভেঙে প্রথম মিছিলে নেতৃত্ব দেওয়ার তথ্য বদরুদ্দীন উমরও জানিয়েছেন:

> ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত এভাবে ঘোষিত হওয়ার পর ছাত্র-ছাত্রীরা উত্তেজিত হয়ে '১৪৪ ধারা ভাঙতে হবে', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি শ্লোগান দিতে থাকে। এই সময় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পদ্ধতি নির্ধারণ করে স্থির হয়ে যে, দশ জন করে এক এক ব্যাচে ছাত্র ছাত্রীরা বের হয়ে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে হবে, অন্যথায় সকলে একসঙ্গে বের হতে চাইলে চারদিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিতে পারে। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী হাবিবুর রহমান শেলীর নেতৃত্বে ১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম দলটি গেট থেকে রাস্তায় বের হয় (মাহবুবউল্লাহ, ২০০৮)।

উল্লেখ্য, হাবিবুর রহমানের মধ্যে দেশের জন্য কল্যাণচিন্তা ছিল সদা তৎপর। বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে পড়াকালীন তাঁর নিজের মানস নিয়ে তিনি লিখেছেন:

> লেখাপড়া নিয়ে ব্যস্ত থাকলেও ছাত্রসমাজে যখন কোনো গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন উঠতো তখন চুপচাপ না থেকে সরাসরি সাড়া দিতাম। উপনিবেশবাদ, ভিয়েৎনাম, বর্ণবৈষম্য, সাম্প্রদায়িকতা, পূর্ববাংলার আঞ্চলিক স্বায়ত্তশাসন ও ছাত্রদের দাবী-দাওয়া ইত্যাদি ছোট বড় সব ব্যাপারে নিজস্ব একটা বক্তব্য রাখার প্রেরণা অনুভব করতাম। ছোটখাটো সব আন্দোলনে অংশগ্রহণ করতে না পারলে নিজেকে অপরাধী মনে হতো। ফরাসি শব্দ 'আগাঁজে' (বাংলা শব্দ 'নিয়োজিত' না 'নিবেদিত' হবে?) বলতে যা বুঝায় মনের অবস্থা ছিল তাই। মনে হতো যেন সারা পৃথিবীটা আমাকে কেন্দ্র করে প্রদক্ষিণ করছে। সকল সমস্যার আশু সমাধান সন্নিকটে। কল্যাণকর সমাজ প্রতিষ্ঠার একটা অস্পষ্ট ধারণা মাথার ভিতরে পাক খেতো। নিজেকে প্রগতিবাদী বলে পরিচয় দিতে গর্ব অনুভব করতাম (রহমান, ২০০৮)।

১৪৪ ধারা ভাঙ্গার কারণে ২১শে ফেব্রুয়ারি হাবিবুর রহমানকে পুলিশ গ্রেপ্তার করে কারাগারে পাঠায়। ১১ই মার্চ তিনি কারামুক্ত হন। কয়েকসপ্তাহ পর রাজশাহী থেকে ঢাকায় এসে বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক হিসেবে যোগদানের সিদ্ধান্ত নেন। এ সম্পর্কে তিনি নিজে জানিয়েছেন:

> পয়লা মে আমার শিক্ষক, প্রফেসর হালিম সাহেবের আমন্ত্রণে ইতিহাস বিভাগে অস্থায়ী লেকচারার পদে যোগদান করি। আমার হাজতবাসের কথা উল্লেখ করে ভাইস চ্যান্সেলরের শীঘ্রই কান ভারী

> করা হয়। কোন কোন সহযোগী আমাকে বিশেষ বর্ণে রঞ্জিত করে ভাইস চ্যান্সেলরের কাছে অভিযোগ করেন। ৪ঠা মে প্রফেসর হালিম আমাকে ডেকে সব কথা বললেন। তাঁকে চিন্তান্বিত দেখে আমার খারাপ লাগল। আমি বললাম 'আমার জন্য যদি আপনার ইউনিভার্সিটির কোন অসুবিধা হয়, তবে আমি পদত্যাগ করছি। অনুরূপ ভাষায় তাঁকে একটি পদত্যাগ পত্র দিলাম। ভাইস চ্যান্সেলর ড. মোয়াজ্জেম হোসেন সাহেব অত্যন্ত ক্ষিপ্রতার সাথে আমার পদত্যাগপত্র গ্রহণ করলেন (আহমদ, ২০১৪)।

এরূপ বৈরী পরিস্থিতিতে হাবিবুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের লেকচারার পদের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি কামনা করে উপাচার্যের নিকট যে চিঠি দেন, তাতে উল্লেখ ছিল:

> I have the honour to state that I joined my duty as a Lecturer in the Department of History on the 1st may, 1952. I beg to state now that if the University or the Department of History is put any difficulty on account of my appointment, I tender my resignation from today or any day thereafter which may be conveniant to you. (Record Room, DU).

ভাষা আন্দোলনে নেতৃস্থানীয় ভূমিকার জন্য হাবিবুর রহমানকে যথেষ্ট রাজরোষের মুখোমুখি হতে হয়েছে। ছাত্রজীবনের প্রতিটি স্তরে উজ্জ্বল মেধার স্বাক্ষর রাখলেও তাঁর প্রতিভা বিকাশের পথ বহুলাংশে রুদ্ধ হয়েছিল শুধু ভাষা আন্দোলনে যোগদানের কারণেই। রাজরোষের শিকার হাবিবুর রহমান মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষায় জাতীয় জীবনের ক্রান্তিলগ্নে নিজ দায়িত্ব পালন করেন। পরে আবার দেশের নানা কলেজে এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিচ্ছিন্নভাবে শিক্ষকতা করেন।

সৈয়দ নজরুল ইসলাম (১৯২৫-১৯৭৫)

সৈয়দ নজরুল ইসলাম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ থেকে ১৯৪৬ সালে বিএ (সম্মান) এবং ১৯৪৭ সালে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫৩ সালে এ বিশ্ববিদ্যালয় থেকেই এলএলবি ডিগ্রিও লাভ করেন। ছাত্রজীবন থেকেই সৈয়দ নজরুল ইসলাম রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনকালে গঠিত সর্বদলীয় অ্যাকশন কমিটির সদস্য হিসেবে ভাষা আন্দোলনে তিনি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন (হোসেন ও ইসলাম, ২০২২)। ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে আয়োজিত একটি সভায় পাকিস্তান গণতান্ত্রিক যুবলীগ, গণ আজাদী লীগসহ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের নিয়ে গঠিত কমিটিতে সৈয়দ নজরুল ইসলামও ছিলেন।

পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর পূর্ববঙ্গ সফরের কর্মসূচি এগিয়ে আসায় সরকারের পক্ষ থেকে আন্দোলন থামানোর কৌশল বের করা হয়। এরই অংশ হিসেবে ১৫ই মার্চ পূর্ববঙ্গের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ নেতৃবৃন্দের এক বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। বৈঠকে ৮ দফা সমঝোতা চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়। বর্ধমান হাউসে অনুষ্ঠিত ওই সভায় উপস্থিত ছিলেন নাইমউদ্দীন আহমদ, আবদুর রহমান চৌধুরী, সৈয়দ নজরুল ইসলাম এবং আজিজ আহমদ। তাঁরা ছাড়াও উপস্থিত ছিলেন অধ্যাপক আবুল কাসেম এবং কামরুদ্দীন আহমদ। সেদিনের বৈঠক নিয়ে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন:

> নির্ধারিত সময়ে নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে আলোচনার জন্য সংগ্রাম পরিষদের পক্ষ থেকে কামরুদ্দীন আহমদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবুল কাসেম, নঈমুদ্দিন আহমদ, সৈয়দ নজরুল ইসলাম, আজিজ

> আহমদ প্রমুখ বর্ধমান হাউসে উপস্থিত হন।... নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে সংগ্রাম পরিষদের এই আলোচনা বৈঠকে তুমুল বিতর্ক এবং উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ... দীর্ঘ সময় স্থায়ী এই বৈঠকে উভয় পক্ষের মধ্যে অনেক তর্ক-বিতর্ক হয়, কিন্তু সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা তাঁদের দাবীতে অনমনীয় থাকায় নাজিমুদ্দীন শেষপর্যন্ত তাঁদের সবকটি দাবীই মেনে নিতে বাধ্য হন। তবে ৮ দফা চুক্তিটির শেষ দফাটি কিছু রদবদল করে নাজিমুদ্দীন স্বহস্তে সেটি নতুনভাবে লিখে দেন (মাহবুবউল্লাহ, ২০০৮)।

সৈয়দ নজরুল ইসলামসহ সংগ্রাম পরিষদের নেতাদের সাথে প্রধানমন্ত্রী নাজিমুদ্দীনের ৮ দফা চুক্তি ছিল নিম্নরূপ:

১. ২৯ ফেব্রুয়ারি ১৯৪৮ হইতে বাংলা ভাষার প্রশ্নে যাঁহাদিগকে গ্রেফতার করা হইয়াছে তাঁহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দান করিতে হইবে।

২. পুলিশ কর্তৃক অত্যাচারের অভিযোগ সম্পর্কে প্রধানমন্ত্রী স্বয়ং তদন্ত করিয়া এক মাসের মধ্যে এ বিষয়ে বিবৃতি প্রদান করিবেন।

৩. ১৯৪৮-এর এপ্রিলের প্রথম সপ্তাহে পূর্ববাংলা সরকারের ব্যবস্থাপক সভায় বেসরকারি আলোচনার জন্যে যেদিন নিধারিত হইয়াছে সেই দিন বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করিবার এবং তাহাকে পাকিস্তান গণপরিষদে এবং কেন্দ্রীয় সরকারের পরীক্ষাদিতে উর্দুর সমমর্যাদা দানের জন্যে একটি বিশেষ প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে।

৪. এপ্রিল মাসে ব্যবস্থাপক সভায় এই মর্মে একটি প্রস্তাব উত্থাপন করা হইবে যে, প্রদেশের সরকারি ভাষা হিসেবে ইংরেজী উঠিয়া যাওয়ার পরই বাংলা তাহার স্থলে সরকারী ভাষারূপে স্বীকৃত হইবে। ইহা ছাড়া শিক্ষার মাধ্যমও হইবে বাংলা। তবে সাধারণভাবে স্কুল-কলেজগুলোতে অধিকাংশ ছাত্রের মাতৃভাষার মাধ্যমেই শিক্ষাদান করা হইবে।

৫. আন্দোলনে যাঁহারা অংশগ্রহণ করিয়াছেন তাঁহাদের কাহারো বিরুদ্ধে কোন ব্যবস্থা গ্রহণ করা হইবে না।

৬. সংবাদপত্রের উপর হইতে নিষেধাজ্ঞা প্রত্যাহার করা হইবে।

৭. ২৯ ফেব্রুয়ারি হইতে পূর্ববাংলার যেসকল স্থানে ভাষা আন্দোলনের জন্য ১৪৪ ধারা জারী করা হইয়াছে সেখান হইতে তাহা প্রত্যাহার করা হইবে।

৮. সংগ্রাম পরিষদের সাথে আলোচনার পর আমি এ ব্যাপারে নিঃসন্দেহ হইয়াছি যে এই আন্দোলন রাষ্ট্রের দুশমনদের দ্বারা অনুপ্রাণিত হয় নাই (অমৃতবাজার, ১৯৪৮)।

চুক্তির শর্ত মেনে ১৫ই মার্চ কারাবন্দিদের মুক্তি দেওয়া হয়। ১৬ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় এক ছাত্রসভা অনুষ্ঠিত হয়। শেখ মুজিবুর রহমান এতে সভাপতিত্ব করেন। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে দেওয়া জিন্নাহর ভাষণের প্রতিক্রিয়ায় ছাত্ররা ক্ষোভে ফেটে পড়ে। এদিন সন্ধ্যায় পূর্ব-পাকিস্তানের চিফ সেক্রেটারি আজিজ আহমদের সরকারি বাসভবনে জিন্নাহর সাথে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের যে সভা হয়, তাতে সৈয়দ নজরুল ইসলামও অন্যদের সঙ্গে উপস্থিত ছিলেন (জাগরণ, ২০২১)। এ সভায় জিন্নাহর হাতে একটি স্মারকলিপি দেওয়া হয়। সভাটি শান্তিপূর্ণভাবে সমাপ্ত হয়নি। পরিষদ নেতৃবৃন্দের সাথে জিন্নাহর তর্ক-বিতর্ক হয়।

এ সম্পর্কে বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন:

> রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের একটি প্রতিনিধিদেরকে জিন্নাহ ২৪ মার্চ সন্ধ্যায় সাক্ষাৎ দান করেন। এই সাক্ষাতের সময় সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের মধ্যে উপস্থিত ছিলেন শামছুল হক, কামরুদ্দীন আহমদ, আবুল কাসেম, তাজউদ্দিন আহমদ, লিলি খান, মোহাম্মদ তোয়াহা, আজিজ আহমদ, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল আলম, অলি আহাদ এবং সৈয়দ নজরুল ইসলাম। আলোচনার প্রথমেই জিন্নাহ তাঁদেরকে বলেন যে, নাজিমুদ্দীনের সঙ্গে তাঁদের যে চুক্তি হয়েছে সেটাকে তিনি স্বীকার করেন না। কারণ নাজিমুদ্দীনের কাছ থেকে জোরপূর্বক সেই চুক্তিতে সই আদায় করা হয়েছে। তিনি এসময় দৃঢ়ভাবে সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদেরকে জানান যে, একমাত্র উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। এই সাক্ষাৎকারের সময় উভয়পক্ষে অল্পক্ষণের মধ্যেই তুমুল বাকবিতন্ডা শুরু হলে জিন্নাহ আর আলোচনা করতে অসম্মত হওয়ায় সাক্ষাৎকারটি নির্ধারিত সময়ের আগেই আকস্মিকভাবে সমাপ্ত হয় (মাহবুবউল্লাহ, ২০০৮)।

মো. জিল্লুর রহমান (১৯২৯-২০১৩)

মো. জিল্লুর রহমান ১৯৫২ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ থেকে বিএ (সম্মান) এবং ১৯৫৪ সালে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন। ১৯৫২ সালের মহান ভাষা আন্দোলনে তাঁর ছিল সক্রিয় অবদান। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আমতলায় ১৯৫২ সালের ১৯শে ফেব্রুয়ারি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে সংঘটিত ছাত্র-সমাবেশে জিল্লুর রহমান সভাপতিত্ব করেন। এ সমাবেশ সম্পর্কে ভাষাসৈনিক গাজীউল হক লিখেছেন:

> ১৯ ফেব্রুয়ারি বিশ্ববিদ্যালয়ে একটি ছাত্রসভা ডাকা হয়। সভায় সভাপতিত্ব করেন জিল্লুর রহমান। সেই ছাত্রসভায় 'বিশ্ববিদ্যালয় রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি' নামে ১৭/১৮ জন সদস্য নিয়ে একটি কমিটি গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক করা হয় আমাকে (গাজীউল হক), 'রাজবন্দী মুক্তি আন্দোলন কমিটি'র সেই প্রথম সভায় যাঁরা বক্তৃতা করেছিলেন, তাঁদের মধ্যে ছিলেন: জিল্লুর রহমান, নাদিরা বেগম এবং শামসুল হক চৌধুরী (হাফিজ, ২০১৭)।

প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, পাকিস্তান রাষ্ট্রের জন্মের পর জিল্লুর রহমানের সভাপতিত্বে গঠিত এ কমিটিই ছিল প্রথম 'রাজবন্দি মুক্তি আন্দোলন কমিটি'। ২০শে ফেব্রুয়ারি ফজলুল হক হল ও ঢাকা হলের মাঝখনের পুকুরপাড়ে যে ১১ জন ছাত্রনেতার নেতৃত্বে ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, জিল্লুর রহমান ছিলেন তাঁদের অন্যতম। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতি নিয়ে তিনি লিখেছেন:

> একটি ঘটনা আমার বেশ স্পষ্ট মনে আছে, ২১ ফেব্রুয়ারি আমরা যে সভা করব এবং ১৪৪ ধারা ভাঙব, এর পোস্টার ফজলুল হক হলের ই/১৮ নং কামরার (গাজীউল হক এ রুমে থাকতেন) মেঝেতে বসে গাজীউল হক সাহেব স্বহস্তে লিখেছিলেন। পোস্টারগুলো দেয়ালে লাগিয়ে দেওয়া হয়। ২১ ফেব্রুয়ারি সকালবেলা ঢাকা শহরের স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা স্রোতের মত বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বরে সমবেত হতে থাকে। সেদিন অনেক ছাত্রীও সেখানে এসেছিল; ইতিপূর্বে কোন সভা-সমিতিতে এমন ছাত্রী সমাবেশ দেখা যায়নি (আলীম, ২০১৯)।

জিল্লুর রহমান আরো লিখেছেন:

> শেষপর্যন্ত আমাদের সিদ্ধান্ত হল যে, একসাথে গেলে পুলিশ লাঠিচার্জ করে, গুলি ছুড়ে আমাদের নাস্তানাবুদ করে দেবে। আমরা অ্যাসেম্বলী হাউজে পৌঁছাতেই পারব না। আমরা সেসময় খবর

> পেয়েছিলাম যে আইয়ুব খান অস্ত্রশস্ত্রে সজ্জিত একটি বাহিনী নিয়ে অ্যাসেম্বলী হাউজের পেছনে অবস্থান করছেন। আমরা শেষ পর্যন্ত ঠিক করলাম যে, পাঁচজন করে গেট দিয়ে বেরিয়ে অ্যাসেম্বলী হাউজের (বর্তমান জগন্নাথ হল) দিকে যাবো। সকলেই এ প্রস্তাব মেনে নিল। পাঁচজন ছাত্রী গেট দিয়ে বেরিয়ে সেদিকে চলে গেল। আমরা প্রথমে মেয়েদের পাঠিয়েছিলাম একথা ভেবে যে, তাদের গায়ে চট করে হাত দেয়ার সাহস পুলিশ পাবে না। তাছাড়া তখন বিশ্ববিদ্যালয়ের চত্বর থেকে পুলিশের দিকে ইট পাটকেল ছোঁড়া হচ্ছিল। তারাও আমাদের লক্ষ্য করে চত্বরের ভেতরে টিয়ারগ্যাস নিক্ষেপ করছিল। একটা খণ্ডযুদ্ধই চলছিল তখন (আলীম, ২০১৯)।

ভাষা আন্দোলনে যুক্ত থাকায় জিল্লুর রহমানও রাজরোষে পড়েছিলেন। ১৯৫৩ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বেশ কয়েকজন ছাত্রকে বহিষ্কার করা হয়েছিল। সে-সময় বাংলা ভাষাকে কেন্দ্র করে বিশ্ববিদ্যালয় চত্বরে নানা সভা-সমাবেশ হতো, যা সরকারের চক্ষুশূল হয়ে দাঁড়ায়। কিন্তু জিল্লুর রহমানসহ কিছু ছাত্রনেতা সভা-সমাবেশ না করা বিষয়ক প্রশাসনের কালাকানুনকে তোয়াক্কা করেননি। ফলে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ জিল্লুর রহমানসহ ১০ জনকে বহিষ্কার করে এবং প্রতিবাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা তিনমাস ধরে নানা প্রতিবাদ, ধর্মঘট অব্যাহত রাখলে অবশেষে বহিষ্কারাদেশ প্রত্যাহার করে ডিগ্রি ফেরত দিতে বাধ্য হয় (আলীম, ২০১৯)।

আনোয়ারা খাতুন (১৯১৭-১৯৮৮)

১৯৪০-৪১ শিক্ষাবর্ষে আনোয়ারা খাতুন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগে ভর্তি হন। এ বিভাগের প্রথম মুসলমান ছাত্রী তিনি। ১৯৪২ সালে ইতিহাস বিষয়ে তিনি এমএ ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। ১৯৪৬ সালে তিনি বঙ্গীয় আইনসভার সদস্য মনোনীত হয়ে বীণা দাশ, নেলী সেনগুপ্তা, হাসনে আরা বেগম ও আশালতা সেন প্রমুখের সাথে একত্রে নানা রাজনৈতিক কাজে যুক্ত হন (চক্রবর্তী, ২০০৬)। পরবর্তীকালে তিনি পূর্ব-বাংলার আইন পরিষদের সদস্য মনোনীত হন। ১৯৫২ সালে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের সময় আনোয়ারা খাতুনের যে ভূমিকা ছিল, তা বাংলাদেশের নারীর ইতিহাসে চিরকাল দেদীপ্যমান থাকবে। বাংলাভাষা প্রশ্নে পাকিস্তান গণপরিষদের সিদ্ধান্ত এবং এ প্রসঙ্গে সরকার ও সরকারি দলের মারমুখী আচরণের প্রতিক্রিয়ায় ভাষা আন্দোলনকে সংগঠিত করার জন্য ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদের প্রতিষ্ঠালগ্নে অনুষ্ঠিত সভায় আনোয়ারা খাতুন যোগ দিয়ে বাংলা ভাষার পক্ষে নিজস্ব মতামত উপস্থাপন করেছিলেন (চক্রবর্তী, ২০০৬)। আনোয়ারা খাতুন সম্পর্কে গাজীউল হকের লেখায় উল্লেখ আছে:

> ২রা মার্চ তারিখে ফজলুল হক হল মিলনায়তনে একটি বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। এই বৈঠকে যোগ দেন 'পূর্ব পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ', 'তমদ্দুন মজলিস', 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ', বিভিন্ন হলের ছাত্র নেতৃবৃন্দ এবং প্রগতি লেখক সংঘ ও অন্যান্য যে সমস্ত সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান ছিল, তাদের প্রতিনিধিগণ। যাঁরা সেদিন উপস্থিত ছিলেন, যতদূর মনে পড়ে, তাঁরা হলেন– শামসুল আলম, শওকত ভাই, তোয়াহা সাহেব, তাজউদ্দিন, শহীদুল্লাহ কায়সার, লিলি খান, কাজী গোলাম মাহবুব, নঈমুদ্দিন আহমদ, শামসুল হক, আনোয়ারা খাতুন (হাফিজ, ২০১৭)।

এ থেকে প্রতীয়মান হয়, পাকিস্তানের জন্মের অব্যবহিত পর মুসলিম একটি পরিবার থেকে এসে আনোয়ারা খাতুনের দুঃসাহসিক কর্মতৎপরতা সেদিন সকলকে বিস্মিত না করে পারেনি। আনোয়ারা খাতুন ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে চিরভাস্বর হয়ে রইলেন। এরপর ১৩ই মার্চ অনুষ্ঠিত পরিষদের উপকমিটির বৈঠকেও

উপস্থিত ছিলেন আনোয়ারা খাতুন। ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা শুনে তিনি তীব্র প্রতিবাদ করেন। সে-সময় আইন পরিষদে অধিবেশন চলছিল। তখন তিনি স্পিকারকে বারবার ঘটনাস্থল পরিদর্শনের আহ্বান জানান। একপর্যায়ে আনোয়ারা খাতুন অধিবেশন বর্জন করে এবং কয়েকজন পরিষদ সদস্যকে সাথে নিয়ে পরিষদ ভবন ত্যাগ করে বাইরে অপেক্ষমাণ ছাত্র-জনতার সামনে মিলিত হন। এরপর তিনি ভাষা আন্দোলনে গ্রেপ্তারকৃতদের অবস্থা জানতে এবং তাঁদের মুক্তিদানের জন্য আইন পরিষদে কয়েকবার প্রশ্ন উত্থাপন করেন (চক্রবর্তী, ২০০৬)।

সেদিনের ঘটনা ও পরিষদ ভবনের সদস্যরূপে আনোয়ারা খাতুনের ভূমিকা সম্পর্কে জানা যায়:

> ২১ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ হোস্টেলের কাছাকাছি ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশনে যোগদানের জন্য সভার সদস্যরা পরিষদভবনে যখন উপস্থিত ছিলেন সেই সময়েই ছাত্রদের উপর গুলীবর্ষণ করা হয়। গুলীর আওয়াজ সেখান থেকেও শোনা যায়। গুলীর কিছুক্ষণ পর ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের যেদিকে পরিষদ ভবন অবস্থিত সেদিকে সমবেত হয়ে পরিষদ সদস্যদেরকে বাইরে বের হয়ে আসার জন্য চিৎকার করে আহ্বান জানাতে থাকে। এসময় পরিষদের অভ্যন্তরেও দারুণ হট্টগোল শুরু হয়।... ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ও মনোরঞ্জন ধর নূরুল আমীনকে বলেন যে, তাঁর উচিত তৎক্ষণাৎ মেডিক্যাল হাসপাতাল পরিদর্শন করা এবং তারপর পরিস্থিতি সম্পর্কে পরিষদে বিবৃতি দেওয়া। নূরুল আমীন এই প্রস্তাবে সম্মত না হওয়ায় বিরোধী পক্ষীয় সদস্যগণ সেদিনের মতো অধিবেশন স্থগিত রাখার দাবী রাখেন। কিন্তু নূরুল আমীন বিরোধী পক্ষের দাবী অগ্রাহ্য করে নিজের বিবৃতি দিতে শুরু করলে পুলিশের গুলীবর্ষণের প্রতিবাদে পরিষদের অধিবেশন বর্জন করে মাওলানা আবদুর রশিদ তর্কবাগীশ, আবুল কালাম শামসুদ্দীন, আনোয়ারা খাতুন এবং আলী আহমদ খান পরিষদ ভবন পরিত্যাগ করে বাইরে ছাত্রদের সামনে উপস্থিত হন (মাহবুবউল্লাহ, ২০০৮)।

ড. পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের মেধাবী ছাত্র ও প্রথিতযশা শিক্ষক ড. পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী। রাজনীতির ক্ষেত্রে পৃথ্বীশচন্দ্র ছিলেন একজন ভিন্নধর্মী ব্যক্তিত্ব। বিশেষ কোনো রাজনৈতিক দলের সদস্য বা প্রকাশ্য সমর্থক ছিলেন না তিনি। বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতির সাথেও ছিল না সক্রিয় সংশ্রব। তবে রাজনীতির ব্যাপারে তাঁর নিজস্ব দর্শন ছিল। রাজনীতি বলতে তিনি বুঝতেন স্বদেশপ্রেম ও জাতীয়তাবাদ। স্বদেশের প্রতি ও এ জাতির প্রতি অকৃত্রিম দরদ ও ভালোবাসা ছিল তাঁর জীবনাদর্শের প্রধান বৈশিষ্ট্য। সমকালীন রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহ সম্পর্কে তিনি ছিলেন সদা সজাগ। রাষ্ট্রভাষা বাংলার প্রশ্নে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদের নিকট শ্রেণিকক্ষে তিনি তাঁর পক্ষপাত, অবিচল ও অটল সমর্থন নিয়ে কথা বলতেন।

ভাষা আন্দোলনের সাথে সক্রিয়ভাবে সংশ্লিষ্ট মনে করে ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে পুলিশ জন-নিরাপত্তা অধ্যাদেশ বলে পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তীকে আটক করে। উল্লেখ্য, এ-সময় তিনি ইতিহাস বিভাগে রিডার, আন্তর্জাতিক সম্পর্ক বিভাগের ভারপ্রাপ্ত সভাপতি ও জগন্নাথ হল ছাত্রাবাসের প্রাধ্যক্ষ হিসেবে দায়িত্ব পালন করছিলেন। ভাষার প্রশ্নে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর পক্ষপাতের কারণে তাঁকে রাজরোষের শিকার হতে হয়। ১৫ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদের সভায় গৃহীত সিদ্ধান্ত মোতাবেক তাঁকে সাময়িকভাবে বরখাস্ত করা হয়।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্যনির্বাহী পরিষদে তাঁর বিরুদ্ধে আনীত তিনটি অভিযোগের মধ্যে একটি ছিল তিনি ১৯৪৮ সালের ২৪শে মার্চ মুহম্মদ আলী জিন্নাহ প্রদত্ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন বক্তৃতাকে হিটলারের বক্তৃতার সাথে তুলনা করেছেন। পৃথ্বীশচন্দ্র না কি আরো বলেছেন যে, পাকিস্তানের কাশ্মীর দাবি অসমর্থনীয় এবং পাখতুনিস্থানের দাবি যুক্তিযুক্ত। বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ এই অভিযোগের উত্তরে জানান যে, এরূপ মন্তব্য সাধারণ ছাত্রদের মধ্যে উত্তেজনা সৃষ্টি করতে পারে সত্য, তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের কাছে এ বিষয়ে নির্ভরযোগ্য কোনো তথ্য নেই। পরে অবশ্য জননিরাপত্তা আইনে গ্রেপ্তারকাণ্ডকে ঢাল হিসেবে ব্যবহার করে কর্তৃপক্ষ তাঁকে অপসারণের পথে অগ্রসর হয়। উল্লেখ্য ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ভাষা আন্দোলনের জন্য সমবেত ছাত্র-জনতার উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এ ঘটনায় ২৫শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের তিনজন অধ্যাপক গ্রেফতার হন। তাঁরা হলেন, ড. পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী, মুনীর চৌধুরী ও ড. মুজাফ্ফর আহমেদ চৌধুরী। ২৫শে ফেব্রুয়ারি রাতে জননিরাপত্তা আইনে ড. পৃথ্বীশচন্দ্র তাঁর বাসা থেকে গ্রেফতার হন। ১৫ই মার্চ ১৯৫২ তারিখে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত নেয়:

> Dr. P. C. Chakravarti, Reader in History, temporary honorary reader and acting Head of the department of International Relations and provost, Dacca Hall, be placed under suspension with effect from the date of arrest under public safety ordinance. (Record Room, DU).

মার্চ মাসের শেষ দিকে ড. পৃথ্বীশচন্দ্র জামিনে মুক্ত হন। কিন্তু ইতোমধ্যে পাকিস্তান রাষ্ট্র, সরকার ও সরকার-অনুগত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের নিকট তিনি অনাকাঙ্ক্ষিত ব্যক্তিত্ব। তাঁর বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে চলে আলোচনা। শেষে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সরকারি নির্দেশে ড. পৃথ্বীশচন্দ্রকে কেন চাকরিচ্যুত করা হবে না, তা জানতে কৈফিয়ত তলব করেন। আসলে এ কৈফিয়ত তলব ছিল তাঁর বিরুদ্ধে স্থায়ী ব্যবস্থা নেওয়ার তৎপরতার অংশ। এরকম রাজরোষ তথা নির্যাতনের হাত থেকে রক্ষা পেতে তখন তিনি অনন্যোপায় হয়ে উপাচার্যকে লিখেন যে, জননিরাপত্তা আইনে কেউ গ্রেফতার হলেই দোষী প্রমাণিত হয়ে যায় না। উপাচার্যকে লিখিত পত্রে পৃথ্বীশচন্দ্র উল্লেখ করেন:

> Arrest under the public safety ordinance does not establish guilt of any person. You would have been perfectly within your rights to take any action against me if I were convicted by a competent court of law. In fact I was never informed of the grounds of my arrest, if the grounds were communicated to me, I would have been able to prove to the satisfaction of the authorities that I was not guilty of any offense against the state. (Record Room, DU).

এই উত্তর নিয়ে সরকারের ক্রীড়নক বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য করণীয় ঠিক করতে পূর্ব-বাংলার শিক্ষা সচিবের সাথে পত্রালাপ করেন এবং পৃথ্বীশচন্দ্রের নিকট থেকে পদত্যাগপত্র গ্রহণ করেন। ড. পৃথ্বীশচন্দ্র ১৬ই এপ্রিল উপাচার্য বরাবর পদত্যাগপত্র প্রেরণ করেন। এ থেকে সুস্পষ্ট যে, পৃথ্বীশচন্দ্র চক্রবর্তী শিক্ষাব্রতী হলেও তিনি পরিকল্পিতভাবে কাল্পনিক দেশদ্রোহিতার অভিযোগে রাজরোষে পতিত হন।

উপসংহার

সার্বিক মূল্যায়নে বলা যায়, মহান ভাষা আন্দোলনে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষক-শিক্ষার্থীর অবদান খুবই উজ্জ্বল। ভাষা আন্দোলনের প্রথম গান রচয়িতা, প্রথম পোস্টার-লিখন, প্রথম ১৪৪ ধারা অমান্য

করে মিছিল করা এ সব কিছুতেই নেতৃত্ব দেন ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থীরা। '৫২-পরবর্তী সময়ে একুশের চেতনার চর্চা এবং বিস্তারেও তাঁরা সক্রিয় ছিলেন। প্রকৃতপক্ষে ভাষা আন্দোলন ও ইতিহাস বিভাগ একসূত্রে গাঁথা। ইতিহাস বিভাগে সূচনাকাল থেকেই একদল মানবতাবাদী, সমাজমুখী, দেশপ্রেমিক ও প্রগতিবাদী শিক্ষার্থী-শিক্ষকের উপস্থিতি ছিল। পাকিস্তানি শাসনের যবনিকাপাত ঘটাতে পূর্ব-বাংলার জনগণ ১৯৪৮ সাল থেকে ১৯৫২ সাল কালপর্বে যে শক্তি সঞ্চয় করেছিল, সে সঞ্চয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগের শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের অবদান ছিল বিপুল। ভাষা আন্দোলনে এ বিভাগের শিক্ষার্থী ও শিক্ষকগণ প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ দু'ভাবেই জড়িত ছিলেন। ১৯৪৭ সালে নতুন রাষ্ট্ররূপে আত্মপ্রকাশের সময়েই শাসকগোষ্ঠী যে 'সাংস্কৃতিক সাম্রাজ্যবাদ' নীতি বাস্তবায়নে তৎপর হয়েছিল, তার প্রতিবাদ ও প্রতিরোধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ গ্রহণ করেছিল অগ্রণী ভূমিকা।

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান। (২০১৫)। *কাল নিরবধি*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

আলীম, ড. এম আব্দুল। (২০১৯)। *ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিব কতিপয় দলীল*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আহমদ, তাজউদ্দীন। (২০১৪)। *তাজউদ্দীন আহমদের ডায়েরি ১৯৫১*। তৃতীয় খণ্ড। ঢাকা: প্রতিভাস।

উমর, বদরুদ্দীন। (২০০৮)। 'ভাষা আন্দোলন'। *মহান একুশে সুবর্ণজয়ন্তী গ্রন্থ* [সম্পা. মাহবুবউল্লাহ]। ঢাকা: অ্যাডর্ন পাবলিকেশন।

চক্রবর্তী, রতনলাল। (২০০২)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ*। ঢাকা: কল্যাণ প্রকাশন।

চক্রবর্তী, রতনলাল। (২০১৫)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: দি ইউনিভার্সাল একাডেমি।

চক্রবতী, ড. রতনলাল। (২০০৬)। *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নারী*। ঢাকা: কল্যাণ প্রকাশন।

চক্রবতী, ড. রতনলাল। (২০১০)। *রাজারোষ দুর্ভোগের নবব্যাকরণ*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সাল একাডেমি।

দেব, মিলটন কুমার। (২০২৪)। *১৯৭১: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাস বিভাগ*। ঢাকা: কথা প্রকাশ।

দেব, মিলটন কুমার। (২০২৪)। *রমেশচন্দ্র মজুমদার: জীবন ও সৃজন*। ঢাকা: দ্যু প্রকাশন।

রেজা, সি এম তারেক। (২০০৪)। *২১ ভাষা আন্দোলনের সচিত্র ইতিহাস*। ঢাকা: নিমফিয়া পাবলিকেশন।

শেলী, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান। (১৯৮০)। 'স্মৃতিচারণ'। *একুশের সংকলন '৮০*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

সুলতান, আমিনুর রহমান। (২০২০)। *ভাষাসংগ্রামী গাজীউল হক*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হক, গাজীউল। (২০০০)। *আমার দেখা আমার লেখা*। ঢাকা: মেরী প্রকাশন।

হক, গাজীউল। (২০১৭)। 'যার যা ভূমিকা'। *আমাদের একুশে ফেব্রুয়ারি* [সম্পা. হাসান হাফিজ]। ঢাকা: অনন্যা।

হোসেন, আশফাক ও ইসলাম, আশা (২০২২)। *শতবর্ষে ইতিহাস বিভাগ : অতীতের আলোয় বর্তমান ও ভবিষ্যত* (সম্পা.)।

ইতিহাস বিভাগ, ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

ব্যক্তিগত ফাইল

Personal file of Dr. P. C. Chakrabory, Record Room, University of Dhaka.
Personal file of Md.Habibur Rahman, Record Room, University of Dhaka.

দৈনিক পত্রিকা

The Amrita Bazar Patrika, 16 March, 1948

প্রথম আলো, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০০২

জাগরণ অনলাইন, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২১

জগন্নাথ কলেজের প্রতিষ্ঠার ইতিহাস ও ভাষা আন্দোলনে জগন্নাথ কলেজের অবদান

শামীম আরা

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookAShameem

ভাষা আন্দোলন পূর্ব-বাংলার জনমানুষের সামষ্টিক অভিজ্ঞতায় তাৎপর্যপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। এ আন্দোলনকে কেন্দ্র করে গড়ে ওঠা ভাষাভিত্তিক জাতীয়তাবাদ ক্রমে বিকশিত ও পরিপুষ্ট হয়ে পূর্ববঙ্গের মানুষকে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ করেছিল, যা পরবর্তীকালে স্বাধিকার আন্দোলনের রূপ নেয় এবং সশস্ত্র মুক্তিযুদ্ধের মাধ্যমে এ অঞ্চলের মানুষকে একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র গঠনে সহায়তা করে। ১৯৪৭ সালের দেশভাগের পর উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ গ্রহণ করলে প্রথমে সচেতন বুদ্ধিজীবীগণ পত্র-পত্রিকায় লেখালেখি ও সভা-সমিতিতে বক্তৃতার মাধ্যমে প্রতিবাদ করেন। পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব নাকচ হয়ে গেলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা প্রতিবাদ করেন। এ সময় যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলো অগ্রগণ্য ভূমিকা পালন করেছে, তাদের মধ্যে আজকের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় অর্থাৎ তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ অন্যতম। বর্তমান গবেষণা-প্রবন্ধে সুনির্দিষ্ট গবেষণা-পদ্ধতির আলোকে বিভিন্ন দালিলিক প্রমাণের ভিত্তিতে জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভাষা আন্দোলনে অবদান সম্পর্কে আলোচনা-পর্যালোচনা, বিশ্লেষণ ও মূল্যায়ন করা হয়েছে।

জগন্নাথ কলেজের ইতিহাস

জগন্নাথ কলেজের ইতিহাস জানতে হলে শুরুটা করতে হবে ঢাকাস্থ ব্রাহ্ম স্কুল থেকে। ১৮৪৬ খ্রিষ্টাব্দে ব্রজসুন্দর মিত্রের নেতৃত্বে ঢাকায় ব্রাহ্মসমাজ প্রতিষ্ঠিত হয়। ১৮৬০ খ্রিষ্টাব্দের মধ্যেই এ সমাজটি ঢাকায় তাদের নিজেদের অবস্থানকে মজবুত করে নেয়। ব্রাহ্ম আন্দোলনের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্যকে সামনে রেখে তারা সকল ধর্ম ও বর্ণের শিক্ষার্থীদের জন্য উন্মুক্ত একটি বিদ্যালয় স্থাপনের তাগিদ অনুভব করে। সেই সময় ব্রাহ্ম আন্দোলনের নেতা দীননাথ সেন, অনাথবন্ধু মৌলিক, পার্বতীচরণ রায়, ব্রজসুন্দর মিত্র প্রমুখের প্রচেষ্টায় ১৮৫৮ খ্রিষ্টাব্দে ব্রাহ্ম স্কুল যাত্রা শুরু করে। বিষয়টি স্পষ্ট করার জন্য প্রসঙ্গত মুনতাসীর মামুনের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য। তিনি বলেছেন:

> আদিনাথ সেন লিখেছেন, তাঁর বাবা দীননাথ সেন এ স্কুল স্থাপনে মনস্থ করে জানিয়েছিলেন ব্রজসুন্দরকে যিনি তখন ছিলেন কুমিল্লায়। ব্রজসুন্দর এই বিদ্যালয়ের জন্য মাসিক ত্রিশ টাকা অর্থ সাহায্য ও তাঁর বাড়ির নিচের কামরাগুলো বিদ্যালয়ের কাজের জন্য ছাড়িয়া দিতে সম্মত হইলেন। ১৮৬০ খৃ. ঢাকায় ব্রাহ্ম স্কুল সংস্থাপিত হয়। কিন্তু আদিনাথ আবার ১৮৫৯ সালে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডার উদ্ধৃত করেছেন, যেখানে ১৮৫৮ সালে ব্রাহ্ম স্কুল স্থাপনের উল্লেখ আছে এবং সেখানে প্রতিষ্ঠাতা উপরোল্লিখিত চারজনের নাম ঠিক আছে। জগন্নাথ কলেজের এক সময়ের অধ্যাপক ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায় ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা সাল উল্লেখ করেছেন ১৮৬৬ সাল বলে। অনাথবন্ধু মৌলিক তাঁর স্মৃতিচারণে যে সময় ব্রাহ্ম স্কুল স্থাপিত হয়েছিল বলে উল্লেখ করেছেন সে সময় হিসাব করলে দাঁড়ায় ১৮৫৮/৫৯। শরিফউদ্দিন ব্রাহ্ম বিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাকাল ১৮৬৩ সালে

> উল্লেখ করেছেন। আদিনাথ যে সময়টার কথা লিখেছেন, অর্থাৎ দীননাথ যখন ব্রজসুন্দরকে কুমিল্লায় চিঠি লিখলেন, সে সময়টা হবে ১৮৫০-৫১। কারণ ব্রজসুন্দর সে সময় কুমিল্লায় ছিলেন। এ পরিপ্রেক্ষিতে ধরে নিতে পারি প্রতিষ্ঠাতা অনাথবন্ধু ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেন্ডারই সঠিক, অর্থাৎ ব্রাহ্ম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৮৫৮ সালে, ব্রজসুন্দরের আর্মেনিটোলার বাসায় এবং প্রাথমিকভাবে খুব সম্ভব ব্রজসুন্দর স্কুলকে অর্থ সাহায্যও করতেন যার ইঙ্গিত দিয়েছেন আদিনাথ সেন আগে (চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ৩৯-৪০)।

'জগন্নাথ কলেজ: ইতিহাস প্রসঙ্গ' নামক প্রবন্ধে (রশিদ, ১৯৯২) মির্জা হারুণ-অর রশিদের বিস্তৃত বর্ণনা থেকে জানা যায়, কলকাতায় রাজা রামমোহন রায়ের উদ্যোগে ব্রাহ্মধর্মের (২০শে আগস্ট ১৮২৮) প্রতিষ্ঠা হলে তার প্রভাবে পূর্ববাংলায় কতিপয় উৎসাহী যুবক ব্রাহ্মধর্মের প্রতিষ্ঠা করেন ১৮৪৬ সালের ৬ই ডিসেম্বর (১২৫৩ বঙ্গাব্দের ২২শে অগ্রহায়ণ)। এদের মধ্যে প্রধান হলেন শ্রী ব্রজসুন্দর মিত্র, যাদবচন্দ্র বসু, রামকুমার বসু, গোবিন্দচন্দ্র বসু, বিশ্বম্ভর দাস, নরোত্তম মল্লিক প্রমুখ। এদের মধ্যে ব্রজসুন্দর মিত্র ছিলেন সর্বাপেক্ষা প্রভাবশালী, কর্মতৎপর ও একনিষ্ঠ ব্রাহ্ম যুবক। তিনি ১৯৪০ সালে ১৯ বছর বয়সে ঢাকার কমিশনারের ১৮ টাকা বেতনের সামান্য সেরেস্তাদার পদ থেকে ৭০০ টাকা বেতনের ডেপুটি কালেক্টর, সার্ভেয়ার পদে উন্নীত হন। ব্রজসুন্দর বদলি অবস্থায় যখন কুমিল্লায় বাস করছিলেন, সেই সময় ব্রাহ্ম সন্তানদের শিক্ষালাভ ও একই সাথে ধর্মচর্চায় উন্নতির জন্য একটি ব্রাহ্ম স্কুল প্রতিষ্ঠার উদ্যোগ গ্রহণ করেন এবং তাঁর ইচ্ছানুযায়ী তাঁরই আর্মানিটোলাস্থ বাড়ির নিচের তলায় ব্রাহ্ম স্কুল প্রতিষ্ঠিত হয় ১৮৬৩ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি (১২৬৯ বঙ্গাব্দের ১২ই ফাল্গুন)। এ স্কুল সম্পর্কে তৎকালীন *ঢাকা প্রকাশ* পত্রিকায় নিম্নরূপ বিজ্ঞাপন ছাপা হয়েছিল:

> এতদ্বারা জ্ঞাপন করা যাইতেছে ঢাকা আর্মানিটোলা ব্রাহ্ম সমাজ গৃহে ১২ই ফাল্গুন একটি ব্রাহ্মবিদ্যালয় সংস্থাপিত হইয়াছে, এই বিদ্যালয়ে বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পরীক্ষার পাঠ্যপুস্তকাদি অর্থাৎ অন্যান্য বাঙ্গালা বিদ্যালয়ে যে যে বিষয়ের শিক্ষা হইয়া থাকে তাহা এবং তদতিরিক্ত ব্রাহ্মধর্ম ও ধর্মনীতি শিক্ষা দেওয়া হইবে।... সকল জাতীয় ছাত্রেরই ইহাতে প্রবেশাধিকার আছে। ছাত্রদের নিকট হইতে বেতন লওয়া হইবে না।
>
> শিক্ষক
> শ্রী দীননাথ সেন,
> সম্পাদক
> শ্রী গোবিন্দ প্রসাদ রায়।
> (*স্মরণিকা*, ১৯৯২, পৃ. ২৫)

১৮৬৮ সালে জগন্নাথ রায় চৌধুরী জগন্নাথ স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন। জগন্নাথ কলেজের একটি পুরাতন রেকর্ডে এ তথ্য পাওয়া যায়। ব্রাহ্ম স্কুলটি বছর দশেক চলার পর তার বিলুপ্তি ঘটে এবং জগন্নাথ স্কুলের সঙ্গে একাত্ম হয়ে যায়। খুব গুরুত্বপূর্ণ তথ্য দিয়েছেন শ্রী বঙ্ক বিহারী কর তাঁর *পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্ম সমাজের ইতিবৃত্ত* গ্রন্থে। তিনি বলেছেন:

> ...তখন ইহাতে (ব্রাহ্ম স্কুল) ছাত্রবৃত্তি পর্যন্ত পড়ানো হইত। ক্রমে উহার উন্নতি হইয়া এন্ট্রান্স পরীক্ষা দানের ব্যবস্থা হয়। ইহা প্রায় দশ বৎসর স্বীয় অস্তিত্ব বজায় রাখিয়া ব্রাহ্মগণের হস্তচ্যুত এবং জগন্নাথ স্কুলে পরিণত হয়। বালিয়াটি (মানিকগঞ্জ) এর জমিদার জগন্নাথ বাবুর মধ্যম পুত্র (জগন্নাথ রায়

> চৌধুরীর তিন সন্তান ছিল) কিশোরী বাবু পিতার নামে বিদ্যালয়ের নামকরণে ইচ্ছুক এবং বিদ্যালয়ের উন্নতির জন্য অগ্রসর হওয়ায় পরিচালকগণ সম্মত হন। পরে কলেজ বিভাগ খুলিলে জগন্নাথ কলেজ নাম হয়। শিক্ষা বিভাগ পরে কলেজ হইতে স্কুল স্বতন্ত্র করিলে কিশোরী বাবুর নামে স্কুলের নাম জুবিলি স্কুল হয় (কর, ১৯৫১, পৃ. ০৪)।

উল্লেখ্য, জগন্নাথ স্কুল যখন প্রতিষ্ঠিত হয় তখন তার দু'দিকে দুইটি স্কুল আগে থেকেই শিক্ষা দান করে আসছিল। এর একটি হল কলেজিয়েট স্কুল (স্থাপিত ১৮৩৫), অন্যটি পোগোজ স্কুল। একজন আরমানি জমিদার সি এস পি পোগোজ ১৮৪৮ সালে এই বিদ্যালয়টি স্থাপন করেন। তিনি এই স্কুলের প্রথম হেডমাস্টার ছিলেন এবং তাঁর নাম অনুসারেই এই স্কুলের নাম হয় পোগোজ স্কুল। প্রথম ভারতীয় প্রি ভি কাউন্সিলার স্যার কে. জি. গুপ্ত, ঢাকা কলেজ ও প্রেসিডেন্সি কলেজের প্রথম ভারতীয় প্রিন্সিপ্যাল ড. পি. কে. রায়, পশ্চিম বাংলার ভূতপূর্ব মুখ্যমন্ত্রী ড. প্রফুল্লচন্দ্র ঘোষ এবং বিখ্যাত রাজনীতিবিদ আতাউর রহমান খান এই স্কুলের ছাত্র ছিলেন। আতাউর রহমান খান জগন্নাথ কলেজেরও ছাত্র ছিলেন। ঢাকার প্রখ্যাত অ্যাডভোকেট হৃদয়নাথ মজুমদার, পোগোজ স্কুলে পড়েছিলেন ১৮৭০ পর্যন্ত; এরপর ভর্তি হয়েছিলেন কলেজিয়েট স্কুলে। কলেজিয়েট স্কুলে চার বছর পড়ার পর আবার ভর্তি হয়েছিলেন জগন্নাথ স্কুলে। জগন্নাথ স্কুল থেকে মাসিক পনেরো টাকা বৃত্তি পেয়ে পাস করেছিলেন এন্ট্রান্স। হৃদয়নাথ মজুমদার তাঁর *The Reminiscence of Dacca* (1926) গ্রন্থে লিখেছেন:

> কলেজিয়েট, পোগোজ স্কুলের অনেক পরে স্থাপিত হয়েও জগন্নাথ স্কুল এগিয়ে গিয়েছিল। স্কুলের হেডমাষ্টার গোপীমোহন বসাকের কর্মদক্ষতার জন্যই তা সম্ভব হয়েছিল। বসাক ছিলেন পোগোজ স্কুলে, কিন্তু জগন্নাথ স্কুল প্রতিষ্ঠিত হলে তাতে যোগ দিয়েছিলেন হেডমাষ্টার হিসেবে। স্কুলের ছাত্র সংখ্যা বৃদ্ধি হয়েছিল দ্রুত। শুধু তাই নয়, গোপীনাথের আমলে ৫/৬ বছর এন্ট্রান্স পরীক্ষায় প্রথম হয়েছিল জগন্নাথ স্কুল (মজুমদার, 1926)।

জগন্নাথ কলেজের শতবর্ষ উৎসব উদ্‌যাপন অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন কালীশঙ্কর রায়চৌধুরী। উল্লেখ্য কালীশঙ্কর রায়চৌধুরী ব্যতীত জগন্নাথ রায়ের কোনো উত্তরপুরুষ বাংলাদেশ এবং ভারতে নেই। কালীশঙ্কর রায়চৌধুরীর অন্য দুই ভাই ও এক বোন ভারতে চলে যান এবং সেখানে মৃত্যুবরণ করেন। কালীশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রদত্ত বংশ-তালিকাটি উপস্থাপন করা হলো। শ্রদ্ধেয় কালীশঙ্কর রায়চৌধুরী এখনো বেঁচে আছেন, তবে বেশ অসুস্থ। এই অবস্থায় আমি তাঁর একটি সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছি। সে সময় তিনি আমাকে বংশ-তালিকা ও বহু উল্লেখযোগ্য তথ্য প্রদান করেন (আরা, ২৩শে জুন, ২০২৪)।

কালীশঙ্কর রায়চৌধুরী প্রদত্ত জগন্নাথ রায় চৌধুরীর বংশ-তালিকা:

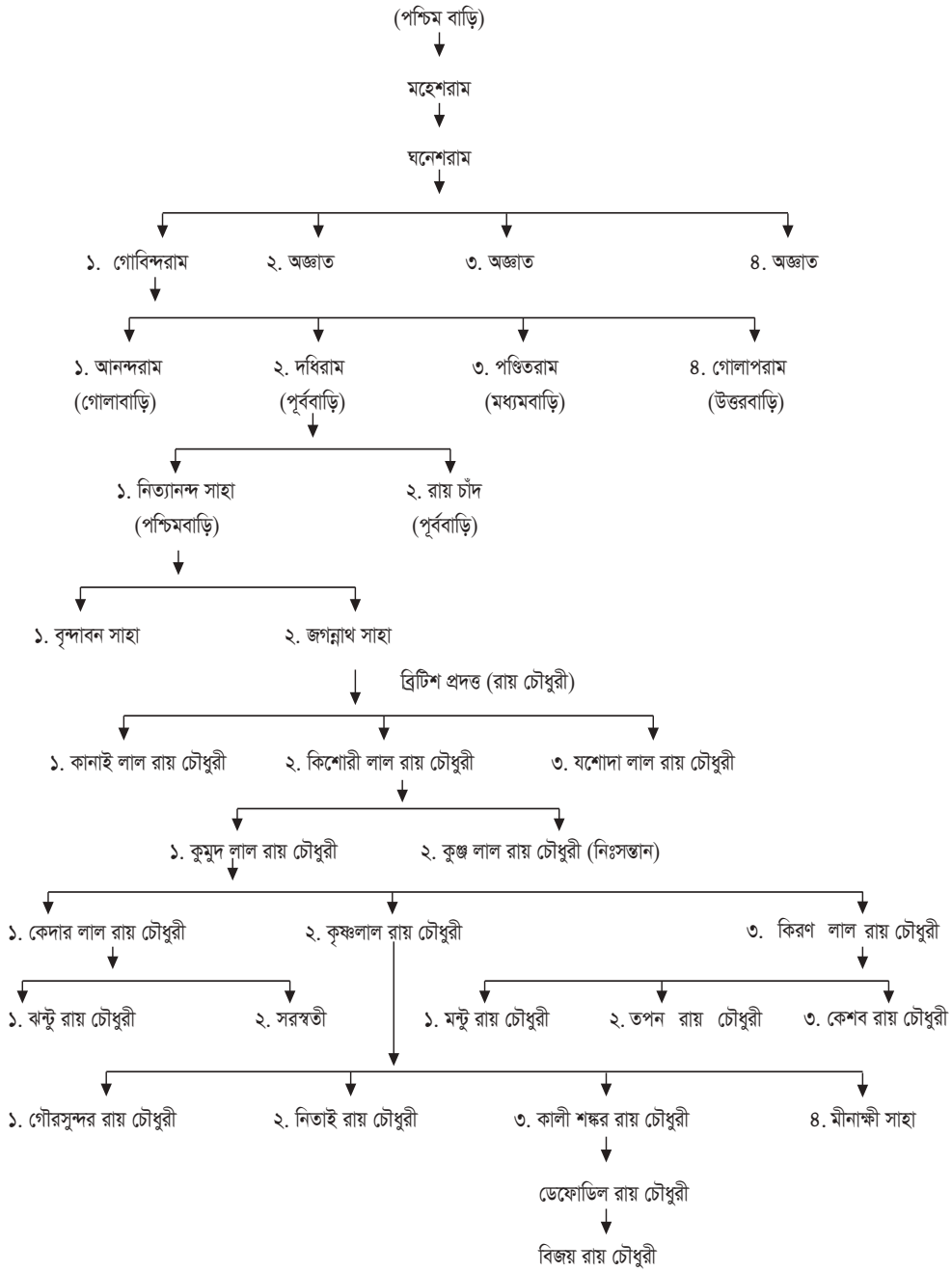

* কালীশঙ্কর রায়চৌধুরী ব্যতীত জমিদারগণের উত্তরপুরুষ বাংলাদেশে কেউ নেই

উক্ত অনুষ্ঠানের বক্তব্যে কালীশঙ্কর রায়চৌধুরী বলেন:

> আমি জগন্নাথ কলেজের একজন প্রাক্তন ছাত্র। ১৯৬৯-৭১ শিক্ষাবর্ষে দুই বৎসর এখানে আই কম পড়েছি। জগন্নাথ কলেজের প্রতিষ্ঠাতা মহাত্মা কিশোরী লাল রায় চৌধুরী আমার ঠাকুরদাদার পিতা ছিলেন। তিনি ছিলেন সাটুরিয়া থানার বালিয়াটির বিখ্যাত জমিদার। আজও লোকমুখে একটি কথা প্রচলিত আছে – 'ডালের মধ্যে মুশুরী বাবুর মধ্যে কিশোরী'। এই প্রবাদটি যথার্থ। ... জমিদারদের স্বভাবসুলভ বিলাসময় জীবনযাপনের বাইরেও বাবু কিশোরী লাল রায় চৌধুরীর আলাদা একটা সত্তা ছিল। জনহিতকর কাজে তিনি ছিলেন অগ্রনায়ক। বালিয়াটিতে একটি দাতব্য চিকিৎসালয়, একটি প্রাথমিক বিদ্যালয়, ঢাকাতে কিশোরী লাল জুবিলী হাই স্কুল (কে এল জুবিলী হাই স্কুল নামে পরিচিত) এবং তাঁর পিতার নামে জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠা প্রভৃতি কাজ আজও তাঁর সুকীর্তির সাক্ষ্য বহন করছে। তিনি ঢাকার আরমানিটোলায় নিজ গৃহে বসবাস করতেন। তিনি অত্যন্ত সাংস্কৃতিকমনা ব্যক্তি ছিলেন। মালঞ্চ নামে ঢাকাতে তিনি একটি রঙ্গমঞ্চ গড়ে তোলেন। আজ সেটা লায়ন্স সিনেমা হল। এখানে নাটক মঞ্চস্থ হতো। পরবর্তী সময়ে জনাব কাদের সরদারকে তিনি এটা দান করেন।

আলোচ্য বক্তব্যে তিনি জগন্নাথ কলেজ সম্পর্কে বলেন:

> ১৮৮৪ সালের ৪ঠা জুলাই কিশোরী বাবু প্রতিষ্ঠা করেন তার পিতার নামে। ১৯০৬ সন পর্যন্ত কলেজটি তার ব্যক্তিগত তদারকিতে চলে। ১৯০৭ সালের ১লা মার্চ তারিখে একটি ট্রাস্ট বোর্ড গঠন করে কলেজ পরিচালনার ভার উক্ত বোর্ডের হাতে তুলে দেন। এই বোর্ডের সদস্য ছিলেন কিশোরী লাল রায় চোধুরী স্বয়ং এবং রায় চন্দ্র কুমার দত্ত বাহাদুর ও আনন্দ চন্দ্র রায়। ১৯০৯ সালের ৩রা জুলাই বাবু কিশোরী লাল রায় চৌধুরী পরলোক গমন করেন। ঐ বৎসরই ২৪শে আগষ্ট তারিখে নতুন একটি ট্রাস্টি বোর্ড গঠন করা হয় বাবু রায় চন্দ্র কুমার দত্ত বাহাদুর, আনন্দ চন্দ্র রায়, যশোদা লাল রায় চৌধুরী, কুমার নরেন্দ্র নারায়ণ রায় চৌধুরী এবং দীনেশ চন্দ্র রায় চৌধুরীকে নিয়ে।
>
> ১৯১৯ সন পর্যন্ত উক্ত ট্রাস্টি বোর্ড কলেজ পরিচালনা করেন। ১৯২০ সালের মার্চ মাসে জগন্নাথ কলেজ এ্যাক্টের মাধ্যমে ট্রাস্টি বোর্ড বিলুপ্ত করে জগন্নাথ কলেজ এর পরিচালনার ভার সরকার গ্রহণ করেন। তারপর অনেক চড়াই উৎরাই পার হয়ে জগন্নাথ কলেজ ১৯৪৮ সনে সরকারী কলেজরূপে আত্মপ্রকাশ করে। ... আমি ১৯৬৯ সনে মেট্রিক পাশ করার পর আমার পিতা স্বর্গীয় কৃষ্ণলাল রায় চৌধুরী জগন্নাথ কলেজে নিয়ে এলেন আই কম পড়ার জন্য। তখন আমাদের জমিদারী নেই। কিন্তু জমিদারী বিলুপ্তির পর তার দায়-দেনা মেটাতে মেটাতে আমরা তখন সর্বশান্ত। কলেজের তৎকালীন অধ্যক্ষ জনাব মোঃ এরশাদ উল্লাহ সাহেব বাণীভবন ছাত্রাবাসে আমার থাকার ব্যবস্থা করে দিলেন। উক্ত ছাত্রাবাসের সুপারিনটেনডেন্ট ছিলেন বাবু কেশব চন্দ্র বিশ্বাস। প্রতিষ্ঠাতা কিশোরী বাবুর বংশধর হিসাবে আমাকে এই কলেজে সবকিছু ফ্রি করে দেয়া হয়। এখান থেকে আমি আই কম পাশ করার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে হিসাববিজ্ঞানে সম্মানসহ মাস্টার্স করে বেরিয়ে আসি। আমার লেখাপড়ার জন্য কেশববাবু এবং অধ্যক্ষ সাহেবের অবদান চিরকাল স্মরণীয় হয়ে থাকবে।

শ্রদ্ধেয় কালীশঙ্কর রায়চৌধুরী অসুস্থ থাকায় সকল প্রশ্নের উত্তর পাওয়া সম্ভব হয়নি, তবে কিছু গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্নের উত্তর দিয়েছিলেন এবং জগন্নাথ কলেজের শতবর্ষ উৎসব অনুষ্ঠানে প্রদত্ত বক্তব্যটি স্বাক্ষর করে আমার প্রয়োজনে ব্যবহার করার অনুমতি দিয়েছিলেন।

সাক্ষাৎকারের সংক্ষিপ্ত অংশ প্রদত্ত হলো:

প্রশ্ন: জগন্নাথ রায়চৌধুরীর প্রকৃত নাম কী ?

উত্তর: জগন্নাথ সাহা

প্রশ্ন: রায়চৌধুরী এই উপাধি কোথায় পেয়েছেন ?

উত্তর: ব্রিটিশদের কাছ থেকে এই উপাধি গ্রহণ করেছিলেন।

প্রশ্ন: জমিদারি পাওয়ার আগে জগন্নাথ বাবুর পেশা কী ছিল?

উত্তর: তিনি ব্যবসায়ী ছিলেন। তাঁর পূর্বপুরুষ লবণের ব্যবসা করতো।

প্রশ্ন: জগন্নাথ বাবুর নাম অনুসারে বর্তমান জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় এবং এই বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পেছনে স্বয়ং জগন্নাথ বাবুর কোনো উদ্যোগ ছিল কি না?

উত্তর: মূলত তাঁর ছেলে কিশোরীলাল রায়চৌধুরী বিদ্যানুরাগী ছিলেন এবং পিতার প্রতি ছিল তাঁর অগাধ ভালোবাসা ও শ্রদ্ধা তাই তিনি তার প্রতিষ্ঠিত কলেজটির নাম জগন্নাথ কলেজ নামকরণ করেছিলেন। তবে ১৮৬৮ সালে জগন্নাথ রায় চৌধুরী জগন্নাথ স্কুলের প্রতিষ্ঠা করেন যা বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপ লাভ করেছে। সেদিক থেকে অবশ্যই সম্পৃক্ততা রয়েছে।

প্রশ্ন: আচ্ছা আপনি বা আপনাদের পরিবারের কোনো সদস্যের কাছে জগন্নাথ বাবুর কোনো ছবি বা পোর্টেট কী বর্তমানে আছে?

উত্তর: না। ১৯৭১ সালে পাকবাহিনীর সদস্যরা আমাদের বাড়িঘর জ্বালিয়ে দেয় তখন দেয়ালে লাগানো ছিল কিছু ছবি সেখানে জগন্নাথ রায়চৌধুরীর ছবিও ছিল সব ছবিই পুড়ে যায় এবং আমাদের কাছে তাঁর অন্য কোনো ছবি সংগ্রহে ছিল না বলে আমরা জগন্নাথ রায়চৌধুরীর ছবি সংরক্ষণ করতে পারিনি।

সাহিত্যের বিখ্যাত ইতিহাসকার দীনেশচন্দ্র সেন (১৮৬৬-১৯৩৯) জগন্নাথ স্কুলের ছাত্র ছিলেন। এই স্কুল থেকেই তিনি ১৮৮২ সালে এন্ট্রান্স পাশ করেন। ঢাকায় এসে তিনি প্রথমে কলেজিয়েট স্কুলে ভর্তি হন। তাঁর পিতার আর্থিক অবস্থা ভালো ছিল না। তাঁর পিতার এক ছাত্র ধামরাই নিবাসী অনাথবন্ধু মল্লিক জগন্নাথ স্কুলের কর্তৃপক্ষ ছিলেন। তাঁরই সহযোগিতায় ফ্রি-স্টুডেন্টশিপ নিয়ে তিনি জগন্নাথ স্কুলে ভর্তি হন। চারদিকে জগন্নাথ কলেজের খ্যাতি ও প্রসারতা বাড়ায় কিশোরীলাল রায়চৌধুরী জগন্নাথ স্কুলকে কলেজে উন্নীত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন। তাঁকে এ ব্যাপারে সাহায্য করেছিলেন অনাথবন্ধু মল্লিক, আইনজীবী ত্রৈলোক্যনাথ বসু ও বিচারপতি সারদাচরণ মৈত্র। সকলের মিলিত প্রচেষ্টায় ১৮৮৪ সালে জগন্নাথ স্কুল জগন্নাথ কলেজে রূপান্তরিত হয়। সে সময়ই জগন্নাথ কলেজে আইনের ক্লাস চলারও সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। জগন্নাথ স্কুল ও কলেজ একই প্রশাসনিক কর্তৃপক্ষের অধীনে ১৮৮৭ সাল পর্যন্ত চলার পর শিক্ষা বিভাগের নির্দেশের পর স্কুল ও কলেজ পৃথক হয়ে যায় তখন স্কুলের নাম হয় 'কিশোরী জুবিলী স্কুল' (বর্তমানে কে. এল. জুবিলী অর্থাৎ কিশোরী লাল জুবিলী স্কুল)।

জনাব মির্জা হারুণ-অর-রশিদ অধ্যাপক, তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের প্রধান। তিনি বিগত ত্রিশ বছর ধরে জগন্নাথ কলেজের যে আন্দোলন-সংগ্রাম অবলোকন করেছেন, সেই স্মৃতি তিনি স্বচ্ছতার সঙ্গে তুলে ধরেছেন *স্মরণিকা* (শতবর্ষ পূর্তি উৎসব' ৯২) গ্রন্থটিতে, তাঁর মতে:

> জগন্নাথ কলেজ যখন যাত্রা শুরু করে তখন তার ছাত্র সংখ্যা ছিল ৪৮। কিন্তু কলেজ দ্রুত উন্নতি লাভ করায় মাত্র পাঁচ বছরে অর্থাৎ ১৮৮৯ সালে ছাত্র সংখ্যা দাড়াঁয়- ৩৯৬ এ। ১৮৮৬ সালে কেবল এফ. এ ক্লাসেই ছাত্র সংখ্যা ছিল ১৫৬। ১৯১০ সালের পূর্বেই জগন্নাথ কলেজের ছাত্র সংখ্যা ৫০০ তে পৌঁছে এবং তখনি এ কলেজে আই. এ., আই. এস. সি., বি. এ., পাস ছাড়াও ইংরেজি দর্শন ও সংস্কৃতে অনার্স এবং ইংরেজিতে এম. এ. পড়ানো হত *(স্মরণিকা*, ৯২, পৃ. ২৭)।

তিনি আরও জানান:

> ১৯০৯ সালের ৩রা জুন তারিখে কিশোরীলাল রায়চৌধুরী মারা গেলে নতুন করে ট্রাস্ট দলিল সম্পাদিত হয় ১৯০৯ সালের ২৪ শে আগস্ট। এই ট্রাস্টি বোর্ডের যাঁরা সদস্য ছিলেন তাঁরা হলেন ১. রায় চন্দ্র কুমার বাহাদুর, ২. আনন্দ চন্দ্র রায়, ৩. যশোদা লাল চৌধুরী ৪. কুমার রমেন্দ্র নারায়ণ চৌধুরী, ৫. দীনেশ চন্দ্র রায়। এইসময় কলেজকে এক বিশেষভাবে আর্থিক সাহায্য করেন Sir Robert Nathan (ঢাকার কমিশনার), Mr. H. Le Mesurier ও Mr. Bonham Carter. এঁদের আনুকূল্যে কলেজ এইসময় ৮০,০০০.০০ (আশি হাজার) টাকার অনুদান লাভ করে আর এই অর্থ দ্বারা নির্মিত হয় জগন্নাথ কলেজের বর্তমান মূল প্রশাসনিক ভবনটি (স্মরণিকা, ৯২, পৃ. ২৭-২৮)।

জানা যায়, ১৯১০ সালে সন্তোষের জমিদার রাজা মন্মথ রায় চৌধুরী কলেজ কাউন্সিলের চেয়ারম্যানের অনুমতিক্রমে তাঁদের টাঙ্গাইলস্থ প্রমথ-মন্মথ কলেজটিকে জগন্নাথ কলেজের সঙ্গে যুক্ত করেন এবং মহারাজা জগন্নাথ কলেজের গেটের পাশেই 'সন্তোষ ভবন' নামে দ্বিতল একটি বাড়ি নির্মাণ করে দেন যা কলেজের অধ্যক্ষের বাসভবন হিসেবে পরিচিত ছিল। ১৯৩৫ সালের ২০শে মার্চ জগন্নাথ কলেজের সুবর্ণজয়ন্তী উৎসব পালিত হয়। এতে সন্তোষের মহারাজা মন্মথ রায়চৌধুরী সভাপতিত্ব করেছিলেন। জগন্নাথ কলেজ যখন ট্রাস্টি বোর্ডের হাতে যায় তখন এর অধ্যক্ষ ছিলেন বিখ্যাত শিক্ষাবিদ রায় বাহাদুর ললিত মোহন চ্যাটার্জি। তিনি ১৯২১ সাল পর্যন্ত দীর্ঘ ১৭ বছর জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। তিনি এই কলেজের উন্নতির জন্য অক্লান্ত পরিশ্রম করেছেন। তৎকালীন কমিশনার রবার্ট নাথান বিষয়টি লক্ষ করেছেন এবং কলেজকে সর্বপ্রকার সহায়তা প্রদান করেছেন। তিনি জগন্নাথ কলেজকে 'আমার কলেজ' বলে বহু জায়গায় উল্লেখ করেন। ট্রাস্টি বোর্ডের অন্যান্য সদস্যরাও কলেজের উন্নয়নে পরিশ্রম করেছেন সর্বাত্মকভাবে। জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পরবর্তী সত্তর বছর কলেজের যাঁরা অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছিলেন তাঁরা প্রত্যেকেই বিদগ্ধ, জ্ঞানী, পণ্ডিত ও উচ্চমানের ব্যক্তিত্বের অধিকারী। প্রথম অধ্যক্ষ কুঞ্জলাল নাগ ব্রিটিশবিরোধী মনোভাবের উজ্জ্বল প্রতীক। তিনি প্রায় বার বছর অত্যন্ত সার্থকভাবে এই কলেজের অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেছেন। প্রসঙ্গত ইউ সি ভট্টাচার্যের বক্তব্য এক্ষেত্রে প্রণিধানযোগ্য:

> আমরা জগন্নাথ কলেজে যাঁহার নিকট ইংরেজি অধ্যয়ন করিতাম, সেই অধ্যাপক কুঞ্জলাল নাগ মহাশয়ের ইংরেজি অধ্যাপনা ইংরেজরাও পরবর্তীকালে প্রশংসা করিয়া গিয়াছেন। কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষতা ত্যাগ করিয়া কলিকাতার বিদ্যাসাগর কলেজের ইংরেজির অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করিয়াছিলেন...। স্যার মাইকেল স্যাডলার ও তাঁহার সহযোগীগণ যে দিন ঐ কলেজ পরিদর্শন করিতে গিয়াছিলেন, সেদিন কুঞ্জলাল নাগ মহাশয় সেক্সপিয়রের ম্যাকবেথ নাটক

> পড়াইতেছিলেন। ক্লাসে প্রবেশ করিয়া স্যার মাইকেল কুঞ্জ বাবুকে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, "May I attend your lectures?"
> নাগ মহাশয় বলিলেন, "I never make a secret of my lectures; you are welcome" তখন স্যার মাইকেল ও তাঁহার সহযোগীগণ ছাত্রদিগের সহিত বসিয়া তাঁহার অধ্যাপনা শুনিতে লাগিলেন। বিদায়কালে তিনি বিদ্যাসাগর কলেজের অধ্যক্ষের নিকট বলিয়া গেলেন, "Your English Professor can compare with some of the best shakespearian Professors at home. (চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ৬৩)।

এরপর বৈকুণ্ঠ কিশোর চক্রবর্তী ১৮৯৫ থেকে ১৯০২ সাল পর্যন্ত মোট সাত বছর অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। বৈকুণ্ঠ কিশোরের পরে মাত্র দু'বছরের জন্য যিনি অধ্যক্ষ হয়ে এসেছিলেন তিনি হলেন কলকাতা সিটি কলেজের ইংরেজির অধ্যক্ষ হেরম্ব চন্দ্র মৈত্রেয়। তিনি ব্রাহ্ম ধর্মাবলম্বী ও এই ধর্মের একজন বলিষ্ঠ প্রবক্তা। হেরম্ব চন্দ্রের পরামর্শে রায় বাহাদুর ললিত মোহন চট্টোপাধ্যায়কে আমন্ত্রণ জানানো হয় অধ্যক্ষ হওয়ার জন্যে। ললিত মোহন দীর্ঘ ১৭ বছর (১৯০৪-১৯২১) কলেজ অধ্যক্ষের দায়িত্ব অত্যন্ত নিষ্ঠা ও সততার সঙ্গে পালন করেন। ললিতমোহন কলেজের ভার গ্রহণের চার বছর পর অর্থাৎ ৭ই মার্চ ১৯০৮ সালে জগন্নাথ কলেজের ট্রাস্টিবৃন্দ ও সেক্রেটারি অফ স্টেটের মধ্যে এক দলিল সম্পাদনের মাধ্যমে কলেজ ব্যবস্থাপনাকার্যে পরিবর্তন ঘটে। কলেজটি রূপান্তরিত হয় প্রথম শ্রেণির কলেজে। ট্রাস্টিবোর্ডের সদস্যদের কথা পূর্বেই বলেছি। ঢাকার কমিশনার নাথান সাহেবের কথাও স্মরণ করেছি শ্রদ্ধার সঙ্গে। জগন্নাথ কলেজে সরস্বতী পূজা অতি ধুমধামের সঙ্গে পালন করা হয়, এখনো সেই ধারাবাহিকতা চলছে। লেখক আবুল মনসুর আহমেদ, ভর্তি হয়েছিলেন জগন্নাথ কলেজে ১৯১৭ সালে। 'উচ্চ শিক্ষা: ঢাকা শহরে' নামক স্মৃতিকথা অথবা প্রবন্ধ যাই বলা হোক না কেন, জগন্নাথ কলেজ সম্পর্কিত, সংস্কৃতি, ঐতিহ্য, শিক্ষা এমনকি পরিবেশের যে বর্ণনা তিনি দিয়েছেন তা তুলনারহিত, অনবদ্য; তথ্যে ভরপুর। তিনি বলেন:

> দুই বছরের জগন্নাথ কলেজ-জীবন আমার মোটামুটি সুখেই কাটিয়াছিল। ভাল-ভাল প্রফেসারের কাছে পড়িবার আনন্দ পাওয়া ছাড়াও জগন্নাথ কলেজে আমার একটা অভিজ্ঞতা লাভ হয়। স্কুল-কলেজে এত বড় লাইব্রেরী থাকিতে পারে, জগন্নাথ কলেজেই প্রথম এই জ্ঞান লাভ করি। লাইব্রেরীর বিশালতায়, বই এর সংখ্যায় ও নাম-না-শোনা ও চোখে না-দেখা বড়-বড় আকারের বই দেখিয়া আমি লাইব্রেরীটার প্রতি আসক্ত হইয়া পড়ি। ক্লাসে পড়া না থাকিলে অথবা অন্যভাবে অবসর পাইলেই আমি লাইব্রেরীতে ঢুকিতাম। অল্পক্ষণই লাইব্রেরীতে ডুবিয়া পড়িতাম (চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ৮৮)।

আবুল মনসুর আহমেদ আরো জানান অধ্যক্ষ ললিত চ্যাটার্জী মহাশয় ছাড়াও আরও নামকরা অনেক অধ্যাপক ছিলেন তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে। দর্শনের অধ্যাপক উমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য, ইতিহাসের অধ্যাপক মি. পি. গুপ্ত, অধ্যাপক সতীশচন্দ্র সরকার, অধ্যাপক ফণীন্দ্রনাথ রায় বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। জগন্নাথ কলেজের অগ্রযাত্রা থমকে দাড়াঁয় ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্মলগ্নে যে দু'টো কলেজ তাদের সাহচর্য ও সেবা দিয়ে লালন করেছিল তার একটি হলো জগন্নাথ কলেজ, অপরটি ঢাকা কলেজ। উল্লেখ্য, জগন্নাথ কলেজ তার ছাত্র, শিক্ষক, বই পুস্তক ইত্যাদি দিয়ে সে দিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে সাহায্য করেছিল। জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা কলেজের ডিগ্রি ক্লাসের সমস্ত ছাত্র নিয়ে ১৯২১ সালের ১লা জুলাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় যাত্রা শুরু করে। পূর্ববঙ্গের সবচেয়ে খ্যাতনামা শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানকে

ইন্টারমিডিয়েট কলেজে অবনমিত করা হয়েছিল। অধ্যক্ষ ললিত মোহন চ্যাটার্জী এর তীব্র বিরোধিতা করেন। কিন্তু ফলাফল শূন্য। কারণ ব্যক্তি প্রতিষ্ঠানের দানে, শ্রমে ও ত্যাগে তিলে তিলে গড়ে উঠা জগন্নাথ কলেজকে অবনমন করার জন্য সরকারের পক্ষ থেকে আইন পাস হয়। ১৯২০ সালে Jagannath College Act - এর মাধ্যমে জগন্নাথ কলেজের একটা অংশকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সংযুক্ত করা হয়। Act-টি নিম্নরূপ:

Jagannath College Act.
Act -No-XVI of 1920
(Passed by the Indian legislative Council)
(Receieved the Assent of the Governor General on the 20th March, 1920). And whereas it is expedient in connection with the in corporation of the University of Dacca, to put an end to the said trust and to vest the said institution and properties in the Governor of Bangal in council.
It is hereby enacted as follows,
1. (i) This act may be called The Jagannath College Act. 1920

উল্লেখ্য, ১৯৬৮ সালে মোনায়েম সরকার যখন জগন্নাথ কলেজকে সরকারি কলেজে রূপান্তরিত করেন তখন এই অ্যাক্টকেও কাজে লাগানো হয়। বিশিষ্ট সমাজবিজ্ঞানী শ্রী রংগলাল সেন 'জগন্নাথ হল হীরক জয়ন্তী সংখ্যা' (১৯২১-১৯৮১) এবং *বাসন্তিকার* ২, ৩, ৪ নং পৃষ্ঠায় যা বলেছেন প্রসঙ্গত তা উল্লেখ্য। তিনি বলেছেন:

> ...তখন ঢাকা শহরে, 'most important and best equipped' কলেজ হিসেবে সরকারী ঢাকা কলেজ ও কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে 'affiliated and government aided first grade' কলেজ হিসেবে জগন্নাথ কলেজের নাম এ-উপমহাদেশের শিক্ষিত মহলে সুবিদিত (Report of the C.U. Commission 1919. vol. iv. p.121)।

তবে ঢাকা কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৮৪১ ইংরেজি) সরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান বিধায় সেখানে প্রধানত সমাজের উচ্চস্তরের শিক্ষার্থীরাই লেখাপড়া করত, আর জগন্নাথ কলেজ (প্রতিষ্ঠা ১৮৮৪ ইংরেজি), ছিল 'Mainly for poor students' (Speech of Mr. P. J. Hartog, Vice-chancellor of D. U. Calender for the years 1921-2, 1922-3 and 1923-4) ... যে তিনটি ছাত্রাবাস নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আদর্শ আবাসিক শিক্ষা প্রতিষ্ঠানরূপে বিকাশ লাভের পথে যাত্রা শুরু করে সেগুলির প্রতিষ্ঠার পিছনে ইতিহাস রয়েছে। ছাত্রাবাস তিনটির নামের তাৎপর্যের মধ্যে কেবল তারতম্য রয়েছে তাই নয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অঙ্গ প্রতিষ্ঠান হিসাবে এগুলির সৃষ্টির ক্ষেত্রেও পার্থক্য রয়েছে। জন্মের দিক থেকে 'ঢাকা হল' যে রাজধানী শহর ঢাকা তথা একটি স্থানীয় সরকারি কলেজের সাথে সংশ্লিষ্ট যে সত্যটি সর্বসমক্ষে উদ্ভাসিত। বর্তমান 'জগন্নাথ হল' একজন মহানুভব ব্যক্তির দ্বারা প্রতিষ্ঠিত একটি বেসরকারি কলেজের সঙ্গে যে জন্মসূত্রে সম্পর্কিত তারও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত বিদ্যমান। মূলত ঢাকা কলেজ ও জগন্নাথ কলেজের Post Intermediate শ্রেণির ছাত্রদের নিয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম ক্লাস শুরু হয়। ঢাকা কলেজ থেকে আগত ছাত্ররা সেখানে থাকার সুযোগ পায় তা 'ঢাকা হল' নামে অভিহিত হয়। অর্থাৎ ঢাকা কলেজ আংশিকভাবে কার্যত ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে absorbed হয়ে যাওয়ায় 'ঢাকা হল' নামে একটি ছাত্রাবাসের সৃষ্টি হয়। উল্লেখ্য যে ১৯১৭-১৮ সালে ঢাকা কলেজের মোট ছাত্র সংখ্যা ছিল ৯৯৫। ... এর মধ্যে ৩য় ও ৪র্থ বর্ষে ছিল ৪২৩ জন এবং ৫ম ও ৬ষ্ঠ বর্ষে ছিল ৯০ জন। ঢাকা কলেজ সরকারী শিক্ষা প্রতিষ্ঠান বিধায় যত সহজে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে সম্পৃক্ত হতে পেরেছিল জগন্নাথ কলেজের সংযুক্তিকরণ তত সহজে নিষ্পন্ন হয়নি। জগন্নাথ হল তার নামটি যে জগন্নাথ কলেজ থেকে উত্তরাধিকারসূত্রে পেয়েছে তার স্বীকৃতিস্বরূপ জগন্নাথ কলেজ প্রতিষ্ঠার (১৮৮৪ ইংরেজি) সুবর্ণজয়ন্তী উপলক্ষে ১৯৩৪ সনে জগন্নাথ কলেজ ও জগন্নাথ হলের যৌথ পঞ্চম পুনর্মিলন উৎসব অনুষ্ঠিত হয়। জগন্নাথ হলের তৎকালীন প্রভোস্ট এবং জগন্নাথ হল ও জগন্নাথ কলেজ পুনর্মিলনী কমিটির ভাইস-প্রেসিডেন্ট ডঃ রমেশ চন্দ্র মজুমদার ১৯৩৪ ইংরেজির ২৬ শে নভেম্বর তারিখে তাঁর একটা আবেদনপত্রে কী বলেছিলেন তা এখানে উল্লেখযোগ্য:

> I beg to invite you most cordially to interest yourself in the Jagannath Hall Reunion. The institution was established in 1930 with the old boys of the old Jagannath College and those of the Jagannath Hall of Dacca University as its members ... the old Jagannath College, from which the hall inherited its name and whose valuable services to the cause of higher education in Dacca before the establishment of the University certainly deserve to be kept alive in the memory of us all. (*বাসন্তিকা*, ১৯২১-১৯৮১)

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং জগন্নাথ হল তাদের জন্মসূত্রে জগন্নাথ কলেজের কাছে কতটা দায়বদ্ধ তা উল্লিখিত বক্তব্য থেকে অনুধাবন করা যায়। স্বদেশি আন্দোলনের অন্যতম নেতা বিপ্লবী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ ১৯৪১ থেকে ১৯৪৭ সাল পর্যন্ত জগন্নাথ কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন। এর আগে রায় বাহাদুর ললিতমোহনের পরে অধ্যক্ষ হয়ে আসেন রায় বাহাদুর সত্যেন্দ্রনাথ ভদ্র। তিনি সুপরিচিত ব্যক্তিত্ব ছিলেন। তিনি বিখ্যাত *ঢাকা রিভিউ* পত্রিকার সম্পাদক ছিলেন। তিনি দীর্ঘ প্রায় ২০ বছর অধ্যক্ষের দায়িত্বে ছিলেন। শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ এক তেজস্বী পৌরুষের নাম। পদার্থ-বিদ্যায় কৃতিত্বের সঙ্গে এম. এস. সি পাস করার পর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক নিযুক্ত হন। কিন্তু তিনি ছিলেন স্বদেশি-আন্দোলনের অন্যতম সক্রিয় সদস্য। ব্রিটিশ সরকার তাঁকে ধরার চেষ্টা করে ব্যর্থ হয়েছে। তিনি জাহাজের খালাসির ছদ্মবেশে আমেরিকা পালিয়ে যান এবং সেখানে তিনি বিখ্যাত বিপ্লবী নেতা তারকানাথ দাসের সহযোগিতায় ভারতের অস্থায়ী শাসন পরিষদ (Indian Provisional Government) গঠন করেন। পরবর্তীকালে যুক্তরাষ্ট্র সরকারের হাতে ধরা পড়ে জেলে যান। দীর্ঘ চার বছর জেল খাটার পর তিনি মুক্তি পান এবং প্রথমে তিনি বরিশাল বি. এম. কলেজে ও পরে জগন্নাথ কলেজে অধ্যক্ষের দায়িত্ব পালন করেন। শ্রী শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ প্রথম অধ্যক্ষ, যিনি জগন্নাথ কলেজে কো এডুকেশনের ব্যবস্থা করেছিলেন; ১৯৪২ সালে তিনি নিজের মেয়েকে বিজ্ঞান ক্লাসে ভর্তি করে দিয়েছিলেন এবং পরের বছরেই মেয়েদের জন্য পৃথক একটি সেকশন করে বিজ্ঞান পড়ানোর ব্যবস্থা করেছিলেন। ঢাকা শহরে সর্বপ্রথম জগন্নাথ কলেজেই কলেজ-পর্যায়ে মেয়েদের বিজ্ঞান শিক্ষার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। ১৯৪৭ সালে শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ বিদায় নেওয়ার পর অধ্যক্ষ হয়ে আসেন অবিভক্ত বাংলার শিক্ষা বিভাগের অবসরপ্রাপ্ত উপ-পরিচালক খ্যাতনামা শিক্ষাবিদ খান বাহাদুর আব্দুর রহমান খান (১৯৪৮)। ইতোমধ্যে দেশভাগ হয়ে পাকিস্তান ও হিন্দুস্তান দুই দেশের জন্ম হয়েছে। জনাব আব্দুর রহমান খান জগন্নাথ কলেজের প্রথম মুসলিম অধ্যক্ষ ছিলেন। খান বাহাদুর আব্দুর রহমান খান সাহেব জগন্নাথ কলেজের সার্বিক উন্নতির দিকে সদা সচেতন ছিলেন। ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্বে জগন্নাথ

কলেজকে অবনমিত করে ইন্টারমিডিয়েট কলেজে পরিণত করা হয় সেই সমস্যার সমাধান করেন খান বাহাদুর আব্দুর রহমান। তাঁরই প্রচেষ্টায় ১৯৪৮ সালে বি. কম. এবং ১৯৪৯ সালে বি. এ ক্লাস খোলা হয়। রাতেও ডিগ্রি ক্লাস খোলা হয়। দেশ-বিভাগের ফলে খ্যাতিমান অধ্যাপকদের অনেকেই দেশ ছেড়ে চলে যান আবার অনেকেই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যোগদান করেন, ফলে শিক্ষক-শূন্যতায় পড়ে কলেজটি। জনাব খান বাহাদুর শিক্ষক নিয়োগে বিশেষ যাচাই পদ্ধতি অবলম্বন করলেন। প্রথমেই সন্তোষজনক পরীক্ষার ফল দেখে মৌখিক পরীক্ষায় আহ্বান এবং সেখানে পাস করলে তারপর ক্লাসে নিয়ে গিয়ে একটা বিষয় ঠিক করে পড়াতে বলা হয়। বোর্ডের সদস্যদের সামনে ক্লাসভর্তি ছাত্রদের পড়ানো সে এক অগ্নিপরীক্ষা। ১৯৬৮ সালে জগন্নাথ কলেজ সরকারি হওয়ার পূর্ব পর্যন্ত কলেজে শিক্ষক-নিয়োগের এই পদ্ধতিই অনুসরণ করা হতো।

'৫২-এর ভাষা আন্দোলন, হামিদুর রহমান শিক্ষা কমিশনের বিরুদ্ধে আন্দোলন, '৬৯-এর গণ-আন্দোলন, স্বাধিকার আদায়ের যে-কোনো আন্দোলন, '৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণ প্রভৃতির মধ্য দিয়ে জগন্নাথ কলেজ এক ঐতিহ্যবাহী কলেজে পরিণত হয়েছে। '৭১-এর বহু নির্যাতনের সাক্ষী এ কলেজ। যুদ্ধ শেষ হলে কলেজের মাঠে একাধিক গণকবরের সন্ধান মিলে। ছাত্ররা মাটি খুঁড়ে ট্রাকভর্তি কঙ্কাল উদ্ধার করে, মেয়েদের আস্ত চুলের বেনি, ভেনেটি ব্যাগ ও আনুষঙ্গিক ব্যবহার্য বহু জিনিসপত্র আবিষ্কার করা হয়। মুক্তিযুদ্ধে জগন্নাথ কলেজের বহু ছাত্র প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষভাবে যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। তাই যুদ্ধ শেষ হওয়ার পরে জগন্নাথ কলেজের ছাত্র নেতৃত্ব সব বিরোধিতা ভুলে গিয়ে সরকারের সঙ্গে একাত্মতা ঘোষণা করে।

ভাষা আন্দোলন ও জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভূমিকা

ভাষা আন্দোলনকে মুক্তিযুদ্ধের প্রস্তুতিপর্ব বলা হয়। বাঙালি জাতিসত্তা ও আত্মপরিচয়ের সন্ধান খুঁজে পাওয়া যায় ভাষা আন্দোলনের মধ্যে, তাইতো আবেগের ও অস্তিত্বের এই বিষয়টি নিয়ে প্রচুর গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তারপরও মহৎ আন্দোলনের পিছনে যাঁদের অবদান রয়েছে সেই সকল মহান ব্যক্তিত্বের সন্ধান আজও অব্যাহত রয়েছে। সেই ধারাবাহিকতায় আমার ক্ষুদ্র প্রয়াস ব্যক্ত হয়েছে 'ভাষা আন্দোলনে জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভূমিকা' শীর্ষক গবেষণা প্রবন্ধটিতে।

স্বাধীন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের পেছনে ভাষা আন্দোলন ছিল প্রধান ও মূল উৎস। মহান রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৪৭ সালের দেশভাগের সাথে সাথেই শুরু হয়েছিল।

> ১৯৪৭ সালের সাংগঠনিকভাবে ভাষা আন্দোলনের শুরুর সময়টা 'ভাষা আন্দোলনের সূচনা-পর্ব' বলে আখ্যায়িত করা যায়। ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলনকে 'ভাষা আন্দোলনের বিকাশ-পর্ব', ১৯৪৯ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত 'ভাষা আন্দোলনের স্তিমিত-পর্ব' এবং ১৯৫২ সালের আন্দোলনকে 'ভাষা আন্দোলনের বিস্ফোরণ-পর্ব' বলা যেতে পারে। ...১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারির পর থেকে ১৯৫৬ সালের ২৯ ফেব্রুয়ারি পর্যন্ত সময় কালকে ভাষা আন্দোলনের বিজয় ও সফলতার পর্ব বলে ধরে নেয়া যায়। ভাষা আন্দোলনের সফলতার পর্বটি আজও চলমান (মাহবুব, ২০১৭, পৃ. ০৯)।

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস আজও প্রকাশিত হয়নি। এই গৌরবদীপ্ত ইতিহাস রচনার ক্ষেত্রে সংবাদপত্রের ভূমিকা অপরিসীম। *দৈনিক আজাদ* সযত্নে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ (১৮৮৫-১৯৬৯) রচিত 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' নামের প্রবন্ধটি ১৯৪৭ সালের ২৯শে জুলাই প্রকাশ করেন। ভাষা

আন্দোলনের শুরুতে *আজাদ*-এ প্রকাশিত ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্'র এই প্রবন্ধটিকে ভাষা আন্দোলনের সূচক হিসেবে ধরে নেওয়া যায় (মাহবুব, ২০১৭, পৃ. ১১)।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে ধীরেন্দ্রনাথ দত্তের (১৮৮৬-১৯৭১) রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সংশোধনী প্রস্তাব বাতিল হয়েছিল। ১৯৪৮ এর ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জগন্নাথ কলেজ ও ঢাকা মেডিকেল কলেজ ছাত্রদের মিছিলের মাধ্যমে ঢাকায় প্রথম প্রতিক্রিয়া শুরু হয়। এভাবেই ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতি শুরু হয়ে গেল। উল্লেখ্য, পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকেই মুসলিমলীগ সরকার বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে নানা ষড়যন্ত্র শুরু করে, ফলে প্রতিবাদী ভূমিকায় অবতীর্ণ হয় শিক্ষক ও ছাত্রসমাজ। ঢাকা শহরের অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের মতোই জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরা এই আন্দোলনে সম্পৃক্ত হয়। '১৯৪৭ সালের নভেম্বর মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা-সংক্রান্ত আলোচনা ও কর্মপন্থা নির্ধারণে এক গোপন বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। ঐ বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন জগন্নাথ কলেজের অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ' (আলীম, ২০২১, পৃ. ৪৭১)। অজিত কুমার গুহ (১৯১৪-১৯৬৯) ছিলেন জগন্নাথ কলেজ-এর বাংলা বিভাগের শিক্ষক ও 'জগন্নাথ কলেজ বাংলা সংস্কৃতি সংসদ'-এর সহ-সভাপতি। প্রকৃত অর্থে কলেজের অধ্যক্ষ ছিলেন সংগঠনটির সভাপতি আর অজিত কুমার গুহ ছিলেন মূল সংগঠক। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চকে 'বাংলা ভাষা দাবি দিবস' ঘোষণা করা হয় এবং ঐ দিনে শতকরা ৯০ শতাংশ ছাত্র আন্দোলনে যোগ দেয় এবং পিকেটিং করতে উপস্থিত হয় ইডেন বিল্ডিং, জেনারেল পোস্ট অফিস ও অন্যান্য স্থানে। আন্দোলন সংগ্রামে জগন্নাথ কলেজের শিক্ষার্থীরাই সমবেত হয়ে মিছিল করতে করতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগিয়ে আসে। সবচেয়ে গ্রহণযোগ্য তথ্য পাওয়া যায় বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান রচিত *অসমাপ্ত আত্মজীবনী গ্রন্থে*। বঙ্গবন্ধু লিখেছেন, "সামান্য কিছু সংখ্যক বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র ছাড়া শতকরা নব্বই ভাগ ছাত্র এই আন্দোলনে যোগদান করল। জগন্নাথ কলেজ, মিটফোর্ড, মেডিকেল স্কুল, ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজ বিশেষ করে সক্রিয় অংশগ্রহণ করল" (রহমান, ২০১২, পৃ. ৯২)। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পূর্ব-বাংলা থেকে নির্বাচিত পাকিস্তান গণ-পরিষদের সদস্য কুমিল্লার কংগ্রেস নেতা ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত গণপরিষদে একটি সংশোধনী প্রস্তাব উত্থাপন করেছিলেন– সেখানে দাবি করা হয় ইংরেজি ও উর্দুর সঙ্গে পাকিস্তানের জনসংখ্যার সংখ্যাগরিষ্ঠ অংশের ভাষা বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে ব্যবহার করতে দিতে হবে। এই সূত্র ধরেই কিছু দিনের মধ্যেই বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করার দাবি পূর্ব-বাংলায় জোড়ালো হয়ে উঠে সেই ইতিহাসেই হলো ভাষা আন্দোলনের সূচনা। অজিত কুমার গুহ প্রথম থেকেই ভাষা আন্দোলনের সঙ্গে সক্রিয়ভাবে জড়িয়ে পড়েছিলেন।

অজিত গুহ স্মারক গ্রন্থে ড. সালাহ্উদ্দীন আহমদ জানান– 'অজিতবাবু কোন দলীয় রাজনীতি করতেন বলে আমার জানা নেই' (আনিসুজ্জামান, ১৯৯০, পৃ. ৪০)।

১৯৪৮ সালের ৩১শে ডিসেম্বর এবং ১৯৪৯ সালের ১লা জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে অনুষ্ঠিত পূর্ব পাকিস্তান সাহিত্য সম্মেলনে জগন্নাথ কলেজের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক অজিত কুমার গুহ যৌথ সম্পাদক হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন। প্রসঙ্গত ফজলুল করিমের বক্তব্য প্রণিধানযোগ্য, "...এদেশের প্রগতিশীল সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে তিনি ছিলেন ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত। বাংলাভাষা রাষ্ট্রভাষার দাবিতে ছিলেন সোচ্চার। ফলে ভাষা আন্দোলনে তার গ্রেফতারের ঘটনা ঘটে..." (করিম, ২০১০, পৃ. ৫৪)। উল্লেখ্য, *অজিত গুহ স্মারক* গ্রন্থটির প্রকাশক ছিলেন ফজলুল করিম।

অজিত গুহের নেতৃত্বে জগন্নাথ কলেজে 'বাংলা সাহিত্য সমিতি' গঠিত হয়েছিল। ১৯৪৯ সালে এই সমিতির উদ্যোগে কলেজে পঁচিশে বৈশাখ উদ্‌যাপিত হয়েছিল একটি মনোমুগ্ধকর অনুষ্ঠানের মাধ্যমে। এর পরই অজিত গুহের বিরুদ্ধে একটা ষড়যন্ত্র শুরু হলো। এই সময় 'ইসলামিক ব্রাদারহুড' নামে একটি উগ্রদক্ষিণপন্থি দল গঠিত হয়েছিল, পাকিস্তানকে একটি ইসলামি রাষ্ট্র হিসেবে গড়ে তোলাই ছিল এর উদ্দেশ্য। জগন্নাথ কলেজের ছাত্রদের মধ্যে কিছু ছাত্র এ দলের হয়ে কাজ করতো। তারাই অজিত কুমার গুহের নামে মিথ্যা প্রচার করতে লাগল এই বলে যে, তিনি পাকিস্তান ও ইসলামবিরোধী কার্যকলাপে লিপ্ত আছেন। ১৯৫২ সালে ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীন উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণার পরপরেই সমগ্র দেশ ক্ষোভে ফেটে পরে। জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীরাও প্রতিবাদ করে। আন্দোলন সঠিকভাবে পরিচালনার জন্য বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের শুরুতেই জগন্নাথ কলেজের 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম-পরিষদ' গঠিত হয়। এই পরিষদের কার্যক্রম জোড়ালোভাবে চলতে থাকে। অন্যদিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ আলাদা করে 'সংগ্রাম-পরিষদ' গঠন করে আন্দোলন, সভা, মিছিল কার্যক্রম অব্যাহত রাখে। প্রসঙ্গত আনিসুজ্জামানের বক্তব্য স্মরণযোগ্য:

> রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা খুবই গৌরবময় ভূমিকা পালন করেছিল। "উর্দুই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে" এই মর্মে খাজা নাজিমউদ্দিনের ঘোষণার প্রতিবাদে আমরা কলেজে সভা করি। ১৯৫২ সালের ৩০ বা ৩১ জানুয়ারি কলেজে তো ধর্মঘট হয়ই, আশেপাশের স্কুলগুলোয় যাতে ধর্মঘট হয়, সে ভার পরে এই পরিষদের ওপরে। কয়েকজনের সঙ্গে পোগোজ স্কুলে গিয়েছিলাম সেখানে এমনিতেই ধর্মঘট হচ্ছিল। সেখান থেকে আমি সেন্ট গ্রেগরীজ স্কুলে–এখানটায় পিকেটিং করতে হয়। এর মধ্যে পুলিশ এসে পড়ায় পিঠ টান দিই। ১১ ফেব্রুয়ারি পতাকা দিবস উপলক্ষে ঢাকা নারায়ণগঞ্জ ও ঢাকা টঙ্গি লাইনের ট্রেনে যাত্রীদের কাছ থেকে চাঁদা তুলি। তারপর শুরু হয় ২১ ফেব্রুয়ারির প্রস্তুতি (চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ১৫৭)।

উল্লেখ্য, রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের যৌক্তিকতা বিশ্লেষণ করে ফেব্রুয়ারি মাসে প্রকাশিত পুস্তিকা 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন' এবং সাব-টাইটেল ছিল 'কি ও কেন'?। যার লেখক ছিলেন জগন্নাথ কলেজের শিক্ষার্থী আনিসুজ্জামান। প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৫২। আনিসুজ্জামান ছাত্রজীবনে প্রগতিশীল রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত হন। জগন্নাথ কলেজে অধ্যায়নকালে তিনি পূর্ব-পাকিস্তান যুবলীগে যোগ দেন এবং ১৯৫১ সালের ডিসেম্বর মাসে দপ্তর সম্পাদক নিযুক্ত হন। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জগন্নাথ কলেজে প্রথমবর্ষে অধ্যয়নরত। ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকেই জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলার সমাবেশে উপস্থিত হয়। সভায় ১৪৪ ধারা ভাঙ্গার সিদ্ধান্ত হলে তাঁরা 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান দিতে দিতে পরিষদ ভবনের দিকে যাত্রা করে। '১৪৪ ধারা ভঙ্গকারী প্রথম দিকের ছাত্রদের মধ্যে ছিলেন জগন্নাথ কলেজের রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সদস্য নেয়ামাল বাসির' (বাসির, ১৯৮১, পৃ. ৭০)।

প্রথম যে দশজন ১৪৪ ধারা ভেঙেছিলেন, তাদের মধ্যে অন্যতম ছিলেন জগন্নাথ কলেজের ছাত্র প্রখ্যাত কথাশিল্পী ও চলচ্চিত্র পরিচালক জহির রায়হান (১৯৩৫-১৯৭২)। ১৯৫৩ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে তিনি আই. এস. সি. পাস করেন। পরে ১৯৫৮ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ থেকে স্নাতক (সম্মান) ডিগ্রি অর্জন করেন। ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। ১৯৫২ সালে তিনি

ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন। '২১ ফেব্রুয়ারি যে দশজন প্রথম ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করেন তিনি তাদের একজন। অন্যান্যদের সঙ্গে তাঁকে মিছিল থেকে গ্রেফতার করে কারারুদ্ধ করা হয়' (চৌধুরী, ২০১১, পৃ. ১৮৯)।

এই আন্দোলন জহির রায়হানের চেতনায় গভীর প্রভাব বিস্তার করেছিল। ভাষা আন্দোলনের প্রথম উপন্যাস *আরেক ফাল্গুন* (১৯৬৯) তিনি রচনা করেন। ভাষা আন্দোলনভিত্তিক অন্য আর একটি উপন্যাস হলো *একুশে ফেব্রুয়ারি* (১৯৭০)। ভাষাসৈনিক আবদুল জলিল এই প্রতিষ্ঠানের ছাত্র থাকা অবস্থায় ১৯৪৮ সালে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালে জগন্নাথ ছাত্র সংসদের সাধারণ সম্পাদক শফিউদ্দিন আহমেদকে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করায় কারাবরণ করতে হয়। আবারও অজিত কুমার গুহ প্রসঙ্গ। বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান তাঁর *অসমাপ্ত আত্মজীবনী* গ্রন্থে অধ্যাপক অজিত কুমার গুহের অন্য একটি গুণের কথা তুলে ধরেছেন এভাবে:

> এখন আমি, ইয়ার মোহাম্মদ খান, দেওয়ান মাহবুব আলী, বিজয় চ্যাটার্জী, অধ্যাপক অজিত গুহ, মোহামদ তোয়াহা ও কোরবান আলী এক জায়গায় থাকি। দিন আমাদের কেটে যাচ্ছে কোনোমতে। অজিত বাবু আমাদের খাওয়া-দাওয়ার দেখাশোনা করতেন। বাবুর্চি তিনি ভালই ছিলেন। অসুস্থ হয়েও নিজেই পাক করতেন (রহমান, ২০১২, পৃ. ২৮০)।

এই মহান ব্যক্তিত্বের গুণের শেষ নেই। ১৯৬৪ সালের ঘটনা। ছাত্রনেতা নূরে আলম সিদ্দিকী ২১শে ফেব্রুয়ারি উপলক্ষ্যে 'রক্তকপোত' নামে একটি একাঙ্কিকা নাটক লিখে তাতে অজিত গুহের ভূমিকা সংবলিত করে ছাপিয়ে দেয়। সরকারের বিরুদ্ধে বিষোদ্‌গার থাকায় সরকার ঐ নাটিকার লেখক, প্রকাশক ও ভূমিকা লেখকের বিরুদ্ধে গ্রেফতারি পরোয়ানা জারি করে। '৫২'র ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণের দায়ে ২৪শে ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে তাকে গ্রেফতার করা হয়। ১৯৫২ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি জহুর হোসেন চৌধুরীর কাছে তিনি জেনেছিলেন 'সরকার সে রাতে বহু ছাত্র, রাজনৈতিক নেতা এবং শিক্ষককে গ্রেফতার করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে এবং সে তালিকায় তাঁরও নাম আছে' (উমর, ২০১২, পৃ. ১৭৯)।

অজিত কুমার গুহকে প্রথমেই দিনাজপুর কারাগারে আটক রাখা হয়। পরে ঢাকা কেন্দ্রীয় কারগারে স্থানান্তর করা হয়। ভাষা আন্দোলনের চেতনাকে তিনি হৃদয়ে ধারণ করেছেন সর্বত্র। ১৯৫৩ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে অবস্থানকালে মুনীর চৌধুরী, মুজাফ্‌ফর আহমদ চৌধুরী, শামসুল হক, অলি আহাদ, মোহাম্মদ তোয়াহা, আবদুল মতিন, ফজলুল করিম প্রমুখের সঙ্গে 'শহীদ দিবস' পালন করেন। ফজলুল করিম *বায়ান্নর কারাগার* গ্রন্থে বলেন, ''তিনি নিজের একজোড়া সিল্কের কালো মোজা কেটে তৈরি করেন কালো ব্যাজ'' (করিম, ২০১০, পৃ. ৬৯)।

১৯৫৪ সালের ৩০শে মে ৯২-ক ধারায় পুনরায় অজিত গুহকে গ্রেফতার করা হয়। এ সময় তিনি এক বছর কারাভোগ করেন। জেলখানায় অসুস্থ অবস্থায় তিনি মানবেতর জীবনযাপন করেন। রাষ্ট্রভাষা বাংলাকে মর্যাদার আসনে অধিষ্ঠিত করার জন্য সমগ্র জীবন অতিবাহিত করেছেন, তিনি অবিবাহিত ছিলেন, সংসারী হওয়ার ইচ্ছেও তার মধ্যে দেখা যায়নি। অগণিত ছাত্র ও ভক্তের হৃদয়ে অবস্থান করছেন অজিত কুমার গুহ। ১৯৬৯ সালের ১২ই নভেম্বর এই মহান সাংস্কৃতিক পুরোধা ব্যক্তিত্বের জীবনাবসান ঘটে। ২০১৩ সালে তাঁকে মরণোত্তর একুশে পদক দিয়ে জাতি নিজেকে গৌরবান্বিত করেছে। তাঁর স্মৃতিকে স্মরণীয় করে রাখতে কুমিল্লায় একটি কলেজের নামকরণ করা হয়েছে 'অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়'। সম্প্রতি ২৮শে ফেব্রুয়ারি,

২০২৪ দৈনিক *ইত্তেফাক* পত্রিকার ১৬ নং পৃষ্ঠায় "শিক্ষার আলো ছড়াচ্ছে ভাষাসৈনিক অজিত গুহ মহাবিদ্যালয়" শিরোনামে একটি প্রতিবেদন প্রকাশিত হয়েছে। কর্তৃপক্ষের দাবি–

'বঙ্গবন্ধুর কারাজীবনের সঙ্গীর স্মৃতি রক্ষায়
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি জাতীয়করণের দাবি' সরকারের প্রতি

সম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগ অজিত কুমার গুহের স্মৃতি রক্ষার্থে ২০২৩ সালে বিভাগীয় সেমিনারের নামকরণ করেছেন 'অজিত কুমার গুহ পাঠাগার'।

আবুল মনসুর আহমদ (১৮৯৮-১৯৭৯) অল্প বয়স থেকেই রাজনীতি-সচেতন ছিলেন। তাঁর রাজনৈতিক জীবনের সূত্রপাত কংগ্রেসের একজন কর্মী হিসেবে (হাসান, ২০১২, পৃ. ১৯০)। ১৯৪৭ সালের ১৫ই সেপ্টেম্বর 'তমুদ্দুন মজলিস'-এর পক্ষ থেকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু শিরোনামের পুস্তিকা প্রকাশিত হয়, তিনি তার সঙ্গে যুক্ত ছিলেন। এ পুস্তিকায় 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' নামক প্রবন্ধে বাংলা ভাষার পক্ষে যুক্তিসম্মত দাবি তুলে ধরেন। আবুল মনসুর আহমদ জগন্নাথ কলেজ থেকে ১৯১৯ সালে আই. এ. পাশ করেছিলেন। ১৯৪৮ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে আবুল মনসুর আহমেদের সভাপতিত্বে কলকাতায় অনুষ্ঠিত বঙ্গীর মুসলমান সাহিত্য সমিতির এক অধিবেশনে 'বাংলাকে সরকারি ভাষা করার প্রস্তাব গৃহীত হয়' (মাহবুব, ২০১২, পৃ. ৭৫)। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনে তিনি সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। ১৯৫২ সালের ২৫শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে স্থানীয় বিপিন পার্কে আবুল মনসুর আহমদের সভাপতিত্বে প্রায় ৩০ হাজার লোকের উপস্থিতিতে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। উক্ত সভায় প্রস্তাবসমূহের মধ্যে ছিল শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা, শোকার্ত আত্মীয়স্বজনদের সমবেদনা জ্ঞাপন, নূরুল আমীন মন্ত্রিসভার বিরুদ্ধে ক্ষোভ প্রকাশ, বেসরকারি তদন্ত কমিটি গঠন, ১৪৪ ধারা প্রত্যাহার, ও পরিষদের সদস্যদের পদত্যাগ দাবি করা হয়। ভাষাশহিদদের স্মৃতিকে অম্লান করে রাখার জন্য নির্মিত মিনারকে 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' না বলে 'শহিদ মিনার' হিসেবে প্রচলনের প্রথম উদ্যোক্তাও তিনি। আবুল মনসুর আহমদ বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠার দাবি করলেও পরবর্তীকালে পূর্ব-পাকিস্তানে মুসলমান জীবনভিত্তিক স্বতন্ত্র সংস্কৃতি সৃষ্টির প্রয়াস চালান যাকে নাম দেন 'পাক-বাংলার কালচার' (আলীম, ২০২১, পৃ. ১৭৭)। রবীন্দ্র-সংগীত পাকিস্তানি আদর্শের পরিপন্থি বলে পাকিস্তান সরকার ১৯৬৭ সালের জুন মাসে রেডিও-টেলিভিশনে এই সংগীত নিষিদ্ধ করলে তিনি তা সমর্থন করেন। সুতরাং এটা স্পষ্ট যে সাংস্কৃতিক চিন্তায় তিনি ছিলেন স্ববিরোধী চেতনার।

ডা. গোলাম মাওলার (১৯২০-১৯৬৭) জন্মস্থান শরীয়তপুর জেলার নড়িয়া থানার পোড়াগাছা গ্রাম। ১৯৩৯ সালে নড়িয়া বিহারী লাল উচ্চ বিদ্যালয় থেকে ম্যাট্রিকুলেশন, ১৯৪১ সালে ঢাকার জগন্নাথ কলেজ থেকে আই. এস. সি এবং ১৮৪৩ সালে বি. এস. সি. পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হন। ১৯৪৬ সালে কলকাতা মেডিকেল কলেজে ভর্তি হলেও দেশভাগের পর ঢাকায় চলে আসেন এবং ভর্তি হন ঢাকা মেডিকেল কলেজে। ১৯৫৪ সালে এখান থেকে এম. বি. বি. এস ডিগ্রি লাভ করেন। তিনি ১৯৫২ সালে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে আন্দোলনের নেতৃত্ব দেন। ২১শে ফেব্রুয়ারি সঙ্গীদের নিয়ে উপস্থিত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায়। তাঁর নির্দেশ ও পরামর্শে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ২০ নং ব্যারাকের ১ নং কক্ষে কন্ট্রোলরুম স্থাপন করা হয়। ভাষা আন্দোলনে সক্রিয় ভূমিকা রেখেছিলেন তৎকালীন জগন্নাথ কলেজের সাবেক এই শিক্ষার্থী। বাংলাপিডিয়ায় বলা হয়েছে, "মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণের যে জায়গায় প্রথম গুলি হয়েছিল ঠিক সেই স্থানেই ২৩

ফেব্রুয়ারি রাতে গোলাম মাওলার সার্বিক তত্ত্বাবধানে প্রথম শহীদ মিনার নির্মিত হয়" (বাংলাপিডিয়া, দশম খণ্ড, পৃ. ৪৭৫)।

ফেব্রুয়ারির ২১ তারিখ, ইতিহাসের রক্তের অক্ষরে লেখা একটি দিন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আমতলায় ছাত্ররা সভা করল। ১৪৪ ধারা ভেঙে তুমুল উত্তেজনা আর স্লোগানে স্লোগানে তার একটি দাবির কথাই বলেছিল- "রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই"। পাঁচজন, সাতজন, দশজন করে ছোটো ছোটো দলে গেট পেরিয়ে রাস্তায় নেমে ১৪৪ ধারা অমান্য করতে লাগল। পুলিশ তাদের গ্রেফতার করল আর গাড়িতে তুলে থানায় নিয়ে যেতে লাগল। কে আগে যাবে এই নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে হুড়োহুড়ি পড়ে গেল। ছাত্রদের সঙ্গে বিক্ষোভে যোগ দিয়েছিল এলাকার রেস্টুরেন্টের বয়, অফিসের পিয়ন, রিকশাওয়ালারা। পুলিশ যখন তাদের সঙ্গে পেরে উঠল না তখন গুলি চালাল। কেবল রাস্তায় নয়, মেডিকেল কলেজের ভিতরেও গুলি চালানো হয়। পথের উপরেই শহিদ হলেন রফিকউদ্দীন আহমদ (১৯২৬-১৯৫২) এরপর আবুল বরকত, আবদুস সালাম, অহিউল্লাহ ও নাম না জানা অনেকেই। ভাষাশহিদ রফিকউদ্দিন আহমদ সম্পর্কে আব্বাস উদ্দিন আহমেদ বলেছেন:

> শহীদ রফিকের জন্ম তৎকালীন ঢাকা জেলার মানিকগঞ্জ মহকুমার অন্তর্গত সিঙ্গাইর থানার বলধারা ইউনিয়নের পারিল গ্রামে। পারিল এককালে খুবই বর্ধিষ্ণু গ্রাম হিসেবে পরিচিত ছিল। ব্রিটিশ আমলেই এখানে ছিল ডাকঘর, ইউনিয়ন অফিস এবং সরকারি ডিসপেনসারি। পারিল বলধারার সেন পরিবারের ছিল দেশজোড়া খ্যাতি। বর্তমানে এটি মানিকগঞ্জ জেলার সিঙ্গাইর উপজেলার অন্তর্ভুক্ত একটি গ্রাম, যা ভাষাশহীদ রফিকের স্মৃতিধন্য 'রফিকনগর' নামে পরিচিতি লাভ করেছে (আহমেদ, ২০১৭, পৃ. ১৩)।

শহিদ রফিকউদ্দিনের পিতার নাম আবদুল লতিফ এবং মাতার নাম রাফিজা খাতুন। ১৯৪৬-এ কলকাতার মহাদাঙ্গার পর রফিক দেশে ফিরে আসেন এবং বায়রা স্কুলে ভর্তি হন। এই স্কুল থেকেই তিনি প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে ভর্তি হন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজে বাণিজ্য বিভাগে। পরবর্তীকালে তিনি ঢাকার জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হন। শিক্ষা জীবনের পাশাপাশি তিনি মাঝেমধ্যে পিতার প্রেসের ব্যবসা দেখাশোনা করতেন (আহমেদ, ২০১৭, পৃ. ১৪)।

অধিকাংশ গণমাধ্যমই ভাষাশহিদ রফিকের জীবনী আলোচনা করতে গিয়ে তাঁকে মানিকগঞ্জের দেবেন্দ্র কলেজের ছাত্র হিসেবে তুলে ধরে। এই তথ্যটি যে অসত্য এমনটাও নয়। দেবেন্দ্র কলেজে পড়া শেষ করে তিনি তৎকালীন জগন্নাথ কলেজে ভর্তি হয়েছিলেন। ১৯৫২ সালে তিনি যখন ভাষা আন্দোলনে যোগ দেন তখন তিনি জগন্নাথ কলেজের ছাত্র। ১৯৫০ সালে তিনি দেবেন্দ্র কলেজ থেকে আই. এ. পরীক্ষা দিয়েছিলেন বাণিজ্য বিভাগ থেকে। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য:

> ভাষা আন্দোলনের অমর শহিদ রফিক, পুরো নাম রফিক উদ্দিন। ... মানিকগঞ্জের সরকারি দেবেন্দ্র কলেজে ১ম ও ২য় বর্ষে লেখাপড়া করেন। ১৯৫২ সালে ২১ ফেব্রুয়ারি তিনি ঢাকা জগন্নাথ কলেজের ছাত্র ছিলেন। ... মাত্র ২৬ বছর বয়সে রফিক ঢাকা মেডিকেল কলেজের সামনে মিছিলে গুলিবিদ্ধ হয়ে শহিদ হন। (ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর পূর্তি স্মারক, ঢাকা সাহিত্য সংস্কৃতি কেন্দ্র)।

তিনি জগন্নাথ কলেজের নিয়মিত ছাত্র নয় বরং অনিয়মিত ছাত্র হিসেবে সান্ধ্যকালীন কোর্সের ছাত্র ছিলেন। কারণ হিসেবে বলা যায় রফিকউদ্দিন পিতাকে বলেছিলেন পড়ালেখার পাশাপাশি তিনি প্রেস ব্যবসা দেখাশুনা করবেন, এ কারণেই সান্ধ্যকালীন কোর্সে ভর্তি হয়েছিলেন। একটি সূত্র থেকে জানা যায়, তিনি হিসাববিজ্ঞান বিভাগের ছাত্র ছিলেন। দিন কয়েক পরেই যার দীর্ঘ দিনের ভালোবাসার মানুষ, একই গ্রামের রাহেলা খাতুন পানুবিবির সাথে বিয়ের তারিখ পাকাপাকি হয়েছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি বিয়ের শাড়ি-গহনা নিয়ে যার সন্ধ্যায় বাড়ি ফেরার কথা ছিল। নিজের জীবন দিয়ে বাংলা ভাষাকে বিশ্ব অঙ্গনে উন্নত করে গেলেন সেই রফিকউদ্দিন। ভাষাশহিদ রফিকউদ্দিন আহমেদ পৃথিবীর প্রথম ভাষাশহিদ হলেও আজ পর্যন্ত তার কবর নির্ধারণ করা সম্ভব হয়নি। শত্রুরা তাকে মেরেই ক্ষান্ত হয়নি, ঢাকা মেডিকেল থেকে তার লাশ লুকিয়ে ফেলে এবং জনরোষের ভয়ে পরের দিন সেনাদের সহযোগিতায় আজিমপুর কবরস্থানে দাফন করে। তাঁর কবরের কোনো চিহ্ন রাখা হয়নি। ১৯৫২ সালে ভাষা আন্দোলনের একজন কর্মী ছিলেন আবদুল গাফ্ফার চৌধুরী (১৯৩৪-২০২২) তিনি ভাষা আন্দোলনের শহিদদের রক্তাক্ত স্মৃতি স্মরণে কালজয়ী গান রচনা করেন:

আমার ভাইয়ের রক্তে রাঙানো একুশে ফেব্রুয়ারি
আমি কি ভুলিতে পারি

এই সময় মুনীর চৌধুরী (১৯২৫-১৯৭১) ঢাকা কেন্দ্রীয় কারাগারে রণেশ দাশগুপ্তের চিরকুটে পাঠানো অনুরোধে 'কবর' নাটকটি রচনা করেন। 'কবর' নাটকে লাশের বীভৎস চিত্র অঙ্কন করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের শহিদেরা যে নিছক লাশ নয়, তাঁরা বাঙালির ঐতিহ্যের, সংস্কৃতির, চেতনার জাগ্রত রূপ, মুনীর চৌধুরী তাই ব্যক্ত করেছেন।

প্রথম প্রতিবাদী নাটক হিসেবে 'কবর' নাটকের প্রসঙ্গ আসে। কারণ সামন্তপ্রথা, সাম্প্রদায়িকতা, ঔপনিবেশিক শোষণ ও সংস্কৃতির ওপর অত্যাচারের বিরুদ্ধে এই নাটকটিতেই উচ্চারিত হয়েছিল প্রতিবাদের ভাষা। জগন্নাথ কলেজের ভাষা আন্দোলনের ভয়াবহ স্মৃতি তুলে ধরেছেন তৎকালীন ছাত্র আবদুর রহিম। তাঁর ভাষ্য:

> একটি কথা না বললে আমার লেখা অসমাপ্ত থেকে যাবে। তা হলো বাংলাভাষা আন্দোলনে জগন্নাথ কলেজের অবদান। ১৯৫১-১৯৫২ সাল পর্যন্ত পুরোনো ঢাকায় জগন্নাথ কলেজেই ছিল অন্যতম প্রধান দুর্গ। এ সম্পর্কে নিশ্চয়ই অন্যরা বিস্তারিত লিখবেন। সেই বাংলাভাষা আন্দোলনের স্রোতে আমিও অতি ক্ষুদ্র অংশগ্রহণ করি। সেদিনের সহপাঠী তোফাজ্জল হোসেন, খোন্দকার আলী আশরাফ, লন্ডনে স্বনির্বাসিত আমির আলী, সাহিত্যিক প্রয়াত নেয়ামাল বাসীর, সৈয়দ আহমদ হোসেন, মশিউর রহমান (আমাদের কাছে মসী), প্রয়াত মৃণাল বরুবীর কথা আজ স্মরণ করি। নেয়ামাল বাসীর আর আমি একই হোস্টেলে ছিলাম। ওর কাছ থেকে শুনতাম রাজনীতির কথা, বাংলা ভাষার কথা, বাংলাভাষার বিরুদ্ধে চক্রান্তের অপচেষ্টা (চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ২৭১-৭২)।

ভাষা আন্দোলনে প্রত্যক্ষ অংশগ্রহণকারী ছাত্র এ আর ইউসুফ স্মৃতিচারণ করে বলেছেন:

> ছাত্রসংগ্রাম পরিষদ দুপুর ১২ টায় সাধারণ ছাত্রসভার আয়োজন করে। জগন্নাথ কলেজের ছাত্রসংগ্রাম পরিষদও সভার আয়োজন করে এবং সভা শেষ করে কেন্দ্রীয় ছাত্রসংগ্রাম পরিষদে যোগদানের জন্য আমার নেতৃত্বে এক বিরাট মিছিল সহকারে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের দিকে এগোতে

> থাকি। রায়সাহেব বাজার পুলের কাছে পৌঁছার সঙ্গে সঙ্গে পুলিশ আমাদের বাধা দেয় এবং আমাদের ৮/১০ জনকে গ্রেফতার করে। ... আমাদের গ্রেফতার করে কোতওয়ালী থানায় নিয়ে যায় এবং এরপর সেন্ট্রাল জেলে পাঠিয়ে দেয় (দৈনিক ভোরের কাগজ, ৯ ফ্রেব্রুয়ারি, ২০১৭)।

শেষকথা

১৬০ বছরেরও বেশি সময় ধরে যে শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানটি জ্ঞানের আলো ছড়িয়ে দিয়েছে সেই প্রতিষ্ঠানটি বর্তমানে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় নামে পরিচিত। বাংলাদেশের জন্ম ও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস ওতপ্রোতভাবে জড়িত। বাঙালির প্রতিটি আন্দোলন-সংগ্রামেও জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (তৎকালীন জগন্নাথ কলেজ) রয়েছে সমৃদ্ধ ইতিহাস। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলন, '৬২'র শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ, '৬৬'র ছয়দফা, '৬৮'র এগারো দফা, '৬৯-এর গণঅভ্যুত্থান এবং ১৯৭১-এর মহান মুক্তিযুদ্ধে জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীর ভূমিকা ছিল অগ্রগণ্য। পৃথিবীর ইতিহাসে বাঙালিরাই একমাত্র জাতি, যাঁরা নিজের ভাষার জন্য জীবন দিয়েছেন। আমাদের আলোচনার ক্ষেত্র ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে তবে জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের ভূমিকা চলমান। ১৯৭১ সালে বাংলাদেশ স্বাধীন হলে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাভাষা প্রবর্তিত হয়। ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘের ইউনেস্কো ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণা করে। ২০০০ সালে বাংলাদেশ সরকার শহিদ রফিকউদ্দিন আহমেদকে মরণোত্তর একুশে পদকে ভূষিত করেন। জগন্নাথ কলেজের শিক্ষার্থী রফিকউদ্দিন আহমেদের স্মৃতি রক্ষার্থে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ ২০১৪ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের পুরোনো বিজনেস স্টাডিজ ভবন-২ এর নামকরণ করেন 'ভাষাশহীদ রফিক ভবন'। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনিক ভবনের সামনে অবস্থিত ভাষাশহিদদের স্মরণে নির্মিত শহিদ মিনারটির সঙ্গে দেশের অন্যান্য শহিদ মিনারের কোনো মিল খুঁজে পাওয়া যায় না। যে-কেউ প্রথম দেখতেই শহিদ মিনারটিকে স্থাপত্যশিল্প মনে করবে। দেশের সব শহিদ মিনারে তিন থেকে পাঁচটি বেদি থাকলেও এই শহিদ মিনারটির একটি প্রধান বেদিসহ মোট বেদির সংখ্যা আটটি। প্রতিটি বেদি বৃত্তাকারে সাজানো। প্রতিটি বেদি নিজ অবস্থানে পেছনের দিকের পাদদেশে কোমর ভেঙে হেলানো রয়েছে। প্রধান বেদিটি ব্যতিক্রম– দাঁড়ানো অবস্থায় সামনের দিকে অর্ধনমিতভাবে রয়েছে। এই শহিদ মিনারটিতে ভাষা আন্দোলনের দাবিতে ছাত্রদের সংঘবদ্ধ সমাবেশের একটি নিখুঁত চিত্র তুলে ধরা হয়েছে বলে বিজ্ঞজনেরা মনে করেন। ভাষা আন্দোলনে জগন্নাথ কলেজের অবদান বর্তমান প্রজন্ম খুব সামান্যই জানে। ভাষা আন্দোলনের প্রকৃত ইতিহাস এবং জগন্নাথ কলেজের শিক্ষক-শিক্ষার্থীদের অবদান জাতির কাছে তুলে ধরতে হলে বর্তমানে শিক্ষক-শিক্ষার্থীসহ সকল শুভাকাঙ্ক্ষীদের এগিয়ে আসতে হবে। বিশ্ববাসীর কাছে পৌঁছে দিতে হবে জগন্নাথ কলেজের সাবেক শিক্ষার্থী শহিদ রফিকউদ্দিন আহমেদ, শফিউদ্দিন আহমদ, আনিসুজ্জামান, আহমদ হোসেন, এম. আমিরুল ইসলাম, জহির রায়হান, আব্দুল গাফ্ফার চৌধুরী, আবদুর রব, মৃণাল বরুড়ি, খলিলুর রহমান, মোঃ আব্দুল জলিল, অজিত কুমার গুহ, ড. সালাউদ্দীন আহমদ, তোফাজ্জল হোসেন, খোন্দকার আলী আশরাফ, নেয়ামাল বাসীরসহ সবার ভাষা আন্দোলনের জন্য মহান ত্যাগের ঘটনা।

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান (সম্পা.) [১৯৯০]। *অজিত গুহ স্মারক গ্রন্থ*। ঢাকা: অজিত গুহ স্মারক গ্রন্থ প্রকাশনা পরিষদ।

আনিসুজ্জামান, (অগাস্ট, ২০১৫)। *কাল নিরবধি*। তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

আল্‌হেলাল, বশীর (২০১৬)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। তৃতীয় মুদ্রণ। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

আলীম, এম আবদুল (২০১১)। *ভাষা-আন্দোলন-কোষ*। প্রথম খণ্ড। ঢাকা: কথা প্রকাশনী।

আহমেদ, আব্বাসউদ্দিন (২০১৭)। *ভাষা শহীদ রফিকউদ্দিন আহমদ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১২)। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। প্রথম ও দ্বিতীয় খণ্ড। ঢাকা: সুবর্ণ।

কর, শ্রী বঙ্ক বিহারী (১৯৫১)। *পূর্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজের ইতিবৃত্ত*। বিহার: ব্রাহ্মসমাজ গিরিডি।

করিম, ফজলুল (ডিসেম্বর ২০১০)। *বায়ান্নর কারগার*। দ্বিতীয় মুদ্রণ, ঢাকা: যুক্ত।

কাদের, চৌধুরী শহীদ (সম্পা.) [২০১৫]। *ব্রাহ্ম স্কুল থেকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়*। ঢাকা: সুবর্ণ।

খান, শামসুজ্জামান ও আল্‌হেলাল, বশীর ও হোসেন, সেলিনা ও বিশ্বাস, সুকুমার ও চৌধুরী, শফিকুর রহমান ও ইসলাম, নূরুল (সম্পা.) [২০১৫]। *ভাষা আন্দোলনের শহীদেরা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

গুহ, অজিত কুমার (সাক্ষাৎকার, ১৪. ০৮. ১৯৬৯)। উদ্ধৃত: উমর, বদরুদ্দীন (২০১৫)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (সম্পা.)। [*বাংলাপিডিয়া*, ২০১১] দশম খণ্ড। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

বাসির, নেয়ামাল (১৯৮১)। *স্মৃতিচারণ- '৮১*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মাহবুব, এম আর (২০১২)। *যারা অমর ভাষা সংগ্রামে*। ঢাকা: অনিন্দ্য প্রকাশ।

মাহবুব, এম আর (২০১৭)। *সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: গৌরব প্রকাশনী।

মুকুল, এম আর আখতার (২০০৯)। *চল্লিশ থেকে একাত্তর*। ঢাকা: অনন্যা প্রকাশনী।

রফিক, আহমেদ ও ঘোষ, বিশ্বজিৎ (সম্পা.) [২০০৩]। *ভাষা আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

রশিদ, হারুণ-অর মির্জা (সম্পা.) [১৯৯২]। *স্মরণিকা*। শতবর্ষ পূর্তি উৎসব' ৯২। ঢাকা: জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কলেজ।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পা.) [২০১২]। *একুশে ফেব্রুয়ারী*। ঢাকা: বাঙ্গালা গবেষণা প্রকাশনা।

সেন, শ্রী রংগলাল (১৯২১-১৯৮১)। *বাসন্তিকা*। জগন্নাথ হল হীরকজয়ন্তী সংখ্যা। ঢাকা: ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়।

হাসান, মোরশেদ শফিউল (২০১২)। *পূর্ব বাংলায় চিন্তাচর্চা ১৯৪৭-১৯৭০*। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

পত্রিকা

দৈনিক আজাদ, ২৯শে জুলাই, ১৯৪৭।

দৈনিক ভোরের কাগজ, ৯ ফেব্রুয়ারি, ২০১৭।

দৈনিক ইত্তেফাক, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।

সাক্ষাৎকার

রায়চৌধুরী, কালীশঙ্কর (২৩শে জুন, ২০২৪ খ্রি.)। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: শামীম আরা।

ভাষা আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান

চাঁদ সুলতানা কাওছার

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookChad

পূর্ববাংলার উচ্চশিক্ষার প্রথম পাশ্চাত্য চিকিৎসাশিক্ষা প্রতিষ্ঠান ঢাকা মেডিকেল কলেজ (১৯৪৬)। এই মেডিকেল কলেজ প্রতিষ্ঠার একবছর পরই (১৯৪৭) ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান হয় এবং ভারত ও পাকিস্তান রাষ্ট্র আবির্ভূত হয়। নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ববাংলা শুরু থেকেই নানারকম শোষণ-বঞ্চনার শিকার হয়। পাকিস্তান সরকার এই অঞ্চলের মাতৃভাষার ওপর প্রথম আঘাত আনে এবং প্রতিবাদস্বরূপ পূর্ববাংলার ছাত্রসমাজ আন্দোলন গড়ে তোলে। এ ক্ষেত্রে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের সাহসী ও প্রতিবাদী ভূমিকা ছিল স্মরণীয়। তারা ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে সুসংগঠিত হয়েছে এবং আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছে। অথচ তাদের অবদানের কথা অনেকের কাছে অজানা এবং সার্বিকভাবেও স্বীকৃতি পায়নি। চিকিৎসাশিক্ষার শিক্ষার্থীদের সার্বক্ষণিক তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পড়াশোনায় ব্যস্ত থাকতে হয়। পড়াশোনার বাইরে অন্য কিছুতে সময় ব্যয় করা খুব কঠিন। তারপরও এ কলেজের শিক্ষার্থীরা দেশ ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর ভালোবাসা ও শ্রদ্ধাবোধ থাকায় ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে এবং অসামান্য ভূমিকা রাখে। আলোচ্য প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন তথা ১৯৪৭, ১৯৪৮ এবং চূড়ান্ত-পর্ব তথা ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান তুলে ধরা হয়েছে। এক্ষেত্রে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় গ্রন্থাগারের রেয়ার সেকশন, জাতীয় গ্রন্থাগার ও বাংলাদেশ জাতীয় আরকাইভস, ঢাকা মেডিকেল কলেজ লাইব্রেরির বই, পত্রপত্রিকা ও সাক্ষাৎকার থেকে প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ করা হয়েছে।

পূর্ববাংলার মানুষ দীর্ঘকাল রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক, সামাজিক অধিকার থেকে বঞ্চিত ছিল। এ অঞ্চল বিদেশি শক্তি তথা ব্রাহ্মণ, তুর্কি, পাঠান, মোগল, ইংরেজ ও পাকিস্তানিদের দ্বারা শাসিত ও শোষিত হয়। বিদেশিদের দ্বারা শাসন ও শোষণের সাথে সাথে বিদেশি ভাষাও আধিপত্য প্রতিষ্ঠা করে রাষ্ট্রীয় ভাষা বা সরকারি ভাষা হিসেবে। এর ফলে দেশি ভাষা তেমন বিকাশের সুযোগ পায়নি। ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসানের পর দেশি ভাষার রাষ্ট্রীয় মর্যাদালাভের সুযোগ আসলেও বাংলাভাষা বঞ্চিত হয় (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ৯৯)। অবিভক্ত ভারতের মুসলমানগণ বিভিন্নভাষী ছিলেন। এর মধ্যে বাংলাভাষী মুসলমানের সংখ্যা ছিল সবচেয়ে বেশি (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ৯৯)। ১৯২১ সালে সেন্সাস রিপোর্টে বাংলা ভাষাভাষী মুসলমানদের সংখ্যা ছিল ২৩,৯৯৫,০০০ (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ৯৯)।

দেশবিভাগের সময় পশ্চিম পাকিস্তান বিভিন্নভাষী (পাঞ্জাবি, সিন্ধি, পশতু, বালুচি, ব্রাহুই) এবং পূর্ব-পাকিস্তান বাংলাভাষা অধ্যুষিত অঞ্চল। এ সময়ে ভারত থেকে উর্দু ও অন্যভাষী মুসলমান ব্যাপক সংখ্যায় পশ্চিম পাকিস্তানে চলে যায় এবং স্বল্প-সংখ্যক পূর্ববাংলায় চলে আসে। ১৯৪৮ সালে পাকিস্তানে মোট ৬ কোটি ৯০ লক্ষ মানুষের মধ্যে ৪ কোটি ৪০ লক্ষ ছিল বাংলা ভাষাভাষী (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ৯৯)। সামগ্রিকভাবে

পাকিস্তানে বাংলাভাষীর সংখ্যা বেশি হওয়া সত্ত্বেও পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠী বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রীয় ভাষার মর্যাদা দিতে অনীহা প্রকাশ করে। ফলে শুরু হয় রাষ্ট্রভাষার দাবিতে প্রতিরোধ আন্দোলন তথা রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন।

ভাষা আন্দোলন ও বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের ইতিহাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পাশাপাশি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরাও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রাখে। এ আন্দোলনের সূচনালগ্ন (১৯৪৭) থেকে প্রতিটি পর্বে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করে। বর্তমান প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস তথা পটভূমিতে না গিয়ে এই আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান কতটুকু তা তুলে ধরা হয়েছে।

চিকিৎসাশিক্ষা, কারিগরি অন্য যেকোনো শিক্ষার চেয়ে ব্যতিক্রম। চিকিৎসাশিক্ষার মূল বিষয় হলো মানুষের সুস্থতা তথা অসুস্থ মানুষকে সুচিকিৎসা দিয়ে সুস্থ করা ও জীবন রক্ষা করা। স্বাভাবিকভাবেই তাত্ত্বিক শিক্ষার চেয়ে হাতে-কলমে ব্যবহারিক শিক্ষা এখানে গুরুত্বপূর্ণ। তাত্ত্বিক পড়াশোনার পাশাপাশি রোগীর পাশে বসে রোগ-নির্ণয়, ঔষধ প্রয়োগ, এর কার্যকারিতাসহ সবকিছু পর্যবেক্ষণ তথা ক্লিনিক্যাল শিক্ষার ওপর সুচিকিৎসক হওয়া নির্ভর করে। প্রতিটি ক্লাশে প্রত্যেক শিক্ষার্থীর উপস্থিতি প্রয়োজন হয়। অন্যথায় সুচিকিৎসক হয়ে ওঠার সম্ভাবনা কমে যায়। সুচিকিৎসক হতে না পারলে কোনো শিক্ষার্থীর পক্ষে ক্যারিয়ার গড়াও কঠিন হয়ে পড়ে। ফলে চিকিৎসাশিক্ষার মতো জটিল বিষয়ের শিক্ষার্থীদের জন্য পড়ার বাইরে অন্য কিছুতে সময় দেওয়া দুরূহ হয়। আন্দোলনে জড়িত হলে নিজেদের সুন্দর ভবিষ্যৎ নষ্ট হতে পারে জেনেও মেডিকেল কলেজের অনেক শিক্ষার্থী দেশাত্মবোধের নৈতিক কর্তব্যবোধ থেকে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে সুসংগঠিত হয়ে যোগদান করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের সে সময়ের (১৯৫২) কলেজ ছাত্র ইউনিয়নের ডা. শরফুদ্দিন আহমেদ (শিক্ষাবর্ষ ১৯৪৮-৪৯, ব্যাচ K-7) বলেন, ''মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা স্বতঃস্ফূর্তভাবে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। তাদের মনোভাবটি এ রকম ছিল যে, শিক্ষাজীবন শেষে চাকুরি না করে প্রাইভেট প্রাকটিস করে জীবন নির্বাহ করা যাবে'' (ALUMNI DIRECTORY DHAKA MEDICAL COLLEGE, PP-13-23 এবং রফিক, ২০০৩, পৃ. ৮০)।

১৯৪৭ সালের নভেম্বর-ডিসেম্বর থেকে পূর্ববঙ্গে ভাষাবিষয়ক বিক্ষোভের সূচনা হয়। ভাষা আন্দোলনের সূচনাপর্বে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান সম্পর্কে এ কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মির্জা মাজহারুল ইসলাম বলেন, ''১৯৪৭-এ পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর থেকে রাষ্ট্রীয় কাজে উর্দু ও উর্দু ভাষাভাষীদের দাপট শুরু হয়। ইংরেজ আমলের পোস্ট কার্ড ইনভেলাপ হতে বাংলা উঠিয়ে লেখা হয়, তখনই আমাদের মনে ভাষার প্রশ্নটি উদয় হয় এবং এর প্রতিবাদের জন্য তৈরি হই'' (লিটু, ২০১৮, পৃ. ৩৩-৩৪)। এ বছরের ডিসেম্বর মাসে ক্ষমতাসীন সরকারের সহযোগিতায় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবি নিয়ে পুরনো ঢাকার উর্দুভাষী অধিবাসীরা ঢাকা মেডিকেল কলেজের অস্থায়ী পলাশী ব্যারাকের ছাত্রাবাসের সামনে মিছিল নিয়ে আসলে কলেজের শিক্ষার্থীরা তা প্রতিরোধ করার চেষ্টা করে এবং তারা পালিয়ে যেতে বাধ্য হয় (*দৈনিক আজাদ*, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭)। এর ফলে কলেজের অনেক শিক্ষার্থী আহত হয়। ভাষার প্রশ্নে প্রথম প্রত্যক্ষ প্রতিরোধ-সংগ্রামে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা সাহসের সাথে অংশগ্রহণ করে। এ ব্যাপারে বিক্ষোভে অংশগ্রহণকারী ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন শিক্ষার্থী ডা. সাঈদ হায়দার বলেন:

> ... মুহূর্তে প্রতিরোধ এলো, মিছিলের অগ্রগতিকে বাধা দিতে বেরিয়ে এলো মেডিকেল ছাত্ররা, শুরু হলো খণ্ড যুদ্ধ। .... মেডিকেল শিক্ষার্থীদের অনেকেই সেদিন আহত হয়েছিল, কেটে ছিঁড়ে গিয়েছিল

> তাঁদের অঙ্গ প্রতঙ্গ, কিন্তু দৃঢ় মনোবল নিয়ে তারা সেদিন ভাষা ও সংস্কৃতির শত্রুদের আক্রমণ প্রতিহত করেছিল, দুর্জয় সাহস আর ভাষার প্রতি গভীর অনুরাগ নিয়ে... (হায়দার, ১৯৯৬, পৃ. ৯৯)।

১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সূচনা হলেও তা ১৯৪৮ সালে সুনির্দিষ্ট আন্দোলনের রূপ নেয়। একই বছরের (১৯৪৮) ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের কংগ্রেস দলীয় সদস্য কুমিল্লার ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ইংরেজি, উর্দুর সাথে বাংলাকে গণপরিষদের তৃতীয় ব্যবহারিক ভাষা হিসেবে গ্রহণ করার জন্য প্রস্তাব উত্থাপন করলে তা মুসলিম লীগের সদস্যদের বিরোধিতার কারণে বাতিল হয়ে যায়। এ সিদ্ধান্তের প্রতিবাদে ফেব্রুয়ারি মাসের (২৬, ২৮, ২৯) বিভিন্ন সময়ে সভা অনুষ্ঠিত হয় ও ধর্মঘট পালিত হয়। উক্ত সভা ও ধর্মঘটে ঢাকা মেডিকেল কলেজের বেশকিছু শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। তারা ক্লাস বর্জন করে রাস্তায় নেমে এসে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে বিভিন্ন স্লোগান দেয় এবং পথসভায় বক্তব্য রাখে (লিটু, ২০১৮, পৃ. ৮৫)।

একই বছরের (১৯৪৮) ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে তমদ্দুন মজলিশ ও মুসলিম ছাত্রলীগের এক যৌথসভায় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ পুনর্গঠন করা হয়। এ পরিষদে ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে কলেজের প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মীর্জা মাজহারুল ইসলাম অন্তর্ভুক্ত হন। শুরুর দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিজস্ব কোনো ছাত্রাবাস না থাকায় তাঁকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে থাকতে হয়েছে। মেডিকেল কলেজে তাঁর ব্যাপক পরিচিতি ছিল। তিনি খেলাধুলা, লেখাপড়া ও রাজনীতিতে সক্রিয় ছিলেন। সে কারণেই মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে শিক্ষার্থীদের সংগঠিত করে ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করার জন্য তাঁকে দায়িত্ব দেওয়া হয়। তিনি ছাড়াও এ আন্দোলনের সঙ্গে জড়িত ছিলেন বদরুল আলম, আবু সিদ্দিক মিয়া, আবদুল মান্নান, আবদুল হাই প্রমুখ। তাঁরা আন্দোলনের শুরুর দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের আন্দোলন সংগঠনে তাঁকে যথেষ্ট সহযোগিতা করেন (লিটু, ২০১৮, পৃ. ৮৩)। ১৯৪৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারির সভায় সরকারের ভাষানীতির বিরুদ্ধে প্রতিবাদ গড়ে তুলতে ১১ই মার্চ দেশব্যাপী ধর্মঘট পালনের যে সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়, তা সফল করার জন্য ঢাকার ছাত্রনেতারা নানা কর্মসূচি গ্রহণ করেন। এসব কর্মসূচি বাস্তবায়নের জন্য অন্যান্য শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীদের সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরাও যথেষ্ট সংখ্যায় অংশগ্রহণ করে। অলি আহাদ প্রমুখ নেতার সাথে ঢাকা মেডিকেল কলেজের জসিমুল হক, আবু সিদ্দিক মিয়া, এম. আই. চৌধুরী, মোঃ আলী আসগর প্রমুখ হাইকোর্ট ও সেক্রেটারিয়েটের প্রথম গেটের সামনে অবস্থান নেয়। অন্যান্যরা পলাশী ও নীলক্ষেত ব্যারাক, রেলওয়ে ওয়ার্কশপ অঞ্চলে পিকেটিং করে (হায়দার, ১৯৯৬, পৃ. ২৬৯)।

ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা কেবল ভাষা আন্দোলনে যোগদান করে কারাবরণ করেনি বরং উর্দু শিক্ষার পক্ষে যারা প্রচারণা করছিল, তাদের বিরুদ্ধেও ব্যবস্থা গ্রহণ করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উর্দুভাষী অধ্যাপক ড. সাদানির বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে বেতারে আপত্তিকর বক্তৃতা দেবার প্রতিবাদে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা তাঁর পদচ্যুতির দাবি জানানোর জন্য সভার আয়োজন করে (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১২৬)। পরবর্তীকালে এসব ঘটনার পরিপ্রেক্ষিতে যে নতুন পরিস্থিতির সৃষ্টি হয়, তার বিরুদ্ধে অন্যান্য শিক্ষার্থীর মতো ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররাও প্রতিবাদে অংশগ্রহণ করে।

১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ রেসকোর্স ময়দানে পাকিস্তানের গভর্নর জেনারেল মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার ঘোষণা দিলে মেডিকেল কলেজের মাহফুজ হোসেন, মীর্জা মাজহারুল ইসলাম, আহমেদ ফজলুল মতিন, আবু ছিদ্দিক, আবদুল মান্নানসহ অন্যান্য শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরাও

প্রতিবাদ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা ২২ ও ২৩শে মার্চ ছাত্র-সমাবেশ করে। মূলত মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর বক্তৃতা শুনতে যাওয়া শিক্ষার্থীরাই ব্যারাকের অন্য সহপাঠীদের সাথে নিয়ে পরবর্তী একুশের আন্দোলন গড়ে তোলে (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১২৮)।

১৯৪৮ সালের এপ্রিল থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত বিশেষ কোনো আন্দোলন না হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্রসমাজ ভাষার বিষয়ে প্রস্তুত ছিল। বিভিন্ন সময়ে তারা তাদের কর্মতৎপরতা অব্যাহত রাখে। ১৯৪৯ সালের প্রথম দিকে ঢাকা মেডিকেল কলেজের যেসব ছাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ হলে থাকত তাদের উদ্যোগে এই হল থেকে উর্দুভাষী শিক্ষার্থীদের প্রতিহত করার চেষ্টা হয় এবং এ কাজে তারা সফল হন। এ সময়ের মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতা নিয়ে আ. জা. ম. তকীয়ুউল্লাহ বলেন:

> ... ১৯৪৯ সালের ১১ মার্চ রাষ্ট্রভাষা দিবস পালনসহ ছাত্র আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্ররা প্রধান ভূমিকা পালন করেন। ১৯৫১ সালের ১১ মার্চ পর্যন্ত পুরো আন্দোলনকে প্রাণবন্ত রাখতে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান খুবই গুরুত্বপূর্ণ। ১৯৪৯-১৯৫১ সালের আন্দোলনে মেডিকেল কলেজের ছাত্র আবদুল হাইসহ অনেকেই গ্রেপ্তার হন এবং তাদের কলেজ থেকে বহিষ্কার করা হয়। তৎকালীন সময়ের মেডিকেল কলেজের ছাত্র মোবারকেরও গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল (লিটু, ২০১৮, পৃ. ১২৬)।

এ সময়ের মধ্যে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ভাষা চেতনা এত গভীর ছিল যে, তারা উর্দুভাষা সংশ্লিষ্ট কোনো কিছুকে ছাড় দিতেন না। ১৯৫১ সালের আগস্ট মাসে মেডিকেল কলেজের প্রিন্সিপাল টি আহমেদ (১৯৪৮-১৯৫১) কলেজে 'নাজমা ও নুরী' নামে একটি উর্দু নাটক মঞ্চস্থ করার সিদ্ধান্ত নেন। তাঁর এই সিদ্ধান্তে ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা ক্ষুব্ধ হন এবং নাটকটি মঞ্চস্থ করতে বাধা দেন। ফলে পুরো আয়োজন ব্যর্থ হয়ে যায় (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১২৯)। ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকার পল্টন ময়দানে এক জনসভায় উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ঘোষণা দিলে প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিল শুরু হয়। এ সময় ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরাও প্রতিবাদ ও বিক্ষোভে অংশগ্রহণ করে।

একই বছরের ৩১শে জানুয়ারি ঢাকার বার লাইব্রেরিতে মওলানা ভাসানীর সভাপতিত্বে যে আলোচনা সভা অনুষ্ঠিত হয়, সেখানে পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম লীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, তমদ্দুন মজলিস, ইসলামি ব্রাদারহুড, যুবলীগ ইত্যাদি সংগঠনের প্রতিনিধি ছাড়াও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, ঢাকা মেডিকেল কলেজ, ঢাকা মেডিকেল স্কুল, জগন্নাথ কলেজ প্রভৃতি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে ছাত্রনেতা ও কর্মী উপস্থিত ছিলেন। ঢাকা মেডিকেল কলেজের উপস্থিত নেতৃবৃন্দের মধ্যে ছিলেন শরফুদ্দিন আহমেদ, আহমদ রফিক, মোঃ আলী আসগর, মোজাম্মেল আবদুল সালাম প্রমুখ। এ আলোচনা সভায় সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ বা 'All Parties Committee of Action' গঠিত হয় (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩০)। প্রতিটি সংগঠন ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান থেকে প্রতিনিধি নিয়ে এ পরিষদ গঠন করা হয়। ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে গোলাম মাওলাকে সদস্য মনোনীত করা হয়। এই মনোনয়নে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যে ক্ষোভের সৃষ্টি হয়। কারণ বিশ্ববিদ্যালয়ের হলগুলো থেকে সহ-সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক হিসাবে দুজন করে প্রতিনিধি নেওয়া হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ থেকে শুধু সহ-সভাপতি হিসাবে একজন প্রতিনিধি গোলাম মাওলাকে নেওয়া হয়। এ প্রসঙ্গে এই সভায় উপস্থিত ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী আহমদ রফিক বলেন:

> ...হয়তো উপস্থিত রাজনীতিক ও ছাত্রনেতারা ভেবেছিলেন মেডিকেল কলেজের মতো কারিগরি শিক্ষায়তনের তথা চিকিৎসাবিজ্ঞানের ছাত্ররা তাদের কর্মব্যস্ততার মধ্যে আন্দোলনে কতটাই বা সময় সহায়তা দিতে পারবেন। কিন্তু এই ধারণা যে সর্বতোভাবে ভুল একুশের আন্দোলনে তার প্রমাণ মিলে ছিল... (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১২৯)।

ভাষা আন্দোলনে ঢাকা মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের নেতৃত্বকে ভাষাসৈনিক আবদুল মতিন স্বীকার করেন। ১৯৫২ সালের ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে যে ছাত্রসভা হয়, সেখানে ঢাকা মেডিকেল কলেজের অনেক শিক্ষার্থী অংশগ্রহণ করে। উক্ত সভায় একুশ ফেব্রুয়ারিতে দেশব্যাপী হরতাল, বিক্ষোভ, সভা ও মিছিলের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ তা সমর্থন করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা উপলব্ধি করে যে, পুরনো ঢাকার উর্দুভাষীদের ভাষা আন্দোলনে সম্পৃক্ত করতে না পারলে এ আন্দোলনকে সার্থক ও সফল করা কষ্টকর হবে। তাই ১৯শে ফেব্রুয়ারি কলেজ ইউনিয়নের সহ-সভাপতি গোলাম মাওলার পরামর্শক্রমে সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন কাদের সর্দারের বাসায় গিয়ে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে তাঁর সমর্থন আদায় করেন। পুরনো ঢাকার জনগণ; বিশেষ করে কাদের সর্দার যদি ভাষা আন্দোলনের পক্ষে এ সিদ্ধান্ত না দিতেন, তাহলে তাদের পক্ষে আন্দোলনে যাওয়া খুবই কঠিন ছিল (লিটু, ২০১৮, পৃ. ১৮৯)। সে সময়ের সাধারণ সম্পাদক শরফুদ্দিন আহমেদ তা উল্লেখ করেন। তারা এই সিদ্ধান্তের মাধ্যমে দূরদর্শিতার পরিচয় দেন। কারণ ঢাকার প্রভাবশালী উর্দুভাষী জনগোষ্ঠী যখন বাংলাকে সমর্থন করবে, তখন পূর্ববাংলার জনগণের ওপর মাতৃভাষা বাংলার পরিবর্তে উর্দুকে চাপিয়ে দেওয়ার যে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয়েছে, তা পরিবর্তন করতে শাসকশ্রেণি অনেক বেশি চাপে পড়বে।

বুকের তাজা রক্ত দিয়ে ও বেশকিছু প্রাণের বিনিময়ে মাতৃভাষা বাংলা রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা লাভ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা শুধু সভা ও মিছিলে অংশগ্রহণ করে কর্তব্য শেষ করেননি। তারা মেডিকেল ব্যারাকের শিক্ষার্থীদের একুশে ফেব্রুয়ারির কর্মসূচি বাস্তাবায়ন করতে আহ্বান জানান। তাই একুশে ফেব্রুয়ারিকে সফল করে তুলতে অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের মতো মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের মধ্যেও যথেষ্ট আগ্রহ ছিল। তাই ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য হলের মতো মেডিকেল ব্যারাকেও ব্যস্ততা বেড়ে যায়। শিক্ষার্থীরা পোস্টার লেখা, চাঁদা তোলা, ইশতাহার ছাপার জন্য প্রেসে যাওয়া ইত্যাদি কাজে ব্যস্ত থাকে। মেডিকেল কলেজের যেসব শিক্ষার্থী পোস্টার লেখার কাজে ব্যস্ত ছিলেন তাঁরা হলেন, জিয়া হাসান, নুরুল ইসলাম, বদরুল আলম, ফজলে রাব্বি, জাকির হোসেন, মশাররফুর রহমান প্রমুখ (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩১)।

১৯৫২ সালে ২০শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতা বন্ধ করার জন্য তৎকালীন পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করে সভা ও শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করে। এ ঘোষণার প্রতিক্রিয়ায় অন্যান্য হল ও হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের মতো মেডিকেল ব্যারাকের শিক্ষার্থীরাও নিষেধাজ্ঞার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানায়। এদিন মেডিকেল ব্যারাকের এক ছাত্র-সমাবেশে আবুল হাশেম, আলিম চৌধুরী, মনজুর হোসেন প্রমুখ শিক্ষার্থী বক্তৃতা দেন। ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে ২০শে ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের কাছে খুবই গুরুত্বপূর্ণ। মেডিকেল ব্যারাকের শিক্ষার্থী ডা. সাঈদ হায়দার বলেন, বায়ান্নর ২০শে ফেব্রুয়ারি একটি উত্তেজনাপূর্ণ বিকেল। মেডিকেল ছাত্রাবাসের প্রতিটি ছাত্রকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের অধিকাংশই ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত থেকে শহরে সরকার আরোপিত ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার পক্ষে ছিল (হায়দার, ১৯৯৬, পৃ. ২৭৭)।

১৪৪ ধারা জারির পর সার্বিক পরিস্থিতি ও পরবর্তী কর্মসূচি নিয়ে আলোচনা করার জন্য সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ৯৪, নবাবপুর রোড, আওয়ামী লীগের অফিসে প্রধান নেতা আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত সম্পর্কে কবির উদ্দিন আহমেদ বলেন, এতৎসত্ত্বেও উক্ত সভার অধিকাংশ সদস্যই সরকারি দমন-নীতিকে মেনে নেওয়ার পক্ষে মন্তব্য করেন। অবশেষে ১১-৪ ভোটে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ না করার সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ২৭)। সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের সভায় ১৫ জন উপস্থিত ছিলেন। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের পক্ষে যারা ভোট দিয়েছিলেন গাজীউল হক তাঁদের নাম উল্লেখ করেছেন। তাঁরা হলেন: অলি আহাদ, আবদুল মতিন, ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী গোলাম মওলা। মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। বাকি ১১ জন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের বিপক্ষে ভোট দেন (ইসলাম, ১৯৮৬, পৃ. ২৭)। উক্ত সভায় ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রতিনিধি হিসেবে তৎকালীন ছাত্র ইউনিয়নের সহ-সভাপতি গোলাম মাওলা অংশগ্রহণ করেন। মেডিকেল ব্যারাকের সচেতন শিক্ষার্থীরা ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে অবস্থান নেওয়ার জন্য অনুরোধ জানায়। অন্যদিকে মেডিকেল ব্যারাকের শিক্ষার্থী আহমদ রফিককে সর্বদলীয় পরিষদের ওপর নজর এবং যোগাযোগ রক্ষার দায়িত্ব দেওয়া হয়। ফলে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলে গিয়ে সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়া জানার চেষ্টা করেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধিকাংশ শিক্ষার্থী ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে ছিল (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩২)।

এ রকম অবস্থায় ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি সকাল থেকে পুলিশ বাহিনী ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের আর্টস বিল্ডিং তথা বর্তমান মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের সামনে অবস্থান নিতে থাকে (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৩)। উল্লেখ্য, এ সময় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কলা অনুষদ, লাইব্রেরি, প্রশাসনিক ভবন, শ্রেণিকক্ষ, ঢাকা মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের এক অংশে ছিল, অন্য অংশ ঢাকা মেডিকেল কলেজের অধীনে ছিল; কারণ তখনও ঢাকা মেডিকেল কলেজের নিজস্ব ভবন ছিল না। পরবর্তীকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অংশটি ১০ লক্ষ রুপির বিনিময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের কাছে হস্তান্তর করা হয়। এ কারণেই মেডিকেল কলেজ থাকা সত্ত্বেও এ এলাকাকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় চত্বর বলা হতো। তাছাড়া মেডিকেল কলেজ ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মেডিসিন ফ্যাকাল্টির অধীনে। ১৯৫৫ সালে হাসপাতালের পাশেই মেডিকেল কলেজের নতুন ভবন নির্মাণ করা হয়।

শিক্ষার্থীরা একত্রিত হয়ে কলা ভবনের সামনে হাজির হতে থাকে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা সবাই হাসপাতাল প্রাঙ্গণের পূর্বে আমতলা ও মধুর ক্যান্টিনের সামনে হাজির হয়। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও জগন্নাথ কলেজের অন্য শিক্ষার্থীদের সাথে মিলিত হয়। আমতলার সভার বিবরণ অনেকেরই জানা। সেই বিবরণে না গিয়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের ওই সভায় অংশগ্রহণ ও ভূমিকা সম্পর্কে আলোচনা করা যাক। কলেজের ৪৭ ব্যাচের শিক্ষার্থী মতিয়ার রহমান এ দিনটির অভিজ্ঞতার কথা এভাবে বর্ণনা করেছেন:

> আমতলার মিটিং এ ছিলাম, এখান থেকে ১০ জন করে ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে যেসব শিক্ষার্থী বের হচ্ছিল তার এক ব্যাচে আমিও ছিলাম। ভাগ্যক্রমে পুলিশের বেষ্টনী থেকে ছিটকে বেরিয়ে পড়ে মেডিকেল কলেজের মধ্যে ঢুকে পড়েছিলাম (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৫)।

নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে শিক্ষার্থীরা পুলিশ কর্ডন ভেঙে মেডিকেল ব্যারাকের দিকে এগিয়ে যেতে থাকলে পুলিশ কাঁদানে গ্যাস ছুড়ে লাঠিচার্জ করলে বিশৃঙ্খলা দেখা দেয় এবং পুরো এলাকার চেহারা পাল্টে যেতে থাকে। আমতলা ও মধুর ক্যান্টিনে দু-একজন শিক্ষার্থী থাকলেও মেডিকেল ব্যারাক প্রাঙ্গণ ভরে যায়। এ সময় ব্যারাক প্রাঙ্গণেও স্লোগান চলতে থাকে এবং এসেম্বলি ভবন ঘেরাও করে এমএলএ-দের রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে প্রস্তাব গ্রহণে বাধ্য করতে চেষ্টা করা হয়। এরই মধ্যে পুলিশ ব্যারাকের সামনে অবস্থান নিলে নিরস্ত্র শিক্ষার্থী ও পুলিশের মধ্যে সংঘর্ষ চলে। ২১শে ফেব্রুয়ারির দুপুরের দিকে ব্যারাক প্রাঙ্গণে মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীর সংখ্যা বেশি ছিল। ঘটনার সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত আহমদ রফিক জানান, 'তারাই তৎপর ছিল সবার চেয়ে বেশি' (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৩)। এ সময় মেডিকেল কলেজের বেশকিছু শিক্ষার্থী মানিকগঞ্জের এমএলএ আওলাদ হোসেনসহ কয়েকজন এমএলএ-কে ব্যারাক-প্রাঙ্গণের ছয় নম্বর ছাউনিতে নিয়ে আসেন এবং রাষ্ট্রভাষা বাংলার পক্ষে পরিষদে প্রস্তাব আনার অঙ্গীকার আদায় করেন (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৬)।

এরকম বিশৃঙ্খল অবস্থার মধ্যে ৩:১০ থেকে ৩:৩০ মিনিটের দিকে তৎকালীন অবাঙালি জেলা প্রশাসক এ এইচ কোরেশীর নির্দেশে পুলিশ মেডিকেল কলেজের ব্যারাকের সামনে সমবেত শিক্ষার্থীদের ওপর দু'দফায় ২৭ রাউন্ড গুলিবর্ষণ করে। গুলিতে কয়েকজন শিক্ষার্থী ও সাধারণ মানুষ শহিদ হন। এটাই ছিল পূর্ববাংলার ভাষা আন্দোলনের ইতিহাসে শিক্ষার্থীদের ওপর প্রথম গুলিবর্ষণ। এ সময় মেডিকেল ব্যারাককে কেন্দ্র করে ভাষার লড়াই ছিল যেমন সাহসী, তেমনি স্বতঃস্ফূর্ত। মেডিকেল ব্যারাক পরিণত হয় ভাষা আন্দোলনের কেন্দ্রস্থলে। গুলিবর্ষণে শহিদ হবার পরিপ্রেক্ষিতে ছাত্র-আন্দোলন গণআন্দোলনে পরিণত হয়। আন্দোলনে শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণ যুক্ত হতে থাকে। তাদের সংখ্যাই ছিল বেশি। ভাষা আন্দোলনের ফলে গণ-আন্দোলনের যে প্রবলতা সূচিত হয়েছিল, তা সরকারের প্রশাসনিক ভিত দুর্বল করে দেয়। মেডিকেল ব্যারাক প্রাঙ্গণের এই কর্মতৎপরতায় মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থীদের প্রাধান্য ছিল। এ সময় পুলিশের গুলিতে ব্যারাক প্রাঙ্গণে শহিদদের মধ্যে ছিলেন মাথায় গুলিবিদ্ধ রফিকউদ্দিন, উরুতে গুলিবিদ্ধ আবুল বরকত, তলপেটে গুলিবিদ্ধ আবদুল জব্বার। শহিদ রফিক উদ্দিনের মাথায় গুলিবিদ্ধ হওয়ার ঘটনা ঢাকা মেডিকেল কলেজের তৎকালীন তৃতীয় বর্ষের শিক্ষার্থী ও ১৮ নম্বর ছাউনির ১০ নম্বর কক্ষের বাসিন্দা হুমায়ূন কবির স্বচক্ষে দেখেন এবং তাঁকে হাসপাতালের ইমার্জেন্সিতে নিয়ে যান (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৮)। একই ঘটনা মেডিকেল কলেজের তৃতীয় বর্ষের আরেক শিক্ষার্থী মোশাররুফ প্রত্যক্ষ করেন এবং শহিদ রফিক উদ্দিনের মাথার মগজটি তিনি দুই হাতে তুলে নেন (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৩৮)।

গুলিবর্ষণের ঘটনা বিভিন্ন সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। *Morning News* ব্যতিত সবকয়টি দৈনিক ও সাপ্তাহিক পত্রিকা ঘটনার বিবরণ সঠিকভাবে প্রকাশ করে। *Morning News* পত্রিকা সম্প্রদায়িকতামূলক সংবাদ 'Dhutees Roaming Dhaka Street' শিরোনামে প্রকাশ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী আহমেদ রফিক নিজের গবেষণায় এ বিষয়ে আলোকপাত করেন। তাঁর মতে, এ পত্রিকা বরাবরই মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, সাম্প্রাদায়িক মানসিকতার সংবাদ প্রচার করে (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৫৩)। অন্যদিকে মওলানা আকরাম খাঁর মালিকানাধীন মুসলিম লীগের মুখপত্র হিসেবে পরিচিত *দৈনিক আজাদ* তার রক্ষণশীলতা থেকে বেরিয়ে এসে 'তদন্ত চাই' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে (*দৈনিক আজাদ*, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)। *সাপ্তাহিক সৈনিক* 'শহীদের তাজা রক্তে ঢাকার রাজপথ রনজিত' এবং 'মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র সমাবেশে গুলিবর্ষণ' শিরোনামে আবেগঘন সংবাদ প্রচার করে (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৫৩)।

মেডিকেল ব্যারাকের শিক্ষার্থীরা আহত ও নিহতদের নিয়ে ব্যস্ত হয়ে পড়েন। আহতদের চিকিৎসাসেবা দেওয়া এবং শহিদদের লাশ মর্গে নিয়ে যাওয়ার দায়িত্ব পালন করেন কলেজের শিক্ষক, চিকিৎসক, নার্স, এমনকি ওয়ার্ডবয়সহ সকল কর্মকর্তা-কর্মচারী। মেডিকেল কলেজের কোনো শিক্ষার্থী শহিদ না হলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজ ও ব্যারাক প্রাঙ্গণ আন্দোলনের প্রাণকেন্দ্রে পরিণত হয়। আন্দোলনের নেতৃত্বও তাদের ওপর এসে পড়ে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের ছাত্র ইউনিয়নের নেতৃত্বে শিক্ষার্থীরা আন্দোলনের পরবর্তী কর্মসূচি দেওয়া, প্রচারকার্য পরিচালনা, পরস্পর যোগাযোগ পুনঃপ্রতিষ্ঠাসহ আন্দোলনের সার্বিক সমন্বয় সাধনের কাজটি সম্পন্ন করে। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক ও ১৯৫০-৫২ সালের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির আহ্বায়ক আব্দুল মতিন বলেন:

> ভাষা আন্দোলনের গুলিবর্ষণের পর ঢাকা শহর ও সমগ্র দেশের শিক্ষার্থীদের ও তাদের সমর্থক জনগণের মধ্যে পরিব্যাপ্ত হয়ে গেলেও সে সময় আন্দোলন কেন্দ্রীভূত হয়ে গিয়েছিল ঢাকা মেডিকেল কলেজ তথা কলেজের বাঁশের ব্যারাকের ছাত্রাবাসে। তা যদি না হতো তাহলে ভাষা আন্দোলন এত সুশৃঙ্খল অবস্থার মধ্য দিয়ে পরিসমাপ্ত না হতে পারতো। গুলি চালনার পরপরই মেডিকেল হোস্টেলের আমগাছগুলিতে বাঁধা মাইকের হর্ন থেকে প্রচারই জানিয়ে দিয়েছিল শিক্ষার্থীদের ওপর নির্মম, বর্বর ও আকস্মিক গুলিবর্ষণের খবর। তাদের দেখাদেখি পরে ফজলুল হক হল, সলিমুল্লাহ্ হল এবং আরো কিছু জায়গায় মাইক বেঁধে প্রচারের পদ্ধতি চালু হয়েছিল (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১০)।

মেডিকেল কলেজের মাইকের মাধ্যমে গুলিবর্ষণের খবর প্রচারিত হলে তা দ্রুত ঢাকা শহরবাসী জনগণের কানে পৌঁছায়। কলকাতার *সাপ্তাহিক মতামত* ভাষা আন্দোলনের ঘটনাবলি নিয়ে প্রতিবেদন প্রকাশ করে। এ পত্রিকার সংক্ষিপ্ত প্রতিবেদনে রয়েছে রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যদের প্রতিবাদ এবং মেডিকেল হোস্টেলের মাইকে প্রচারণার কথা (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৫৪)। ফলে ছাত্রাবাস ও ইমার্জেন্সিতে সাধারণ মানুষের ঢল নামে। সাধারণ মানুষের এই উপস্থিতি দেখে কয়েকজন শিক্ষার্থী ভাষাসৈনিক আবদুল মতিনকে ২২শে ফেব্রুয়ারি জানাজা প্রদানের কর্মসূচি দিতে আহ্বান জানান। ফলে ভাষা আন্দোলন মেডিকেল কলেজ প্রাঙ্গণ থেকে ছাত্রাবাস, নীলক্ষেত, পলাশী ব্যারাক, পার্শ্ববর্তী নারায়ণগঞ্জ তথা সমগ্র পূর্ব পাকিস্তানে ছড়িয়ে পড়ে (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৫৪)।

গুলিবর্ষণের পর আন্দোলনের কৌশল নির্ধারণের জন্য ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতে মেডিকেল কলেজ ব্যারাকে (হোস্টেল) সহ-সভাপতি গোলাম মাওলাকে আহ্বায়ক করে একটি নতুন সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারির সর্বদলীয় সভার সিদ্ধান্ত ছিল শিক্ষার্থীদের মতামতের পরিপ্রেক্ষিতে ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেওয়া হলে সর্বদলীয় পরিষদ বিলুপ্ত হবে। সেজন্যই নতুন আহ্বায়ক মনোনয়ন করা হয়। কিন্তু নতুন আহ্বায়ক (গোলাম মাওলা) মনোনীত হওয়া সত্ত্বেও নতুন সদস্য নিয়ে নতুন পরিষদ গঠন করা হয়নি। তাই পুরনো সদস্যদের অনেকে আন্দোলনের দ্বিতীয় দিন থেকে যাওয়া-আসা শুরু করে। এ রকম একটি গুরুত্বপূর্ণ সময়ে কেন্দ্রীয় নেতৃত্ব অনুপস্থিত থাকায় স্বাভাবিকভাবেই আন্দোলনের দায়িত্ব গ্রহণ করেন ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা (রফিক, ২০১৭, পৃ. ১৪৫-১৪৬)।

পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা আন্দোলনের সব কৌশল পাল্টে দেয়। কারণ এ পর্যন্ত যা কিছু ঘটেছে তা সকল শিক্ষার্থীর মাতৃভাষার টানে, অন্তত মেডিকেল হোস্টেলের প্রাঙ্গণের ঘটনাবলিতে, হোস্টেল প্রাঙ্গণে ও হাসপাতালে নেতাদের বিশেষ কোনো ভূমিকা ছিল না। আবুল হাশিমের সিদ্ধান্ত অনুযায়ী 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা

সংগ্রাম পরিষদ' তখন প্রায় বিলুপ্ত। গুলিবর্ষণের ঘটনায় সর্বসাধারণের ব্যাপক প্রতিরোধ-আন্দোলন নিয়ন্ত্রণে রাখতে দৃঢ় সাংগঠনিক কাঠামো প্রয়োজন, যাতে আন্দোলন বিশৃঙ্খলভাবে শেষ না হয়। তাই মেডিকেল হোস্টেলে ২১শে ফেব্রুয়ারি রাতে ছাত্র-যুব নেতাদের মধ্যে জরুরি বৈঠক হয়। সর্বসম্মতিক্রমে মেডিকেল কলেজ ছাত্র-সংসদের ভি পি গোলাম মাওলাকে সর্বদলীয় পরিষদের অস্থায়ী আহ্বায়ক মনোনীত করে পরদিনের কর্মসূচি নির্ধারণ করা হয়। পরদিন (২২শে ফেব্রুয়ারি) সকালে হোস্টেল প্রাঙ্গণে শহিদদের জানাজা অনুষ্ঠানের পর তাঁদের লাশ নিয়ে ঢাকা শহরের রাজপথে মিছিল, শোক দিবস পালন, বাড়িতে বাড়িতে কালো পতাকা উত্তোলন, শোকচিহ্ন হিসেবে প্রত্যেকের বুকে কালো ব্যাজ কিংবা বাহুতে কালো ফিতা ধারণ, দেশব্যাপী হরতাল আহ্বান, ইশতেহার ছাপা ও বিতরণ– ইত্যাদি ছিল সেদিনের কর্মসূচি (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৫৪)।

সংগ্রাম পরিষদ গঠনের পর আন্দোলনে গতিসঞ্চার হয়। মেডিকেল কলেজের সকলপন্থি শিক্ষার্থী একতাবদ্ধ হয়ে সম্মিলিতভাবে একুশের আন্দোলনকে সার্থক করে তোলে, কেননা শহিদদের মৃতদেহ, কবর ও পরিচয় এ কলেজের শিক্ষার্থীদের দ্বারা উদ্ধার করা সম্ভব হয়। দু'জন মেডিকেল কলেজ শিক্ষার্থী ভাষা-শহিদদের মৃতদেহ শনাক্ত করার কাজে নিয়োজিত ছিলেন। তাঁরা হলেন বামপন্থি ছাত্রনেতা খোন্দকার আলমগীর এবং আমীর আহসান। শহিদদের মৃতদেহ লুকিয়ে রাখা সত্ত্বেও সামরিক বাহিনীর লোকজন হাসপাতাল ঘেরাও করে লাশগুলো নিয়ে যায়। সকালে কারফিউ'র সময় পার হওয়ার সাথে সাথে উল্লিখিত দুই শিক্ষার্থী আজিমপুর কবরস্থানে চলে যান। শহিদদের রক্তমাখা কাপড় ও ব্যান্ডেজ ইত্যাদি কবরস্থানের একটি ঘর থেকে উদ্ধার করেন এবং কবরগুলো চিহ্নিতকরণ করেন। এ খবর সলিমুল্লাহ হলের মাইকে ঘোষণা করা হলে রক্তমাখা ব্যান্ডেজ ও কাপড়ের টুকরো নিয়ে এক শোভাযাত্রা হয়। শোভাযাত্রায় শিক্ষার্থীদের পাশাপাশি সাধারণ জনগণসহ বহু সরকারি কর্মচারী অংশগ্রহণ করে। ঢাকা মেডিকেল কলেজের বেশিরভাগ শিক্ষার্থী এ মিছিলে যোগ দেয়। এদের মধ্যে যেমন ছিল রাজনীতি-সচেতন শিক্ষার্থী, তেমনি ছিল রাজনীতিতে অনাগ্রহী পড়াশোনায় একনিষ্ঠ শিক্ষার্থী ও সাধারণ শিক্ষার্থী (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১৫০)। এ প্রসঙ্গে ভাষাসৈনিক এম আর আখতার মুকুল লিখেছেন:

> মেডিকেল কলেজের দু'জন ছাত্র দুঃসাহসিক কাজ করে বসলো। কারফিউর মধ্যে এরা সৈন্যদল চলে যাবার পর এই দুই জন ছাত্র শহিদদের কবরগুলো চিহ্নিত করে এলো। এই জন্যই পরবর্তীকালে ছাত্রসমাজ প্রতিবছর একুশে ফেব্রুয়ারি আজিমপুর গোরস্থানে এই কবরগুলো জিয়ারত ও শ্রদ্ধাঞ্জলি জানাতে সক্ষম হচ্ছেন (মুকুল, ১৯৮৭, পৃ. ৩১)।

এ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজে একটি ব্লাড-ব্যাংক প্রতিষ্ঠার মধ্য দিয়ে এক ঐতিহাসিক পদক্ষেপ নেওয়া হয়। ভাষা আন্দোলনে যারা আহত হয়েছিল, তাদের চিকিৎসা ও অস্ত্রোপচারের জন্য প্রচুর রক্তের প্রয়োজন ছিল কিন্তু হাসপাতালের কোথাও রক্ত ছিল না। রক্তের প্রয়োজন মেটাতে রক্ত সংগ্রহের জন্য ২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী-শিক্ষকদের উদ্যোগ ও ব্যবস্থাপনায় রক্ত সংগ্রহ অভিযান ও ব্লাড-ব্যাংক স্থাপন করা হয়। এর মধ্য দিয়েই প্রথম ব্লাড-ব্যাংক স্থাপনের চিন্তাভাবনার সূত্রপাত হয় এবং বিনামূল্যে রক্ত প্রদানের ব্যবস্থা চালু হয় (লিটু, ২০১৮, পৃ. ৯৪)। বিভিন্ন পত্রপত্রিকায় রক্তদানের জন্য বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়। *সাপ্তাহিক সৈনিক* জানায়, ''আজকের হত্যাকাণ্ডে আহত বন্ধুরা রক্তের অভাবে মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে মরতে বসেছে। আপনি দয়া করে ব্লাড-ব্যাংকে রক্ত দান করে বাঁচান'' (লিটু, ২০১৮, পৃ. ৯৪)।

ভাষাশহিদদের স্মৃতিকে অমর করে রাখার জন্য শহিদ মিনার নির্মাণের কথা চিন্তা করা হয়। মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে পুলিশের গুলিবর্ষণ এবং 'শহিদ স্মৃতি অমর হোক'– এ স্লোগানের পরিপ্রেক্ষিতে তৈরি হয় ঢাকায় প্রথম শহিদ মিনার এবং মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা এর নাম দেয় 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ'। এর পরিকল্পনা ও নির্মাণ মেডিকেল হোস্টেলের শিক্ষার্থীদের যৌথ চিন্তা ও ঐক্যবদ্ধ শ্রমের ফসল। ২৩শে ফেব্রুয়ারি সকালে মেডিকেল হোস্টেলে কিছুসংখ্যক শিক্ষার্থী এই পরিকল্পনা করে এবং রাতে বাস্তবায়নের ব্যবস্থা করে। এ স্মৃতিস্তম্ভের নকশা আঁকেন মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থী বদরুল আলম। 'শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ' ফলকটিও তাঁরই হাতে লেখা (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৬৭)।

পরিশেষে বলা যায়, ভাষা আন্দোলনের সূচনালগ্ন থেকে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেল পর্যন্ত অন্যান্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের মতো ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদানও উল্লেখ করার মতো। মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীগণ তাঁদের তাত্ত্বিক ও ব্যবহারিক পড়াশোনার পাশাপাশি দেশ, জাতি ও মাতৃভাষার প্রতি গভীর শ্রদ্ধাবোধ ও ভালোবাসা থেকে ভাষা আন্দোলনে যোগদান করেন। ১৯৪৭ সালে ভাষা আন্দোলনের সাংগঠনিক কার্যক্রম শুরুর সময় থেকে এ কলেজের শিক্ষার্থীরা আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ভাষা আন্দোলন পরিচালনার জন্য আবুল কাশেমের নেতৃত্বে 'তমদ্দুন মজলিস' নামে যে সাংস্কৃতিক সংগঠন প্রতিষ্ঠিত হয়, তার সাথে এ কলেজের শিক্ষার্থীদের সম্পৃক্ততা ছিল। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিকে সফল করতে ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের অবদান ছিল উল্লেখ করার মতো। তৎকালীন পাকিস্তান সরকার শিক্ষার্থীদের কর্মতৎপরতা বন্ধের জন্য ১৪৪ ধারা জারি করলে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের অধিকাংশ সদস্য মেনে নেওয়ার পক্ষে সিদ্ধান্ত দিলেও ঢাকা মেডিকেল কলেজের সচেতন শিক্ষার্থীসহ অন্যরা তা মেনে নেয়নি। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও এই মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীরা নিষেধাজ্ঞা অমান্য করে ১৪৪ ধারা ভাঙার জন্য এগিয়ে গেলে পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এরপরেই আন্দোলনের কৌশল পাল্টে যায়। বিশেষ করে ২১শে ফেব্রুয়ারি গুলিবর্ষণের পরবর্তী সময়ে আন্দোলনের নেতৃত্ব গ্রহণ করে মেডিকেল শিক্ষার্থীরা এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি রাত থেকে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণের কৃতিত্বের প্রধান দাবিদারও তারা। তাদের এ অবদানের কথা তেমন প্রচার বা স্বীকৃতি না পেলেও ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন ঢাকা মেডিকেল কলেজের শিক্ষার্থীদের কৃতিত্বের কথা স্বীকার করে বলেন:

> ভাষা আন্দোলনের অমূল্য কীর্তি শহিদ মিনারের প্রথম স্মৃতিস্তম্ভ মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের অবদান। ভাষা আন্দোলনের শহীদ এবং আন্দোলনের হাজারো সহকারীদের স্মৃতি অম্লান রাখার জন্য বর্তমান শহীদ মিনারের কাছে ২৩ ফেব্রুয়ারি মেডিকেল কলেজ ছাত্ররা এক রাত্রের মধ্যে স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ করে যে কাজটি সম্পন্ন করেছিল তা আজও বাঙালি জাতির কাছে অমর হয়ে আছে। আজ বাংলাদেশের সকল ছাত্র প্রতিষ্ঠানে ভাষা শহীদদের স্মরণে ছাত্ররা ঐ একই প্রকার স্মৃতিস্তম্ভ তৈরি করে রেখেছে (রফিক, ২০০৩, পৃ. ১০-১১)।

তথ্যসূত্র

আলী, মো: শওকত (২০১৩)। *২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস*। ঢাকা: আহমদ পাবলিশিং হাউজ।

আলী, সৈয়দ মুজতবা (২০০২)। *পূর্বপাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা*। ঢাকা: একুশে পাবলিকেশন্স লিমিটেড।

ইসলাম, রফিকুল (১৯৮৬)। *শহিদ মিনার*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন (২০১৭)। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ঢাকা: বাতিঘর।

খান, এম. সাইদুর রহমান (২০১৬)। *অমর একুশের বিশ্বায়ন যেভাবে হলো*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশনা।

মতিন, আবদুল (১৯৮৬)। *ভাষা ও একুশের আন্দোলন*। ঢাকা: নন্দন প্রকাশনা।

মতিন, আবদুল (২০১৩)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: মুক্তচিন্তা প্রকাশনা।

মাহমুদ, হায়াৎ (১৯৮৯)। *অমর একুশে*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মাহমুদ, হায়াৎ (২০১৬)। *বাংলা ভাষা এবং ভাষা আন্দোলনে প্রথম শহীদ: আব্বাস উদ্দিন আহমেদ ভূমিকা*। ঢাকা: দি ইউনিভার্সেল একাডেমী।

মুকুল, এম. আর আখতার (১৯৮৭)। *বায়ান্নোর জবানবন্দী*। ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স।

রফিক, আহমদ (২০০৩)। *স্মৃতিবিস্মৃতির ঢাকা মেডিকেল কলেজ ১৯৪৭-১৯৭১*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

রফিক, আহমদ (২০১৭)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা: অনিন্দ প্রকাশ।

রশীদ, রফিকুর (২০১৪)। *আমাদের ভাষা আন্দোলন: কিশোর ইতিহাস*। ঢাকা: ইত্যাদি গ্রন্থ প্রকাশ।

লিটু, মনিলাল আইচ ও মাহবুব, এম. আর. (২০১৮)। *ঢাকা মেডিকেল কলেজ: সেবা সংগ্রাম ঐতিহ্য*। ঢাকা: গৌরব প্রকাশন।

সবুজ, শাহ কামাল (২০১৬)। *ভাষা শহীদ এবং আমাদের দায়*। ঢাকা: জনতা প্রকাশ।

হায়দার, সাঈদ (১৯৯৬)। *পিছু ফিরে দেখা*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

হাসান, খন্দকার মাহমুদুল (২০০২)। *ভাষা ও বর্ণমালার ইতিহাস*। ঢাকা: ঐতিহ্য।

পত্রিকা

দৈনিক আজাদ, ১৩ই ডিসেম্বর, ১৯৪৭।

দৈনিক আজাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২।

দৈনিক আজাদ, ১৭ই এপ্রিল ১৯৬৯।

সাক্ষাৎকার

রফিক, আহমদ (২০২২)। (ঢাকা মেডিকেল কলেজের প্রাক্তন ছাত্র) সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: চাঁদ সুলতানা কাওছার।

ফাইল

ALUMNI DIRECTORY DHAKA MEDICAL COLLEGE, Dhaka Medical College Alumni Trust.

ভাষা আন্দোলন ও বাংলাদেশের চারুশিল্পী সমাজ

শাওন আকন্দ

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookShawon

বাংলাদেশের ইতিহাসে এবং পৃথিবীর ইতিহাসেও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে পূর্ব-বাংলায় যে আন্দোলন গড়ে উঠেছিল, এ অঞ্চলের মানুষের সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক জীবনে তার প্রভাব পড়েছিল উল্লেখযোগ্য মাত্রায়। দীর্ঘ আন্দোলন-সংগ্রাম এবং নয় মাস সশস্ত্র যুদ্ধের পর ১৯৭১ সালে পৃথিবীর মানচিত্রে স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের অভ্যুদয় ঘটেছে। স্বাধীনতা আন্দোলনের সূচনাবিন্দু হিসেবে ভাষা আন্দোলনকে বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ মনে করা হয়। মূলত ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে এবং বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির উপর ভিত্তি করে বাঙালি জাতীয়তাবাদ বিকশিত হয়েছিল, যার চূড়ান্ত পরিণতি আমরা দেখতে পাই ১৯৭১ সালে। এ লেখায় আমরা মূলত ভাষা আন্দোলনে এদেশের চারুশিল্পী-সমাজ কীভাবে কতটুকু যুক্ত হয়েছিল এবং কী ধরনের ভূমিকা পালন করেছিল, তা খতিয়ে দেখার চেষ্টা করব। একইসঙ্গে ভাষা আন্দোলনের পর বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে এদেশের চারুশিল্পীরা কীভাবে সম্পৃক্ত ছিল এবং একুশের চেতনায় বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনকে কীভাবে উজ্জীবিত করেছিল, তা জানার ও বোঝার চেষ্টা করা হবে এ লেখায়। তবে মূল আলোচনায় প্রবেশের আগে দেশভাগ ও ঢাকায় চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের সূত্রপাত নিয়ে আমাদের কিছু আলোচনা করা দরকার।

দেশভাগ ও ঢাকায় চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান

ভারতীয় উপমহাদেশে প্রায় দুইশ বছরের (১৭৫৭-১৯৪৭) ব্রিটিশ ঔপনিবেশিক শাসনের অবসান ঘটে ১৯৪৭ সালে। এ উপমহাদেশকে দুইভাগে বিভক্ত করে ব্রিটিশরা এ দেশ থেকে বিদায় নেয় এবং জন্ম হয় ভারত ও পাকিস্তান নামে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্রের। পাকিস্তানের ছিল আবার দুটি অংশ: পূর্ব-পাকিস্তান ও পশ্চিম-পাকিস্তান। উল্লেখ করা যেতে পারে, এই দেশভাগ হয়েছিল দ্বিজাতিতত্ত্বের উপর দাঁড়িয়ে, ধর্মীয় জাতীয়তার ভিত্তিতে; এবং সমগ্র ভারতবর্ষে উল্লেখযোগ্য মাত্রায় এর প্রভাব পড়েছিল।

ধর্মীয় ভিত্তিতে দেশভাগের কারণে বাঙালি অধ্যুষিত বাংলা অঞ্চল দুইভাগে বিভক্ত হয়ে যায়। যেহেতু তৎকালীন পূর্ব-বাংলা ছিল পাকিস্তানের অন্তর্গত, আর ঘোষিতভাবে পাকিস্তান ছিল মুসলমানের জন্য নির্মিত রাষ্ট্র, ফলে সেসময় পূর্ব-বাংলা থেকে হিন্দু জনগোষ্ঠীর একটা বড়ো অংশ দেশত্যাগ করে ভারতে চলে গিয়েছিল। পাশাপাশি, মুসলমান সম্প্রদায়ের একটা উল্লেখযোগ্য অংশ (বাঙালি ও অবাঙালি), যারা ভারতের বিভিন্ন প্রদেশে বাস করতো, তারা পূর্ব-বাংলা বা পূর্ব-পাকিস্তানে চলে এসেছিল। দেশান্তরি এসব বাঙালি মুসলমানের ভেতর যেমন পশ্চিম-বাংলার মানুষ ছিল, তেমনি ছিল পূর্ব-বাংলার মানুষও– যারা বিভিন্ন কারণে ভারতবর্ষের নানা প্রদেশে বাস করতো। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পরের বছর (১৯৪৮) আমরা ঢাকায় প্রথম চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান তৈরি হতে দেখি এবং সেখানে এ উভয় শ্রেণির বাঙালিদেরই আমরা সক্রিয় হতে দেখি। তবে এসবের নেতৃত্বে ছিলেন পূর্ব-বাংলার জয়নুল আবেদিন (১৯১৪-১৯৭৬)। জয়নুল আবেদিন ততদিনে দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা এঁকে খ্যাতি লাভ করেছেন। তিনি ছাড়া আরো যারা ঢাকায় চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ার

আন্দোলনে তাঁর সতীর্থ হয়েছিলেন, তারা হলেন আনোয়ারুল হক (১৯১৮-১৯৮০), সফিউদ্দিন আহমেদ (১৯২২-২০১২), কামরুল হাসান (১৯২১-১৯৮৮) প্রমুখ।

বলে রাখা ভালো, দেশভাগের আগে, পূর্ব-বাংলায় একমাত্র চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি ছিল খুলনায়– 'মহেশ্বরপাশা স্কুল অব আর্ট'। শিল্পী শশীভূষণ পালের নেতৃত্বে এটি প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল ১৯০৪ সালে (বর্তমানে এটি চারুকলা অনুষদ হিসেবে খুলনা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে যুক্ত)। তবে দেশভাগের আগে ঢাকায় চারুচর্চার কোনো প্রাতিষ্ঠানিক অবকাঠামো ছিল না।

যাইহোক, কলকাতা সরকারি আর্ট স্কুলে শিক্ষাপ্রাপ্ত বাঙালি মুসলমান শিল্পীরা, যারা দেশভাগের পর পূর্ব-বাংলায় চলে এসেছিলেন, তারা ঢাকায় একটা আর্ট স্কুল গড়ে তোলার পরিকল্পনা করেন। এদেরই নেতৃত্ব দেন জয়নুল আবেদিন। শিল্পীরা ছাড়াও তৎকালীন কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবীদের একটা অংশ এবং প্রশাসনের একটা অংশ এ আন্দোলনে সহায়ক শক্তি হিসেবে কাজ করেছিল। তারপরও, ঢাকায় চারুচর্চার অনুকূল অবকাঠামো ও পরিবেশ গড়ে তোলার জন্য জয়নুল আবেদিন ও তার সহযোদ্ধাদের অনেক কাঠখড় পোড়াতে হয়েছিল। উদাহরণ হিসেবে ১৯৪৮ সালের পোস্টার প্রদর্শনীর কথা উল্লেখ করা যায়। এই পোস্টার প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল ঢাকায় পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষ্যে। পোস্টারগুলোর বিষয়বস্তু ছিল ভারত উপমহাদেশে মুসলিম বিজয় থেকে শুরু করে পাকিস্তান সৃষ্টি পর্যন্ত ইতিহাসের সংক্ষিপ্ত ধারাবিবরণী। আমাদের দেশের দুই দিকপাল শিল্পী জয়নুল আবেদিন ও কামরুল হাসান পোস্টারগুলো আঁকার ক্ষেত্রে প্রধান ভূমিকা পালন করেছিলেন (ইসলাম, ২০০৩, পৃ. ৩১; আজিজুল, ২০০৪, পৃ. ১৮; হক, ১৯৯৮, পৃ. ৬০ ও ২৪৩; হক, ২০১৫, পৃ. ১৬৯)। উল্লেখ্য, এ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল মূলত তৎকালীন পাকিস্তানের আমলা ও উচ্চপদস্থ কর্মকর্তাদের উদ্দেশ্য করে, যারা ক্ষমতাকাঠামোর সঙ্গে সরাসরি যুক্ত ছিলেন। এ পোস্টার-প্রদর্শনীর বদৌলতে যখন পশ্চিম-পাকিস্তানের উচ্চতম মহলকে (ক্ষমতাকাঠামোর) এটা বোঝাতে শিল্পীরা সক্ষম হয়েছিলেন যে, ছবি আঁকার একটা ব্যবহারিক দিক আছে এবং যা কি না প্রয়োজনে নিজেদের স্বার্থে ব্যবহার করা যায়, তখন ছবি আঁকার স্কুল তৈরি অনেক সহজ হয়ে গেল। প্রতিষ্ঠিত হলো গভর্মেন্ট ইনস্টিটিউট অব আর্ট (১৯৪৮), যা এখন 'চারুকলা অনুষদ' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যায়ের সঙ্গে যুক্ত। সে-সময় থেকে এখনো, এ দেশের যাবতীয় চারুকলা বিষয়ক কর্মকাণ্ডের প্রধান কেন্দ্র হিসেবে এ প্রতিষ্ঠানটি গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে চলেছে। যার জন্মের সঙ্গে জড়িয়ে আছে ক্ষমতা-কাঠামোকে খুশি/তুষ্ট করার জন্য ইসলাম ধর্ম এবং রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তানকে গৌরবোজ্জ্বল ও মহিমান্বিত করে আঁকা শতাধিক পোস্টারের একটি প্রদর্শনী।

কিন্তু বিস্ময়কর হলেও সত্যি, গোড়া থেকেই এই প্রতিষ্ঠানের কার্যক্রমে– বিশেষ করে চর্চায় ও অনুশীলনে ধর্মীয় বিষয়কে কখনোই প্রাধান্য দেওয়া হয়নি। নেতিবাচক বা সংকীর্ণ অর্থে যেটাকে ধর্মীয় 'সাম্প্রদায়িকতা' বলা হয়– তা এ প্রতিষ্ঠানে কখনো প্রশ্রয় পায়নি। বরং প্রতিষ্ঠানটির আদিপর্বের শিক্ষকদের অনেকে যেমন জয়নুল আবেদিন, কামরুল হাসান প্রমুখ বাঙালি সংস্কৃতির বিভিন্ন দেশজ উপাদানের বিষয়ে আকৃষ্ট হয়েছিলেন। শুধু তাই নয়, সরকারি শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান হওয়া সত্ত্বেও, সরকারবিরোধী বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে এই শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের ছাত্র ও শিক্ষকেরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। এর কারণ কী? সেটা বুঝতে হলে আমাদের আরেকটু পেছনে তাকাতে হবে।

আন্দোলন-সংগ্রামে চারুশিল্পী সমাজঃ প্রেক্ষাপট ও পরম্পরা

১৯৪৭-এর দেশভাগের আগেই অবিভক্ত বাংলায় বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন-সংগ্রামে এ অঞ্চলের চারুশিল্পীদের অংশ নিতে দেখা যায়। উদাহরণ হিসেবে প্রাসঙ্গিকভাবে গুরুসদয় দত্তের ব্রতচারী আন্দোলনের (১৯৩২) কথা বলা যায়। এ সাংস্কৃতিক আন্দোলনে পটুয়া কামরুল হাসানসহ তৎকালীন বিভিন্ন শিল্পী যুক্ত ছিলেন। ব্রিটিশ আমলে 'খাকসার' আন্দোলনের (১৯৩১) সাথে যুক্ত ছিলেন শিল্পী এস এম সুলতান। ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির সাথে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন অনেক শিল্পী। এর মধ্যে চিত্তপ্রসাদ (১৯১৫-১৯৭৮) ও সোমনাথ হোড়ের (১৯২১-২০০৬) নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। অবিভক্ত বাংলার এ দুই শিল্পীই– যারা পার্টির জন্য 'হোলটাইমার' হিসেবে কাজ করতেন– ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষ নিয়ে ছবি এঁকেছেন নিজস্ব শৈলীতে। এছাড়া, কালের সাক্ষী হয়ে আছে সোমনাথ হোড়ের 'তেভাগা আন্দোলন' নিয়ে আঁকা স্কেচ আর ছাপচিত্রগুলো।

এমনকি দেশভাগের আগে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডের সাথে সম্পৃক্ততার বিষয়েও জানা যায়। তিনি কমিউনিস্ট পার্টির সাথে সরাসরি যুক্ত না হলেও ১৯৪৩ সালে তার আঁকা বিখ্যাত দুর্ভিক্ষের চিত্রমালা প্রদর্শিত হয়েছিল কলকাতায় ভারতীয় কমিউনিস্ট পার্টির আয়োজনে। এ প্রদর্শনীতে আরো অনেক শিল্পী অংশ নিয়েছিল (হক, ২০১৫, পৃ. ৩৩)। জয়নুলের দুর্ভিক্ষের স্কেচ সে-সময় বিভিন্ন পত্রপত্রিকা– বিশেষ করে কমিউনিস্ট পার্টি পরিচালিত *জনযুদ্ধ* ও *দ্য পিপলস ওয়ার*– ছেপে প্রচার করার ব্যাপারে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এছাড়াও *দ্য স্টেটসম্যান* পত্রিকাতেও জয়নুলের স্কেচ ছাপা হয়েছিল (হক, ২০১৫, পৃ. ৩৪)। ফ্যাসিবাদ-বিরোধী লেখক ও শিল্পী সংঘের সাথেও জয়নুল এবং কামরুল হাসান যুক্ত ছিলেন। এ সংঘকে সক্রিয় রাখার ব্যাপারে ভারতের কমিউনিস্ট পার্টির গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা ছিল। এছাড়া ইন্ডিয়ান পিপলস থিয়েটার এসোসিয়েশন (আইপিটিএ) বা গণনাট্য সংঘের সাথেও জয়নুল-কামরুলের ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের কথা জানা যায়। এভাবে দেখা যাচ্ছে, সরাসরি রাজনীতির সাথে যুক্ত না হলেও বাংলাদেশের পথিকৃৎ শিল্পীরা, যারা দেশভাগের পর ঢাকায় একটি শিল্প-শিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে তুলেছিলেন, তাঁরা কলকাতায় থাকাকালীন বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সাথে যুক্ত ছিলেন।

পাশাপাশি, আমরা লক্ষ করি, ঢাকার এ চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানে আদিপর্বের শিক্ষার্থীদের অনেকে বাম রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে যুক্ত ছিলেন। যেমন মুর্তজা বশীর (১৯৩২-২০২০), আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১১), দেবদাস চক্রবর্তী (১৯৩৩-২০০৮), বিজন চৌধুরী (১৯৩১-২০১২) প্রমুখ। মুর্তজা বশীরের নিজের ভাষ্য থেকে আরো জানা যায়, তিনি আদতে ছবি আঁকার ব্যাপারে তেমন একটা উৎসাহী ছিলেন না। পার্টির নির্দেশে তিনি ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে ভর্তি হয়েছিলেন। তিনি লিখেছেন, 'আর্ট পড়াটা হয়েছিল ঘটনাচক্রে। স্কুলে ছাত্রাবস্থাতে রাজনীতির সঙ্গে সম্পর্ক ছিল। পোস্টার লিখতাম, আবার পার্টি অফিসের জন্য আঁকতাম মার্কস, লেনিন কিংবা স্টালিনের প্রতিকৃতি। তাই, সেই রাজনৈতিক সংগঠনের একজন কর্মী হিসেবে আমার প্রতি নির্দেশ হলো আর্ট কলেজে ঢুকে পড়ার, ছাত্রদের মধ্যে কাজ করার' (বশীর, ২০০১, পৃ. ১১৯)। দেবদাস চক্রবর্তী ও বিজন চৌধুরী কলকাতা সরকারি আর্ট কলেজের ছাত্র ছিলেন। কিন্তু রাজনৈতিক কর্মকাণ্ডের জন্য সেখান থেকে বিতাড়িত হলে তাঁরা ঢাকায় চলে আসেন এবং জয়নুল আবেদিন তাঁদের ঢাকা আর্ট ইনস্টিটিউটে শিক্ষার্থী হিসেবে গ্রহণ করেন (ইসলাম, ২০০৩, পৃ. ৪১)। ফলে বলা যেতে পারে, বাম রাজনীতির একটা প্রভাব গোড়া থেকেই চারুকলা ইনস্টিটিউটে প্রচ্ছন্নভাবে উপস্থিত ছিল। ফলে ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটে, পাকিস্তানি শাসনামলের গোড়ার দিকেও, বাঙালি সংস্কৃতির চর্চা ও লালনের জন্য

যেমন এক ধরনের অনুকূল পরিবেশ বা প্রেক্ষাপট তৈরি হয়েছিল, তেমনি এক ধরনের আন্দোলনের সংস্কৃতিও দানা বেঁধে উঠছিল– এরকম বলা যায়। তবে বাঙালি সংস্কৃতির জন্য ঢাকার চারুকলা ইনস্টিটিউটের এ পক্ষপাত এবং আন্দোলন-সম্পৃক্ততা প্রথম প্রকাশ্য রূপ লাভ করে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে।

ভাষা আন্দোলনে চারুশিল্পীদের অংশগ্রহণ ও তাৎক্ষণিক প্রতিক্রিয়া

স্বাধীন রাষ্ট্র হিসেবে পাকিস্তান সৃষ্টির অল্প কিছুদিন পর থেকেই (১৯৪৮) রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে বিতর্ক ও আন্দোলন শুরু হয়েছিল। ঢাকায় চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানের যাত্রাও শুরু হয় এই বছর। রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে আন্দোলন তীব্র ও গতিশীল হয়ে ওঠে ১৯৫২ সালে। এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিয়েছিল মূলত ছাত্ররা। যদিও তখন ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউট শৈশব অতিক্রম করেনি, তবু এ ইনস্টিটিউটের তৎকালীন ছাত্র-শিক্ষকরা আন্দোলনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। বিভিন্নভাবে যারা ভাষা আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন বলে জানা যায়, তাদের মধ্যে ইমদাদ হোসেন (১৯২৫-২০১১), মুর্তজা বশীর (১৯৩২-১৯২০), আমিনুল ইসলাম (১৯৩১-২০১১) প্রমুখের নাম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। এঁদের মধ্যে ইমদাদ হোসেন 'সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষেদ'র সদস্য ছিলেন। এছাড়া বিজন চৌধুরী, রশীদ চৌধুরী, আবদুর রাজ্জাক, আবদুর রহমান ভুইঞা প্রমুখ বিভিন্নভাবে এ আন্দোলনের সঙ্গে সম্পৃক্ত ছিলেন বলে জানা যায় (ইমদাদ হোসেন, সাক্ষাৎকার, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯) (ইসলাম, ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯; আকন্দ, ২০০৯, পৃ. ১৭; সোম, ২০১৫, পৃ. ১৫)। শিল্পী মোস্তফা মনোয়ারের কথাও এ প্রসঙ্গে উল্লেখ করা দরকার। তখন তিনি ছিলেন স্কুলের ছাত্র। থাকতেন নারায়ণগঞ্জে। তারপরও তিনি ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিয়েছিলেন এবং পুলিশের হাতে গ্রেফতার হয়েছিলেন।

কামরুল হাসানের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, 'সেকালের পোস্টার লেখার প্রধান মাল-মসলা ছিল পুরাতন খবরের কাগজের ওপর লাল বা কালো রং দিয়ে লেখা স্লোগান। সাধারণত রাজনৈতিক কর্মীরাই সেগুলো লিখতেন। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের সময় থেকেই প্রথম আমিনুল ইসলাম, মুর্তজা বশীর, ইমদাদ হোসেন, রশীদ চৌধুরী পোস্টার লিখেছে। এদের তুলির বলিষ্ঠ রেখার পোস্টার শিক্ষাঙ্গনে, রাস্তায়, গলিতে সেঁটে দিয়ে ভাষা আন্দোলনেকে করা হয়েছে আরো প্রাণবন্ত। এছাড়া লেখা হয়েছে শ্লোগানে, দাবিতে আকীর্ণ ব্যানার। আমি নিজেও আমার ছাত্রদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে কাজ করেছিলাম' (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৫-১৮৬)। আমিনুল ইসলাম জানিয়েছেন, সেসময় পোস্টার লেখার কাজে পুরনো খবরের কাগজ ও পোস্টার পেপার ব্যবহার করা হতো। পোস্টার কালারের দাম বেশি হওয়ার কারণে সাধারণত সস্তা রং দিয়ে পোস্টার লেখার কাজ শেষ করা হতো। বিশেষ কোনো ইমেজ তাতে থাকতো না। তবে মুষ্টিবদ্ধ হাত, ছেঁড়া শেকল ইত্যাদি কখনো কখনো ব্যবহৃত হতো। ১৯৫২ সালের একুশে ফেব্রুয়ারির পর থেকে বিভিন্ন ধরনের ইমেজ ব্যবহার করে পোস্টার, ব্যানার, প্লাকার্ড তৈরি করা শুরু হয় (ইসলাম, ১লা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)। আবার ইমদাদ হোসেন মনে করেন, সেসময় যেসব চিত্ররূপ আঁকা হয়েছে এসব পোস্টার-ব্যানারে, তাতে ভারতীয়– বিশেষ করে পশ্চিমবঙ্গের বিভিন্ন সাময়িকপত্রে প্রকাশিত ছবির প্রভাব ছিল। তিনি জানান, পোস্টার বা প্ল্যাকার্ড আঁকার কাজে সস্তা কার্টিজ পেপারের পাশাপাশি কখনো কখনো দামি কাগজও ব্যবহার করা হতো (হোসেন, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০০৯)।

উল্লেখ্য, ১৯৫০ সালে জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে 'ঢাকা আর্ট গ্রুপ' যাত্রা শুরু করেছিল। ১৯৫১ সালে এ গ্রুপ একটি সফল শিল্পকর্ম-প্রদর্শনীর আয়োজন করে। এর ধারাবাহিকতায় ১৯৫২ সালের ২২শে ফেব্রুয়ারি

ছিল ঢাকা আর্ট গ্রুপের দ্বিতীয় প্রদর্শনীর উদ্‌বোধনের জন্য নির্ধারিত দিন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের পাশাপাশি প্রদর্শনীর কাজও এগিয়ে চলছিল। তৎকালীন নিমতলীর ঢাকা জাদুঘরে এ প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করার কথা ছিল বাংলার গভর্নরের পত্নী ভিকারুননিসা নূনের। ২১শে তারিখে সেই অনুযায়ী প্রস্তুতিও চলছিল। কিন্তু ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলি চালানো ও উদ্ভূত পরিস্থিতির পরিপ্রেক্ষিতে তাৎক্ষণিকভাবে প্রদর্শনী স্থগিত করা হয়। এ বিষয়ে গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত নিয়েছিলেন কামরুল হাসান। কামরুল হাসানের স্মৃতিচারণে সে-সময়ের পরিস্থিতি সম্পর্কে চমৎকার বিবরণ পাওয়া যায়:

> তখন বিকেল প্রায় সাড়ে চারটে হবে। হঠাৎ দেখি শিল্পী মুর্তজা বশীর। সারা জামা তার রক্তাক্ত। সে খুবই ভাবপ্রবণ। আমার কাছে এসে হাউ-মাউ করে কেঁদে পড়লো। সালাম, বরকতদের সংবাদ আমি বশীরের কাছ থেকেই প্রথম পেয়েছি। বশীর হাসপাতালে আহত ও মৃতদের বহনকারীদের সঙ্গে ছিল। তার গায়ের জামায় তাদেরই তাজা রক্ত (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৮৭)।

পাশাপাশি, মুর্তজা বশীরের লেখা থেকেও সে-সময়ের প্রত্যক্ষদর্শীর তাজা বিবরণ পাওয়া যায়। জানা যায়, মুর্তজা বশীরসহ আরো কয়েকজন শিল্পী প্রদর্শনী থেকে তাদের ছবি প্রত্যাহার করেছিলেন– তাৎক্ষণিক প্রতিবাদ হিসেবে। অবশ্য পরে, যখন মার্চ মাসে প্রদর্শনীটি অনুষ্ঠিত হয়, তাতে তাঁরা অংশ নিয়েছিলেন। উদ্‌বোধন করেছিলেন লেডি ভিকারুননিসা নূন। আমিনুল ইসলামের লেখা থেকে জানা যায়, তিনি ২১শে ফেব্রুয়ারির ঘটনাতে আলোড়িত হয়ে 'হিউম্যানিটি ক্রুসিফাইড' শিরোনামে একটা বেশ বড়ো ছবি এঁকে এই প্রদর্শনীতে দিতে চেয়েছিলেন, কিন্তু ছবির সিলেকশন কমিটি ওই মুহূর্তে এ ধরনের ছবি প্রদর্শনীতে দেওয়া সমীচীন বোধ করেননি (ইসলাম, ২০০৩, পৃ. ৪৪)।

আমরা লক্ষ করি, বাংলা ভাষার জন্য চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকরা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নিলেও এ প্রদর্শনী উপলক্ষে যে ক্যাটালগ প্রকাশিত হয়েছিল, তাতে কিন্তু বাংলার স্থান ছিল না। পুরো ক্যাটালগ ছিল ইংরেজিতে। তৎকালীন প্রেক্ষাপটে এটা হয়তো খুব অস্বাভাবিক নয়। কিন্তু ভাষা আন্দোলনের রেশ কাটার আগেই শিল্প-প্রদর্শনীর ক্যাটালগের ভাষা হিসেবে ইংরেজির আশ্রয় নেওয়া এবং তাতে বাংলার স্থান না হওয়াটা আমাদের ভাবনার খোরাক জোগায় বৈ কি!

এমনকি, রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে যখন আন্দোলন সংগ্রাম চলছে তখনো আমরা দেখি, ঢাকা আর্ট গ্রুপের প্রথম প্রদর্শনী (১৯৫১) উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকার ভাষাও ছিল ইংরেজি। এবং তাতে ইংরেজি ভাষায় লিখিত বক্তব্যে বলা হয়েছে, এ গ্রুপ কোনো বিশেষ রাজনৈতিক মতাদর্শ বা নির্দিষ্ট কোনো শিল্পাদর্শের ভিত্তিতে প্রতিষ্ঠিত নয়। এ হচ্ছে শিল্পীদের স্বার্থ রক্ষা ও ছবি আঁকা এবং এর জন্য পরিবেশ তৈরির লক্ষ্যে প্রতিষ্ঠিত একটি সংগঠন মাত্র (আজিম, ২০০০, পৃ. ৯৩)।

আরো উল্লেখ করা যেতে পারে, এ প্রদর্শনীর প্রধান পৃষ্ঠপোষক ছিলেন এবং প্রদর্শনী উদ্‌বোধন করেছিলেন পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী নুরুল আমিন, বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতি-বিরোধী হিসেবে যার ব্যাপক পরিচিতি ছিল।

খুব সম্ভবত তৎকালীন প্রেক্ষাপটে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা ছাড়া চারুকলা বিষয়ক কোনো প্রতিষ্ঠান টিকিয়ে রাখা সম্ভব হবে না– এই বিবেচনায় সরকারের শীর্ষস্থানীয় ক্ষমতাবান ব্যক্তিদের আনুকূল্য পাওয়ার চেষ্টা চারুশিল্পীদের এসব কর্মকাণ্ডে বিশেষভাবে দৃষ্টিগোচর হয়। যদিও এসব শিল্পী ব্যক্তিগতভাবে বাংলা ভাষা ও

বাঙালি সংস্কৃতির পক্ষের মানুষ ছিলেন– যা তাদের অন্যান্য কার্যক্রম থেকে বুঝে নেওয়া যায়। কিন্তু প্রাতিষ্ঠানিকভাবে, প্রতিষ্ঠানের উন্নয়নের স্বার্থে তৎকালীন প্রেক্ষাপটে তারা একাধিক এমন পদক্ষেপ নিয়েছেন, যাতে তাদের রাজনৈতিক অবস্থান প্রশ্নবিদ্ধ হতে পারে। সত্যের খাতিরে এ কথা বলতেই হবে। তবে প্রতিষ্ঠানের স্বার্থে, এধরনের পদক্ষেপকে একধরনের কৌশলও বলা যেতে পারে।

ভাষা আন্দোলনের প্রভাব: পঞ্চাশের দশকের অন্যান্য ঘটনা

১৯৫২'র ভাষা আন্দোলনের প্রভাব পড়েছিল দেশের সব স্তরের মানুষের উপর। শিল্প-সাহিত্যেও এর ব্যতিক্রম ঘটেনি। ভাষা আন্দোলনের পরের বছর (মার্চ ১৯৫৩) শহিদ দিবস স্মরণে *একুশে ফেব্রুয়ারী* নামে হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত যে সংকলনটি প্রকাশিত হয়েছিল (প্রকাশক: মোহাম্মদ সুলতান) তার প্রচ্ছদ করেছিলেন আমিনুল ইসলাম। অলংকরণ করেছিলেন মুর্তজা বশীর ও বিজন চৌধুরী। মুর্তজা বশীরের লিনোকাট মাধ্যমে করা শিল্পকর্মে দেখা যায় নিজের ব্যক্তিগত অভিজ্ঞতার প্রতিফলন। গুলিবিদ্ধ তরুণের আহত শরীর আঁকড়ে ধরে আছে আরেক তরুণ সহযোদ্ধা। আহত তরুণের হাতে রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে প্ল্যাকার্ড। এ সংকলনে আরো যেসব অলংকরণ রয়েছে তাতে একুশের অভিজ্ঞতার তাজা বিবরণ নানাভাবে প্রকাশিত হয়েছে।

১৯৫২ সালের ঐতিহাসিক ঘটনার পরের বছর অর্থাৎ ১৯৫৩ সালে চারুকলা ইনস্টিটিউটের শিক্ষার্থীরা একুশের ঘটনা স্মরণে ব্যানার-ফেস্টুন শোভিত একটি শোভাযাত্রা বের করেছিল। শোভাযাত্রায় ভাষা আন্দোলনকে উপজীব্য করে আঁকা একাধিক ব্যানার প্রদর্শিত হয়েছিল। এসব ব্যানারচিত্রের বিষয়বস্তু ছিল প্রধানত ভাষার দাবিতে শিক্ষার্থী-জনতার মিছিল এবং তাতে পুলিশের গুলিবর্ষণের ঘটনা। সে সাথে 'বাক স্বাধীনতা চাই', 'গ্রেফতারী পরোওয়ানা প্রত্যাহার করো'– এসব শ্লোগান-সমৃদ্ধ সচিত্র প্ল্যাকার্ড ও ফেস্টুন তাঁরা বহন করেছিলেন।

ভাষা আন্দোলনের ঘটনাকে উপজীব্য করে দৈনিক পত্রিকায় কার্টুন প্রকাশিত হয়েছিল। 'দোপেয়াজা' ছদ্মনামে কার্টুনগুলি শিল্পী কাজী আবুল কাসেমের আঁকা। এসব কার্টুনে তৎকালীন বিভিন্ন গোষ্ঠীর চরিত্র ও অবস্থান ব্যঙ্গবিদ্রুপের মাধ্যমে উদ্‌ঘাটিত হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনেরই প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে শহিদ মিনারের কথা বলা যেতে পারে। হামিদুর রাহমান এবং নভেরা আহমেদের পারিকল্পনা ও ডিজাইনে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশের দশকের শেষার্ধে (১৯৫৬-১৯৫৮)। যদিও রাজনৈতিক উত্থান-পতনের কারণে একাধিকবার এই শহিদ মিনার তৈরির কাজ বাধাগ্রস্ত হয়েছিল এবং শিল্পীদ্বয়ের পরিকল্পিত নকশা অনুসারে এ কাজ কখনো সম্পূর্ণ হয়নি বলে অভিযোগ রয়েছে, তবু এ শহিদ মিনারকে কেন্দ্র করেই বাংলাদেশের বিভিন্ন রাজনৈতিক-সামাজিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড পরিচালিত হয়েছে পঞ্চাশের দশক থেকেই, যা তখন থেকে এখন পর্যন্ত বাঙালি জাতীয়তাবাদের অন্যতম স্মারক ও প্রেরণার উৎস। এই মডেলের অনুসরণে পরবর্তীকালে অজস্র শহিদ মিনার গড়ে উঠেছে দেশের ভিতরে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন প্রান্তে। বিশেষ করে, ১৯৯৯ সালে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি পাবার পর একুশে ফেব্রুয়ারি ও শহিদ মিনারের গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো বৃদ্ধি পেয়েছে। কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার ছাড়াও আরো অনেক শহিদ মিনার সৃষ্টিতে শিল্পীদের ভূমিকা ছিল। উদাহরণ হিসেবে বলা যায়, ঢাকা

বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হল চত্বরে যে শহীদ মিনার, তার ডিজাইন করেছিলেন জয়নুল আবেদিন স্বয়ং (নজরুল, ১৯৯৫, পৃ. ৫৪)।

ভাষা আন্দোলনকে বাঙালি জাতীয়তাবাদের উন্মেষকাল বলা যেতে পারে। এর প্রভাব দেখা যায় ১৯৫৪ সালের নির্বাচনে। পাকিস্তান সৃষ্টির সাত বছর পর প্রথম সাধারণ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। '৫৪'র নির্বাচনে যুক্তফ্রন্টের জয়লাভ ও মুসলিম লীগের ভরাডুবি বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ। এ নির্বাচনে চারুশিল্পীরা যুক্তফ্রন্টের পক্ষে প্রচারণায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছিল। কামরুল হাসানের লেখা থেকে জানা যায়, '১৯৫৪ সালের নির্বাচন উপলক্ষে যুক্তফ্রন্টকে সমর্থন দানের ভিত্তিতে শিল্পীরা যে উৎসাহ উদ্দীপনা নিয়ে হাজার হাজার দেওয়ালচিত্র, ব্যানার, এবং ছবি এঁকেছিল তা আমার স্মৃতিতে জ্বলজ্বল করছে' (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৯০)। নমুনার অভাবে কেমন ছিল সে-সব দেয়ালচিত্র বা ব্যানারের চিত্রভাষা– তা নিয়ে আলোচনা করা সম্ভব নয়। তবে প্রবীণ শিল্পীদের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, সে সময়ের কাজগুলো ছিল মূলত নির্বাচনমুখী। রাজনৈতিক নেতাদের অনিয়ম ও দুর্নীতি (যেমন ঘুষ নেওয়া), পাক-মার্কিন সামরিক চুক্তি ইত্যাদি ব্যঙ্গাত্মক ভঙ্গিতে চিত্রিত করা হতো এসব পোস্টার, ব্যানার বা দেয়ালচিত্রে (হোসেন, ২০০৯; আকন্দ, ২০০৯, পৃ. ২১)।

ভাষার প্রশ্নে পূর্ব-বাংলার গণমানুষের ভেতর যে জাগরণ সৃষ্টি হয়েছিল তাতে চারুশিল্পীরাও উজ্জীবিত হয়েছিলেন এবং জনগণকে বাঙালি জাতীয়তাবাদী মন্ত্রে উজ্জীবিত করার ক্ষেত্রে তাঁরা গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিলেন। ১৯৫৪ সালের এপ্রিল মাসে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে সপ্তাহব্যাপী যে সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়েছিল তা ছিল সে-সময়ের এক উল্লেখযোগ্য ঘটনা। ভারতের পশ্চিমবঙ্গ থেকে অনেক কবি, সাহিত্যিক, বুদ্ধিজীবী এ উপলক্ষ্যে ঢাকা এসেছিলেন। এ বিষয়ে কামরুল হাসানের মূল্যায়ন ও স্মৃতিচারণ প্রণিধানযোগ্য:

> আমার বিবেক-বিবেচনা দিয়ে অনেক পথ অতিক্রম করে এসে আজ এটা পরিষ্কার উপলব্ধি করতে পারছি যে '৫৪ সালের এ সাহিত্য সম্মেলনই ছিল বাঙালী জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের প্রারম্ভিক প্রবাহ। এ প্রবাহ প্রতিক্রিয়াশীল চক্রের দুর্গে প্রচণ্ড আঘাত হানতে পেরেছিল। এর প্রমাণ পাওয়া যাবে সেই সময়কার *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার পৃষ্ঠায়। প্রায় দুই মাস ধরে আজাদের পৃষ্ঠায় দুই কলাম হেডিং-এ প্রতিদিন আমাদের এই সম্মেলনের বিরুদ্ধে শুধু বিদ্বেষপ্রসূত বিষোদ্গারই ছিলো না, এতে অশালীন ভাষাও প্রয়োগ করা হতো। আমরা অর্থাৎ সম্মেলনের উদ্যোক্তা ও সমর্থকরা যে ভারতীয় দালাল এবং ইসলামবিরোধী এটাই ছিল তাদের মূল বক্তব্য। বাংলাদেশের বেশিরভাগ শিল্পী কেবল সেই মহাসম্মেলন উপলক্ষে চিত্র প্রদর্শনী করেই দায়িত্ব পালন করেনি বরং পোস্টার, পুস্তিকা, মঞ্চসজ্জা থেকে ছায়া নাট্যের পটভূমিতেও সক্রিয় ছিল (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৯১)।

এ সাংস্কৃতিক সম্মেলন উপলক্ষ্যে বর্ধমান হাউসে যে আলোকচিত্র ও শিল্পকর্ম প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল, তা উদ্‌বোধন করেছিলেন শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিন।

১৯৫৫ সালের আগস্ট (১৪-২১) মাসে পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের আয়োজনে জয়নুল আবেদিনের উদ্যোগে চারুকলা ইনস্টিটিউটে লোকশিল্পের এক বিশাল প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সম্ভবত সেটাই ছিল বাংলাদেশে প্রথম লোকশিল্প প্রদর্শনী। সারা দেশ থেকে লোকশিল্পের বিভিন্ন নিদর্শন সংগ্রহ করে এ প্রদর্শনীতে দেখানো হয়েছিল। যার মধ্যে ছিল নকশিকাঁথা, শিকা, জামদানি, বাঁশ ও বেতের তৈরি জিনিস, ঐতিহ্যবাহী মৃৎশিল্প

ইত্যাদি (*দৈনিক আজাদ*, ১৯৫৫, ১৬ই আগস্ট)। সরাসরি রাজনৈতিক বক্তব্য না থাকলেও এ প্রদর্শনীর ভেতর দিয়ে বাঙালি সংস্কৃতিকে সবার সামনে তুলে ধরা হয়েছিল– যা পরোক্ষভাবে একুশের চেতনার সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ এবং যা বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের পক্ষে সহায়ক হয়েছিল।

পঞ্চাশের দশকেই ১৯৫৭ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে টাঙ্গাইলের কাগমারীতে পূর্ব-পাকিস্তান আওয়ামী লীগের বিশেষ কাউন্সিল অধিবেশন উপলক্ষে সেখানে এক সাংস্কৃতিক সম্মেলনের আয়োজন করা হয়। তাতে পাকিস্তানের উভয় অঞ্চলের সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবী ছাড়াও বিদেশি অনেক প্রতিনিধি অংশ নিয়েছিলেন। এ সম্মেলনের পোস্টার আঁকার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল আর্ট ইনস্টিটিউটের শিল্পীদের। জয়নুল আবেদিন, শফিকুল আমিন, কামরুল হাসানের নেতৃত্বে একদল শিল্পী এ সম্মেলনে যোগ দিয়েছিলেন এবং চিত্র-প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল সন্তোষের রাজবাড়িতে (মকসুদ, ২০১৭, পৃ. ১৩৬-১৩৭)। হাশেম খানসহ আর্ট ইনস্টিটিউটের ৩০ জন শিক্ষার্থী এতে অংশ নেয়। কাগমারী এলাকায় বসবাসরত সাধারণ মানুষের জীবন সম্পর্কে প্রদর্শনীর আগে তাৎক্ষণিকভাবে এসব চিত্রকর্ম আঁকা হয়েছিল। ফলে দেখা যাচ্ছে, ভাষা আন্দোলন থেকে যে সম্পর্কের সূত্রপাত– প্রাতিষ্ঠানিক চারুশিল্পীদের সঙ্গে তৎকালীন বাঙালি জাতীয়তাবাদী নেতৃত্বের একধরনের সম্পর্ক গড়ে উঠেছে পঞ্চাশের দশকেই।

ষাটের দশকের বিভিন্ন আন্দোলন ও চারুশিল্পী সমাজ

বাংলাদেশের আন্দোলন-সংগ্রামের ইতিহাসে ষাটের দশক অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ অধ্যায়। বায়ান্নোর ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে বাংলাদেশে যে জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের বীজ অঙ্কুরিত হয়েছিল, তা ষাটের দশকেই নানাভাবে আরো স্পষ্ট ও প্রকাশিত হতে শুরু করেছিল।

মোটামুটি ১৯৬২ থেকে বিভিন্ন ইস্যুকে সামনে এনে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছিল। বিভিন্ন ঘটনার ভেতর দিয়ে প্রবাহিত হয়ে ১৯৬৬ সালে আওয়ামী লীগের ছয় দফা কর্মসূচি ঘোষিত হলে এ আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনই প্রথমে স্বাধিকার ও পরে স্বাধীনতা আন্দোলনে রূপ নেয়। তবে সে আলোচনায় প্রবেশের আগে আরেকটি আন্দোলনের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন।

১৯৬২ সালে যখন ছাত্রদের নেতৃত্বে আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলন শুরু হয়েছে, তখন প্রায় একই সময়ে ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটেও আরেকটি বিশেষ আন্দোলন দানা বেঁধে উঠেছিল। সেটা হলো সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটকে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে রূপান্তরিত করার আন্দোলন। ১৯৬২ সাল নাগাদ এ আন্দোলন তুমুল আকার ধারণ করে। প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে নামের সঙ্গে 'ইনস্টিটিউট' শব্দটি যুক্ত থাকলেও ঢাকার সরকারি আর্ট ইনস্টিটিউটটি সরকারি কাগজপত্রে স্কুল হিসেবেই পরিগণিত হতো। তখন এখানে পাঁচ বছরের সার্টিফিকেট কোর্স চালু ছিল। অর্থাৎ এখানে শিক্ষা লাভ করলে একজন শিক্ষার্থী যে সার্টিফিকেট লাভ করতেন, তা ডিগ্রির সমতুল্য ছিল না। ষাটের দশকের গোড়ায় যারা এ প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থী ছিলেন, তারা সার্টিফিকেট কোর্সের পরিবর্তে ডিগ্রি প্রদানের দাবিতে চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটিকে পূর্ণাঙ্গ ডিগ্রি কলেজে পরিণত করার আন্দোলন শুরু করে। ছাত্রদের ভেতর এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দেন আনোয়ার হোসেন, প্রফুল্ল রায়, কেরামত মওলা, সামসুল ইসলাম নান্টু, মুনশী মহিউদ্দিন, বেলাল আহমেদ, আর. এস. এম. সালাম প্রমুখ। এছাড়া আর্ট ইনস্টিটিউটের সঙ্গে সম্পৃক্ত অনেকেই কমবেশি এ আন্দোলনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন এবং গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন। আর্ট ইনস্টিটিউটের বাইরের অনেকের সহযোগিতাও পাওয়া যায় এ আন্দোলনে। এ প্রসঙ্গে কমরেড রবি

নিয়োগী, কমরেড মোহম্মদ ফরহাদ, কবি বেগম শামসুন নাহার মাহমুদ প্রমুখের নাম বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তৎকালীন ডাকসুর নেতৃবর্গও এ আন্দোলনের প্রতি সহযোগিতার হাত বাড়িয়ে দিয়েছিলেন।

তবে আন্দোলনের গতিবৃদ্ধিতে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তৎকালীন তরুণ শিক্ষক শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার। বিভিন্ন কার্টুন সমৃদ্ধ পোস্টারগুলোর মাস্টার কপিটি তিনিই অঙ্কন করতেন। শিক্ষার্থীরা সেগুলোর অসংখ্য কপি করে সারা শহরে ছড়িয়ে দিতো। সে-সময়ের স্মৃতিচারণ করে শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার জানান, ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতা থেকে তিনি শিখেছিলেন যে, কার্টুন বা ছবি আঁকা দিয়ে মানুষের সাথে যোগাযোগ প্রতিষ্ঠা করা যায়। সে অভিজ্ঞতা কাজে লাগিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটকে কলেজে রূপান্তরিত করার আন্দোলনেও তিনি বিভিন্ন বক্তব্যসমৃদ্ধ কার্টুন আঁকার প্রতি গুরুত্ব দিয়েছিলেন (মনোয়ার, ২০০৯)। এ আন্দোলনের অন্যতম প্রধান নেতা আনোয়ার হোসেনের স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়:

> আন্দোলন চলতে থাকে।... এদিকে কার্টুনে, পোস্টারে ভরে ওঠে সারা শহর। পূর্ব ও পশ্চিম পাকিস্তানের সাথে বৈষম্য, স্কুল ও কলেজের ছাত্রদের ছাত্রাবাসের অভাব, সংবাদপত্রের স্বাধীনতায় বিষাক্ত ছোবল। ভুড়িওয়ালা কেন্দ্রীয় সরকার ঐ পাকিস্তানের কামিজ পরিহিতা অলংকার ও প্রসাধনে ফিটফাট মহিলাকে মূল্যবান হার পরিয়ে দিচ্ছে। পাশেই এই পাকিস্তানের শাড়ী পরা অলংকারহীন মহিলা শীতে থর থর করে কাঁপছে। তার দিকে দৃষ্টি নেই। ছাত্রাবাসে জায়গা নেই। ছোট ঘরে উঁচু হয়ে ঠেলাঠেলি করে ঢুকছে ছাত্ররা। সাংবাদিকদের কলমের উপর বড় বড় নখ ও পশমওয়ালা কালো হাতের ছোবল। জনতার হাত বাঁধা, মুখে তালা। শামুকের পিঠে সরকারী ফাইল – ইত্যাদি অংকিত হয়ে রেখাচিত্রে, পোস্টারে লিপিকলার সাথে... (হোসেন, ১৯৯৮, পৃ. ২০৯-২১০)।

আন্দোলনের ফলে প্রায় ৬৬ দিন (মতান্তরে ৬২ দিন) ইনস্টিটিউট বন্ধ থাকে। সরকারি কর্তৃপক্ষ বিভিন্নভাবে ছাত্রদের ধর্মঘট প্রত্যাহারের জন্য চাপ সৃষ্টি করলেও তা সফল হয়নি। শেষ পর্যন্ত আটজন ছাত্রকে এই আন্দোলনের কারণে বহিষ্কার করা হয়। তারপরও আন্দোলন চলতে থাকে এবং অবশেষে দীর্ঘ আন্দোলনের পর সরকারের তরফ থেকে দাবি মেনে নিয়ে আর্ট ইনস্টিটিউটকে সরকারি আর্ট কলেজ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। ১৯৬৩ সাল থেকে 'সরকারী চারু ও কারুকলা মহাবিদ্যালয়' নামে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে এই চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠানটি যাত্রা শুরু করে এবং বিএফএ বা ব্যাচলর অব ফাইন আর্টস ডিগ্রি চালু হয়। আর্ট কলেজে রূপান্তরিত করার এ আন্দোলন বিশেষ তাৎপর্যপূর্ণ এবং এর ফল অত্যন্ত সুদূরপ্রসারী হয়েছিল।

কলেজে রূপান্তরিত করার আন্দোলনের ফলে তৎকালীন রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দের সঙ্গে, বিশেষ করে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক ছাত্রনেতাদের সঙ্গে আর্ট ইনস্টিটিউটের ছাত্র-শিক্ষকদের গভীর সখ্য তৈরি হয়। পরবর্তী পর্যায়ে ষাটের দশকের বিভিন্ন রাজনৈতিক আন্দোলনে চারুশিল্পীদের সঙ্গে রাজনৈতিক নেতৃত্বের এ সম্পর্কের প্রভাব পড়েছিল উল্লেখযোগ্য মাত্রায়।

আইয়ুব খানের শাসনামলের প্রথম কয়েকবছর তেমন কোনো প্রতিবাদ-প্রতিরোধ-আন্দোলন গড়ে ওঠেনি। কিন্তু ক্রমশ বিভিন্ন ইস্যুকে কেন্দ্র করে অসন্তোষ দানা বাঁধতে থাকে। ১৯৬২ সালের শুরু থেকেই আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনের সূত্রপাত হয়। ঝিমিয়ে পড়া রাজনৈতিক অঙ্গনে বাষট্টির ছাত্র-আন্দোলনকে কেন্দ্র করে নতুন প্রাণসঞ্চার হয়। ক্রমশ তা রাজনৈতিক চেহারা নেয় এবং আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে পরিণত হয়। এ আন্দোলনেও বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা ও অংশগ্রহণ ছিল সক্রিয় ও উজ্জ্বল। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের পর থেকেই কার্টুন বা ছবি এঁকে পোস্টার, ফেস্টুন বা ব্যানার করার যে চল তৈরি হয়েছিল, তা

ষাটের দশকের আইয়ুব-বিরোধী আন্দোলনে আরো বৃদ্ধি পায়। আর্ট কলেজ করার আন্দোলনে যেমন শিল্পীরা এ পদ্ধতি বা কৌশল ব্যবহার করেছিল, তেমনি জাতীয় রাজনৈতিক ইস্যুতেও তারা চিত্রিত পোস্টার, প্ল্যাকার্ড বা ফেস্টুন তৈরি করার ধারা অব্যাহত রাখে। সে সময়ের একটি আলোকচিত্রে দেখা যায়, শিক্ষানীতির বিরুদ্ধে একটি মিছিলের প্ল্যাকার্ড ও পোস্টারগুলিতে 'স্বৈরতন্ত্র নিপাত যাক', 'গণতন্ত্র কায়েম কর', 'ডলারের বন্ধন ছিন্ন কর' ইত্যাদি স্লোগানের পাশাপাশি শেকল ছিঁড়ে বের হয়ে আসছে গতিশীল মানুষ এমন ছবিসহ বিভিন্ন ধরনের ব্যঙ্গচিত্র স্থান পেয়েছে। এছাড়া বিভিন্ন মিছিলে যেসব পোস্টার, ব্যানার, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি দেখা যায়, তা চারুশিল্পীদের অবদান। সে সময়ের সক্রিয় চারুশিল্পীদের সঙ্গে আলাপের ভিত্তিতে জানা যায়, তখন তারা বিভিন্ন বিষয়ে অজস্র পোস্টার, ফেস্টুন ইত্যাদি এঁকেছিল। কিন্তু মূল নিদর্শনের অভাবে সেসব পোস্টার, ব্যানার, ফেস্টুন ইত্যাদি সম্পর্কে আলোচনা করাটা বেশ দুরূহ।

১৯৬৫ সালে পাকিস্তানের রাজনৈতিক অঙ্গনে দুটি বড়ো ঘটনা ঘটে। প্রথমত জানুয়ারি মাসে অনুষ্ঠিত প্রেসিডেন্ট নির্বাচন। এ নির্বাচনে প্রমাণিত হয়ে যায় যে আইয়ুব খানের জনপ্রিয়তা পূর্ব-পাকিস্তানে ক্রমহ্রাসমান। দ্বিতীয়ত ১৯৬৫ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কাশ্মীর প্রশ্নে পাক-ভারত যুদ্ধ শুরু হয়– পূর্ব-পাকিস্তানে এর বিরূপ প্রতিক্রিয়া তৈরি হয়। এ যুদ্ধ পূর্ব-পাকিস্তানের অধিবাসীদের ভৌগোলিক হুমকির ব্যাপারে সচেতন করে তোলে এবং তাদের মনে নিরাপত্তাহীনতার জন্ম দেয়। এ পরিস্থিতি পূর্ব-পাকিস্তানের স্বায়ত্তশাসন দাবির পক্ষে বাস্তবভিত্তিক যুক্তি জুগিয়েছিল। এছাড়া যুদ্ধ চলাকালীন রবীন্দ্রসংগীত-বিরোধী উদ্যোগ এবং পশ্চিমবাংলা থেকে সাংস্কৃতিক উপাদান ও প্রকাশনা আমদানি নিষিদ্ধকরণ বাঙালি সংস্কৃতির স্বাতন্ত্র্যের উপর আঘাত হিসেবে গণ্য করা হয়। বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের অভিজ্ঞতাও তাদের নতুন করে ভাবতে অনুপ্রাণিত করে এবং বাঙালি সাংস্কৃতিক পরিচয়টি সামনে চলে আসে। এসব কারণে ষাটের দশকের প্রথমার্ধে বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা আরো বিকশিত হতে থাকে। এর নানা নজির আমরা দেখতে পাই সে-সময়ের বিভিন্ন সাহিত্যিক-সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ডে। উদাহরণ হিসেবে ছায়ানটের কথা বলা যেতে পারে (প্রতিষ্ঠা ১৯৬১)। ১৯৬৪ থেকে ছায়ানট বর্ষবরণ অনুষ্ঠান শুরু করলেও কয়েকবছর পর এ অনুষ্ঠান রমনার বটমূলে আয়োজন করা হয় এবং তারপর থেকে প্রতিবছর নিয়মিতভাবে বর্ষবরণ উৎসব উদ্‌যাপন করতে শুরু করে। সন্‌জীদা খাতুন লিখেছেন, ''১৯৬৭ সাল থেকে শুরু হলো রমনার বর্ষবরণ অনুষ্ঠান।... চারুকলা ইনস্টিটিউটের ছাত্রছাত্রীরা হাতে লিখে কিছু আমন্ত্রণপত্র তৈরি করল'' (খাতুন, ২০১৭, পৃ. ১৪)। অর্থাৎ ছায়ানটের কার্যক্রমের সাথেও চারুকলার শিল্পীদের একটা সম্পৃক্ততা ছিল। এ প্রতিষ্ঠানের আয়োজনে রবীন্দ্র ও নজরুল-জয়ন্তী, বসন্ত উৎসব ইত্যাদিও নিয়মিতভাবে পালিত হতে থাকে।

আর্ট ইনস্টিটিউটেও তখন ছবি আঁকার পাশাপাশি বিভিন্ন সাংস্কৃতিক কর্মকাণ্ড শুরু হয়েছে। কলকাতা আর্ট কলেজ থেকে পাস করে শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার তখন তরুণ শিক্ষক হিসেবে ঢাকার আর্ট ইনস্টিটিউটে যোগ দিয়েছেন। তাঁর উদ্যোগে আর্ট ইনস্টিটিউটে প্রথম নাটক হয়েছে– রবীন্দ্রনাথের *ডাকঘর*। হয়েছে নানা ধরনের সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান, বসন্ত উৎসব ইত্যাদি।

সংবাদ, *ইত্তেফাক* ইত্যাদি পত্রিকা এবং কচি-কাঁচার মেলা (প্রতিষ্ঠা ১৯৫৬), খেলাঘর প্রভৃতি শিশু-সংগঠনগুলো এ সময় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এসব সংগঠন বা পত্রিকার সাথে জড়িত ছিলেন অনেক চারুশিল্পী। যেমন হাশেম খান, রফিকুন নবী, শাহাদত চৌধুরী প্রমুখ। বিভিন্ন সাহিত্য পত্রিকা বা একুশের সংকলনকে কেন্দ্র করেও কবি বা লেখকদের সঙ্গে চিত্রশিল্পীরা বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনার বিকাশে

গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন। কেননা এসব পত্রিকা বা সংকলনের প্রচ্ছদ ও অলংকরণের কাজটা চিত্রশিল্পীরাই করতেন।

প্রকৃতপক্ষে ষাটের দশকের গোড়াতেই এমন একটা পরিবেশ তৈরি হয়েছিল যাতে কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক, সাংবাদিক, বুদ্ধিজীবী, শিক্ষার্থী, রাজনীতিবিদ প্রমুখসহ বিভিন্ন পেশাজীবী শ্রেণির মানুষের ভেতর এক ধরনের যোগাযোগ ও ঘনিষ্ঠতা তৈরি হয়েছিল। তাদের সম্পর্কের অন্যতম ভিত্তি ছিল আইয়ুব-বিরোধী মনোভাব ও বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনা। বাঙালি সাংস্কৃতিক চেতনাই ক্রমশ পাকিস্তানি ভাবাদর্শের বিপরীতে বাঙালি জাতীয়তাবাদকে আরো শক্তিশালী করে তোলে। এটা আরো স্পষ্ট হয়ে উঠে ১৯৬৬ সালে।

১৯৬৬ সালে লাহোরে সর্বদলীয় সম্মেলনে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধি দলের প্রধান শেখ মুজিবুর রহমান ছয়-দফা প্রস্তাব হাজির করেন। ছাত্র-বুদ্ধিজীবী ছাড়াও পূর্ব-পাকিস্তানের সাধারণ মানুষের কাছে ছয়-দফা খুবই জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল। ছয়-দফাকে পূর্ব-পাকিস্তানের অধিকাংশ মানুষ তাদের মুক্তির সনদ হিসেবে বিবেচনা করেছিল। ছয়-দফার কারণেই শেখ মুজিব পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষের কাছে অসাধারণ গ্রহণযোগ্যতা এবং শীর্ষ-নেতার মর্যাদা লাভ করেছিলেন। বোধগম্য কারণেই, লাহোরে ছয়-দফা প্রস্তাব হাজির করার পর আওয়ামী লীগের পক্ষ থেকে পূর্ব-পাকিস্তানে ছয় দফার পক্ষে ব্যাপক প্রচারণা চালানো হয়েছিল। আর এই প্রচারণার কাজে– পোস্টারে, ব্যানারে, জনসভার মঞ্চসজ্জা ইত্যাদিতে ছয়-দফার যে লোগো ব্যবহৃত হয়েছিল, তার ডিজাইন করেছিলেন শিল্পী হাশেম খান। সে-সময়ের স্মৃতিচারণ করে শিল্পী হাশেম খান জানিয়েছেন, খুব সহজ-সরল ফর্মে করা হয়েছিল ছয়-দফার লোগো ডিজাইন। বাংলাদেশ ছয় ঋতুর দেশ। বাংলাদেশের মানুষের জীবনে ছয় ঋতুর প্রভাব ব্যাপক। এ দেশের মানুষের স্বকীয় স্বভাব, মন-মেজাজ ইত্যাদি গড়ে উঠেছে ছয় ঋতুর কল্যাণে। এ ছয় ঋতুর কথা মাথায় রেখে ছয়-দফার লোগো ডিজাইন করা হয়েছিল বলে তিনি জানিয়েছেন (খান, ১৪ই মে, ২০০৯)। পরবর্তীকালে বীরেন সোম জানিয়েছেন, হাশেম খানের লে-আউট অবলম্বনে তিনি, আবুল বারক আলভী ও মঞ্জুরুল হাই– এ তিনজন মিলে ৬-দফার মঞ্চ বানাবার কাজ সম্পন্ন করেন। এ মঞ্চ থেকেই ১৯৬৬ সালে শেখ মুজিবুর রহমান ৬-দফা কর্মসূচি ব্যাখ্যা করেন (সোম, ২০১৫, পৃ. ৪৬-৪৭)।

ছয় দফা এবং শেখ মুজিবের জনপ্রিয়তায় ভীত হয়ে আইয়ুব খানের সরকার দমননীতির আশ্রয় নেয়। রাজনীতিক ও ছাত্র-জনতার উপর নেমে আসে অমানুষিক নির্যাতন। সংবাদপত্রের উপর কড়াকড়ি আরোপ করা হয়। ১৯৬৬ সালেই শেখ মুজিব গ্রেফতার হয়ে যান এবং ১৯৬৮ সাল পর্যন্ত তিনি অধিকাংশ সময় কারাবন্দি থাকেন। ১৯৬৮ সালের জানুয়ারিতে শেখ মুজিবের বিরুদ্ধে আগরতলা ষড়যন্ত্র মামলা দায়ের করা হয়। এ মামলার বিরুদ্ধে শেখ মুজিবের মুক্তির দাবিতে ব্যাপক গণ-অভ্যুত্থান ঘটে। ইতিহাসে এটাই ১৯৬৯-এর গণ-অভ্যুত্থান হিসেবে পরিচিত। দুর্বার গণ-আন্দোলনের মুখে ১৯৬৯ সালের ফেব্রুয়ারিতে শেখ মুজিব ও অন্য বিরোধী নেতাদের আইয়ুব খান বিনা শর্তে মুক্তি দেন। পরের মাসে, মার্চে পরিস্থিতি সামলাতে রাওয়ালপিন্ডিতে শুরু হয় গোল-টেবিল বৈঠক। কিন্তু শেষ পর্যন্ত আইয়ুব খান ক্ষমতা ধরে রাখতে পারে না। মার্চ মাসেই সামরিক বাহিনীর হাতে ক্ষমতা হস্তান্তর করে আইয়ুব খান দায়িত্ব পরিত্যাগ করেন। এভাবে আইয়ুব খানের এক দশকের শাসনামলের অবসান হয়। সামরিক বাহিনী ক্ষমতা-গ্রহণের পর দেশে সামরিক শাসন জারি হয় এবং সেনাপ্রধান ইয়াহিয়া খান নিজেকে রাষ্ট্রের প্রেসিডেন্ট হিসেবে ঘোষণা করেন। তিনি

অবিলম্বে সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠানের প্রতিশ্রুতি দেন। এভাবে দেশ এক সেনাশাসকের হাত থেকে আরেক সেনাশাসকের হাতে এসে পড়ে।

মোটাদাগে এই হলো ১৯৬৬-৬৯ এই কালপর্বের রাজনৈতিক ঘটনাপ্রবাহের সংক্ষিপ্ত বিবরণ। এ কালপর্বে প্রথমে ছয়-দফা এবং পরবর্তীকালে এগারো-দফাকে সামনে রেখে যখন স্বায়ত্তশাসন ও অন্যান্য দাবিতে আন্দোলন প্রবল হয়ে ওঠে, তখন চারুশিল্পীরা বিভিন্নভাবে তাতে অংশ নেয়। চারুশিল্পীদের কর্মকাণ্ডের অন্যতম কেন্দ্রবিন্দু হয়ে উঠে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনার।

একুশের চেতনাকে নান্দনিকভাবে উপস্থাপন করার অংশ হিসেবে একুশের আলপনার প্রবর্তন বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের বিশেষ অবদান। ভাষা আন্দোলনের পর শহিদ মিনারে ও রাস্তায় আলপনা আঁকার প্রচলন কিছু মাত্রায় চালু হয়েছিল। কিন্তু ১৯৬৭/৬৮ সাল থেকে তা আরো নতুন মাত্রা পায় এবং ব্যাপকভাবে ছড়িয়ে পড়ে। সাধারণভাবে আলপনা ও ব্রত-পার্বণ হিন্দু সংস্কৃতির অংশ হিসেবে পরিগণিত হয়। কিন্তু এদেশের চারুশিল্পীরা একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে আলপনাকে বাংলা সংস্কৃতির উপাদান হিসেবে নতুন মাত্রা দিয়ে রাজপথে নিয়ে আসে। একুশের আলপনা এখন বিশেষ ধরনের আলপনা হিসেবে স্বীকৃত– যা বাঙালি সংস্কৃতির অসাম্প্রদায়িক চেতনার চিত্রিত রূপ হিসেবে সারা পৃথিবীতে পরিচিত ও সমাদৃত।

শহিদ মিনার এলাকায় বাঙালি সংস্কৃতি ও আন্দোলনের সপক্ষের বিভিন্ন বিষয়ভিত্তিক বড়ো বড়ো ছবি বা ব্যানার এঁকে তা টাঙিয়ে দিয়ে ব্যানার প্রদর্শনী শুরু হয় ষাটের দশকেই। ক্রমশ এ ব্যানার-প্রদর্শনী জনপ্রিয়তা এবং ব্যাপকতা লাভ করে। '৬৭-তে শুরু হলেও পরবর্তী বছরগুলোতে, অর্থাৎ ১৯৬৮ এবং ১৯৬৯ সালে তা আরো বড়ো আকারে আয়োজিত হয়। আন্দোলনের পক্ষে জনমত গঠনে ব্যানারগুলোর ভূমিকা অস্বীকার করা যায় না। কী ছিল এসব ব্যানারের ছবির বিষয়বস্তু? ভাস্কর সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদের ভাষ্য থেকে সে-সময়ের কিছু বিবরণ পাওয়া যায়:

> ... ঐ সময় প্রথম প্যানেল করার প্রয়াস পাই বাঙালি জাতিসত্তার উপর। বাঁশপাতার কাহিনী বলে একটা বড় ব্যানার করা হয়। ঐ ব্যানার অসাধারণ সুন্দর ছিল। অনেকগুলি অংশে এটা বিভক্ত ছিল। মা ও শিশু... হারিকেনের আলোয় পড়ছে। আকাশে চাঁদ। অ, আ, ক, খ পড়ছে। তারপর দেখা যায় ছেলেটা বড় হয়েছে। বাঁশের কঞ্চি দিয়ে লেখে। আরো একটু বড় হয়ে ছেলেটা স্কুলে যায়। আর অবসর সময়ে সে রাখালদের সঙ্গে গরু চরায় বা রাখালে বাঁশী শোনে। তারপর একসময় ছেলেটা মাট্রিক পাস করলো । বাবা ভাবলো তার সন্তান বড় হয়েছে। শহরে পাঠাবে লেখাপড়া করতে। সেই ছেলে শহরে এসে যখন দেখলো সে যে ভাষায় কথা বলে, লিখতে শিখেছে, সে ভাষায় কথা বলা যাবে না। তখন সে ভাষা আন্দোলনে সক্রিয়ভাবে অংশ নেয়। একসময় পুলিশের বাঁশের লাঠির আঘাতে সে মারা যায়। এই কাহিনীচিত্র সে সময় অসাধারণ ছিল (খালিদ, ২০০৫)।

ব্যানার-চিত্রের মধ্যে আরেকটি গুরুত্বপূর্ণ সিরিজ হলো 'দুঃখিনী বর্ণমালা' (মতান্তরে বিক্ষুব্ধ/বিদ্রোহী বর্ণমালা)। বাংলা বর্ণমালার বিভিন্ন অক্ষরকে কেন্দ্র করে প্রচলিত ছড়াকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন রাজনৈতিক বক্তব্য দর্শকের সামনে হাজির করা হয়েছিল চিত্রকলার মাধ্যমে। যেমন 'অ'-তে 'অজগর আসছে তেড়ে' এটা খুবই প্রচলিত শিশুতোষ বাক্য। এ শিশুতোষ বাক্যকে কাজে লাগিয়ে যে ছবি আঁকা হয়েছিল– তা কিন্তু পুরোপুরি রাজনৈতিক। ছবিতে দেখা যায়, বিশালাকৃতির এক অজগর– যেটা চালিয়ে বা বহন করে নিয়ে আসছে কয়েকজন পাকিস্তানি পোশাক পরা হিংস্র প্রকৃতির মানুষ। অজগরের হিংস্রতা থেকে এদের হিংস্রতাও

কম নয়। এই ছবিতে যে লেখা ব্যবহার করা হয়েছে তাও গুরুত্বপূর্ণ– 'দেশ স্বাধীন হলো। বিদেশিরা গেল চলে, কিন্তু স্বার্থন্বেষীর পোষা অজগর এলো, ধীর গতিতে লোভের জিভ বের করে'। ছবির বিষয়বস্তু ও বক্তব্য খুবই পরিষ্কার। এ ধরনের আরো অনেক ছবি আঁকা হয়েছিল এবং তা প্রদর্শিত হয়েছিল শহিদ মিনার চত্বরে। ঠিক কতগুলো ছবি আঁকা হয়েছিল, তা নির্দিষ্ট করে জানা না গেলেও সে সময়কার কিছু কাজের সাদাকালো আলোকচিত্র আমরা দেখেছি। প্রাসঙ্গিক বিবেচনায় সে ধরনের আরো কিছু কাজের বিবরণ দেওয়া হলো।

এ-তে 'এক্কা গাড়ি খুব ছুটেছে'– এই ছবিতে দেখা যায় আরেক চিত্র। মেকি সংস্কৃতি, খাজনা ইত্যাদির ভারে এক্কা গাড়ি ছুটতে তো পারছেই না, বরং এসব চাপিয়ে দেওয়া ভারে এক্কা গাড়ির ঘোড়ার জীবন সংকটাপন্ন। এ ছবির সঙ্গে যে লেখা যুক্ত করা হয়েছে তাও তাৎপর্যপূর্ণ– 'নতুন সড়কে চলতে হবে নতুন চেতনায়, কিন্তু আমাদের জীবন-শকট হাজার বোঝার ভারে এখন অচল'। আবার ঈ-তে 'ঈগল পাখি পাছে ধরে'– এই ছবিতে দেখা যায়, একটা বিশালাকৃতির ঈগল হিংস্র নখর মেলে আক্রমণ-উদ্যত। দুটি সাদা তির তার দিকে ছুটে যাচ্ছে। ছবিতে লেখা হয়েছে, 'সহস্র জনতা বারবার প্রতিহত করেছে সাম্রাজ্যবাদের অশুভ প্রচেষ্টা। কিন্তু ঈগলের রক্ত নখ উদ্যত প্রতিক্ষণে'। উ-তে 'উট চলেছে কোন মুলুকে'– এই ছবিতে দেখা যায়, বিস্তীর্ণ মরুভূমির উপর দিয়ে উট চলেছে। মাথার উপরে গনগনে সূর্য। দূরে মরীচিকার মতো দেখা যাচ্ছে কিছু চীনামাটির তৈজসপত্র। আর দরিদ্র, রুগ্‌ণ, ক্লান্ত একজন বাঙালিকে দেখা যায় কোনোরকমে উটের পিঠের উপর শুয়ে আছে। উটের চলাচলের উপর তার কোনো নিয়ন্ত্রণই নেই। এ ছবির সঙ্গে ব্যবহৃত লেখাটি ছিল এরকম: 'ঠিক মরীচিকার মতোই শত শত আশ্বাস আমাদের নিয়ে চলেছে কোন মুল্লুকে? মরূদ্যানের সন্ধান কি পাবো না এই মুল্লুকেই?'। ঋ-তে 'ঋষি মশাই বসে পূজায়'– এ ছবিটিও অসাধারণ। এতে দেখা যায়, একজন জটাধারী সাধু ধ্যানে বসে আছে। মানুষের হাড়, খুলি ইত্যাদির পাশাপাশি পিস্তল, রাইফেল নিয়ে সে ধ্যান করছে। এমনকি তার মাথার জটার ভেতরেও একটা পিস্তল গুজে রাখা। পাশে আগুন জ্বলছে। আর তাতে পুড়িয়ে ধ্বংস করা হচ্ছে 'গণতন্ত্র চাই', 'ভাত চাই' ইত্যাদি লেখা পোস্টার, ফেস্টুন। এ ছবির সঙ্গে লেখা ছিল– 'মৌনীবাবা কথা বলে না, কানে শোনে না। কিন্তু যখের মতো পাহারা দেয় পুঁজিপতির পুঁজি'। এসব ছবির বিবরণ থেকে আমাদের বুঝে নিতে অসুবিধা হয় না, তৎকালীন রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রাসঙ্গিক নানা চিত্র শিল্পীদের রং-তুলিতে চমৎকারভাবে ফুটে উঠেছে।

এসব ব্যানারচিত্র আঁকার কাজে যারা অংশ নিয়েছেন কিংবা সাংগঠনিক কাজে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছেন তাদের মধ্যে মোস্তফা মনোয়ার, ইমদাদ হোসেন, হাশেম খান, রফিকুন নবী, শাহাদাত চৌধুরী, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ, মঞ্জুরুল হাই, নাসির বিশ্বাস, প্রাণেশ মণ্ডল, প্রফুল্ল রায়, মতলুব আলী, আনোয়ার হোসেন, মহিউদ্দিন ফারুক, আবুল বারক আলভী, বীরেন সোম প্রমুখ গুরুত্বপূর্ণ। বলাই বাহুল্য, অংশগ্রহণকারী শিল্পীদের তালিকা আরো দীর্ঘ হবে। আর শিল্পীরা শুধু ছবি এঁকে নয়, আরো নানাভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছেন।

আরো কয়েকটি ব্যানারচিত্রের কথা উল্লেখ করা প্রয়োজন। যেমন, রশীদ চৌধুরীর আঁকা একটা ব্যানারে দেখা যায়, বাংলার মানুষসহ বাংলার বাঘ, কুমির, গরু, সাপ ইত্যাদি পশু-পাখি, এমনকি ফুল, লতা-পাতা এবং প্রজাপতি– সবাই একসঙ্গে বিদ্রোহ করেছে। বাংলার মানুষ ও প্রকৃতি যে বিদ্রোহ-উন্মুখ– তা এ ছবিতে দারুণভাবে ফুটে উঠেছে। আবার নাম না জানা কোনো এক শিল্পীর আঁকা একটি ব্যানার-চিত্রে দেখা যায়,

চারদিক থেকে এগিয়ে আসা বেয়নেটের আক্রমণের ভেতর দাঁড়িয়ে আছে একটি ব্যানার– 'শহীদ দিবস অমর হোক'। এভাবে দেখা যায়, '৬৯-এর গণ-আন্দোলনের সময় বাংলাদেশের শিল্পীরা আন্দোলনে শরিক হয়েছে বিভিন্নভাবে, তবে শিল্পী হিসেবে রং-তুলি হাতেই তারা অধিক সক্রিয় ছিলেন।

এসব ব্যানার ছাড়াও সেসময় বিভিন্ন দাবি বা বক্তব্য উপস্থিত করে অজস্র পোস্টার, ফেস্টুন বা প্ল্যাকার্ড আঁকা হয়েছিল। এগুলো সাধারণত কার্টুন বা ব্যঙ্গচিত্রসহযোগে করা হতো। সে সময়ের স্মৃতিচারণ করে বীরেন সোম লিখেছেন:

> উনসত্তরের সেই উত্তাল সময়টাতে ঢাকা আর্ট কলেজে জোর আন্দোলন চলছে। তখন কলেজের জিএস ছিল সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ। বৃহত্তর আন্দোলনের স্বার্থে তখন এগারো দফা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়ে গেলো আর্ট কলেজের ছাত্ররা। সেসময় ডাকসুর সভাপতি ছিলেন তোফায়েল আহমেদ। এই বৃহত্তরে আন্দোলনে আমাদের ভূমিকা কী হবে – সেটা নিয়ে প্রথম মিটিং হলো ইকবাল হলে, এখন যার নাম সার্জেন্ট জহুরুল হক হল। সেই মিটিংয়ে ছিলেন তোফায়েল আহমেদ, সাইফুদ্দিন আহমেদ মানিক, শাহজাহান সিরাজ, মঞ্জুরুল হাই, আবদুল্লাহ খালিদ, রেজাউল করিম, এবং আরো অনেকে। মিটিংয়ে নিজেদের কর্তব্য নিয়ে বিস্তারিত আলাপ আলোচনা হলো। এগারো দফার মধ্যে চারুশিল্পীদের কিছু দাবিও সংযোজিত হলো। মিটিংয়ে আমরা সিদ্ধান্ত নেই, আন্দোলনের জন্য পোস্টার, ব্যানার, ও ফেস্টুন তৈরি করবো। তখন কাজকর্ম নিয়ে নিয়মিত আমাদের সাথে যোগাযোগ রক্ষা করতেন আসাদুজ্জামান নূর (নাট্যব্যক্তিত্ব), তিনি তখন ডাকসুর সাংস্কৃতিক সম্পাদক। আরো যোগাযোগ রাখতেন মতিউর রহমান (সম্পাদক, প্রথম আলো), মফিদুল হক (ট্রাস্টি, মুক্তিযুদ্ধ জাদুঘর), আবুল হাসনাত (সম্পাদক, কালি ও কলম) প্রমুখ। আর্ট কলেজের হোস্টেলে আমরা তখন সারারাত জেগে পোস্টার আঁকি। আমাদের দায়িত্ব ছিলো রোজ এক রিম পোস্টার লেখা। মানে ৫০০টা পোস্টার। তখন আমরা যারা পোস্টার লিখতাম তাদের মধ্যে ছিলো শহীদ কবির, মঞ্জুরুল হাই, আবদুল্লাহ খালেদ, রেজাউল করিম, বিজয় সেন, অলক রায়, হাসি চক্রবর্তীসহ আর্ট কলেজের অনেক ছেলেমেয়ে (সোম, ২০১৫, পৃ. ১৬-১৮)।

কী ছিল সে-সব পোস্টার বা প্ল্যাকার্ডের বিষয়বস্তু? এ বিষয়ে খুব বেশি তথ্য আমাদের হাতে নেই। তবে যেসব আলোকচিত্রে সে-সময়কার কিছু কিছু পোস্টার বা ফেস্টুন দেখা যায়, তার কয়েকটা নিয়ে আলোচনা করলে কিছুটা ধারণা পাওয়া যেতে পারে। যেমন ১৯৬৮ সালের একটি মিছিলের আলোকচিত্রে দেখা যায় '২০ টাকা মন দরে চাউল চাই' দাবি জানিয়ে আঁকা প্ল্যাকার্ডে অনেকগুলি চাউলের বস্তার ছবি আঁকা হয়েছে। আর সে বস্তার উপর বসে আছে পেটমোটা একটা লোক– হয়তো চাউলের আড়তদার। আবার পাশের প্ল্যাকার্ডে 'স্বায়ত্তশাসন দিতে হবে'– এ দাবির সাথে আঁকা হয়েছে বিভিন্ন ধরনের কয়েকটি মুখ এবং তার উপরে একটা বিশালাকৃতি হাতুড়ি। যেন মুখগুলিকে হাতুড়ি দিয়ে আঘাত করা হচ্ছে। মুখগুলি পাকিস্তানের সাধারণ মানুষ এবং হাতুড়িটি এখানে সামরিক শাসনের প্রতীক হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। ১৯৬৮ সালের আরেকটি মিছিলের আলোকচিত্রে দেখা যায় পোস্টারে আঁকা হয়েছে ভিক্ষার থালা হাতে অপুষ্টিতে ভোগা নিরন্ন শিশুর ছবি। নিচে লেখা 'বুলেট না খাবার দে'। পাশের পোস্টারে বন্ধন ছিন্নরত প্রতিবাদী মানুষের ছবি আঁকা হয়েছে। এছাড়াও বিভিন্ন রকমের বক্তব্য-সমৃদ্ধ পোস্টার বা প্ল্যাকার্ডে প্রাসঙ্গিক ছবি বা ব্যঙ্গচিত্র আঁকা হয়েছে ষাটের দশকের বিভিন্ন আন্দোলনে।

উনসত্তরের ফেব্রুয়ারিতে কামরুল হাসান বাংলা একাডেমিতে প্রথম 'অক্ষরবৃক্ষ' উদ্‌বোধন করেন। এ ধরনের শিল্পকর্ম নির্মাণের উদ্যোগ সে-কালের পরিপ্রেক্ষিতে অত্যন্ত অভিনব ও অসাধারণ ছিল। বাংলাদেশের চারুকলার ইতিহাসে স্থাপনাশিল্প বা ইনস্টলেশন আর্টের অন্যতম আদি উদাহরণ হিসেবে এ কাজটি বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। স্থাপনাশিল্প ছাড়াও কামরুল হাসানের করা বাংলা অক্ষর দিয়ে শাড়ির নকশা উনসত্তরে অসাধারণ জনপ্রিয়তা অর্জন করেছিল– যার রেশ এখনো বাংলাদেশের সমকালীন ফ্যাশনে দেখা যায়। এসময় কামরুল হাসান নিজের উদ্যোগে প্রচুর পোস্টার এঁকেছেন বলে জানা যায় (হক, ১৯৯৮, পৃ. ৯১-৯৪)। উনসত্তরেই তিনি আঁকতে শুরু করেন ইয়াহিয়া খানের প্রতিকৃতি, যা আরো পরে পোস্টার হিসেবে ছাপা হয়েছে এবং বাংলাদেশের স্বাধীনতা-আন্দোলনে বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১৯৪)।

মুক্তিযুদ্ধঃ ১৯৭১

ভাষা আন্দোলন ও একুশের চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে আন্দোলনের সংস্কৃতি চারুকলা ইনস্টিটিউটে গড়ে উঠেছিল পঞ্চাশ ও ষাটের দশকেই। ফলে সত্তরের দশকের শুরুতেই চারুশিল্পীরা আরো সক্রিয় হয়ে ওঠে এবং জাতীয় মুক্তি-সংগ্রামে গভীরভাবে যুক্ত হয়ে যায়। ১৯৭০ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে শিল্পাচার্য জয়নুল আবেদিনের নেতৃত্বে ঢাকার বাঙালি শিল্পীদের নিয়ে 'নবান্ন' শীর্ষক বিরাট প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়। এ উপলক্ষ্যে জয়নুল আবেদিন 'নবান্ন' শীর্ষক ৬৫ ফুট দীর্ঘ একটি স্ক্রল পেইন্টিং আঁকেন। আবহমান বাংলার কৃষিভিত্তিক সমৃদ্ধ গ্রামীণ জীবনের আনন্দ-বেদনার কাব্য ফুটিয়ে তুলেছিলেন তিনি এই শিল্পকর্মে। ১৯৭০ সালের এপ্রিল মাসে 'কালবৈশাখী' শীর্ষক আরেকটি প্রদর্শনীর আয়োজন করেছিল এদেশের শিল্পীরা। দুটি প্রদর্শনীই অনুষ্ঠিত হয়েছিল পাকিস্তান আর্ট কাউন্সিলের (বর্তমানে শিল্পকলা একাডেমি) গ্যালারিতে।

১৯৭০ সালের নভেম্বর মাসে বাংলাদেশের উপকূলীয় অঞ্চলে সামুদ্রিক ঝড় ও জলোচ্ছ্বাসে কয়েক লক্ষ মানুষের প্রাণহানি ও ব্যাপক ক্ষয়ক্ষতি ঘটে। জয়নুল আবেদিন দুর্গত এলাকা ঘুরে এসে বেশ কিছু স্কেচ আঁকেন এবং পরবর্তীকালে (১৯৭২-৭৩) 'মনপুরা ৭০' শীর্ষক ৩০ ফুট দীর্ঘ স্ক্রল চিত্র আঁকেন। প্রাকৃতিক দুর্যোগে বিপর্যস্ত পূর্ব-বাংলায় পাকিস্তান সরকার ত্রাণ-ব্যবস্থাপনা ও দুর্যোগ প্রতিরোধে চরম ব্যর্থতার পরিচয় দেয়। এ দুর্যোগের পরের মাসে অর্থাৎ ১৯৭০ সালের ডিসেম্বর মাসে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয় এবং আওয়ামী লীগ সমগ্র পাকিস্তানে মোট ১৬০টি আসনে জয়লাভ করে নিরঙ্কুশ সংখ্যাগরিষ্ঠতা অর্জন করে। কিন্তু পাকিস্তান সরকার নানা কূটকৌশল অবলম্বন করে ক্ষমতা হস্তান্তরে বিলম্ব ঘটায়। অবশেষে ১৯৭১ সালের ১লা মার্চ প্রেসিডেন্ট ইয়াহিয়া খান জাতীয় পরিষদ অধিবেশন অনির্দিষ্টকালের জন্য বন্ধ ঘোষণা করেন। এই ঘোষণার পর ঢাকাসহ সারা দেশ উত্তাল হয়ে উঠে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'স্বাধীন বাংলা ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' স্বাধীন বাংলাদেশের নতুন পতাকা উত্তোলন করে। গাওয়া হয় 'আমার সোনার বাংলা আমি তোমায় ভালোবাসি' গানটি । অবশেষে ৭ই মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ঐতিহাসিক ভাষণ প্রদান করেন। তিনি বলেন 'তোমাদের যা-কিছু আছে, তা-ই নিয়ে প্রস্তুত থাক। রক্ত যখন দিয়েছি রক্ত আরো দেব। এদেশের মানুষকে মুক্ত করে ছাড়ব ইনশাল্লাহ্। এবারের সংগ্রাম আমাদের মুক্তির সংগ্রাম– এবারের সংগ্রাম আমাদের স্বাধীনতার সংগ্রাম'।

বঙ্গবন্ধুর এই ঐতিহাসিক ভাষণ বাঙালির মনে স্বাধীনতার নতুন দীপশিখা জ্বালিয়ে দেয়। এদেশের শিল্পীসমাজও তাতে প্রবলভাবে যুক্ত হয়ে পড়ে। ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে গঠিত হয়েছিল 'বাংলা চারু ও কারুশিল্পী সংগ্রাম পরিষদ'। এর যুগ্ম আহবায়ক ছিলেন শিল্পী কাইয়ুম চৌধুরী ও মুর্তজা বশীর। ১৯৭১

সালের মার্চ মাসে এ পরিষদের ব্যানারে কেন্দ্রীয় শহিদ মিনারে একটি সমাবেশ ও মিছিলের আয়োজন হয়। সমাবেশে জয়নুল আবেদিন ও মুর্তজা বশীর বক্তৃতা করেন। জয়নুল আবেদিন বলেন, ''এবারকার এই গণজাগরণে আমরা বাংলাদেশের সত্যিকারের চেহারা দেখতে পেয়েছি। দেখেছি কিভাবে দেশের সবুজ মাঠ আমার ভাইয়ের রক্তে লাল হয়ে উঠেছে''। তিনি আরো বলেন, ''শিল্পীর তুলি অত্যাচারীর বন্দুকের চাইতে বেশী শক্তিশালী'' (*পূর্বদেশ*, ১৫ মার্চ, ১৯৭১)। মুর্তজা বশীর বলেন, "জনগণের এই মুক্তি-সংগ্রামের সময় কেউ ঘরে বসে থাকতে পারে না।... এই অবস্থায় শিল্পীরা কেবল ঘরে বসে ছবি আঁকলে চলবে না, দেশের এই মুক্তি-সংগ্রামের সাথে শিল্পীদের একাত্ম হওয়ার আহ্বান জানিয়ে তিনি বলেন, শিল্পীরা জনগণেরই লোক" (*পূর্বদেশ*, ১৫ মার্চ, ১৯৭১)।

সমাবেশ শেষে কার্টুন, ফেস্টুন, পোস্টার দিয়ে সাজানো একটি মিছিল বের হয় এবং শেষ হয় বাহাদুর শাহ পার্কে। এই মিছিলের সামনে চারজন ছাত্রী 'স্বাধীনতা' শব্দটি লিখে বহন করেছিল– যা ছিল অভূতপূর্ব ঘটনা। এছাড়াও বিভিন্ন ব্যঙ্গচিত্র ও প্লাকার্ডে 'হবু চন্দ্র আর গবু চন্দ্র', 'শোষণমুক্ত বাংলা দেশ কায়েম কর', 'আমার দেশের ফসল নিয়েছ তুমি, আমাকে দিয়েছ সমূহ সর্বনাশ, তোমার ওখানে মরুতে ফসল এলো, শুধু অনাহারে কেটেছে আমার দিন' ইত্যাদি স্থান পেয়েছিল (*পূর্বদেশ*, ১৫ মার্চ, ১৯৭১)। মিছিলের নেতৃত্ব দেন জয়নুল আবেদিন। ছিলেন মুর্তজা বশীর, শফিউদ্দিন আহমদ, কাইয়ুম চৌধুরী, আমিনুল ইসলাম, কবি শামসুর রাহমান প্রমুখ শিল্পী ও গুরুত্বপূর্ণ ব্যক্তিবর্গ। এছাড়া, ১৯৭১ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে মওলানা ভাসানীর অনুরোধে জয়নুল ময়মনসিংহের এক জনসভায় যোগ দেন এবং বক্তৃতা করেন। এই সভায় তিনি পাকিস্তান সরকারের দেওয়া 'হেলাল-ই-ইমতিয়াজ' উপাধি বর্জন করেন (হক, ২০১৫, পৃ. ১৫১)।

এদিকে চট্টগ্রামে ১৯৭১ সালের মার্চ মাসে শিল্পী-সাহিত্যিক-সংস্কৃতিসেবী প্রতিরোধ সংঘ কর্তৃক 'বাঙলায় বিদ্রোহ' শীর্ষক ছাপাই ছবির ফোলিও প্রকাশ করা হয়। শিল্পী রশীদ চৌধুরীর নেতৃত্বে মোট ছয়জন শিল্পী বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রামকে উপজীব্য করে শিল্পকর্ম তৈরি করেন। এরা হলেন: দেবদাস চক্রবর্তী, সবিহ উল আলম, আনসার আলী, মিজানুর রহিম, সৈয়দ আবদুল্লাহ খালিদ এবং রশীদ চৌধুরী। ছাপাই প্লেটের উপর সরাসরি এঁকে তাৎক্ষণিকভাবে ছাপা হয়েছিল ছবিগুলো। মাহমুদ শাহ্ কোরেশী ফোলিওতে এ উদ্যোগ সম্পর্কে লেখেন:

> বাঙলায় আজ বিদ্রোহ। হাজার বছরের ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়: বাঙলা যুগে যুগে বিদ্রোহ করেছে– অনাচার, অবিচার আর অনুশাসনের বিরুদ্ধে। জনগণের কল্যাণ কামনায়, জনমানসের মুক্তির জন্যে বাঙালির সংগ্রাম বিরামহীন। ... আজকের বিদ্রোহ আমাদের আগামীদিনের বিপ্লবেরই পূর্বাভাস। বাঙলা দেশের প্রতিটি মানুষ আজ সার্বিক মুক্তির চেতনায় উদ্বুদ্ধ। সে চেতনাকে সমাজের সর্বস্তরে ছড়িয়ে দিতে, সে সংগ্রামে পূর্ণ অংশগ্রহণে সংকল্পবদ্ধ দেশের শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী সমাজ।

বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম বিষয়ে এদেশের শিল্পী সমাজের মনোভাব সহজ-সরল ও স্পষ্টভাবে প্রকাশিত হয়েছে এই বয়ানে।

আমরা সবাই জানি, ১৯৭১ সালের ২৫শে মার্চে বাঙালি জাতির স্বাধীনতার আন্দোলনকে ধ্বংস করার জন্য, বাঙালি জাতিকে স্তব্ধ করে দেবার জন্য সামরিকবাহিনী নৃশংস অভিযান চালায় নিরস্ত্র সাধারণ মানুষের উপর। এই কালরাত্রির পর আলোচনার সব পথ বন্ধ হয়ে যায় এবং চূড়ান্ত সংঘাত অনিবার্য হয়ে ওঠে এবং শুরু হয় মুক্তির জন্য সশস্ত্র সংগ্রাম– যা মুক্তিযুদ্ধ নামে পরিচিত। স্বাধীনতার জন্য বাঙালির নয়মাস-ব্যাপী এই

মুক্তিযুদ্ধে চারুশিল্পীরা অনেকে সরাসরি রাইফেল হাতে অংশগ্রহণ করেছে। যেমন, শিল্পী শাহাবুদ্দিন, শাহাদাত চৌধুরী, বনিজুল হক, জি এম এ রাজ্জাক এবং আরো অনেকে। অনেকে গোপনে গেরিলাদের সাহায্য করেছেন (যেমন, শিল্পী রফিকুন নবী, শিল্পী আবুল বারক আলভী প্রমুখ) ২৬শে মার্চ পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর হাতে নির্মমভাবে শহিদ হয়েছিলেন আর্ট কলেজের ছাত্র শাহনেওয়াজ, আহত হয়েছিলেন কার্টুনিস্ট ও শিল্পী নজরুল ইসলাম (ইসলাম, ২০২২, পৃ. ১৫)। নিশ্চিতভাবেই এ তালিকা আরো দীর্ঘ হতে পারে। কারো নাম বাদ পড়ে যেতে পারে এ আশঙ্কায় নামের তালিকা দেওয়া থেকে বিরত থাকছি।

প্রবাসী সরকারের আর্ট ও ডিজাইন বিভাগ

১৯৭১ সালের ১৭ই এপ্রিল মেহেরপুরের মুজিবনগরে সৈয়দ নজরুল ইসলামকে অস্থায়ী রাষ্ট্রপতি ও তাজউদ্দীন আহমেদকে প্রধানমন্ত্রী করে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার গঠন করা হয়, যার নেতৃত্বে পরবর্তীকালে মুক্তিযুদ্ধ পরিচালিত হতে থাকে। দলে দলে লোক পশ্চিমবঙ্গ, ত্রিপুরা প্রভৃতি বাংলাদেশের বর্ডার-সংলগ্ন অঞ্চলে আশ্রয় নিতে থাকে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধকালে শরণার্থী শিল্পী-সাহিত্যিকদের নিয়ে 'বাংলাদেশ বুদ্ধিজীবী মুক্তিসংগ্রাম পরিষদ' (বাংলাদেশ লিবারেশন কাউন্সিল অফ ইনটেলিজেনশিয়া) তৈরি হয়েছিল। সে পরিষদের সভাপতি ছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১০১)। তবে সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ছিল এপ্রিল মাসে মুজিবনগর সরকার গঠিত হলে প্রবাসী সরকারের তথ্য ও বেতার মন্ত্রণালয়ের অধীনে তৈরি হওয়া 'আর্ট ও ডিজাইন বিভাগ'। এ বিভাগের পরিচালকের দায়িত্ব পালন করেছিলেন শিল্পী কামরুল হাসান। আরো যুক্ত ছিলেন শিল্পী নিতুন কুণ্ডু, দেবদাস চক্রবর্তী, নাসির বিশ্বাস, প্রাণেশ মণ্ডল, বীরেন সোম প্রমুখ (হাসান, ১৯৯৮, পৃ. ১০০)। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে অসাধারণ সব পোস্টার তৈরির কৃতিত্ব মূলত এসব শিল্পীর। কামরুল হাসানের বিখ্যাত পোস্টার 'এই জানোয়ারদের হত্যা করতে হবে' এ সময়েই করা। শাহরিয়ার কবিরের ভাষায়, 'পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর প্রধান জেনারেল ইয়াহিয়া খানের দানবসদৃশ প্রতিকৃতি-সম্বলিত পোস্টারটি আঁকার ভেতর শিল্পীর রূপকল্পনার গভীরতা ছিল, কলম ও তুলির দক্ষ আঁচড় ছিল, কিন্তু সবচেয়ে বড়ো ছিল শত্রুর প্রতি তার গভীরতম ঘৃণা ও ক্রোধ, যা তিনি প্রতিটি দর্শকের ভেতর সঞ্চার করতে পেরেছিলেন। ... এ যাবতকালে যুদ্ধের যত পোস্টার আমরা দেখেছি, এতটা ঘৃণাসঞ্চারী এবং ক্রোধ উদ্রেককারী দ্বিতীয়টি দেখিনি' (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১০০)। আরো অনেক পোস্টারের মাধ্যমে এদেশের চিত্রশিল্পীরা মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে প্রচারণায় বিশেষ ভূমিকা পালন করেছে।

এ সময় করা মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক আরো পোস্টারের মধ্যে রয়েছে 'বাংলার হিন্দু, বাংলার খৃষ্টান, বাংলার বৌদ্ধ, বাংলার মুসলমান– আমরা সবাই বাঙালী', 'সদাজাগ্রত বাংলার মুক্তিবাহিনী', 'বাংলার মায়েরা, মেয়েরা সকলেই মুক্তিযোদ্ধা', 'একেকটি বাংলা অক্ষর অ আ ক খ একেকটি বাঙালীর জীবন', 'বাংলাদেশের সম্পদ বৃদ্ধি করুন পাকিস্তানী পণ্য বর্জন করুন', 'বাংলাদেশের কৃষক শ্রমিক ছাত্র যুবক সকলেই আজ মুক্তিযোদ্ধা', 'এবারের সংগ্রাম স্বাধীনতার সংগ্রাম', 'রক্ত যখন দিয়েছি আরও রক্ত দেবো' প্রভৃতি।

কামরুল হাসানের নেতৃত্বে যৌথভাবে শিল্পীরা এ কাজগুলো করতো। পোস্টারগুলোর মধ্যে যাদের ড্রয়িং ভালো তারা ড্রইংয়ের কাজ করতো, আর যাদের লেটারিং ভালো তারা লেটারিংয়ের কাজ করতো (সোম, ২০১৫, পৃ. ২৩)। এখান থেকে মুক্তিযুদ্ধের জন্য প্রয়োজনীয় মনোগ্রাম, পোস্টার, কার্টুন, লিফলেট, ব্যানার-ডিজাইন ইত্যাদিও করা হতো (সোম, ২০১৫, পৃ. ২২)।

১৯৭১ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতার বিড়লা একাডেমিতে বাংলাদেশি শিল্পীদের এক যৌথ প্রদর্শনীর আয়োজন করা হয়েছিল। এ প্রদর্শনী আয়োজনে কামরুল হাসানের ভূমিকা ছিল প্রধান (হক, ১৯৯৮, পৃ. ১০১)। বীরেন সোম জানিয়েছেন:

> ১৩ই সেপ্টেম্বর ১৯৭১ বিড়লা একাডেমিতে এই প্রদর্শনী উদ্বোধন করেন প্রখ্যাত ভাস্কর শ্রীদেবীপ্রসাদ রায়চৌধুরী।... প্রদর্শনীতে শিল্পী কামরুল হাসান, মুস্তাফা মনোয়ার, দেবদাস চক্রবর্তী, নিতুন কুণ্ডু, প্রাণেশ মণ্ডল, নাসির বিশ্বাস, বীরেন সোম, রণজিৎ নিয়োগী, আবুল বারক আলভী (ক্যাটালগে তার নাম ছাপা হয়েছিল কিন্তু তিনি শিল্পকর্ম জমা দিতে পারেননি। প্রদর্শনীর আগেই তিনি পাক হানাদার বাহিনীর হাতে ধরা পড়েন এবং জুলুম-নির্যাতনের শিকার হন), গোলাম মাহাম্মদ, স্বপন চৌধুরী, কাজী গিয়াসউদ্দিন, চন্দ্রশেখর দে, হাসি চক্রবর্তী, বিজয় সেন, বরুণ মজুমদারসহ ১৭ জন শিল্পীর ৬৬টি ছবি স্থান পেয়েছিল। ছবিগুলো তেলরং, জলরং, কালি-কলম মিশ্র মাধ্যমে আঁকা হয়েছিল (সোম, ২০১৫, পৃ. ৬৬)।

কলকাতায় সন্‌জীদা খাতুন ও ওয়াহিদুল হকের নেতৃত্বে যে গানের দল তৈরি হয়েছিল, তাতে যুক্ত ছিলেন শিল্পী মোস্তফা মনোয়ার, গোলাম মওলা, বীরেন সোম, স্বপন চৌধুরী প্রমুখ। এ গানের দল ভারতের বিভিন্ন স্থানে এবং মুক্তিযোদ্ধাদের ক্যাম্পে গান পরিবেশন করতো। এর উদ্দেশ্য ছিল ভারতীয় জনগণের মধ্যে মুক্তিযুদ্ধের স্বপক্ষে সহানুভূতি ও সহমর্মিতার উদ্রেগ করা এবং মুক্তিযোদ্ধাদের মনোবল অটুট রাখা। চিত্রশিল্পীদের কাজ ছিল সেট ডিজাইন ও ব্যাকসিন আঁকা। মোস্তফা মনোয়ারের নির্দেশনায় বীরেন সোম ও গোলাম মওলা এসব সেট ডিজাইন করতেন (সোম, ২০১৫, পৃ. ২১)। মোস্তফা মনোয়ারের অন্য আরেকটি উদ্যোগ হলো পাপেট-শো। শরণার্থী শিবিরগুলোতে বিমর্ষতা কাটিয়ে কিছুটা স্বস্তি ও আনন্দ দিতে তিনি পাপেট-শো করতেন। এছাড়াও তিনি ১৯৭১ সালে শারদীয় *দেশ* পত্রিকায় অলংকরণ করেছিলেন বলে জানা যায়।

প্রবাসী বাংলাদেশি শিল্পীদের মধ্যে লন্ডনে শিল্পী এ কে এম আবদুর রউফের কর্মকাণ্ড বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। তিনি ১৯৭১ সালে স্বাধীনতা আন্দোলনের পক্ষে লন্ডনে অনুষ্ঠিত বিভিন্ন সমাবেশ ও শোভাযাত্রার জন্য ব্যানার, পোস্টার, প্ল্যাকার্ড ইত্যাদি তৈরি করে দিতেন এবং সক্রিয়ভাবে আন্দোলনে অংশ নিয়েছিলেন। *বাংলাদেশ সংবাদ পরিক্রমা* নামে একটি পত্রিকা তিনি হাতে লিখে প্রকাশ করতেন। মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বিভিন্ন তথ্যপূর্ণ সংবাদ সচিত্র ছাপা হতো এ পত্রিকায় (রউফ, ২০১১, পৃ. ১৪-২৭)।

শেষকথা

বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ একদিনে হঠাৎ করে ঘটেনি– বরং এর নিজস্ব ক্রমবিবর্তনের ইতিহাস আছে। ১৯৪৭-এর দেশভাগ থেকে শুরু করে ভাষার প্রশ্নে প্রথম বিরোধিতা এবং ক্রমশ বাঙালি জাতীয়তাবাদের উদ্ভব ও বিকাশ স্বাধীনতা আন্দোলনকে ত্বরান্বিত ও বেগবান করেছে। আমরা লক্ষ করি, দেশভাগের প্রত্যক্ষ ফল হিসেবে ঢাকায় যে চারুশিক্ষা প্রতিষ্ঠান গড়ে উঠেছে, তা ক্রমশ এই বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনের সাথে জড়িয়ে গেছে এবং একে অপরকে উজ্জীবিত করছে, সহযোগিতা করছে। কিংবা ব্যাপারটাকে এভাবেও বলা যায়, বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও বাংলাদেশের আধুনিক চিত্রকলা পাশাপাশি হাত ধরাধরি করে চলেছে। এ দুইয়ের মাঝে অবিচ্ছেদ্য সম্পর্ক বিদ্যমান।

বাংলাদেশের চারুশিল্পী সমাজ ভাষা আন্দোলন থেকে শুরু করে মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত সবসময়ই একুশের চেতনায় উজ্জীবিত হয়ে বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির পক্ষে সবসময়ই সোচ্চার ও সক্রিয় ছিল। একটি পেশাজীবী সম্প্রদায় হিসেবে চারুশিল্পীরা ১৯৫২'র ভাষা আন্দোলন থেকে ১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ পর্যন্ত বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামে যে ভূমিকা পালন করেছে, তা বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ। বিশেষ করে শহিদ মিনার এবং একুশের আলপনা– চারুশিল্পীদের এ দুটি অবদান অসাধারণ ও অনন্য। ক্রমশ এ দুটি হয়ে উঠেছে বাঙালি জাতি ও সংস্কৃতির পরিচয় বহনকারী মূল্যবান স্মারক। আমরা বলতে পারি, বাঙালি জাতি যতদিন থাকবে ততদিন একুশের চেতনা অমলিন থাকবে। একই সাথে শহিদ মিনার ও একুশের আলপনাসহ বাংলাদেশের স্বাধীনতা আন্দোলনে চারুশিল্পীদের অবদান ও ভূমিকা ইতিহাসে গুরুত্বের সাথে উল্লিখিত হবে।

তথ্যসূত্র

আকন্দ, শাওন (২০০৯)। 'ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধীনতা সংগ্রাম: বাংলাদেশের চারুশিল্পীদের ভূমিকা'। *শিল্পরূপ*। নীলিমা আফরিন (সম্পা.)। তৃতীয় বর্ষ, প্রথম সংখ্যা, ঢাকা।

আজিম, মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান (২০১৩)। *বাংলাদেশের রাজনৈতিক ঘটনাপঞ্জি ১৯৭১-২০১১*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

আহমদ, সাঈদ (সম্পা.) [১৯৯৭]। *হামিদুর রাহমান*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমি।

ইসলাম, আমিনুল (২০০৩)। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলনের পঞ্চাশ বছর, প্রথম পর্ব-১৯৪৭-১৯৫৬*। ঢাকা: বাংলাদেশ শিল্পকলা একাডেমী।

ইসলাম, নজরুল (২০২২, মার্চ)। 'শরীর-ভেদী বুলেট'। *ঈক্ষণ*, সমাজ ও সাহিত্য বিষয়ক পত্রিকা, বর্ষ ৩৫, সংখ্যা ৩।

ইসলাম, সিরাজুল (সম্পা.) [২০০৭]। *বাংলাদেশের ইতিহাস ১৭০৪-১৯৭১*, ১ম, ২য় ও ৩য় খণ্ড। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

ইসলাম, রফিকুল (২০০৬)। *বাংলা ভাষা, সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন*। ঢাকা: সেড।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৪)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল* (১ম খণ্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৫)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ: কতিপয় দলিল* (২য় খণ্ড)। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

খাতুন, সন্‌জীদা (২০১৭)। 'ছায়ানট'। আবুল হাসনাত [সম্পা.]। *আলোকের ঝরণাতলায়*। ঢাকা।

খালিদ, সৈয়দ আবদুল্লাহ (২০০৫, ২৫শে মার্চ)। *সাপ্তাহিক ২০০০*, শাহাদাত চৌধুরী (সম্পা.), বর্ষ ৭ সংখ্যা ১৪।

গুপ্ত, কিরণশঙ্কর সেন ও করিম, সরদার ফজলুল (১৯৯৪)। *চল্লিশের দশকে ঢাকা*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

ফয়েজুল (২০০০)। *বাংলাদেশের শিল্পকলার আদিপর্ব ও ঔপনিবেশিক প্রভাব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

বশীর, মুর্তজা (২০০১)। *মুর্তজা বশীর: মূর্ত ও বিমূর্ত*। চট্টগ্রাম: পূর্বা।

মকসুদ, সৈয়দ আবুল (২০১৭)। *কাগমারী সম্মেলন*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

মামুন, মুনতাসীর ও খান, হাশেম (সম্পা.), [২০০৭]। *ঢাকা ১৯৪৮-১৯৭১ আলোকচিত্রের সংকলন*। ঢাকা: মওলা ব্রাদার্স।

মুকুল, এম আর আখতার (১৩৯১)। *পঞ্চাশ দশকে আমরা ও ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: সাগর পাবলিশার্স।

রউফ, শাহানারা (২০১১)। 'মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ. কে.এম. আব্দুর রউফ: এক বহুমাত্রিক জীবনের প্রতিচ্ছবি'। *মুক্তিযোদ্ধা শিল্পী এ কে.এম. আব্দুর রউফ স্মারক গ্রন্থ*। কামরুন নাহার [সম্পা.]। ঢাকা: বাংলাদেশ ফিল্ম আর্কাইভ।

রহমান, হাসান হাফিজুর (সম্পা.) [১৯৫৩]। *একুশে ফেব্রুয়ারী*। ঢাকা: পুথিপত্র প্রকাশনী।

রেজা, সি এম তারেক (২০০৪)। *একুশে ভাষা আন্দোলনের সচিত্র ইতিহাস (১৯৪৭-১৯৫৬)*। ঢাকা: নিমফিয়া পাবলিকেশনস।

সোম, বীরেন (২০১৫)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রামে শিল্পীসমাজ*। ঢাকা: চন্দ্রাবতী একাডেমি।

স্বপন, সিদ্দিকুর রহমান (২০০৮)। *বাংলাদেশের গণ-আন্দোলনে স্লোগান, প্ল্যাকার্ড ও পোস্টার*। ঢাকা: বাংলাদেশ চর্চা।

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০১৫)। *জয়নুল আবেদিন*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশনা।

হক, সৈয়দ আজিজুল (১৯৯৮)। *কামরুল হাসান: জীবন ও কর্ম*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

হক, সৈয়দ আজিজুল (২০০৭)। 'কামরুল হাসান', *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮ : চারু ও কারুকলা*। লালা রুখ সেলিম [সম্পা.]। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

হাসনাত, আবুল ও মামুন, মুনতাসীর (সম্পা.)। *ঢাকা ১৯৭১* (১৯৮৮)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হাসান, কামরুল (২০১০)। *বাংলাদেশের শিল্প আন্দোলন ও আমার কথা*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

হোসেন, আনোয়ার (১৯৯৮)। 'গণতান্ত্রিক আন্দোলনে শিল্পী ও শিল্পকলার ভূমিকা ও আর্ট কলেজ আন্দোলন'। *রূপবন্ধ*, মতলুব আলী (সম্পা.)। ঢাকা: মানব প্রকাশ।

হোসেন, মাহমুদুল (২০০৭)। 'ব্যঙ্গচিত্র', *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৮: চারু ও কারুকলা*। লালা রুখ সেলিম [সম্পা.]। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

৮০তম জন্মবার্ষিকী উপলক্ষে প্রকাশিত পুস্তিকা। *৮০ বছরে জীবন শিল্পী ইমদাদ হোসেন*। ঢাকা ২০০৫।

পত্রিকা

কবির, শাহরিয়ার (২০১৩, ১৯শে জানুয়ারি)। *প্রথম আলো*।

পূর্বদেশ, ১৫ই মার্চ ১৯৭১।

দৈনিক আজাদ, ১৬ই আগস্ট, ১৯৫৫।

সাক্ষাৎকার

ইসলাম, আমিনুল (২০০৯, ১লা ফেব্রুয়ারি)। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী : শাওন আকন্দ।

খান, হাশেম (২০০৯, ১৪ই মে)। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: শাওন আকন্দ।

নবী, রফিকুন (২০০৯, ২৬শে মে)। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: শাওন আকন্দ।

মনোয়ার, মোস্তফা (২০০৯, ৪ঠা মে)। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: শাওন আকন্দ।

হোসেন, ইমদাদ (২০০৯, ৩রা ফেব্রুয়ারি)। ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: শাওন আকন্দ।

চট্টগ্রামের সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন (১৯৪৮-১৯৫২)

ফারহানা আজিজ

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookFarhana

ভূমিকা

১৯৪৭ সালে ভারত-বিভক্তির পর ভাষা বিষয়ে আন্দোলন শুরু হলেও ভাষা বিতর্কের সূচনা অনেক আগে থেকেই হয়েছিল। প্রথম দিকে ভাষা প্রশ্নটি সাহিত্য সংস্কৃতি অঙ্গনে সীমাবদ্ধ থাকলেও পরবর্তী সময়ে এটি জাতীয় রাজনীতির অন্যতম মূল বিষয় হয়ে উঠে। ১৯৪৭ সালের ১৮ই মে, নিখিল ভারত মুসলিম লীগের প্রভাবশালী নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান (১৮৮৯-১৯৭৩) হায়দ্রাবাদ শহরে উর্দু ভাষা পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে বলে ঘোষণা করে ভাষা বিতর্কের সূচনা করেন। এছাড়া পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর নানা ঘটনাপ্রবাহে এটা পরিষ্কার হয় যে, সরকারের লক্ষ্যও উর্দু ভাষাকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করা। ফলে পূর্ব-বাংলায় ক্রমশ প্রতিবাদ শুরু হয়। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাস থেকে বাঙালি লেখক ও সাংবাদিকগণ ভাষার বিষয়ে জোর তৎপরতা শুরু করেন। *দৈনিক ইত্তেহাদ* পত্রিকায় ভাষার স্বপক্ষে পরপর কয়েকটি প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। সাংবাদিক আব্দুল হকের 'বাংলাভাষা বিষয়ক প্রস্তাব' শীর্ষক দীর্ঘ একটি প্রবন্ধ ২২ ও ২৯শে জুলাই দুই খণ্ডে *দৈনিক ইত্তেহাদ-এ* প্রকাশিত হয় (হক, ১৯৭৬, পৃ. ৪)। 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' এবং 'উর্দু রাষ্ট্রভাষা হলে' শীর্ষক উক্ত লেখকের আরো দুটি প্রবন্ধ যথাক্রমে ৩০শে জুন *দৈনিক আজাদ-এ* এবং ২৭শে জুলাই *দৈনিক ইত্তেহাদ-এ* প্রকাশিত হয়। প্রবন্ধগুলিতে লেখক বাঙালি সমাজে ইংরেজি, উর্দু ও হিন্দির প্রতি পক্ষপাত এবং বাংলা ভাষার প্রতি উদাসীনতার সমালোচনা করেন। এছাড়া, লেখক বাংলাভাষা ও সাহিত্য উর্দু ভাষার চাইতে অধিকতর উন্নত এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে বাঙালিরা উর্দুভাষীর চেয়ে সংখ্যাগরিষ্ঠ এরূপ যুক্তি প্রদর্শন করেন (*দৈনিক ইত্তেহাদ*, ২৭শে জুলাই, ১৯৪৭)।

সংবাদপত্রে প্রকাশিত উপরিউক্ত প্রবন্ধসমূহ নিঃসন্দেহে রাষ্ট্রভাষা দাবির পক্ষে অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করেছিল। তবে এ-সময় সবচেয়ে বেশি আলোড়ন সৃষ্টি করে ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্‌র (১৮৮৫-১৯৬৯) ভাষাভিত্তিক মন্তব্য। 'আমাদের ভাষা সমস্যা' এবং 'পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা সমস্যা' প্রবন্ধে বাংলাভাষা দাবির পক্ষে তিনি যে বৈজ্ঞানিক যুক্তিসমূহ উপস্থাপন করেন, তা ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের অনুপ্রাণিত করে (*দৈনিক আজাদ*, ২৯শে জুলাই, ১৯৪৭)। ১৯৪৮ সালে সাহিত্যিক সৈয়দ মুজতবা আলী (১৯০৪-১৯৭৪) *চতুরঙ্গ* পত্রিকায় বাংলা ভাষার পক্ষে প্রকাশিত একটি প্রবন্ধে বলেন, "পূর্ব পাকিস্তানের ঘাড়ে যদি উর্দু চাপিয়ে দেয়া হয় তাহলে পূর্ব পাকিস্তানিরা একদিন বিদ্রোহ করে বিচ্ছিন্ন হয়ে যাবে এবং কার্যত হয়েছিলও তাই (আলী, ১৩৬৩ বঙ্গাব্দ, পৃ. ৭৮)।

এভাবে ভারত-বিভক্তির পূর্ব থেকেই উর্দু-বাংলা বিতর্ক মাথাচাড়া দিয়ে উঠে। পাকিস্তান সৃষ্টির পর থেকে বাংলা ভাষার প্রতি সরকারের বৈষম্যমূলক নীতি বিভিন্নভাবে কার্যকর করা হয়। যেমন- পাকিস্তানের মুদ্রা, পোস্টকার্ড, এনভেলাপ, মানিঅর্ডার ফরম, রেটিকেট, ছাপানো টাকায় ইংরেজি ও উর্দুর ব্যবহার, ১৯৪৮-

এর পাবলিক সার্ভিস কমিশন পরীক্ষা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া (মতিন, ২০০৫, পৃ. ২৩)। ভাষার দাবির প্রশ্নে তখন থেকে কিছু কিছু সংগঠন আত্মপ্রকাশ করে। ১৯৪৭ সালের জুলাই মাসে কামরুদ্দীন আহমদের (১৯১২-১৯৮২) উদ্যোগে *গণ আজাদী লীগ*, একই বছর আগস্ট মাসে *গণতান্ত্রিক যুবলীগ*, ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও ছাত্রদের উদ্যোগে *তমদ্দুন মজলিস* এবং ডিসেম্বরের প্রথম দিকে *রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ* গঠিত হয়। গণতান্ত্রিক যুবলীগ ১৯৪৭-এর ৭ই সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত সম্মেলনে এবং ১৫ই সেপ্টেম্বর *তমদ্দুন মজলিস* কর্তৃক প্রকাশিত "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা বাংলা না উর্দু" শীর্ষক পুস্তিকায় বাংলাকে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার বাহন ও আইন আদালতের ভাষা করার দাবি জানায় (রহমান, ২০০১, পৃ. ২২)।

১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি করাচিতে পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশন শুরু হয়। এ অধিবেশনে সরকারি ভাষার তালিকা থেকে বাংলাকে বাদ দেওয়া এবং লিয়াকত আলী খান ও খাজা নাজিমুদ্দিনের বিরূপ মন্তব্যের প্রতিবাদে *তমদ্দুন মজলিস* ও পূর্ব-পাকিস্তান মুসলিম ছাত্রলীগ ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ সমগ্র পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট আহ্বান করে। প্রথম থেকেই ভাষা আন্দোলন ব্যাপকভাবে ঢাকাকে কেন্দ্র করে পরিচালিত হলেও সারা দেশেই এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়তে থাকে। এক্ষেত্রে চট্টগ্রাম ছিল আন্দোলনের অন্যতম ক্ষেত্র। ভারত-বিভক্তির পূর্ব থেকে মাতৃভাষা বাংলার যথাযোগ্য মর্যাদা প্রদান এবং আবহমান বাংলার সংস্কৃতির ধারা প্রবহমান রাখতে চট্টগ্রামের সংবাদপত্র অগ্রণী ভূমিকা পালন করেছিল। তৎকালে ভাষার প্রশ্নে বাংলার আপামর জনসাধারণকে উজ্জীবিত করার প্রত্যয়ে সংবাদপত্রের মাধ্যমে চট্টগ্রামে যে আন্দোলন সূচিত হয়েছিল, তা পরবর্তী সময়ে '৫২'র আন্দোলনকে চূড়ান্ত পর্যায়ে উপনীত হতে সহায়তা করেছিল।

গবেষণা-পদ্ধতি

প্রবন্ধটি প্রাথমিক উৎসের ভিত্তিতে রচিত, পাশাপাশি সহায়ক উৎস হিসেবে দ্বৈতয়িক উৎস ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে ভাষা আন্দোলনকালীন চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহ ব্যবহার করা হয়েছে। এ-সময় চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রসমূহের মধ্যে *দৈনিক পাঞ্চজন্য* (১৯২৯-১৯৫৩, সম্পাদক, অম্বিকাচরণ দাস), *সাপ্তাহিক সত্যবার্তা* (১৯৩৫-১৯৫০, সম্পাদক, পর্যায়ক্রমে গোলাম সোবহান মাস্টার, মোহাম্মদ ওমর ও কাজী কবিরউদ্দীন), *দৈনিক পূর্ব্ব পাকিস্তান* (১৯৪৭-১৯৭০, সম্পাদক, কবি আবদুস সালাম), *সীমান্ত* (প্রকাশকাল অক্টোবর ১৯৪৭, সম্পাদক, যথাক্রমে মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও সুচরিত চৌধুরী), *সাপ্তাহিক কোহিনুর* (প্রকাশকাল ডিসেম্বর ১৯৫০ সম্পাদক, ইঞ্জিনিয়ার মো. আবদুল খালেক), *দৈনিক ইনসাফ* (১৯৫২-৫৩) এবং পরবর্তী সময়ে *দৈনিক পূর্বকোণ* (প্রকাশকাল ফেব্রুয়ারি ১৯৮৬, সম্পাদক, মোহাম্মদ ইউছুফ চৌধুরী) পত্রিকায় প্রকাশিত ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণকারী ভাষাসৈনিকদের স্মৃতিচারণ ও বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। এছাড়া, ভাষা আন্দোলনকালীন সময়ে প্রকাশিত সাহিত্যিক উপাদান ও বিভিন্ন মনীষীদের আত্মজীবনী প্রাথমিক উৎস হিসেবে ব্যবহৃত হয়েছে। সহায়ক/দ্বৈতয়িক উৎস হিসেবে এতৎসংক্রান্ত বিভিন্ন গ্রন্থ, প্রকাশিত প্রবন্ধ, গবেষণা প্রতিবেদন, অপ্রকাশিত অভিসন্দর্ভ, গেজেটিয়ার ও ওয়েবসাইট থেকে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যাদির মাধ্যমে সত্য উদ্‌ঘাটনের জন্য প্রধানত পাঠ-বিশ্লেষণ কৌশল পদ্ধতি অনুসরণ করা হয়েছে।

ভাষা আন্দোলনের প্রাথমিক পর্ব ও চট্টগ্রাম

পাকিস্তান সৃষ্টির পর ১৯৪৮ সালের ১৯ই মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ (১৮৭৬-১৯৪৮) পূর্ব-বাংলায় প্রথম সফর করেন। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে মওলানা ভাসানী (১৮৮০-১৯৭৬) আগে থেকেই সোচ্চার ছিলেন। মোহাম্মদ

আলী জিন্নাহ্‌র ঢাকা আগমন উপলক্ষ্যে তিনি (ভাসানী) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের ছাত্রসমাজকে সংগঠিত করার উদ্যোগ গ্রহণ করেন। মওলানা ভাসানী, শামসুল হক (১৯১৮-১৯৬৫) এবং শেখ মুজিবুর রহমান (১৯২০-১৯৭৫) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন হলের ছাত্র ও কর্মচারীদের সাথে যোগাযোগ করে ভাষার প্রশ্নে জিন্নাহ্‌র অবস্থানের বিরুদ্ধে তীব্র প্রতিবাদ জ্ঞাপনের কর্মসূচি প্রণয়ন করেন (এম. এ. হালিমের স্মৃতিচারণ)। ২১শে মার্চ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানের বিশাল জনসভায় মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ভাষণ দেন। উক্ত ভাষণে তিনি ঘোষণা করলেন: "উর্দু এবং উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"। জিন্নাহ্‌র এ ঘোষণার পর উপস্থিত ছাত্ররা 'না না' (ইংরেজিতে 'নো-নো) বলে চিৎকার করে তীব্র প্রতিবাদ জানান। এদের মধ্যে একজন ছিলেন চট্টগ্রামের *পিপল'স ভিউ* পত্রিকার সম্পাদক (পরবর্তীতে) নূরুল ইসলাম (চৌধুরী, ১৪০২, পৃ. ১৯)। একই বছরের ২৪শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাবর্তন অনুষ্ঠানে রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে সেই পুরনো সুরেই কথা বলেন (অন্য কোন ভাষা নয়, উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্র ভাষা)। এ ঘোষণার সাথে সাথে একদল ছাত্র না না স্বরে এর তীব্র প্রতিবাদ জানায়। জিন্নাহ্ ছাত্রদের এরূপ আচরণে হতবাক ও ক্ষুব্ধ হন। ছাত্ররা ছিল তাদের দাবিতে অটল। শেষপর্যন্ত জিন্নাহ্ বিষয়টি অমিমাংসিত রেখে ঢাকা ত্যাগ করেন (মতিন, ২০০৫, পৃ. ৬৪)। এ ঘটনার প্রতিক্রিয়া চট্টগ্রামসহ সারাদেশে ছড়িয়ে পড়ে।

জিন্নাহ্ তাঁর পূর্ব-বাংলার সফরসূচিতে চট্টগ্রামকে অন্তর্ভুক্ত করেছিলেন এবং এ সফরে ছাত্র-প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠক করার সিদ্ধান্ত নেন। এদিকে মওলানা আবদুল হামিদ খান ভাসানী জিন্নাহ্‌র চট্টগ্রাম সফরের সময় বিক্ষোভ প্রদর্শন ও রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্যের প্রতিবাদ জানানোর জন্য ছাত্রদেরকে সংগঠিত করার লক্ষ্যে শামসুল হককে চট্টগ্রামে প্রেরণ করেন। রাজনৈতিক উদ্দেশ্যকে আড়াল করে গোয়েন্দা সংস্থার লোকজনকে সন্দেহমুক্ত রাখার জন্য শামসুল হক সস্ত্রীক চট্টগ্রামে এসেছিলেন। চট্টগ্রামের তৎকালীন জননেতা এম. এ. আজিজ (১৯২১-১৯৭১) চকবাজারের একটি বাসায় নিয়ে শামসুল হককে থাকার ব্যবস্থা করে দেন। সেই বাসা থেকেই তিনি চট্টগ্রাম কলেজসহ বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের ছাত্র-প্রতিনিধিদের সাথে যোগাযোগ করেন এবং জিন্নাহ্'র চট্টগ্রাম সফরের সময় রাষ্ট্রভাষা প্রশ্নে পশ্চিমাদের মনোভাবের বিরুদ্ধে প্রতিবাদ জানানোর জন্য একটা রূপরেখা প্রণয়ন করেন (হালিম, ১৯৯৩)।

জিন্নাহ্‌র চট্টগ্রাম সফর উপলক্ষে দামপাড়া পুলিশ লাইনে এক জনসভার (১৯৪৮ সালের মার্চে) আয়োজন করা হয়। জনসভা পরিচালনার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন মুসলিম লীগ নেতা আহমেদ সগীর চৌধুরী। উক্ত সভায় তৎকালীন পাকিস্তান গণপরিষদ সদস্য এ. কে. খানও (১৯০৫-১৯৯১) বক্তব্য রাখেন (রহমান, ১৯৯৩, পৃ. ২০১)। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ তাঁর ভাষণে "চট্টগ্রামকে সুন্দর নগরী করার প্রতিশ্রুতি" দিয়ে বাংলার স্বার্থ-বিরোধী রাজনৈতিক বক্তব্য অতি নির্বিঘ্নে দিয়ে যান। এরপর জিন্নাহ্ ছাত্র-প্রতিনিধিদের সাথে বৈঠকে মিলিত হন। বৈঠকের সময় জিন্নাহ্ ছাত্র-প্রতিনিধিদেরকে তাদের বক্তব্য লিখিত আকারে পেশ করার জন্য বলেন। কিন্তু চট্টগ্রামের ছাত্র প্রতিনিধিরা ইতিপূর্বে শামসুল হকের পরামর্শ মতে জিন্নাহ্'র সাথে আলোচনার জন্য যেসব দাবিনামা ঠিক করেছিলেন সেই কাগজটি (দাবিনামাটি) অনিচ্ছাকৃতভাবে ফেলে আসেন। ফলে জিন্নাহ্‌কে লিখিতভাবে কোনো দাবি প্রদান করা সম্ভব হয়নি। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ছাত্রদেরকে শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে নিয়ম-শৃঙ্খলা বজায় রেখে লেখাপড়া করার হিতোপদেশ দিয়ে চলে যান। চট্টগ্রামে সে-সময় জিন্নাহ্‌কে ব্যাপক কোনো বিক্ষোভ দেখানো না গেলেও এর পরে ভাষার প্রশ্নে ছাত্রদের

মধ্যে ধীরে ধীরে সচেতনতা সৃষ্টি হতে শুরু করে এবং পরে তা পাকিস্তান-বিরোধী আন্দোলনে রূপ নেয় (হালিম, ১৯৯৩)।

ভাষা আন্দোলনের চূড়ান্ত পর্ব ও চট্টগ্রাম: সংবাদপত্রে প্রতিক্রিয়া

১৯৪৮ সালে জিন্নাহ্'র মৃত্যুর পর আন্দোলন কিছুদিনের জন্য স্তিমিত হলেও ১৯৪৯ সাল থেকে ভাষা বিতর্ক আবার শুরু হয়। এ সময় কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক সরকার বাংলা ভাষাকে ধ্বংস করার জন্য কৌশলী কর্মসূচি গ্রহণ করে। এ পর্যায়ে সরকারি প্রচেষ্টায় আরবি হরফে বাংলা উচ্চারণ কিংবা ইসলামি ভাবধারার আলোকে বাংলা ভাষার জন্য আরবি হরফ গ্রহণের প্রচেষ্টা চালানো হয়। সরকারের এ-সকল প্রচেষ্টার পক্ষে-বিপক্ষে অন্যান্য জাতীয় পত্রিকার সাথে সাথে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্রগুলি তাদের মতামত ও বক্তব্য উপস্থাপন করে।

১৯৪৯ সালের ৭ই ফেব্রুয়ারি কেন্দ্রীয় সরকারের শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান শিক্ষা উপদেষ্টা বোর্ডের এক সভায় আরবি হরফকে পাকিস্তানের ভাষার একমাত্র হরফ করার জোর সুপারিশ করেন এবং মুসলমানদেরকে বাংলার পরিবর্তে 'ইসলামী ভাষা' উর্দুকে গ্রহণের পরামর্শ দেন (মুসা, ১৯৭৪, পৃ. ২৫৯)। কিন্তু বাঙালিরা উর্দুকে ইসলামি ভাষা হিসেবে মেনে নিতে রাজি ছিল না। বাঙালিদের মতে, ইসলামি ভাষা হলো একমাত্র আরবি, উর্দু নয়। তাঁরা দ্ব্যর্থহীন ভাষায় বলেন, পাকিস্তান সরকারের উর্দু চাপানোর উদ্দেশ্য রাষ্ট্রীয় সংহতি বা ইসলামি আদর্শ প্রতিষ্ঠার স্বার্থে নয়, বরং বাঙালির উপর সর্ব-বিষয়ে আধিপত্য প্রতিষ্ঠাই ছিল মূল লক্ষ্য। সরকারের এরূপ তৎপরতা সম্পর্কে প্রশ্ন তোলে *দৈনিক ইনসাফ* পত্রিকার সম্পাদকীয় মন্তব্যে বলা হয়:

> পূর্ববঙ্গের ছেলে মেয়েরা বাঙালা বর্ণমালায় মাতৃভাষা শিখিলে এবং মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষা শুরু করিলে গোমরাহ বা ইসলামী ভাবধারা বিহীন হইয়া পড়িবে এই আশংকা কেন? সেই আশংকা যদি কাহারও মনে না থাকে তবে বর্ণমালা পরিবর্তনের জন্য কতৃপক্ষ মহলের এই অস্বাভাবিক আগ্রহ কেন? (*দৈনিক ইনসাফ*, ২৩শে জুন ১৯৫২)।

১৯৫০ সালের প্রথম দিকে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমান চট্টগ্রাম কলেজ পরিদর্শনে এলে তাঁকে আরবি হরফে বাংলা প্রচলনের প্রক্রিয়ার প্রতিবাদে স্মারকলিপি প্রদান করা হয়। স্মারকলিপি প্রদানের কারণে কলেজের দুইজন ছাত্রনেতাকে বহিষ্কার করা হয়। ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে *দৈনিক পূর্বকোণ*-এ এক সাক্ষাৎকারে তখনকার ছাত্রনেতা এজহারুল হক এ ঘটনার উল্লেখ করে বলেন:

> খুব সম্ভব ১৯৫০ সালের জানুয়ারি মাসে কেন্দ্রীয় শিক্ষামন্ত্রী চট্টগ্রাম সফরে আসেন। এই সফরকালে তাঁর চট্টগ্রাম কলেজ পরিদর্শনের প্রোগ্রাম ছিল। এটা জানতে পেরে ফরমান উল্লাহ খান, আবদুল্লাহ আল হারুন এবং আমি তাঁকে একটি খোলা চিঠি দেয়ার সিদ্ধান্ত নিলাম। তবে চিঠিটা হবে বেনামি এবং কোন প্রতিষ্ঠান বা ব্যক্তির নাম থাকবেনা। কারণ তাতে গ্রেপ্তারের যথেষ্ট ঝুঁকি ছিল। এই ইস্তাহারটি আমরা আন্দরকিল্লাস্থ রহমানিয়া প্রেস থেকে ছাপাই। অন্যকোন প্রেস এটা ছাপাতে রাজী হয়নি। এখানে উল্লেখ করা ভাল, রহমানিয়া প্রেসের মালিক ফরমান উল্লাহ খানের আত্মীয় ছিল। ...নির্দেশ মোতাবেক প্রিন্সিপ্যাল আবু হেনা সাহেব কয়েকজন প্রফেসরকে নিয়ে একটি কমিটি গঠন করেন। কিন্তু কমিটি কয়েকবার মিটিং করেও কোন সিদ্ধান্তে আসতে পারেননি। পরে জানা যায় যে ফরমান উল্লাহ খানের একজন প্রফেসর আত্মীয় ফরমান উল্লাহ খানের নাম বলে দেয়। ফরমান উল্লাহ ও শামসুদ্দিন মোহাম্মদ ইছহাককে এজন্য শাস্তি প্রদান করা হয়। এবং আই এ'এর পর বিএ-তে

> তাদের ভর্তি নিষিদ্ধ করা হয়। সামশুদ্দিন মোহাম্মদ ইছহাক সেই সময় যদিও পরোক্ষভাবে তমদ্দুন মজলিসের সমর্থক ছিলেন, কিন্তু এই ইস্তাহার ছাপানো এবং বিলির ব্যাপারে তার কোন ভূমিকা ছিল না তবুও তাঁকে এই শাস্তি কেন প্রদান করা হলো এখনো আমাদের কাছে রহস্যাবৃত (হক, ১৯৯৩)।

এই ঘটনার পর প্রগতিশীল ছাত্ররা দাবি আদায়ের ক্ষেত্রে সংগঠিত ও ঐক্যবদ্ধ হয়। যার ফলে তারা "ইনডিপেন্ডেন্ট ষ্টুডেন্ট অর্গানেইজেশন" নামে একটি ছাত্র জোট গড়ে তোলেন, যার সভাপতি ছিলেন আবদুল্লাহ আল হারুন এবং সম্পাদকের দায়িত্বে ছিলেন মোহাম্মদ আলী ও ফরিদউদ্দীন আহমদ। ১৯৫২ সালের ফেব্রুয়ারির প্রথমভাগে সংগঠনের নাম পরিবর্তন করে "সর্বদলীয় ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ" রাখা হয়। উপরিউল্লিখিত তিনজনকেই আহ্বায়ক করে 'ছাত্র সংগ্রাম পরিষদ' পুনর্গঠন করা হয়। এ পরিষদের গুরুত্বপূর্ণ সদস্য ছিলেন গোলাম আকবর চৌধুরী, এম. এ. হালিম, আবদুল ওয়াদুদ, আবদুল হাই, ফরমানউল্লাহ খান, এ. এন. এম. নূরুন্নবী প্রমুখ। এ কমিটি ৫৪ সাল পর্যন্ত বহাল ছিল। সংগঠনটির ছাত্ররা চৌধুরী হারুনর রশিদ ও এম. এ. আজিজের সাথে সবসময় যোগাযোগ রাখতেন (হারুন, ১৯৯৩)।

চট্টগ্রাম কলেজে শিক্ষামন্ত্রী ফজলুর রহমানের বক্তব্যের প্রতিবাদে এ সময় চট্টগ্রামের জনপ্রিয় *সাপ্তাহিক কোহিনূর* পত্রিকায় একটি মতামত প্রকাশিত হয়েছিল। তবে সেটি ছিল উর্দু ভাষার বিকল্প হিসেবে। *সাপ্তাহিক কোহিনূর*-এর ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যার সম্পাদকীয় কলামে এ বিষয়ে মতামতটি প্রকাশিত হয়। এতে বলা হয়, উর্দু কোনোপ্রকারেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হতে পারে না। কেননা, পাকিস্তানের কোনো প্রদেশের ভাষা উর্দু নয়। যদি কোনো প্রাদেশিক ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করতে হয়, তবে বাংলাই রাষ্ট্রভাষা হওয়ার উপযুক্ত। কেননা, পাকিস্তানের অধিবাসীর অর্ধেকেরও বেশি লোক বাংলা ভাষাভাষী (*কোহিনূর*, ১৯৫১, ৪র্থ সংখ্যা, পৃ. ৭৯)।

বাংলা ভাষার দাবিতে যখন সমগ্র দেশ বিক্ষোভে ফেটে পড়ে, ঠিক তখনই *কোহিনুর* পত্রিকা ধারাবাহিকভাবে বাংলা ভাষার সমর্থনে বিভিন্ন প্রবন্ধ প্রকাশ করে আন্দোলনে গতি এনে দেয়। ১৫ই ফেব্রুয়ারি ১৯৫২ সালে মতিউল ইসলাম রচিত 'বাংলা ভাষা' কবিতাটি প্রকাশিত হয়। এতে লেখক রাষ্ট্রভাষা বাংলার আন্দোলনে সম্মিলিতভাবে সবাইকে এগিয়ে আসার আহ্বান জানিয়ে লিখেন:

বাংলা হবে রাষ্ট্রভাষা
বাংলাই সে সবার আশা
বাংলা ছাড়া উপায় কারো নাই
সম্মিলিত বজ্র রবে
তোলো আওয়াজ বলো সবে
(অন্যতম) রাষ্ট্রভাষা হওয়া চাই।
(*কোহিনূর*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৮১)

'বাংলা ও বাঙ্গালী' কবিতায় মোতাসিম বিল্লাহ বাংলা ভাষাকে যে হিন্দুয়ানি ভাষা বলা হয়, তার তীব্র প্রতিবাদ করে বলেন, এটা হিন্দু ও মুসলমানদের নয়, সমগ্র বাঙালির ভাষা। কবিতাটিতে তিনি বলেন:

এ দেশ, এ ভাষা, হিন্দুর নয়
নয় তা' মুসলমানের
দুই জাতি মিলে সৃষ্টি করলো
এখানে অযুত গানের।

হিন্দুও নয়, মুসলিমও নয়,
তুমি 'বাঙালী' এই পরিচয়ঃ
তা'হলে তাহার ভাষা আর প্রাণ কেন বা করছো ধ্বংস?
(*কোহিনূর*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ১৩৩)

এরপর শুরু হয় ১৯৫২ সালের উত্তাল আন্দোলন। ১৯৫২ সালে খাজা নাজিমউদ্দীন (১৮৯৪-১৯৬৪) পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী নিযুক্ত হন। দায়িত্বগ্রহণ করে ২৬শে জানুয়ারি তিনি পূর্ব-বাংলা সফরে আসেন এবং ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানে জনসভায় বলেন, "কায়েদে আযম মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ উর্দুকেই পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার কথা ঘোষণা করেছিলেন এবং সেই অনুযায়ী উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।" তিনি ঘোষণা দেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু" (হোসেন, ২০০৮, পৃ. ২০৯)। উপস্থিত ছাত্র-জনতা সাথে সাথে এর প্রতিবাদ করে এবং ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ সভা ও ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করে। ওই দিনের সভায় ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ছাত্র ধর্মঘট আহ্বান করা হয়। ৩১শে জানুয়ারি আবদুল হামিদ খান ভাসানীর নেতৃত্বে ঢাকা বার লাইব্রেরিতে সর্বদলীয় সভার মাধ্যমে ধর্মঘট সমর্থন এবং ২১শে ফেব্রুয়ারি প্রদেশব্যাপী হরতালের ঘোষণা দেওয়া হয় (হোসেন, ২০০৮, পৃ. ২০৯-১০)। শুরু থেকেই ঢাকার রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের সাথে যোগাযোগ রেখে চট্টগ্রামে সমন্বিত কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। ইতঃপূর্বে গঠিত 'মূলনীতি বিরোধী সংগ্রাম কমিটি' ছিল চট্টগ্রামের ভাষা আন্দোলনসহ সকল কর্মকাণ্ডের চালিকা শক্তি। কিন্তু আন্দোলনের প্রয়োজনে ১৯৪৮ সালে গঠিত 'মূলনীতি বিরোধী সংগ্রাম কমিটি' পরিবর্তিত ও পরিবর্ধিত করে চট্টগ্রামে জেলা সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন করা হয়। কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন তখনকার তরুণ সাহিত্যিক মাহবুব উল আলম চৌধুরী এবং যুগ্ম আহ্বায়ক ছিলেন চৌধুরী হারুনর রশিদ ও এম. এ. আজিজ (চৌধুরী, ১৯৯৩)। আন্দরকিল্লায় অবস্থিত আওয়ামী লীগের অফিস ছিল সংগ্রাম পরিষদের দপ্তর। সকল শ্রেণির পেশাজীবী সংগঠন, কৃষক-শ্রমিক সংগঠন, আওয়ামী মুসলিম লীগ ও তমদ্দুন মজলিসের প্রতিনিধিদের এই কমিটির অন্তর্ভুক্ত করা হয়।

পল্টন ময়দানে খাজা নাজিমউদ্দীনের ভাষণের কঠোর সমালোচনা করে *কোহিনূর* 'রাষ্ট্রভাষা' শীর্ষক সম্পাদকীয়তে মন্তব্য লিখে:

> উজিরে আযমের সাম্প্রতিক পূর্ববঙ্গ সফরের সময় উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করা সম্বন্ধে যে অভিমত প্রকাশ করিয়াছেন তাহাতে পূর্ববঙ্গবাসী মাত্রেরই হৃদয়ে কঠোর আঘাত লাগিয়াছে। যখন তিনি পূর্ববঙ্গের উজিরে আযম ছিলেন তখন বঙ্গ ভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করা হইবে বলিয়া অঙ্গীকার পত্রে দস্তখত দিয়াছিলেন। এখন তিনি পাকিস্তান রাষ্ট্রের উজিরে আযমের স্থান গ্রহণ করিয়া তাহার অঙ্গীকার বিস্তৃত হইছে বলিয়া মনে হয়। নতুবা উর্দুকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা রূপে গ্রহণ করিতে হইবে বলিয়া মত প্রকাশ করার কোন কারণ থাকিতে পারে না। পাকিস্তানের ৪ কোটি অধিবাসীর মনে নিদারুণ আঘাত হানিয়া তাঁহাদের উপর জোরপূর্বক ভূত চাপাইয়া দেওয়া হইতেছে। বাঙ্গালীরা এখন এত বোঝার চাপ সহ্য করিবে কিনা তাহাই ভাবিবার বিষয়। সহ্য করিতে না পারিলে ঘাড় ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় আছে। (*কোহিনূর*, ১৫ই ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, ৫ম সংখ্যা, পৃ. ৯৫)।

সর্বদলীয় ঐক্যের ঘোষণা ছিল; যে মূলনীতিতে ভাষার অধিকার নেই, স্বায়ত্তশাসনের অধিকার নেই, তা আমরা মানি না, মানবো না। কেন্দ্রের পূর্ব নির্ধারিত কর্মসূচি অনুযায়ী ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতালকে সফল করার জন্য অন্যান্য জেলার মতো সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে চট্টগ্রামে মিটিং, মিছিল এবং লালদীঘি মাঠে

জনসভার কর্মসূচি গ্রহণ করা হয়। এসব কর্মসূচির প্রস্তুতি পর্যায়ে সার্বক্ষণিক কাজ করেছেন মাহবুব উল আলম চৌধুরী ও আজিজুর রহমান (লাল আজিজ নামে পরিচিত)। কর্মসূচির সফল বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে এই দুইজন ১৯শে ফেব্রুয়ারি ডক শ্রমিকদের সংগঠিত করে বক্তব্য রাখেন। এরপর মাহবুব উল আলম চৌধুরী জলবসন্তে আক্রান্ত হয়ে অসুস্থ হয়ে পড়েন। ২০শে ফেব্রুয়ারি তার অনুপস্থিতিতে চৌধুরী হারুনর রশিদ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের ভারপ্রাপ্ত আহ্বায়কের দায়িত্বভার গ্রহণ করেন। অসুস্থ থাকা অবস্থায়ও কমিটির সমস্ত কার্যক্রম তাঁকে নিয়মিত অবহিত করা হতো এবং প্রয়োজনীয় পরামর্শ নেওয়া হতো (চৌধুরী, ১৪০২, পৃ. ৩০)। আন্দোলনে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর ভূমিকার প্রশংসা করে তৎকালীন ছাত্রনেতা এমদাদুল ইসলাম বলেন, "১৯৪৭ সালে দেশবিভাগের পর থেকে ১৯৫৪ সালের নির্বাচন পর্যন্ত চট্টগ্রামের ভাষা, সংস্কৃতি ও প্রগতিশীল রাজনৈতিক আন্দোলনে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর অগ্রণী ভূমিকা ছিল" (ইসলাম, ১৯৯৩)।

১৯ ও ২০শে ফেব্রুয়ারি রাতদিন পুলিশের চোখকে ফাঁকি দিয়ে শহরের বিভিন্ন স্থানে পোস্টার লাগানো হয়। পাড়ায় পাড়ায় ক্লাব সংগঠনগুলো ৩১শে জানুয়ারি ঘোষিত ২১শে ফেব্রুয়ারির হরতাল সফল করার প্রস্তুতি নেয়। কর্মসূচি অনুযায়ী বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে ২১শে ফেব্রুয়ারি পূর্ণ দিবস হরতাল পালন করা হয়। ঐ দিন সমস্ত দোকানপাট, যানবাহন, সরকারি অফিস আদালত ও স্কুল কলেজ বন্ধ ছিল। চট্টগ্রাম শহরের সর্বস্তরের মানুষ স্বতঃস্ফূর্তভাবে হরতালে অংশগ্রহণ করে। সরকারি অপপ্রচার ও পুলিশের হয়রানি উপেক্ষা করে চট্টগ্রামের হাজার হাজার কর্মী হরতালের সমর্থনে এগিয়ে আসে। ঐ দিন লালদীঘির ময়দানের পূর্ব-নির্ধারিত জনসভায় যোগদানের উদ্দেশ্যে ঢাকা থেকে খন্দকার ইলিয়াস পূর্বাহ্নে চট্টগ্রামে এসে পৌঁছান। তিনি ঢাকার সাথে টেলিফোনে যোগাযোগ করে জানতে পারলেন, ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার অজুহাতে ঢাকায় ছাত্র মিছিলে গুলি চালানো হয়েছে। এতে বেশ কিছু সংখ্যক ছাত্র জনতা শহিদ হয়েছে (মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্মৃতিচারণ)। এ খবর চট্টগ্রামে পৌঁছার সাথে সাথে গোটা শহর বারুদের মতো জ্বলে ওঠে। মিছিলের পর মিছিল চতুর্দিক থেকে পুরাতন ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউটের দিকে যেতে থাকে। জহুর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে একটি মিছিল এবং রেল-শ্রমিকদের একটি বিশাল মিছিল ইনস্টিটিউটে জমায়েত হয়। চট্টগ্রাম কলেজ ও মেডিকেল কলেজের ছাত্রদের মিছিলও জড়ো হয় সেখানে। সম্মিলিত বিশাল মিছিলটি এম. এ. আজিজ ও জহুর আহমেদ চৌধুরীর নেতৃত্বে ওয়াজিউল্লাহ ইনস্টিটিউট থেকে বিভিন্ন স্লোগান দিয়ে এগিয়ে যেতে থাকে। মিছিলের স্লোগান ছিল: "ঢাকায় গুলিতে হত্যার বিচার চাই, খুনীদের বিচার চাই, জুলুমের প্রতিরোধ গড়ে তুলুন, জুলুম বাজি চলবেনা, রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই" ইত্যাদি (*দৈনিক ইনকিলাব*, ১৯৯৫, অমর একুশে সংখ্যা)।

২১শে ফেব্রুয়ারি (১৯৫২) ঢাকায় রক্তপাতের খবর চট্টগ্রামে পৌঁছানোর পর পরই তরুণ সাহিত্যিক ও তৎকালীন সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বায়ক জনাব মাহবুব উল আলম চৌধুরী রোগ শয্যায় 'কাঁদতে আসিনি, ফাঁসীর দাবি নিয়ে এসেছি' কবিতাটি রচনা করেন। এটাই হচ্ছে পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলনের উপর রচিত প্রথম কবিতা। কবিতাটির গুরুত্ব বর্ণনায় চৌধুরী জহুরুল হক বলেন, "মাহবুব উল আলম চৌধুরী রচিত এই কবিতাটিতে ভাষা আন্দোলনে নিহত শহিদদের হত্যাকারীদের বিরুদ্ধে অগ্নিক্ষরা বিদ্রোহী কণ্ঠই শুধু উচ্চারিত হয়নি, যাকে বলি একুশের চেতনা, স্বাধীনতার চেতনা, তারও দীপ্র দলিল রচিত হয়েছে। কেবল তাই নয়, এটিই ছিল একুশের চেতনবাহী সংগ্রামশীলতার প্রথম সৃজনশীল সাহিত্য স্মারক, একুশের প্রথম কবিতা, পুস্তিকা আকারে প্রকাশিত একুশের প্রথম স্মরণিকা (হক, ২০০২, পৃ. ১১)। কবিতাটি

২২শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যা ৭টায় লালদীঘি ময়দানের জনসভায় চৌধুরী হারুনর রশিদ উপস্থিত দর্শক শ্রোতাদের সামনে পাঠ করেন।

পরের দিন ভোরে কবিতাটি সংরক্ষণ, প্রকাশ, প্রচার ইত্যাদি নিষিদ্ধ ঘোষণা করে কবিতাটির প্রকাশিত সকল কপি বাজেয়াপ্ত করা হয়। কবিতা পাঠ করার কারণে চৌধুরী হারুনর রশীদ ও কবিতার মুদ্রিত কপি বহন করার কারণে কৃষ্ণ গোপাল সেনকে ২২শে ফেব্রুয়ারি রাতেই গ্রেফতার করা হয়। মাহবুব উল আলমের উপর হুলিয়া জারি করা হয় এবং বাড়ির সামনে পুলিশের পাহারা বসানো হয়। তিনি বোরখা পড়ে রাতের অন্ধকারে পালিয়ে যান। মাহবুব উল আলম চৌধুরী বলেন, কবিতাটি বাজেয়াপ্ত করার এবং পুলিশি নির্যাতনের কারণে কবিতাটির কোনো কপি তিনি হাতে রাখতে পারেননি বা সংরক্ষণ করতে পারেননি। তখন চট্টগ্রামে পুলিশের একজন কলেজ পড়ুয়া বোন মনজুরা বেগম কবিতাটি সংরক্ষণ করেন। পরে সংস্কৃতি কর্মী মফিদুল হকের মাধ্যমে মনজুরা বেগম তার পুরানো ডায়েরিটি[১] আমার কাছে পৌঁছে দিলে সেই কবিতাটি আমি ফিরে পাই (*দৈনিক পূর্বকোণ*, ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩)।

কবিতাটি প্রচারের কথা স্বীকার করে কৃষ্ণ গোপাল সেন উল্লেখ করেন:

> বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে সর্বাত্মক হরতাল পালিত হওয়ায় এখনো আমি নিজেকে গর্বিত মনে করি। কারণ সেদিন চট্টগ্রাম শহরের হরতাল পরিচালনা করা ও লালদীঘি ময়দানের জনসভায় শৃঙ্খলা রক্ষার দায়িত্ব ছিল মূলত আমার উপর। আমি সফলতার সঙ্গে সেই দায়িত্ব পালন করেছি, কিন্তু পরের দিনের হরতাল দেখার সুযোগ আমার হয়নি। ২২শে ফেব্রুয়ারি ভোরে কোহিনূর ইলেকট্রিক প্রেস থেকে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর লেখা 'কাঁদতে আসিনি ফাঁসির দাবী নিয়ে এসেছি' কবিতার মুদ্রিত কপি নিয়ে প্রচার করার মুহূর্তে পুলিশ আমাকে গ্রেফতার করে। এক বছর চট্টগ্রাম কেন্দ্রীয় কারাগারে আমাকে বন্দি অবস্থায় থাকতে হয় (সেন, ১৯৯৩)।

২১শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের নেতৃবৃন্দ লালদীঘির ময়দানের জনসভা শেষে পরবর্তী কর্মসূচি গ্রহণ করার জন্য ঐ দিন রাতে আন্দরকিল্লাস্থ অফিসে এক বৈঠকে মিলিত হন। সভায় শাসকগোষ্ঠীর ঘৃণ্য দমননীতির নিন্দা প্রকাশ করে বিভিন্ন বক্তব্য রাখা হয় এবং নিম্নোক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় (চৌধুরী, ১৪০২, পৃ. ৩৫)।

ক. ঢাকার আন্দোলনের সাথে সঙ্গতি রেখেই তারা আন্দোলন চালিয়ে যাবেন; এবং
খ. ২২, ২৩ ও ২৪শে ফেব্রুয়ারি বিক্ষোভ, হরতাল, জনসভাসহ বিভিন্ন কর্মসূচি পালিত হবে।

২২শে ফেব্রুয়ারি সকালে সংবাদপত্রের মাধ্যমে ঢাকার নির্মম হত্যাকাণ্ডের খবর চট্টগ্রামে পৌঁছার সাথে সাথে গোটা শহরে ক্ষোভ ও শোক ছড়িয়ে পড়ে। মিছিল ও স্লোগানে সমগ্র শহর উত্তপ্ত হয়ে ওঠে। মিছিলকারীরা 'নুরুল আমিনের রক্ত চাই', 'নাজিমুদ্দীন গদী ছাড়' প্রভৃতি স্লোগান দিতে থাকে। পরে লালদীঘি ময়দানে সমবেত হয়ে তারা এক সমাবেশের আয়োজন করে (*দৈনিক আজাদ*, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)। এ দিন চট্টগ্রাম কলেজ ছাত্র সংসদের নেতা এজাহার, মাকসুদুর রহমান প্রমুখের নেতৃত্বে একটি বিশাল প্রতিবাদ ও বিক্ষোভ মিছিল বের হয়। মিছিলে হালিমা খাতুনের নেতৃত্বে ডা. খাস্তগীর স্কুলের কিছু ছাত্রী এসে যোগ দেয়। মিছিলটি অর্পণাচরণ স্কুলের সামনে দিয়ে যাওয়ার পথে আরো কিছু মেয়ে মিছিলে যোগ দেয়। মেয়েদেরকে

একটি ট্রাকে উঠিয়ে দিয়ে অন্যরা পেছনে সাইকেল চেপে বা কেউ পায়ে হেঁটে মিছিলটিকে এগিয়ে নিয়ে যায়। মিছিলে অংশগ্রহণকারী, ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মী, বিশিষ্ট আইনজীবী এম. ওমর হায়াত বলেন:

> আমার মনে পড়ে চট্টগ্রামের সেই বিশাল বিক্ষোভ মিছিলটি নিয়ে আমরা কদমতলী হয়ে দেওয়ানহাট পর্যন্ত গেলাম। ফিরে আসলাম পাঠানটুলির ভিতর দিয়ে। ওই মিছিলে যে-সব মেয়েরা অংশ নিয়েছিলেন তাদের মধ্যে হালিমা খাতুন, রহিমা খাতুন ও আনোয়ারার কথা মনে করতে পারি। আনোয়ারা প্রকাশ খুকু বাংলা ভাষার বিশিষ্ট গবেষক মরহুম ড. মাহফুজুল হকের স্ত্রী। এমনকি সেদিনকার সারা শহরে বিভিন্ন শ্লোগান সম্বলিত পোস্টারে সয়লাব হয়ে যায়। 'খুনী নুরুল আমিনের ফাঁসি চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' ইত্যাদি বক্তব্য পোস্টারে স্থান পায়। সন্ধ্যার পর সমস্ত জনতা উপরোক্ত শ্লোগান দিয়ে সমস্ত শহর প্রদক্ষিণ করে। (*দৈনিক আজাদ*, ২৪শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।

২২শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় নিহত একুশের শহিদদের নাম জানার পর তাদের নামে চট্টগ্রাম শহরের বিভিন্ন রাস্তার নামকরণ করা হয়। বায়ান্নের একুশে ফেব্রুয়ারির ভাষা আন্দোলনে ছাত্রদের উপর গুলিবর্ষণ সম্পর্কিত বিভিন্ন সংবাদ পত্রিকায় প্রকাশিত হয়। *সাপ্তাহিক কোহিনূর* 'ঢাকা শহরে নৃশংস হত্যাকাণ্ড' শিরোনামে সংবাদ প্রচার করে (*কোহিনূর*, ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ১০৯)।

বাংলা ভাষার আন্দোলনকে নস্যাৎ করার জন্য পাকিস্তান সরকার ১৪৪ ধারা জারি করলে এ সম্পর্কে *কোহিনূর* সম্পাদকীয় প্রবন্ধে লিখে, ব্রিটিশরা তাদের বিরুদ্ধে কোনো ষড়যন্ত্র বা কথা উত্থাপন না করার জন্য ১৪৪ ধারা জারি করে সভা সমিতি নিষিদ্ধ করতো। এমনকি ৫ জনের সংযোগ বেআইনি বলে ঘোষণা করেছিল। এই আইন অমান্য করলে কাঁদুনে গ্যাস, বোমা ও গুলি ছোড়া হতো। দেশ স্বাধীনতা লাভের পর জনপ্রতিনিধিরাই যেখানে দেশের শাসনভার চালাবেন সেখানে ১৪৪ ধারার কোন প্রয়োজন আছে বলে এ পত্রিকা মনে করে না এবং এই বেআইনি আইন ১৪৪ ধারা উঠিয়ে দেওয়ার জন্য সুপারিশ করে। একই সংখ্যার সম্পাদকীয় নিবন্ধে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনাকে জালিয়ানওয়ালাবাগের ঘটনার সাথে তুলনা করে 'নৃশংস ছাত্র হত্যা' শীর্ষক সম্পাদকীয় প্রকাশ করে (*কোহিনূর*, ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ১০৯)।

তৎকালীন পত্রিকার উপর সরকারি বিভিন্ন দমন আইনকে উপেক্ষা করে বাংলা ভাষার পক্ষে নিজস্ব মতামত ব্যক্ত করে *কোহিনূর* পত্রিকা জনসাধারণের মাঝে এর অবস্থান তৈরি করে নিয়েছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারির মর্মান্তিক ঘটনার পর এ পত্রিকা বিভিন্ন সংবাদ শিরোনাম এবং সম্পাদকীয় নিবন্ধের মাধ্যমে ঢাকায় ঘটে যাওয়া ঘটনার পূর্ণ বিবরণ তুলে ধরে। শুধু তাই নয় পত্রিকার প্রচলিত পৃষ্ঠা সজ্জারীতি ভঙ্গ করে পত্রিকার শুরুতেই ভাষা আন্দোলন বিষয়টাকে পাদ প্রদীপের আলোয় উপস্থাপন করে 'নিরপেক্ষ বিচার দাবি করিতেছি' শিরোনামে প্রকাশিত হয় (*কোহিনূর*, ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২, পৃ. ১০৯)।

একুশে ফেব্রুয়ারির স্বতঃস্ফূর্ত হরতালে চট্টগ্রামের নারীরাও সক্রিয় অংশগ্রহণ করেছিলেন। তখনকার রক্ষণশীল পরিবেশে নারীদের রাস্তায় বের হয়ে মিছিল করা ছিল অকল্পনীয় ব্যাপার। তাদের পাশাপাশি কিছু কিছু পুলিশ অফিসারের ভূমিকাও ছিল প্রশংসনীয়। চট্টগ্রামে একুশের সেই উত্তাল দিনটির স্মৃতিচারণ করতে গিয়ে এমন একটি ঘটনার কথা উল্লেখ করেন প্রবীণ সংস্কৃতিকর্মী ও ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় অগ্রসেনানী মাহবুব হাসান। তিনি বলেন:

> বায়ান্নর একুশে ফেব্রুয়ারি সকাল। বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবীতে ছাত্র-ছাত্রীদের একটি মিছিল বের হয় চট্টগ্রাম কলেজ থেকে। মিছিল আসে ডা. খাস্তগীর স্কুলের সামনে। স্কুলের ফটক জুড়ে ছিল পুলিশের জীপ এবং ছাত্রীরা যাতে মিছিলে যোগ দিতে না পারে, সেজন্য স্কুল ফটক ভেতর থেকে তালাবদ্ধ করে রাখা হয়েছিল। ছাত্রীরা রাজপথে বেরিয়ে আসতে পারছিলনা। ছাত্র নেতারা ফটক ভাঙ্গার চেষ্টা চালায় এবং ব্যর্থ হচ্ছিল। ব্যর্থতা তাদের পেয়ে বসছিল প্রায়। ঠিক তখনই জীপ গাড়ি থেকে পুলিশ অফিসার তার জীপের হ্যাণ্ডেলটি তুলে দেন ছাত্র নেতাদের হাতে, তালা ভাঙতে ... (হাসান, ১৯৯৩)।

ঢাকায় একুশে ফেব্রুয়ারি পুলিশের গুলিতে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে দেশের সর্বত্র যে বিক্ষুব্ধ তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছিল, তা চট্টগ্রামের গ্রাম-গ্রামান্তর পর্যন্ত আঘাত হেনেছিল। চট্টগ্রাম জেলার বিভিন্ন থানা শহরেও ছাত্র জনতা স্বতঃস্ফূর্ত হরতাল পালন করে।

সন্দ্বীপ হাবিলা স্কুলের ছাত্রছাত্রীদের উদ্যোগে ২১শে ফেব্রুয়ারি সারাদিন শান্তিপূর্ণভাবে ধর্মঘট পালিত হয়। বিকালে স্থানীয় মাঠে এক বিরাট জনসভায় বক্তারা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার মর্যাদা প্রদানের দাবিতে বিভিন্ন যুক্তিপূর্ণ বক্তব্য রাখেন এবং দাবি আদায়ের লক্ষ্যে শেষ রক্তবিন্দু উৎসর্গ করার সংকল্প ব্যক্ত করেন।

সীতাকুণ্ড থানা শহরেও প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমউদ্দীনের উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা ঘোষণার প্রতিক্রিয়া স্বরূপ জনমনে দারুণ উত্তেজনার সৃষ্টি হয়। ২১শে ফেব্রুয়ারি এখানে পূর্ণ দিবস হরতাল পালিত হয়। সকালে বিভিন্ন স্কুল ও মাদ্রাসার ছাত্র-ছাত্রীরা বিক্ষোভ মিছিল বের করে এবং বিকেলে জনসভার আয়োজন করে (*দৈনিক* সৈনিক, ১৬ই মার্চ, ১৯৫২)। সভায় বক্তারা শাসকচক্রের ঘৃণ্য ষড়যন্ত্রের বিরুদ্ধে তীব্র ক্ষোভ প্রকাশ করে ও রাষ্ট্রভাষা বাংলার দাবিতে সকলকে ঐক্যবদ্ধ হওয়ার আহ্বান জানান।

নাজিরহাট, ফটিকছড়িতেও ঐদিন সর্বাত্মক হরতাল পালিত হয়। ঐ এলাকার কর্মসূচি সফল করার দায়িত্বে ছিলেন তৎকালীন ছাত্রকর্মী এমদাদুল ইসলাম ও আবু জাফর চৌধুরী। ঘটনার উল্লেখ করে এমদাদুল ইসলাম বলেন, ঐ দিন আমার ও আমার বন্ধু আবু জাফর চৌধুরীর উপর নাজিরহাট ও ফটিকছড়িতে কর্মসূচি সফল করার দায়িত্ব অর্পিত হয়েছিল। হাজারখানেক লোকের এক মিছিল ও মিছিল শেষে একটি সভা হয়েছিল নাজিরহাটে। মুসলিম লীগের বাধাপ্রদান সত্ত্বেও নাজিরহাটের হরতাল পুরোমাত্রায় সফল হয়েছিল (ইসলাম, ১৯৯৩)।

একুশে শহিদদের স্মরণে প্রথম শহিদ স্মৃতিস্তম্ভও স্থাপিত হয়েছিল চট্টগ্রামে। খুরশীদ মহল সিনেমা হলের সামনে অবস্থিত বর্তমান পেট্রোল পাম্প এলাকা তখন লালদীঘি ময়দানের অংশ ছিল। সেখানে (তখন ভিক্টোরিয়া পার্ক নামে একটি পার্ক ছিল) সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির নেতা-কর্মীরা ২২শে ফেব্রুয়ারি সকালের মধ্যে ছোটোখাটো স্মৃতিস্তম্ভ (শহিদবেদির আঙ্গিকে) তৈরি করেছিলেন। এদিন হরতাল-সমাবেশের পাশাপাশি এই স্মৃতিস্তম্ভে কিছু কিছু পুস্পস্তবকও পড়েছিল। কিন্তু দু'একদিন পর পুলিশ এসে তা ভেঙে দেয়। এ প্রসঙ্গে ভাষা সৈনিক মাহবুব উল আলম বলেন, "ঢাকায় কিন্তু স্মৃতিস্তম্ভ হয়েছিল ২৩শে ফেব্রুয়ারি। আমাদের প্রথম স্মৃতিস্তম্ভটি ভেঙ্গে দেয়ার পর ঠিক করা হয়েছিল ঐখানেই অর্থাৎ ভিক্টোরিয়া পার্কেই শহীদ স্মৃতি সৌধ গড়ে তুলবো। কিন্তু তখন কি কারণে জানি না মিউনিসিপ্যালিটি ঐ জায়গাটি ব্যক্তি মালিকানায় দিয়ে দিল, ফলে ওখানে আর স্মৃতিস্তম্ভ গড়ে তোলা সম্ভব হয়নি।" (চৌধুরী, ১৯৯৩)।

২৩শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে অসংখ্য শোকমিছিল বের হয়। তাছাড়া ২৪ তারিখ হরতাল ও জনসভা সফল করার লক্ষ্যে সারাদিন প্রচারকার্য চালানো হয়। ঘোড়ার গাড়িতে মাইক লাগিয়ে বা কখনো কখনো চোঙ দিয়ে মিছিল সহকারে প্রচার কাজ চলেছিল এবং পাশাপাশি ব্যাপকভাবে পোস্টারিং ও লিফলেট বিতরণ করা হয়। ১৯৫২ সালের জুন মাসে তমদ্দুন মজলিস কর্তৃক প্রকাশিত "ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস" নামক পুস্তিকার প্রচ্ছদে ঐ মিছিলের তিনটি ছবি ছাপানো হয় (চৌধুরী, ১৪০২, পৃ. ৩৭)।

২৪শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র জেলাব্যাপী পূর্ণ-দিবস হরতাল পালিত হয় এবং পূর্ব সিদ্ধান্ত অনুযায়ী ২৪ তারিখ বিকাল ৪টায় লালদীঘি ময়দানে সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদের উদ্যোগে এক বিশাল প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। সভায় লক্ষাধিক জনতার সমাবেশ ঘটে। ১৯৪৭ সালে ভারত-বিভক্তির পর লালদীঘি ময়দানে এটা ছিল ব্যতিক্রমধর্মী বিশাল গণসমাবেশ। এই সভায় সভাপতিত্ব করেন তৎকালীন আওয়ামী মুসলিম লীগের জেলা সভাপতি মোজাফফর আহমেদ। বক্তাদের মধ্যে ছিলেন জহুর আহমেদ চৌধুরী, চৌধুরী হারুনর রশিদ, অধ্যাপক সুলতানুল আলম চৌধুরী ও তমদ্দুন মজলিস নেতা আজিজুর রহমান। এছাড়া মুসলিম লীগ নেতা রফিকউদ্দীন সিদ্দীকী ও এ. কে. খান এতে বক্তব্য রাখেন (রহমান, ১৯৯৩, পৃ. ২০২)।

কবি আবদুস সালাম (১৯০৮-১৯৮৭) সম্পাদিত *দৈনিক পূর্ব্ব পাকিস্তান* পত্রিকাটি ১৯৫৮ সালে আইয়ুব খান (১৯০৭-১৯৭৪) কর্তৃক সামরিক শাসন জারির আগ পর্যন্ত মুসলিম লীগ সরকারকে প্রত্যক্ষভাবে সমর্থন জুগিয়েছিল। তবে বাংলা ভাষার প্রতি তাঁর (কবি আবদুস সালামের) যে গভীর অনুরাগ ছিল তারও প্রমাণ পাওয়া যায়। যদিও ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মুহূর্তের কিংবা তার পূর্ববর্তী বা অব্যবহিত পরবর্তী সময়ে প্রকাশিত এই পত্রিকাটির কোনো কপি পাওয়া যায়নি, কিন্তু ৩০শে জুলাই ১৯৫৩ সালে প্রকাশিত একটি সম্পাদকীয়তে বাংলাভাষার পক্ষে পত্রিকাটির জোরালো সমর্থন লক্ষ করা যায়। '*দৈনিক পূর্ব্ব পাকিস্তান* কেন মোহাম্মদ আলীকে সমর্থন করে' শীর্ষক একটি সম্পাদকীয় নিবন্ধে বলা হয়:

> মাতৃভাষা প্রত্যেকটি লোকের কাছে প্রাণের চেয়ে প্রিয়। ইহার প্রমাণ, বিগত ভাষা আন্দোলনে নাজিমী ঔদ্ধত্যের নিকট মাতৃভাষা বাংলার দাবীকে বিসর্জ্জন না দিয়া বাংলার যুবজনতা দিয়েছে প্রাণ। এই মহান আত্মদানের নেকট অবশেষে নিজামী বেয়নেট মাথা হেট করিতে বাধ্য হইয়াছিল। ...গণতান্ত্রিক পাকিস্তানে যতদিন বাঙালি জীবিত থাকিবে, ততদিন এমন কোন তৈমুর চেঙ্গিস নাই, যে বাংলাভাষাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হওয়ার দাবী হইতে বিচ্যুত করার দুঃসাহস করিবে। ...তিনি যদি বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্র ভাষা করিতে পারেন, তবে তিনি বাংলার ইতিহাসে অমর হইয়া থাকিবেন (*দৈনিক পূর্ব্ব পাকিস্তান*, সম্পাদকীয়, ৩০শে জুলাই ১৯৫৩)।

২৫শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রাম শহরের একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা হলো ছাত্রীদের স্বতন্ত্র মিছিল। ঐ দিন চট্টগ্রাম কলেজ ও স্থানীয় মহিলা বিদ্যালয়সমূহের ছাত্রীরা লরি ও বাসে করে 'মন্ত্রীসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', প্রভৃতি স্লোগান দিয়ে শহরের প্রধান প্রধান সড়ক প্রদক্ষিণ করে। চট্টগ্রামের ইতিহাসে মহিলাদের এ ধরনের স্বতন্ত্র বিক্ষোভ প্রদর্শন এটাই প্রথম, পরে এক সমাবেশে ছাত্রীরা ঢাকায় পুলিশের গুলি বর্ষণের তীব্র প্রতিবাদ জানায় এবং মন্ত্রীসভার পদত্যাগ দাবি করে। গণপরিষদ কর্তৃক বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি না দেওয়া পর্যন্ত আন্দোলন চালিয়ে যাওয়ার অঙ্গীকার করা হয় (*দৈনিক আজাদ*, ২৭শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২)।

২৮শে ফেব্রুয়ারি চট্টগ্রামে আবার হরতাল পালিত হয়। ঢাকায় পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের সর্বত্র অসন্তোষ দেখা দেয়। জেলার বিভিন্ন অংশ থেকে ছাত্ররা শহরে জমায়েত হয় এবং এক মাইল দীর্ঘ

শোকমিছিলের মাধ্যমে শহিদদের আত্মার প্রতি শ্রদ্ধা জ্ঞাপন করা হয়। এদিন পুনরায় চট্টগ্রামের সমস্ত স্কুল-কলেজের ছাত্রীরা খালি পায়ে এক বিরাট মিছিল বের করে এবং 'মন্ত্রীসভার পদত্যাগ চাই', 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' প্রভৃতি ধ্বনি উচ্চারণ করে শহরের বিভিন্ন রাস্তা প্রদক্ষিণ করে (*দৈনিক আজাদ*, ২রা মার্চ, ১৯৫২)।

১৯৫২ সালের ৫ই মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের আহ্বানে সমগ্র পূর্ববাংলায় শহিদ দিবস পালিত হয়। সেদিন পূর্ব-বাংলার সবচেয়ে বড়ো জনসভা হয় চট্টগ্রামে। লালদীঘি মাঠে অনুষ্ঠিত এ জনসভায় সভাপতিত্ব করেন শেখ মোজাফফর আহমেদ। বক্তৃতা করেন জহুর আহমেদ চৌধুরী, মাহমুদুন্নবী চৌধুরী, এম. এ. আজিজ, আজিজুর রহমান প্রমুখ। সভার পর এক বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। মিছিলকারীরা লালদীঘি পার্ককে 'রাষ্ট্রভাষা শহীদ পার্ক', লয়েল রোডকে 'শহীদ সালাউদ্দিন রোড', টেরিবাজার রোডকে 'শহীদ বরকত রোড', লাভলেনকে 'শহীদ জব্বার রোড', এমপ্রেস রোডকে 'রাষ্ট্রভাষা শহীদ রোড' নামে অভিহিত করে সাইনবোর্ড টাঙিয়ে দেয়। সংগ্রাম কমিটির কর্মীরা দলে দলে বিভিন্ন মহল্লায় গিয়ে পরিবর্তিত নামগুলো ঘোষণা করে এবং চট্টগ্রাম পৌরসভাকে এই ঘোষণা কার্যকর করার অনুরোধ জানিয়ে সর্বসম্মত প্রস্তাব গ্রহণ করে (চৌধুরী, ২০১৩, পৃ. ১২৫)।

সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদের এক বৈঠকে ধর্মঘট প্রত্যাহারের সিদ্ধান্ত গৃহীত হওয়ায় ৮ই মার্চ থেকে স্কুল কলেজের ছাত্রছাত্রীরা ধীরে ধীরে ক্লাসে যোগ দেওয়া শুরু করে। এতে ভাষা আন্দোলনকে কেন্দ্র করে উত্তপ্ত চট্টগ্রামের উত্তাল আন্দোলন ক্রমে শিথিল হয়ে পড়ে। মাতৃভাষা তখন জাতিসত্তার অস্তিত্বের প্রশ্নে আপামর জনসাধারণকে সচেতন ও ঐক্যবদ্ধ করার প্রয়াসে ছাত্র-শিক্ষক, রাজনৈতিক ও সংস্কৃতকর্মীরা বিভিন্ন কর্মকাণ্ডে জড়িয়ে পড়ে। এমনকি, গ্রামে-গঞ্জে কৃষক, শ্রমিক, মেহনতি জনতাকেও তারা সক্রিয় করে তোলার চেষ্টা চালায়। এভাবে কেন্দ্রীয় নীতির সাথে সামঞ্জস্য রেখে চট্টগ্রামে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন স্তিমিত হয়ে যায়।

উপসংহার

বাঙালির স্বাধিকার আন্দোলনের প্রথম ধাপ ভাষা আন্দোলনের (১৯৪৮-১৯৫২) সময়কালে চট্টগ্রাম থেকে প্রকাশিত সংবাদপত্র বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে দৃঢ় ও সুস্পষ্ট ভূমিকা পালন করেছিল। বাংলা ভাষার স্বপক্ষে এবং পাকিস্তানি সরকারের উর্দুকীকরণের প্রতিবাদে চট্টগ্রামের এ-সকল সংবাদপত্রে প্রকাশিত বিভিন্ন লেখনী, সম্পাদকীয়, প্রতিক্রিয়া, কবিতা বাংলা ভাষার পক্ষে জনমতকে প্রভাবিত করেছিল। সংবাদপত্রের পাশাপাশি চট্টগ্রামের বিভিন্ন শিক্ষা-প্রতিষ্ঠান, প্রথিতযশা ব্যক্তিবর্গ, কবি, শিল্পী, সাহিত্যিক বিভিন্ন কর্মসূচি ও লেখনীর মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রকে প্রসারিত করেছিল। চট্টগ্রামের ছাত্রসমাজ থেকে শুরু করে সর্বস্তরের জনতা ভাষার দাবিতে সোচ্চার ভূমিকা পালন করে। সংবাদপত্রগুলি নিজস্ব প্রতিবেদন, সম্পাদকীয় মতামত, কবি, সাহিত্যিক তথা সর্বস্তরের জনগণের লেখনী প্রচার করে ভাষা আন্দোলনকে গণদাবিতে পরিণত করেছিল, যার ফলে ক্ষমতাসীন সরকার বাংলা ভাষার দাবির পক্ষে নতি স্বীকারে বাধ্য হয়। ভাষা আন্দোলনের এ সাফল্য পরবর্তী সময়ে বাঙালিকে ন্যায্য দাবি আদায়ে সাহস জুগিয়েছিল।

টীকা

১. ১৯৫৫ সালের ২১ ও ২২শে ফেব্রুয়ারি এ দু'দিন মনজুরা বেগম লাল কালি দিয়ে কবিতাটি ডায়েরিতে তুলে রেখেছিলেন। এ প্রসঙ্গে মনজুরা বেগম ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধের' কথা স্মরণ করে বললেন:

একাত্তর সালে মুক্তিযুদ্ধের সময় কবিতাটি নিয়ে আবার ভয় পেয়েছিলাম। তখন আমরা ও ভাবীরা একসাথে থাকি। মফিদুল ছাত্র ইউনিয়ন করত। মুক্তিযুদ্ধের পক্ষে কাজ করত। তাই ভয় হতো, পাক বাহিনী এসে বাড়ীতে তল্লাসী চালিয়ে কবিতাটি যদি দেখতে পায় তাহলে ঝামেলা হবে। তাই '৭১ সালে ডায়েরীটা আবার লুকিয়ে রেখেছিলাম। '৫২ থেকে '৭১ এই দীর্ঘ সময় অতিক্রান্ত হওয়ার পর দেশ স্বাধীন হলো। আমি খেলাঘরের সাথে জড়িত ছিলাম। বহুবারই খেলাঘরের কর্মীরা বলেছে, খালাম্মা, চলুন আমরা সবাই মিলে কবিতাটি বাংলা একাডেমীতে জমা দিয়ে আসি। কিন্তু যাই যাই করে আর যাওয়া হলো না। হঠাৎ একদিন সম্ভবতঃ '৮৭ সালে টেলিভিশনে মাহবুব উল আলম চৌধুরীর একটি সাক্ষাৎকার দেখলাম। ভদ্রলোক বললেন যে, কবিতাটি তিনি খুঁজে পাচ্ছেন না। মাত্র ৪ লাইন মনে আছে। তাই আমি চট্ করে ডায়েরীতে কবিতাটির পাশে ভদ্রলোকের নামটা লিখে রাখলাম। পরে মফিদুলের মাধ্যমে তাঁর কাছে কবিতাটি পাঠিয়ে দিলাম। (বেগম, *দৈনিক পূর্বকোণ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩)।

তথ্যসূত্র

আলী, সৈয়দ মুজতবা (১৩৬৩ বঙ্গাব্দ)। *পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা*। চট্টগ্রাম: বইঘর।

চৌধুরী, নাসিরুদ্দিন (প্রধান সম্পাদক, ২০১৩)। *মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*। চট্টগ্রাম: বাংলাদেশ মুক্তিযোদ্ধা সংসদ চট্টগ্রাম জেলা ইউনিট কমান্ড।

চৌধুরী, মোহাম্মদ আলী (কার্তিক-পৌষ, ১৪০২)। 'ভাষা আন্দোলনে চট্টগ্রাম : রাজনৈতিক, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপট'। ঢাকা: *একাডেমি পত্রিকা*।

মতিন, আবদুল ও অন্যান্য (১৯৯২)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও তাৎপর্য*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

মুসা, মনসুর (সম্পা. ১৯৭৪)। *বাঙলাদেশ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

রহমান, সাঈদ-উর (২০০১)। *বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪০-৮২)*। ঢাকা: অন্যান্য প্রকাশ।

রহমান, ডা. মাহফুজুর (১৯৯৩)। *বাঙালির জাতীয়তাবাদী সংগ্রাম মুক্তিযুদ্ধে চট্টগ্রাম*। চট্টগ্রাম: বাংলাদেশের মুক্তিসংগ্রাম ও মুক্তিযুদ্ধ গবেষণা কেন্দ্র।

হক, আব্দুল (১৯৭৬)। *ভাষা আন্দোলনের আদি পর্ব*। ঢাকা: অবসর ।

হক, চৌধুরী জহুরুল (২০০২)। *প্রসঙ্গ : একুশের প্রথম কবিতা*। চট্টগ্রাম: কোহিনূর প্রকাশন।

হোসেন, ড. আবু মোঃ দেলোয়ার (২০০৮)। *বাংলাদেশের ইতিহাস : ১৯০৫-১৯৭১*। ঢাকা: বিশ্ববিদ্যালয় প্রকাশনী।

পত্রিকা

দৈনিক আজাদ (১৯৪৭), ৩০শে জুন, ১৯৪৭, *দৈনিক আজাদ* (১৯৫২), ২২, ২৪, ২৬ ও ২৭শে ফেব্রুয়ারি।

সাপ্তাহিক কোহিনূর (১৯৫১) ২য় বর্ষ, ৪র্থ সংখ্যা, *সাপ্তাহিক কোহিনূর* (১৯৫২), ২য় বর্ষ, ৫ম সংখ্যা, ২য় বর্ষ, ৬ষ্ঠ সংখ্যা।

দৈনিক সৈনিক (১৯৫২), ১৬ই মার্চ।

দৈনিক ইত্তেহাদ (১৯৪৭), ২৭শে জুলাই।

দৈনিক আজাদ (১৯৪৭), ২৯শে জুলাই।

দৈনিক ইনসাফ (১৯৫২), ২৩শে জুন।

দৈনিক পূর্ব্ব পাকিস্তান (১৯৫৩), সম্পাদকীয়, ৩০ জুলাই।

দৈনিক ইনকিলাব (১৯৯৫), অমর একুশে সংখ্যা।

'চট্টগ্রামে ভাষা আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক এম. এ. হালিমের স্মৃতিচারণ'। ১৩ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক মাহবুব উল আলম চৌধুরীর স্মৃতিচারণ'। ১৮ই ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক মাহবুব হাসানের স্মৃতিচারণ'। ২০শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক কৃষ্ণ গোপাল সেন-এর স্মৃতিচারণ'। ২৫শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক আবদুল্লাহ হারুন-এর স্মৃতিচারণ'। ২৬শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক এমদাদুল ইসলাম-এর স্মৃতিচারণ'। ২৭শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

'ভাষা সৈনিক এজহারুল হকের স্মৃতিচারণ'। ২৮শে ফেব্রুয়ারি ১৯৯৩। *দৈনিক পূর্বকোণ*।

সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন ও একুশ নির্মাণ

মো. মফিজুর রহমান
মোছা. নাসরিন আক্তার

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookMafiz

ভূমিকা

বাংলাদেশের রাষ্ট্রভাষা দিবস ২১শে ফেব্রুয়ারি 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বজুড়ে উদ্‌যাপিত হয়। মাতৃভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য প্রাণদান ইতিহাসে খুব বেশি ঘটেনি। মূলত ১৯৪৮-৫২ সালের ভাষা আন্দোলনেই বাংলাদেশের উদ্ভবের বীজ নিহিত বলে ইতিহাসবেত্তা ও রাজনৈতিক বিশ্লেষকরা মনে করেন। একটি জাতির ইতিহাস, ঐতিহ্য, কৃষ্টি ও অর্জন প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে গণমাধ্যম বিভিন্ন আধেয়ের মধ্যে দিয়ে সঞ্চালিত করে। তৎকালীন পূর্ব-পাকিস্তানের বাঙালি মালিকানাধীন সংবাদপত্রগুলো ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন দিক তুলে ধরে ভবিষ্যৎ রাষ্ট্রের ভাবগত ক্ষেত্র প্রস্তুতিতে সহায়তা করেছিল। স্বাধীনতা-উত্তরকালেও সংবাদপত্র জাতিরাষ্ট্রের উপস্থাপন বিশেষত বাংলা ভাষার গুরুত্ব, মাতৃভাষার অধিকার অর্জনে প্রদত্ত মূল্য, সর্বক্ষেত্রে বাংলাভাষার প্রচলনসহ ভাষাভিত্তিক মূল্যবোধ, চেতনা ও ঐতিহ্যের তথ্যপ্রবাহে অগ্রণী ভূমিকা রেখেছে। নানামুখী তৎপরতার ফলস্বরূপ আমাদের ভাষা আন্দোলন সাংস্কৃতিক পরিচয়ের সংগ্রামের প্রতীক হিসেবে বিশ্বসমাজে স্বীকৃতি লাভ করেছে। পরবর্তীকালে 'ভাষা দিবস' একুশকে ঘিরে দেশের সংবাদপত্রগুলোতে উৎসবের আমেজ তৈরির প্রবণতা দেখা যায়। পত্রিকায় এ দিবসকে ঘিরে বিভিন্ন পাঠকের জন্য লাইফস্টাইল পাতার আধেয়তে দেখা যায় কেমন পোশাক পরবে, কেমন খাবারের রান্না হবে, কোন রেস্তোরাঁয় কেমন অফার ইত্যাদি এবং সেইসাথে দেখা যায় বিভিন্ন ফ্যাশন-ব্যান্ডের পোশাকের বিজ্ঞাপন। বর্তমান প্রবন্ধে সংবাদপত্রে একুশ নির্মাণের বিবর্তন অনুসন্ধান করা হয়েছে। সমাজে গণযোগাযোগের কাজ, গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পণ্য-সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যম ও ভোগবাদের তাত্ত্বিক কাঠামো অনুসরণ করে সংবাদপত্রে একুশ নির্মাণ পর্যালোচনা করা হয়েছে বর্তমান নিবন্ধে।

ভাষা আন্দোলন

১৯৪৭ সালে ব্রিটিশ শাসন থেকে স্বাধীনতা লাভের পর ভারতবর্ষ ভাগ হয়ে দুটি স্বাধীন রাষ্ট্র ভারত ও পাকিস্তান সৃষ্টি হয়। পাকিস্তান দুটি অংশে বিভক্ত ছিল– পূর্ব-পাকিস্তান (বর্তমান বাংলাদেশ) এবং পশ্চিম-পাকিস্তান (বর্তমান পাকিস্তান)। ভাষা, সংস্কৃতি এবং জীবনযাত্রার দিক থেকে এ দুই অংশের মধ্যে ছিল বিস্তর তফাত। প্রতিষ্ঠার পর থেকেই পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকরা উর্দুকে পুরো পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা করার উদ্যোগ নেয়। কিন্তু পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ; যাদের মাতৃভাষা প্রধানত বাংলা, তারা এই সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। ১৯৪৭ সালের ডিসেম্বরের শেষের দিকে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার সমর্থনে সর্বপ্রথম রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠিত হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের প্রথম অধিবেশনে পূর্ব-পাকিস্তানের প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত উর্দু ও ইংরেজির সাথে বাংলাকেও গণপরিষদের

ভাষা হিসেবে ব্যবহারের দাবি তোলেন। তবে তমিজুদ্দিন খানের নেতৃত্বে পরিষদে উপস্থিত মুসলিম লীগের সকল মুসলিম সদস্য একযোগে এ দাবির বিরোধিতা করেন। খাজা নাজিমুদ্দিন এ প্রস্তাবের বিরোধিতা করে বক্তব্যও দেন। ১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ্ ঢাকা সফরে এসে এক সমাবেশে ঘোষণা করে, "উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা"। ২৪শে মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্জন হলে গিয়েও তিনি একই ঘোষণা দেন। এর প্রতিবাদে পূর্ব-পাকিস্তানে তীব্র প্রতিক্রিয়া সৃষ্টি হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ বিভিন্ন শিক্ষা প্রতিষ্ঠানের শিক্ষার্থীরা বাংলাকে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতির দাবি নিয়ে আন্দোলন শুরু করে।

আন্দোলন আরো জোরালো হয় ১৯৫২ সালে। তৎকালীন প্রধানমন্ত্রীর পদে আসীন খাজা নাজিমুদ্দিন ঢাকায় এসে ২৭শে জানুয়ারি পল্টন ময়দানের এক জনসভায় দীর্ঘ ভাষণ দেন। এ ভাষণে তিনি জিন্নাহ্'র ঘোষণার পুনরুক্তি করে বলেন, "পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু"। তার এই বক্তব্যর প্রতিবাদে 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' ২৯শে জানুয়ারি প্রতিবাদ-সভা এবং ৩০শে জানুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করে। ৩১শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরি হলে অনুষ্ঠিত সভায় মওলানা ভাসানীর নেতৃত্বে ৪০ সদস্যের 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মী পরিষদ' গঠিত হয়। পরিষদ ২১শে ফেব্রুয়ারি হরতাল, সমাবেশ ও মিছিলের বিস্তারিত কর্মপরিকল্পনা গ্রহণ করে। ৪ঠা ফেব্রুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ অন্যন্য শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছাত্ররা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রাঙ্গণে এসে সমবেত হয়। সমাবেশ থেকে আরবি লিপিতে বাংলা লেখার প্রস্তাবের প্রতিবাদ এবং বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের দাবি জানানো হয়। ২০শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান সরকার স্থানীয় প্রশাসনের মাধ্যমে ২১শে ফেব্রুয়ারি থেকে এক মাসের জন্য ঢাকায় সভা-সমাবেশ ও মিছিল নিষিদ্ধ করে ১৪৪ ধারা জারি করে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ২১শে ফেব্রুয়ারি শান্তিপূর্ণ মিছিল বের করে। কিন্তু পাকিস্তানি পুলিশ সেই মিছিলের উপর গুলি চালায় এবং এতে সালাম, রফিক, বরকত, জব্বারসহ অনেকে নিহত হন। এ রক্তক্ষয়ী ঘটনার পর সারা পূর্ব-পাকিস্তানে ব্যাপক প্রতিক্রিয়া এবং প্রতিবাদ দেখা দেয়। শেষ পর্যন্ত, ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সরকার বাধ্য হয়ে বাংলাকে উর্দুর পাশাপাশি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেয়।

গবেষণার যৌক্তিকতা

ভাষা আন্দোলন বাঙালি জাতির স্বাধীনতা আন্দোলনের বীজ বুনে দিয়েছিল। ফলে বলা চলে, এটা তাদের জাতীয় অস্তিত্বের সাথে গভীরভাবে সম্পর্কিত। বাঙালির জাতীয় চেতনা ও মর্যাদার প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারি পরবর্তীকালে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বব্যাপী স্বীকৃতি পায়। ভাষা আন্দোলন ও একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহ্য ও মহিমা ধারণ ও প্রচারের ক্ষেত্রে সংবাদপত্র গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছিল। তবে পরবর্তীকালে সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলনকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে বিবর্তন লক্ষ করা গেছে। এ বিবর্তনের স্বরূপ বর্তমান গবেষণা নিবন্ধে অনুসন্ধান করা হবে। কারণ, প্রাসঙ্গিক সাহিত্য-পর্যালোচনার পর দেখা গেছে, এ বিষয়ে গবেষণাকর্ম এবং লেখালেখি খুবই অপ্রতুল। সেই শূন্যতা বর্তমান অনুসন্ধানের মাধ্যমে পূরণের চেষ্টা করা হবে। গবেষণাটি ভাষা আন্দোলনের সঠিক ইতিহাস সংরক্ষণ ও প্রচারের গুরুত্ব সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করবে এবং কর্পোরেট আগ্রাসনের বিরুদ্ধে জাতীয় ঐতিহ্য রক্ষায় নীতিমালা প্রণয়নে সহায়তা করবে।

গবেষণার প্রশ্ন

বর্তমান গবেষণায় বাংলাদেশের জাতীয় পত্রিকাগুলোতে ভাষা আন্দোলন ও একুশের চেতনা উপস্থাপনের বিবর্তন হয়েছে কি না, তা মূল অনুসন্ধানের বিষয় হিসেবে নির্ধারণ করা হয়েছে। মূল প্রশ্নকে আরো কয়েকটি সম্পূরক প্রশ্নে ভাগ করা হয়েছে। সামগ্রিকভাবে গবেষণা প্রশ্নগুলো নিম্নরূপ:

- ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটে বাংলাদেশের সংবাদপত্রের ভূমিকা কী ছিল?
- একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনা এবং এর মহিমা সাম্প্রতিক সময়ে পত্রিকাগুলোতে কীভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে?
- ভাষা আন্দোলন এবং একুশের চেতনাকে উপস্থাপনের ক্ষেত্রে সাম্প্রতিক সময়ে সংবাদপত্রগুলোতে বাণিজ্যিকীকরণের প্রবণতা দেখা যায় কি না?

তাত্ত্বিক কাঠামো

বর্তমান গবেষণা-নিবন্ধে তাত্ত্বিক কাঠামো হিসেবে সমাজে গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা, গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি, পণ্য সংস্কৃতি এবং গণমাধ্যম ও ভোগবাদ তত্ত্বগুলো অনুসরণ করে 'সংবাদপত্রে একুশ নির্মাণ' পর্যালোচনা করা হয়েছে। নিম্নে তত্ত্বগুলোর সংক্ষিপ্ত পরিচিতি এবং কীভাবে তত্ত্বগুলো ব্যবহার করা হবে তা আলোচনা করা হলো।

সমাজে গণ-যোগাযোগের কাজ

১৯৪৭ সালে হাচিনস কমিশন (Hutchins Commission) গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা তত্ত্বটি প্রস্তাব করে। এ তত্ত্বের মূল বক্তব্য হলো গণমাধ্যম কোনো ধরনের সরকারি নিয়ন্ত্রণ এবং সেন্সরশিপ ছাড়াই স্বাধীনভাবে কাজ করবে, তবে একই সাথে সমাজের মঙ্গলার্থে দায়িত্বশীলতার ব্যাপারটাও বজায় রাখতে হবে। গণমাধ্যম কেবল ব্যবসায়িক লাভের জন্য নয় বরং সমাজের উন্নয়নে কাজ করবে দায়িত্বশীলতার সাথে (হাচিন্স, ১৯৪৭)। সীবার্ট এবং অন্যান্যদের মতে, গণমাধ্যমকে নিরপেক্ষ ও সত্যনিষ্ঠ থাকতে হবে, সংবাদ ও তথ্যের সঠিকতা নিশ্চিত করতে হবে, যাতে জনগণ সঠিক তথ্যের ভিত্তিতে সিদ্ধান্ত নিতে পারে (সীবার্ট ও অন্যান্য, ১৯৫৬)। ড্যানিস ম্যাককুইলের মতে, গণমাধ্যমের কাজ হচ্ছে জনমত গঠন, শিক্ষা প্রদান, এবং সমাজের বিভিন্ন সমস্যা বৃহত্তর স্বার্থে সমাধানের জন্য তুলে ধরা (ম্যাককুইল, ২০১০)। ম্যাককুইল আরো বলেছেন, গণমাধ্যমের একটি প্রধান ভূমিকা হলো সামাজিক উত্তরাধিকার তৈরি করা (ম্যাককুইল, ২০১০)। অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের স্থানান্তর ঘটানো। হ্যারল্ড ডি. ল্যাসওয়েল তাঁর যোগাযোগ-তত্ত্বে সামাজিক ঐতিহ্যের ট্রান্সমিশন নিয়ে আলোচনা করেছেন। তাঁর মতে, সামাজিক ঐতিহ্য হলো সমাজের মূল্যবোধ, বিশ্বাস, প্রতীক এবং আচার-অনুষ্ঠানের সমষ্টি, যা প্রজন্ম থেকে প্রজন্মান্তরে পরিবাহিত হয় এবং এ দায়িত্ব পালনে গণমাধ্যমের ভূমিকা অপরিসীম (ল্যাসওয়েল, ১৯৪৮)।

পণ্য-সংস্কৃতি

পণ্য-সংস্কৃতি বলতে এমন একটি ব্যবস্থাকে বোঝায় যেখানে বস্তু, বিষয়, জীব কিংবা মানবীয় উপাদান যেমন মূল্যবোধ, রীতিনীতি, প্রথা, সামাজিক সম্পর্ক ইত্যাদিকে পণ্যে রূপান্তর করা হয়। পণ্য-সংস্কৃতির

ধারণাটি মার্কসবাদী তত্ত্বের উপর ভিত্তি করে গড়ে উঠেছে। বিজ্ঞাপন শিল্পে বহুল ব্যবহৃত একটি কৌশল হচ্ছে মানবীয় বিষয়গুলোকে পণ্যের মধ্যে প্রতিস্থাপিত করে পণ্যকে প্রাণ দিয়ে পণ্যের বিক্রি নিশ্চিত করা। যেটাকে কার্ল মার্কস 'কমোডিটি ফেটিশিজম' বলেছেন। পণ্য-সংস্কৃতি সম্পর্কে মস্কো (১৯৯৬) বলেছেন, পণ্যায়ন তখনই ঘটে যখন তথ্য, বিষয়বস্তু, এমনকি একজন ব্যক্তির ব্যক্তিগত জীবনও পণ্য হিসেবে রূপান্তরিত হয়, যা বিক্রি এবং কেনা যেতে পারে। পুঁজিবাদী সমাজব্যবস্থায় গণমাধ্যম সবকিছুকেই পণ্যে রূপান্তর করে, যার মূল লক্ষ্য মুনাফা অর্জন। এর ফলে ইতিহাস, ঐতিহ্য এবং সংস্কৃতির মতো বিষয়গুলোও বাদ যায় না। হোসকিন্স ও ম্যাকফেডেন (২০০০) উল্লেখ করেন, গণমাধ্যমে সবকিছুই প্রদর্শিত হয় একটি নির্দিষ্ট পণ্য বা পরিষেবা বিক্রির উদ্দেশ্যে। একইভাবে, শিলার (১৯৮৯) বলেন, গণমাধ্যম কেবল বিনোদন বা তথ্য সরবরাহের মাধ্যম নয়, এটি পুঁজিবাদী ব্যবস্থার অংশ, যা সবকিছুকে বাণিজ্যিক পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করে। ইতিহাস ও সংস্কৃতির পণ্যায়ন সম্পর্কে হোমি কে. ভাভা (১৯৯৪) বলেন, গণমাধ্যমে ইতিহাস ও সংস্কৃতি একটি নির্দিষ্ট দৃষ্টিকোণ থেকে উপস্থাপিত হয়, যা প্রায়শই পুঁজিবাদী স্বার্থে প্রভাবিত হয়।

গণমাধ্যমের ভোগবাদ তত্ত্ব

ভোগবাদ হচ্ছে এমন একটি সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা, যা ক্রমাগত ক্রমবর্ধমান পরিমাণে পণ্য ও পরিষেবার অধিগ্রহণকে উৎসাহিত করে। এ ধরনের ব্যবস্থায় ভোগ্যপণ্য এবং বস্তুগত সম্পদ অর্জনের উপরই সমাজে মানুষের মর্যাদা, সম্মান, যোগ্যতা-অযোগ্যতা, কিংবা সংস্কৃতির অন্য বিষয়গুলো নির্ভর করে। থিওডর অ্যাডর্নো এবং ম্যাক্স হর্কহাইমার তাদের *Dialectic of Enlightenment* গ্রন্থে গণমাধ্যমের সাহায্যে কীভাবে সমাজে ভোগবাদী সংস্কৃতির বিস্তার ঘটে, তা আলোচনা করেন। তাঁরা 'কালচার ইন্ডাস্ট্রি'র ধারণা দেন। তাঁদের মতে, গণমাধ্যম মানুষের সাংস্কৃতিক চাহিদাগুলোকে নিয়ন্ত্রণ করে এবং ভোগবাদের মাধ্যমে একটি সমাজ তৈরি করে, যেখানে ভোক্তা হিসেবে মানুষের পরিচয় গড়ে ওঠে।

ফরাসি মার্কসবাদী তাত্ত্বিক গাই ডেবর্ড 'The Society of the Spectacle'-এর কথা বলেন। এর মাধ্যমে তিনি এমন একটি অবস্থাকে বুঝিয়েছেন, যেখানে মানুষ সরাসরি অভিজ্ঞতার বদলে বরং ছবি, চিত্র এবং রেপ্রিজেন্টেশনের মাধ্যমে বাস্তবতাকে উপলব্ধি করে। গণমাধ্যম, বিজ্ঞাপন এবং জনপ্রিয় সংস্কৃতি এই স্পেক্ট্যাকল মাধ্যম হিসেবে কাজ করে। ডেবর্ড (১৯৯৫) মনে করেন, সমাজে মানুষের জীবনধারা ও সামাজিক সম্পর্ক গণমাধ্যমের মাধ্যমে গড়ে ওঠে এবং মানুষ ক্রমাগত ভোগবাদী মানসিকতার দিকে ঝোঁকে।

গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি

গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি হলো এমন একটি তত্ত্ব যা গণমাধ্যমের মালিকানার সাথে গণমাধ্যমের প্রচারিত বার্তা বা আধেয়ের সম্পর্ক খোঁজে। বলা হয়, গণমাধ্যম প্রতিষ্ঠান শুধুই মুনাফা লাভের উদ্দেশ্য রাখে না, একইসাথে অন্য রাজনৈতিক উদ্দেশ্যও থাকে। অর্থাৎ গণমাধ্যম কেবল তথ্য সরবরাহকারী নয় বরং একটি ব্যবসায়িক এবং রাজনৈতিক প্রতিষ্ঠানও।

হার্বার্ট শিলার (১৯৮৯) বলেন, "গণমাধ্যমের ওপর কর্পোরেট সংস্থার নিয়ন্ত্রণ রয়েছে এবং তারাই মিডিয়ার আধেয়ের মাধ্যমে কর্পোরেট শক্তির অনুকূলে একটি নির্দিষ্ট ধরনের রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক মূল্যবোধকে সামনে এগিয়ে দেয়।"

হ্যাবারমাস (১৯৮৯) গণমাধ্যমকে 'পাবলিক স্ফিয়ার'-এর ধারণার সাথে যুক্ত করেন; যেখানে তিনি বলেন, গণমাধ্যম আসলে জনগণের রাজনৈতিক বিতর্কের জায়গা হওয়ার পরিবর্তে বৃহৎ কর্পোরেট সংস্থার অধিকারভুক্ত হয়ে পড়েছে। এর ফলে গণমাধ্যমে প্রচারিত বার্তাগুলো স্বাধীন মত প্রকাশের পরিবর্তে কর্পোরেট এবং রাষ্ট্রীয় স্বার্থের অনুগামী হয়ে পড়ে। হারম্যান এবং চমস্কির 'Propaganda Model' উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেছে গণমাধ্যমের রাজনৈতিক অর্থনীতি তত্ত্বের বিকাশে। তাঁদের মতে, গণমাধ্যম কর্পোরেট ও রাষ্ট্রীয় স্বার্থে প্রভাবিত হয়ে কাজ করে এবং তাদের অনুকূলে সাধারণ জনগণের মতামত নিয়ন্ত্রণে সক্রিয় ভূমিকা রাখে।

গবেষণা-পদ্ধতি

বর্তমান গবেষণায় তথ্য সংগ্রহ ও বিশ্লেষণের জন্য পাঠ-পর্যালোচনা (লিটারেচার রিভিয়্যু) এবং আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। পাঠ-পর্যালোচনা পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে সংশ্লিষ্ট বিষয়ে পূর্ববর্তী গবেষণা ও দ্বৈতীয়িক তথ্য সংগ্রহের কাজে, আর আধেয়-বিশ্লেষণ পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে তথ্য-উপাত্ত বা আধেয়ের গুণগত বিশ্লেষণে। গবেষণার জন্য নমুনায়ন পদ্ধতি হিসেবে দৈবচয়ন পদ্ধতি বেছে নেওয়া হয়েছে। প্রিন্ট ও অনলাইন উভয় পত্রিকা থেকেই দৈবচয়ন পদ্ধতিতে বিশ্লেষণের জন্য আধেয় সংগ্রহ করা হয়েছে।

গবেষণা-তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণ

তথ্য উপস্থাপন ও বিশ্লেষণের সুবিধার্থে গবেষণার এ অংশকে তিনটি ভাগে ভাগ করা হয়েছে। যথা, ১. ভাষা আন্দোলন চলাকালীন সংবাদমাধ্যমে তার উপস্থাপন; ২. ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সংবাদমাধ্যমে একুশের উপস্থাপন এবং ৩. বর্তমান সময়ের সংবাদমাধ্যমে একুশের উপস্থাপন। তিন অংশের বিশ্লেষণ এবং আলোচনা অংশটি এখানে তুলে ধরা হলো:

১) ভাষা আন্দোলন চলাকালীন সংবাদপত্রে তার উপস্থাপন

গণমাধ্যম বিভিন্নভাবে ভাষা আন্দোলনকে সারা দেশে ছড়িয়ে দিতে এবং জনগণকে আন্দোলনের প্রতি সচেতন ও উৎসাহিত করতে সহায়তা করেছে। রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্কের সূত্রপাত হয় ১৯৪০ সালে লাহোর প্রস্তাব গৃহীত হওয়ার পরপরই। ওইসময় থেকে নানা আলোচনা-পর্যালোচনা শুরু হলেও বাঙালি লেখক ও সাংবাদিকগণ ভাষার বিষয়ে জোর তৎপরতা চালান ১৯৪৭-এর জুলাই থেকে (জাহান, ২০০৮)। সংবাদপত্রগুলো নিয়মিতভাবে আন্দোলনের খবর প্রচার করতো এবং এভাবে জনসাধারণ নিয়মিত তথ্য পেত। বিশেষ করে *দৈনিক আজাদ*, *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*, *দৈনিক সংগ্রাম*, *দৈনিক ইত্তেহাদ*, *দৈনিক পাকিস্তান*, এবং *সাপ্তাহিক সৈনিক*সহ আরো অনেক পত্রিকা ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বলিষ্ঠ ভূমিকা পালন করে (জাহান, ২০০৮)। পত্রিকাগুলো আন্দোলনের সময়ে সংঘটিত ঘটনা, যেমন মিছিল, প্রতিবাদ সভা, ধর্মঘট, পুলিশের গুলিবর্ষণ ইত্যাদির সচিত্র প্রতিবেদন প্রকাশ করতো। উদাহরণ হিসেবে তফাজ্জল হোসেন মানিক মিয়া সম্পাদিত *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*'র কথা উল্লেখ করা যায়। ১৯৫২ সালের ২১ ও ২২শে

ফেব্রুয়ারির ঘটনা নিয়ে *সাপ্তাহিক ইত্তেফাক*'র প্রথম পৃষ্ঠায় শিরোনাম ছিল, 'দেশের কাছে লাল ফেব্রুয়ারীর শহীদদের ডাক আসিয়াছে', 'বাংলা ভাষা সংগ্রামকে সফল করিয়া রক্তের প্রতিশোধ নাও', 'নুরুল আমিনও প্রতিশ্রুতির পিচ্ছিল পথে পা বাড়াইয়াছে', 'জনগণ হইতে বিচ্ছিন্ন সরকার আজ মিলিটারির জোরে বাঁচিয়া আছে' (রহমান, ২০১৭)।

ইত্তেফাক
THE ITTEFAK
সংগঠন শক্তি ও সফলতাই ৪ঠা ফেব্রুয়ারীর ডাক

চিত্র: ১

ইত্তেফাক
THE ITTEFAK
বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিতে জনগণ শেষ রক্তবিন্দু দিবে

চিত্র: ২

দৈনিক আজাদ'র কথাও উল্লেখ করা যায়। পত্রিকাটি 'মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে ছাত্র সমাবেশে নির্বিচারে পুলিশের গুলিবর্ষণ', 'পুলিশের গুলিতে ছাত্র নিহত' শিরোনামে সংবাদ প্রকাশ করে।

আজাদ
The Azad
মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ

চিত্র: ৩

আজাদ
পুলিশের গুলীতে ছাত্র নিহত

চিত্র: ৪

ছাত্র-জনতার ওপর পুলিশের গুলিবর্ষণে এবং কয়েকজন শহিদ হওয়ার মর্মান্তিক ঘটনার পর ২৩শে ফেব্রুয়ারি প্রকাশিত হয় *সাপ্তাহিক সৈনিক*'র শহিদ সংখ্যা। লাল কালিতে ও লাল বর্ডার দিয়ে প্রকাশিত এ সংখ্যায় খবরের উল্লেখযোগ্য শিরোনাম ছিল, 'শহীদ ছাত্রদের তাজা রক্তে রাজধানী ঢাকার রাজপথ রঞ্জিত', 'গত বৃহস্পতিবার ৭ জন নিহত, ৩ শতাধিক আহত, ৬২ জন গ্রেফতার', 'শুক্রবারেও ব্যাপক সংখ্যক লোক হতাহত', 'রক্তের বিনিময়ে রাষ্ট্রভাষা করার শপথ বিঘোষিত'।

ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে
ছাত্র সমাবেশের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ

বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ জন ছাত্রসহ চার ব্যক্তি
নিহত ও ১৭ ব্যক্তি আহত

হাসপাতালে প্রেরিত আহতদের ৪ জনের
অবস্থা আশঙ্কাজনক

স্কুলের ছাত্রসহ ৬২ জন গ্রেফতার; গুলীবর্ষণ সম্পর্কে
প্রধানমন্ত্রী কর্তৃক তদন্তের আশ্বাস দান

চিত্র: ৫

ভাষা আন্দোলনের সংবাদ গুরুত্বসহ প্রকাশকারী পত্রিকাগুলোর মধ্যে কলকাতা থেকে প্রকাশিত *দৈনিক ইত্তেহাদ* অন্যতম। কলকাতার *আনন্দবাজার*-এও ভাষা আন্দোলন নিয়ে সংবাদ প্রকাশিত হয়।

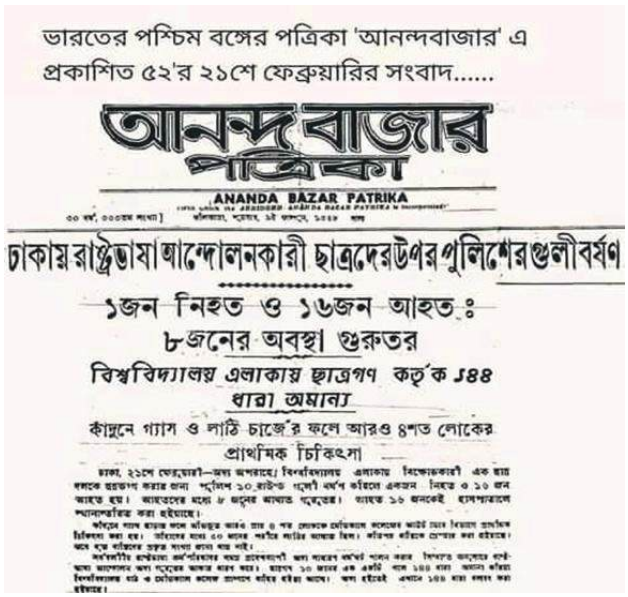

ভারতের পশ্চিম বঙ্গের পত্রিকা 'আনন্দবাজার' এ
প্রকাশিত ৫২'র ২১শে ফেব্রুয়ারির সংবাদ.....

আনন্দবাজার পত্রিকা

ANANDA BAZAR PATRIKA

ঢাকায় রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনকারী ছাত্রদের উপর পুলিশের গুলীবর্ষণ

১জন নিহত ও ১৬জন আহত ঃ
৮জনের অবস্থা গুরুতর

বিশ্ববিদ্যালয় এলাকায় ছাত্রগণ কর্তৃক ১৪৪
ধারা অমান্য

কাঁদুনে গ্যাস ও লাঠি চার্জের ফলে আরও ৪শত লোকের
প্রাথমিক চিকিৎসা

চিত্র: ৬

১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের খবর কলকতার *যুগান্তর* পত্রিকায়ও প্রকাশিত হয়।

বাংলা ভাষা আন্দোলন দমনে যশোহরে
পুলিশের অত্যাচার

বালক-বৃদ্ধ-নির্ব্বিশেষে নিগৃহীত

সংখ্যালঘুদের মধ্যে আতঙ্ক ঃ ব্যাপক বাস্তুত্যাগের সম্ভাবনা

চিত্র: ৭

কেবল সংবাদ-প্রতিবেদনই নয়, পত্রিকাগুলো ঘটে যাওয়া ঘটনা নিয়ে নিয়মিত সম্পাদকীয় ও প্রবন্ধ ছাপাতো, যেগুলো ভাষা আন্দোলনের গুরুত্ব এবং প্রাসঙ্গিকতা তুলে ধরতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। বিশেষত, বিশিষ্ট লেখক ও সাংবাদিকরা তাদের লেখালেখির মাধ্যমে আন্দোলনের প্রতি সমর্থন প্রকাশ করতেন। এসব প্রবন্ধ ও সম্পাদকীয় পাঠকদের মধ্যে আন্দোলনের প্রতি সহানুভূতি ও সমর্থন জাগিয়ে তুলতে সহায়ক ছিল। দৃষ্টান্ত হিসেবে *সাপ্তাহিক মিল্লাত* পত্রিকার সম্পাদকীয়'র কথা বলা যায়। ২৭শে জুন, ১৯৪৭ সংখ্যায় 'বাংলাই হবে পূর্ব পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা' শিরোনামের সম্পাদকীয়তে বলা হয়, 'মাতৃভাষার পরিবর্তে অন্য কোনো ভাষাকে রাষ্ট্রভাষারূপে বরণ করার চাইতে বড় দাসত্ব আর কিছু হতে পারে না। পূর্ব পাকিস্তানবাসীকে এই ঘৃণ্য দাসত্বের শৃঙ্খলে বাঁধিতে যদি কেহ বাসনা করে, তাহা হইলে সেই উদ্ভট বাসনা বাঙ্গালীর প্রবল জনমতের ঝড়ের তোড়ে তৃণখণ্ডের মত ভাসিয়া যাইবে।' (জাহান, ২০০৮, পৃ. ৫১)।

মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ সম্পাদিত *পাক্ষিক তকবীর* পত্রিকায় প্রকাশিত 'পূর্ব পাকিস্তানের শিক্ষার সমস্যা' শীর্ষক প্রবন্ধে রাষ্ট্রভাষা বাংলা দাবির পক্ষে মতামত ব্যক্ত করে লেখা হয়, 'হিন্দু মুসলমান নির্বিশেষে প্রত্যেক বাঙ্গালীর জন্য প্রাথমিক শিক্ষার ভাষা অবশ্যই বাঙ্গালা হইবে। ইহা জ্যামিতি স্বীকৃত বিষয়ের ন্যায় স্বতঃসিদ্ধ। উন্মাদ ব্যতীত কেহই ইহার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিতে পারে না। এই বাঙ্গালাই হইবে পূর্ব পাকিস্তানের প্রাদেশিক ভাষা' (জাহান, ২০০৮)। এছাড়া বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে লেখক-সাংবাদিকগণ সরাসরিও আন্দোলনে শামিল হয়েছিলেন (জাহান, ২০০৮)। *দৈনিক আজাদ* পত্রিকার সম্পাদক আবুল কালাম শামসুদ্দিনের নাম উঠে আসে, যিনি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার মিছিলে পুলিশের গুলিবর্ষণের প্রতিবাদে প্রাদেশিক পরিষদের সদস্যপদ থেকে পদত্যাগ করেন। আবার ভাষা আন্দোলনে ভূমিকা রাখার দায়ে *অবজারভার* পত্রিকার সম্পাদক আব্দুস সালামকে কারাগারে প্রেরণ করে তৎকালীন সরকার। আন্দোলনের বিভিন্ন খবর *পাকিস্তান অবজারভার* পত্রিকায় গুরুত্ব দিয়ে প্রকাশিত

হতো, যার কারণে পাকিস্তান সরকার ১৯৫২ সালের ১৩ই ফেব্রুয়ারি *অবজারভার*'র প্রকাশনাই বন্ধ করে দেয় এবং একই সাথে সম্পাদক আবদুস সালাম ও মালিক হামিদুল হক চৌধুরীকে আটক করে।

উপরিউক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, ভাষা আন্দোলনের সময়ে সাংবাদিক, কলামিস্ট, লেখক ও সম্পাদকের বড়ো ভূমিকা ছিল। তারা তখনকার সময়ের ঘটনাবলিকে জনসমক্ষে তুলে ধরার মাধ্যমে একদিকে জনগণের মধ্যে চেতনাবোধ জাগিয়ে তুলেছেন, অন্যদিকে সাম্প্রতিক ঘটনাপ্রবাহকে পত্রিকায় এনে ইতিহাসের ধারাবাহিকতা রক্ষায় গুরুত্বপূর্ণ অবদান রেখেছে। সংবাদপত্র সেই সময়ে শুধু খবর পৌঁছে দেওয়ার মাধ্যমেই সীমাবদ্ধ ছিল না; এটি হয়ে উঠেছিল একটি সামাজিক আন্দোলনের অংশ, যা জনগণের অধিকার, ভাষা, ও সংস্কৃতির জন্য সংগ্রামকে শক্তিশালী করে তুলেছিল। সংবাদপত্র তার সামাজিক দায়বদ্ধতার স্থান থেকেই এ দায়িত্ব পালন করে জনগণের অধিকার ও গণতান্ত্রিক মূল্যবোধের পক্ষে শক্তিশালী ভূমিকা রেখেছে।

২) '৫২-পরবর্তী সময়ে সংবাদমাধ্যমে একুশের উপস্থাপন

ভাষা আন্দোলনের পর বাংলা পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃত হয়। যারা ভাষার জন্য প্রাণ দিয়েছিল, সেই শহিদদের স্মরণে প্রতি বছরই ২১শে ফেব্রুয়ারির দিনটিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করা হতে থাকে এবং দিবসটি উদ্‌যাপনের খবর পত্রিকাগুলোতে বিশেষ গুরুত্ব সহকারে উপস্থাপিত হতে থাকে। শহিদদের স্মরণে সর্বস্তরের মানুষের প্রভাতফেরিতে অংশ নেওয়ার বিষয়টি সে সময়ের সংবাদপত্রের আলোকচিত্রে দেখা যায়।

চিত্র: ৮

চিত্র: ৯

বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর ১৯৭২ সালের পরের বছরগুলোতে একুশে পালনের ধরন বদলে যেতে থাকে। প্রভাতফেরিসহ বিভিন্ন কার্যক্রম রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার অধীনে চলে যায়। খবরে দেখা যেত শহিদ মিনারে রাষ্ট্রীয় পর্যায় থেকে পুষ্পস্তবক অর্পণের দৃশ্য, প্রভাতফেরির মিছিল। তবে রাষ্ট্রীয় আনুষ্ঠানিকতার বাইরেও শিল্পী, কবি, সাহিত্যিকসহ সাংস্কৃতিক কর্মীরা নিজেদের মতো একুশে পালন করে গেছেন। সদ্যস্বাধীন দেশকে শিল্প ও সাংস্কৃতিক জাগরণের মধ্য দিয়ে গড়ে তোলার আহ্বানও ফুটে উঠতো সেই দিনগুলোর জাতীয় দৈনিকের বিশেষ পাতায়।

চিত্র: ১০

চিত্র: ১১

পত্রিকাগুলোতে ভাষা আন্দোলন নিয়ে বিশেষ পাতাও প্রকাশিত হতো। এখানে ভাষা আন্দোলন নিয়ে রচিত কবিতা, গান, গল্প, নাটক ও চলচ্চিত্রের আলোচনা স্থান পেত। এর মাধ্যমে পাঠকরা আন্দোলনের সাংস্কৃতিক দিকটি সম্পর্কেও জানতে পারতো। দিবসটি উপলক্ষ্যে বিশেষ ক্রোড়পত্রও প্রকাশ করতো পত্রিকাগুলো; যেখানে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, শহিদদের স্মৃতিচারণ এবং নানা ধরনের ফিচার, প্রবন্ধ ও নিবন্ধ থাকতো। পত্রিকার সম্পাদকীয় পাতায় ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য নিয়ে থাকতো বিশ্লেষণধর্মী লেখা, যেখানে সম্পাদক বা বিশিষ্ট লেখকরা আন্দোলনের সামাজিক, রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক প্রভাব নিয়ে আলোচনা করতেন। এ ধরনের বিশ্লেষণধর্মী আলোচনার ফলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, এর চেতনা এবং মাহাত্ম্য নতুন প্রজন্মের কাছে পরিবাহিত হতো।

চিত্র: ১২

চিত্র: ১৩

৩) সাম্প্রতিক সময়ের সংবাদমাধ্যমে একুশের উপস্থাপন

বর্তমান সময়েও পত্রিকাগুলো একইভাবে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে ঘিরে রাষ্ট্রীয় অনুষ্ঠানকে অগ্রাধিকার দিয়ে সংবাদে নিয়ে আসে। রাষ্ট্রপতি ও প্রধানমন্ত্রীর পক্ষ থেকে শহিদ-বেদিতে ফুল দিয়ে শ্রদ্ধা নিবেদন, সাংস্কৃতিক অনুষ্ঠান আয়োজনের মাধ্যমে সর্বসাধারণের একুশ উদ্‌যাপন ইত্যাদি ঘটনার ছবি সংবলিত বিস্তর খবর এবং ফিচারধর্মী লেখা পত্রিকায় পাওয়া যায়।

মহান একুশে ফেব্রুয়ারি আজ

প্রথম প্রহরে রাষ্ট্রপতি প্রধানমন্ত্রীর শ্রদ্ধা

সাংস্কৃতিক প্রতিবেদক

অমর একুশে ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি গভীর শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন রাষ্ট্রপতি

চিত্র: ১৪

চিত্র: ১৫

তবে একই সাথে একুশের চেতনাকে পুঁজি করে পত্রিকাগুলোতে দেশের কর্পোরেট গোষ্ঠীর; বিশেষ করে ফ্যাশন এবং লাইফস্টাইল ব্রান্ডগুলোকে তুলে ধরার প্রবণতা দেখা যায়। একুশকে ঘিরে পত্রিকাগুলোতে উৎসবের আমেজ তৈরির প্রবণতা লক্ষণীয়। উৎসবের আমেজ তৈরির প্রবণতা প্রকাশ পায় দিবসটিকে ঘিরে বিভিন্ন লাইফস্টাইল পাতার আধেয় বিশ্লেষণ করলে। একুশের দিন দর্শক কেমন পোশাক পরবে, কেমন খাবার রান্না করবে, কেমন করে চুল বাঁধবে, কোন ধরনের গহনা পরবে, কোন রেস্তোরাঁয় ভোক্তার জন্য কেমন অফার– এসব নিয়ে থাকে বিস্তর প্রতিবেদন। সেই সাথে দেখা যায় বিভিন্ন ফ্যাশন-ব্যান্ডের নাম-লোকেশন তুলে ধরে তাদের পণ্যের বিজ্ঞাপন। লাইফস্টাইল সংক্রান্ত এসব প্রতিবেদনে যে প্রবণতাগুলো দেখা যায় সেগুলো নিম্নে তুলে ধরা হলো:

একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহাসিক দিনকে উপলক্ষ্য করে ফ্যাশন হাউজ এবং অনলাইন শপগুলো নানারকম পোশাক ও গয়নার বিশেষ সংগ্রহ বাজারে এনেছে বলে লাইফস্টাইল সংক্রান্ত প্রতিবেদনে উল্লেখ থাকে। বিশেষ করে অঞ্জন'স, রঙ বাংলাদেশ, মেঘ ইত্যাদি ব্রান্ড একুশের চেতনাকে ফুটিয়ে তোলার জন্য বিশেষ থিমে পোশাক নিয়ে আসে। যেমন, নারীদের একুশের চেতনা প্রকাশ করতে কালো-সাদা শাড়ি, সেলোয়ার-কামিজ, কাঠ, মাটি, সুতা, পুঁতি ইত্যাদি উপকরণ দিয়ে তৈরি গয়না, যেখানে বাংলা বর্ণমালা এবং একুশের বিভিন্ন মোটিফ থাকে। সেই সাথে থাকে এই ফ্যাশন হাউজের পোশাক ও গয়না পরা বিভিন্ন মডেলদের নানা অঙ্গভঙ্গির ছবি।

Kaykraft

Kaykraft's Ekushey collection are now available in its all outlets. Designers ornamented the dresses using three colors -white, black and light red. They used the motif of Bangla Bornomla (Bengali alphabets) and words in their designs. Primeval alphabets are also used in the designs of their collections. Kay Kraft Bashundhara City outlet manager Nasir Hossian said that special attraction of their fashion house will be family package (4 pieces) for husband, wife and two kids.

Aarong

Apart from a number of dress items, Bangladesh's one of the leading fashion house Aarong has displayed special Slim-Fit Panjabi-Pajama-Coaty-Set for men and kids using mainly white and black. Azmery Akhter, Marketing Officer of Aarong, said a light variation of colors has been chosen to offer shoppers more options this season.

Anjans

Abdul Alim, branch In-charge of Anjan's Bashundhara City outlet, said containing the spirit of the Ekushey, Anjans brings its collection mainly with screen print and block print with the theme of Bornomala (alphabets).
Designers portrayed various sketches with two specific colors-Black and white. In some items, a reddish shade has been used as a reflector.

Rang Bangladesh

Fashion house Rang Bangladesh has used white, black, ash and off-white colors in their Ekushey collections.

Ekushey February now turned into a festival of national achievement and to celebrate the occasion, local boutique shops have been making different outfits for all age groups. Designers have used black-white-red- based traditional motifs and patterns to represent the theme of the International Mother Language Day.

চিত্র: ১৬

লাইফস্টাইল

মার্জিত সাজে কাটুক মাতৃভাষা দিবস

মাতৃভাষা দিবসের সাজ-পোশাক হবে মার্জিত

মাতৃভাষা দিবসের সাজ-পোশাক

চিত্র: ১৭

চিত্র: ১৬ নেওয়া হয়েছে *এশিয়ান নিউজ*'র লাইফস্টাইল পাতা থেকে। এখানে পাঞ্জাবি পরা মডেলের ছবির ক্যাপশনে সরাসরি উল্লেখ করা হচ্ছে 'Ekushey February now turned into a festival of national achievement'। তারা আরো উল্লেখ করছে, এই ফেস্টিভালকে কেন্দ্র করে লোকাল বুটিকশপগুলো কী ধরনের পোশাক নিয়ে এসেছে। অর্থাৎ পত্রিকাটি সরাসরি একুশে ফেব্রুয়ারিকে উৎসব নামে আখ্যায়িত করে শোককে আনন্দ দিয়ে প্রতিস্থাপন করে দিয়েছে এবং সেই উৎসব পালনে কোন কোন বুটিক হাউজের পোশাক এই আনন্দ-উৎসবের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ, তা বলে দিচ্ছে। প্রতিবেদনটিতে দেশের স্বনামধন্য বুটিকশপগুলো কী ধরনের পোশাক নিয়ে এসেছে, তার ব্যাখ্যা রয়েছে। অর্থাৎ শোক এবং একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাকে তারা মুনাফার জন্য বাণিজ্যিকীকরণ করছে। বাঙালির গর্ব ভাষা আন্দোলন এবং একুশের স্পিরিট, শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা ইত্যাদি বিষয়কে এখানে বিভিন্ন ফ্যাশন এবং পোশাকের ডিজাইনের মাধ্যমে এক ধরনের ব্যবসায়িক পণ্যে পরিণত করা হয়েছে।

চিত্র: ১৭ নেওয়া হয়েছে *ডেইলি বাংলাদেশ* পত্রিকা থেকে। এখানে বলা হচ্ছে একুশের সাজ কেমন হবে। এখানে 'মার্জিত' সাজের উল্লেখ রয়েছে এবং সেই অনুযায়ী সাদাকালো পোশাক পরার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে এক ছবিতে, আর একই প্রতিবেদনের আরেকটি ছবিতে সাদাকালোর সাথে লাল রঙের সমন্বয়ে পোশাকের ডিজাইন উপস্থাপন করা হয়েছে। সাদাকালোর সাথে লাল রঙের সমন্বয়ের কারণ হিসেবে তাদের ভাষ্য: 'যদিও ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালির জাতীয় জীবনের অন্যতম শোকের দিন, তবু এই মাসেই রয়েছে উদ্‌যাপনের নানা রঙিন উপলক্ষ্য।' এটা নিঃসন্দেহে সাদা, কালো এবং লাল রং মেশানো ডিজাইন দিয়ে শোকের একুশসহ ফেব্রুয়ারির অন্যান্য উৎসবকেও কাভার করার একটা মার্কেটিং। ক্রেতার সাশ্রয়ের কথা যেমন বলা হয়েছে, তেমনি বিক্রেতার সারা মাস জুড়ে পোশাক বিক্রয় করতে পারার দিকেও নজর রাখা হয়েছে। ফলে পুরোপুরিভাবে এখানে একুশের চেতনাকে পণ্যে রূপান্তর করা হয়েছে এবং একটা ভোক্তা-সংস্কৃতিকে প্রচার করা হয়েছে।

চিত্র: ১৮

চিত্র: ১৯

চিত্র: ১৮ নেওয়া হয়েছে *জাগো নিউজ* থেকে। এখানেও চিত্র ১৬ এবং চিত্র ১৭-এর মতো একুশের দিন দর্শক কোন ধরনের সাজগোজ করবে, তা নিয়ে বিশেষ নির্দেশনা দেওয়া হয়েছে। একুশের দিন মেয়েরা কী

ধরনের লিপস্টিক ব্যবহার করবে, নেইল পালিশের মাধ্যমে কীভাবে বাংলা বর্ণমালার প্যাটার্ন তৈরি করবে, তার ফিরিস্তি আছে। ছেলেদেরকে বলা হচ্ছে, বর্ণমালার ডিজাইন করা পাঞ্জাবি পরতে, মাথায় বাংলাদেশের পতাকা বেঁধে নিতে। এমনভাবে এখানে পোশাক, সাজগোজ, বেশভূষা করতে বলা হয়েছে, যেন একুশ একটা সাজগোজের উপাদান মাত্র। এখানে সরাসরি একুশ, বাংলা বর্ণমালা, দেশের পতাকাকে একেকটা পণ্য হিসেবে ব্যবহার্য উপাদানে পরিণত করা হয়েছে।

চিত্র: ১৯ *সংবাদ প্রকাশ* পত্রিকা থেকে নেওয়া হয়েছে। এখানে সরাসরি একুশের গহনার প্রচার করা হচ্ছে। বাংলা বর্ণমালা এবং শহিদ মিনারের মোটিফকে সাদা-কালো লাল-নীল রঙে ফুটিয়ে তোলা হয়েছে গলার নেকলেস আর কানের দুলে। এর মাধ্যমে একদিকে যেমন জাতীয় ঐতিহ্যকে প্রকাশ করা হচ্ছে, তেমনি তার বাণিজ্যিকীকরণেরও স্পষ্ট উপস্থিতি দেখা যাচ্ছে।

চিত্র: ২০

চিত্র: ২০-এর ফিচারটি প্রকাশিত হয়েছিল *সমকাল* পত্রিকায়। প্রকাশের সাথে সাথেই এটা ব্যাপক সমালোচনার জন্ম দেয়। বাঙালি ও পাশ্চাত্য সংস্কৃতির সংমিশ্রণের সাজে একজন মডেলকে দেখা যাচ্ছে এখানে, যার পরনে কালো রঙের স্লিভলেস ওয়েস্টার্ন ব্লাউজের সাথে সাদা শাড়ি, মাথায় কালো টুপিতে সাদা ডটের লাইন আর গোলাপি লিপস্টিক ঠোঁটে– তবে তা ঠোঁটের বাইরে গাল পর্যন্ত লেপ্টে আছে। গলায় মাফলার ঝোলানো। মডেলটির পোশাক এবং সাজসজ্জায় সাদা শাড়ি একুশে ফেব্রুয়ারির প্রতীকী অর্থ বহন করে। কিন্তু অপরদিকে, কালো টুপি ও মাফলার পাশ্চাত্য ফ্যাশনের উপাদান। ঠোঁটের বাইরে গোলাপি রঙের লিপস্টিক পাশ্চাত্য কসমেটিক ও স্টাইলের পপ আর্ট। এই পুরো হাইব্রিড সাজসজ্জা ভাষা আন্দোলনের মূল চেতনা থেকে দূরে সরে গিয়ে সংস্কৃতি এবং ইতিহাসকে ফ্যাশনের অংশ করে বাজারে উপস্থাপন করে। মূলত পশ্চিমা পপ সংস্কৃতির উপাদান এবং বাংলাদেশের ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপটকে একত্র করে এখানে বাজারজাত করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের দিনকে শ্রদ্ধা নিবেদনের দিন হিসেবে দেখা হলেও এখানে এটি একটি ফ্যাশনেবল ইভেন্ট হিসেবে প্রদর্শিত হয়েছে। ছবির চেহারা এবং অঙ্গভঙ্গি থেকে বোঝা যায়, একুশের দিনটিকে স্টাইল, গ্ল্যামার এবং ফ্যাশনের একটা নতুন প্যাটার্নে রূপান্তর করা

হয়েছে। এতে ঐতিহাসিক দিনের গভীরতা এবং এর আবেগমূলক মূল্যবোধকে সরিয়ে শহিদদের স্মৃতি এবং তাদের আত্মত্যাগকে কেবল ফ্যাশনে নামিয়ে এনে মূল চেতনার বিকৃতিকরণ করা হয়েছে।

চিত্র: ২১

চিত্র: ২১-এর ফিচারটি প্রকাশিত হয়েছিল *আমাদের সময়* পত্রিকায়। এখানে ভাষা আন্দোলন এবং একুশের স্পিরিটকে খাবারের মাধ্যমে বাজারজাত করা হয়েছে, যাকে 'কমোডিফিকেশন' বলা যায়। এখানে খাবারের ডিজাইনে একুশের মোটিফ ব্যবহার করা হয়েছে, যা একটি পবিত্র ও শোকময় ঐতিহাসিক ঘটনাকে বাণিজ্যিক উদ্দেশ্যে ব্যবহারের উদাহরণ। ফিচারের উপরের বাম কোণে দেখা যাচ্ছে একটি পশ্চিমা স্টাইলের কেক, যার উপর কালো রঙে 'অমর একুশে' লেখা রয়েছে। রক্তের ছাপের মতো সাজানো এবং বর্ণমালার প্রতীকী চিহ্নগুলো কেকের উপরে সাজানো হয়েছে। রক্তাক্ত একুশের মূল প্রতীকগুলোকে এখানে বাণিজ্যিকভাবে উপস্থাপিত করা হয়েছে। অন্যান্য খাবারের মধ্যে রয়েছে খিচুড়ি, ইলিশ কোর্মা, এবং সুইস রোল; যেগুলোর ডিজাইনেও একুশের মোটিফ এবং বর্ণমালা ব্যবহার করা হয়েছে। বিশেষত, খিচুড়ি প্লেটে বর্ণমালার প্রতীকে সাজানো হয়েছে। অর্থাৎ ঐতিহাসিক এবং জাতীয় গর্বের উপাদানকে এখানে খাদ্য-পণ্য হিসেবে উপস্থাপন করা হয়েছে, একুশের মর্মবাণী বা শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা প্রদর্শনের চেয়ে খাবারের প্যাকেজিং এবং প্রদর্শনীকে বেশি গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।

আলোচনা

গবেষণার ফলাফলে দেখা যায়, একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাকে ঘিরে যে শোক, সংগ্রাম এবং জাতীয় ঐক্যের আদর্শ ছিল, তা ক্রমশই বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাবে বিবর্তিত হচ্ছে। শুরুতে ভাষা আন্দোলনকে একটা শুভ্র ও পবিত্র শোকগাথা হিসেবে দেখে তার তাৎপর্যকে ধারণ করে এর মহিমা পরবর্তী প্রজন্মে ছড়িয়ে দেওয়ার একটা প্রবণতা দেখা গিয়েছে, পরে সেটা আপামর জনসাধারণ ও রাষ্ট্রীয় ভাবগাম্ভীর্যপূর্ণ একটা উদ্‌যাপনের বিষয়ে বিবর্তিত হয়েছে এবং সর্বশেষে পত্রিকাগুলোর দ্বারা একুশের বাজারিকরণ প্রবণতা লক্ষ করা গেছে।

শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানানোর পরিবর্তে, এ দিনটিকে ঘিরে তৈরি করা হয়েছে একটি ভোক্তা-বাজার। যেখানে পণ্য ও সেবার মাধ্যমে একুশের প্রতীকগুলোকে ব্যবহার করে আর্থিক লাভের সুযোগ তৈরি করা হচ্ছে। ফ্যাশন হাউস এবং অন্যান্য বাণিজ্যিক প্রতিষ্ঠান একুশের চেতনাকে কেন্দ্র করে বিশেষ পোশাক, সাজসজ্জা এবং লাইফস্টাইল পণ্যের প্রচারণা চালাচ্ছে। পত্র-পত্রিকায় শহিদ মিনার এবং বর্ণমালা সম্পর্কিত আলপনা ও মোটিফগুলোর বাণিজ্যিক ব্যবহারকে প্রচারের মাধ্যমে উপস্থাপন করা হচ্ছে, যা মূলত পণ্যায়নের প্রতিফলন।

এভাবে একুশে ফেব্রুয়ারির ঐতিহ্য শুধু ভাষা আন্দোলনের স্মরণে সীমাবদ্ধ না থেকে, সমাজের অর্থনৈতিক প্রেক্ষাপটে নতুন এক বাণিজ্যিক রূপ নিচ্ছে। কর্পোরেট মুনাফা নিশ্চিত করতে শহিদদের আত্মত্যাগ এবং বাংলা ভাষার প্রতি যে গভীর আবেগ ও শ্রদ্ধা একদিন ছিল, তা এখন ক্রমেই একটি বিক্রয়যোগ্য ইভেন্টে পরিণত হয়েছে। বাণিজ্যিক পণ্যগুলোতে একুশের চেতনার প্রতিফলন দেখানো হলেও, মূলত তা ঐতিহাসিক ও সাংস্কৃতিক প্রেক্ষাপটকে আড়াল করে ভোক্তাদের মনোযোগ আকর্ষণ এবং আর্থিক লাভের উদ্দেশ্যকে প্রাধান্য দিচ্ছে।

এর ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আর কেবল শোক ও সংগ্রামের দিন হিসেবে নয় বরং একটি অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডের অংশ হিসেবে দেখা যাচ্ছে, যা একুশের মূল তাৎপর্যকে ক্ষুণ্ন করছে। ভাষা আন্দোলনের আত্মত্যাগ এবং ঐতিহাসিক গুরুত্বকে সম্মান জানানোর বদলে, এটি একটি ক্রমবর্ধমান বাণিজ্যিক উৎসবে পরিণত হয়েছে, যেখানে শহিদদের স্মৃতির প্রতিফলন পণ্যের মধ্যে সীমাবদ্ধ। জাতীয় ঐতিহ্য এবং ঐক্যের চেতনাকে বাজারের প্রয়োজনে ব্যবহার করা হচ্ছে, যা আমাদের সামাজিক ও সাংস্কৃতিক দায়বদ্ধতার সঙ্গে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়।

পত্রিকাগুলোতে ভাষা আন্দোলনের এ ধরনের উপস্থাপনের ফলে গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতার যে কাজ তা পালিত হচ্ছে না। সমাজ-সংস্কৃতি, ইতিহাস, কৃষ্টি, ঐতিহ্য এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে যেভাবে পরিবাহিত হবার কথা, তা হচ্ছে না। নতুন প্রজন্মের কাছে গৌরবের যে প্রকৃত ইতিহাস আর চেতনা তা পরিবাহিত হচ্ছে না। গণমাধ্যমের সামাজিক উত্তরাধিকার তৈরি করার যে দায়বদ্ধতা তা আর রক্ষিত হচ্ছে না। অর্থাৎ এক প্রজন্ম থেকে আরেক প্রজন্মে ইতিহাস, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের বিষয়গুলো সঠিকভাবে স্থানান্তর হচ্ছে না। প্রায়ই গণমাধ্যমের বিভিন্ন প্রতিবেদনে দেখা যায়, তরুণ প্রজন্মকে ঐতিহাসিক দিনগুলোতে কী ঘটেছে জিজ্ঞেস করা হলে তারা সঠিকভাবে উত্তর দিতে পারে না। এর দায় প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা-কাঠামোর যেমন, তেমনই গণমাধ্যমেরও।

উপসংহার

গবেষণার ফলাফল থেকে প্রতীয়মান হয়, একুশে ফেব্রুয়ারির চেতনাকে কেন্দ্র করে যে জাতীয় ঐক্য, শোক ও সংগ্রামের আদর্শ ছিল, তা সময়ের সাথে সাথে বাণিজ্যিকীকরণের প্রভাবে রূপান্তরিত হচ্ছে। শুরুতে ভাষা আন্দোলনকে পবিত্র শোক ও স্মৃতির মর্যাদাপূর্ণ উদ্‌যাপন হিসেবে দেখা হলেও, ক্রমে তা অর্থনৈতিক সুবিধা অর্জনের একটি হাতিয়ারে পরিণত হয়েছে। বিশেষত, পত্রিকা ও গণমাধ্যমের ভূমিকায় এই বাণিজ্যিকীকরণের প্রচেষ্টা লক্ষণীয়। শহিদদের আত্মত্যাগ এবং আন্দোলনের মাহাত্ম্য আড়াল করে বাণিজ্যিক পণ্যায়নের মাধ্যমে একুশে ফেব্রুয়ারির প্রকৃত চেতনাকে ক্ষুণ্ন করা হচ্ছে। পত্রিকা ও

গণমাধ্যমের এ ধরনের ভূমিকা পালনের ফলে ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও চেতনা নতুন প্রজন্মের কাছে যথাযথভাবে উপস্থাপিত হচ্ছে না এবং গণমাধ্যমের সামাজিক দায়বদ্ধতা পালিত হচ্ছে না। এর ফলে প্রজন্মান্তরে জাতীয় ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি সঠিকভাবে স্থানান্তরিত হবার বিষয়টি প্রশ্নবিদ্ধ হচ্ছে।

বর্তমান গবেষণার কিছু সীমাবদ্ধতা রয়েছে। এখানে সীমিত সংখ্যক নমুনার একটা গুণগত বিশ্লেষণ করা হয়েছে। পরবর্তী গবেষকরা চাইলে গুণগত বিশ্লেষণের পাশাপাশি বিস্তর পরিসরে পরিমাণগত বিশ্লেষণ করতে পারেন। এছাড়া, সংবাদপত্রে এ ধরনের উপস্থাপনার প্রভাব জনগণের ওপর কীভাবে পড়ছে, সে বিষয়েও গবেষণা করা যেতে পারে।

তথ্যসূত্র

আডোর্নো, টি. ও হরখেইমার, এম. (১৯৪৪)। *ডায়ালেকটিক অব এনলাইটেনমেন্ট*। ক্যালিফর্নিয়া: স্ট্যানফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

ভাবা, এইচ. কে. (১৯৯৪)। *দ্য লোকেশন অফ কালচার*। ইংল্যান্ড: রুটলেজ।

জাহান, মো. এমরান (২০০৮)। *বাংলাদেশের স্বাধীনতা সংগ্রাম: ইতিহাস ও সংবাদপত্র (১৯৪৭-১৯৭১)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী প্রেস।

ডেবর্ড, জি. (১৯৯৫)। *দ্য সোসাইটি অব দ্য স্পেক্টাকল*। নিউ ইয়র্ক: জোন বুকস।

ম্যাককুয়েল, ডি. (২০১০)। *মাস কমিউনিকেশন থিওরি*। মেলবোর্ন: সেজ পাবলিকেশনস।

ল্যাসওয়েল, এইচ. ডি. (১৯৪৮)। 'দ্যা স্ট্রাকচার অ্যান্ড ফাংশান অব কমিউনিকেশন ইন সোসাইটি'। এল. ব্রাইসন (সম্পা.), *দ্য কমিউনিকেশন অব আইডিয়াস*। নিউ ইয়র্ক: হার্পার অ্যান্ড ব্রাদার্স।

শিলার, এইচ. আই. (১৯৮৯)। *কালচার, ইনকর্পোরেটেড: দ্য কর্পোরেট টেকওভার অফ পাবলিক এক্সপ্রেশন*। ইংল্যান্ড: অক্সফোর্ড ইউনিভার্সিটি প্রেস।

সীবার্ট, এফ. এস; পিটারসন, টি. ও শ্রাম, ডব্লিউ. (১৯৫৬)। *ফোর থিওরিজ অফ দ্য প্রেস: দ্য অথরিটারিয়ান, লিবারটেরিয়ান, সোশ্যাল রেসপনসিবিলিটি, অ্যান্ড সোভিয়েত কমিউনিস্ট কনসেপ্টস অফ হোয়াট দ্য প্রেস শুড বি অ্যান্ড ডু*। ইলিনয়: ইউনিভার্সিটি অফ ইলিনয় প্রেস।

হাচিন্স, আর. এম. (১৯৪৭)। *আ ফ্রি অ্যান্ড রেসপনসিবল প্রেস: আ জেনারেল রিপোর্ট অন মাস কমিউনিকেশন: নিউজপেপারস, রেডিও, মোশন পিকচারস, ম্যাগাজিনস, অ্যান্ড বুকস*। শিকাগো: ইউনিভার্সিটি অফ শিকাগো প্রেস।

হোসকিন্স, সি. ও ম্যাকফেডেন, ডি. (২০০০)। *মিডিয়া ইকোনমিকস: কনসেপ্টস অ্যান্ড ইস্যুজ*। মেলবোর্ন: সেজ পাবলিকেশনস।

হ্যাবারমাস, জে. (১৯৮৯)। *দ্য স্ট্রাকচারাল ট্রান্সফরমেশন অব দ্য পাবলিক স্ফিয়ার: এন ইনকোয়ারি ইনটু অ্যা ক্যাটেগরি অফ বুর্জোয়া সোসাইটি*। ক্যামব্রিজ: এমআইটি প্রেস।

পত্রিকা ও রিপোর্ট

https://www.channelionline.com/1973-74-february-1973-74-press-release/। সাইটে প্রবেশ: ১২ই জুলাই, ২০২৪।

https://www.channelionline.com/in-february-1972/। সাইটে প্রবেশ: ১২ই জুলাই, ২০২৪।

https://dailysangram.info/post। সাইটে প্রবেশ: ২০শে মার্চ, ২০২৪।

'ভাষা আন্দোলনে সংবাদপত্রের সোচ্চার ভূমিকা'। *dailyinqilab.com*। সাইটে প্রবেশ: ১০ই মার্চ, ২০২৪।

'ভাষা আন্দোলনে সংবাদপত্রের ভূমিকা'। *dailysangram.com*। সাইটে প্রবেশ: ১৫ই মার্চ, ২০২৪।

'ভাষা আন্দোলনে গণমাধ্যমের ভূমিকা'। *sarabangla.net*। সাইটে প্রবেশ: ১৫ই মার্চ, ২০২৪।

'সংবাদপত্রে ভাষা আন্দোলন'। *prothomalo.com*। সাইটে প্রবেশ: ১৫ই মার্চ, ২০২৪।

সাপ্তাহিক মিল্লাত, ১২ই জুন, ১৯৪৭।

পাক্ষিক তকবীর, ১লা জানুয়ারি ১৯৪৮।

ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি

সানজিদা মুস্তাফিজ

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookSanjida

১৯৪৭ সালে শুরু হওয়া ভাষা আন্দোলনের তাৎপর্য থেকেই ১৯৭১ সালে বাংলাদেশের স্বাধীনতা অর্জিত হয়। হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বিকশিত বাঙালি জাতি ১৯৪৭-এর পর বাংলা ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করা এবং বাঙালি জাতীয় চেতনা তৈরির মাধ্যমে 'আত্মনির্ধারণ অধিকার' চর্চার দিকে তথা স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যাচ্ছিল। এ বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনের আয়ত্তে থাকা একটি বিধান। স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধানে উল্লেখ করা হয়েছে, রাষ্ট্র জাতীয় ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখা ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ পায়। সময়ের সাথে যুগোপযোগী আইন প্রণয়ন ও পরিবর্তন প্রয়োজন হয়। সংবিধানে উল্লেখ থাকলেও বাংলাদেশের স্বাধীনতা-পরবর্তী সময়ে সর্বস্তরে বাংলা ভাষার ব্যবহার বিষয়ক আইন প্রণয়নের উল্লেখযোগ্য কোনো উদ্যোগ বা সংস্কার দীর্ঘদিন গ্রহণ করা হয়নি। অন্যদিকে বাংলাভাষা ব্যবহারের সুযোগ-সুবিধা উন্নত করার লক্ষ্যে প্রয়োজনীয় কার্যকর নীতি ও সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাও আবশ্যক। আইনগত ভিত্তিতে ভাষা আন্দোলন কীভাবে গড়ে উঠেছিল এবং সে প্রেক্ষাপটে ভাষা আন্দোলন একটি স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনে কীভাবে সহায়ক ভূমিকা পালন করেছিল তা আইনের ইতিহাসের প্রেক্ষাপটে বিশ্লেষণ করাই এ প্রবন্ধের উদ্দেশ্য। একইসঙ্গে বাংলা ভাষার সার্বিক কল্যাণের লক্ষ্যে কী ধরনের পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল এবং তা কতটা কার্যকর ছিল সে বিষয়েও উক্ত প্রবন্ধে আলোচনা করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের বিষয়টি মানবাধিকারের দৃষ্টিতে আইনের ইতিহাসের অংশ হিসেবে কীভাবে মূল্যায়ন করা যায় সেদিকটিও প্রবন্ধটিতে উপস্থাপনের চেষ্টা করা হয়েছে। ভাষার অধিকার প্রতিষ্ঠায় বিদ্যমান আইনের প্রয়োগ ও নতুন আইন প্রণয়নের প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখাও সমানভাবে প্রয়োজনীয়। ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে ভাষার প্রয়োগাধিকারে আইনের প্রয়োগ ও প্রণয়নের প্রয়োজনীয়তা বিষয়ে এবং ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি বিষয়ে উল্লেখযোগ্য প্রাসঙ্গিক তেমন কোনো গবেষণা হয়নি বলে উক্ত গবেষণাকর্মের প্রাসঙ্গিকতা নির্ধারিত হয়েছে।

গবেষণা-পদ্ধতি

গবেষণাটি ঐতিহাসিক পর্যালোচনা-নির্ভর একটি গবেষণা। উক্ত গবেষণার প্রেক্ষাপট হলো ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি এবং ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়ে এদেশের জনগণের মধ্যে জাতীয়তাবোধ কীভাবে তৈরি হয়েছে তার বিশ্লেষণ করা। এছাড়া সর্বস্তরে মাতৃভাষা বাংলার প্রয়োগ সংক্রান্ত সমস্যা সমাধানে বা নিরসনে আইনগত উদ্যোগ গ্রহণ ও তার প্রয়োগ-প্রক্রিয়ার বিশ্লেষণ করা। এ গবেষণার ক্ষেত্রে 'গুণগত পদ্ধতি'র প্রয়োগ করা হয়েছে। উক্ত গবেষণায় প্রাথমিক ও অনেক ক্ষেত্রে গৌণ উৎস হতে প্রাপ্ত তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎসের সাথে গবেষণার সার্বিক কাঠামো নির্ধারণ, তথ্য বিশ্লেষণসহ বিভিন্ন প্রয়োজনে মাধ্যমিক উৎসের তথ্য ব্যবহার করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলন-সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন কর্মসূচির প্রতিবেদন, গ্রন্থ,

প্রবন্ধ, সংবাদপত্র-পত্রিকা হতে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। গবেষণাটিতে তথ্য ব্যবহার করার ক্ষেত্রে তথ্যের সময়কাল, প্রাপ্তিস্থান, তথ্যসূত্রের যোগানদাতা, কী ধরনের প্রেক্ষাপটে তথ্যসূত্রের আবির্ভাব হয়েছে; সে-সাথে এসব তথ্যের গ্রহণযোগ্যতা যাচাই করে নেওয়া হয়েছে (Shafer, 1974, p. 19.)। গৌণ উৎস ব্যবহারে কিছু ক্ষেত্রে তথ্যবিভ্রাট ঘটে, তাই সে ধরনের প্রেক্ষাপটে গবেষণায় ব্যবহৃত তথ্যগুলোকে অন্য তথ্যের সাথে যাচাই করে গ্রহণযোগ্য করার চেষ্টা করা হয়েছে। তাছাড়া অপূর্ণাঙ্গ তথ্যসূত্র, অনুমানভিত্তিক তথ্য ব্যবহার করা ও বর্ণনার ক্ষেত্রে অপর্যাপ্ততার বিষয় হতে গবেষণাটিকে মুক্ত রাখার চেষ্টা করা হয়েছে।

সাহিত্য পর্যালোচনা

ভাষা আন্দোলনের সার্বিক বিষয়ে অসংখ্য গবেষণা এবং অনেক গ্রন্থ রচিত হয়েছে। গবেষক গোলাম কুদ্দুস *ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন* নামের ৭০০ পৃষ্ঠার গ্রন্থে ১৯টি অধ্যায়ের মাধ্যমে শতাব্দী-প্রাচীন আমাদের ভাষার লড়াইকে তুলে এনেছেন। যেখানে তিনি প্রচলিত ধ্যান-ধারণার ও ইতিহাসকে চ্যালেঞ্জ করে নতুন দিঙ্‌নির্দেশনা প্রদান করেছেন। ইতিহাসের একাধিক অমীমাংসিত সত্যকে ইতিহাসের কাঠগড়ায় তুলে এনে প্রতিষ্ঠিত করার উদ্যোগ নিয়েছেন। সেখানে তিনি বাংলা ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট তৈরি হওয়া দেখিয়েছেন প্রাচীনকালে আরাকান শাসনামলে। তিনি ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে পুলিশের গুলিতে মাথার খুলি উড়ে মগজ বেরিয়ে যাওয়া যুবকের নাম বলেছেন সালাউদ্দিন, যাকে তিনি রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের প্রথম শহিদ বলেছেন। তাছাড়া ভাষা আন্দোলনে শেখ মুজিবুর রহমানের ভূমিকা এবং ১৯৪৮ সালে সংগঠিত ভাষা আন্দোলনের প্রথমপর্বের গুরুত্বপূর্ণ ঘটনাবলি যথাযথভাবে ইতিহাসে স্থান পেয়েছে কি না তা নিয়েও প্রশ্ন তুলেছেন (কুদ্দুস, ২০১৫, পৃ. ৮)। ভাষাসৈনিকদের অনেকেই সে-সময় কারাবরণ করেছিলেন। যাদের মধ্যে ছিলেন বহু ছাত্র ও যুবনেতা। তাদের কারাগারের স্মৃতি নিয়ে ফজলুল করিম লিখেছেন *বায়ান্নর কারাগার* (করিম, ২০১৪, পৃ. ১৫-১৮)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঘটনা প্রবাহ ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ* গ্রন্থে এম. এ. বার্ণিক উল্লেখ করেছেন ভাষা আন্দোলনের পূর্বে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার বিভিন্ন উদ্যোগ, আন্দোলনের স্তিমিত বিভিন্ন ঘটনা, বিস্ফোরণকাল এবং আন্দোলন-উত্তর গঠনমূলক বিভিন্ন বিষয়সমূহ (বার্ণিক, ২০০৫, পৃ. ৮-৯)। *মোস্তফা কামালের ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন* গ্রন্থে ১৯০০ সালের শুরু হতে এ অঞ্চলে ভাষার ক্ষেত্রে কী ধরনের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়েছিল তা তুলে ধরেছেন। সে-সাথে তিনি ভাষা আন্দোলনকে ১৯৪৭-৪৮ এবং ১৯৫২ এ দুটি পর্বে ভাগ করে দেখানোর চেষ্টা করেছেন (কামাল, ১৯৮৭)। বদরুদ্দীন উমর-এর *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল* (২য় খণ্ড) গ্রন্থে বিভিন্ন রাজনৈতিক ও গণ সংগঠনের সাংগঠনিক ঘোষণাপত্র, গঠনতন্ত্র, প্রস্তাব, ভাষণ, ইশতাহার, সার্কুলার, মূল্যবান ঐতিহাসিক দলিলপত্র, এলিস কমিশন রিপোর্ট ও তাজউদ্দীন আহমেদের ডায়রির কিছু অংশ এখানে আলোচিত হয়েছে (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ৭-১২)। *বাংলা ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বাঙালির সংগ্রাম* গ্রন্থে নিগার চৌধুরী দেখানোর চেষ্টা করেছেন, ভাষা আন্দোলনের সূত্রপাত হতে শুরু করে ভাষা আন্দোলনের দিকে এগিয়ে যাওয়ার ঘটনাপ্রবাহ। ভাষা আন্দোলনের দ্বিতীয় পর্যায়ে তিনি দেখানোর চেষ্টা করেছেন বায়ান্নর রক্তাক্ত রাজপথ ও বিদ্রোহী গণপরিষদের ঘটনাসমূহ (চৌধুরী, পৃ.১-৬)। সন্তোষ গুপ্ত তাঁর *একুশের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ* গ্রন্থে দেখানোর চেষ্টা করেছেন, একুশে ফেব্রুয়ারি হতে কীভাবে অর্থনৈতিক মুক্তির দিকে বাঙালি এগিয়ে যায়। সে-সাথে জাতীয়তাবাদী চেতনায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে কীভাবে স্বাধীনতার দিকে এগিয়ে গিয়েছিল। তিনি আরও বলার চেষ্টা করেছেন, উনিশ শতকে রেনেসাঁর যে ভূমিকা ছিল রাজনীতি, সমাজ, সংস্কৃতিতে; তৎকালীন পূর্ববাংলার রাজনীতিতে সে ভূমিকা রেখেছিল ভাষা আন্দোলন। বাংলা ভাষা সর্বক্ষেত্রে

প্রচলনে কী কী বাধার সম্মুখীন হতে হয় সেটাও দেখানোর চেষ্টা করেছেন (গুপ্ত, ২০০৫, পৃ.৪-৬)। *ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ দুই বাংলার চালচিত্র* গ্রন্থে ড. জাকিরুল হক ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস ও ভাষা আন্দোলন থেকে স্বাধিকার আন্দোলন সম্পর্কে আলোচনা করেছেন (হক, ২০১৪, পৃ. ১১-১২)।

হাসান হাফিজুর রহমান সম্পাদিত *একুশে ফেব্রুয়ারি* গ্রন্থে সকল ভাষার মর্যাদা সমান-সহ সকল প্রতিবন্ধকতা দূর করে সামনে চলার অনুপ্রেরণা কীভাবে ভাষা আন্দোলনের প্রেরণা হতে পাওয়া যায়, তা দেখানো হয়েছে। তাছাড়া, পাকিস্তানের বিভিন্ন জাতির ভাষার সমান অধিকারের স্বীকৃতির ভিত্তিতে সকল জাতির মর্যাদা প্রতিষ্ঠার কথা রয়েছে (রহমান, ২০১৬, পৃ. ২৬)। অন্যদিকে ইসমাইল হোসেন বকুল সম্পাদিত *ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, রক্তঝরা একুশ* বইয়ে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, এ আন্দোলনে বিভিন্ন ব্যক্তি ও সংগঠনের ভূমিকা, আন্দোলনের ধরন, বিস্তার, ব্যস্ত ঘটনাবলির বিবরণ তুলে ধরেছেন বিভিন্ন সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে (হোসেন, ২০০০, পৃ. ৭)। এছাড়া বশীর আল্ হেলাল তাঁর *ভাষা-আন্দোলনের সেই মোহনায়* গ্রন্থে ভাষা আন্দোলনের সমগ্র ইতিহাস সংক্ষিপ্ত পরিসরে দেখা যায়। তিনি ভাষা আন্দোলনকে শোষিত আর শোষকের মধ্যকার আন্দোলন হিসেবে উপস্থাপন করেছেন। সে-সাথে ভাষা আন্দোলনে আমাদের রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক আত্মবিকাশের পথ কতটা উত্তাল ছিল তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন (হেলাল, ২০০৩, পৃ. ৭-৮)। মোনায়েম সরকার সম্পাদিত *একুশে নির্বাচিত প্রবন্ধ* গ্রন্থে বিভিন্ন প্রবন্ধ-লেখক তাদের প্রবন্ধের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট, বর্তমান সমাজ-রাজনীতির ওপর ভাষা আন্দোলনের প্রভাব এবং জাতীয় ও আন্তর্জাতিক পর্যায়ে মাতৃভাষার মর্যাদা প্রতিষ্ঠার বিষয়সমূহ তুলে ধরেছেন (সরকার, ২০১৯ পৃ. ৭-৮)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি* গ্রন্থে বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলন-পরবর্তী সময়ে এ দেশের প্রতিটি রাজনৈতিক, সামাজিক ও অর্থনৈতিক আন্দোলনকে কীভাবে প্রভাবিত করেছে এবং করছে তা দেখানোর চেষ্টা করেছেন (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ৭-১২)। আতিউর রহমান ও লেনিন-এর লেখা *ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার* বইয়ে ভাষা আন্দোলনের তাত্ত্বিক কাঠামো তুলে ধরেছেন। ভাষা আন্দোলনের বিভিন্ন প্রকাশনার পর্যালোচনার মাধ্যমে জাতীয়তাবাদ ও সাংস্কৃতিক চেতনা গড়ে ওঠার বিষয়ে বর্ণনা করেছেন (রহমান, আজাদ, ১৯৯৫, পৃ. ৭-৯)। উল্লিখিত কোনো গ্রন্থ বা প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি সংক্রান্ত কোনো রচনা নেই। যে কারণে আলোচ্য গবেষণার যৌক্তিকতা নির্ধারণ করা হয়েছে।

ঘটনাপ্রবাহ

১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ হরতালের মধ্য দিয়ে রাজপথে ভাষা আন্দোলন সূচিত হলেও বুদ্ধিবৃত্তিক ভাষা আন্দোলন সূচিত হয়েছিল ১৯৪৭ সাল থেকেই। ভারত-পাকিস্তান বিভাজন যখন আসন্ন, তখন ১৭ই মে ১৯৪৭-এ হায়দ্রাবাদে উর্দু সম্মেলন হয়; যেখানে মুসলিম লীগ নেতা চৌধুরী খালিকুজ্জামান পাকিস্তানের জাতীয় ভাষা উর্দু হবে বলে ঘোষণা করেন। বাঙালি লেখক আবদুল হক এর প্রতিবাদে দৈনিক *ইত্তেহাদ* পত্রিকায় ২২ এবং ২৯শে জুন এক প্রবন্ধ লিখেন 'বাংলা ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব: ভাষা বিষয়ক প্রস্তাব'। উর্দুভাষা যে মুসলমানের ভাষা, ইসলামি ভাষা– এমন একটি অযৌক্তিক ধারণা থেকে আলীগড় বিশ্ববিদ্যালয়ের তৎকালীন উপাচার্য ড. জিয়াউদ্দিন ১৯৪৭ সালের ১৪ই জুলাই মন্তব্য করেছিলেন, উর্দু হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। তিনি মনে করেছিলেন পাকিস্তান হবে মুসলমানের ইসলামি রাষ্ট্র। উর্দু ছিল মাত্র ৬.০৭ শতাংশ নাগরিকের মাতৃভাষা। একটি রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষা হয় সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা আর সেদিক থেকে বাংলা ভাষার দাবি অগ্রগণ্য ছিল। এ লেখার প্রতিবাদে ড. মুহাম্মদ শহীদুল্লাহ্ *আজাদ* পত্রিকায় ২৯শে জুলাই এক প্রবন্ধ লিখেন

'পাকিস্তানের ভাষা সমস্যা' শিরোনামে। যেখানে তিনি শতকরা ৫৫ শতাংশ পাকিস্তানি নাগরিকের ভাষা 'বাংলা' রাষ্ট্রভাষা হবে এমন যুক্তি উপস্থাপন করেন (হোসেন, ২০২৪, পৃ. ১-২)।

১৯৪৭ সালে জুলাই মাসে কামরুদ্দীন আহমদ প্রধানত ভাষা প্রসঙ্গে ঢাকায় প্রতিষ্ঠা করেন 'গণ আজাদী লীগ'। পুলিশি তৎপরতায় এর বিকাশ না হয়ে নাম হয় 'সিভিল লিবার্টিজ'। কমিউনিস্ট নেতা ভাষা মতিন এ-সময় প্রতিষ্ঠা করেন 'গণতান্ত্রিক যুবলীগ'। পূর্ব-বাংলার ছাত্র-জনতা, বুদ্ধিজীবীগণ দাবি করেছিলেন দুটি বিষয়ে। একটি ছিল পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষার মাধ্যম ও সরকারি দাপ্তরিক কাজে রাষ্ট্রভাষা হতে হবে বাংলা এবং উর্দু। 'তমদ্দুন মজলিশ' নামক সংগঠনটি ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর প্রতিষ্ঠিত হয়ে এ দুটি দাবির পক্ষে আবুল কাশেমের নেতৃত্বে প্রথম আন্দোলন গড়ে তুলেছিল। তরুণ নেতা শেখ মুজিবুর রহমান ১৭ই আগস্ট কলকাতার সাপ্তাহিক *মিল্লাত* পত্রিকার সম্পাদকের সাথে বলেছিলেন, বাংলা হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা। কারণ, বাংলা সংখ্যাগরিষ্ঠের ভাষা। ১৯৪৭ সালের ৫ই ডিসেম্বর বাংলা ভাষার দাবিতে একটি মিছিল পূর্ব-পাকিস্তান মুখ্যমন্ত্রীর সরকারি বাসভবন 'বর্ধমান হাউস'-এ গিয়ে একটি সভায় যোগ দিয়েছিল। পাকিস্তানের কেন্দ্রীয় পার্লামেন্ট 'গণপরিষদে' ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি শুধু উর্দু ও ইংরেজিতে সংসদ সদস্যদের বক্তব্য দেওয়ার আহ্বান জানানো হলে কংগ্রেস থেকে নির্বাচিত সংসদ সদস্য ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অত্যন্ত যৌক্তিকভাবে এ প্রস্তাবের সংশোধনী এনে বাংলাকেও গণপরিষদের অন্যতম ভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার আহ্বান জানিয়েছিলেন। যদিও তৎকালীন পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন দৃঢ়ভাবে তা প্রত্যাখ্যান করেন। তারা বলার চেষ্টা করেন, ইসলামি রাষ্ট্র পাকিস্তানে 'উর্দু' রাষ্ট্রভাষা হবে এটাই স্বাভাবিক। সে-সময় খাজা নাজিমুদ্দিন মিথ্যে বলেন যে, পূর্ব-পাকিস্তানের মানুষ উর্দুকেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে চায়। পূর্ব-পাকিস্তানে এর প্রতিবাদে ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয় এবং ২৬শে ফেব্রুয়ারি নগরব্যাপী মিছিল হয়। গণপরিষদের ভাষার তালিকা হতে বাংলা ভাষা বাদ দেওয়া, পাকিস্তানের মুদ্রা ও ডাকটিকিটে বাংলা ব্যবহার না করা এবং নৌ-বাহিনীর চাকরির পরীক্ষায় বাংলা বাদ দিয়ে শুধু উর্দুকে মাধ্যম হিসেবে রাখার প্রতিবাদে ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ঢাকায় ধর্মঘট পালিত হয়। মিছিলে 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগান তোলে ছাত্ররা এবং অনেককে গ্রেপ্তার করা হয়। যার প্রতিবাদে ১৪ই মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং ১৫ই মার্চ সারা পূর্ব-বাংলায় ধর্মঘট পালিত হয়। পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন সেদিন ছাত্র সংগ্রাম পরিষদের সাথে 'এগ্রিমেন্ট' স্বাক্ষর করে বাংলাকে এ প্রদেশের সরকারি ভাষা করা হবে বলে মেনে নেন। সেদিন আন্দোলনের পরিপ্রেক্ষিতে সরকার যাদের গ্রেপ্তার করেছিলেন, তাদের মুক্তি দেওয়া হয়। গভর্নর-জেনারেল মোহাম্ম আলী জিন্নাহ ঢাকায় এসে ১৯৪৮ সালের ২১ ও ২৪শে মার্চ দাম্ভিক উক্তি করেছিলেন যে, পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হবে উর্দু। জিন্নাহ ও প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খানের মৃত্যুর পর পাকিস্তানের প্রধানমন্ত্রী হন খাজা নাজিমউদ্দিন এবং পূর্ব-পাকিস্তানের মুখ্যমন্ত্রী হয়েছিলেন নূরুল আমীন। ১৯৫২ সালে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিন ২৭শে জানুয়ারি করাচি হতে ঢাকা এসে পল্টন ময়দানের সমাবেশে আবার উল্লেখ করেন, ''উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা।'' যার প্রতিবাদে ৩০শে জানুয়ারি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে ধর্মঘট পালিত হয়। ৩১শে জানুয়ারি বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দলের নেতাদের সভা হয় এবং বিভিন্ন রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দল, ছাত্র-সংগঠন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র-হল, পূর্ববঙ্গ বিধান পরিষদের সদস্যদের নিয়ে গঠিত হয় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদ' (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৮)। ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি আবুল হাশিমের সভাপতিত্বে রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভা হতে সিদ্ধান্ত নেওয়া হয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার। যদিও পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক

পরিষদের নির্বাচন এ অজুহাতে পালিত হতে পারে বলে কেউ কেউ ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করতে আগ্রহী ছিলেন না। রাতে নবাবপুরে আওয়ামী মুসলিম লীগের সভায় ১১-৪ ভোটে সিদ্ধান্ত হয় ১৪৪ ধারা ভঙ্গ হবে না। এ সংবাদ ছাত্রী-হোস্টেলে পৌঁছালে ছাত্রীদের মধ্যে তুমুল বিতর্ক দেখা দেয়। তবে সলিমুল্লাহ হল ও ফজলুল হক হলে অনুষ্ঠিত দু'টি সভা হতে ১৪৪ ধারা ভাঙার পক্ষে সিদ্ধান্ত হয়। এমনকি ২০শে ফেব্রুয়ারি রাত ১২টায় ১১ জন ছাত্রনেতা ঢাকা হলের পুকুরের পূর্বধারের সিঁড়িতে এক জরুরি গোপন বৈঠকে বসে ১৪৪ ধারা ভঙ্গের সিদ্ধান্ত নেন (একুশ, ২০১০, পৃ. ৩৩)। তবে শেষে ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে।

ভাষা আন্দোলনের আইনগত ভিত্তি

একমাত্র ভাষানির্ভর নির্ভেজাল জাতীয়তাবাদী চেতনাই পারে গণতন্ত্রকে বিকশিত করে মানুষের অধিকার ও সুযোগের সাম্য প্রতিষ্ঠা করতে। ১৯৫২ সালের মাতৃভাষা নিয়ে আন্দোলন শুধু বাঙালির নয়, সারা বিশ্বের প্রতিটি জাতির মাতৃভাষার মর্যাদা, স্বাধিকার, স্বাধীনতা ও মানুষের মতো বাঁচার দাবির সংগ্রামের দুর্জয় অনুপ্রেরণা তৈরি করেছে। জাতি হিসেবে আমরা আত্মনিয়ন্ত্রণাধিকার প্রতিষ্ঠায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদী ভাবধারার সমন্বয়ে অসাম্প্রদায়িক চেতনা ধারণ করেছি। ভাষা আন্দোলনের পক্ষে বেশ কিছু আইনগত ভিত্তি ছিল। ১৯৫৬ সালে পাকিস্তানের সংবিধানের ২১৪ অনুচ্ছেদে বাংলাকে উর্দুর সাথে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেওয়া হয়। যা আইনগত অধিকারের একটি অর্জন ছিল। ২১শে ফেব্রুয়ারি বর্তমানে আমাদের 'শহিদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' যা জাতিসংঘের ইউনেস্কো কর্তৃক স্বীকৃত। সারা বিশ্বে 'সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র ক্ষমতা' নীতিটি সকল গণতান্ত্রিক সংবিধানে স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত। ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইন (Government of India Act) যা দ্বারা ভারত ও পাকিস্তান পরিচালিত হয়ে আসছিল। এ আইনে নির্বাচনের মাধ্যমে জনপ্রতিনিধি নির্ধারণের বিধান ছিল। যেহেতু সংবিধান রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইন, সেক্ষেত্রে পাকিস্তানের ৫৬ শতাংশ জনগণের ভাষা বাংলাকে নিয়ে আন্দোলন করার অর্থ দাঁড়ায় এ আন্দোলনটি পরিচালিত হয়েছিল একটি গণতান্ত্রিক ও আইনি বিধান বাস্তবায়ন করার জন্য। এরই ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশে বর্তমানে কার্যকর ১৯৭২ সালের সংবিধানে, অর্থাৎ রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ আইনের ২৩ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়েছে, রাষ্ট্রীয় জাতীয় ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নের এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করতে হবে যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখার ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে।

১৯৪৮ সালে জিন্নাহ যখন ঢাকায় এসে রাষ্ট্রভাষা উর্দুর স্বপক্ষে বলেন, তখন সেখানে লঘিষ্টের ভাষা গরিষ্ঠের ওপর চাপিয়ে দিয়ে প্রভুত্ব বিস্তারের সুপ্ত বাসনা প্রদর্শন করেন। যা ছিল পাকিস্তানি মানসিকতার প্রতিফলন আর এ মানসিকতা পাকিস্তান '৭১ সাল পর্যন্ত ধারণ করেছিল। অর্থাৎ জিন্নাহ লঘিষ্ঠের প্রাবল্য প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে আগ্রহ দেখিয়েছিলেন। তিনি পাকিস্তানের পথদ্রষ্টা ছিলেন। যে-কারণে '৪৬ সালের এপ্রিলে দিল্লি মুসলিম লেজিসলেটরস কনফারেন্সে তার নির্দেশে এবং সোহরাওয়ার্দীর সহযোগিতায় লাহোর প্রস্তাবে 'স্টেটস' শব্দটি 'স্টেট' হয়ে যায়। যার মধ্য দিয়ে দুই পাকিস্তান হয়ে গিয়েছিল এক পাকিস্তান। যদিও জিন্নাহর মৃত্যুর আগে তার ব্যক্তিগত চিকিৎসকের কাছে সিদ্ধান্তটি ভুল বলে স্বীকার করে গেছেন। তবে তখন আর শোধরানোর উপায় ছিল না। আর উত্তরসূরিরা সে ভুলকে ধরে রেখে পাকিস্তান পরিচালনা করার জন্য '৭১-এর যুদ্ধ অনিবার্য হয়ে ওঠে (হোসেন, ২০২৪, পৃ. ১-২)।

১৯৬০ সালে 'জনগোষ্ঠীর আত্মনির্ধারণ অধিকার' বিষয়টি একটি মানবাধিকার হিসেবে আন্তর্জাতিক আইনি দলিলে স্বীকৃতি পেয়েছে। যদিও এ বিষয়টি তার পূর্বের কয়েক দশকে সারাবিশ্বে অধিকার অর্জনের মতো

পরিপূর্ণতা অর্জন করেছিল। এ দলিলটি ছিল 'Declaration on the Granting of Independence to Colonial Countries and Peoples (DGICCP)'। উক্ত আইনি দলিল অনুসারে কোনো ভাষাভিত্তিক সংখ্যাগরিষ্ঠ জনগোষ্ঠী আত্মনির্ধারণ অধিকার চর্চার যোগ্যতা রাখে। যে-কারণে দেখা যায়, হাজার বছরের বেশি সময় ধরে বিকাশমান বাঙালি জাতি বা বাঙ্গালি জনগোষ্ঠী ১৯৪৭ সাল হতে যখন ভাষাভিত্তিক জাতীয় চেতনাকে শক্তিশালী করা বাঙালি জাতীয় স্পৃহা তৈরির মাধ্যমে 'আত্মনির্ধারণ অধিকার' চর্চার দিকে অর্থাৎ স্বাধীন রাষ্ট্র গঠনের দিকে এগিয়ে যায়, তখন থেকে উক্ত বিষয়টি আন্তর্জাতিক আইনে আবৃত একটি বিষয় বলে পরিগণিত হয় (মন্ডল, ২০২৩)।

ভাষা আন্দোলনে নিহতদের পক্ষে মামলা

১৯৫২ সালের ২৫শে মার্চ শহিদ আবুল বরকতের ছোটো ভাই আবুল হাসনাত ঢাকা সদর মহকুমা হাকিম এন. আহমদের এজলাসে একটি মামলা দায়ের করার চেষ্টা করেন। আবুল বরকতকে গুলি করে হত্যা করার অপরাধে তিনি ঢাকা জেলা ম্যাজিস্ট্রেট কোরেশী, সিটি এস.পি মাসুদ মাহমুদ, ডি.আই.জি. এ. জেড ওবায়দুল্লা ও কয়েকজন পুলিশের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। আবেদনে বলা হয়, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ২য় বর্ষ এম.এ ক্লাসের ছাত্র আবুল বরকত ২১শে ফেব্রুয়ারি অপরাহ্নে ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে তার বন্ধু মোরশেদ নেওয়াজের সাথে দেখা করতে যান। মোরশেদ নেওয়াজ ১২ নং শেডের একটি ঘরে থাকতেন। সেখানে উভয়ের সাক্ষাতের সময় বাইরে বিভিন্ন স্লোগান হচ্ছিল। যা শুনে বরকত শেডের বাইরে এসে দাঁড়ান এবং কয়েকজন বন্দুকধারী পুলিশকে হোস্টেলের ভেতর প্রবেশ করতে দেখে আবার ঘরে ফিরে যাবার সময় পুলিশের গুলিতে পড়ে যান। তাকে ইমার্জেন্সি ওয়ার্ডে নিয়ে যাওয়া হলে ডা. নুরুল হক তার চিকিৎসা করান। আহত অবস্থায় বরকত হাসপাতালে কর্তব্যরত মেডিক্যাল কলেজের ছাত্র ও অন্যান্য ব্যক্তির নিকট তার আঘাতের বিবরণ দেন এবং সন্ধ্যা সাড়ে সাতটার দিকে ওই আঘাতের ফলে তিনি মারা যান। পুলিশ আবেদনকারীর অনুরোধ উপেক্ষা করে মৃতের আত্মীয়-স্বজনের আগমনের অপেক্ষা না করে ও ময়নাতদন্ত না করে সে-রাতে লাশ দাফন করে। মহকুমা হাকিম বিচারের জন্য মামলা গ্রহণ করতেই রাজি হন না। তিনি বলেছিলেন, অভিযুক্ত ব্যক্তিরা সকলেই সরকারি অফিসার। ঘটনার আগের দিন যে ১৪৪ ধারা জারি করা হয়েছিল তা কার্যকর করতেই তারা ঘটনার সময় কর্তব্যে নিযুক্ত ছিলেন। অভিযোগের বিবরণ অনুযায়ী তারা যা কিছু করেছেন তা নিজ নিজ কর্তব্য হিসেবে করেছেন। একই সাথে ফৌজদারি দণ্ডবিধির ১৩৭ ও ১৩২ ধারা অনুযায়ী কেন্দ্রীয় বা প্রাদেশিক সরকারের অনুমতি ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে বিচারের জন্য কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা যায় না। আবেদনকারী তার অভিযোগের সাথে অনুরূপ কোনো অনুমতিপত্র দাখিল করতে পারেননি বলে অভিযোগটি খারিজ করা হয় (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ২২)। মামলাটি আবেদনকারীর পক্ষে পরিচালনা করেন আলী আমজাদ খান, আতাউর রহমান খান, এম. রহিম, কামরুদ্দিন আহমদ, জমিরুদ্দিন, নুরুল ইসলাম, জহিরুদ্দিন, সৈয়দ শহুদুল হক ও শামসুল হক। আর কোর্ট ইন্সপেক্টর কাজী জহুরুল হক সরকারপক্ষে মামলা পরিচালনা করেন।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকা মেডিকেল কলেজ হোস্টেল প্রাঙ্গণে রফিকউদ্দিন আহমেদকে গুলি করে হত্যা করার অপরাধে ঢাকার জেলা মেজিস্ট্রেট জনাব কোরেশী, সিটি এস,পি জনাব মাসুদ মাহবুব, ডি, আই, জি, জনাব এ, জেড, ওবায়দুল্লাহ ও জন কয়েক অজ্ঞাতনামা বন্দুকধারী পুলিশের বিরুদ্ধে ২৮শে মার্চ শুক্রবার ঢাকা সদর মহকুমা জনাব এস, আহমেদের এজলাসে অভিযোগ করা হলে তা বাতিল করা হয়। মহকুমা হাকিম বলেন যে, অভিযুক্ত ব্যক্তিগণ সকলেই সরকারি কর্মচারী। একইসাথে যেহেতু তারা নিজ নিজ কর্তব্যে

নিযুক্ত থাকাকালীন গুলিবর্ষণের নির্দেশ দিয়েছিলেন, সে-কারণে সরকারের অনুমোদন ছাড়া তাদের বিরুদ্ধে বিচারার্থ কোনো অভিযোগ গ্রহণ করা চলে না। মৃত রফিকউদ্দিন আহমদের মামাত ভাই জনাব মোশাররফ হোসেন খান উপরিউক্ত অফিসারদের বিরুদ্ধে অভিযোগ করেন। ঘটনার বিবরণে সে-দিন বন্দুকধারী পুলিশকে প্রহরারত দেখতে পাওয়া যায়নি। একদল পুলিশ মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে প্রবেশ করে গুলিবর্ষণ করে এবং সেই গুলিতে রফিক নিহত হন। তাছাড়া, আবেদনকারী এটিও উল্লেখ করেন যে পুনঃপুন অনুরোধ করার পরও পুলিশ মৃত রফিকউদ্দিনের পিতার আগমনের অপেক্ষা না করে সে-দিন রাত প্রায় ৩টার দিকে আজিমপুরে মৃতের লাশ দাফন করে। বাদী পক্ষে জনাব আতাউর রহমান, জনাব জহিরুদ্দিন, জনাব জমিরুদ্দিন, জনাব এস, এ রহিম প্রমুখ এবং বিবাদী পক্ষে কোর্ট ইন্সপেক্টর জনাব কাজী জহুরুল হক মামলা পরিচালনা করেন (স্টাফ রিপোর্টার, ১৯৫২)। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে মওলানা ভাসানী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে গুলি চালানোর জন্য সরকারের নিকট তদন্ত দাবি করে। তিনি উল্লেখ করেন উক্ত গুলি চালনায় ৭ ব্যক্তি শহিদ হয়েছিলেন, তা প্রমাণের জন্য যথেষ্ট তথ্য তার কাছে রয়েছে। একইসাথে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভায় গৃহীত এক প্রস্তাবে ছাত্র জনতার উপর পুলিশের গুলি চালানো নিয়ে নতুন তদন্ত করার দাবি আসে।

১৫ই মার্চ হাইকোর্টের প্রধান বিচারপতি শাহাবুদ্দীন পূর্ব-বাংলা সরকারের অনুরোধ অনুযায়ী তদন্তের জন্য বিচারপতি টি. এইচ. এলিস-কে নিয়োগ করেন। সরকার শুধু ২১শে ফেব্রুয়ারির গুলি চালানোর ঘটনার মধ্যে তদন্তের এখতিয়ার বেঁধে দেয়। জনসাধারণ তদন্তের এ ব্যবস্থা ও পদ্ধতি প্রত্যাখ্যান করে। কমিশনের কর্মপরিধি অত্যন্ত সংকীর্ণ হওয়ায় ভাষা আন্দেলনের কেন্দ্রীয় কর্মপরিষদ তা প্রত্যাখ্যান করে। অনেক ছাত্র বন্দি ও বিশ্ববিদ্যালয় বন্ধ হওয়ায় অনেকে সাক্ষ্য দিতে পারেনি। তদন্তে শুধু গুলির বিষয়টি আনা হয়, সামগ্রিক ঘটনাবলিকে সংযুক্ত করা হয়নি। তদন্ত কমিশনকে প্রহসন আখ্যা দিয়ে বিভিন্ন সংগঠন দাবি জানাতে থাকে। ঢাকায় কমিশনার্স কোর্টে ১৯৫২ সালের আট এপ্রিল বিচারপতি এলিস তদন্ত শুরু করেন। ৩রা মে শুনানির দিন শেষ হয় ও ২৭শে মে সরকারকে তদন্ত-রিপোর্ট দেওয়া হয়। ৩১শে মে তা প্রকাশ করা হয়। তদন্তে বিচারপতি এলিস দেখানোর চেষ্টা করেন, পরিস্থিতি বিবেচনায় পুলিশের গুলিবর্ষণ যুক্তিযুক্ত হয়েছে। আইনত সরকারের তরফ হতে কোন অংশগ্রহণ ছিল না। তবে ঢাকা হাইকোর্টের সৈয়দ আব্দুল গণিকে সাহয্যের জন্য বলেন। রিপোর্টে ৯১ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয় ১৪৪ ধারা অমান্যের জন্য। বেলা ৩টায় পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না নিতে পেরে জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট, পুলিশের ডেপুটি ইন্সপেক্টর-জেনারেল এবং পুলিশ সুপার গুলি চালানোর প্রয়োজনীয়তা সম্পর্কে একমত হন। জেলা-ম্যাজিস্ট্রেটের নির্দেশে ও পুলিশ সুপারের সরাসরি আদেশক্রমে পুলিশ দাঙ্গাকারীদের উপর গুলি করতে বাধ্য হয়। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে না থাকায় কতজন নিহত হয় পুলিশ সঠিক তথ্য জানে না। পরবর্তীতে রিপোর্টে দেখা যায় হতাহতের সংখ্যা ৯ জন ও তাদের মধ্যে ২ জন রাত্রে মারা যান। বিচারপতি জানান, জেলা-ম্যাজিস্ট্রেট ছিলেন নতুন। তিনি আরও জানান, সব লিখিত ও মৌখিক তথ্য হতে জানা যায়, সেদিন ২৭ রাউন্ড গুলি হয়, গুলিতে ৯ জন আহত ৩ জন মারা যায়। আরও জানান, পুলিশের পক্ষে গুলি চালানোর প্রয়োজন ছিল আর পরিস্থিতির বিবেচনায় গুলি করা যুক্তিযুক্ত ছিল। উক্ত তদন্তে বিচার্য বিষয়ের পরিধি ছিল যুক্তিযুক্ত (হেলাল, ২০০৩, পৃ. ১৪২-১৪৯)।

জনগণের সম্পৃক্ততা

রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন কতিপয় ব্যক্তিবিশেষের চিন্তাপ্রসূত ও সংশ্লিষ্ট আন্দোলন ছিল না। এখানে নানান শ্রেণি-পেশার মানুষের অংশগ্রহণ ছিল। যার ধারাবাহিকতায় আত্মপ্রকাশ ঘটে বিভিন্ন সংগঠনের। বিভিন্ন শ্রেণি-

পেশার মানুষ আন্দোলনে অংশগ্রহণ করে। ধারণা হতে পারে, ভাষার ব্যাপারটা শিক্ষিত লোকদের বিষয়। তবে ভাষাটা শিক্ষিত লোকের চেয়ে গরিবদের বেশি দরকার ছিল। শিক্ষিত যারা ছিলেন, তারা তো ইংরেজি কিছুটা জানতেন। বাংলা তাদের না জানলেও হতো। কিন্তু যারা গরিব, তাদের তো বাংলা ছাড়া অন্য উপায় ছিল না। কাজেই নিজের ভাষায় কথা বলতে পারবে না এ বিষয়টি এবং তৎকালীন দুর্ভিক্ষ ও খ্যাদ্যাভাব সাধারণ মানুষকে আন্দোলনে প্রভাবিত করে (উমর, ২০২৪, পৃ. ৫)। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ পূর্ব-পাকিস্তানে সাধারণ ধর্মঘট পালিত হয়। ছাত্ররাই মূলত বিক্ষোভ শুরু করলেও পরবর্তীতে সে বিক্ষোভে অফিস-আদালতের কর্মচারী এবং রেল-শ্রমিকরা যুক্ত হয়েছিল (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৬)। 'আসমাপ্ত আত্মজীবনী' গ্রন্থে শেখ মুজিবুর রহমান উল্লেখ করেন, ১১-১৫ই মার্চ নেতারা কারারুদ্ধ ছিলেন। তিনি আরও লিখেছেন:

> দেওয়ালের বাইরেই মুসলিম গার্লস স্কুল। যে পাঁচ দিন আমরা জেলে ছিলাম সকাল দশটায় মেয়েরা স্কুলের ছাদে উঠে শ্লোগান দিতে শুরু করত, আর চারটায় শেষ করতো। ছোট্ট ছোট্ট মেয়েরা একটু ক্লান্তও হত না। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই', 'বন্দি ভাইদের মুক্তি চাই', 'পুলিশের জুলুম চলবে না'– নানা ধরনের শ্লোগান দিত। এ সময় হক সাহেবকে আমি বললাম, ''হক সাহেব ঐ দেখুন, আমাদের বোনেরা বেরিয়ে এসেছে। আর বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা না করে পারবে না।'' হক সাহেব আমাকে বললেন, ''তুমি ঠিকই বলেছ, মুজিব'' (রহমান, ২০১২, পৃ. ৯৩, ৯৫)।

পঞ্চাশের দশকে ভাষা আন্দোলনের মধ্য দিয়েই এদেশের মেয়েরা রক্ষণশীলতার বেড়ি ভেঙে একটা প্রগতির ধারা সূচনা করেছিল। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামিক ইতিহাসের অধ্যাপক সুফিয়া আহমেদ স্মৃতিচারণ করেছেন:

> ২১ ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল করার সময় শুরুর দিকে দুই তিনটি দলে ভাগ হয়ে ছাত্রদের মিছিল বেরিয়ে যাওয়ার পর ছাত্রীদের যে মিছিল হয় তাতে তারা আট-দশ জনের মত ছিলেন। রক্ষণশীল পর্দাপ্রথা মেনে চলা মেয়রাও ভাষা আন্দোলন অনিবার্য দেখে বোরখা পরেই মিছিলে গিয়েছিল ও গুলি ও কাঁদনে গ্যাসের সম্মুখীন হয়েছিল। সম্ভ্রান্ত পরিবারের মেয়েরাও এ সময় বাড়ি বাড়ি গিয়ে অর্থ সংগ্রহ করে আন্দোলন পরিচালনার জন্য। চার দশক আগে নারীদের পক্ষে রক্ষণশীলতার দড়ি ছেড়া ততটা সহজ ছিল না। তার মধ্যেও মেয়েরা নানা ভাবে ভাষা আন্দোলনকে শক্তি, অনুপ্রেরণা দিয়েছিল (হোসেন, ২০২৪,পৃ. ২৪)।

সংগঠন হিসেবে 'ইউথ লীগ'-ই ভাষা আন্দোলনের মূল কার্যক্রম পরিচালনা করেছে। ১৯৫১ সালে নারায়ণগঞ্জের মর্গ্যান হাইস্কুলের প্রধান শিক্ষিকা মমতাজ বেগম ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হন। ২১শে ফেব্রুয়ারির পর ঢাকায় গুলি করে ছাত্র হত্যার প্রতিবাদে বিক্ষোভ মিছিলে মুখরিত হয় নারায়ণগঞ্জ। নারায়ণগঞ্জের রহমতউল্লাহ মুসলিম ইনস্টিটিউটের মাঠে বিশাল প্রতিবাদ-সভা অনুষ্ঠিত হয়। মমতাজ বেগমের নেতৃত্বে অনেক মহিলা ও মর্গ্যান স্কুলের ছাত্রীরা এতে অংশ নেয়। এ সভায় আদমজী জুটমিলের হাজার হাজার শ্রমিক অংশ নেয় (শাহনেওয়াজ, ২০১৭, পৃ.১২৮)। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে ছাত্রদের সাথে জনগণ পুলিশের ওপর ইট-পাটকেল ছুড়েছিল। ছাত্রদের সাথে এ-দিন যুক্ত হয়েছিল এলাকার রেস্টুরেন্ট বয়, অফিসের পিয়ন, কর্মচারী, রিকশাওয়ালারা। ছাত্রদের সাথে বয় বাবুর্চিরা ইট ভেঙ্গে জমা করে রাখছিল যাতে পুলিশ ভেতরে প্রবেশ করতে না পারে। ২১শে ফেব্রুয়ারিতে মাতৃভাষা বাংলার মান রাখতে প্রাণ দিচ্ছে শুনে স্রোতের মতো মানুষ ছুটে আসে ঢাকা মেডিকেল কলেজের দিকে। আহতদের খবর নেওয়াসহ তাদের প্রাণ

রক্ষায় ছাত্রদের আবেদনে সাড়া দিয়ে রক্ত দিয়েছিল সাধারণ জনগণ। মেডিকেল কলেজে হাসপাতালের রোগীরা রাস্তার দিকের করিডরে দাঁড়িয়ে একুশে ফেব্রুয়ারির ঘটনা দেখছিল। তাদের মধ্যে অনেকে আবার পুলিশের দিকে কিছু না কিছু নিক্ষেপ করছিল (আনিসুজ্জামান, ২০০৩)। সবকিছু বন্ধ হয়ে যায়। ছাত্ররা মেডিক্যাল কলেজ হোস্টেল, এস এম হল হতে বক্তৃতা করছে, ক'দিন তারা যা বলছে জনগণ তা ই শুনছে, মানছে তাদের নির্দেশনা, যেন তারাই সরকার। ২২শে ফেব্রুয়ারিতে নিহত হওয়া শফিউর রহমানের স্ত্রী আকিলা খাতুনের সাক্ষাৎকারে জানা যায়, ২১শে ফেব্রুয়ারি শফিউর রহমান বাসায় ফিরে সবাইকে বলেছিলেন তিনি এ-দেশে আর থাকবেন না। পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর বিরুদ্ধে তিনি সেদিন তীব্র ক্ষোভ ও ঘৃণা প্রকাশ করেছিলেন। সে-সাথে বলেছিলেন, সভ্য দেশে পুলিশ সতর্কতামূলক ব্যবস্থা হিসেবে পা লক্ষ্য করে গুলি করে। কিন্তু আজ পুলিশ এলোপাতাড়িভাবে গুলি চালিয়ে ছাত্রদের মাথার খুলি উড়িয়ে দিয়েছে। কী বর্বরতা (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৬৫)! যার মধ্য দিয়ে সাধারণ মানুষের শাসকদের প্রতি তীব্র ক্ষোভের বহিঃপ্রকাশ ঘটে।

২২শে ফেব্রুয়ারিতে গায়েবানা জানাজা হলে মর্মস্পর্শী ভাষায় ইমাম বলেছিলেন, ''হে আল্লাহ, যে জালেমরা আমাদের মাসুম বাচ্চাদের উপর গুলি চালিয়েছে, তাদের ধ্বংস করে দাও।'' গায়েবানা জানাজার পর অসংখ্য মানুষ শোক-মিছিলে অংশ নেয়। ভাষাসৈনিক আব্দুল মতিন উল্লেখ করেন, ২২ তারিখে মিছিল বের করা সম্ভব হয়েছিল বিপুল পরিমাণে জনগণ জানাজায় অংশ নিয়েছিল বলে। সেক্রেটারিয়েট থেকে জানাজায় অংশ নেওয়ার উদ্দেশ্যে একটি বিরাট মিছিল এসেছিল। অফিসের বড়ো সাহেবদের হুমকি ও ওয়ার্নিং সত্ত্বেও সেক্রেটারিয়েটের কেরানিরা ধর্মঘট করেছিল। এদের সাথে বহু-সংখ্যক অন্য লোকেরাও মিছিল ও জানাজায় অংশ নেয়। ভাষাসৈনিক মুস্তফা রওশন আখতার মুকুল-এর জবানিতে জানা যায়, জগনাথ হলের ছেলেরা, হকার্স মার্কেটের লোকেরা, ঢাকার স্থানীয় মানুষ ঢাকার সদরঘাট এলাকায় জড়ো হয়েছিলেন। গায়েবানা জানাজায় জিঞ্জিরা, ফতুল্লা, মিরপুর, সাভার, বাড্ডা প্রভৃতি জায়গা হতে দলে দলে লোক এসেছিল (হেলাল, ১৯৮৫, পৃ. ৪২৮-২৯)। পরবর্তীকালে ঢাকায় কারফিউ জারি হয়। নেতারা ছাত্রদের সাথে একাত্মতা ঘোষণা করে। আবুল বরকত যেখানে শহিদ হন, সে-স্থানে ছাত্ররা ২৩শে ফেব্রুয়ারি দিবাগত রাতে কারফিউ অমান্য করে শহিদ মিনার গড়ে তোলে। অনেক মানুষ সেখানে এসে অশ্রু ফেলে, টাকা পয়সা দেয়, এমনকি অনেক মেয়েরা অলঙ্কার রেখে যায় (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ১৪)। ২৩শে ফেব্রুয়ারি সকালে সংবাদপত্রে আসে ৫ জন নিহত ১২৫ জন আহত ও ৩০ জনকে গ্রেপ্তার দেখানো হয়েছে। প্রদেশের সর্বত্র ঢাকার হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে সকল শ্রেণীর জনসাধারণের সংগঠিত বিক্ষোভ প্রদর্শিত হয় (রহমান, ২০১৬, পৃ. ১৪৬)। সরকার-পক্ষ পুরোনো ঢাকার বিভিন্ন মহল্লার সরদারদের মধ্যে ভাষা আন্দোলন-বিরোধী মনোভাব তৈরির চেষ্টা করে। তারা প্রচার চালায়, ভারতীয়দের অনুচর হিসেবে নাস্তিক কমিউনিস্টরা ভাষা আন্দোলনের নামে অরাজকতা সৃষ্টি করছে।

এভাবে মানুষের বিক্ষোভ সংগ্রামের ফলস্বরূপ ১৯৫৪ সালে নির্বাচনে মুসলিম লীগ হেরে যায়। ২রা এপ্রিল কৃষক-শ্রমিক পার্টির শেরে বাংলা এ. কে ফজলুল হক যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা গঠন করেন। যদিও পাকিস্তান সরকার তিন মাসের মধ্যে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে ৯২(ক) ধারা প্রবর্তন করেন। পূর্ব-পাকিস্তানের গভর্নর হন ইস্কান্দার মীর্জা। ১৯৫৫ সালের ৩রা জুন ৯২(ক) ধারার গভর্নর কেন্দ্রীয় শাসন বাতিল হয়। তবে ১৯৫৫ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারির শোক দিবস উদ্‌যাপনে সরকার বাধা দেয়। অনেক ছাত্র এ-সময় জেলে যায়। ১৯৫৬ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের পক্ষে আরমানিটোলা

ময়দানে এবং কৃষক প্রজা পার্টির তরফে পল্টন ময়দানে দুটি সভা অনুষ্ঠিত হয়। আরমানিটোলা ময়দানের সভায় শুরুর আগে থেকেই সভাস্থল জনসমুদ্রে পূর্ণ হয়। ময়দানের পাশের রাস্তাগুলোতেও জায়গা না হওয়াতে বাড়ির ছাদ ও বারান্দায় অসংখ্য লোক শ্রদ্ধাপ্লুত হয়ে জনসভার বক্তৃতা শোনেন। শেষে এক বিরাট মিছিল শহর প্রদক্ষিণ করে। সে মিছিলের ওপর পথের উভয় পাশের বাড়ির ছাদ ও বারান্দা হতে পুষ্পবৃষ্টি করা হয়। ঘরে ঘরে কালো পতাকা উত্তোলন, শহিদদের সংগ্রাম ও আদর্শের উত্তরাধিকারী ছাত্র-ছাত্রী ও তরুণ-তরুণীরা বাহুতে কালো ব্যাজ ধারণ, নগ্নপদে শোকপ্রকাশ, শিক্ষায়তন ও ছাত্রাবাসসমূহের সামনে শহিদ স্মৃতিস্তম্ভ নির্মাণ, অশ্রু-সজল চোখে দলে দলে জনগণ শহিদদের কবর জিয়ারত ও শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ এবং পূর্ণ হরতালের মধ্য দিয়ে ১৯৫৬ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি উদ্‌যাপিত হয়েছিল। সেদিন বাংলা একাডেমির দায়িত্ব বাংলা ভাষার প্রতি সহানুভূতিশীল নন এমন সব প্রতিক্রিয়াশীল ব্যক্তিদের ওপর ন্যস্ত করায় জনসাধারণের দাবির প্রতি পূর্ববঙ্গ-সরকার উপেক্ষা প্রদর্শন করেছে বলে সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা কর্মপরিষদের সভা হতে তীব্র নিন্দা জানানো হয়। একইসাথে সকল কালা-কানুন বাতিলসহ সকল রাজবন্দিদের অবিলম্বে মুক্তির কথা বলা হয়। ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত আন্দেলন চলে এবং সংবিধানে বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দিতে হয়। এর মধ্য দিয়েই বাঙালি সাধারণ জনগণের মধ্যে জাতীয়তার চেতনা জাগ্রত হয় এবং ক্রমে তা ১৯৭১ সালে গিয়ে পাকিস্তানের শাসকদের বিরুদ্ধে লড়াই-এর মাধ্যমে মুক্তিযুদ্ধে পরিণত হয়।

আইনগত প্রতিরোধ

পাকিস্তান রাষ্ট্রের উর্দুর অধিপত্য এবং অন্যান্য ভাষার প্রতি পদ্ধতিগত অবহেলা এ অঞ্চলের মানুষকে একইসাথে মাতৃভাষার প্রতি আকৃষ্ট এবং আন্দোলনে উদ্‌বুদ্ধ করেছে। ১৯৪৮ সালের ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালন ও সেক্রেটারিয়েট ঘেরাও করা হলে একদিকে পুলিশের বেটন, বেয়নেট, বুট দ্বারা আন্দেলনকারীদের আঘাত করা হয়। অনেক ছাত্র আহত হন এবং জ্ঞান হারিয়ে হাসপাতালে ভর্তি হন। এ-সময় কয়েকশজন গ্রেপ্তার হয়ে জেলে গিয়েছিলেন (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৬)। কমিউনিস্ট পার্টিসহ সামগ্রিকভাবে সমস্ত বিরোধী-দলকে দমন করতে সরকার জননিরাপত্তামূলক আইনসহ অন্যান্য বহু নির্যাতনমূলক আইন-ব্যবস্থা প্রবর্তন করেন। সংবাদপত্রের উপর পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে উসকানিমূলক সম্পাদকীয় ও সংবাদ প্রকাশের ওপর সেন্সরশিপ জারি করেন। দৈনিক *পূর্ব পাকিস্তান*, *ইস্টার্ণ স্টার*-এর বিরুদ্ধে ব্যবস্থা নেওয়া হয়। বিভিন্ন সংগঠনের পক্ষ হতে এ সেন্সর উঠিয়ে দেওয়ার আবেদন আসে (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ২৪৫-২৪৮)। ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে নূরুল আমীন সরকার আন্দোলনকে স্তব্ধ করার জন্য আগের দিন ১৪৪ ধারা জারি করেন। এ আইনে বলা হয়, একইসাথে চারজনের বেশি রাস্তায় নামা যাবে না ও কোনো সভা-সমাবেশ-মিছিল করা যাবে না। উক্ত আইন ভঙ্গ করলে জেল, জরিমানা হতে পারে। এ-দিন এক মাসের জন্য ঢাকা শহরে সভা, শোভাযাত্রা নিষিদ্ধ করা হয়। ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে ছাত্ররা আইন অমান্য করা শুরু করে। পুলিশ তাদের ধরে গাড়িতে নিতে শুরু করলে কে আগে যাবে তা নিয়ে ছাত্রদের মধ্যে হুড়োহুড়ি শুরু হয়। সত্যাগ্রহীদের অনেককে পুলিশ ঢাকার বাইরে দূরে ছেড়ে দিয়ে আসতে থাকে। বিশ্ববিদ্যালয়ের গেটে তখন পুলিশ আইন-অমান্যকারী সত্যাগ্রহীদের ছত্রভঙ্গ করতে লাঠি চালায়। মেয়েদেরকেও এ-সময় আঘাত করা হয়। কাঁদানে-গ্যাসের শেল ছাড়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভেতরে। ছাত্র-জনতার প্রতিরোধে টিকতে না পেরে তখন পুলিশ গুলি ছোড়ে রাস্তাসহ মেডিক্যাল কলেজের ভেতরে। শহিদ হন মানিকগঞ্জ দেবেন্দ্র কলেজের আই কম-এর ছাত্র রফিকউদ্দিন আহমেদ, রিকশাচালক আবদুল জব্বার, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের এমএ-এর ছাত্র

আবুল বরকত। অনেকে আহত হয়ে হাসপাতালে মৃত্যুর সাথে লড়াই করে। যাদের মধ্যে পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের ডিরেক্টর অব ইন্ডাস্ট্রিজ বিভাগের পিয়ন আবদুস সালাম ২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা সাড়ে তিনটায় মেডিক্যাল কলেজের সামনে পুলিশের গুলিতে আহত হন। ১৯৫২ সালের ৭ই এপ্রিল বেলা সাড়ে এগারটায় মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে পরবর্তীতে তিনি মারা যান। সাপ্তাহিক '*নতুন দিন*'র ১৩৬২ সালের ১১ই ফাল্গুন সংখ্যায় অহিউল্লাহ নামে আট-নয় বছরের এক কিশোরও শহিদ হন বলে উল্লেখ করা হয় (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৮২)। পত্রিকার রিপোর্ট অনুযায়ী আবদুল আওয়াল নামের ২৬ বছর বয়সি একজন রিক্সাচালক ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৫২-তে শহিদ হন।

শহিদ রফিকের ভগ্নীপতি মোবারক আলী খানের নিকট থেকে প্রত্যক্ষ বিবৃতির মাধ্যমে রচিত এক লেখায় উল্লেখ আছে, ২১শে ফেব্রুয়ারি বেলা ২টার সময় জানা যায় মেডিকেলে গুলি চলেছে এবং তিনজন ছাত্র মারা গেছে। বেলা তিনটায় ফুলবাড়িয়া রেলগেট এবং নওয়াবপুরে গোলাগুলি চলেছে। রেলগেটে ছোটো একটা শিশু গুলিতে মারা গেছে। এভাবেই চারদিক হতে গোলাগুলির সংবাদ জানা যায়। এছাড়া তিনি ইমারর্জেন্সি ওয়ার্ডে জনৈক কর্মরত ডাক্তারের নিকট জানতে পারেন যে, ৪টি লাশ রয়েছে হাসপাতালে (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৪৮)। ২২শে ফেব্রুয়ারিতেও গুলি চলে। সকাল সাড়ে দশটার দিকে নবাবপুর রোডে বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা করার দাবিতে মিছিলকারীদের উপর পুলিশ গুলিবর্ষণ করে। এ-দিন শফিউর রহমান গুলিবিদ্ধ হয়ে আহত হলে সন্ধ্যা সাতটায় ঢাকা মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালে মারা যান। পাকিস্তান সেনাবাহিনীর সদস্যরা মেডিক্যাল কলেজ হতে লাশ নিয়ে গুম করে ফেলত। কারণ লাশ দেওয়া হলে ছাত্ররা লাশ নিয়ে মিছিল করবে ও পরিস্থিতি খারাপ হবে। পূর্ব-রাত্রে মর্গ থেকে সব লাশ সরিয়ে গায়েব করে দেওয়া হয়। যে কারণে গায়েবানা জানাজা করা হয়। এরপর শোক মিছিলেও শহরের নানা জায়গায় গুলি চলে, এমনকি বেয়নেটও চার্জ করা হয়। পাকিস্তান পোস্ট অ্যান্ড টেলিগ্রাফ অফিসে কর্মরত সুপারিনটেনডেন্ট শফিউর রহমান এ-দিন শহিদ হন। নাম না জানা অনেকে শহিদ হন, তবে পুলিশ লাশ গুম করে ফেলে। গোপনে পুলিশ আজিমপুর পুরাতন গোরস্থানে কয়েকজন শহিদের লাশ কবর দেয়। ২১ আর ২২শে ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গ ব্যবস্থাপক পরিষদের অভ্যন্তরে অনেক আলোচনা, বিক্ষোভ, বিতর্ক চলতে থাকে। সদস্যরা ছাত্র হত্যার তদন্ত আর অপরাধীদের বিচার দাবি করেন। এ বিতর্কের মধ্যেও তারা বাংলা ভাষার দাবি তোলেন। পাকিস্তানের জনগণের শতকরা ৫৬ ভাগ মানুষের মাতৃভাষা বাংলা হলেও শুধু বাংলা ভাষাকে বাঙালিরা রাষ্ট্রভাষা করতে চায়নি। তারা চেয়েছিল বাংলার সাথে উর্দুকেও রাষ্ট্র ভাষা করা হোক। তবে বাঙালির এ উদারতাটাই অনেকে দুর্বলতা হিসেবে গ্রহণ করেছে (মুজিব, ২০১২, পৃ. ১৯৮)।

ভাষা আন্দোলন পরবর্তী আইনগত পদক্ষেপ

ভাষা আন্দোলন শুরু হয়েছিল ১৯৪৭ সাল হতে। ভাষা আন্দোলনের আলোকে বর্তমান বাংলাদেশের সংবিধানে বলা আছে, ভাষার পরিপোষণ ও উন্নয়নে এমন ব্যবস্থা গ্রহণ করবে যাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখা ও অংশগ্রহণ করার সুযোগ লাভ করে। সংবিধান ও আইনে রাষ্ট্রভাষা বাংলা সর্বস্তরে ব্যবহারের বাধ্যবাধকতা থাকলেও তা প্রতিপালন হচ্ছে না। যুক্তফ্রন্টের নির্বাচনী কর্মসূচি ২১ দফার প্রথম দফা ছিল বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা হবে। ১৯৫৬ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি পূর্ববঙ্গের আবু হোসেন সরকারের নেতৃত্বাধীন যুক্তফ্রন্ট সরকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে শহীদ দিবস হিসেবে ঘোষণা দেয়। সেসাথে যুক্তফ্রন্ট মন্ত্রীসভা ভাষা আন্দোলনের শহিদদের স্মৃতির প্রতি সম্মান প্রদর্শনের উদ্দেশ্যে একুশে ফেব্রুয়ারিকে সরকারি ছুটির দিন হিসেবেও স্বীকৃতি দেয় (খান ও অন্যান্য, ১৯৯১, পৃ. ৯৪)। ডাকসুর সহ-

সভাপতি জনাব ফেরদৌস কোরেশীর সভাপতিত্বে এক সভা অনুষ্ঠিত হয় ১৯৬৭ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি। ভাষণদানকালে জনাব ফেরদৌস আহমদ কোরেশী অভিযোগের সুরে বলেন, এখনও অফিস আদালতে বাংলা ভাষা কেন চালু করা যাচ্ছে না তা সরকারের কাছে মানুষের জিজ্ঞাসা (আজাদ, ১৯৬৭)। জাতীয় জীবনে বাংলা ভাষা চর্চার একটি গুরুত্বপূর্ণ ক্ষেত্র হলো আদালত। তবে সেখানে এখনও ইংরেজিই চর্চা হয়ে থাকে। নিম্ন আদালতের রায় বাংলায় দেওয়া হলেও উচ্চ আদালতের রায় দেওয়া হয় ইংরেজিতে। কয়েকজন বিচারপতি সাম্প্রতিককালে উচ্চ আদালতের রায় বাংলায় দিয়েছেন। এ রায় দেওয়ার বিষয় নিয়ে পত্রিকায় সংবাদ প্রকাশিত হয়েছে, অনেক বিশিষ্ট ব্যক্তিবর্গ প্রবন্ধ লিখেছেন। সাবেক বিচারপতি মুহাম্মদ হাবিবুর রহমান লিখেছেন, 'দেশের রায় বাংলায় লিখতে হবে, যাতে নিরক্ষরও শুনলে কিছু বুঝতে পারে। বিদেশীদের অসুবিধা এখানে অপ্রাসঙ্গিক। সব সন্দেহ নিরসনকল্পে সংসদেও দ্ব্যর্থহীন উদ্যোগ নেওয়া উচিত' (*প্রথম আলো*, ২০১৩, পৃ. ১, ৬)। সাবেক বিচারপতি কাজী এবাদুল হক আদালতে বাংলা ব্যবহারের বাধা চিহ্নিত করার চেষ্টা করেন। তিনি নিজেও কয়েকটি রায় বাংলায় দিয়েছিলেন। তিনি উল্লেখ করেছিলেন, বিচারপতিদের মধ্যে একমাত্র প্রয়াত আমিরুল ইসলাম চৌধুরী বাংলা ভাষায় আদেশ দান ও রায় লেখা শুরু করে সবাইকে পথ দেখিয়েছেন।

উচ্চ আদালতে বাংলা ভাষার প্রয়োগে কিছু সীমবদ্ধতা আছে তবে সংবিধান বা প্রচলিত আইনে কোথাও অস্পষ্টতা নেই। সংবিধানের ৩ অনুচ্ছেদে বলা আছে প্রজাতন্ত্রের রাষ্ট্রভাষা বাংলা। এ ঘোষণাকে বাস্তবায়িত করতেই ৮ই মার্চ ১৯৮৭ সালে প্রণীত হয় 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন'। এর মাধ্যমে সর্বক্ষেত্রে বাংলা ভাষার ব্যবহারের ক্ষেত্রে বাধ্যবাধকতা তৈরি হয়। সংবিধানের ধারা ৩(১) এ বলা হয়েছে, বিদেশের সাথে যোগাযোগ ব্যতীত বাংলাদেশের সর্বত্র তথা সরকারি অফিস, আদালত, আধা-সরকারি, স্বায়ত্তশাসিত প্রতিষ্ঠান সবক্ষেত্রে নথি-চিঠিপত্র, আইন-আদালতের সওয়াল-জবাব এবং অন্যান্য আইনানুগ কার্যাবলি অবশ্যই বাংলায় লিখতে হবে। এ বাধ্যবাধকতা উচ্চ আদালতের ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য। কেননা সংবিধানের ১৫২ অনুচ্ছেদ মতে 'আদালত অর্থ সুপ্রিমকোর্টসহ যে-কোন আদালত' (সংবিধান, ১৯৭২)। ১৯০৮ সালের দেওয়ানি কার্যবিধির ১৩৭(২) ধারা এবং ১৮৯৮ সালের ফৌজদারি কার্যবিধির ৫৫৮ ধারা সরকারকে আদালতের ভাষা নির্ধারণের দায়িত্ব দিয়েছে। তবে ১৯৮৭ সালের আইনের ৩(১) ধারায় সুস্পষ্ট নির্দেশনা সরকারকে এ দায় হতে অব্যাহতি দিয়েছে। সংবিধানের প্রস্তাবনায় মৌলিক মানবাধিকার ও সুবিচারের নিশ্চয়তা দেওয়া হয়েছে। এর ৩৫(৩) অনুচ্ছেদ অনুযায়ী 'প্রকাশ্য বিচার লাভ' ফৌজদারি অপরাধের দায়ে অভিযুক্ত ব্যক্তির মৌলিক অধিকার। আর ইংরেজি না জানা বা না বোঝা ব্যক্তির কাছে 'প্রকাশ্য বিচার আর গোপন বিচার'-এর মধ্যে কোনো পার্থক্য থাকে না। বিচারপ্রার্থী জনগণের অবশ্যই রায় অনুধাবনের সুযোগ থাকতে হবে। এছাড়া, বিচার পাওয়ার অধিকারকে সমুন্নত ও সুসংহত রাখতে আদালত বা বিচারিক প্রক্রিয়া পরিচালিত হয়। ভাষার দুর্বোধ্যতা বিচারপ্রার্থী জনগণকে তাদের মৌলিক অধিকার প্রাপ্তি থেকে বঞ্চিত করে। আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত মানবাধিকার হলো বোধগম্য ভাষায় বিচার লাভ করা। জাতিসংঘের ইন্টারন্যাশনাল কোভেন্যান্ট অন সিভিল অ্যান্ড পলিটিক্যাল রাইটস (আইসিসিপিআর) এর ১৪(৩) ধারায় বলা হয়েছে, 'কারও বিরুদ্ধে কোনো অভিযোগ আনা হলে সে অভিযোগের প্রকৃতি ও কারণ দ্রুত ও বিস্তারিতভাবে সে বোঝে এমন ভাষায় তাকে জানাতে হবে। আদালতের ব্যবহৃত ভাষা যদি সে বুঝতে বা বলতে না পারে, তবে তাকে বিনামূল্যে দোভাষী দিয়ে সহযোগিতা করতে হবে।' বাংলাদেশ উক্ত চুক্তিতে স্বাক্ষর করলেও পালন বা কার্যকর করার পরিপূর্ণ আগ্রহ নেই। ১৯৮৭ সালের বাংলা ভাষা প্রচলন আইনের ১(২) ধারায়

আইনটি 'অবিলম্বে বলবৎ হইবে' বলে উল্লেখ আছে। ৩(২) ধারায় বলা আছে, কর্মরত ব্যক্তি সংশ্লিষ্ট প্রতিষ্ঠানে বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষায় আবেদন বা আপিল করলে তা বেআইনি ও অকার্যকর বলে গণ্য হবে। আর ৩(৩) ধারায় বলা হয়, কোনো কর্মকর্তা বা কর্মচারী এ আইন অমান্য করলে তা হবে অসদাচরণ। যে-কারণে তার বিরুদ্ধে 'সরকারি কর্মচারী শৃঙ্খলা ও আপিল বিধি' অনুসারে ব্যবস্থা নেওয়া হবে। তবে বাস্তবে 'অবিলম্বে বলবৎ হইবে' নির্দেশনাটি কার্যকর হয়নি। এ আইনের ৪ ধারায় বাংলা প্রচলনে প্রয়োজনে সরকারকে বিধি প্রণয়ন করতে বলা হয়েছে। এ ধারাটিও কার্যকর হয়নি। সংবিধানের ২৩ অনুচ্ছেদ-এ বলা হয়, 'রাষ্ট্র জনগণের সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও উত্তরাধিকার রক্ষণের জন্য ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন এবং জাতীয় ভাষা, সাহিত্য ও শিল্পকলাগুলোর এমন পরিপোষণ ও উন্নয়নের ব্যবস্থা গ্রহণ করিবেন, যাহাতে সর্বস্তরের জনগণ জাতীয় সংস্কৃতির সমৃদ্ধিতে অবদান রাখিবার ও অংশগ্রহণ করিবার সুযোগ লাভ করিতে পারেন।' উচ্চ আদালত এ বিষয়ে উল্লেখযোগ্য অগ্রগতি দেখাতে পেরেছে।

২০১২ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি ও ২০১৪ সালের ১৭ই ফেব্রুয়ারি সর্বস্তরে বাংলা ভাষা প্রচলনের বিষয়ে এবং বেতার টেলিভিশনে বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণ ও দূষণরোধে রুলসহ নির্দেশনা দেন হাইকোর্ট। যাতে বেতার ও টেলিভিশনে বাংলা ভাষার বিকৃত উচ্চারণ এবং ভাষা ব্যঙ্গ ও দূষণ করে অনুষ্ঠান প্রচার না করার নির্দেশনা ছিল। সাথে ইলেকট্রনিক মিডিয়া ও বিজ্ঞাপন, গাড়ির নম্বরপ্লেট, সব সাইনবোর্ড ও নামফলক বাংলায় লেখার নির্দেশ আসে। সে-সাথে 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭' অনুসারে সর্বত্র বাংলা ভাষা ব্যবহারের পদক্ষেপ গ্রহণের নির্দেশ দেন হাইকোর্ট। নিম্ন আদালতে বাংলা চর্চা বৃদ্ধি পাচ্ছে। নিম্ন আদালতে ইংরেজি লেখা বা বলার জন্য কোনো কিছুকে 'বেআইনি' বা অকার্যকর' ঘোষণা করা না হলেও সেখানে আরজি, আবেদন, আপিল লেখা, সাক্ষ্যগ্রহণ, জেরা, সওয়াল-জবাব, যুক্তি তর্ক উপস্থাপন, রায় লেখাসহ সমগ্র বিচার-ব্যবস্থায় বাংলার আধিক্য বেশি। বাংলা ভাষায় রায় লেখা নিয়ে বিচারপতি খায়রুল হক বলেছেন, ''সাধারণ মানুষ যাতে এ রায়ের বিষয়বস্তু বুঝতে পারেন। এ নিয়ে চায়ের দোকানে, চুলার পাশে বসেও যাতে আলোচনা করতে পারেন।'' এ বিষয়ে সাবেক বিচারপতি হাবিবুর রহমান বলেছেন, ''ন্যায়বিচার যদি সদ্‌গুণ হয় এবং জনগণের কল্যাণই যদি এর কাজ হয়, তবে তা জনগণের ভাষাতেই হওয়া উচিত।'' সাবেক প্রধান বিচারপতি এস কে সিনহা তার কার্যকালীন উচ্চ আদালতে বাংলায় রায় লেখা ব্যাপকভাবে প্রচলনের আশ্বাস দেন এবং অবসরে যাওয়ার আগে সব রায় বাংলায় দেওয়া সম্ভব হয়নি বলে দুঃখ প্রকাশ করেছিলেন (ছিদ্দিকী, ২০২৪, পৃ. ৩)। অনুবাদ-জটিলতা, দক্ষ অনুবাদক বা যথেষ্ট পরিভাষা নেই বলে এসব ক্ষেত্রে জটিলতা তৈরি হচ্ছে। তবে সদিচ্ছার মাধ্যমে শীঘ্রই উচ্চ আদালতের ভাষা জনগণের ভাষা হয়ে উঠবে। তবে বাংলা ভাষা প্রয়োগের আইন থাকলেও সামগ্রিকভাবে আইনের এ নির্দেশ সাতাশ (২০২৪) বছর পরেও যথাযথভাবে পালন করা হয় না। ২০২২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারিতে দৈনিক ভোরের কাগজের প্রধান প্রতিবেদনে বলা হয়, 'ভাষা আন্দোলনের ৭০ বছর আর বিজয়ের ৫০ বছর পরও ভাষানীতি না হওয়ায়... হারিয়ে যাচ্ছে প্রমিত বাংলা। স্বপ্নই রয়ে গেছে সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর স্বপ্ন' (ভোরের কাগজ, ২০২২, পৃ.১)। এ বিষয়ে সরকারি উদ্যোগও সীমিত। এরশাদ-সরকার এবং পরবর্তী সরকারগুলোর আচরণে দেখা যায় 'বাংলা ভাষা প্রচলন আইন ১৯৮৭' প্রহসনে পরিণত হয়েছে। মূলত সাধারণ মানুষের জীবন-মান উন্নয়ন এবং দেশে স্থিতিশীল কল্যাণকামী অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু না হলে এ ধরনের আইন কার্যকর করা সম্ভব হবে না। এর জন্য বৃহত্তর সামাজিক আন্দোলন এবং সংখ্যাগরিষ্ঠ মানুষের ব্যক্তিগত শিক্ষা ও উপলব্ধি প্রয়োজন।

গবেষণার ফলাফল

ভাষা আন্দোলন শুধু ভাষার জন্য আন্দোলনই ছিল না, এ আন্দোলনের ছিল বহু মাত্রা। মহান একুশের চেতনায় জাগ্রত বাংলার মানুষ অতীতের মতো ঐক্যবদ্ধভাবে দেশের আর্থ-সামাজিক বিকাশে আরও বেগবান করবে একুশের চেতনা মূলত এটিই। ১৯৪৭-এর দেশভাগের পর হতে ১৯৫৬ সাল পর্যন্ত পূর্ব-পাকিস্তানে সংগঠিত সব আন্দোলন ছিল গণমানুষের মৌলিক অধিকার রক্ষার আন্দোলন। ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি ভাষার অধিকার রক্ষার আন্দোলন চূড়ান্ত পর্যায়ে পৌঁছে যায়। পুলিশ ১৪৪ ধারা জারি করে ঢাকার সব সমাবেশ বেআইনি ও নিষিদ্ধ ঘোষণা করা হলেও ছাত্ররা মায়ের ভাষা কেড়ে নেওয়ার চেষ্টাকে বৈষম্যবাদ আখ্যা দিয়ে সরকারি আদেশ প্রত্যাখ্যান করে। রাষ্ট্রের ভাষা বাংলা, রাষ্ট্রীয় কাজে বাংলার ব্যবহার থেকে বিরত থাকাও যে শাস্তিযোগ্য অপরাধ, তাতেও কোনো সন্দেহ নেই। তবে বাস্তবতা হলো ইংরেজি ভালো না জানলে শুধু বাংলা দিয়ে বর্তমানে এ-দেশের মানুষ খুব বেশি এগিয়ে যেতে পারছে না। রাষ্ট্রভাষা বাংলার ব্যবহার আইন আদালতে করার বিষয়টি শুধু সাংবিধানিক বা আইনগত বাধ্যবাধকতা না, এ ধরনের উদ্যোগ বাংলাদেশ রাষ্ট্র পরিচালনার মূলনীতির অন্তর্গত। ২০১২ সালে হাইকোর্ট রুলস চালু হওয়ার ৩৯ বছর পর এবং বাংলা ভাষা আইন প্রচলনের ২৫ বছর পর হাইকোর্টে ইংরেজির পাশাপাশি বাংলায় দরখাস্ত করার বিধান যুক্ত হয়। যার ভিত্তিতে ২০১৪ সালের ফেব্রুয়ারি মাসে সর্বস্তরে বাংলাভাষা প্রচলনের দাবিতে ইউনুস আলী আকন্দ নামে এক আইনজীবী রিট করেন। উক্ত আবেদনটি ছিল বাংলায়। সম্প্রতি বাংলায় রায় আদেশ লেখার প্রবণতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের ফেব্রুয়ারিতে ভাষাশহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটের 'বাংলা সংস্করণ' চালু হয়। সে-সাথে সর্বসাধারণের সুবিধার্থে সুপ্রিম কোর্টের ওয়েবসাইটে ইংরেজিতে প্রকাশিত সব রায় ও আদেশ গুগল প্রযুক্তির মাধ্যমে বাংলায় অনুবাদ করে পড়ার সুযোগ আছে। হাইকোর্টে পূর্বের তুলনায় বাংলায় নোটিশ ও আদেশ প্রদানের ঘটনা খুব বেশি। তবে উচ্চ আদালতে বাংলা চর্চার সবচেয়ে বড়ো সমস্যা রায় লেখা। স্বল্প-সংখ্যক বিচারক রায় বাংলায় লিখলেও তা অল্প সময়ের জন্য। আইনের ভাষা এবং উচ্চতর ডিগ্রির পাঠ্যবই এখনও ইংরেজি ভাষায় রয়েছে।

মাতৃভাষা কেড়ে নেওয়ার প্রতিবাদে নিজেদের উৎসর্গ করে ১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি বাঙালি জাতিকে এক ঐতিহাসিক ও বীরোচিত মর্যাদা দিয়েছে। যে কারণে বাঙালির নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি, অধিকার, সংগ্রাম ও ত্যাগের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়ে ইউনেস্কো ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে। এ ঘোষণার পর হতে যথাযোগ্য মর্যাদার সাথে সারা বিশ্ব দিবসটি উদ্‌যাপন করে। কথা বলার ভাষা এবং একইসাথে স্বাধিকার কেড়ে নেওয়ার নগ্ন আক্রমণের বিরুদ্ধে অকাতরে প্রাণ বিসর্জন, ত্যাগের ইতিহাস সৃষ্টির গৌরব শুধু বাঙালি জাতিরই আছে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে এক জাতির ভাষার প্রতি অন্য জাতির ভালোবাসা ও সম্মান প্রদর্শনে দায়িত্বের বিষয়টি স্মরণ করায়। একুশে ফেব্রুয়ারি বৈষম্যহীন সমাজ ব্যবস্থা, আত্মনিয়ন্ত্রণ অধিকার ও সংখ্যাগরিষ্ঠের রাষ্ট্র ক্ষমতা পরিচালনার বিষয়টিকে মানবাধিকারের দৃষ্টিভঙ্গিতে সামনে নিয়ে আসে। যা জনসাধারণের মধ্যে আত্মবিকাশের চেতনা জাগ্রত করে।

উপসংহার

একুশে ফেব্রুয়ারি এ দেশের মানুষকে শিখিয়েছে আত্মত্যাগের মন্ত্র, বাঙালিকে করেছে মহীয়ান। ভাষা আন্দোলনের পথ বেয়ে এসেছে মহান স্বাধীনতা। জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নতির সাথে ভাষার উন্নতি কিংবা ভাষার উন্নতির সাথে জাতি ও রাষ্ট্রের উন্নতি অবিচ্ছেদ্য। ভাষা আন্দোলন তৎকালীন রাজনীতি, সমাজ, অর্থনীতি, সংস্কৃতিতে গভীর প্রভব বিস্তার করে। এ আন্দোলনের মাধ্যমে অসাম্প্রদায়িক রাজনীতির বিকাশ ঘটে।

১৯৪৮ সালে শুরু হওয়া ধারাবাহিক রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ১৯৫২ সালে এসে এক দৃঢ় অসাম্প্রদায়িক ঐক্যচেতনার জন্ম দিয়েছিল। এ ঐক্যশক্তি সময়ের প্রয়োজনে স্বাধীনতার জন্য কাজে লেগেছিল তবে বাংলা ভাষার উন্নয়নে তা ব্যবহৃত হয়নি। ভাষা আন্দোলনের চেতনার ধারাবাহিকতা ক্রমাগত পিছু হটছে। যার ধারাবাহিকতায় স্বাধিকার আন্দোলন ও সমগ্র মুক্তিযুদ্ধের বিজয়ে অর্জিত হয়েছিল স্বাধীনতা। স্বাধীনতা-উত্তরকালে আমাদের সমাজ ও রাষ্ট্রজুড়ে ব্যক্তিগত প্রতিষ্ঠার প্রতিযোগিতা চরম আকার ধারণ করছে। তাই সমষ্টিগত উন্নতি সমাজে তেমনভাবে দেখা যাচ্ছে না। এসব আত্মকেন্দ্রিকতার অবসান ঘটিয়ে সমষ্টিগত মানুষের মুক্তির মধ্য দিয়েই আমাদের সমষ্টিগত মানুষের ভাষা-সংস্কৃতি সর্বজনীন হতে পারবে। ভাষাগত বৈচিত্র্যের সযত্ন লালন ও সুরক্ষার ওপর জোর দিতে হবে, যাতে ভাষার কারণে কোনো বৈষম্য সৃষ্টি না হয়। মাতৃভাষা সংরক্ষণ, পুনরুজ্জীবন, চর্চা, বিকাশ, প্রচার-প্রসারের মাধ্যমে ভাষাগত ও সাংস্কৃতিক বৈচিত্র্যকে ধরে রাখাই আমাদের মূল উদ্দেশ্য হওয়া উচিত।

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান (২০০৩)। *কালনিরবধি*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

আল্ হেলাল, বশীর (২০০৩)। *ভাষা আন্দোলনের সেই মোহনায়*। ঢাকা: সূচীপত্র প্রকাশনী।

আল্ হেলাল, বশীর (২০১০)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*। ঢাকা: জাতীয় গ্রন্থ প্রকাশন।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৯৫)। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

একুশ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের বীরত্বগাথা: একটি সচিত্র ইতিহাস (১৯৪৭-২০০৯)। ঢাকা: বাংলাদেশ এন্টারপ্রাইজ ফর ডেভেলেপমেন্ট অ্যান্ড সিকিউরিটি স্টাডিজ।

করিম, ফজলুল (২০১৪)। *বায়ান্ন'র কারাগার*। ঢাকা: অনুপম প্রকাশনী।

কামাল, মোস্তফা (১৯৮৭)। *ভাষা আন্দোলন: সাতচল্লিশ থেকে বায়ান্ন*। ঢাকা: বাংলাদেশ কো-অপারেটিভ বুক সোসাইটি লি.।

কুদ্দুস, গোলাম (২০১৫)। *ভাষার লড়াই ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: নালন্দা।

খান, শামসুজ্জামান ও অন্যান্য (সম্পা.) (১৯৯১)। *ভাষা-আন্দোলনের শহীদেরা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশের সংবিধান, ১৯৭২।

গুপ্ত, সন্তোষ (২০০৫), *একুশের চেতনা ও আজকের বাংলাদেশ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

চৌধুরী, নিগার। *বাংলার ভাষার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র ও বাঙালির সংগ্রাম*। ঢাকা: ইছামতি প্রকাশনী।

বার্ণিক, এম.এ (২০০৫)। *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ইতিহাস, ঘটনা প্রবাহ ও প্রেক্ষিত বিশ্লেষণ*। ঢাকা: এ এইচ ডেভেলপমেন্ট পাবলিশিং হাউস।

রহমান, শেখ মুজিবুর (২০১২)। *অসমাপ্ত আত্মজীবনী*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

রহমান, হাসান হাফিজুর (২০১৬)। *একুশে ফেব্রুয়ারি*। ঢাকা: সময় প্রকাশন।

রহমান, আতিউর; আজাদ, লেনিন (১৯৯৫)। ভাষা আন্দোলন: পরিপ্রেক্ষিত ও বিচার। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

শাহনাওয়াজ, এ. কে. এম (২০১৭)। *ভাষা আন্দোলন পরিপ্রেক্ষিত ও ইতিহাস*। ঢাকা: প্রতীক প্রকাশনা সংস্থা।

সরকার, মোনায়েম (২০১৯)। *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

হক, ড. জাকিরুল (২০১৪)। *ভাষা আন্দোলন থেকে মুক্তিযুদ্ধ দুই বাংলার চালচিত্র*। ঢাকা: গতিধারা।

হোসেন, ইসমাইল বকুল (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের প্রেক্ষাপট রক্তঝরা একুশ*। ঢাকা: এশিয়া পাবলিকেশনস।

R. J. Shafer (1974). *A Guide to Historical Method*. Illinois: Dorsey Press.

সংবাদপত্র রিপোর্ট

আদালতে রাষ্ট্রভাষার প্রবেশাধিকার' (অমর একুশে ২০১৩)। ঢাকা: *প্রথম আলো*।

'একুশের অনুষ্ঠানে শহীদ সালামের পিতা' (২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৭)। 'সমগ্র প্রদেশে শহীদ দিবস উদযাপিত, কেন্দ্রীয় শহীদ মিনার'। ঢাকা: *দৈনিক আজাদ*।

'ভাষা নীতি প্রণয়নের তাগিদ: প্রযুক্তিতে পিছিয়ে, উচ্চ শিক্ষায় অবহেলিত বাংলা ভাষা' (২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২২)। ঢাকা: দৈনিক ভোরের কাগজ।

'ম্যাজিস্ট্রেট ও পুলিশ অফিসারদের বিরুদ্ধে আর একদফা মামলা'। ঢাকা: দৈনিক *আজাদ*।

সাক্ষাৎকার

উমর, বদরুদ্দীন (২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। 'বাংলা ভাষা গরিব মানুষের জন্য বেশি দরকার' (বিশেষ সাক্ষাৎকার)। ঢাকা: দৈনিক *প্রথম আলো*।

ছিদ্দিক, আফতাব উদ্দিন (২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। 'উচ্চ আদালতে বাংলার পূর্ণাঙ্গ প্রচলনের প্রত্যাশা'। ঢাকা: দৈনিক *যুগান্তর*।

মন্ডল, শাহজাহান (২০শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৩)। 'ভাষা আন্দোলনের আইনি ভিত্তি'। ঢাকা: দৈনিক *জনকণ্ঠ*। Retrieved from *https://www.dailyjanakantha.com/opinion/news/678778*

হোসেন, সেলিনা (২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। 'সংখ্যা মাত্র নয়'। ঢাকা: দৈনিক *জনকণ্ঠ*।

হোসেন, সৈয়দ আনোয়ার (২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। 'ভাষা আন্দোলন: ইতিহাস ও বাস্তবতা'। ঢাকা: দৈনিক *ইত্তেফাক*।

ভাষা আন্দোলন এবং পূর্ব-বাংলার মনস্তাত্ত্বিক ঐক্য

ফোরকান আহমেদ

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookFurkan

প্রাচীনকাল থেকে সামাজিক, রাজনৈতিক এবং অর্থনৈতিক প্রভাবে পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষের মনোজগতের রূপান্তর ঘটলেও সবসময় আনন্দ-বেদনার অনুভূতিগুলো তারা ভাগাভাগি করে নিয়েছে। উৎসবের উদ্‌যাপন কিংবা শোষণমুক্তির আন্দোলন, প্রায় সকল ক্ষেত্রে ঐক্যবদ্ধভাবে কাজ করেছে। ভাষা ও সংস্কৃতি ছিল এই মেলবন্ধনের মূল ভিত্তি। ব্রিটিশ শাসনের সময়কালে অর্থনৈতিক শোষণ ও সাম্প্রদায়িক বিভাজন পূর্ব-বাংলার মানুষের দীর্ঘদিনের গৌরবোজ্জ্বল সাংস্কৃতিক ও মনস্তাত্ত্বিক একতার মূলে আঘাত করে এবং জন্ম দেয় সাম্প্রদায়িক সংকট ও শ্রেণি-দ্বন্দ্বের। দেশভাগের আগে পূর্ব-বাংলার সাধারণ মানুষ মনে করেছিল স্বাধীনতা পেলে অর্থনৈতিক মুক্তি মিলবে এবং শোষণমুক্ত একটি সমাজ বিনির্মাণ হবে। রক্তাক্ত এক অধ্যায়ের মধ্য দিয়ে স্বাধীনতার আকাঙ্ক্ষা অর্জন হলেও পাকিস্তান রাষ্ট্রের শাসকগোষ্ঠী তাদের স্বপ্ন পূরণ করতে পারেনি বরং ধীরে ধীরে প্রকাশিত হয়েছে সাম্প্রদায়িকতার আড়ালে শাসকগোষ্ঠীর উপনিবেশসুলভ মনোভাব ও আচরণ। ফলে দল-মত নির্বিশেষে সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ নিজেদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিভাজন ও শ্রেণি-দ্বন্দ্বের ঊর্ধ্বে গিয়ে সকলে একত্র হয়েছে ভাষা আন্দোলনে। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলন পূর্ব-বাংলার মানুষের স্বাধীনতা-চেতনার ভিত্তি রচনা করে এবং এটি তাদের মনস্তাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক ঐক্যকে পুনর্জাগ্রত ও সুদৃঢ় করেছে।

হাজার মাইলের ব্যবধান সত্ত্বেও ধর্মের ভিত্তিতে ১৯৪৭ সালের ১৪ই আগস্ট পৃথিবীর বুকে প্রতিষ্ঠিত হলো পাকিস্তান নামক রাষ্ট্র। দেশভাগের আগে থেকেই বুদ্ধিজীবী, সাংবাদিক, রাজনীতিবিদ এবং সচেতন জনগোষ্ঠীর মধ্যে চলে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা নিয়ে বিতর্ক। যে ঢাকায় ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগ প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল, যে পূর্ব-বাংলার মানুষের ভোটের কারণে ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে মুসলিম লীগ জয় পেয়েছিল, যে পূর্ব-বাংলার হাজারো মানুষের রক্তের উপর দিয়ে অনিবার্য হয়ে গিয়েছিল আলাদা মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠা, সেখানে এসে মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঘোষণা দিলেন 'উর্দুই হবে পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা'।[১] একইসাথে যারা আন্দোলন ও সমালোচনা করছিল, তাদের কড়া হুঁশিয়ারিও দিয়ে গেলেন। পূর্ব-বাংলার ছাত্র-জনতা সাথে সাথেই প্রতিবাদ করেছিল। দেশভাগ-পূর্ব কল্পিত পাকিস্তান নামক রাষ্ট্রের কাছে প্রত্যাশা এবং পাকিস্তান রাষ্ট্রে প্রাপ্তি, এ দু'য়ের পার্থক্য খুব শীঘ্রই স্পষ্ট হতে থাকে। সময় যত গড়িয়েছে, ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত হয়েছে প্রায় সকল শ্রেণি-পেশার মানুষ। ফলে ভাষা আন্দোলন আর কোনো রাজনৈতিক বা সাংস্কৃতিক আন্দোলনের মধ্যে আবদ্ধ থাকেনি, যুক্ত হয়েছে এর বহুমুখী প্রেক্ষাপট। আন্দোলনকারীদের দমাতে শাসকগোষ্ঠী ষড়যন্ত্র থেকে অস্ত্র কোনো কিছু বাদ রাখেনি। গোটা বিশ্ব দেখল একুশে ফেব্রুয়ারির রক্তাক্ত এক অধ্যায়। সমগ্র পূর্ব-বাংলায়, শহর থেকে গ্রাম, কৃষক-শ্রমিক থেকে পেশাজীবী সকলে নেমে এসেছিল রাজপথে, আন্দোলনকারীদের প্রতিবাদের কাছে বন্দুকের গুলিও যেন অসহায়। এ যেন অসাম্প্রদায়িক গণমানুষের পূর্ব-বাংলার পুনর্যাত্রা শুরু। পাকিস্তান যে সম্প্রদায়গত ভিত্তির উপর দাঁড়িয়েছিল, পূর্ব-বাংলায়

তা অকার্যকর হয়ে পড়ে। এজন্য ঐতিহাসিক ও গবেষকগণ স্বীকার করে নিয়েছেন, একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন পরবর্তী সকল আন্দোলন-সংগ্রামে অনুপ্রেরণা ও বাতিঘর হিসেবে কাজ করেছে।

বদরুদ্দীন উমর, আহমদ রফিক, অলি আহাদসহ অনেক গবেষক ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস লিখেছেন। কিন্তু অধিকাংশ গবেষণায় ভাষা আন্দোলনকে দেখানো হয়েছে ১৯৫২ সালের সমসাময়িক কালের ঘটনার প্রেক্ষাপটে, যার অধিকাংশই রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক দৃষ্টিভঙ্গি থেকে লেখা। ফলে অনেক ক্ষেত্রে আড়ালে থেকেছে আন্দোলনে অংশগ্রহণকারীদের মনোবিশ্লেষণ। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীসহ অনেক মার্কসিস্ট গবেষক শ্রেণি-সচেতনতার পটভূমিতে এ আন্দোলনকে দেখার চেষ্টা করলেও সাম্প্রদায়িক সংকট থেকে অসাম্প্রদায়িক মনস্তত্ত্বের পুনর্জাগরণের বিষয়টি আড়ালে থেকে গেছে। এ গবেষণা-প্রবন্ধে আমি ভাষা আন্দোলনের সাথে যুক্ত সকল মানুষের দৃষ্টিতে এ আন্দোলনে অংশগ্রহণের কারণ অনুসন্ধান করব। শত প্রতিবন্ধকতা সত্ত্বেও কীভাবে নিজেদের মধ্যে একতা ও আন্দোলনে একাত্মতা পোষণের মনস্তত্ত্ব তৈরি হলো, তা ব্যাখ্যা করার চেষ্টা করব। পাঠকের সুবিধার্থে খুব সংক্ষেপে ভাষা আন্দোলনের ঘটনার প্রয়োজনীয় অংশের বিবরণ দেওয়া হবে। ইতিহাসের নিরিখে দেশভাগ তথা পাকিস্তান রাষ্ট্রের অভ্যুদয়ের আগের সময় থেকে আর্থ-সামাজিকসহ বিভিন্ন দৃষ্টিকোণ থেকে এর প্রেক্ষাপট বিবেচনায় রাখা হবে।

প্রবন্ধটি লেখার ক্ষেত্রে গবেষণার 'গুণগত' পদ্ধতি ব্যবহার করা হয়েছে। প্রাথমিক উৎস হিসেবে সমসাময়িক জনশুমারি প্রতিবেদন, রাজনৈতিক দলগুলোর ইশতাহার এবং পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন ব্যবহৃত হয়েছে। প্রকাশিত একাধিক প্রতিবেদনের মধ্যে তুলনামূলক বিশ্লেষণ করে সামগ্রিক অবস্থা দেখার চেষ্টা করা হয়েছে। দ্বৈতীয়িক উৎস হিসেবে বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সহায়তা নিয়েছি। এক্ষেত্রে প্রকাশের সাল ও স্থান, তথ্য-উপাত্তের ব্যবহার, লেখকের বস্তুনিষ্ঠতা ও দৃষ্টিভঙ্গির প্রতি বিশেষ গুরুত্ব দিয়ে তথ্য সংগ্রহ করা হয়েছে। শুধু ভাষা আন্দোলনকেন্দ্রিক গ্রন্থে সীমাবদ্ধ না থেকে অভ্যন্তরীণ ও বাহ্যিক একাধিক বিষয় সামনে রেখে গ্রন্থ পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পূর্ব-বাংলার মানুষের মনোজগতের রূপান্তর

অন্য যে-কোনো জনগোষ্ঠীর মতো পূর্ব-বাংলার মানুষের মনোজগৎও প্রাচীনকাল থেকে নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়ে গঠিত ও পুনর্গঠিত হয়েছে। ধর্ম, সাহিত্য, সংস্কৃতি, অর্থনীতি এবং রাজনৈতিক প্রভাব এ পরিবর্তনের প্রধান চালিকাশক্তি। মানুষের চিন্তাধারা ও অনুভূতির বিবর্তন সমাজের-উন্নয়নের সঙ্গে হাত ধরাধরি করে চলেছে এবং এখনও সে প্রক্রিয়া অব্যাহত রয়েছে।

পুরোনো দুনিয়ায় মানুষের মনোজগৎ মূলত ধর্মীয় বিশ্বাস এবং সংশ্লিষ্ট সাংস্কৃতিক চর্চা দ্বারা পরিচালিত হয়েছে। বাংলার ক্ষেত্রে হিন্দু এবং বৌদ্ধ ধর্মের প্রভাব ছিল বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। ধর্মীয় আচার-অনুষ্ঠান, মন্দিরে পূজা এবং পৌরাণিক কাহিনি ছিল মানুষের দৈনন্দিন জীবনের অবিচ্ছেদ্য অংশ (চৌধুরী, ২০০২, পৃ. ১০২-১৫৭)। সাহিত্যকর্ম মানুষকে নৈতিকতা ও মূল্যবোধের শিক্ষা দিত। মধ্যযুগে মুসলিম শাসনকালেও মানুষের মনোজগতে ধর্মের প্রভাব অক্ষুণ্ন থাকে। ইসলাম ধর্মের আগমনের সাথে নতুন সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ধারা তৈরি হয়। ধর্মকেন্দ্রিক রীতি-নীতি, সংস্কৃতি ও উৎসবের প্রচলন থাকলেও তার চর্চা হয়েছে উৎসবমুখর পরিবেশে স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণের মাধ্যমে, যা বাঙালির উদারতা, সমন্বয়বাদিতা ও অসাম্প্রদায়িক

চরিত্রের গৌরবোজ্জ্বল নিদর্শন। লোকসংস্কৃতি, গান, কবিতা এবং লোককাহিনির বিকাশ মানুষের চিন্তাভাবনায় যোগ করেছে নতুন মাত্রা।

ঊনবিংশ শতাব্দীতে বাংলায় এক ধরনের সাংস্কৃতিক রেনেসাঁর সূচনা ঘটে, যা মানুষের চেতনাকে গভীরভাবে প্রভাবিত করেছে। বিশ শতকে ব্রিটিশ শাসনের বিরুদ্ধে জাতীয়তাবাদী আন্দোলন মানুষের মধ্যে রাজনৈতিক সচেতনতা বৃদ্ধি করে এবং তারা নিজেদের সাংস্কৃতিক পরিচিতি নিয়ে সচেতন হতে শুরু করে। মধ্যবিত্ত শ্রেণির উদ্ভব এবং তাদের অর্থনৈতিক পরিবর্তনের আকাঙ্ক্ষা ও শাসকগোষ্ঠীর বিভাজনের নীতির প্রেক্ষাপটে সাম্প্রদায়িক রাজনীতির উদ্ভব ঘটলেও রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর বা কাজী নজরুল ইসলামের মতো অনেক লেখক মানুষের চিন্তাভাবনাকে ব্যাপকভাবে প্রভাবিত করেন, যা স্বাধীনতা, মানবতা এবং নৈতিকতার ধারণাগুলিকে পুনরুজ্জীবিত করে (আনিসুজ্জামান, ২০১২, পৃ. ৩৫-১১১)। পূর্ব-বাংলার ক্ষেত্রে বিশেষভাবে বলা যায়, রাজনৈতিক ও অর্থনৈতিক পরিবর্তন এবং ভৌগোলিক বৈশিষ্ট্য এ অঞ্চলের মানুষের ওপর গভীর প্রভাব ফেলেছে। প্রতিকূল আবহাওয়া, নদী-বিধৌত ভাটি অঞ্চলে জীবিকা নির্বাহের অনিশ্চয়তা এবং রাজনৈতিক অস্থিরতার ফলে টিকে থাকার লড়াই চলেছে অবিরত। ইতিহাস সাক্ষ্য দেয়, বাঙালি বারবার অর্থনৈতিক মুক্তির জন্য সংগ্রাম করেছে এবং শোষকের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছে। কৈবর্ত বিদ্রোহ (১০৭৫-১০৮০) থেকে শুরু করে ফকির-সন্ন্যাসী আন্দোলন (১৭৬০-১৮০০), রংপুরের কৃষক বিদ্রোহ (১৭৮৩), পার্বত্য চট্টগ্রামে চাকমা বিদ্রোহ (১৭৭৬-১৭৮৭), ফরায়েজি আন্দোলন (১৮৪০-), সাঁওতাল বিদ্রোহ (১৮৫৫-১৮৫৭), নীলবিদ্রোহ (১৮৫৯-১৮৬০), পাবনার কৃষক বিদ্রোহ (১৮৭২-১৮৭৩), তেভাগা আন্দোলনের (১৯৪৬) মতো অসংখ্য ঘটনা ক্রমাগত নানান প্রান্তের জনসমাজের মধ্যে ঘটেছে। এ-সকল আন্দোলন বিশ্লেষণ করলে একটি ব্যাপারে সব ঘটনার মধ্যে মিল পাওয়া যায়– অর্থনৈতিক শোষণ থেকে মুক্তি। অর্থনৈতিক মুক্তির আকাঙ্ক্ষা বাঙালিকে ঐক্যবদ্ধভাবে প্রতিবাদী এবং চিরবিদ্রোহী করে তুলতে ভূমিকা পালন করেছে (চক্রবর্তী, ২০১৪)।

ভাষা আন্দোলনের সংক্ষিপ্ত বিবরণ

ভাষা আন্দোলনকে গবেষকগণ কয়েকটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন। কেউ কেউ ১৯৪৭-এর পূর্ব থেকেই রাষ্ট্রভাষা প্রসঙ্গে দাবি-দাওয়াকে ভাষা আন্দোলনের প্রস্তুতিপর্ব বলে উল্লেখ করেছেন (রহমান, ১৯৯২, পৃ. ৭৪-৭৬)। পাকিস্তানের জন্মের আগে থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হওয়া উচিত সে প্রসঙ্গে পত্রপত্রিকা ও বুদ্ধিজীবী-মহলে আলাপ চলতে থাকে। সাপ্তাহিক *বেগম* পত্রিকায় 'পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা' প্রবন্ধে উল্লেখ করা হয়, ইংরেজি ভাষা যেহেতু ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের অন্যতম স্তম্ভ ছিল, সেহেতু কোনোভাবেই রাষ্ট্রভাষা হিসেবে ইংরেজি গ্রহণযোগ্য না, উর্দুর পক্ষে দাবি আসলেও বাংলা ভাষার চেয়ে বেশি জোরালো না (বেগম, ৩রা আগস্ট ১৯৪৭)।

১৯৫১ সালের আদমশুমারি অনুসারে পাকিস্তানের ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা নিম্নরূপ:

ভাষা	জনসংখ্যা	শতকরা হার
বাংলা	৪,১২,৯১,৯৮৯	৫৪.৬
পাঞ্জাবি	২,১৪,৬৬,৮১৫	২৮.৪
উর্দু	৪৫,১৯১৩১	৭.২
সিন্ধি	৪৩,৫৯,২৮৭	৫.৮

পশতু	৩৫,৮৯,৬২৬	৭.১
ইংরেজি	১৩,৭৭,৫৬৭	১.৮
বেলুচ	১০,৭৫,৯৯৯	১.৪

তালিকা: পাকিস্তানের ভাষাভিত্তিক জনসংখ্যা (Choudhury, 1984, P. 129)

বদরুদ্দীন উমর ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ রাজনৈতিক সংগ্রামের ঘটনাপ্রবাহকে দুটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন; ১৯৪৮-এর ফেব্রুয়ারি-মার্চ এবং ১৯৫২ সালের জানুয়ারি-মার্চ (উমর, ১৯৭০, পৃ. ক)। ১৯৪৭ সালের ১লা সেপ্টেম্বর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের পদার্থবিজ্ঞানের অধ্যাপক আবুল কাসেমের নেতৃত্বে গঠিত *তমদ্দুন মজলিশ*'র পক্ষ থেকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে বাংলাকে অন্তর্ভুক্তকরণসহ ভাষা-বিষয়ক বিভিন্ন দাবি-দাওয়া উত্থাপন করা হয়। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে তাঁর বক্তব্যে বলেন, জনসংখ্যায় পাকিস্তানের বৃহত্তম অংশ বাঙালি, সুতরাং তাদের মাতৃভাষা বাংলাকেও অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়া হোক। এ প্রস্তাবের ঘোর বিরোধিতা করেন প্রধানমন্ত্রী লিয়াকত আলী খান। তিনি বাংলা ভাষাকে ইসলামবিরোধী ভাষা হিসেবে উল্লেখ করেই ক্ষান্ত হননি, ধীরেন্দ্রনাথ দত্তকে 'ভারতের দালাল' হিসেবেও আখ্যা দেন। প্রতিবাদস্বরূপ ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত অবিলম্বে অধিবেশন ত্যাগ করে ফ্লাইটে করে ঢাকায় চলে আসেন (মৈত্র, ২০১৯, পৃ. ২০৮)। পূর্ব-বাংলার ছাত্রসমাজ তাৎক্ষণিক এ ঘটনার প্রতিবাদ জানায়।

১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ফজলুল হক হলে রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনের ব্যাপারে একটি সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ গঠন এবং ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালনের সিদ্ধান্ত হয়। ১১ই মার্চ ধর্মঘট পালনকালে সচিবালয়-গেট থেকে গ্রেফতার হন শামসুল হক, শেখ মুজিবুর রহমান এবং অলি আহাদসহ অনেকে এবং তাদের কারাগারে প্রেরণ করা হয়। ভাষা আন্দোলনে এটাই ছিল প্রথম কারাবরণ (রহমান, ২০১২, পৃ. ৩৫)। ১১ মার্চের বিভিন্ন ঘটনায় আহত ও পুলিশ কর্তৃক গ্রেফতারকৃতদের এক হিসাবে দেখা যায়, গুরুতর আহত ১৮, আহত ২০০, গ্রেফতার ৯০০, কারাবন্দি ৬৯ (উমর, ১৯৭০, পৃ. ৭৫)। এর প্রতিবাদে ঢাকার বাইরে চট্টগ্রাম, খুলনা, রাজশাহী, রংপুর, বরিশাল, ময়মনসিংহসহ প্রায় প্রত্যেকটি জেলা ও মহকুমায় এ আন্দোলন ছড়িয়ে পড়ে (হোসেন, ২০০০)।

১৯৪৮ সালের ২১শে মার্চ মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ঢাকার রেসকোর্স ময়দানে স্পষ্টভাবে ঘোষণা দেন, উর্দুই হবে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা। ২৪শে মার্চ তারিখে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় সমাবর্তন অনুষ্ঠানে তিনি তাঁর আগের বক্তব্যের পুনরাবৃত্তি করলে উপস্থিত ছাত্রসমাজ সাথে সাথে প্রতিক্রিয়া জানায়। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহর এমন বক্তব্য ছিল চরম হতাশাব্যঞ্জক। মুক্তিযুদ্ধ গবেষক মফিদুল হকের পর্যবেক্ষণ:

> পশ্চিম অংশ গঠিত হয়েছে চার ভিন্ন ভাষাভিত্তিক জাতীয়তার চারটি প্রদেশ নিয়ে। পূর্ব বাংলা পাকিস্তানের বৃহত্তম প্রদেশ এবং ৫৬ শতাংশ নাগরিকের বসবাস এখানে, তাদের মাতৃভাষা বাংলা। এমন বাস্তবতায় পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষা কী হবে সেটা নিয়ে সিদ্ধান্ত গ্রহণ ছিল জরুরি। এক্ষেত্রে জিন্নাহর জীবনাচারে অনুসৃত আধুনিকতার কোনো পরিচয় আর খুঁজে পাওয়া গেল না, রাজনীতিতে তিনি হয়ে উঠলেন কেন্দ্রশাসিত পাকিস্তান রাষ্ট্রের সর্বময় ক্ষমতাসম্পন্ন গভর্নর জেনারেল, যিনি পাকিস্তানি রাষ্ট্র কাঠামোতে পাঞ্জাবি ও মোহাজের এলিট চক্রের আধিপত্যের প্রতিনিধিত্ব করেন এবং মুসলিম-পরিচিতি তথা ইসলামের দোহাই তুলে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা হিসেবে উর্দুর পক্ষে দৃঢ় অবস্থান নেন। (হক, ২০১২, পৃ. ৩৫২)।

১৯৪৮ থেকে ১৯৫১ সাল পর্যন্ত ভাষা আন্দোলনের গতি ও সাংগঠনিক কর্মতৎপরতা পূর্বের তুলনায় অনেক কমে যায়। প্রতি বছর ১১ই মার্চ ভাষা দিবস পালিত হলেও পূর্বের মতো উপস্থিতি লক্ষ করা যায়নি। ১৯৪৯ সালে আরবি হরফে বাংলা লেখার পরিকল্পনা গ্রহণ করা হলে পূর্ব-বাংলার বুদ্ধিজীবী ও সচেতন মহলে প্রতিক্রিয়া দেখা যায়।[২] সময়টা ১৯৫২ সাল। এর মধ্যে অনেক ভয়াবহ অভিজ্ঞতা হলো পূর্ব-বাংলার, যা জনমনে জন্ম দিয়েছে অসন্তোষ আর ক্ষোভ। এ ক্ষোভের আগুনে স্ফুলিঙ্গ হয়ে আসলো ১৯৫২ সালের ২৭শে জানুয়ারি ঢাকার পল্টন ময়দানে প্রধানমন্ত্রী খাজা নাজিমুদ্দিনের বক্তব্য। জিন্নাহর মতো তিনিও রাষ্ট্রভাষা উর্দু হবে ঘোষণা দিলে পুনরায় তীব্র আন্দোলন শুরু হয়, গঠিত হয় 'সর্বদলীয় কেন্দ্রীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ'। ২১শে ফেব্রুয়ারি সমগ্র পূর্ব-বাংলায় হরতাল ও জনসভার ডাক দেওয়া হয়। অবস্থা বেগতিক দেখে সরকার ২০শে ফেব্রুয়ারি তারিখে ১ মাসের জন্য ঢাকা শহরে ১৪৪ ধারা জারি করে।

১৪৪ ধারা ভঙ্গ করে মিছিল গণপরিষদ ভবনের দিকে এগোতে চাইলে পুলিশ নির্বিচারে গুলি করে। গুলিতে নিহত হন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র আবুল বরকত, গফরগাঁওয়ের যুবক আব্দুল জব্বারসহ অন্তত ৬ জন (রফিক, ২০০৯, পৃ. ৫১)। একুশে ফেব্রুয়ারির হত্যাকাণ্ডের প্রতিবাদে পরদিন অর্থাৎ ২২শে ফেব্রুয়ারি তারিখে গ্রাম থেকে শহর সবখানে সব শ্রেণি-পেশার মানুষ রাজপথে নেমে আসে, সরকার পরিস্থিতি সামাল দিতে না পেরে সেনাবাহিনী মোতায়েন করতে বাধ্য হয়।

২২শে ফেব্রুয়ারি পুলিশ ও সেনাদের গুলিতে নিহত হন হাইকোর্টের কর্মচারী শফিউর রহমান, রিকশাচালক আব্দুল আউয়াল, কিশোর অলিউল্লাহ, তাঁতিবাজারের যুবক সিরাজ উদ্দিন এবং নাম না জানা আরও কয়েকজন, যাদের সামরিক যানে ও পুলিশভ্যানে তুলে নিতে দেখা গেছে।[৩] অবশেষে ১৯৫৬ সালের সংবিধানের ২১৪ নম্বর অনুচ্ছেদে কেন্দ্রীয় সরকার বাংলা ভাষাকে পূর্ব-বাংলার মাতৃভাষা হিসেবে অন্তর্ভুক্ত করে রাষ্ট্রভাষার স্বীকৃতি দেয়।

ভাষা আন্দোলন গণমানুষের আন্দোলনে রূপান্তরিত হওয়ার কারণ অনুসন্ধান

ভাষা আন্দোলনের প্রত্যক্ষ কারণ হিসেবে আত্মমর্যাদার লড়াই এবং সাংস্কৃতিক কারণকে গণ্য করা যায়। রবার্ট টেড গার *Why Men Rebel* গ্রন্থে বিদ্রোহের কারণ ব্যাখ্যায় সাংস্কৃতিক কারণের ওপর সবচেয়ে বেশি জোর দিয়েছেন। সাংস্কৃতিক আগ্রাসন কোনো শ্রেণি-পেশার মানুষ সহ্য করতে পারে না, এর সাথে চৈতন্য ও মানসিক অনুভূতির সম্পৃক্ততা অনেক নিবিড়। ঔপনিবেশিক দাসত্বের মনোভঙ্গি তৈরির জন্য যত উপাদান ব্যবহার করা হয়, তার মধ্যে সবচেয়ে মারাত্মক ও কার্যকর অস্ত্র হচ্ছে সাংস্কৃতিক আগ্রাসন। আর পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠী নব্য-স্বাধীন রাষ্ট্রে সুপরিকল্পিতভাবে এ অস্ত্রের ব্যবহার করেছিল পূর্ব-বাংলার গৌরবোজ্জ্বল সাহিত্য-সংস্কৃতির বিরুদ্ধে, যা পূর্ব-বাংলার মানুষ কোনোভাবে মেনে নেয়নি।

কিন্তু ১৯৪৮ সালের ভাষা আন্দোলন ছিল সীমিত এলাকায়, ছাত্র-শিক্ষকের একাংশের মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। ১৯৫২ সালে কৃষক-শ্রমিক, পেশাজীবী ও মধ্যবিত্ত এর সাথে যুক্ত হয়ে একে গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত করে। ১৯৫১ সালের আদমশুমারিতে দেখা যায়, তখনো পর্যন্ত পূর্ব-বাংলায় শিক্ষার হার ২১.১%, অর্থাৎ কৃষক-শ্রমিকের অধিকাংশই ছিল অশিক্ষিত। আর স্বাভাবিকভাবে রাষ্ট্রযন্ত্র সম্পর্কে অনেকটা অসচেতন। তাহলে কেন তারা এ আন্দোলনের সাথে প্রত্যক্ষভাবে জড়িত হলো? কারাই বা তাদের মধ্যে এ সচেতনতা তৈরি করল? আর মধ্যবিত্ত শ্রেণির আন্দোলন কি শুধু রাষ্ট্রভাষা বাংলা প্রতিষ্ঠা করে আত্মমর্যাদা ও অতীত

গৌরব ধরে রাখার মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল? সমাজের বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের সমস্যা, দাবি-দাওয়া, কাল্পনিক মুসলিম রাষ্ট্র ও বাস্তবিক পাকিস্তানের মধ্যে তুলনা, প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির মধ্যে পার্থক্য এবং সর্বোপরি পূর্ব-বাংলার জনগণের সাথে মুসলিম লীগ সরকারের আচরণ ও দৃষ্টিভঙ্গি বিশ্লেষণের মধ্যে এর উত্তর খুঁজে পাওয়া যাবে।

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধ শুরু হওয়ার পর থেকে ভারতবর্ষে এর প্রভাব পড়ে, পূর্ব-বাংলায়ও এর ভয়াবহতা দেখা যায়। বার্মা সীমান্তে জাপানি সৈন্যরা চলে আসলে পূর্ব-বাংলায়, বিশেষ করে চট্টগ্রামে যুদ্ধের পরিস্থিতি তৈরি হয়, ভেঙে পড়ে শিক্ষা-ব্যবস্থা, আইন-শৃঙ্খলা, সামাজিক নিরাপত্তা। বিদেশি সৈনিকদের অনৈতিক আচরণ, ব্যবসা-বাণিজ্য বন্ধদশা, খাদ্য-সংকট ও প্রয়োজনীয় দ্রব্যের চড়া দামের পরিপ্রেক্ষিতে শুরু হয় সর্বক্ষেত্রে নৈরাজ্যময় পরিস্থিতি। 'বোট ডিনায়াল পলিসি' এবং সরকারের যথাযথ নজরদারি ও পদক্ষেপের অভাব এ পরিস্থিতিকে আরো সংকটাপন্ন করে তোলে (করিম, ২০০৮, পৃ. ৭৫-১২৬)। অল্প কিছুদিনের ব্যবধানে শুরু হয় ১৯৪৩-এর ভয়াবহ দুর্ভিক্ষ। দুর্ভিক্ষ কমিশনের রিপোর্ট অনুসারে ১৯৪৩-এর দুর্ভিক্ষে ১৫-২০ লক্ষ মানুষ প্রাণ হারায় (Khosla, 2012, Pp. 33-34)। বিশ্বযুদ্ধ শেষে শুরু হয় আরেক ভয়ঙ্কর পরিস্থিতি। মুসলিম লীগ ও কংগ্রেসের ধর্মভিত্তিক রাজনীতির চরম বলি হয় সাধারণ মানুষ, শুরু হয় সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা। ১৯৪৬ সালের কলকাতা দাঙ্গায় (Great Calcutta Killing) উভয়পক্ষের কমপক্ষে পাঁচ হাজার লোক নিহত হয় (চ্যাটার্জী, ২০০৩, পৃ. ২৭০)। সামগ্রিকভাবে একটি বিপর্যস্ত অবস্থার মধ্য দিয়ে যাত্রা শুরু করে ভারত ও পাকিস্তান নামক দুটো রাষ্ট্র। ফলে পূর্ব-বাংলাকে কিছুদিনের মধ্যে ছাত্র-আন্দোলন ছাড়াও সরকারি কর্মচারীদের ধর্মঘট, খাদ্যাভাব, দুর্ভিক্ষ, মূল্যস্ফীতি, আমলাতান্ত্রিক স্বেচ্ছাচার, দুর্নীতি, সংবাদপত্রের কণ্ঠরোধের চেষ্টা, গ্রেফতার, নিষেধাজ্ঞা, দমন-নিপীড়নসহ বহুবিধ সমস্যার মধ্য দিয়ে যেতে হয় (উমর, ১৯৭০, পৃ. ১৬০-৬৬)।

মধ্যবিত্ত শ্রেণির প্রত্যাশা, প্রাপ্তি এবং ভীতি

ভাষা আন্দোলনে যারা সক্রিয়ভাবে প্রথম থেকে অংশগ্রহণ ও নেতৃত্ব দিয়েছিলেন, তাদের মধ্যে মধ্যবিত্ত শ্রেণির সংখ্যাই সবচেয়ে বেশি। দেশভাগের সময় পূর্ব-বাংলার ব্যবসা-বাণিজ্য, প্রশাসন এবং সরকারি চাকরি প্রায় সবখানে হিন্দু মধ্যবিত্তশ্রেণির প্রাধান্য ছিল। কারণ পূর্ব-বাংলায় মুসলিম সমাজে মধ্যবিত্তশ্রেণির আবির্ভাব হয়েছিল হিন্দু সমাজের তুলনায় অনেক পরে, বিশেষত প্রথম বিশ্বযুদ্ধের পরে। যুদ্ধজনিত অবস্থার সুযোগ গ্রহণ, পাটের আন্তর্জাতিক বাজার এবং ১৯২১ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা মুসলিম মধ্যবিত্তের উদ্ভবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করে। হিন্দু-মুসলমান পৃথক নির্বাচন-ব্যবস্থার ফলে রাজনীতিতে মধ্যবিত্তের সম্পৃক্ততা বাড়ে (সিংহ, ২০১২, পৃ. ১৮-১৯)। ১৯৩৭ সালের নির্বাচনে এ. কে. ফজলুল হক জয়লাভ করে প্রধানমন্ত্রী পদে অধিষ্ঠিত হলে কৃষক পরিবার থেকে মধ্যবিত্ত শ্রেণির উত্থানের পথ আরো প্রশস্ত হয় (খান, ২০১২, পৃ. ২৪)। এই উঠতি মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বপ্ন ছিল মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তান প্রতিষ্ঠিত হলে চাকরি, শিক্ষা-দীক্ষা ও ব্যাবসা-বাণিজ্যে তাদের জন্য সম্ভাবনাময় ক্ষেত্র তৈরি হবে। অর্থনৈতিকভাবে শক্তিশালী হিন্দু উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্তশ্রেণির সাথে আর প্রতিযোগিতা করতে হবে না (Hossain, 2010, Pp. 53-55)। কিন্তু ফল হলো উল্টো। দেশ-বিভাগ কার্যকর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পূর্ব-বাংলায় রাজনৈতিকভাবে তো বটেই, চাকরির ক্ষেত্রেও ঐ জায়গার বড়ো অংশ দখল করে নিলো আরেক অবাঙালি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত শ্রেণি। দেশভাগের পরে পূর্ব-বাংলার সিভিল সার্ভিসে সমস্ত কর্মকর্তাই ছিল অবাঙালি। এর ফলে অবাঙালি অফিসাররাই গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্তগুলো গ্রহণ করতো (Umar, 2000, P. 23)।

এমন পরিস্থিতিতে শাসকগোষ্ঠীর রাষ্ট্রভাষা উর্দু করার সিদ্ধান্ত যে কতটা ভয়াবহ ক্ষতির কারণ হতে পারে, তা মধ্যবিত্ত সমাজ তথা ছাত্র-শিক্ষক ও আর্থিকভাবে কিছুটা সচ্ছল জনগোষ্ঠী বুঝতে পেরেছিল। বহুভাষাভিত্তিক রাষ্ট্রে কোনো একটি নির্দিষ্ট গোষ্ঠীর ভাষা যদি রাষ্ট্রভাষা হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহলে অন্য ভাষার মানুষ বিভিন্ন ক্ষেত্রে, বিশেষত আর্থ-সামাজিক ক্ষেত্রে পিছিয়ে পড়ার আশঙ্কা অনেক বেশি থাকে (রফিক, ২০০৯, পৃ. ১৬)। সিরাজুল ইসলাম চৌধুরীর মতে:

> বাঙালি মুসলমান যে পাকিস্তানের পক্ষে ভোট দিয়েছিল সেটা কোনো আধ্যাত্মিক অনুপ্রেরণায় নয়, একেবারেই বৈষয়িক কারণে। মানুষ মুক্তি চাইছিল। দেশ স্বাধীন হলে মধ্যবিত্তের জন্য নতুন সুযোগ আসবে, হিন্দু প্রতিদ্বন্দ্বীরা সামনে না থাকায় ক্ষেত্রটি হবে অবাধ, কৃষক অব্যাহতি পাবে জমিদারি ও মহাজনি ব্যবস্থার জোয়াল থেকে – এই আশাই ছিল আসল অনুপ্রেরণা। এখন দেখা গেলো ওই মুক্তির কোনো সম্ভাবনা নেই। বরঞ্চ গোলামির একটি চিরস্থায়ী জালে বাঙালিকে আবদ্ধ করার চেষ্টা চলছে। উর্দু তো কেবল রাষ্ট্রভাষা হবে না, উর্দু না জানার কারণে ওই ভাষায় দক্ষতার মানদণ্ডের দ্বারা লাঞ্ছিত হয়ে বাঙালি নতুন করে পরাধীন হয়ে যাবে। স্বাধীনতা তার জন্য নিয়ে আসবে নতুন অধীনতা। ওই বোধ থেকেই মধ্যবিত্ত বাঙালি আন্দোলনে গেলো (ইসলাম, ২০০০, পৃ. ২৪৫)।

আবুল মনসুর আহমদ 'বাংলা ভাষাই হইবে আমাদের রাষ্ট্রভাষা' প্রবন্ধে বলেন:

> উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা করিলে পূর্ব-পাকিস্তানের শিক্ষিত সমাজ রাতারাতি অশিক্ষিত ও সরকারি চাকরির অযোগ্য বনিয়া যাইবেন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মধ্যভাগে ফার্সির জায়গায় ইংরেজিকে রাষ্ট্রভাষা করিয়া ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদ মুসলিম শিক্ষিত সমাজকে রাতারাতি অশিক্ষিত ও সরকারি কাজের অযোগ্য করিয়াছিল (হক, ২০০০, পৃ. ১৩৫)।

ফলে পূর্ব-বাংলায় নবজাগ্রত মধ্যবিত্ত শ্রেণি বিভিন্ন প্রগতিশীল ও উদার গণতান্ত্রিক সংগঠনগুলোতে অন্তর্ভুক্ত হয়ে রাষ্ট্রভাষা বাংলা ও ইংরেজিকে অন্তর্ভুক্ত করার পক্ষে জোর দাবি তোলে। এর প্রধান কারণ, মাতৃভাষা বাংলা এবং আন্তর্জাতিক ভাষা ইংরেজি ছাড়া তাদের পক্ষে একদিকে যেমন চাকরি পাওয়া মুশকিল হয়ে যাবে, অন্যদিকে ব্যবসা-বাণিজ্য করাও প্রায় অসম্ভব হয়ে যাবে (ঘোষ, ২০১৯, পৃ. ১০৯)।

এ গেল মধ্যবিত্ত শ্রেণির স্বপ্নভঙ্গের এক দিক, যেটি শিক্ষিত সমাজের ক্ষোভের কারণকে প্রতিফলিত করে। যাদের হাতে সামান্য পুঁজি আছে এবং শিল্প-কারখানা বা ব্যবসায় বিনিয়োগ করে প্রবৃদ্ধি অর্জন করতে চায়, তাদেরও নানান ক্ষেত্রে পাকিস্তানি সরকারের বিরুদ্ধে অভিযোগ ছিল। পাকিস্তানের রাজধানী করাচিতে হওয়ায় লাইসেন্সসহ বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ কাজ হতো পশ্চিম পাকিস্তানে। স্বাভাবিকভাবেই যারা মধ্যবিত্ত শ্রেণি থেকে ব্যবসা-বাণিজ্য ও শিল্প-কারখানায় বিনিয়োগ করতে চাচ্ছিল, তাদের অনেকের পক্ষে এ খরচ বহন করে লাভবান হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না।

এছাড়া কেন্দ্রীয় সরকারের বৈদেশিক-নীতির ক্ষেত্রে পূর্ব-বাংলার সাথে বৈষম্যমূলক আচরণ করার ফলে পূর্ব-বাংলার উচ্চবিত্ত এবং শিল্পপতিরাও অনেকদিন থেকে ক্ষতির সম্মুখীন হয় (মুহিত, ২০০০, পৃ. ৯৮-১২৫)। ব্যবসা ও শিল্প-কারখানা গড়ে ওঠার জন্য সরকার পশ্চিম পাকিস্তানে যেভাবে অনুকূল পরিবেশ তৈরি করেছিল সেভাবে পূর্ব-বাংলায় করেনি। গোটা পাকিস্তানে ১৩৫টি শিল্প-উন্নয়ন কর্পোরেশনের মধ্যে ১৩২টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, যা শতকরা হিসাবে ৯৭.৭৮ শতাংশ। কৃষি ও ফাইন্যান্স কর্পোরেশনের মোট ৪৮টির মধ্যে ৩৮টিই ছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, যা শতকরা হিসাবে ৭৯.১৭ শতাংশ। প্রতি বছর পূর্ব-বাংলা থেকে

আদায়কৃত ৬০-৭০ কোটি রুপি রাজস্ব করের সিংহভাগই ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে (Choudhury, 1984, Pp. 136-139)। ১৯৪৭ সালে পাকিস্তানের মোট ১৭টি বস্ত্রশিল্পের মধ্যে পূর্ব-বাংলায় ছিল মাত্র ৩টি। অন্যান্য বৃহৎ ৩৭টি কারখানার মধ্যে পূর্ব-বাংলায় ছিল মাত্র ২টি। বাণিজ্যের ৯৯.৬ ভাগই ছিল করাচিতে আর মাত্র ০.৪ ভাগ ছিল চট্টগ্রামে (রহমান, ২০১২, পৃ. ৩৫)। পাট উৎপাদনে পূর্ব-বাংলার সুখ্যাতি থাকলেও অধিকাংশ পাটকল প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল পশ্চিম পাকিস্তানে, এ যেন আরেক ব্রিটিশ উপনিবেশের অভিজ্ঞতা, যেখানে ভারতবর্ষ কাঁচামালের জোগান দিত, আর ইউরোপে সব ভারি ও বৃহৎ শিল্প-কারখানা গড়ে উঠেছিল। শুধু তাই নয়, পাটজাত দ্রব্য থেকে রপ্তানি-আয়ের সিংহভাগই ব্যয় হয়েছে পশ্চিম পাকিস্তানে। পূর্ব-বাংলার সাথে এ বৈষম্যমূলক আচরণ তৎকালীন পার্লামেন্টে বাজেট-বিতর্ক প্রসঙ্গে পূর্ব-বাংলার প্রধানমন্ত্রী নূরুল আমিনের বক্তব্য থেকে স্পষ্ট বোঝা যায়। *দৈনিক আজাদে* প্রকাশিত প্রতিবেদন:

> ...জনাব নূরুল আমীন কেন্দ্রীয় সরকারের বিরুদ্ধে তিনটি অভিযোগ আনয়ন করিয়াছেন। প্রথমতঃ ১৯৩৫ সালের ভারত শাসন আইনের ১৩৮ ধারার বিধান অনুসারে আয়করের যে অংশ পূর্ব-বাংলার প্রাপ্য, তাহা ইহাকে দেওয়া হইতেছে না। দ্বিতীয়তঃ উক্ত আইনের বিধান অনুসারে পাটশুল্কের শতকরা ৬২ ভাগ, যাহা এই প্রদেশকে দিবার কথা আছে, প্রাদেশিক সরকারের সহিত বিনা পরামর্শে একতরফাভাবে কেন্দ্রীয় সরকার নিজ তহবিলের যুক্ত করিয়া লইয়াছেন। তৃতীয়তঃ আরও কতগুলো কর আদায়ের ব্যবস্থা যাহা এতদিন প্রাদেশিক সরকারের হাতে ছিল, তাহাও কেন্দ্রীয় সরকার প্রদেশের সম্মতি ব্যতিরেকেই অথবা অন্য উপায়ে হস্তগত করিয়াছেন (২৩ মার্চ, ১৬ বৈশাখ ১৩৫৮)।

ফলে যে মধ্যবিত্ত শিক্ষিত জনগোষ্ঠী একটি গণতান্ত্রিক পূর্ব-বাংলার স্বপ্নে আপ্রাণ লড়াই করছিল, তারা দেখেছে পাকিস্তান একটি স্বৈরতান্ত্রিক সরকারে রূপান্তরিত হচ্ছে। এই যে প্রত্যাশা ও প্রাপ্তির ফারাক, তা মধ্যবিত্ত শ্রেণির মধ্যে ক্ষোভের সঞ্চার করে:

> … For those who believed in democracy and supported the creation of Pakistan with the hope of establishing a democratic country, the early of Pakistan was the history of frustration. For those who came to power as Pakistan came into being as a separate entity, it was a period of desperation to stay in power. Hopes were dashed for the emerging middle class of East Pakistan who fought against the British power and Hindu zaminders with the hopes and aspirations that the newly form of Pakistan would be a place where they could live their lives in peace and tranquility with democratic rights and privileges the early political actions of the ruling leaders were totally disappointing. The West Pakistani leaders attempted to transform the tradition into an Imperial regime whose metropolis was Punjab and whose 'jewel in the crown' was Bengal. (Hossain, 2010, Pp. 67)

অন্যদিকে, সমাজের উচ্চবিত্তদের অনেকেই রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে উর্দুকে সমর্থন দিয়েছিল। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ-পরবর্তীকালে মুসলমান সমাজের নেতৃত্ব যাদের হাতে এসেছিল, তারা ছিল প্রধানত উর্দুভাষী, বিশেষ করে ঢাকার নবাব পরিবার। ঢাকার নবাব পরিবারের সদস্য খাজা নাজিমুদ্দিন এবং খাজা শাহাবুদ্দিন পাকিস্তানের মুসলিম লীগের রাজনীতির সাথে ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত ছিলেন। মূলত পূর্ব-বঙ্গের মুসলিম লীগ তাঁদের নেতৃত্বেই পরিচালিত হতো (রহিম, ২০২২, পৃ. ৫৬)। স্বভাবতই উর্দুর প্রতি তাঁদের বিশেষ আকর্ষণ

ও আগ্রহ ছিল। ফলে তাঁরা উর্দুকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণের সিদ্ধান্তকে সাধুবাদ জানান (ঘোষ, ২০১৯, পৃ. ১১১)। তাছাড়া জমিদারি প্রথায় তাঁরা ছিল সবচেয়ে সুবিধাভোগী। ইতিহাসের চিরাচরিত নিয়মে সুবিধাভোগীরা খুব সহজে সংস্কার মেনে নিতে পছন্দ করে না। ফলে তারা পূর্ব-বাংলার মানুষের বিরাগভাজন হন।

কৃষক-শ্রমিকের অসন্তোষ, পুঞ্জীভূত ক্ষোভ এবং বিদ্রোহ

দেশভাগের পরে পূর্ব-বাংলায় শহরে বাস করে এমন মানুষের সংখ্যা ৫ শতাংশেরও কম; এবং কর্মক্ষম জনসংখ্যার ৮২.৩৪ শতাংশ কৃষিকাজের সাথে জড়িত ছিল (রহিম, ২০২২)। ১৯৪৭ সালের আগে থেকেই পূর্ব-বাংলার রায়তদের ভাগ্যে লেখা ছিল নানারকম অমানবিক নির্যাতন, বঞ্চনা, শোষণ ও অবিচার। ১৯৩৫ সালে কৃষক প্রজা পার্টির নির্বাচনী ইশতাহারের অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ বিষয় ছিল বিনা ক্ষতিপূরণে জমিদারি উচ্ছেদ, মহাজনি সুদের কারবার নিয়ন্ত্রণ এবং ঋণসালিশি বোর্ডের মাধ্যমে কৃষকদের ঋণমুক্ত করা। কৃষক-শ্রেণি এ. কে. ফজলুল হকের প্রতি আস্থা রেখে মুসলিম লীগের পরিবর্তে কৃষক প্রজা পার্টিকে ভোট দেয়। কিন্তু সত্যিকার অর্থে কৃষকদের যথাযথ মূল্যায়ন ফজলুল হক মন্ত্রিসভা করেনি (সিংহ, ২০১২, পৃ. ২২)।

দেশভাগের ফলে পূর্ববঙ্গের জমিদারিগুলোতে হিন্দু জমিদারদের স্থান করে নিলো আর্থিকভাবে সচ্ছল মুসলিম উচ্চবিত্তরা, বিশেষ করে নবাব-শ্রেণি। ১৯৪৭ সালের পূর্বে কৃষকের শোষণ-নির্যাতন ও শ্রেণিদ্বন্দ্বকে সাম্প্রদায়িক আবরণে ঢেকে রাখার প্রয়াস ছিল বরাবরের মতোই। কিন্তু দেশভাগের পরে এ মিথ্যে ঠুনকো অজুহাতের আড়ালে প্রকৃত সত্য উদ্‌ঘাটন করতে কৃষকদের বেগ পেতে হয়নি। এ প্রসঙ্গে বদরুদ্দীন উমর যথার্থই বলেছেন:

> In East Bengal, Caste Hindus dominated the society economically, politically and culturally. With the partition of Bengal, the dominance of the upper caste and upper class Hindus ended almost overnight … Consequent upon this, the Muslim peasants, both poor peasants and sharecroppers, and the rural wage-workers found themselves in the same economic relations with the landlord and the usurer, but with this difference that now they were no longer Hindus, but people belonging to their own religious 'brotherhood'. This change happened not only in the rural areas and in the agricultural sector, but in all spheres of life and in all sectors of production and distribution, in industry and business, and in the various professions. The Muslim peasants, workers, artisans and other working people found themselves in the same relations with the propertied classes, but such relations no longer had any communal dimensions. The exploiters and the exploited now confronted each other in the rural areas nakedly and without any illusion. (Umar, 2000, Pp. 26-27)

রায়ত-শ্রেণি আশা করেছিল স্বপ্নের পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হলে ব্রিটিশদের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমিদারি ব্যবস্থা বাতিল হবে এবং 'লাঙ্গল যার, জমি তার' ভিত্তিতে জমির মালিকানা পুনর্বিন্যাস করা হবে। মূলত তারা মুক্তি চেয়েছিল। এ মুক্তি রাজনৈতিক, সাংস্কৃতিক, আধ্যাত্মিক বা চৈতন্যকেন্দ্রিক নয়, অর্থনৈতিক মুক্তি। যে মুক্তির মধ্য দিয়ে প্রতিষ্ঠিত হবে শোষণমুক্ত একটি সমাজ। কিন্তু বাস্তবিক অর্থে তা হয়নি। চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের উচ্ছেদ হলো ১৯৫০ সালে। কিন্তু কৃষক দেখল তার ভাগ্যের কোনো পরিবর্তন হয়নি। পরিবর্তন

হয়েছে এটুকু– জমিদারের জায়গায় এসেছে সরকারের আমলা, আর ক্রমাগত বর্ধিত হারে লক্ষ লক্ষ কৃষক হারিয়েছে তার চাষের জমি (ইসলাম, ২০০০, পৃ. ২৪৩-২৪৫)।

সাথে যুক্ত হয়েছে পাকিস্তানের দুই অংশের মধ্যে বৈষম্যমূলক আচরণ। ১৯৪৮-৫১ সালে সারা পূর্ব-বাংলা ছিল দুর্ভিক্ষকবলিত, কোনো কোনো অঞ্চলে তা মন্বন্তরের আকার ধারণ করে। চালের দামসহ নিত্যপ্রয়োজনীয় পণ্যের দাম ছিল কৃষকদের ক্রয়ক্ষমতার অনেক উর্ধ্বে। সরকার কার্যত কৃষকদের এ পরিস্থিতি থেকে উত্তরণের জন্য কোনো পদক্ষেপ গ্রহণ করেনি। পূর্ব-বাংলায় ভয়াবহ কলেরা ও বসন্ত রোগের প্রকোপে ব্যাপক মৃত্যুর পরেও পাকিস্তান সরকার যথাযথ ব্যবস্থা নেয়নি। পূর্ব-বাংলার কৃষকদের নিরাপদ খাবার পানি ও জনস্বাস্থ্য নিশ্চিত করতে ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছিল।[৪] ফলে বিক্ষুব্ধ জনতার স্লোগান হয়ে ওঠে: 'ইয়ে আজাদি ঝুটা হ্যায়– লাখো ইনসান ভুখা হ্যায়'।

অন্যদিকে দেখা যায় অধিকাংশ বৃহৎ শিল্প-কারখানা ছিল পশ্চিম-পাকিস্তানে। পাকিস্তানের বৈদেশিক অর্থনীতির ভিত্তি ছিল পাট, চা ও চামড়াশিল্প, যার উৎপাদনক্ষেত্র ছিল পূর্ব-বাংলা। কিন্তু এর সুফল পূর্ব-বাংলার শিল্প-মালিক বা শ্রমিক কেউ ভোগ করতে পারেনি। ফলে, তাদের অবস্থার উন্নতিও হয়নি। দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির ফলে আন্তর্জাতিক বাজারে পাটের চাহিদা কমে গেলে পাট-শ্রমিক ও কৃষক উভয়ে ক্ষতিগ্রস্ত হয়।

আর্থিক সংকটে জরাজীর্ণ এই শ্রেণি শিক্ষা-দীক্ষা ও সচেতনতায় অনেক পিছিয়ে ছিল। কৃষক-শ্রমিকদের অধিকার সম্পর্কে সচেতনতা তৈরি করা এবং ভাষা আন্দোলনে তাদের শামিল করার ক্ষেত্রে সবচেয়ে ভূমিকা পালন করেছিল ধর্মীয় এবং বিপ্লবী সাম্যবাদী ঘরানার সংগঠনগুলো (উমর, ১৯৯৫, পৃ. ২৫৬-২৬৪)। সামগ্রিক এ অসন্তোষের বহিঃপ্রকাশ বিচ্ছিন্নভাবে গোটা পূর্ব-বাংলায় দেখা যায়। পাকিস্তান রাষ্ট্রের প্রতিষ্ঠালগ্ন থেকে, বিশেষ করে ১৯৪৮ সাল থেকে সিলেট, খুলনা, যশোর, রাজশাহী, ময়মনসিংহসহ গোটা পূর্ব-বাংলায় কৃষকরা সংগঠিতভাবে শোষক ও শাসকদের বিরুদ্ধে অনেক ছোটো ছোটো বিদ্রোহ করে। এ সংগ্রাম ও বিদ্রোহের স্মারক ছিল ১৯৫০ সালে হাজং বিদ্রোহ, ১৯৪৯ সালে সিলেটের কৃষক আন্দোলন, ১৯৫০ সালে নাচোলে কৃষক বিদ্রোহ এবং ঢাকা-রাজশাহীসহ বিভিন্ন কারাগারে আটক রাজনৈতিক বন্দিদের আমরণ অনশন (উমর, ১৯৭০, পৃ. ৩২৭-৩৪৪)। কাজেই বলা যায়, কৃষক-শ্রমিকের দৃষ্টিতে ভাষা আন্দোলন শুধু সাংস্কৃতিক আন্দোলন নয়, অর্থনৈতিক শোষণ-মুক্তির আন্দোলনও।

ভাষা আন্দোলন এবং অসাম্প্রদায়িকতা

ব্রিটিশ আমলে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব লেগেই ছিল। ক্রমশ এর গভীরতা ও বিস্তৃতি বেড়েছে। এর পেছনে একদিকে যেমন রয়েছে অর্থনৈতিক কারণ, অন্যদিকে রয়েছে ঔপনিবেশিক সরকারের 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি। ১৯০৫ সালের বঙ্গভঙ্গ সাম্প্রদায়িক সংকটকে আরো ত্বরান্বিত করে। ১৯০৯ সালের মর্লে-মিন্টো সংস্কার আইনের মাধ্যমে সরকার প্রবর্তন করেছিল হিন্দু-মুসলিম পৃথক নির্বাচনের ব্যবস্থা। ১৯০৬ সালে মুসলিম লীগের প্রতিষ্ঠা, ১৯০৯ ও ১৯১৯ সালের সংস্কার আইন, খিলাফত আন্দোলন, রাজনীতিতে জিন্নাহর ব্যাপক উত্থান, ১৯৩২ সালের সাম্প্রদায়িক রোয়েদাদ, ১৯৩৫ সালের সংস্কার আইনে হিন্দু-মুসলিম পৃথক নির্বাচনের পরিপ্রেক্ষিতে সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলিম জাতীয়তাবাদী চেতনা ও রাজনীতি ব্যাপক প্রসার লাভ করে।

১৯৪০ সালের লাহোর প্রস্তাবে দ্বিজাতিতত্ত্বের ভিত্তিতে মুসলমানদের জন্য আলাদা একাধিক রাষ্ট্র গঠনের প্রস্তাব দেওয়া হয় এবং এ নিশ্চয়তা দেওয়া হয় যে সংখ্যালঘুরা ন্যায্য অধিকার ভোগ করবে এবং কোনো ধরনের শোষণের শিকার হবে না। উল্লেখ্য, দেশভাগ-পূর্ববর্তী ও পরবর্তী পরিসংখ্যানে দেখা যায়, পূর্ব-বাংলায় হিন্দু জনগোষ্ঠীর সংখ্যা অব্যাহতভাবে কমেছে। ক্রমান্বয়ে হিন্দু জনসংখ্যার অনুপাত হ্রাসের পেছনে রয়েছে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা ও দেশ-বিভাগকালীন অভিজ্ঞতা।

সাল	মুসলিম	হিন্দু	অন্যান্য
১৯১১	৬১.৬৭	৩১.২৯	৭.০৪
১৯২১	৬৪.৪৯	৩১.৪৮	৪.০৩
১৯৩১	৬৮.৩৮	২৮.৮৬	২.৭৬
১৯৪১	৭০.০৪	২৮.০০	১.৩৬
১৯৫১	৭৬.৮৫	২২.০৪	১.১১

তালিকা: পূর্ব-বাংলায় ধর্মের ভিত্তিতে জনসংখ্যার অনুপাত (রহিম, ২০২২, পৃ. ৫২)

কিন্তু বাস্তবিক অর্থে লাহোর প্রস্তাবে উত্থাপিত মুসলিম রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠিত হয়েছে ঠিকই, কিন্তু একাধিক না। তাছাড়া সংখ্যালঘুদের প্রতি যে আশ্বাস লাহোর প্রস্তাবে দেওয়া হয়েছিল, তা বাস্তবায়নে পাকিস্তান সরকার যথাযথ পদক্ষেপ গ্রহণে ব্যর্থ হয়। ফলে ১৯৫০ সালে আরেক ভয়াবহ সাম্প্রদায়িক দাঙ্গার অভিজ্ঞতা হয়। এ দাঙ্গায় ৫-৭ হাজার মানুষ নিহত হয় এবং অন্তত ৩৫ লাখ মানুষ ভিটেমাটি হারিয়ে সীমান্ত অঞ্চল, আসাম ও ত্রিপুরায় আশ্রয় নেয় (ঘোষ, ২০১৬, পৃ. ৩৯৪-৪০০)। অল্প সময়ের ব্যবধানে ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকলের একসাথে আন্দোলন করার স্পৃহা জাগ্রত হতে আমরা দেখি। বিশ শতকের প্রথম দুই দশকে সাধারণ মানুষের মধ্যে যে অসাম্প্রদায়িক সংস্কৃতি ও একাত্মবোধ কাজ করেছিল, যেন তার পুনর্যাত্রা শুরু হলো ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে।

শ্রেণি-দ্বন্দ্ব থেকে অসাম্প্রদায়িক জাতীয় গণ-আন্দোলনে রূপান্তর

উপর্যুক্ত আলোচনা থেকে একটি ব্যাপার একদম স্পষ্ট যে, সমাজের মধ্যবিত্ত, কৃষক-শ্রমিকসহ প্রায় সকলের মধ্যে দীর্ঘদিন ধরে ক্ষোভ আর অসন্তোষ বিরাজ করছিল। মধ্যবিত্ত শ্রেণির ক্ষোভ সরাসরি অবাঙালি উচ্চবিত্তদের বিরুদ্ধে, যারা হয় এখানকার শিল্প-কারখানার মালিক অথবা সরকারি উচ্চপদস্থ কর্মকর্তা। তারা মূলত এ জায়গাগুলোতে আসতে চায়। আর কৃষকদের ক্ষোভ ছিল জমিদার ও মহাজনদের বিরুদ্ধে, এরা আবার অধিকাংশই নবাব পরিবারের। অর্থাৎ এদের দ্বন্দ্ব ছিল বাঙালি মুসলিম উচ্চবিত্তের সাথে। আবার অন্যদিকে রয়েছে ১৯৫০ সালের দাঙ্গার পরিপ্রেক্ষিতে হিন্দু-মুসলিম দ্বন্দ্ব। তাহলে প্রশ্ন হচ্ছে, কেন এ আন্দোলন কোনো শ্রেণির বিরুদ্ধে না হয়ে সরাসরি পূর্ব-বাংলার জাতীয় সংগ্রামে পরিণত হলো? কীভাবে এ আন্দোলন একটি অসাম্প্রদায়িক গণ-আন্দোলনে রূপান্তরিত হলো?

শ্রেণি-দ্বন্দ্বের নিরিখে যাদের বিরুদ্ধে অসন্তোষটা ছিল তাদের অধিকাংশই কোনো না কোনোভাবে মুসলিম লীগ সরকারের পৃষ্ঠপোষকতা পাচ্ছে অথবা তারাই সরকারের সিদ্ধান্ত-প্রণেতা। যেমন খাজা নাজিমুদ্দিন নিজে জমিদার ছিলেন, তিনি আবার মুসলিম লীগ সরকারের একটি অংশও। আবার পূর্ব-বাংলায় আদমজি জুটমিলসহ যে ক'টা বৃহৎ শিল্প ছিল, একটারও মালিক বাঙালি ছিল না। এই নবাব ও উচ্চবিত্ত পরিবার

পশ্চিম পাকিস্তানের শাসকগোষ্ঠীর সুরে তাল মিলিয়ে রাষ্ট্রভাষা উর্দুকে সমর্থন জানাচ্ছে। কাজেই উচ্চবিত্ত আর পশ্চিম-পাকিস্তানি শাসকগোষ্ঠীর কণ্ঠ এবং স্বার্থ প্রায়ক্ষেত্রে একই সুর ও সুতোয় গাঁথা। আর তাছাড়া রাষ্ট্র বা সরকারের সদিচ্ছা না থাকলে কখনো শ্রেণির বিরুদ্ধে আন্দোলন করে দীর্ঘমেয়াদে সফল হওয়া যাবে না– এ সত্য দীর্ঘ আন্দোলন ও বিদ্রোহের মধ্য দিয়ে কৃষক-মধ্যবিত্ত সবাই বুঝতে পেরেছিল। ফলে তাদের দেখানো কল্পিত মুসলিম রাষ্ট্রে সৃষ্ট প্রত্যাশা আর বাস্তবিক মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানে প্রাপ্তির মধ্যে যে আকাশ-পাতাল তফাৎ তা মানুষকে বিক্ষুব্ধ করে তোলে:

> The Muslim peasants, workers and the middle class people were taught to visualise Pakistan as a dreamland, where milk and honey would flow, everyone would get education and suitable job, healthcare would be there as a routine matter, and there would be a flowering of culture for which there was so much talk during the Pakistan movement. (Umar, 2000, P. 28)

সাথে যুক্ত হলো পাকিস্তান সরকারের স্বৈরাচারী মনোভাব। পাকিস্তান সরকারের দৃষ্টিভঙ্গি ও ষড়যন্ত্র সম্পর্কে নিম্নোক্ত বক্তব্য খুবই প্রাসঙ্গিক:

> The Government, rather than taking steps to correct the public grievances, seemed to be more interested and involved in summarily condemning all opposition as pro-India, pro-Communist and anti-Pakistan. This angered and alienated many patriotic people who were simply working toward better human conditions for themselves. It shows that the government officials, at both the Central and provincial levels, were not aware of the heavy price the country had already begun to pay in distrust and disharmony in East Pakistan. (Dil, Anwar & Dil, Afia, 2011, P. 200)

যারা এতদিন সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প ঢেলে সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা তৈরি করল, তাদের মুখে নতুন স্লোগান 'যারা আন্দোলন ও সমালোচনা করছে তারা দেশের শত্রু, ভারতের দালাল'– সমালোচনাকারী হিন্দু হোক, কিংবা মুসলিম। এমনও পোস্টার দেখা যায়, 'সতর্ক থাকুন পাশের জন সম্পর্কে, সে হতে পারে ভারতের চর'। মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ দেশভাগের পরে প্রথম যখন ঢাকা সফরে বক্তব্য দিলেন (এই সফর জিন্নাহর শেষ ঢাকা সফরও বটে), তখন বারবার বুঝানোর চেষ্টা করেছেন, আন্দোলনকারীরা ভারতের প্ররোচনায় নিজেদের মধ্যে বিভাজন তৈরি করছে এবং ভারতবর্ষকে পুনরায় একত্র করতে চাচ্ছে (উমর, ১৯৭০, পৃ. ১০৩-১১২)। যে পূর্ব-বাংলার মানুষ এতদিন পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আন্দোলনে সরাসরি যুক্ত ছিল এবং নিজেদের ভাগ্যোন্নয়নের স্বপ্নে বিভোর ছিল, তাদেরকে যখন শাসকগোষ্ঠী 'ভারতের দালাল' আখ্যা দেয় তখন আর বুঝতে দেরি থাকে না যে, স্বার্থ আদায়ের জন্য এটা আরেক ব্রিটিশ 'ভাগ কর, শাসন কর' নীতি, যেখানে শাসকগোষ্ঠী নিজেদের স্বার্থ আদায়ের লক্ষ্যে হিন্দু-মুসলিম সংঘাত জিইয়ে রাখতে চায়। গণমানুষের চৈতন্যে এ বোধ উদয়ের ফলে সাম্প্রদায়িকতার বিষবাষ্প হয়ে পড়ে অকার্যকর। হিন্দু-মুসলিম একসাথে হয়ে শাসক ও শোষকের বিরুদ্ধে গণআন্দোলন শুরু করে। মূলত ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে পূর্ব-বাংলায় সাম্প্রদায়িক সংকট থেকে উত্তরণ শুরু হয়। মুসলমানদের সাথে কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে সংগ্রাম করেছে হিন্দু ও অন্যান্য ধর্মের জনগোষ্ঠীও। কারাবরণ করেছেন বসন্ত কুমার দাস, সুরেশ চন্দ্র গুপ্ত, মনোরঞ্জন ধর,

কামিনী কুমার দত্ত, ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত, প্রবোধ চন্দ্র দাসসহ অনেক হিন্দু নেতা (Dil & Dil, 2011, Pp. 199-200)।

১৯৫৫ সালে আওয়ামী মুসলিম লীগ থেকে মুসলিম শব্দটি বাদ দিলে অসাম্প্রদায়িক ও ধর্মনিরপেক্ষ রাজনীতির অগ্রযাত্রা আরো বহুদূর এগিয়ে যায়। শুধু তাই নয়, ১৯৫৪ সালের নির্বাচনের ফলাফলকে বলা যায় একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের ফসল। সে নির্বাচনে যুক্তফ্রন্ট মুসলিমদের জন্য সংরক্ষিত ২৩৭টি আসনের মধ্যে ২২৮টি আসন লাভ করে এবং মুসলিম লীগ মোট ৩০৯টি আসনের মধ্যে লাভ করে মাত্র ১০টি আসন [৫] (Dil & Dil, 2011, Pp. 199-200)। যুক্তফ্রন্টে উদারপন্থি আওয়ামী মুসলিম লীগের সাথে নেজামে ইসলামী ও খেলাফতে রব্বানীর মতো ডানপন্থি দল এবং গণতন্ত্রী পার্টির মতো বামপন্থি দলের সমন্বয়ে সহিষ্ণুতা, অসাম্প্রদায়িকতা ও উদারনীতির রাজনীতি শুরু হয়। সাম্প্রদায়িকতার ঊর্ধ্বে উঠে গণমানুষের জন্য রাজনীতির সফলতার বড়ো নিদর্শন বলা যায় এ নির্বাচন। এ নির্বাচনের ফলাফল যদি হয় একুশে ফেব্রুয়ারির গণ-মানুষের রায়, তাহলে এটাও সত্যি যে, একুশে ফেব্রুয়ারির আন্দোলন কিংবা যুক্তফ্রন্ট নির্বাচন দুটোতেই জয় হয়েছে অসাম্প্রদায়িক বাঙালির। ভাষা আন্দোলনের পর থেকে বাংলার মাটিতে কোনো সাম্প্রদায়িক রাজনৈতিক দল সংখ্যারিষ্ঠতা অর্জন করতে পারেনি।

পরিশেষে আমরা বলতে পারি, ভাষা আন্দোলনের শুরু থেকে তমদ্দুন মজলিস, কমিউনিস্ট পার্টি, ছাত্র ফেডারেশন, যুবলীগ, আওয়ামী মুসলিম লীগ, মুসলিম ছাত্রলীগ, ইসলামি ভ্রাতৃসংঘ প্রভৃতি সংগঠনের ব্যানারে ছাত্র-জনতা সবাই একসাথে ভাষার দাবিতে আপসহীন আন্দোলন করতে থাকে। যেখানে মেলবন্ধন ঘটেছে নানা মত, বিভিন্ন শ্রেণি-পেশার মানুষের। কৃষক-শ্রমিক এবং মধ্যবিত্ত বাঙালি অখণ্ড ভারত কিংবা মুসলিম রাষ্ট্র পাকিস্তানের প্রতিষ্ঠা চায়নি, প্রকৃতপক্ষে তারা চেয়েছে শোষণমুক্ত অর্থনৈতিক স্বাধীনতা এবং সমূহ সম্ভাবনা। কিন্তু নব্য স্বাধীন রাষ্ট্রে তারা শীঘ্রই আবিষ্কার করল তার সামনে এগিয়ে যাওয়ার পথে আরেক অবাঙালি উচ্চবিত্ত ও মধ্যবিত্ত বাধা হয়ে দাঁড়িয়ে আছে। ব্যবসা-বাণিজ্য, সরকারি চাকরি, আমলাতন্ত্র, সামরিক বাহিনী সবকিছু তাদের দখলে। নতুন করে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের মাধ্যমে রাষ্ট্রপক্ষ শুরু করতে চেয়েছিল আরেক ঔপনিবেশিক শোষণ, যার প্রথম পদক্ষেপ ছিল রাষ্ট্রভাষা উর্দু চাপিয়ে দেওয়ার অপচেষ্টা। রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে শাসকগোষ্ঠী বাঙালিকে বুঝিয়ে দিলো যে এখানে গণতন্ত্র থাকবে না, থাকবে স্বৈরাচার। ফলে শুরু হলো পাকিস্তানের ইতিহাসে প্রথম গণআন্দোলন এবং সে আন্দোলনে শ্রেণি, ধর্ম-বর্ণ ব্যবধানের ঊর্ধ্বে উঠে বাঙালি হয়ে উঠলো এক ও অভিন্ন। 'রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' স্লোগানের মধ্যে নিহিত ছিল অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক এবং সাংস্কৃতিক মুক্তি। লাহোর প্রস্তাব উত্থাপনকারী এ. কে. ফজলুল হক, মুসলিম লীগের আব্দুর রশীদ তর্কবাগীশ, আব্দুল হামিদ খান ভাসানী, আবুল হাসেমের মতো জনপ্রিয় ও প্রভাবশালী ব্যক্তিত্ব ভাষা আন্দোলন ও পূর্ব-বাংলার দাবি-দাওয়ার প্রতি একাত্মতা পোষণ করে কেউ কেউ কারাবন্দিও হন। ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমে কৃষক-শ্রমিক থেকে শুরু করে সর্বস্তরের মানুষের যে জাতীয় ঐক্য তৈরি হয়েছিল তার চূড়ান্ত বহিঃপ্রকাশ ঘটে মহান স্বাধীনতা যুদ্ধে। ভাষা আন্দোলন প্রতিটি সংগ্রামে জুগিয়েছে শক্তি, সাহস এবং অনুপ্রেরণা।

টীকা

১. ১৯৪৬ সালের নির্বাচনে বাংলার ২৫০ আসনের মধ্যে মুসলিম লীগ ১১৩টি, কংগ্রেস ৮৬টি এবং অন্যরা ৫১টি আসন লাভ করে।

২. আরবিতে বাংলা লেখার তথা মুসলমানি বাংলার কিছু নমুনা হলো: 'পিছলে এতোয়ার খান গাফফার খাঁর লড়কা গ্রেফতার হয়েছে। '...হুকুমতে হায়দারাবাদ হুকুমত হিন্দুস্থানের খেলাফে জং ও জেহাদের ইরাদা জাহির করেছেন।' গুপ্ত, সন্তোষ (২০১৯), 'একুশে ফেব্রুয়ারি ও আমাদের মুক্তিযুদ্ধ', মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, পৃষ্ঠা. ২৫০।

৩. এলিস কমিশনের প্রতিবেদনে বলা হয় যুক্তিসঙ্গত কারণেই পুলিশ ২৭ রাউন্ড গুলি চালিয়েছে। কিন্তু সত্যিকার অর্থে এর পরিমাণ ছিল অনেক বেশি। এই কমিশনের প্রতিবেদন পক্ষপাতদুষ্ট এবং সরকারকে অপরাধমুক্ত করার একটা প্রয়াস ছিল। আহমদ, রফিক (২০০৯), *ভাষা আন্দোলন*, ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন, পৃষ্ঠা ৫৮।

৪. পূর্ব-বাংলার স্বাস্থ্য-ব্যবস্থা কেমন ছিল তা বোঝা যায় ১৯৪৯ সালে ঢাকা মিটফোর্ড মেডিক্যাল কলেজ হাসপাতালের অব্যবস্থাপনা সম্পর্কে সমকালীন পত্রিকায় প্রকাশিত প্রতিবেদন থেকে। দেখুন, *দৈনিক আজাদ*, ২৪শে জানুয়ারি ১৯৪৯, ১৭ই মাঘ ১৩৫৫, পৃষ্ঠা ২।

৫. "The Muslim League that had led the people of Muslim Bengal to Pakistan was dead and buried in East Pakistan". Quoted in Dil (2011), P. 200.

তথ্যসূত্র

আনিসুজ্জামান। (২০১২)। *মুসলিম-মানস ও বাংলা সাহিত্য*। ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন।

ইসলাম, সিরাজুল। (২০০০)। 'বাঙালি জাতীয়তাবাদ ও রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন'। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং অন্যান্য (সম্পা.), *অমর একুশে প্রবন্ধ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

উমর, বদরুদ্দীন। (১৯৭০)। *পূর্ব-বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, (প্রথম খণ্ড)। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

উমর, বদরুদ্দীন। (১৯৯৫)। '২/২/১৯৫২ এবং ১১/২/১৯৫২ তারিখে পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টি প্রকাশিত ইশতেহার'। *ভাষা আন্দোলন প্রসঙ্গ কতিপয় দলিল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

করিম, আবদুল। (২০০৮)। *সমাজ ও জীবন* (প্রথম খণ্ড)। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

খান, শামসুজ্জামান। (২০১২)। 'স্বাধীন ও সার্বভৌম রাষ্ট্র হিসেবে বাংলাদেশের উদ্ভবের পটভূমি'। অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.), *বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় পর্ব)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

ঘোষ, বিশ্বজিৎ। (২০১৯)। 'রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন ও উত্তরকাল'। মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

ঘোষ, সুশান্ত। (২০১৬)। '১৯৫০-এর দাঙ্গা ও তার প্রভাব'। বুদ্ধদেব ঘোষ, এবং দেবব্রত বিশ্বাস (সম্পা.), *সাতচল্লিশের দেশভাগ*। ঢাকা: কথাপ্রকাশ।

চক্রবর্তী, অমিতাভ। (২০১৪)। *বাংলার কৃষক: কালে কালোত্তরে*। কলকাতা: উবুদশ।

চৌধুরী, আবদুল মমিন। (২০০২)। *প্রাচীন বাংলার ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স।

চ্যাটার্জী, জয়া (২০০৩)। *বাংলা ভাগ হল*। ঢাকা: ইউনিভার্সিটি প্রেস লিমিটেড।

পাকিস্তানের শিল্প-বাণিজ্য, আমদানি-রফতানির তথ্য, কৃষি ও বিভিন্ন খাত থেকে আয়-ব্যয়, আঞ্চলিক বৈষম্য সম্পর্কে জানতে দেখুন- মুহিত, আবুল মাল আবদুল। (২০০০)। *বাংলাদেশ: জাতিরাষ্ট্রের উদ্ভব*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

'পূর্ব-বাংলার রাষ্ট্রভাষা'। সাপ্তাহিক *বেগম*, ৩রা আগস্ট, ১৯৪৭।

মৈত্র, রণেশ। (২০১৯)। 'একুশ মানে যৌবন-জোয়ার'। মোনায়েম সরকার (সম্পা.), *একুশের নির্বাচিত প্রবন্ধ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

রফিক, আহমদ। (২০০৯)। *ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন।

রহমান, আতিউর। (২০১২)। 'মুক্তিযুদ্ধের আর্থ-সামাজিক পটভূমি'। অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.)। *বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড, তৃতীয় পর্ব)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

রহমান, মুহম্মদ মতিউর। (১৯৯২)। *বাংলা ভাষা ও ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: চন্দ্রদ্বীপ প্রকাশন (তিনি ভাষা আন্দোলনের ঘটনা প্রবাহকে চারটি পর্যায়ে ভাগ করেছেন)।

রহিম, মো. আবদুর। (২০২২)। *পূর্ববাংলার আর্থ-সামাজিক জীবন ও মুক্তিযুদ্ধ*। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

সিংহ, কঙ্কর। (২০১২)। *১৯৪৭'র বাংলাবিভাগ অনিবার্য ছিল*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশ।

হক, মফিদুল। (২০১২)। 'বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ এবং শিল্পী-সংস্কৃতিসমাজের ভূমিকা'। অজয় রায় ও শামসুজ্জামান খান (সম্পা.)। *বাংলা ও বাঙ্গালির ইতিহাস* (চতুর্থ খণ্ড তৃতীয় পর্ব)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হোসেন, আবু মো. দেলোয়ার। (২০০০)। *ভাষা আন্দোলনের আঞ্চলিক ইতিহাস*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

হক, আবদুল। (২০০০)। 'ভাষা-আন্দোলনের পটভূমি'। মুস্তাফা নূরউল ইসলাম এবং অন্যান্য (সম্পা.), *অমর একুশে প্রবন্ধ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

দৈনিক আজাদ পত্রিকা, ২৩শে মার্চ, ১৬ই বৈশাখ ১৩৫৮।

Choudhury, A. K. (1984). *The Independence of East Bengal*. Bangladesh: Jatiya Grantha Kendra.

Dil, Anwar & Dil, Afia. (2011). *Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh*. Intercultural Forum. Dhaka: California & Adorn Books.

Hossain, Mokerrom. (2010). *From Protest to Freedom; The Birth of Bangladesh*. Dhaka: Shahitya Prakash.

Khosla, G.D. (2012). 'The Partition of the Ways'. Kaushik Roy(ed.), *Partition of India; Why 1947?*. New Delhi: Oxford University Press.

Umar, Badruddin. (2000). *Language Movement in East Bengal*. Dhaka: Jatiya Grontho Prakashan.

শহিদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারঃ ভাষা আন্দোলনে অবদান

সুস্মিতা রানী দাস

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookSusmita

শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন প্রগতিবাদী ও উদারনৈতিক দৃষ্টিভঙ্গিসম্পন্ন বুদ্ধিজীবী। মানবতাবোধ, মহৎ ও উদার দৃষ্টিভঙ্গির জন্য তিনি মার্কসবাদের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য হন। ১৯৪৭ সালে ভারত-ভাগের ফলে আর্থ-সামাজিক ও রাজনৈতিক পটপরিবর্তনের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা শহীদুল্লা কায়সারের জীবন-জিজ্ঞাসার ক্ষেত্রে পরিবর্তন আনে। পাকিস্তান সৃষ্টির আগেই ভাষার প্রশ্নে ধর্মকে যুক্ত করার বিষয় নিয়ে তিনি চিন্তিত ছিলেন। পাকিস্তান রাষ্ট্র সৃষ্টির পরপরই তিনি উপলব্ধি করেন, নবগঠিত পাকিস্তান রাষ্ট্রে পূর্ব-বাংলার সাংস্কৃতিক অবকাঠামো নির্মূল করে বাংলা ও বাঙালির স্বাতন্ত্র্য ধ্বংস করে দেওয়া হবে। তাই প্রথম থেকেই তিনি বাংলা ভাষা-বিরোধী চক্রান্তের বিরুদ্ধে প্রতিবাদী ভূমিকা পালন করেন। ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে সাংগঠনিক উদ্যোগের দায়িত্বে ছিলেন শহীদুল্লা কায়সার। ভাষা আন্দোলনের প্রথমদিকে তিনি ছাত্র ধর্মঘট সংগঠিত করেন, সভা-মিছিলে সক্রিয়ভাবে অংশগ্রহণ করেন। পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির উপর সরকার দমন-নীতি প্রয়োগ করলে তিনি আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বাধ্য হন। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় তিনি আন্দোলনের পেছনে থেকে নেতৃত্ব দিয়েছেন। ভাষা আন্দোলনে তাঁর সক্রিয় ভূমিকার কারণেই ১৯৫২ সালের জুন মাসে তাকে প্রথমবার গ্রেফতার করা হয়। তিনি ধর্মাশ্রয়ী সাম্প্রদায়িক পাকিস্তান রাষ্ট্রের বিপরীতে একটি সমন্বিত বাঙালি জাতীয়তাবাদী চেতনা বিকাশের ক্ষেত্র নির্মাণে ব্রতী হয়েছিলেন। ভাষা আন্দোলনে অংশগ্রহণের মধ্যদিয়ে এটি শুরু হয় এবং বিভিন্ন আন্দোলন-সংগ্রামের মধ্যদিয়ে ১৯৭১ সালে মুক্তিযুদ্ধে অংশগ্রহণের মাধ্যমে সেটি পরিণতি লাভ করে। তিনি শোষণ-বৈষম্যমুক্ত সমাজ গঠনের একজন নিবেদিত কর্মী ছিলেন। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল পাকিস্তানের সকল ভাষাকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। আলোচ্য প্রবন্ধে ভাষা আন্দোলনে একাত্তরের শহিদ বুদ্ধিজীবী শহীদুল্লা কায়সারের অবদান আলোচনা করা হয়েছে। বিশেষকরে, একজন আত্মগোপনকারী নেতা হয়েও ভাষা আন্দোলন সংগঠিত করতে তিনি যেভাবে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন তা বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে তুলে ধরা হয়েছে।

গবেষণা-পদ্ধতি

প্রবন্ধটি প্রধানত একটি তথ্য অনুসন্ধানমূলক গবেষণা। ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লা কায়সার কী ধরনের এবং কীভাবে ভূমিকা রেখেছেন, তা এই প্রবন্ধে আলোচিত হয়েছে। এক্ষেত্রে ১৯৫২ সাল পর্যন্ত তাঁর ব্যক্তিজীবন, রাজনীতি-সচেতনতা এবং আন্দোলন-সংগ্রামে সম্পৃক্ততা, প্রত্যক্ষ কিংবা পরোক্ষভাবে ভাষা আন্দোলনে অবদান; এই বিষয়গুলো তুলে ধরা হয়েছে। এই গবেষণায় প্রধানত 'ঐতিহাসিক পর্যালোচনা পদ্ধতি' অনুসরণ করা হয়েছে। এ পদ্ধতি হলো লিখিত বা মুদ্রিত বিভিন্ন উপকরণ থেকে তথ্য সংগ্রহ করে পাঠ-বিশ্লেষণ পদ্ধতিতে সিদ্ধান্তে উপনীত হওয়া। প্রবন্ধ সংশ্লিষ্ট প্রকাশিত বিভিন্ন গ্রন্থ ও প্রবন্ধাবলি, গবেষণাকর্ম, জার্নাল, পুস্তকাকারে প্রকাশিত স্মৃতিচারণ ও সাক্ষাৎকার, পত্র-পত্রিকা, সাময়িকী, সুভেনির প্রভৃতি উৎস হিসেবে বিবেচিত হয়েছে। এছাড়া শহীদুল্লা কায়সারের পরিচিত বিশিষ্টজনদের সাক্ষাৎকারের মাধ্যমে প্রাপ্ত বিষয়বস্তুর সাথে সংশ্লিষ্ট তথ্যও ব্যবহৃত হয়েছে। প্রাথমিক উৎস অপ্রতুল হওয়ায় দ্বৈতয়িক উৎসের উপর

গুরুত্ব দিয়ে গবেষণাটি করতে হয়েছে। এক্ষেত্রে ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লা কায়সারের অবদানের ধারাবাহিক তথ্যের অভাব, তথ্য যাচাইয়ের উৎসের অপ্রতুলতা এই গবেষণাকর্মের একটি সীমাবদ্ধতা। প্রবন্ধটি রচনার ক্ষেত্রে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত সমস্ত তথ্য যুক্তির বিবেচনায় যাচাই করে গ্রহণ করা হয়েছে। ভাষা আন্দোলনের পূর্ণাঙ্গ ইতিহাস পুনর্গঠনের জন্য এর বহুমাত্রিক সামগ্রিকতাকে উন্মোচন করা প্রয়োজন। ভাষা আন্দোলনে যারা প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষভাবে অবদান রেখেছেন তাদের প্রত্যেকের ভূমিকা নিয়ে গবেষণার প্রয়োজন রয়েছে। শহীদুল্লা কায়সারকে নিয়ে ইতঃপূর্বে এ ধরনের কোনো কাজ না হওয়ায় এর অ্যাকাডেমিক যৌক্তিকতা অনস্বীকার্য।

ভাষার প্রশ্নে শহীদুল্লা কায়সারের অবস্থান

শহীদুল্লা কায়সার বিশ্বাস করতেন, পাকিস্তানের মতো বহুজাতিক ও বহুভাষিক দেশে সবাই নিজ নিজ ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতিতে শ্রীবৃদ্ধি করলে পাকিস্তান দুর্বল না হয়ে আরো বেশি সবল হবে। বাঙালিরা যদি পীড়নের অনুভূতি থেকে মুক্ত হয় এবং তাদের স্বকীয় বিকাশের পথে কোনো বাধা না থাকে, তাহলে দূরত্ব থাকলেও অচ্ছেদ্য ভ্রাতৃত্বের বন্ধন অটুট থাকবে। তাঁর মতে, অনেকেই মনে করেন পূর্ব-বাংলা অর্থনৈতিক দিক থেকে অনগ্রসর বলেই এখানে স্বাতন্ত্র্য চিন্তা বেড়েছে। কথাটা আংশিক সত্য হলেও পুরো সত্য নয়। অর্থনৈতিক দিক থেকে যদি সমৃদ্ধও হতো, তারপরও এখানে বাঙালি চেতনা জাগতো। কারণ ধর্মীয় চেতনার স্তর পেরিয়ে ভাষা ও জাতীয়তাভিত্তিক চেতনা আসবে এটা ঐতিহাসিক নিয়ম। এই নিয়মকে কেউ অস্বীকার করতে চাইলে অবাঞ্ছিত পরিস্থিতির সৃষ্টি হবে। ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে তাঁর নীতি ছিল পাকিস্তানের বিভিন্ন ভাষাকে সমান মর্যাদা দিতে হবে। পাকিস্তানের সকল জাতিকে নিজ নিজ মাতৃভাষায় শিক্ষালাভ করার এবং রাষ্ট্রের সকল কাজ পরিচালনার অধিকার দিতে হবে। জোর করে কোনো ভাষাকে অন্য ভাষাভাষী জাতির উপর চাপিয়ে দেওয়া যাবে না। পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষীর সম-অধিকার ও সমমর্যাদার নীতিতে বিশ্বাস থেকে 'পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' এর পরিবর্তে 'পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' দাবিকে তিনি সঠিক বলে বিবেচনা করেছিলেন। ভাষা আন্দোলনে তিনি এই নীতিতেই বিশ্বাসী ছিলেন এবং সেই অনুযায়ী কার্যক্রম পরিচালনা করেছেন। তাঁর এই নীতিতে বিশ্বাসের বিষয়টি পরবর্তীতে ভাষা আন্দোলন নিয়ে পত্রিকায় তাঁর লেখা থেকে পরিষ্কার ধারণা পাওয়া যায় (*সংবাদ*, ১৯৭০, পৃ. ১, ৪)। এই নীতিগত অবস্থানের ফলে দু'টি বিষয়ে সুবিধা হয়- এক, বাংলাকে অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে মর্যাদাদানের বিষয়টি গুরুত্ব পায়। দুই, পাকিস্তানের অন্যান্য ভাষাভাষী জনগণ ও প্রগতিশীল বিভিন্ন রাজনৈতিক নেতাদের কাছ থেকে ভাষা আন্দোলনে সমর্থন ও সহানুভূতি আদায় করা সম্ভব হয়।

ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লা কায়সারের ভূমিকা সম্পর্কে বিভিন্ন জীবনী গ্রন্থ, প্রকাশিত সাক্ষাৎকার ও স্মৃতিচারণ, ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির ভূমিকা, ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস নিয়ে লেখা বিভিন্ন গ্রন্থে বিক্ষিপ্তভাবে উল্লেখ পাওয়া যায়। ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে প্রাপ্ত সে-সব তথ্য একেবারেই অপর্যাপ্ত। ভাষা আন্দোলনে কমিউনিস্ট পার্টির নীতিকেই শহীদুল্লা কায়সারের নীতি বলা যায়। কারণ তিনি কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলন সংগঠনের দায়িত্বপ্রাপ্ত নেতা ছিলেন। সাধারণ ছাত্রদের কাছে ছিল তাঁর তুমুল জনপ্রিয়তা। ছাত্রদের সংগঠিত করে ছাত্র ধর্মঘটগুলো সফল করার ক্ষেত্রে তাঁর ভূমিকা গুরুত্বপূর্ণ। একইসাথে মনে রাখা দরকার, ভাষা আন্দোলনের সময় তিনি ছিলেন আত্মগোপনকারী নেতা। তাই প্রকাশ্যে নেতৃত্ব দিতে না পারলেও গোপনে ভাষা আন্দোলনের নেতৃত্বদানকারীদের সাথে যোগাযোগ রেখেছেন, তাদের মাধ্যমে ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে নিজ দলের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করেছেন। বিভিন্ন সময় বিভিন্নজনের সাথে

যোগাযোগ করেছেন, বৈঠক করেছেন, সিদ্ধান্ত-পরামর্শ ও নির্দেশনা দিয়েছেন। পরবর্তীকালে কেউ কেউ তাদের স্মৃতিচারণে শহীদুল্লা কায়সারের কথা উল্লেখ করেছেন। আবার অনেকেই উল্লেখ করেননি বা লেখেননি।[১] তাই অনেক তথ্যই অজানা রয়ে গেছে। যেহেতু ভাষা আন্দোলনে তাঁর অবদান সম্পর্কে তিনি নিজে কিছু লিখে যাননি তাই ইতিহাসে ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লা কায়সারের ভূমিকা বিক্ষিপ্তভাবে উঠে এসেছে। বিক্ষিপ্ত তথ্য থেকেও ভাষা আন্দোলনে তাঁর গুরুত্বপূর্ণ অবদানের উল্লেখ পাওয়া যায়। এই প্রবন্ধে বিভিন্ন উৎস থেকে প্রাপ্ত এই তথ্যগুলো একত্রিত করে ভাষা আন্দোলনে শহীদুল্লা কায়সারের অবদানের একটি কাঠামো তৈরি করা হয়েছে।

রাজনীতি সচেতনতা

১৯২৭ সালের ১৬ই ফেব্রুয়ারি তৎকালীন নোয়াখালীর জেলার ফেনী মহকুমার মজুপুর গ্রামে শহীদুল্লা কায়সারের জন্ম (চৌধুরী, ২০১৫, পৃ. ৩৪)। তাঁর পুরো নাম আবু নাসের মোহাম্মদ শহীদুল্লা, ডাকনাম কায়সার। পিতা মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ এই নাম রাখেন। মা সুফিয়া খাতুনের কাছেই শহীদুল্লা কায়সারের পড়ালেখার হাতেখড়ি। শৈশবে পড়াশোনা করেছেন বাড়ি থেকে মাইলখানেক দূরে আমিরাবাদ হাইস্কুলে। তাঁর পিতা মাওলানা মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্ কলকাতার আলিয়া মাদ্রাসার অধ্যাপক ছিলেন এবং পরবর্তীতে তাদের পরিবার কলকাতায় চলে যায়। শহীদুল্লা কায়সারকে কলকাতা মাদ্রাসা স্কুলে ভর্তি করা হয়। তাঁর সহপাঠী ছিলেন কলিম শরাফি ও কামরুল হাসান। তারা থাকতেনও দেবেন্দ্র ম্যানশনের মুখোমুখি ফ্ল্যাটে (কায়সার, ২০২০, পৃ. ১৭-৪৩)। শহীদুল্লা কায়সার ছোটোবেলা থেকেই ছিলেন প্রাণবন্ত স্বভাবের। ছোটোবেলা থেকেই শহীদুল্লা কায়সার মানুষকে খুব ভালোবাসতেন, মানুষের কথা ভাবতেন।[২] কলকাতা মাদ্রাসার অষ্টম শ্রেণিতে পড়া অবস্থায় মার্কস ও লেনিনের বই পড়ে মানুষের জন্য, সমাজের জন্য ভাবনার উদ্রেক হয়। তাঁর কৈশোর শুরু হয় নিপীড়িত-নির্যাতিত মানুষের মুক্তির জন্য কাজ করার প্রত্যয় নিয়ে। কৃতিত্বের সাথে ১৯৪২ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হয়ে মেধাবী ছাত্র শহীদুল্লা কায়সার ভর্তি হন প্রেসিডেন্সি কলেজে। ম্যাট্রিক পরীক্ষায় ভালো রেজাল্টের পর তাঁর পিতার ইচ্ছা ছিল ছেলেকে আলীগড় মুসলিম বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি করাবেন। কিন্তু শহীদুল্লা কায়সারের ইচ্ছা অনুযায়ী শেষপর্যন্ত প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি করে দেন। স্কুলজীবন পর্যন্ত তিনি কায়সার নামে পরিচিত ছিলেন। প্রেসিডেন্সি কলেজে ভর্তি হওয়ার পর সবার কাছে শহীদুল্লা নামে জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন (কায়সার, ২০২০, পৃ. ১৭-৪৩)। সে-সময় প্রেসিডেন্সি কলেজ ছিল ছাত্র আন্দোলনের পীঠস্থান। প্রেসিডেন্সি কলেজে তিনি বামপন্থী ছাত্র-রাজনীতির প্রত্যক্ষ সংস্পর্শে আসেন এবং ছাত্র ফেডারেশনের কার্যক্রমের সাথে যুক্ত হন (নাঈম ও লাভা, ২০১৯, পৃ. ৩৮৮)। বিভিন্ন জায়গায় তাকে ছুটতে হতো। বিতর্ক প্রতিযোগিতা, উপস্থিত বক্তৃতায় শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন অনবদ্য। তিনি হয়ে উঠেন কমিউনিস্ট পার্টির কিশোর সংগঠক। মিছিলে, আন্দোলনে, বক্তৃতার মঞ্চে সবজায়গায় তাকে দেখা যায়। তাঁর মেধা, তীক্ষ্ণ বুদ্ধি, কর্তব্যনিষ্ঠা, অমায়িক আচরণ ও দেশপ্রেমের কারণে অল্পদিনেই পার্টির সবার কাছে প্রিয় হয়ে ওঠেন। কলকাতা শহরের বিভিন্ন এলাকায় গিয়ে মানুষকে জাগরণের বাণী শুনিয়েছেন, বিভিন্ন ঘরোয়া বৈঠক করেছেন। হলওয়েল মনুমেন্টে বিশাল জনসভায় বক্তৃতা দিয়েছেন, পুলিশের আক্রমণের শিকারও হয়েছেন (কায়সার, ২০২০, পৃ. ৫০-৭২)। তিনি কলকাতার ওয়েলিংটন স্কোয়ার, ধর্মতলা স্ট্রিটে বক্তৃতা দিতেন এবং মানুষ ভিড় করতো তার কথা শোনার জন্য (সাদিয়া, ২০২১, পৃ. ১৭৯)। মহাত্মা গান্ধীর ভারত ছাড় আন্দোলনের সময় চরকায় সুতা কেটে কাপড় বোনার জন্য মা আর মামিকে উৎসাহিত করেছেন। তাঁর মাকে বলেছিলেন, "ঘরে ঘরে মা-বোনেরা চরকায় সুতা কেটে নিজের

কাপড় তৈরি করে। কেউ আর বিদেশী কাপড় পরবে না। আমার ইচ্ছা আমার মাও এ মহৎ কাজটা করবেন। লাইলী মামিকে আপনার সঙ্গে রাখতে পারেন" (কায়সার, ২০২০, পৃ. ৭৩)। এ সময় থেকে তিনি দায়িত্ব নিয়ে দুর্ভিক্ষের দিনগুলোতে রিলিফ ক্যাম্পের জন্য চাল, ডাল, কাপড় সংগ্রহ করেছেন। আবার দাঙ্গার দিনগুলোতে দাঙ্গা প্রতিরোধ এবং হিন্দু-মুসলমানদের নিরাপদ আশ্রয়কেন্দ্রে পৌঁছে দেওয়ার জন্য দিন-রাত কাজ করেছেন (কায়সার, ২০২০, পৃ. ৮৬-১০০)। তিনি ১৯৪৬ সালে দ্বিতীয় শ্রেণিতে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করে অর্থনীতি বিভাগ থেকে বিএ পাশ করেন। এরপর তিনি একইসাথে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অর্থনীতি বিভাগে এমএ শ্রেণিতে ভর্তি হন এবং রিপন কলেজে (বর্তমান সুরেন্দ্রনাথ কলেজ) আইন নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন (বড়ুয়া, ১৯৮৮, পৃ. ১৩)।

ভাষা আন্দোলন ও শহীদুল্লা কায়সার

ভারত-বিভক্তি নিশ্চিত হয়ে গেলে পাকিস্তান রাষ্ট্র প্রতিষ্ঠার আগে থেকেই পাকিস্তানের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নটি সামনে চলে আসে। ধর্মভিত্তিক পাকিস্তান রাষ্ট্রের রাষ্ট্রভাষার প্রশ্নে ধর্মকে জুড়ে দিয়ে উর্দুর পক্ষে প্রচারণা চালানো হতে থাকে। তখন থেকেই ভাষার প্রশ্নে শহীদুল্লা কায়সার বিভিন্ন আলোচনায় দৃঢ়ভাবে বলেছেন, বাঙালি মুসলমানের ভাষা অবশ্যই বাংলা, উর্দু নয়। ১৯৪৬ সালের দাঙ্গার মধ্যে শহীদুল্লা কায়সার পার্টির কিছু কাজে বালিগঞ্জে রোকেয়া কবিরের বাসায় যান। সেদিন রোকেয়া করিরের সাথে ভাষা নিয়ে আলোচনার একপর্যায়ে তিনি মন্তব্য করেন, ধর্মের সঙ্গে ভাষার বিষয়টি যুক্ত করা হচ্ছে রাজনৈতিক উদ্দেশ্যে। সরলপ্রাণ ধর্মবোধকে উসকে দেওয়া হচ্ছে 'বাংলা'র বিরোধিতা করে। তিনি বলেন:

> কেউ যদি উর্দুকে ভালোবাসে সে আলাদা কথা। কিন্তু বাঙালি মুসলমানের ভাষা বাংলা এ নিয়ে কোনো মতবিরোধ থাকা উচিত নয়। আধা বাঙালি, উর্দুভাষী রক্ষণশীল খাঁটি বাঙালির সঙ্গে ধর্মকে যুক্ত করে মুসলিম সম্প্রদায় যদি পাকিস্তান সৃষ্টির নামে উর্দুর পক্ষে প্রচার চালায় তার ফল ভালো হবে না (কায়সার, ২০২০, পৃ. ১১০)।

বন্ধু কলিম শরাফি ও কামরুল হাসানের সাথে আলোচনায়ও তিনি বলেছিলেন, বিষয়টি খুব গুরুত্বপূর্ণ। বাংলার বিরোধিতা করার জন্য ধর্মকে টেনে আনার আশঙ্কা আছে। তিনি বলেন, অনেক রক্ষণশীল মুসলমানকে তিনি বলতে শুনেছেন মুসলমানের জাতীয়তা সম্পূর্ণ ধর্মগত। ধর্মের অজুহাতে অনেকেই মুসলমানদের ভাষা উর্দু বা আরবির পক্ষে কথা বলছেন। জাতীয়তাবোধের প্রশ্নে উর্দু আর বাংলা নিয়ে সংকটের মুখোমুখি হতে হবে এটি চিন্তা করে তিনি বিচলিত হন। তিনি বলেন, "স্বাধীনতার প্রশ্নে ধর্ম যেমন একটি বিরাট ইস্যু হয়ে দাঁড়িয়েছে, তেমনি মনে হচ্ছে ধর্মের সঙ্গে ভাষার বিষয়টি নিয়েও জটিলতার সৃষ্টি হতে পারে" (কায়সার, ২০২০, পৃ. ১১১-১১২)। ভারত বিভক্ত হওয়ার পর যখন কলকাতা ছেড়ে ঢাকায় ফিরতে হবে তখন তাঁর মনে প্রশ্ন দেখা দেয় হিন্দুর জন্য আলাদা রাষ্ট্র, মুসলমানদের জন্য আলাদা রাষ্ট্রের কি আসলেই প্রয়োজন ছিল। ধর্মের নামে মানুষের মধ্যে এই বিভেদ কীভাবে সমাজের বা মানুষের জন্য মঙ্গল বয়ে আনবে এসব ভেবে তিনি বিচলিত হন। দেশ-বিভাগের পর পার্টির ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা নিয়ে আলোচনার জন্য পার্টির নেতাকর্মীদের বেশ কয়েকটি বৈঠক হয়। শহীদুল্লা কায়সার বৈঠকগুলোতে অংশগ্রহণ করেন। পার্টির আদর্শকে জনগণের কাছে গ্রহণযোগ্য করে তোলা, সাধারণ অশিক্ষিত ধর্মান্ধ মুসলমানদের মুক্তির লক্ষ্যে তিনি দৃঢ় আত্মবিশ্বাস ও আন্তরিক দেশপ্রেমে উদ্‌বুদ্ধ হয়ে পার্টির দায়িত্ব নিয়ে ঢাকা আসার প্রস্তুতি নেন। দেশ-ভাগের পর তাঁর পরিবার পূর্ব-পাকিস্তানে চলে আসে এবং তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অর্থনীতি

বিভাগে স্নাতকোত্তরে ভর্তি হন। থাকতেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হলে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের সংগঠিত করা এবং পার্টির পক্ষে একটি ছাত্র সংগঠন গড়ে তোলার দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল শহীদুল্লা কায়সারকে। ইতোমধ্যে ছাত্রদের কাছে শহীদুল্লা কায়সার জনপ্রিয় হয়ে ওঠেন। হল থেকে হলে, বিভাগ থেকে বিভাগে পার্টির কাজে তিনি ছুটেছেন ছাত্রদের কাছে। তাঁর আকর্ষণীয় ব্যক্তিত্বের জন্য তিনি ছাত্রমহলে প্রিয় হয়ে ওঠেন। ঢাকায় আসার পর শহীদুল্লা তাঁর নামের সাথে কায়সার জুড়ে দেন। ডাকনাম ও ভালো নামের সমন্বয়ে হয়ে ওঠেন শহীদুল্লা কায়সার (কায়সার, ২০২০, পৃ. ১২০-১৪৪)। সে-সময় কমিউনিস্ট পার্টির কর্মীসংখ্যা অনেক কম থাকায় ছাত্রদের পাশাপাশি শ্রমিকদের মাঝেও কাজ করতে হতো তাকে (বড়ুয়া, ১৯৮৮, পৃ. ১৪)। সে-সময় সেন্ট্রাল কমিটির সদস্য হওয়া অনেক কঠিন ব্যাপার ছিল। কমিউনিস্ট পার্টির প্রতি তাঁর আনুগত্য ও দায়িত্বশীলতার জন্য কারণে তিনি সেন্ট্রাল কমিটির মেম্বার হয়েছিলেন (হক, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪)।

'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' গঠন

মুসলিম লীগের বাংলা ভাষা-বিরোধী কার্যকলাপ ও গণপরিষদের সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে সক্রিয় আন্দোলন গড়ে তোলার উদ্দেশ্যে ফজলুল হক হলে ১৯৪৮ সালের ২রা মার্চ সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক কর্মীদের সভা আহ্বান করা হয়। সেই সভায় শহীদুল্লা কায়সারসহ রণেশ দাশগুপ্ত, আজিজ আহমদ, কাজী গোলাম মাহবুব, অজিত গুহ, আবুল কাসেম, সরদার ফজলুল করিম, নঈমুদ্দীন আহমদ, তফজ্জল আলী, আনোয়ারা খাতুন, শামসুদ্দীন আহমদ, মহীউদ্দিন, আলী আহমেদ, শামসুল আলম, শওকত আলী, মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদ, শামসুল হক, আবদুল আওয়াল, তাজউদ্দীন আহমদ, লিলি খান ও অন্যান্যরা উপস্থিত ছিলেন। 'রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ' নামে একটি সর্বদলীয় পরিষদ গঠিত হয়। বিভিন্ন সংগঠন ও ছাত্র হলের ২ জন করে প্রতিনিধি সদস্য হিসেবে মনোনীত হন। সংগ্রাম পরিষদের সাব-কমিটি গঠিত হয় এবং সাব-কমিটি ৪ ও ৫ই মার্চ বিকেলে ফজলুল হক হলে দু'টি বৈঠক করে। বৈঠকে ১১ তারিখের ধর্মঘট সম্পর্কে বিস্তারিত আলোচনা করা হয় (হেলাল, ১৯৯৯, পৃ. ২৫৩-২৫৪)। ১৯৪৮ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদের অধিবেশনে পূর্ব-বাংলার প্রতিনিধি ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত বাংলাকে গণপরিষদের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করার প্রস্তাব উত্থাপন করেন। কিন্তু তাঁর প্রস্তাব অগ্রাহ্য হয় এবং সেই সংবাদ ঢাকায় প্রকাশিত হলে সব মহলে তীব্র প্রতিক্রিয়ার সৃষ্টি হয়। গণপরিষদের বাংলা ভাষা-বিরোধী সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধে ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় ছাত্র ধর্মঘট পালন করা হয়। ১১ই মার্চ সমগ্র পূর্ব-বাংলায় সাধারণ ধর্মঘট পালন করা হয় (মতিন, ১৯৮৬, পৃ. ৭-৯)। ১৯৪৮ সালের ২৬শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় যে ছাত্র-ধর্মঘট ও শোভাযাত্রা অনুষ্ঠিত হয়, শহীদুল্লা কায়সার তাতে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন (মুকুল, ফাল্গুন ১৩৯১, পৃ. ৭৯)। ১৯৪৮ সালের ১২ই মার্চ পূর্ব-পাকিস্তান সরকারের সেক্রেটারিয়েট ইডেন বিল্ডিং-এর বারান্দায় টুলের উপর দাঁড়িয়ে মাতৃভাষার সমর্থনে যুক্তি দিয়ে গুছিয়ে বক্তৃতা দেন। তাঁর সেই বক্তৃতা উপস্থিত সবাইকে উজ্জীবিত করেছিল (কায়সার, ২০০০, পৃ. ভূমিকা)।

আত্মগোপনে থেকে ভাষা আন্দোলনে নেতৃত্বদান

১৯৪৮ সাল থেকে মুসলিম লীগ সরকার পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির উপর দমন-নীতি চালায়, যার মূল উদ্দেশ্য ছিল এই দলকে নির্মূল করে দেওয়া। সরকারের আক্রমণ থেকে পার্টিকে রক্ষা করার জন্য পার্টির অনেক নেতা ও কর্মী আন্ডারগ্রাউন্ডে যেতে বাধ্য হন (রায়, ১৯৮৬, পৃ. ৯৬-৯৭)। সরকারের দমন-পীড়নে পূর্ব-পাকিস্তান কমিউনিস্ট পার্টির নেতা-কর্মীরা কোণঠাসা অবস্থার মধ্যেও বাংলা ভাষাকে পাকিস্তানের

অন্যতম রাষ্ট্রভাষা করা এবং সকল ভাষার সমান অধিকারের প্রশ্নে অটল থাকেন। (সারাবাংলা, ২০২৩) শহীদুল্লা কায়সার আত্মগোপনে যান।[৩] এবং পলাতক থেকেই ছাত্রদেরকে সংগঠিত করতে থাকেন। পলাতক থাকার কারণে তিনি স্নাতকোত্তর পরীক্ষা দিতে পারেননি (নাঈম, ও লাভা, ২০১৯, পৃ. ৩৮৯)। বামপন্থী রাজনীতিতে যুক্ত হওয়ায় ছাত্রজীবন থেকেই বহু প্রতিকূল অবস্থার সম্মুখীন হতে হয়েছে। দুঃখ-কষ্টের মধ্যেও তিনি তাঁর আদর্শ থেকে বিচ্যুত হননি (কায়সার, ২০১৯, পৃ. ১০৯)। আত্মগোপনে থেকেও ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করে গেছেন। এ প্রসঙ্গে সাংবাদিক জহুর হোসেন চৌধুরী লিখেছেন:

> কম্যুনিস্ট পার্টি বেআইনি ঘোষিত হয়েছে ঃ আণ্ডার গ্রাউণ্ডে চলে গেছেন সব কম্যুনিস্ট কর্মি ও নেতাগণ। শুরু হয়েছে রণদিভে যুগের রোমাঞ্চকর ও হিংস্র নিপীড়নের দিনগুলি। এখানে সেখানে অনুচ্চ কণ্ঠে উচ্চারিত হতে শুনেছি একটি নাম- শহীদুল্লা কায়সার। তিনি যেন রূপকথার রাজকুমার। সর্বজনশ্রদ্ধেয় আলেম মৌলানা হাবিবুল্লার পুত্র কম্যুনিস্ট। বায়ুর ন্যায় সর্বত্র তাঁর গতি- ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রাবাসগুলি থেকে শুরু করে জয়দেবপুরের গভীর জঙ্গলে কম্যুনিস্ট পার্টির গোপন সভায়। ১৯৫২ সনের ভাষা আন্দোলনের সময়েও বার বার শুনেছি এ নামটি। কম্যুনিস্ট পার্টির তরফ থেকে এ আন্দোলনে নেতৃত্ব দিচ্ছেন শহীদুল্লা কায়সার (কায়সার, ২০০০, পৃ. ভূমিকা)।

আত্মগোপনে থেকে ভাষা আন্দোলনের পক্ষে কাজ করা শহীদুল্লা কায়সারের জন্য মোটেও সহজ ছিল না। মুসলিম লীগের স্বৈরাচারী নীতির বিরুদ্ধে আন্দোলন করতে গিয়ে তিনি অনেকে কঠিন পরিস্থিতির মুখোমুখি হয়েছেন। শেখ মুজিবের সাথে আলাপচারিতার কথা উল্লেখ করে শহীদুল্লা কায়সার লিখেছেন, "সে সময়ের কয়েকটা ঘটনার উল্লেখ করে মুজিব বললো মনে আছে তোর সে সব কথা? কায়ক্লেশে একবেলা খাবার জুটতো। লোকে এক রাত্রি আশ্রয় দিতে ভয় পেতো" (*সংবাদ*, ১৯৭০, পৃ. ১)। ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে কমিউনিস্ট পার্টির অবস্থান ব্যাখ্যা করে ইশতাহার ছাপা, প্রচার ও বিলি করতে দিয়ে অনেক প্রতিকূল অবস্থার মুখোমুখি হতে হয়েছে তাকে। এমনকি নিজ পার্টির সদস্যদের কেউ কেউ তাঁর কাজের বিরোধিতা করেছেন (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৯২-৯৩)। প্রতিকূল পরিস্থিতিতেও তিনি নিষ্ঠার সাথে কাজ করে গেছেন। তাঁর সম্পর্কে খোকা রায় লিখেছেন, বিশ্ববিদ্যালয়ের লেখাপড়া বা ভালো ক্যারিয়ারের কথা না ভেবে আত্মগোপনের জীবন বেছে নিয়ে সাধারণ জনগণের অধিকার প্রতিষ্ঠায় কাজ করেছেন। পূর্ব-বাংলার বুদ্ধিজীবীদের থেকে কমিউনিস্ট পার্টি যে কয়েকজন কর্মী পেয়েছিল, শহীদুল্লা কায়সার তাদের মধ্যে একজন সেরা কর্মী ছিলেন। (*সংবাদ*, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩, পৃ. ৯) বাম রাজনীতির মোড় ঘুরিয়ে দেন তিনি (আলী, ১০ই জুন ২০২৪)। ভাষা আন্দোলনে সাধারণ জনগণকে যুক্ত করতে না পারলে আন্দোলন সফল হবে না এই উপলব্ধি থেকে ভাষা আন্দোলনে শ্রমিকদের সমর্থন আদায়ের উদ্দেশ্যে ঢাকেশ্বরী কটন মিলে শ্রমিকদের মধ্যে প্রচার অভিযান চালাতে গেলে শহীদুল্লা কায়সার-সহ ৭/৮ জন ছাত্রকর্মীকে পুলিশ থানায় ধরে নিয়ে যায়। মুহাম্মদ তকিয়্যুল্লাহর স্মৃতিচারণ থেকে জানা যায়, ১৯৪৯ সালের মার্চ মাসের দিকে তিনি, শহীদুল্লা কায়সার, আনোয়ারুল আজিমসহ কয়েকজন ঢাকেশ্বরী কটন মিলে যান। তাদের উদ্দেশ্য ছিল শ্রমিকদের মধ্যে ভাষা আন্দোলনের চেতনা জাগ্রত করা। মিল মালিকরা তাদের সাথে ভালো ব্যবহারই করেছিলেন। শ্রমিকদের সাথে রাত প্রায় ১০টা পর্যন্ত মিটিং করে তারা। রাত হয়ে যাওয়াতে মিল মালিকরা তাদেরকে মিলের লঞ্চে যেতে বলেন। দু'একজন শ্রমিক গোপনে এসে তাদেরকে খবর দেয় তারা যেন লঞ্চে না যায়, সেখানে পুলিশ অপেক্ষা করছে। কিন্তু তারা বিশ্বাস করতে পারেনি মিল মালিকরা পুলিশে খবর দিবে। তারা লঞ্চঘাটে যাওয়ার সাথে সাথে পুলিশ তাদের ধরে ফেলে এবং থানায় নিয়ে যায়। থানায় নেওয়ার পর পুলিশ পরিচয়

জানতে পারে যে তারা ভদ্রঘরের ছেলে। মিল কর্তৃপক্ষ পুলিশকে খবর দিয়েছিল মিলের ভেতরে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির উদ্দেশ্যে তারা গিয়েছিল। পুলিশ বুঝতে পারে তারা খারাপ লোক নন, ছাত্র। থানায় সারারাত শহীদুল্লা কায়সারসহ সকলে মিলে তাস খেলে পার করেন। পরের দিন এসডিও-এর সাথে তারা দেখা করে এবং আনোয়ারুল আজিম পূর্ব পরিচিত হওয়ায় পুলিশের এসডিও তাদেরকে ভালো আপ্যায়ন করে ছেড়ে দেয় (বাংলা একাডেমী, ১৯৮১, পৃ. ৩৫-৩৭)। ভাষা আন্দোলনের সময় অনেকেই বাংলাকে একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার দাবি তোলে। শাসকদের চরম বাঙালি বিদ্বেষ মনোভাবের কারণেই বাঙালি ছাত্র-যুবকদের মধ্যে উর্দু-বিদ্বেষী চিন্তার প্রকাশ দেখা যায়। ছোটো-বড়ো সব জাতির সমান অধিকার থাকবে, নিজ নিজ ভাষার পূর্ণ অধিকার থাকবে সে-সময় সে-কথা বোঝানো প্রায় অসম্ভব ছিল। আত্মগোপনে থাকা অবস্থায় বিপদের ঝুঁকি নিয়েও শহীদুল্লা কায়সার এই অসম্ভব কাজকে সম্ভব করেছিলেন। দিন-রাত সবার সাথে আলোচনা, আন্তরিক ব্যবহার ও সবিনয় যুক্তি দিয়ে তিনি ভাষা আন্দোলনের কর্মীদের তাঁর যুক্তির পক্ষে আনতে সমর্থ হন। শহীদুল্লা কায়সার দক্ষতার সাথে বোঝাতে সক্ষম হন যে বাংলাকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা দাবি করলে ভাষা আন্দোলন জাত্যাভিমানের পথে চলে যাবে।[৪] ফলে ভাষা আন্দোলনের মূল স্লোগান 'পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' পরিবর্তিত হয়ে হলো 'পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা বাংলা চাই' (*সংবাদ*, ১৪ই ডিসেম্বর ১৯৭২, পৃ. ১-২)। ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের সময়ে ছাত্রদের সাথে কমিউনিস্ট পার্টির যোগাযোগ রক্ষা করতেন শহীদুল্লা কায়সার (চৌধুরী, ১লা অক্টোবর, ২০২৪)। কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে তিনি ছাত্র আন্দোলনে পার্টি কর্মীদের পরিচালনা করতেন ও নির্দেশ দিতেন। সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির বেশ কয়েকজন সদস্য ছিলেন কমিউনিস্ট পার্টির সদস্য। তাদের মাধ্যমে শহীদুল্লা কায়সার ভাষা আন্দোলন সম্পর্কে পার্টির সিদ্ধান্ত বাস্তবায়ন করার চেষ্টা করতেন। তারা পার্টির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশমতো সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সভায় মতামত প্রকাশ করতেন। এক্ষেত্রে ১৯৫২ সালের ২০শে ফেব্রুয়ারি কমিটির বৈঠকের কথা উল্লেখ করা যেতে পারে। এদিন মূল আলোচনা ছিল ২১শে ফেব্রুয়ারি ১৪৪ ধারা জারির পরিপ্রেক্ষিতে পরবর্তী করণীয় নির্ধারণ। ১৪৪ ধারা ভঙ্গের ব্যাপারে কমিউনিস্ট পার্টির সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ সম্পর্কে শহীদুল্লা কায়সার বদরুদ্দীন উমরকে জানিয়েছেন, কমিউনিস্ট পার্টির ৫ সদস্য তোয়াহা, অলি আহাদ, দেওয়ান মাহবুব আলী, সামাদ ও তকিউল্লাহর কাছে পার্টির নির্দেশ ছিল ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য সভায় চাপ প্রয়োগ করা। তবে যদি কমিটির অন্যান্য সদস্যদের এ ব্যাপারে রাজি করানো না যায় তাহলে সংখ্যাগরিষ্ঠের সিদ্ধান্ত মেনে নিতে বলা হয়। সভার কিছুক্ষণের মধ্যেই জানা যায় অধিকাংশই ১৪৪ ধারা ভঙ্গ করার বিপক্ষে। তখন কমিউনিস্ট পার্টি দ্রুত জরুরি বৈঠক করে সিদ্ধান্ত নেয় যে, সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির মধ্যে কমিউনিস্ট পার্টি কোনো অবস্থাতেই ভাঙন ঘটতে দিবে না। কোনো চরমপন্থাকে উৎসাহিত করলে সেটি সরকারের জন্য সুবিধাজনক হতে পারে। তাই পার্টির সদস্যদের কাছে নির্দেশ পৌঁছায় তারা যেন ১৪৪ ধারা ভঙ্গের জন্য চাপ সৃষ্টি না করে। এছাড়া সদস্যরা যেন সভায় তুলে ধরে যে-কোন জরুরি অবস্থার ফলে আগামী সাধারণ নির্বাচন স্থগিত হয়ে যেতে পারে এবং নির্বাচন স্থগিত হয়ে গেলে সেটি পূর্ব-বাংলার গণতান্ত্রিক জীবনে বড়ো ধরনের বিপত্তি ডেকে আনবে (উমর, ১৯৮৪, পৃ. ২৫৮-২৫৯)। ভাষা আন্দোলনের অন্যতম কর্মী মোহাম্মদ সুলতান তাঁর স্মৃতিচারণে উল্লেখ করেছেন, শহীদুল্লা কায়সার এবং মোহাম্মদ তোয়াহা বলেছিলেন ১৪৪ ধারা ভাঙা ঠিক হবে না বলে কমিউনিস্ট পার্টি মনে করে। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্ররা যদি ১৪৪ ধারা ভাঙার সিদ্ধান্ত নেয় সেই সিদ্ধান্ত মেনে যেন সত্যাগ্রহীর আকারে পালন করে। অর্থাৎ, ১০/১১ জনের দল করে একে একে বিশ্ববিদ্যালয় থেকে যেন বের হয়। আন্দোলন যাতে বিশৃঙ্খল না হয়ে সেজন্য এই প্রস্তাব করা হয়েছিল (কমিউনিস্ট পার্টি, ১৯৮৯, পৃ. ভূমিকা)।

এ প্রসঙ্গে আহমদ রফিক লিখেছেন, ২০শে ফেব্রুয়ারি সন্ধ্যায় কমিউনিস্ট পার্টির ছাত্রফ্রন্টের দায়িত্বে থাকা নেতা শহীদুল্লা কায়সার মেডিকেল হোস্টেলে আহমদ রফিকের কক্ষে গিয়েছিলেন ১৪৪ ধারা অমান্য করা সম্পর্কে ছাত্রদের অভিমত জানতে। একই উদ্দেশ্যে শহীদুল্লা কায়সার ঢাকা হল এবং ফজলুল হক হলেও গিয়েছিলেন। কারণ কমিউনিস্ট পার্টি সর্বদলীয় পরিষদের মধ্যে মতভেদ ও বিভক্তির পক্ষে ছিল না। যে-কারণে সংগ্রাম পরিষদের বৈঠকে মোহাম্মদ তোয়াহা ভোটদানে বিরত থাকেন। কিন্তু ছাত্রসমাজের মনোভাব যাচাই-এর পর তাদের মত পাল্টায়। মেডিকেল হোস্টেল, ঢাকা হল, এফএইচ হল, জগন্নাথ কলেজের ছাত্ররা ১৪৪ ধারা ভাঙতে প্রস্তুত এ বিষয়ে নিশ্চিত হয়ে শহীদুল্লা কায়সার বেরিয়ে যান। কিন্তু রাতের সভায় মোহাম্মদ তোয়াহার কাছে কমিউনিস্ট পার্টির কোনো নির্দেশ যায়নি। আহমদ রফিকের মতে, এর কারণ হতে পারে সেদিন রাত পর্যন্ত তারা কোনো সিদ্ধান্তে পৌঁছাতে পারেনি। আওয়ামী লীগসহ অন্যান্য রাজনৈতিক দলের প্রতিনিধিরা যেখানে ১৪৪ ধারা ভাঙার বিরুদ্ধে ছিল, সেখানে কমিউনিস্ট পার্টির মতো আত্মগোপনকারী দলের পক্ষে সিদ্ধান্ত নেওয়া কঠিন হয়ে যায়। শহীদুল্লা কায়সারের ছাত্রাবাসে গিয়ে ছাত্রদের মতামত যাচাই করা থেকে তা বোঝা যায়। তারা সাধারণ ছাত্রদের মতামতের ওপর বিষয়টা ছেড়ে দিয়েছিলেন (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৮২-৮৪)। ভাষা আন্দোলনের সময়ে ঢাকা মেডিকেল কলেজের হোস্টেল ব্যারাকে আত্মগোপনে থেকে শহীদুল্লা কায়সার পার্টির পক্ষ থেকে আন্দোলন পরিচালনায় ভূমিকা রেখেছেন (কমিউনিস্ট পাটি, ১৯৮৯, পৃ. ভূমিকা)। ভাষা আন্দোলনের সময় তাঁর ডাকনাম ছিল তালেব ভাই। আত্মগোপনে থাকা কমিউনিস্ট নেতা হওয়ায় ২১শে ফেব্রুয়ারি মিছিলে তিনি যোগ দিতে পারেননি। তবে ২১শে ফেব্রুয়ারি বিকেলে তিনি মেডিকেল ব্যারাক প্রাঙ্গণে ছাত্রজমায়েতের পরবর্তী করণীয় কী সে সম্পর্কে বক্তৃতা করেছেন। পরবর্তী দুই/তিনদিন হোস্টেলেই থেকেছেন এবং নেতৃবৃন্দের সাথে যোগাযোগ রক্ষা, ছাত্রকর্মীদের সঙ্গে কথা বলেছেন (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৮৬-৯২)।

১৯৫২ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি ছাত্র-জনতার উপর পুলিশের গুলিবর্ষণের পর মেডিকেল কলেজ হোস্টেলে 'নিয়ন্ত্রণ কক্ষ' স্থাপন করা হয়। সেখানে থেকে ছাত্রনেতারা মাইকে বক্তৃতা দিতে থাকেন এবং বিভিন্ন বিষয়ে জনগণকে নির্দেশ দেন। আত্মগোপনকারী কমিউনিস্ট কর্মী শহীদুল্লা কায়সারও এদিন অন্যান্যদের সাথে বক্তৃতা দেন (উমর, ১৯৮৪, পৃ. ৩০৭)। রফিকুল ইসলাম সে-দিনের স্মৃতিচারণ করে লিখেছেন, "...একুশে বিকেলে মেডিক্যাল হোস্টেল নিয়ন্ত্রণ কক্ষের মাইক্রোফোনে কণ্ঠ শোনা যায় ছাত্র নেতাদের এবং দীর্ঘদিন আত্মগোপনকারী রাজনৈতিক কর্মী শহীদুল্লাহ্ কায়সারের..." (ইসলাম, ১৯৮২, পৃ. ৩০)। গুলি বর্ষণের পরে সে-দিনই শহীদুল্লা কায়সার, অলি আহাদ, তোয়াহা, খন্দকার গোলাম মোস্তফা, মাহবুর জামাল জাহেদী, কবিরউদ্দীন আহমদ, কমরুদ্দীন আহমদ সহ আরো কয়েকজন ইঞ্জিনিয়ারিং কলেজে একটি বৈঠক করেন। বৈঠকে একটি ছাত্র-সংগ্রাম কমিটি গঠনের সিদ্ধান্ত হয়। এই সিদ্ধান্ত অনুযায়ী সেদিন রাতেই গোলাম মাওলাকে আহ্বায়ক করে একটি নতুন সংগ্রাম কমিটি গঠিত হয়। এছাড়া বৈঠকে তহবিল, মাইক্রোফোন ক্রয়, লিফলেট ছাপা ইত্যাদি বিষয়েও আলোচনা হয় (উমর, ১৯৮৪, পৃ. ৩০৯-৩১০)। নানা কারণে স্তিমিত ভাষা আন্দোলনকে পুনরুজ্জীবিত করার উদ্দেশ্যে ৯ই মার্চ [৫] শান্তিনগরে ছাত্রযুব নেতৃত্বের বৈঠকের উদ্যোগ নেওয়া হয়। এই উদ্যোগ নিয়েছিল কমিউনিস্ট পার্টি এবং বৈঠকে সব মতাদর্শের নেতাদের ডাকা হয়েছিল (রফিক, ২০১৭, পৃ. ৮৭)। তবে বদরুদ্দীন উমর এই বৈঠক সম্পর্কে লিখেছেন, ৭ই মার্চ সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম কমিটির সভা আহ্বান করা হয় শান্তিনগরে একজন চিকিৎসকের বাসায়। এই বৈঠকের গোপনীয়তা রক্ষার সর্বোচ্চ চেষ্টা করা হয়। কারণ ইতোমধ্যে ভাষা আন্দোলনের গুরুত্বপূর্ণ নেতৃবৃন্দের নামে গ্রেফতারি

পরোয়ানা জারি হয়েছে। আত্মগোপনকৃত অনেক নেতা গোপনে বৈঠক করবেন তাই সংগঠকরা যথেষ্ঠ সতর্ক ছিলেন। শহীদুল্লা কায়সার কমিউনিস্ট পার্টির কেন্দ্রীয় কমিটির সদস্য ছিলেন। ৭ই মার্চের বৈঠকটি শহীদুল্লা কায়সার ডাকতে চাইলে প্রথমে কর্মীরা কিছুটা আপত্তি করলেও শেষ পর্যন্ত বৈঠকের সিদ্ধান্ত হয়। যেহেতু শহীদুল্লা কায়সার কমিউনিস্ট পার্টির পক্ষ থেকে ভাষা আন্দোলনের সংগ্রাম কমিটির নেতৃবৃন্দদের (যারা কমিউনিস্ট পার্টির সাথে যুক্ত ছিলেন) সাথে যোগাযোগ রাখতেন এবং পার্টির পক্ষ থেকে প্রয়োজনীয় নির্দেশ দিতেন, তাই কমিটির সদস্য না হয়েও ৭ই মার্চের বৈঠকে যোগ দেওয়ার উদ্দেশ্যে তিনি শান্তিনগরে গিয়েছিলেন। মাহবুব জামাল জাহেদীকে সাথে নিয়ে তিনি নির্ধারিত স্থানে রওয়ানা হন। নির্ধারিত বাড়িতে ঢোকার আগে তিনি জাহেদীকে নির্দেশ দেন বাড়ির ভেতরে গিয়ে দেখে আসতে বৈঠকে কোনো বাইরের লোক আছে কি না। যেহেতু তিনি আত্মগোপনে ছিলেন তাই অপরিচিতদের সামনে নিজের পরিচয় প্রকাশ করতে তাঁর অসুবিধা ছিলো। শহীদুল্লা কায়সার দূরে দাঁড়িয়ে ছিলেন, জাহেদী বাড়ির কাছে গিয়ে দেখেন বাড়িটি পুলিশ ঘেরাও করতে চলেছে। ফলে তারা দ্রুত এলাকা ছেড়ে চলে যান। সেদিন পুলিশ বাড়িটি ঘেরাও করে সংগ্রাম কমিটির সদস্যদের গ্রেফতার করেছিল। তবে মাহবুব জামাল জাহেদী এ প্রসঙ্গে বলেছেন, তিনি ঐদিন শহীদুল্লা কায়সারের সাথে শান্তিনগর এলাকায় যাননি। উভয়ের বিবরণ একেবারে ভিন্ন হওয়ায় বদরুদ্দীন উমর লিখেছেন, শহীদুল্লা কায়সারের সেদিনের বিস্তৃত বিবরণ থেকে মনে হয় তিনি হয়তো অন্য কারো সাথে সেখানে গিয়েছিলেন। স্মৃতিভ্রমের কারণে সেই কর্মীর নাম মনে করতে না পেরে তাকে জামাল জাহেদী বলে ভুল করেছেন। আবার মাহবুব জামাল জাহেদীরও স্মৃতিভ্রম হতে পারে বলে তিনি উল্লেখ করেছেন (উমর, ১৯৮৪, পৃ. ৪৪৩-৪৪৮)। মোহাম্মদ তোয়াহা, অলি আহাদসহ ভাষা সংগ্রাম পরিষদের সদস্যরা গ্রেফতার হয়ে যাওয়াতে ভাষা আন্দোলন ক্রমে স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল (রায়, ১৯৮৬, পৃ. ১১৯)। ভাষা আন্দোলনের সক্রিয় কর্মীরা গ্রেফতার হয়ে যাওয়ায় সংগ্রাম কমিটি পুনর্গঠন করা হয়েছিল। তারা আন্দোলনেকে এগিয়ে নিয়ে যায়। তবে এ-সময় ভাষা আন্দোলনের ক্ষেত্রে ঢাকার বাইরে যথেষ্ঠ তৎপরতা অব্যাহত ছিল (উমর, ১৯৮৪, পৃ. ৪৫৬)। শহীদুল্লা কায়সার ১৯৫২ সালের ৩রা জুন তিনি গ্রেফতার হন। (*বাংলাপিডিয়া*) ভাষার দাবিতে সভা, বক্তৃতা, বিবৃতি অব্যাহত থাকে। সেই সাথে রাজবন্দিদের মুক্তির দাবিও উচ্চারিত হতে থাকে।[৬] সারাদেশে ১৯৫৩ সাল থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'শহীদ দিবস' হিসাবে পালন করা শুরু হয়। ১৯৫৬ সালের ২৯শে ফেব্রুয়ারি পাকিস্তান গণপরিষদে পাকিস্তানের প্রথম সংবিধান গৃহীত হয়। সেই সংবিধানে বাংলাকে পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয় (সিদ্দিকী, ২০০৬, পৃ. ৩১৫-৩১৬)। শহীদুল্লা কায়সার মনে করতেন, সরকার যতই জনপ্রিয় কিংবা শক্তিশালী হোক, জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা পরিপন্থী নীতি দীর্ঘদিন চালু রাখা যায় না। এর প্রমাণ উর্দুকে পাকিস্তানের একমাত্র রাষ্ট্রভাষা করার একগুয়েমি কার্যক্রমের ব্যর্থতা (*সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, পৃ. ১)।

একুশের চেতনা ও শহীদুল্লা কায়সার

ইতালীয় মার্কসবাদী দার্শনিক এবং তাত্ত্বিক আন্তোনিও গ্রামসির 'বুদ্ধিজীবী' ধারণার নিরিখে শহীদুল্লা কায়সার একজন প্রকৃত সৃষ্টিশীল বা অর্গানিক বুদ্ধিজীবী। গ্রামসি মনে করেন, অর্গানিক বুদ্ধিজীবী কেবল পেশাদার জ্ঞানচর্চা করেন না, বরং তিনি সমাজের নিচু তলার সঙ্গে সংযোগ স্থাপন করে রাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক নেতৃত্ব দেন (Gramsci, 1971, pp. 9-12)। শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন সাংবাদিক, সাহিত্যিক ও রাজনৈতিক কর্মী। তাঁর লেখনীতে শ্রমিক, কৃষক, নারীর অধিকার, সামন্তবাদ ও ঔপনিবেশিক রাষ্ট্রব্যবস্থার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ দেখা যায়। তিনি ছিলেন শ্রমজীবী, মধ্যবিত্ত ও নিপীড়িত মানুষের কণ্ঠস্বর। তিনি জনগণের পক্ষে

অবস্থান নিয়েছেন, নিপীড়িতের ভাষা হয়েছেন এবং জাতির চেতনার নির্মাণে আত্মোৎসর্গ করেছেন। শহীদুল্লা কায়সার ছিলেন একজন প্রগতিশীল কমিউনিস্ট চিন্তাবিদ ও রাজনীতিক। মার্কসবাদী ভাবধারায় উদ্‌বুদ্ধ হয়ে তিনি মানবমুক্তি, শ্রেণিহীন সমাজ, সাম্য এবং শোষণমুক্ত বিশ্বের স্বপ্ন দেখতেন। একজন কমিউনিস্ট হয়েও তিনি বাঙালি জাতীয়তাবাদী আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছেন, কারণ তিনি উপলব্ধি করেছিলেন বাঙালির জাতিগত মুক্তি আন্দোলন প্রকৃতপক্ষে শ্রেণি-নিপীড়নের বিরুদ্ধেই এক ধরনের সংগ্রাম। তিনি বিশ্বাস করতেন, মানুষের মুক্তির সংগ্রাম কেবল অর্থনৈতিক শোষণ-বিরোধী লড়াই নয় বরং একটি সাংস্কৃতিক ও রাজনৈতিক আন্দোলনও বটে।

শহীদুল্লা কায়সার মনে করেন ভাষা আন্দোলনের মাধ্যমেই প্রথমবার পূর্ব-বাংলার জনগণের পুঞ্জীভূত ক্ষোভের বিস্ফোরণ হয়েছিল। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারিকে একটি বিস্ফোরণের দিন এবং গণতান্ত্রিক আন্দোলনের সূচনা হিসেবে উল্লেখ করেছেন (*সংবাদ*, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫, পৃ. ৬)। তিনি লিখেছেন, একুশ আমাদের ঐক্যের শিক্ষা দেয়। পাকিস্তান প্রতিষ্ঠার পর দেশের জনগণের আশা-আকাঙ্ক্ষা বিলীন করে দিয়ে সাম্রাজ্যবাদ, সামন্তবাদ ও আমলাতন্ত্রের সমন্বয়ে যে ত্রিশক্তির আঁতাত হয়, সেই আঁতাতের উপর প্রথম আঘাত হচ্ছে মহান একুশে ফেব্রুয়ারি (*সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, পৃ. ৮)। তিনি একুশে ফেব্রুয়ারিকে আগামী দিনের সংকল্প গ্রহণের সুবর্ণ মুহূর্ত হিসেবে উল্লেখ করেছেন। তাঁর মতে শাসকগোষ্ঠী একুশে ফেব্রুয়ারি আন্দোলনের বিরুদ্ধে ধ্বংসাত্মক ও বিচ্ছিন্নতামুখী চিন্তার অভিযোগ এনেছিল সেটি ছিল মিথ্যা অভিযোগ যা পরবর্তী ঘটনাবলি প্রমাণ করে। তাঁর কাছে "একুশের চেতনা ছিল গঠনমুখী এবং সমান অধিকারের ভিত্তিতে পাকিস্তানের সকল ভাষাভাষীর সৌভ্রাতৃত্ব সৃষ্টির প্রয়াসী" (*সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, পৃ. ৪)। একুশের সংগ্রামে প্রগতিশীল শক্তিগুলো ঐক্যবদ্ধ হয়েছিল। একুশের সংগ্রামে ছিল না কোনো সংকীর্ণ চিন্তা। বাংলা ভাষার ন্যায্য অধিকারের পাশাপাশি সকল ভাষার স্বাভাবিক স্ফুরণের দাবি করা হয়েছিল। ভাষা আন্দোলন যেমন ছিল সংকীর্ণতা-মুক্ত, তেমনি ভাষাগত অভিমানও ছিল না। ফলে শাসকগোষ্ঠী বাঙালি-অবাঙালি প্রশ্ন তুলে আন্দোলনে চিড় ধরাতে পারেনি (*সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০, পৃ. ১)। ১৯৬৪ সালে এক সভায় শহীদুল্লা কায়সার বলেছিলেন, "একুশে ফেব্রুয়ারি'র মহান আত্মত্যাগের মাধ্যমে প্রমাণিত হইয়াছে যে, বাংলা ভাষার কোমলতাই আর শ্যামলিমাই একমাত্র বৈশিষ্ট্য নহে বাংলা একটি অগ্নি স্ফুলিংগ" (*সংবাদ*, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪, পৃ. ৬)। তিনি নিরানন্দ, যন্ত্রণাময়, ভয়ার্ত জীবনে একুশের ভোরকে উজ্জল, রক্তিম, প্রসন্ন প্রহর হিসেবে উল্লেখ করেছেন। (*সংবাদ*, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯, পৃ. ৪)। ১৯৬৮ সালের ২১শে ফেব্রুয়ারি *সংবাদ* পত্রিকার বিশেষ 'শহীদ দিবস' সংখ্যায় 'তোমাদের জন্যে' শিরোনামে একটি কবিতা লেখেন শহীদুল্লা কায়সার। এই কবিতাটি তিনি ভাষা শহীদদের উদ্দেশ্যে লিখেছেন। ভাষা শহীদদের আত্মদান বাঙালির জন্য গৌরবের, তাই তাদের জন্য কান্না পায়না বা আক্ষেপ হয় না বলে তিনি উল্লেখ করেছেন। তিনি লিখেছেন (*সংবাদ*, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮, পৃ. ১):

তোমাদের জন্যই
একটি হৃদয়
সহস্র হৃদয়ে স্পন্দিত
একটি চেতনা
সহস্র বোধনে জাগ্রত
একটি ধ্বনি

অজুত কণ্ঠে উচ্চারিত
একটি মৃত্যু
সহস্য জীবনের অঙ্গীকার
একটি দিন
শতাব্দীর সম্ভার।

টীকা

১. অনিল মুখার্জি লিখেছেন, "ভাষা আন্দোলন নিয়ে অনেকে অনেক কথা লিখেছেন। অনেকের লেখায় এমন একটা ভাব যেন, তারা ইতিহাস রচনা করছেন; কিন্তু ভয়বশতঃই হোক, অথবা সঙ্কীর্ণ চিন্তা হতেই হোক, তাঁরা কেউই প্রায় তাঁদের লেখায় শহীদুল্লার নামও উল্লেখ করেননি। কিন্তু শহীদুল্লাকে বাদ দিয়ে বাহান্ন সালের ভাষা আন্দোলন সম্বন্ধে কিছু বলা কতকটা রামকে বাদ দিয়ে রামায়ণ বর্ণনার মতো।" বিস্তারিত, *সংবাদ* (১৪ ডিসেম্বর ১৯৭২)। শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি সংখ্যা, পৃ. ১-২

২. এমনি একটি উদাহরণ পাওয়া যায় পান্না কায়সারের লেখায়। একদিন শহীদুল্লা কায়সারের পিতা মাওলানা হাবীবুল্লাহ্ কাচারি ঘরে চেয়ারে বসে দুজন চাষির সাথে কথা বলছিলেন জমিজমা সংক্রান্ত বিষয়ে। চাষি দুজন তাঁর পিতার চেয়ারের পাশে মাটিতে হাঁটু গেড়ে কথা বলছিল। শহীদুল্লা কায়সার পাশেই কিছু একটা নিয়ে ব্যস্ত ছিলেন। হঠাৎ যখন তিনি দেখেন চাষি দুজন হাঁটু গেড়ে বসে কথা বলছে তখন তিনি দূরে রাখা টুল টেনে নিয়ে গিয়ে চাষিদের বসতে বলেন। চাষিরা ছোট কায়সারকে বুকে জড়িয়ে ধরে। শহীদুল্লা কায়সার বলতেই থাকেন আপনারা টুলে বসুন, মাটিতে বসলে ঠান্ডা লেগে যাবে। বিস্তারিত, কায়সার, পান্না (২০২০), *একাত্তরের শহীদ শহীদুল্লা কায়সার*, ঢাকা: আগামী প্রকাশনী, পৃ. ৩৭

৩. শহীদুল্লা কায়সার কমিউনিস্ট পার্টির অন্যতম নেতা ছিলেন। ১৯৫১ সালের মাঝামাঝি কমিউনিস্ট পার্টির প্রাদেশিক কমিটির বর্ধিত পূর্ণাঙ্গ বৈঠক অনুষ্ঠিত হয়। সেই বৈঠকে প্রায় ৩০ জন আন্ডারগ্রাউন্ড নেতা উপস্থিত ছিলেন। বৈঠকে ৯ সদস্য বিশিষ্ট প্রাদেশিক কমিটি গঠিত হয়, ৯ জন সদস্যের মধ্যে একজন ছিলেন শহীদুল্লা কায়সার। বিস্তারিত, রায়, খোকা (১৯৮৬) *সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৬৮)*, ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী, পৃ. ১০৬-১০৮

৪. তাঁর দক্ষতার কারণে সর্বদলীয় সংগ্রাম কমিটির সবাইকে এবিষয়ে সঠিকভাবে বোঝানো সম্ভব হয় এবং সংগ্রাম কমিটির ঐক্য রক্ষা করা সম্ভব হয়। বিস্তারিত, *সংবাদ*, শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর ১৯৭৩, পৃ. ৯-১০

৫. আহমদ রফিক বৈঠকের তারিখ ৯ই মার্চ উল্লেখ করছেন। তবে বদরুদ্দীন উমর এই বৈঠকের তারিখ উল্লেখ করেছেন ৭ই মার্চ

৬. শহীদুল্লা কায়সার ১৯৫৫ সালে মুক্তি পাওয়ার কিছুদিনের মধ্যে পুনরায় গ্রেফতার হন এবং ১৯৫৬ সালে মুক্তি পান। ১৯৫৮ সালের ১৪ই অক্টোবর সামরিক শাসক কর্তৃক তিনি পুনরায় গ্রেফতার হন এবং প্রায় চার বছর কারাভোগের পর ১৯৬২ সালে মুক্তি লাভ করেন। বিস্তারিত, বড়ুয়া, সুব্রত (১৯৮৮) *শহীদুল্লা কায়সার (জীবনী গ্রন্থমালা ১৯)*, ঢাকা: বাংলা একাডেমি, পৃ. ২৯-৩১

তথ্যসূত্র

মুকুল, আখতার (সম্পা.)। *বাহান্নর ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশার্স।

ইসলাম, রফিকুল (১৯৮২)। *ভাষা আন্দোলন ও শহীদ মিনার*। ঢাকা: আনন্দ প্রকাশনী।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৭০)। *পূর্ব বাংলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ১ম খণ্ড। কলকাতা: আনন্দধারা প্রকাশন।

উমর, বদরুদ্দীন (১৯৮৪)। *পূর্ব বাঙলার ভাষা আন্দোলন ও তৎকালীন রাজনীতি*, ৩য় খণ্ড। ঢাকা: বইঘর।

কমিউনিস্ট পার্টি, বাংলাদেশ (১৯৮৯)। *ভাষা আন্দোলনের দলিল সংকলন*। ঢাকা: বাংলাদেশের কমিউনিস্ট পার্টি।

কায়সার, পান্না (২০১৯)। *মুক্তিযুদ্ধ: আগে ও পরে*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

কায়সার, পান্না (২০২০)। *একাত্তরের শহীদ শহীদুল্লা কায়সার*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

কায়সার, শহীদুল্লা (২০০০)। *সংশপ্তক*। ঢাকা: জোনাকী প্রকাশনী।

কায়সার, শহীদুল্লা। *বাংলাপিডিয়া*। https://en.banglapedia.org/index.php/Kaiser,_Shahidullah

চৌধুরী, শামীমা (২০১৫)। শহীদুল্লা কায়সার ও মো. শাহ আলমগীর (সম্পা.), *বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধে শহীদ সাংবাদিক*। ঢাকা: বাংলাদেশ প্রেস ইনস্টিটিউট।

নাঈম, আলী মো. আবু ও লাভা, ফাহিমা কানিজ (২০১৯)। *শহীদ বুদ্ধিজীবী কোষ*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

বড়ুয়া, সুব্রত (১৯৮৮)। *শহীদুল্লা কায়সার (জীবনী গ্রন্থমালা ১৯)*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

বাংলা একাডেমী (সম্পা.) (১৯৮১)। *একুশের সংকলন ১৯৮১: স্মৃতিচারণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমী।

মুকুল, এম আর আখতার (১৩৯১)। 'ভাষা আন্দোলনের পটভূমি এবং রক্তাক্ত একুশের ঘটনাপঞ্জি'। গাজীউল হক ও এম আর অনিল মুখার্জি [সম্পা.]। *স্বাধীন বাংলাদেশ সংগ্রামের পটভূমি*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

মতিন, আবদুল (১৯৮৬)। *ভাষা ও একুশের আন্দোলন*। ঢাকা: নন্দন প্রকাশন।

রফিক, আহমদ (২০১৭)। *ভাষা-আন্দোলনে ইতিহাস বিকৃতি: তমদ্দুন মজলিশ ও কমিউনিস্ট পার্টি*। ঢাকা: বিপ্লবীদের কথা প্রকাশনা।

রায়, খোকা (১৯৮৬)। *সংগ্রামের তিন দশক (১৯৩৮-১৯৬৮)*। ঢাকা: জাতীয় সাহিত্য প্রকাশনী।

সাদিয়া, সুপা (২০২১)। *মুক্তিযুদ্ধে শত শহিদ বুদ্ধিজীবী*। ঢাকা: অবসর প্রকাশনা।

সিদ্দিকী, ড. রেজোয়ান (২০০৬)। *পূর্ব বাংলার সাংস্কৃতিক সংগঠন ও সাংস্কৃতিক আন্দোলন (১৯৪৭-১৯৭১)*। ঢাকা: জ্ঞান বিতরণী।

হক, গাজীউল (১৩৯১)। 'একুশের স্মৃতিচারণ'। গাজীউল হক ও এম আর আখতার মুকুল (সম্পা.)। *বাহান্নর ভাষা আন্দোলন*। ঢাকা: হাক্কানী পাবলিশাস।

হেলাল, বশীর আল্ (১৯৯৯)। *ভাষা আন্দোলনের ইতিহাস*। ঢাকা: আগামী প্রকাশনী।

পত্রিকা

সংবাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৪।

সংবাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৫।

সংবাদ, শহীদ দিবস সংখ্যা, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৮।

সংবাদ, ২২শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৬৯।

সংবাদ, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০।

সংবাদ, শহীদ দিবস সংখ্যা, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ১৯৭০।

সংবাদ, শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭২।
সংবাদ, শহীদুল্লা কায়সার স্মৃতি সংখ্যা, ১৪ ডিসেম্বর, ১৯৭৩।
সারাবাংলা, ৩রা ফেব্রুয়ারি, ২০২৩। *https://sarabangla.net/post/sb-747979/*

সাক্ষাৎকার

চৌধুরী, সিরাজুল ইসলাম (১লা অক্টোবর, ২০২৪)। সাক্ষাৎকার। স্থান: সেন্টার ফর অ্যাডভান্সড রিসার্চ ইন আর্টস অ্যান্ড সোশ্যাল সায়েন্সেস (CARASS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: সুস্মিতা রানী দাস।

হক, অধ্যাপক আবুল কাসেম ফজলুল (২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪)। সাক্ষাৎকার। স্থান: নিজ বাসভবন, রোড নং-১, পরিবাগ, ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: সুস্মিতা রানী দাস।

আলী, ডা. সারওয়ার (১০ই জুন ২০২৪)। সাক্ষাৎকার। স্থান: ছায়ানট সংস্কৃতি ভবন, রোড নং- ১৫/এ, ধানমন্ডি, ঢাকা। সাক্ষাৎকার গ্রহণকারী: সুস্মিতা রানী দাস।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ও পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা চর্চার ধারা

আনন্দ বিকাশ চাকমা

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookAnanda

পটভূমি

পূর্ব-বাংলার বাঙালিদের মাতৃভাষার মর্যাদা রক্ষার জন্য পরিচালিত বায়ান্ন'র ভাষা আন্দোলন বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের ইতিহাসে একটি গৌরবময় ঘটনা। রাষ্ট্রভাষার দাবিতে এ আন্দোলন সমগ্র জাতিকে প্রথমবার নাড়া দিয়েছিল এবং এ আন্দোলনের ফসল হিসেবে বাংলা ভাষা তৎকালীন পাকিস্তানের অন্যতম রাষ্ট্রভাষা হিসেবে সাংবিধানিক স্বীকৃতি লাভ করে। ১৯৫৬'র সংবিধানের ২১৪ নং অনুচ্ছেদে বলা হয়, 'The State Language of Pakistan should be Urdu and Bengali.' পরে ১৯৬২ সালের সংবিধানেও এ স্বীকৃতি বলবৎ থাকে (Akanda, 2013, p. 149)। বাঙালি জাতির ভাষা ও সংস্কৃতি বিকাশের ক্রমধারায় এটি নিঃসন্দেহে একটি যুগান্তকারী ঐতিহাসিক অর্জন। ভাষা আন্দোলনের জঠর থেকে জন্ম নেয় বাঙালির ভাষা ও সাংস্কৃতিক স্বাজাত্যবোধের চেতনা তথা বাঙালি জাতীয়তাবাদ। চল্লিশের দশকের ধর্মভিত্তিক ও সম্প্রদায়ভিত্তিক মুসলিম জাতীয়তাবাদের বিপরীতে পঞ্চাশের দশকের অসাম্প্রদায়িক ও ভাষাভিত্তিক বাঙালি জাতীয়তাবাদ পূর্ব-বাংলার মানুষের অন্তরে গভীরভাবে রেখাপাত করে। বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের লেখায় এমন অনুভবের ছাপ স্পষ্ট। এ. এফ. সালাহ্উদ্দীন আহমেদ লিখেছেন:

> পাকিস্তানের অবাঙালি শাসকরা যখন বাঙালিদের ওপর ইসলাম ও জাতীয় সংহতির নামে উর্দু ভাষা ভাষা চাপিয়ে দিয়ে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতিকে ধ্বংস করার চক্রান্তে লিপ্ত হলো তখনই শুরু হয়েছিল আমাদের ঐতিহাসিক ভাষা আন্দোলন। এই ভাষা আন্দোলনের সূত্র ধরেই বাঙালিরা তাদের সুমহান সাংস্কৃতিক ঐতিহ্যকে পুনরুদ্ধার করার সংগ্রামে অবতীর্ণ হলো। এই সংগ্রাম প্রথমে আত্মনিয়ন্ত্রণ ও স্বায়ত্তশাসন প্রতিষ্ঠার আন্দোলন এবং পরিশেষে স্বাধীনতা যুদ্ধে পরিণতি লাভ করলো (আহ্মদ, ২০১৬, পৃ. ৯৬)।

বাঙালির সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য ও স্বাধিকারের চেতনা হলো জাতীয়তাবাদের মূল অভিব্যক্তি। এ চেতনার চরম বহিঃপ্রকাশ ঘটে ১৯৭১-এর মুক্তিযুদ্ধে, যার মাধ্যমে অর্জিত হয় একটি স্বাধীন সার্বভৌম রাষ্ট্র– বাংলাদেশ। স্বাধীনতার পর বাংলাদেশ সরকার সগৌরবে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা হিসেবে গ্রহণ করে নেয়। দেশের সংবিধান রচিত হয় বাংলা ভাষায়। একুশে ফেব্রুয়ারির অবিনাশী চেতনা ও শহিদদের স্মরণে দেশজুড়ে নির্মিত হতে থাকে শহিদ মিনার। মাতৃভাষা বাংলাকে সরকারি অফিস আদালত, প্রচার-মাধ্যম ও শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে মানোন্নয়ন করার প্রক্রিয়াও চলতে থাকে। এরই ধারাবাহিকতায় প্রবাসী বাঙালিরাও একুশের চেতনা দ্বারা শাণিত হয়। তারা বাঙালির মাতৃভাষার জন্য আত্মদানের প্রতীক একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিকভাবে পরিচিত করার উদ্যোগ নেয়। এ লক্ষ্যে বিশ্বসংস্থা জাতিসংঘের সংশ্লিষ্ট অঙ্গসংগঠনের স্বীকৃতির প্রয়োজন অনুভূত হয়। জাতিসংঘের শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংস্থা 'ইউনেস্কো' হলো এর জন্য যথাযথ

প্রতিষ্ঠান। পূর্বাপর ভেবে সকল প্রক্রিয়া মেনে বাঙালির মাতৃভাষা রক্ষার সংগ্রামকে আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃতি প্রদানের জন্য ইউনেস্কো বরাবর প্রস্তাব উত্থাপন করা হয়। অবশেষে ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর আসে সেই ঐতিহাসিক মুহূর্ত। ইউনেস্কোর ৩০তম সম্মেলনে ১৮৮টি সদস্যরাষ্ট্রের প্রতিনিধির ভোটে ঐদিন একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের স্বীকৃতি লাভ করে।

বাংলাভাষার প্রতি বিশ্ববাসীর এরূপ স্বীকৃতিতে সমগ্র দেশবাসী আনন্দিত ও গর্বিত হয়। ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষও এর ব্যতিক্রম নয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের ম্রো জাতিগোষ্ঠীর লেখক সিং ইয়ং ম্রোর বয়ানে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্য অনুধাবন করা যায়। তাঁর মতে, ''বিংশ শতাব্দীর বিদায়ের লগ্নে ২১শে ফেব্রুয়ারি শহীদ দিবস আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস রূপে ঘোষিত হওয়ায় শুধু বাঙালি জাতি নয়, বাংলাদেশে বসবাসরত বিভিন্ন আদিবাসী তথা সারা বিশ্বে ছড়িয়ে ছিটিয়ে থাকা বিভিন্ন ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর মধ্যেও নতুন চেতনার উদয় হয়েছে'' (ম্রো, ২০০৫, পৃ. ৬৯)। এর মধ্য দিয়ে মানব-সভ্যতার উদ্ভব ও বিকাশে জাতিগুলোর স্বকীয় মাতৃভাষার গুরুত্ব ও অপরিহার্যতা নতুনভাবে মান্যতা লাভ করে। এরপর বাংলাদেশসহ বিশ্বব্যাপী দেশে-দেশে পালিত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস। ক্ষুদ্র-বৃহৎ, ধনী-দরিদ্র, স্বাধীন-পরাধীন সকল জাতিগোষ্ঠীর মানুষ মাতৃভাষা রক্ষা, চর্চা ও উন্নয়নের প্রতি যত্নবান হয়। কারণ আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার অন্তর্নিহিত দর্শনটিই হলো পৃথিবীর সকল ভাষার মর্যাদাকে সমুন্নত রাখা এবং প্রত্যেক ভাষাভাষী মানুষ যেন তাদের মাতৃভাষায় আত্মপ্রকাশ এবং জ্ঞান অর্জন করে আত্মবিকাশ ঘটাতে পারে, তার নিশ্চয়তা বিধান করা।

বাংলাদেশের দক্ষিণ-পূর্ব প্রান্তে অবস্থিত একটি নানা বৈচিত্র্যময় জনপদের নাম পার্বত্য চট্টগ্রাম। স্মরণাতীতকাল থেকে এখানে বসবাস করে আসছে দশ ভাষাভাষী ১১টি ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র জাতিসত্তা: চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, খিয়াং, লুসাই, চাক, পাংখোয়া, খুমি, বম। এরা বাংলাদেশের নাগরিক, তবে বাংলা তাদের মাতৃভাষা নয়; শিক্ষার মাধ্যম ও আন্তঃজাতিগোষ্ঠীর মধ্যকার যোগাযোগের ভাষা হিসেবে তারা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। এসব জনগোষ্ঠী ঔপনিবেশিক আমলে পৃথক প্রশাসনিক আইনের অধীন ছিল। কারণ, ঔপনিবেশিক যুগে পার্বত্য চট্টগ্রামের রাজনৈতিক, শাসনতান্ত্রিক ও সাংস্কৃতিক ইতিহাস স্বতন্ত্রধারায় বিকশিত হয়েছিল। পার্বত্য জনপদের অর্থনৈতিক কর্মকাণ্ডও ছিল কেবল জীবনধারণ পর্যায়ের। বাংলাদেশের সমতল এলাকায় যেখানে বাঙালিদের মধ্যে ভাষাগত সমরূপতা বিরাজমান, সেখানে পার্বত্য অঞ্চলে ভাষা-বৈচিত্র্যই যেন নির্ণায়ক সাংস্কৃতিক বৈশিষ্ট্য। এ অঞ্চলের ভৌগোলিক-প্রাকৃতিক সীমারেখা যেমন সহজে চিহ্নিত করা যায়, তেমনি তার নৃতাত্ত্বিক ও সাংস্কৃতিক পরিমণ্ডলের স্বাতন্ত্র্যও সহজে দৃষ্টিগোচর হয়। সংখ্যায় অল্প হলেও প্রত্যেক জাতিগোষ্ঠীর পৃথক পৃথক কথ্যভাষা আছে। তবে নিজস্ব হরফ বা অক্ষরসমেত লেখ্যরূপ অনেক নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষাতে নেই।

আবার তারা ভাষার বিচারেও ভিন্ন ভিন্ন ভাষাপরিবারের অন্তর্ভুক্ত বলে ভাষা-গবেষক ও ভাষাতত্ত্ববিদগণ মত দিয়ে থাকেন। যেমন জনসংখ্যার বিচারে ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মধ্যে বৃহত্তম জাতিসত্তা চাকমা ও তঞ্চঙ্গ্যারা ইন্দো-আর্য ভাষা-পরিবারভুক্ত বলে স্যার জি. এ. গ্রিয়ারসন, সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় প্রমুখ পণ্ডিত চিহ্নিত করেছেন। স্যার গ্রিয়ারসনের এই বর্গীকরণ বাংলাদেশের গবেষকরাও গ্রহণ করেছেন (বিশ্বাস, ২০০৮, পৃ. ১৩)। অন্যদিকে মারমা জাতিসত্তার ভাষা হলো বৃহত্তর চিনা-তিব্বতী ভাষা-পরিবারের অন্তর্গত তিবেতো-বার্মান শাখাভুক্ত। ত্রিপুরা জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষার নাম ককবরক, যা চিনা-তিব্বতি ভাষা-পরিবারের

অন্তর্গত বোড়ো শাখাভুক্ত। অন্যদিকে অপেক্ষাকৃত সংখ্যাল্প জাতিগোষ্ঠী; যেমন বম, লুসাই, পাংখোয়া ও খিয়াং এবং চাক জাতিসত্তার মাতৃভাষা চিনা-তিব্বতি ভাষা পরিবারের উপশাখা কুকি-চীন গোত্রীয় (সিকদার, ২০১১, পৃ. ৯)। চাকমা, মারমা, তঞ্চঙ্গ্যা ও ম্রো ভাষার নিজস্ব বর্ণমালা থাকলেও অন্য জাতিগোষ্ঠীগুলো রোমান হরফে তাদের মাতৃভাষাকে লেখ্যরূপ দেওয়ার প্রয়াস চালাচ্ছে। যেহেতু পার্বত্য অঞ্চল জাতীয়তা, ভাষা ও সংস্কৃতির বিচারে একটি স্বতন্ত্র অঞ্চল হিসেবেই গড়ে উঠেছিল, সেহেতু দু'একটি জাতিগোষ্ঠী; বিশেষ করে চাকমা ও ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী ছাড়া অন্যান্য ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর সাথে সমতলের সংখ্যাগরিষ্ঠ বাঙালি মানুষ ও সমাজের সাথে ভাব ও সাংস্কৃতিক আদান-প্রদানের পরিসরটা ছিল খুবই সীমিত। ভাষা-গবেষক অশোক বিশ্বাসও একই সিদ্ধান্তে এসেছেন যে, ''চাকমা, হাজং, বিষ্ণুপ্রিয়া মণিপুরি, ত্রিপুরা ও বোড়ো ভাষাগুলো ছাড়া কুকি-চীন গোত্রীয় অন্যান্য শাখার ভাষার সাথে বাংলার তেমন যোগাযোগ বা সম্পর্ক কখনো তেমনটা গড়ে ওঠেনি'' (বিশ্বাস, ২০০৮, পৃ. ১৭৭)। তাই এসব ভাষার মানুষের মধ্যে পূর্ব-বাংলার বাঙালিদের ভাষাভিত্তিক রাজনৈতিক আন্দোলনের প্রভাব ছিল না বললেই চলে।

কুকি-চিন ভাষাগোষ্ঠীভুক্ত ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো ছাড়া ইন্দো-আর্য ভাষা-পরিবারভুক্ত চাকমাদের সাথে বাংলা ভাষার যোগাযোগ যথেষ্ট নিবিড়। একজন চাকমা ভাষা-গবেষকের মতে, বর্তমান চাকমা ভাষার শব্দভাণ্ডার ষোল আনার চৌদ্দ আনাই বাংলা ভাষার সাথে সম্পর্কযুক্ত (গিরিনির্ঝর, ১৯৮৭, পৃ. ১০)। উভয় ভাষা ও সংস্কৃতি একে অন্যের দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে। সাংস্কৃতিক আদান-প্রদান বহমান রয়েছে। ত্রিপুরা রাজ্যে রাজ্যভাষা বাংলা হওয়ায় ককবরকভাষী ত্রিপুরাদের সাথে বাংলা ভাষার যোগাযোগও বহু যুগের পুরোনো। ১৯৭৯ সাল থেকে ত্রিপুরা রাজ্যে ত্রিপুরাদের ককবরক ভাষাও রাজ্যভাষা হিসেবে স্বীকৃত। ত্রিপুরারা দীর্ঘ সময় ধরে বাংলালিপিতেই নিজেদের ককবরক ভাষা চর্চা করতেন। ভারতের ত্রিপুরারা নিজেদের জাতিগত ও সাংস্কৃতিক স্বাতন্ত্র্যবোধ রক্ষার খাতিরে এখন রোমান হরফে ককবরক চর্চা করছে (ত্রিপুরা, ২০১৫, পৃ. ১২৬)। বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীর জন্যও একথা সত্য। দেশ আলাদা হলেও উভয় দেশের ত্রিপুরাদের মধ্যে সাংস্কৃতিক যোগাযোগ প্রায় অটুট। ফলে বাংলাদেশের ত্রিপুরারা পূর্বে বাংলা হরফে ককবরক ভাষায় সাহিত্যচর্চা করলেও এখন রোমান হরফ ব্যবহার করে পাঠ্যবই রচনা করছে। এতদিন হরফ নির্বাচন নিয়ে জটিলতা বা সিদ্ধান্তহীনতা ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা চর্চায় অন্তরায় সৃষ্টি করেছে। সরকারি বা প্রাতিষ্ঠানিক পৃষ্ঠপোষকতার অভাবও ছিল ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা চর্চার ক্ষেত্রে বড়ো বাধা। ভাষা আন্দোলনের চেতনার বাস্তবায়ন শুধু বাংলা ভাষার উন্নয়নকে ঘিরে আবর্তিত হওয়ার কারণে বাংলাদেশের ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা চর্চাও ছিল একান্তই ব্যক্তিগত ও অপ্রাতিষ্ঠানিক।

মারমাদের সাংস্কৃতিক অভিমুখ দক্ষিণমুখী। তাদের সংস্কৃতিতে বাংলা ভাষা ও বাঙালি সংস্কৃতির তুলনায় বর্মি-আরাকান ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাব বেশি। তারা বর্মি পঞ্জিকা অনুসরণ করে সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব পালন করে (চৌধুরী, ২০২১, পৃ. ২৩-৪১)। ভাষা ও বর্ণমালার মূলও নিহিত আছে বর্মি ভাষা ও বর্ণমালার মধ্যে। তবু তাদের নিজস্ব ভাষা, বর্ণমালা ও সংস্কৃতির বিকাশধারায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের তাৎপর্যকে অস্বীকার করে না। স্মরণাতীতকাল থেকে মারমা জাতিসত্তার মানুষ ক্যাং বা বৌদ্ধবিহারভিত্তিক মাতৃভাষা শিক্ষা করতো। বাংলাদেশ আমলে কিন্তু মারমাদের আর্থ-সামাজিক জনজীবনে অর্থনৈতিক উদ্‌বেগ-উৎকণ্ঠাপূর্ণ প্রান্তিকতা, বৃহৎ সাংস্কৃতিক শক্তির প্রভাব, রাজনৈতিক সদিচ্ছার অভাব ও ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর আনুগত্য নিয়ে সন্দেহপরায়ণতা প্রভৃতি কারণে বিহারভিত্তিক প্রচলিত মাতৃভাষার চর্চাও স্তিমিত হয়ে পড়ে (চেদনা, ২০১১, পৃ. ১৪)। অপেক্ষাকৃত সংখ্যাগরিষ্ঠ ও অগ্রসর চাকমা, মারমা ও

ত্রিপুরাদের ভাষা-পরিস্থিতি যদি এমন হয়, তাহলে অন্য ক্ষুদ্রতর জাতিসত্তার মাতৃভাষা-পরিস্থিতি কেমন হবে তা সহজে অনুমেয়।

এখানে একটা বিষয় উল্লেখ করা প্রাসঙ্গিক যে, দেশের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভাষাপ্রসঙ্গে রাষ্ট্রীয় নীতিও ছিল অনেকটা একপেশে। সদ্য-স্বাধীন বাংলাদেশের রাষ্ট্রীয় ভাষানীতিও মোটেই বাংলাছাড়া অন্যান্য মাতৃভাষা শিক্ষার সহায়ক ছিল না। ১৯৭৪ সালে বাংলাদেশকে একক ভাষা ও সংস্কৃতিভিত্তিক জাতিরাষ্ট্র ঘোষণা করা হলে দেশের সীমানাভুক্ত অন্য জাতিসত্তার ভাষা ও সংস্কৃতিচর্চা কার্যত রাষ্ট্রীয় পৃষ্ঠপোষকতা থেকে বঞ্চিত হয়ে পড়ে। এ প্রসঙ্গে আমেনা মহসিনের পর্যবেক্ষণটি প্রণিধানযোগ্য। তিনি লিখেছেন, ''On 23 January 1974, the Parliament passed a Bill declaring Bangladesh a uni-cultural and uni-lingual nation-state. The stage was thereby set for carving out a homogenous nation-state patterned around the dominant Bengali culture.'' (Mohsin, 2002, p. 63). তাই এসব ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী এ ধরনের রাষ্ট্রীয় ভাষানীতির মধ্যে 'ভিন্ন সাংস্কৃতিক একীভূতকরণ'-এর প্রয়াস লক্ষ করে এবং নিজ নিজ ভাষা ও সংস্কৃতিকে উপেক্ষিত অবস্থায় দেখতে পায়। এমতাবস্থায় স্বাধীনতা-উত্তরকালে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিগোষ্ঠীগুলোর ঐক্যের প্ল্যাটফর্ম *পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতি* পাহাড়ের ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর স্বতন্ত্র ভাষা ও সংস্কৃতির সংকট দেখতে পায়। সংগঠনটি পাহাড়ের জাতিসত্তাগুলোর আত্মপরিচিতি ধরে রাখা এবং বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতির প্রভাবমুক্ত পৃথক জুম্ম জাতীয়তাবাদী সাংস্কৃতিক কাঠামো নির্মাণের প্রয়াস গ্রহণ করে। অধ্যাপক ভেলাম ভেন সেন্দেলের মতে, ''পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্রমশ বহু সংখ্যায় আবির্ভূত রাজনৈতিক সংগঠনগুলি পাহাড়ে বাঙালি সাংস্কৃতিক কাঠামোর প্রতি ক্রমবর্ধমান বিরাগ প্রকাশ করে। পার্বত্য চট্টগ্রামের মানুষকে চিহ্নিত করার জন্য একটি নতুন পরিভাষা প্রবর্তন করা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের অধিবাসীদের এখন থেকে বলা হতে থাকে 'জুম্ম'। জেএসএস এ পরিভাষা পরিবর্তনের ঘটনাকে কাজে লাগায় সমস্ত পার্বত্য অঞ্চলের অধিবাসীদের এক ছত্রছায়ায় আনার উদ্দেশ্যে'' (সেন্দেল, ১৯৯৮, পৃ. ১০২-১৫১)। এ অবস্থায় পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে ভাষাচর্চার ক্ষেত্রে দোদুল্যমানতা সৃষ্টি হয়। বিশেষ করে যাদের নিজস্ব বর্ণমালা আছে তাদের মধ্যে এ সমস্যাটা প্রকট হয়। যাদের মাতৃভাষার নিজস্ব বর্ণমালা নেই, তারা বাংলা বা রোমান বর্ণমালাকে সহজে বেছে নিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ চাকমা ও মারমাদের নিজস্ব বর্ণমালা থাকলেও তার চর্চা ছিল খুবই সীমিত। ব্রিটিশ ও পাকিস্তান আমলে চাকমা ভাষা ও সাহিত্যচর্চা হতো বাংলালিপিতে। এখন জুম্ম সংস্কৃতির কাঠামোতে জাতিগতভাবে নিজস্ব হরফে মাতৃভাষা-চর্চার তাগিদ অনুভূত হয়। মারমাদেরও একই বাস্তবতা।

পার্বত্য অঞ্চলের জাতিগোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-চর্চা বেগবান না হওয়ার পেছনে আরও কিছু কারণ ছিল। প্রথমত, রাষ্ট্রীয় ভাষানীতিতে বাংলা ব্যতীত অন্য ভাষাগুলোর স্বীকৃতি না থাকা এবং সরকারি পৃষ্ঠপোষকতার অভাব; সর্বস্তরে বাংলা ভাষা চালুর ফলে পাহাড়ি ভাষাগুলোর লিখন, পঠন ও প্রয়োগের প্রাতিষ্ঠানিক চর্চার সুবিধা ও আর্থ-সামাজিক পরিমণ্ডলে প্রায়োগিক সুবিধার অনুপস্থিতি; দ্বিতীয়ত, ১৯৭৫ সালের পর থেকে ইন্সারজেন্সির কারণে পার্বত্য চট্টগ্রামে যুদ্ধাবস্থা ও অনিরাপদ জনজীবন; তৃতীয়ত, ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষায় প্রাতিষ্ঠানিক উপায়ে শিক্ষাদানের জন্য উপযুক্ত ভাষা-শিক্ষক, পাঠ্যক্রম, পাঠ্যবই ও শিক্ষা-উপকরণের অভাব; চতুর্থত, অধিকাংশ পাহাড়ি জাতিসত্তার নিজস্ব বর্ণমালা না থাকায় কোন হরফে মাতৃভাষা চর্চা সুবিধাজনক হবে এ বিষয়ে সংশ্লিষ্ট জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে ঐকমত্য না থাকা ও

পঞ্চমত, ক্ষুদ্র জাতিসত্তার ভাষাগুলোর ভাষা, ব্যাকরণ ও বানানরীতি নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত কাঠামো গড়ে না ওঠা। এসব কারণে বিশ শতক অবধি পাহাড়ি জনগোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-চর্চার অগ্রগতি ছিল অতি নগণ্য।

ভাষা ও সংস্কৃতি-চর্চা কোনো কিছুই রাজনৈতিক পরিবেশের সাথে অসম্পৃক্ত নয়। দ্বন্দ্ব-সংঘাতপূর্ণ রাজনৈতিক পরিবেশে ভাষা ও সংস্কৃতি-চর্চার বিকাশও মারাত্মকভাবে ব্যাহত হয়। আশার কথা, ১৯৯৭ সালে বাংলাদেশ সরকার ও পার্বত্য চট্টগ্রাম জনসংহতি সমিতির মধ্যে স্বাক্ষরিত পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মাধ্যমে ঐ অঞ্চলের সংঘাতপূর্ণ অশান্ত পরিস্থিতির আপাত অবসান ঘটে। চুক্তির ভূমিকাংশে পার্বত্য অঞ্চলের সকল নাগরিকের সার্বিক উন্নয়ন সাধন করাকে চুক্তির প্রধান উদ্দেশ্য বলে স্বীকৃত হয়। পার্বত্য চুক্তির ৩৩ খণ্ডের (খ) ধারায় আঞ্চলিক পরিষদের কার্যাবলির মধ্যে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিধান রাখা হয় এবং এর সাথে সঙ্গতি রেখে চুক্তি অনুসারে গঠিত তিন পার্বত্য জেলা পরিষদ আইন ১৯৯৮-এর ৩৬ (ঠ) ধারায় মাতৃভাষার মাধ্যমে প্রাথমিক শিক্ষাকে আইনগতভাবে স্বীকৃতি দেওয়া হয়েছে। পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তিতে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিধান রাখা এ অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোকে স্ব স্ব মাতৃভাষায় আগ্রহী করে তোলে। এ কথা অনস্বীকার্য যে, শিশুদের পক্ষে মাতৃভাষায় লেখাপড়া করা সহজ, বোধগম্য ও আনন্দদায়ক এবং মেধা বিকাশে সহায়ক। অধিকন্তু শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যসূচির সাথে নিজস্ব চেনা পরিবেশ, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্যের সম্পর্ক থাকায় তারা আত্মবিশ্বাসী ও আত্মমর্যাদাসম্পন্ন মানসিকতা নিয়ে বেড়ে ওঠে। এসব বিবেচনা করে অন্তত প্রাথমিক স্তর পর্যন্ত নিজেদের মাতৃভাষায় পড়ালেখা করার সম্ভাবনা দেখে নৃ-গোষ্ঠীগুলো স্ব স্ব মাতৃভাষার উন্নয়নে সোচ্চার হয়।

উপর্যুক্ত আলোচনায় প্রতীয়মান হয় যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা-চিন্তায় নবপ্রেরণার সঞ্চার ঘটায়। এরপরে দেশে ও বিদেশে সংঘটিত কিছু ঘটনা ও পদক্ষেপ পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-চর্চায় উৎসাহ সৃষ্টি করে। যেমন ১৯৯৯ সালে বাঙালির ভাষা আন্দোলনের স্মৃতিবাহী একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি প্রদান এবং এরই ধারাবাহিকতায় পৃথিবীর বিভিন্ন ভাষা গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষে ২০১০ সালে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট উদ্‌বোধন– এ দুটি ঘটনা পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্নভাষী জাতিগোষ্ঠীগুলোর মধ্যে মাতৃভাষা-চর্চায় আগ্রহ সৃষ্টি করে। একজন চাকমা লেখক পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি স্বাক্ষর ও আন্তর্জাতিকভাবে মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পর আদিবাসীদের মাতৃভাষা-চর্চার গতিধারা সম্পর্কে বলেন:

> আদিবাসী পাহাড়ি জাতিসত্তাসমূহের মাতৃভাষাকে প্রাথমিক স্তরে শিক্ষার মাধ্যম হিসেবে চালু করার দাবী দীর্ঘদিনের। সম্প্রতি পার্বত্য শান্তিচুক্তিতে বিষয়টি অন্তর্ভুক্ত হবার পর পার্বত্য চট্টগ্রামের আদিবাসীদের এ দাবী সরকারীভাবে স্বীকৃতি লাভ করে। পরবর্তীতে ১৯৯৯ খ্রিস্টাব্দের ১৭ই নভেম্বর জাতিসংঘভুক্ত সংস্থা ইউনেস্কোর এক অধিবেশনে '২১ ফেব্রুয়ারি'কে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে বিশ্বব্যাপী পালন করার ঘোষণা আমাদের এ অর্জনকে আরও অনিবার্য করে তুলেছে (চাকমা, ২০১০, পৃ. ৫১-৫৫)।

এর পরম্পরায় বাংলাদেশ সরকার কর্তৃক পরবর্তীকালে গৃহীত পদক্ষেপগুলো পাহাড়ি নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-চর্চার প্রাতিষ্ঠানিক পরিসর সৃষ্টি করে। ২০১০ সালে প্রণীত জাতীয় শিক্ষানীতির উদ্দেশ্য অংশে 'প্রারম্ভিকলগ্নে শিক্ষাস্তরে আদিবাসীসহ সকল ক্ষুদ্র জাতিসত্তার জন্য স্ব স্ব মাতৃভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করার নীতিগত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। বস্তুত জাতীয় শিক্ষানীতির আলোকে বাংলাদেশ সরকার ২০১৪ সালের

জানুয়ারি থেকে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে প্রথম ধাপে ৫টি ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মাতৃভাষায় (চাকমা, মারমা, ককবরক, গারো ও সাদরি) পাঠ্যবই প্রণয়ন ও বিনামূল্যে বিতরণের কার্যক্রম গ্রহণ করে। বাংলাদেশ সরকারের এ পদক্ষেপ নিঃসন্দেহে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীবান্ধব ও ভাষাগত অন্তর্ভুক্তিমূলক। একটি রাষ্ট্রের নাগরিকদের মধ্যে সাংস্কৃতিক বন্ধন সুদৃঢ়করণেও এমন পদক্ষেপের গুরুত্ব অপরিসীম।

বাংলাদেশ সরকার যখন ২০১৪ সাল থেকে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর জন্য মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের কাজে হাত দেয়, তখন কিছু বাস্তব সমস্যা উপস্থিত হয়। প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষা শিক্ষাদানের জন্য উপযোগী শিক্ষাক্রম প্রণয়ন ও ঐ ভাষার উপযুক্ত লেখক প্রাপ্তি, লিপি বা হরফ নির্বাচন সংকট (চাকমা ও মারমাদের নিজস্ব লিপি থাকলেও ত্রিপুরা, গারো ও ওঁরাওদের মাতৃভাষার নিজস্ব হরফ নেই), একই শ্রেণিতে বিভিন্ন ভাষাভাষী শিক্ষার্থীর উপস্থিতি, অক্ষরগুলো কম্পিউটারে কম্পোজ করার মতো উপযুক্ত সফটওয়ার বা কি-বোর্ডের অভাব ইত্যাদি সমস্যা দেখা দেয়। অবশেষে এসব সীমাবদ্ধতা কাটিয়ে ২০১৭ সাল থেকে ইউনিসেফের সহায়তায় ৪টি নৃ-গোষ্ঠীর জন্য প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যবই প্রণয়ন ও মুদ্রণের কাজ শেষ করে বিনামূল্যে শিক্ষার্থীদের হাতে তুলে দেওয়া সম্ভব হয়। এর মধ্যে দিয়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরা এ তিনটি নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা-চর্চা, শিখন ও শিক্ষণ প্রাতিষ্ঠানিক রূপ লাভ করে। এটি একটি দীর্ঘদিনের কাঙ্ক্ষিত স্বপ্নের বাস্তব রূপায়ণ। সরকারের এ নীতি মাতৃভাষা-চর্চায় আগ্রহী পাহাড়ি তরুণ সমাজে দারুণ উদ্দীপনা সৃষ্টি করে। পাহাড়ের শিক্ষিত ও সচেতন তরুণরা মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের উদ্যোগকে সফল করার জন্য বিভিন্ন ভাষাভিত্তিক সমিতি, সংগঠন ও প্রতিষ্ঠান গড়ে তোলে। মাঠ-পর্যায়ে তথ্য সংগ্রহ করতে গিয়ে চাকমা, মারমা ও ম্রোদের দ্বারা পরিচালিত এ ধরনের ভাষাকেন্দ্রিক সাংগঠনিক কার্যক্রম সম্পর্কে তথ্য পাওয়া গিয়েছে। এছাড়া ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীগুলোর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির গবেষণা ও উন্নয়নের জন্য স্থাপিত তিনটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠানও বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা-শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা করে থাকে। আলোচ্য প্রবন্ধে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের পটভূমি ও তাৎপর্য আলোচনাপূর্বক চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো ও অন্যান্য ক্ষুদ্রজাতিসত্তার মাতৃভাষা-চর্চার ধারা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

পূর্ববর্তী লেখালেখির হদিশ

পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা-চর্চা সম্পর্কিত গবেষণার উপাদান খুবই অপ্রতুল। ১৯৯৯ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভের পূর্ব পর্যন্ত বাংলা ব্যতিত অন্যান্য জাতিসত্তার মাতৃভাষা-চর্চার কোনো বিদ্যায়তনিক সুযোগ-সুবিধা না থাকায় এ নিয়ে অ্যাকাডেমিক গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়নি। ফলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা প্রসঙ্গটি গবেষকদের দৃষ্টির আড়ালে রয়ে গেছে। তবে একুশ শতকের সূচনাতে বিদ্যায়তনিক স্তরে দু-একজন বাংলাভাষী ভাষা-গবেষক বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা-গবেষণায় এগিয়ে আসেন। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাষাবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক সিকদার মনোয়ার মোর্শেদ ওরফে সৌরভ সিকদারের নাম এক্ষেত্রে সর্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য। তিনি প্রথম বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে স্বীয় মাতৃভাষা বাংলাভাষার গবেষণাজগৎ থেকে আদিবাসী ভাষাজগতে বিচরণ শুরু করেন। তাঁর সম্পাদিত গবেষণাকর্ম ২০১১ সালে *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা* শিরোনামে বাংলা একাডেমি থেকে প্রকাশিত হয়। এতে ভাষাবিজ্ঞানের আলোকে ১০টি আদিবাসী ভাষার উদ্ভব ও ভাষাতাত্ত্বিক বৈশিষ্ট্য বিশ্লেষিত হয়েছে। কিন্তু ড. সিকদারের গ্রন্থে পার্বত্য জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা-চর্চার ঐতিহাসিক ধারা এবং বিগত এক দশকে কয়েকটি আদিবাসী তরুণের মাতৃভাষার চর্চার

বাহন বর্ণমালার উন্নয়ন নিয়ে গবেষণা ও উন্নয়ন, আদিবাসীদের মাতৃভাষা-চর্চায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের যোগসূত্র বা প্রভাব, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ও বাংলাদেশ সরকারের বিদ্যায়তনিক পর্যায়ে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষায় শিক্ষাদান ও পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন কার্যক্রমের প্রভাব ও সংশ্লিষ্টতা নিয়ে আলোচনা অনুপস্থিত এবং সেটা সঙ্গত কারণেই। সরকার প্রাথমিক স্কুলে আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষাদান কার্যক্রম হাতে নিয়েছে তাঁর গবেষণাগ্রন্থ প্রকাশের প্রায় এক দশক পর। এরপর অশোক বিশ্বাস *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব* (২০০৮) শীর্ষক গ্রন্থে বাংলা ভাষা, ব্যাকরণ ও সাহিত্যে তিব্বতি-চৈনিক ভাষাগুলোর প্রভাব বিশ্লেষণ করতে গিয়ে প্রসঙ্গক্রমে চাকমা ও মারমা ভাষার সঙ্গে বাংলা ভাষার সম্পর্ক নিয়ে আলোকপাত করেছেন। কিন্তু বাংলা ভাষার সাথে পার্বত্য চট্টগ্রামের কুকি-চীন গোত্রীয় ভাষাগুলোর সম্পর্ক না থাকায় তিনি ঐসব জাতিসত্তার মাতৃভাষা নিয়ে আলোচনা থেকে বিরত থাকেন। অ্যাকাডেমিক পর্যায়ে পাহাড়ের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভাষা নিয়ে নতুন কোনো গবেষক ও গবেষণার হদিশ পাওয়া যায় না। পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তার মানুষের মধ্যে কয়েকজন মাতৃভাষাদরদি ব্যক্তি স্ব-উদ্যোগে মাতৃভাষায় সাহিত্যচর্চায় আত্মনিয়োগ করেন। কিন্তু তাদের নিজস্ব বর্ণমালায় স্বাক্ষরজ্ঞান ও লিখনদক্ষতা না থাকায় তারা বাংলা অথবা রোমান হরফে সাহিত্যচর্চা করেন। এসব লেখালেখির সাহিত্যিক মান প্রমিত নয় এবং পরিসরও স্ব স্ব ভাষার মধ্যে সীমাবদ্ধ। যেমন, সুগত চাকমার গবেষণার বিষয় চাকমা জাতি, ভাষা ও সাহিত্য; সিং ইয়ং ম্রো লিখেছেন ম্রো ভাষা ও বর্ণমালা নিয়ে; একইভাবে জিরকুং শাহুর লেখার জগত বম জাতি ও ভাষাকেন্দ্রিক। ফলে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে ঘোষণার পর পার্বত্য চট্টগ্রামে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা অধ্যয়ন ও অগ্রগতির সামগ্রিক চিত্র এসব গবেষণা ও লেখালেখিতে পাওয়া দুষ্কর। মূলত এসব দিক বিবেচনা করলে পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ভাষা-পরিস্থিতির একটি সামগ্রিক ছবি পেতে তাদের মাতৃভাষা-চর্চার অতীত ও সাম্প্রতিক ধারা এবং অগ্রগতি ও সীমাবদ্ধতা নিয়ে গবেষণার গুরুত্ব ও প্রয়োজনীয়তা অনস্বীকার্য।

বর্তমান প্রবন্ধের পদ্ধতিগত দিক

এ গবেষণা-প্রবন্ধটি ঐতিহাসিক গবেষণা-পদ্ধতিতে রচিত। প্রয়োজনীয় তথ্য-উপাত্তের জন্য বিভিন্ন জাতিসত্তার ভাষার ওপর প্রকাশিত গবেষণা-গ্রন্থ ও প্রবন্ধের সহায়তা নেওয়া হয়েছে। মাতৃভাষা-চর্চা বিষয়ক অবস্থা বোঝার জন্য ভিন্ন ভিন্ন জাতির মাতৃভাষা-চর্চার সাথে সংশ্লিষ্ট ব্যক্তিদের সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে এবং সংশ্লিষ্ট সংগঠনগুলোর কার্যালয় পরিদর্শন করে তাদের প্রকাশিত বইপুস্তক সংগ্রহ করা হয়েছে। বিশেষ করে রাঙ্গামাটিতে অবস্থিত *জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল* প্রকাশিত সংকলনগুলো ছিল বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা-চর্চা সম্পর্কে জানার গুরুত্বপূর্ণ উৎস। গবেষণাকালে যারা পার্বত্য চট্টগ্রামের বাইরে অবস্থান করছিলেন কিন্তু মাতৃভাষা-চর্চার সাংগঠনিক উদ্যোগের সাথে এখনও যুক্ত আছেন, তাদেরও সাক্ষাৎকার গ্রহণ করা হয়েছে। এভাবে প্রাপ্ত তথ্য-উপাত্তের ওপর ভিত্তি করে এ গবেষণা-প্রবন্ধটি রচিত হয়েছে। তবে সময়-স্বল্পতার কারণে সবগুলো জাতিত্তার মাতৃভাষাকে গবেষণার অন্তর্ভুক্ত করা যায়নি। এ প্রবন্ধে চাকমা, মারমা, ত্রিপুরা, ম্রো, বম, খিয়াং, খুমি, লুসাই ও পাংখোয়াদের মাতৃভাষা-চর্চার অতীত ও বর্তমান অবস্থা পর্যালোচনা করা হয়েছে।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পটভূমি

একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা সংক্রান্ত ধারণাটির রূপকার ও প্রথম প্রস্তাবক ছিলেন কানাডাপ্রবাসী বাঙালি রফিকুল ইসলাম ও তাঁর সহসংগ্রামী আবদুস সালাম। ১৯৯৮ সালের ৯ই জানুয়ারি রফিকুল ইসলাম পৃথিবীর ভাষাসমূহকে বিলুপ্তির হাত থেকে বাঁচানোর উপায় হিসেবে একটি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পদক্ষেপ গ্রহণের অনুরোধ জানিয়ে জাতিসংঘ মহাসচিব-এর নিকট একটি পত্র লিখেন। উক্ত পত্রে তিনি ১৯৫২ সালে ২১শে ফেব্রুয়ারি ঢাকায় মাতৃভাষার জন্য আত্মদানের স্মৃতির স্মরণে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' হিসেবে ঘোষণার প্রস্তাব করেন। সে-সময় মহাসচিবের প্রধান তথ্য কর্মচারী হিসেবে কর্মরত হাসান ফেরদৌসের নজরে আসে এ চিঠি। তিনি ১৯৯৮ সালের ২০শে জানুয়ারি রফিকুল ইসলামকে অনুরোধ করেন তিনি যেন জাতিসংঘের অন্য কোনো সদস্য রাষ্ট্রের কারো কাছ থেকে একই ধরনের প্রস্তাব আনার ব্যবস্থা করেন। সেই পরামর্শ অনুসারে রফিক তার সহযোদ্ধা আব্দুস সালামকে সাথে নিয়ে 'এ গ্রুপ অব মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স অব দ্যা ওয়ার্ল্ড' নামে একটি সংগঠন দাঁড় করান। তাদের প্রতিষ্ঠিত বহুভাষিক ও বহুজাতিক মাতৃভাষাদরদি গোষ্ঠী ১৯৯৮ সালের ২৯শে মার্চ তারিখে জাতিসংঘের তৎকালীন মহাসচিব কফি আনান বরাবর ২১শে ফেব্রুয়ারিকে 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' ঘোষণার প্রস্তাবসম্বলিত একটি পত্র প্রেরণ করেন। প্রস্তাবের পক্ষে তারা লিখেন, ''বাঙালিরা তাদের মাতৃভাষাকে রক্ষার জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছে। সেটা ছিল তাদের ভাষার অস্তিত্ব রক্ষার লড়াই। আজকের পৃথিবীতেও অনেক জাতি-গোষ্ঠীর ভাষা একই সমস্যা ও বিপদের মধ্যে আছে। কাজেই মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার দাবিটি যুক্তিযুক্ত।" মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভার্স গ্রুপের ওই চিঠিতে ৭ জাতি ও ৭ ভাষার ১০ জন সদস্য স্বাক্ষর করেন। তাঁরা হলেন অ্যালবার্ট ভিনজন ও কারমেন ক্রিস্টোবাল (ফিলিপিনো), জ্যাসন মোরিন ও সুসান হজিন্স (ইংরেজি), ড. কেলভিন চাও (ক্যান্টনিজ), নাজনীন ইসলাম (মালয়), রেনাটে মার্টিনস (জার্মান), করুণা জোসি (হিন্দি) এবং রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালাম (বাংলা) (সিকদার, ২০১৯, পৃ. ১১)। এর একটি কপি ইউএন-এর কানাডিয়ান রাষ্ট্রদূত ডেভিড ফাওলারের কাছেও প্রেরণ করেন। জাতিসংঘ মহাসচিবের দপ্তর থেকে আবেদনকারীদের জাতিসংঘভুক্ত শিক্ষা, বিজ্ঞান ও সংস্কৃতি বিষয়ক সংগঠন 'ইউনেস্কো'র সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপনের পরামর্শ দেওয়া হয়।

পরের বছর, অর্থাৎ ১৯৯৯ সালের ৩রা মার্চ প্যারিসে অবস্থিত ইউনেস্কো সচিবালয়ের ভাষা বিভাগের কর্মকর্তা আন্না মারিয়ার কাছ থেকে রফিকুল ইসলাম একটি চিঠি পান। চিঠিতে মারিয়া জানায়, ''বিষয়টি ব্যক্তিগতভাবে উত্থাপনের কোনো সুযোগ নেই, ইউনেস্কোর পরিচালনা পরিষদের কোনো সদস্য রাষ্ট্রের মাধ্যমে প্রস্তাবটি আনীত হতে হবে।'' সৌভাগ্যক্রমে তখন বাংলাদেশও পরিচালনা পরিষদের সদস্য রাষ্ট্র ছিল। ফলে রফিকুল ইসলাম ও আবদুস সালামের কাজটি অনেকটা সহজ হয়। অতঃপর রফিকুল ইসলাম কানাডা থেকে বাংলাদেশের শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে যোগাযোগ স্থাপন করেন। প্রস্তাবটি বাংলাদেশের জন্য গৌরবজনক ও গুরুত্বপূর্ণ মনে করে মন্ত্রণালয় অতি দ্রুত প্রধানমন্ত্রীর অনুমতি চেয়ে সারসংক্ষেপ পাঠায়। অতঃপর ১৯৯৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর বাংলাদেশ সরকারের পক্ষ থেকে ২১শে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা করে ইউনেস্কোর সদরদপ্তর ও সদস্যদেশসমূহে তা উদ্‌যাপনের উদ্দেশ্যে একটি প্রস্তাব প্রেরিত হয়। প্রস্তাবটি ইউনেস্কোর প্যারিসে অবস্থিত সচিবালয়ে 30 C/8, COM. II. নং স্মারকে নথিভুক্ত হয়। বাংলাদেশ সরকারের প্রস্তাবের পক্ষে যুক্তি হিসেবে বলা হয় যে,

> Considering that languages are the very heart of UNESCO's objectives and that they are the most powerful instruments of preserving and developing our tangible and intangible heritage, Bearing in mind also that all moves to promote the dissemination of mother tongues will serve not only to encourage linguistic diversity and multilingual education but also to development fuller awarness of linguistic and cultural traditions throughout the world and to inspire solidarity based on understanding, tolerance and dialogue, Considering consequently that one of the most effective ways to promote and develop mother tongues is the establishment of an 'International Mother Language Day' with a view to organizing various activities in the Member States and an exhibition at UNESCO Headquarters on that same day, Recognizing the unprecedented sacrifice made by Bangladesh for the cause of mother language on 21 February 1952, Noting that this idea has not yet been adopted at the international level, Proposes that 21 February be proclaimed 'International Mother Language Day' throughout the world to commemorate the martyrs who sacrificed their lives on this very date in1952 (www.unesco.org).

এরপর ১৯৯৯ সালের ১৭ই নভেম্বর প্যারিসে অনুষ্ঠিত ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে যোগদানকারী বাংলাদেশ প্রতিনিধি দল ও তৎকালীন শিক্ষামন্ত্রী এ এস এইচ কে সাদেক বিভিন্ন দেশে শিক্ষামন্ত্রী ও ডেলিগেট প্রধানদের সাথে বৈঠক করে বাংলাদেশের প্রস্তাবের পক্ষে সমর্থন আদায় করেন। অধিকন্তু অধিবেশনের শুরুতে বাংলাদেশের শিক্ষামন্ত্রী ১৯৫২ সালের ভাষা আন্দোলনের পটভূমি, রক্তাক্ত একুশে ফেব্রুয়ারি ও এর তাৎপর্য ইউনেস্কোর ১৮৮টি দেশের প্রতিনিধিদের সম্মুখে সবিস্তারে তুলে ধরেন। বাংলাদেশের সাথে সৌদি আরবও সহপ্রস্তাবক দেশ হতে সম্মত হয়। এভাবে ১৭ই নভেম্বর তারিখে একুশে ফেব্রুয়ারি দিনটিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রস্তাব ইউনেস্কোর ৩০তম সাধারণ অধিবেশনে উত্থাপিত হয় এবং ১৮৮টি সদস্য দেশ প্রস্তাবে সমর্থন দিলে সেটি গৃহীত হয়। রচিত হয় নতুন ইতিহাস। এভাবে একুশে ফেব্রুয়ারি ইউনেস্কো কর্তৃক আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতি লাভ করে। এ প্রসঙ্গে ইউনেস্কোর (স্মারক নং 30 C/DR 35.) কার্যবিবরণীতে লিপিবদ্ধ আছে:

> (Submitted by Bangladesh and Saudi Arabia; supported by Oman, Benin, Sri Lanka, Egypt, the Russian Federation, Bahamas, Dominican Republic, Belarus, the Philippines, Cote d' Ivoire, India, Honduras, Gambia, the federated states of Micronesia, Vanauatu, Indonesia, Papua New Guiniea, Comoros, Pakistan, Islamic Republic of Iran, Lituania, Italy and the Syrian Arab Republic) relating to paragraph 05204, the commission recommends that the General Conference proclaim "International Mother Language Day" to be observed on 21 February (www.unesco.org, 09.09.2024).

২০০২ সালে জাতিসংঘ সাধারণ পরিষদ A/RES/56/262 of 2002 নং প্রস্তাবে ইউনেস্কোর আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার সিদ্ধান্তকে স্বাগত জানায় এবং ২০০৭ সালের ১৬ই মে A/RES/61/266 নং প্রস্তাবে বিশ্বের মানুষের ব্যবহৃত ভাষাসমূহের সংরক্ষণ ও সুরক্ষা প্রদানে এগিয়ে আসতে সদস্যরাষ্ট্রগুলোকে আহ্বান জানায়। শুধু তাই নয়, উক্ত অধিবেশনে ২০০৮ সালকে 'আন্তর্জাতিক ভাষা বর্ষ' ঘোষণা করে

(www.un.org, 09.09.2024)। এভাবে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসটির গুরুত্ব ও তাৎপর্য আরো বৃদ্ধি পায়। উল্লেখ্য ইউনেস্কোর ঘোষণার পর ২০০০ সাল থেকে বিশ্বের ১৮৮টি দেশে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে পালিত হচ্ছে এবং সুসমাচার এই যে আগামী বছর ইউনেস্কো যথাযোগ্য গুরুত্বসহকারে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের রজতজয়ন্তী পালনের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করেছে।

এ স্বীকৃতির মধ্য দিয়ে অমর একুশে ফেব্রুয়ারি বৈশ্বিকভাবে তাৎপর্যপূর্ণ হয়ে ওঠে এবং পৃথিবীর বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর বিপন্ন ভাষা চর্চা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের অবারিত সুযোগ ও সম্ভাবনার দ্বার উন্মোচিত হয়। ইতিহাসবিদ সিরাজুল ইসলামের মতে, ''প্রকৃতপক্ষে এটা ছিল মাতৃভাষার দাবিতে ১৯৫২ সালের ২১ ফেব্রুয়ারিতে বাংলাদেশের বাংলাভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর নজিরবিহীন আত্মত্যাগের মূল্যায়ন ও স্বীকৃতি" ('আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস' (https://bn.banglapedia.org 09.09.2024))।

বাঙালি জাতি ও বাংলাদেশ রাষ্ট্র বিকাশের ইতিহাসে এ স্বীকৃতির সুদূরপ্রসারী তাৎপর্য আছে। উল্লেখ্য যে, বাংলাদেশ সরকার একুশে ফেব্রুয়ারিকে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণায় অসামান্য অবদানের স্বীকৃতিস্বরূপ 'দ্য মাদার ল্যাঙ্গুয়েজ লাভারস অফ দ্য ওয়ার্ল্ড' দেশের দ্বিতীয় সর্বোচ্চ বেসামরিক রাষ্ট্রীয় সম্মান 'একুশে পদক'-এ ভূষিত করে এবং এর প্রধান উদোক্তা ও প্রস্তাবক রফিকুল ইসলামকে ২০১৬ সালে রাষ্ট্রের সর্বোচ্চ সম্মানজনক বেসামরিক পুরস্কার 'স্বাধীনতা পদক'-এ ভূষিত করে। এর ধারাবাহিকতায় দেশ-বিদেশের বিভিন্ন দেশের মাতৃভাষার গবেষণা ও উন্নয়নের লক্ষ্যে ২০০১ সালের ১৫ই মার্চ 'আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট' ভবন নির্মাণ-কাজের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপিত হয়। এর লক্ষ্য ছিল পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণসহ প্রয়োজনীয় গবেষণা সম্পন্ন করা এবং বাংলাসহ অন্যান্য ভাষা আন্দোলনের তথ্য সংগ্রহ ও গবেষণা এবং ইউনেস্কোর সদস্য দেশগুলির মধ্যে এ সংক্রান্ত তথ্যাবলি পৌঁছে দেওয়া। এর মধ্য দিয়ে মাতৃভাষা গবেষণায় নব দিগন্ত উন্মোচিত হয়। এর মাধ্যমে অন্যান্য জাতিগোষ্ঠীর মাতৃভাষা চর্চারও অনুকূল পরিবেশ সৃষ্টি হয়। ২০১০ সালে প্রণীত হয় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা আইন। উক্ত আইনে আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট-এর দায়িত্ব-তালিকার দুই নম্বরে আছে, ''পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ ও ক্ষুদ্র জাতিসমূহের ভাষা সংগ্রহ, সংরক্ষণ, এতদসংক্রান্ত গবেষণা ও প্রশিক্ষণ কার্যক্রম পরিচালনা'' (প্রথম আলো, ২১শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। একই বছর প্রণীত হয় জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০, যেখানে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের নির্দেশনা যুক্ত হয়। এ নির্দেশনা বায়ান্নর ভাষা আন্দোলনের অন্তর্নিহিত চেতনারই প্রতিফলন।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার প্রাক্কালে পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা-চর্চার ধারা

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিগোষ্ঠীর মধ্যে চাকমাদের নিজস্ব হরফ আছে। চাকমাদের মাতৃভাষা-চর্চার অতীত ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, তারা ভাষা আন্দোলনের দশকে প্রথম নিজস্ব হরফে মাতৃভাষার পাঠ্যবই রচনা করে। এর আগে মূলত চাকমা ভেষজ চিকিৎসা তাল্লিক শাস্ত্র ও তন্ত্রমন্ত্রগুলো চাকমা হরফে লেখার চল ছিল। চাকমা লিপিকে রক্ষা করেছিলেন 'লুরি' বা রাউলি সম্প্রদায় আঘরতারা পাঠের মাধ্যমে। এবং এ লিপি দৈনন্দিন কাজে ব্যবহার করতেন চাকমা তান্ত্রিক ও বৈদ্যরা। রাউলিরা মৃতদেহ সৎকারে ধর্মীয় পূজা-অর্চনার সময় আঘরতারা থেকে বিশেষ বিশেষ সূত্র পাঠ করতেন। উল্লেখ্য, চাকমা চিকিৎসাশাস্ত্র বা 'তাল্লিক' চাকমা লিপিতে লেখা। বৈদ্য বা চিকিৎসকেরা এসব দেখে রোগীর শুভাশুভ নির্ণয় ও চিকিৎসার ব্যবস্থা দিতেন। তান্ত্রিকেরা চাকমা লিপিতে তাদের তন্ত্রমন্ত্র ও দেহতত্ত্ব

সম্বন্ধীয় বিষয় লিখে রাখতেন। তাবিজ-কবজের জন্য বিশেষ 'আং' বা নকশা এবং বীজমন্ত্র এ লিপিতে লিখিত না হলে ফলদায়ক হতো না। বস্তুতপক্ষে চাকমা লিপিকে বাঁচিয়ে রেখেছিলেন এ সম্প্রদায়ের লোকেরাই। ব্রিটিশ আমল অবধি মোটামুটি এমনটিই ছিল চাকমাদের মাতৃভাষার বর্ণমালা চর্চার ধারা (খীসা, ১৯৮৭, পৃ. ৮-৯)। এককথায় চাকমাদের বর্ণশিক্ষার ধারাটি ছিল গুরু-শিষ্য পরম্পরা, কোনো প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষা নয়। ভাষা-গবেষক শুভ্রজ্যোতির অভিমত হলো, ''বর্ণশিক্ষার প্রাতিষ্ঠানিক পাঠ না থাকায় চাকমা বর্ণগুলির চর্চা কম ছিল। ফলে বর্ণগুলির কোনো উন্নতি সাধিত হয়নি, অধিকন্তু লোকচক্ষুর অন্তরালে থেকে গেছে। অপরদিকে চাকমা বর্ণে লিখিত চিকিৎসাশাস্ত্র তথা তান্ত্রিক শাস্ত্রেও যে সকল পুঁথি বৈদ্যগণের কাছে থাকত, সেগুলি তারা জনসমক্ষে খোলা থেকে বিরত থাকত'' (চাকমা, ২০১৬, পৃ. ২০১)। শুভ্রজ্যোতির বক্তব্য থেকে এটা স্পষ্ট যে চাকমা বর্ণশিক্ষা পদ্ধতি শুধু বিশেষ গোষ্ঠীর মধ্যে সীমাবদ্ধ ছিল। এ থেকে প্রতীয়মান হয়, সাধারণের মাঝে বর্ণশিক্ষার সুযোগ অবারিত ছিল না এবং এরজন্য কোনো সামাজিক উদ্যোগও ছিল না। ব্রিটিশ আমলের শেষ দশকে ১৯৪০ সালে পার্বত্য চট্টগ্রামের শিক্ষা সুপারিনটেন্ডেন্ট এইচ এফ মিলারের নির্দেশনায় প্রথম বাংলা হরফে চাকমা ভাষা শেখার সরকারি উদ্যোগ নেওয়া হয়। এর জন্য CHAKMA PRIMER নামে একটি বইও ছাপানো হয়। কিন্তু তৎকালীন নেতৃস্থানীয় চাকমারা এ উদ্যোগকে সাদরে গ্রহণ করেনি। ফলে বাংলা হরফে চাকমা ভাষা শিক্ষাদানের প্রক্রিয়াটি আর অগ্রসর হয়নি।

পূর্ব-বাংলায় ভাষা আন্দোলনের পর সাধারণ চাকমাদের মধ্যেও মাতৃভাষায় সাক্ষরতা অর্জনের প্রয়োজনীয়তা অনুভূত হয়। এক্ষেত্রে প্রবাদপ্রতিম পথিকৃতের ভূমিকা পালন করেন নোয়ারাম চাকমা। তিনি বহু কষ্ট, শ্রম ও সাধনায় চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা শেখার সুবিধার্থে 'চাকমার পথম শিক্ষা' নামে একটি পুস্তিকা রচনা করেন। তৎকালীন পার্বত্য চট্টগ্রামের জেলা প্রশাসকের সদয় অনুমতিক্রমে এবং চাকমা রাজা ত্রিদিব রায়ের ভূমিকাসহ এটি ১৯৫৯ সালে প্রকাশিত হয়। অনেক সীমাবদ্ধতা সত্ত্বেও পুস্তকাকারে চাকমা হরফ সংকলন প্রকাশের পিছনে তাঁর দৃষ্টিভঙ্গি ছিল বেশ কৌতূহল-উদ্দীপক। ভূমিকায় তিনি লিখেছেন:

> বহু বছর ধরে আমরা যে রত্নের অভাবে বিশ্বের দরবারে কাঙ্গাল হয়ে আছি, যার অভাবে আমরা আমাদের জাতিত্বও হারাতে বসেছি সেই হারানো রত্নোদ্ধারের জন্য সুদীর্ঘ বারো বছরের পরিশ্রমের ফল 'চাকমার পথম শিক্ষা' বইটি আপনাদের সামনে উপস্থিত করলাম। জানি পুস্তকটিতে চাক্‌মার ভাষা শিক্ষা করবার জন্য খুব সামান্যই তথ্য পাবেন। আশা ছিল অনেক কিন্তু আর্থিক অসচ্ছলতার জন্য পুস্তকটির কলেবর ক্ষুদ্র করতে বাধ্য হয়েছি। আমি নিজেও (সফলকাম) হতে পারিনি কিন্তু এটা আমার প্রথম প্রচেষ্টা মনে রেখে আপনারা আমাকে ক্ষমা করবেন বলে আশা রাখি। (চাকমা, ১৯৫৯)

উপরের উদ্ধৃতিটিতে নোয়ারাম চাকমার মাতৃভাষার প্রতি অগাধ ভালোবাসার বহিঃপ্রকাশ স্পষ্ট। নিঃসন্দেহে তাঁর এ উদ্যোগটি ছিল দূরদর্শী ও যুগান্তকারী। তিনি চাকমা ভাষা লিখন-পদ্ধতির উন্নয়নে প্রথম চিন্তক। অক্ষরগুলোকে একটি ফরম্যাটে এনে বর্ণমালা শেখার উপযোগী করে সংকলন করার সুদূরপ্রসারী চিন্তাটি তাঁরই। তাঁর সংগৃহীত চাকমা বর্ণমালা বইটি তৎকালীন 'পূর্ব-পাকিস্তান স্কুল টেক্সট বুক বোর্ড' পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য পাঠ্য তালিকাভুক্ত করে। এক্ষেত্রে পার্বত্য চট্টগ্রাম জেলার ডেপুটি কমিশনার এম এ করিম মহোদয়ের ভূমিকা প্রশংসনীয়। সমকালীন চাকমা কবি সলীল রায় রচিত 'নুয়ারাম– তর নাঙে'

শীর্ষক কবিতার নিচের দুটি পঙ্‌ক্তিতে নোয়ারাম চাকমা কর্তৃক 'চাকমার পত্থম শিক্ষা' সংকলন ও প্রকাশের গুরুত্ব অনুধাবন করা যায়:

নু'য়ারাম, ত'র স্ববন ম'ইত্তুন আরো গভীরত–? চাঙমা লেখার রূপ তুলি ধরি ছাবা-অক্ষরত,
লিঘিলে 'পত্থম শিক্ষা', আঝা তর – এ অক্ষর লোই,/ চাঙমা অক্ষরে বই একদিন্যা গরি উধিবোই।
[নোয়ারাম, তোমার স্বপ্ন ছিল আমার স্বপ্নের চেয়ে গভীরে –/চাকমা লিপিরূপ প্রকাশিলে তুমি ছাপা অক্ষরে –
লিখেছ তুমি 'পত্থম শিক্ষা' আশা ছিল তোমার– এ হরফে নিয়ে, লেখা হবে একদিন চাঙমা ভাষা গ্রন্থমালা।]

নোয়ারাম চাকমার পর হরকিশোর চাকমাও 'চাকমা লেখা শিক্ষা' নামে একটি বর্ণশিক্ষার বই প্রকাশ করেন। কিন্তু ১৯০৩ সালে স্যার গ্রিয়ারসন কর্তৃক মুদ্রিত এবং নোয়ারাম চাকমা সংগৃহীত ও মুদ্রিত বর্ণগুলোর সাথে হরকিশোরের বর্ণগুলোর আকৃতি, সংখ্যা ও বিন্যাসে গরমিল থাকায় মনে হয় তখন তাদের মধ্যে কোনো যোগাযোগ ছিল না। অর্থাৎ তাদের মাতৃভাষা চিন্তা ও কর্মগুলো মহৎ হলেও পরস্পর থেকে বিচ্ছিন্ন। ফলে চাকমাদের নিজস্ব ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষার উদ্যোগ সামাজিক রূপ পরিগ্রহ করেনি। এর কয়েক বছরের মধ্যে কাপ্তাই বাঁধের প্রভাবে চাকমাদের আর্থ-সামাজিক জীবনে নেমে আসে দুর্বিষহ যুগ। হঠাৎ জমে ওঠা কাপ্তাই হ্রদের জলে ডুবে যায় রাঙ্গামাটির বিস্তীর্ণ জনপদ। লক্ষ মানুষ ভিটেমাটি সহায়সম্বল হারিয়ে সর্বস্বান্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়ে। ফলে ষাটের দশক থেকে একাত্তরে বাংলাদেশের অভ্যুদয়ের মধ্যদিয়ে রাজনৈতিক স্থিতিশীলতা না আসা পর্যন্ত চাকমাদের মাতৃভাষা-চর্চায় কোনো উদ্যোগ চোখে পড়েনি।

স্বাধীনতার পর শিক্ষিত তরুণ ছাত্রসমাজ মাতৃভাষা চর্চায় উদ্যোগী হয়। বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়ুয়া পাহাড়ি ছাত্ররা এবং রাঙ্গামাটির তরুণ ছাত্রসমাজ মাতৃভাষা-চর্চার উদ্দেশ্যে গঠন করে বিভিন্ন সংগঠন। ১৯৭২ সালে গঠিত হয় 'জুমিয়া ভাষা প্রচার দপ্তর' (জুভাপ্রদ)। প্রতিষ্ঠার সময় থেকে ১৯৮২ সাল পর্যন্ত *জুভাপ্রদ* মাতৃভাষায় চাকমাদের প্রধান সামাজিক-সাংস্কৃতিক উৎসব বিজু উপলক্ষ্যে ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। উক্ত ম্যাগাজিনগুলোতে চাকমা ভাষা ও সাহিত্য চর্চা হতো। তবে সেগুলো বাংলা হরফে লেখা হতো। ১৯৮১ সালের ২৭শে ফেব্রুয়ারি কিছু তরুণ পার্বত্য চট্টগ্রামে বসবাসরত জাতিসত্তাসমূহের ভাষা, সাহিত্য, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য চর্চা ও সংরক্ষণের প্রয়াসে 'রাঙ্গামাটি ঈসথেটিকস কাউন্সিল' (রাক) নামে একটি সংগঠন গড়ে তোলে। এটি পরে নাম পরিবর্তন করে 'জুম ঈসথেটিক কাউন্সিল' নাম ধারণ করে। যা '*জাক*' নামে সমধিক পরিচিত। পার্বত্য চট্টগ্রামে বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা, ইতিহাস, ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি চর্চা ছিল এর প্রধান লক্ষ্য। পার্বত্য চট্টগ্রামের ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতির চর্চায় এ সংগঠনটি বিগত চল্লিশ বছর ধরে নিয়মিত সংকলন প্রকাশ করছে। *জাক*ই পার্বত্য চট্টগ্রামের একমাত্র বুদ্ধিবৃত্তিক সংগঠন, যারা বিরামহীনভাবে দীর্ঘ চার দশক ধরে বিভিন্নভাষী নৃ-গোষ্ঠীর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি-চর্চার একটি নির্ভরযোগ্য প্ল্যাটফর্ম হিসেবে মননশীল কার্যক্রম পরিচালনা করছে। ১৯৮৭ সালে 'জুম ঈসথেটিক কাউন্সিল' কর্তৃক চাকমা বর্ণমালা বিষয়ক পত্রিকা '*দিকপাদা*' প্রকাশিত হয়। কিন্তু পার্বত্য চট্টগ্রামে বিরাজমান প্রতিকূল পরিস্থিতির কারণে থেমে যায় '*দিকপাদা*' পত্রিকার প্রকাশনা। শান্তিচুক্তির পর জনজীবনে স্বাভাবিক অবস্থা ফিরে এলে ১৯৯৯ ও ২০০৩ সালে জাক '*দিকপাদা-২*' ও '*দিকপাদা-৩*' সংখ্যা প্রকাশ করে। এরমধ্যে সংগঠনটি 'আনন্দ মাল্টিমিডিয়া'র কারিগরি ও প্রযুক্তিগত সহযোগিতায় চাকমা বর্ণমালা ফন্ট 'বিজয় চাঙমা' তৈরি করে। সরকারি প্রাতিষ্ঠানিক উদ্যোগে পাহাড়ের নৃ-গোষ্ঠীগুলোর ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি চর্চা, গবেষণা ও উন্নয়নের সুযোগ সৃষ্টি হয় ১৯৭৮ সালে রাঙ্গামাটিতে

'উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট' প্রতিষ্ঠার পর। ১৯৮২ সালে ইনস্টিটিউটের পরিচালক ও গবেষক অশোক কুমার দেওয়ানের সম্পাদনায় চাকমা ভাষা শিক্ষা কোর্সের প্রথম পাঠ্যবই প্রকাশ করা হয়। এবং এ বইয়ের মাধ্যমে ইনস্টিটিউট স্বল্পমেয়াদি চাকমা ভাষা প্রশিক্ষণ কোর্স পরিচালনা করে। কিন্তু চাকমা বর্ণ ও সংখ্যা, স্বরবর্ণ, ব্যঞ্জনবর্ণ, বানান, উচ্চারণ ও পঠনরীতিতে অসঙ্গতি ও অসমাঞ্জস্য থাকায় রাঙ্গামাটি উপজাতীয় সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের কার্যনির্বাহী পরিষদের উদ্যোগে ২০০০ সালের ২৩শে আগস্ট চাকমা বর্ণমালা শিক্ষাদানের লক্ষ্যে গ্রহণযোগ্য পুস্তক প্রণয়নের উদ্দেশ্যে একটি কমিটি গঠন করা হয়। উক্ত কমিটির আহ্বায়ক ছিলেন ডা. ভগদত্ত খীসা। তাঁর নেতৃত্বে ২০০১ সালে 'চাঙমা পথম পাঠ' [ইংরেজিতে CHAKMA PRIMER] নামে চাকমা বর্ণশিক্ষার একটি মানসম্মত পুস্তক প্রকাশিত হয়। এভাবে প্রাতিষ্ঠানিক ও সাংগঠনিক উদ্যোগে চাকমাদের মাতৃভাষা-চর্চার নতুন ধারা শুরু হয়।

চাকমা ব্যতীত অন্য জাতিসত্তার মধ্যেও মাতৃভাষা-চর্চার আগ্রহ তৈরি হয়েছে। মারমা সমাজে নিজস্ব বর্ণমালার ব্যবহার বেশ প্রাচীন। মারমা লিপির উৎপত্তি উপমহাদেশের প্রাচীন ব্রাহ্মী লিপি থেকে। বর্তমানে মারমা লিপিতে বর্ণ-সংখ্যা মোট ৪৫টি। তন্মধ্যে ব্যঞ্জনবর্ণ ৩৩টি আর স্বরবর্ণ ১২টি। এ বর্ণমালা বার্মিজ বা রাখাইন বর্ণমালা নামেও পরিচিত। বহুকাল আগে থেকেই মারমারা তাদের বর্ণমালা রাজকার্য ও ধর্মবিষয়ক গ্রন্থাদি লেখার কাজে ব্যবহার করে আসছেন। মারমা বর্ণমালায় মুদ্রিত প্রাচীন গ্রন্থও আছে। প্রফেসর মংসানু লিখেছেন, মারমাদের নিজস্ব হরফে 'পী' [তাল জাতীয়] পাতায় কিংবা বিশেষ ধরনের তৈরি করা হলুদ রঙা কাগজে বনজ গাছ-গাছড়া দিয়ে তৈরি করা অমোচনীয় কালিতে হাতে লেখা বিভিন্ন বিষয়ের উপর অসংখ্য পুথি-পুস্তক রয়েছে। এসব পুস্তকে রয়েছে ঋতু পরিবর্তনের সাথে প্রাকৃতিক পরিবর্তনের চিত্তাকর্ষক কাব্যিক বর্ণনা, বিভিন্ন গল্প ও রূপকথার মনোমুগ্ধকর কাহিনি, লোকনীতি, লোকাচার, পারিবারিক আইন, উত্তরাধিকার আইন, বনজ ঔষধ সম্পর্কীয় বিষয় ও ধর্মীয় পুস্তক (মং সানু, ২০১৮ পৃ. ১৯৪)। অনেক ক্ষেত্রে দেব-দেবীর পূজার শ্লোক মন্ত্র-তন্ত্র, তাবিজ/মাদুলি-লিখন ইত্যাদি কাজে এ বর্ণমালা ব্যবহৃত হয় (উ চ নু, ২০০৭, পৃ. ১৫০-১৫১)। কিন্তু তা সত্ত্বেও আগে মারমাদের মাতৃভাষা আধুনিক শিক্ষাক্রমভিত্তিক প্রাতিষ্ঠানিক শিক্ষার বাহন হয়ে ওঠেনি।

বান্দরবানের ম্রো জাতিসত্তা ভাষাচর্চায় খুবই সক্রিয়। তারা মুরং নামে সমধিক পরিচিত। ম্রোরা নিজেদেরকে 'ম্রো-চা' বলে। এর অর্থ মানব-সন্তান। ম্রোদের মাতৃভাষা-চর্চার ইতিহাস খুবই চিত্তাকর্ষক। এককালে ম্রোদের কোনো নিজস্ব বর্ণমালা ছিল না। কিন্তু তারা উপলব্ধি করে যে, ভাষাকে সঠিকভাবে প্রকাশের জন্য বর্ণমালার বিকল্প নেই। অক্ষর ছাড়া ভাষাকে জীবিত রাখা সম্ভব নয়। মাতৃভাষা চর্চার জন্য নিজস্ব লিপি ও বর্ণমালার একান্ত প্রয়োজন। ম্রোদের কিংবদন্তি পুরুষ ও মহাসাধক মেনলে ম্রো (ক্রামাদি) ম্রো বর্ণমালা উদ্ভাবন করেন ১৯৮৪-৮৫ সালে। তাঁর উদ্ভাবিত বর্ণমালায় মোট ৩১টি বর্ণ রয়েছে। ম্রোদের বর্ণমালার সাথে রোমান, শ্যাম, বর্মি ও চৈনিক বর্ণমালার কিছু সাদৃশ্য রয়েছে। এ প্রসঙ্গে বিশিষ্ট ম্রো কবি ও লেখক সিং ইয়ং ম্রো লিখেছেন:

> ১৯৮৫ সালে ২৫ আগস্টের রবিবার দিনটি ছিল ম্রো জাতির এক ঐতিহাসিক দিন। এ দিনে পোড়া পাড়ায় (মেনলের নিজস্ব গ্রাম) প্রায় ৫ হাজার ম্রো উপস্থিত ছিলেন। তিনি স্বয়ং সেদিন ৫ হাজার লোকের উপস্থিতিতে তাঁর আবিষ্কৃত বর্ণমালা গ্রন্থের মোড়ক উন্মোচন করে পাঠ করলেন। তখন ৫ হাজার লোক আনন্দে উৎফুল্লে অভিবাদন জানিয়ে চিৎকার ও করতালির মাধ্যমে মেনলে ম্রো এর বর্ণমালা গ্রহণ করলো। তাঁর আবিষ্কৃত বর্ণমালা গ্রন্থ গ্রহণ করবে তা তিনি বুঝতে

পারেননি। তাই তিনি জনগণের উৎফুল্লতা দেখে আনন্দে কান্নায় ভেঙ্গে পড়েন।' (ম্রো, ২০০৫, পৃ. ৬৮-৮১)

১৯৮৬ সালের আগস্ট মাসে আধ্যাত্মিক সাধনার উদ্দেশ্যে নিরুদ্দেশে চলে যান মেনলে ম্রো। যাবার আগে তাঁর অনুসারী শিষ্যদের মাঝে ভাষা ও বর্ণমালা, তাঁর প্রববর্তিত ক্রামা ধর্মের পাণ্ডুলিপি, সামাজিক নীতিমালা, চিকিৎসা-সেবার জন্য নিজ হস্তে ম্রো ভাষা ও বর্ণমালায় লিখিত সকল পাণ্ডুলিপি হস্তান্তর করে যান এবং প্রয়োজনীয় দিক-নির্দেশনাও দিয়ে যান। এরপর তাঁর অনুসারীরা ১৯৮৬ সালে পোড়া পাড়ায় 'ম্রোচ চা সাংরা' অর্থাৎ ম্রো ভাষা শিক্ষা কেন্দ্র প্রতিষ্ঠা করে। ম্রো ভাষা ও বর্ণমালার উপর অধিকতর গবেষণা, প্রকাশনাসহ অনুশীলন-কেন্দ্র গড়ে তোলার লক্ষ্যে ১৯৯০ সালের ১৮ই জানুয়ারি গঠিত হয় 'ম্রো ভাষা বর্ণমালা সংরক্ষণ ও উন্নয়ন কমিটি'। ১১ সদস্য-বিশিষ্ট কমিটির মাধ্যমে ভাষা-কমিটির অগ্রযাত্রা শুরু হয়। ১৯৯৩ সালে গঠিত হয় উপজেলাভিত্তিক উপ-কমিটি। ১৯৯৬ সালে ১২ই ডিসেম্বর মেনরুম ম্রো তথ্য-প্রযুক্তির এ বিশ্বে ম্রো ভাষার বর্ণমালাকে প্রযুক্তির আওতায় নিয়ে আসেন। তিনি উদ্ভাবন করলেন *রিয়েন* নামে ম্রো ভাষার একটি ফন্ট। ম্রো ভাষা ও বর্ণমালাকে তিনি আধুনিক বিশ্বের সামনে উপস্থাপনে সক্ষম হন। ম্রোরা বর্তমানে নিজ ভাষায় শতকরা ৬০ ভাগ সাক্ষরতা অর্জন করেছে (ম্রো, ২০১৯, পৃ. ১১০)।

২০০০ সাল থেকে সরকারি প্রতিষ্ঠান তথা বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ম্রো শিক্ষার্থীদের নিয়ে 'ম্রো ভাষা শিক্ষা কোর্স' চালু করে। এতে ম্রোদের ভাষা-শিক্ষার চেতনা আরো সুদৃঢ় হয়। এক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেন শিক্ষক মেনয়াং ম্রো। তিনি ম্রো ভাষা (অক্ষরজ্ঞান) প্রশিক্ষণের জন্য 'ম্রোচা চাসাংওয়ান' অর্থাৎ 'ম্রো প্রাইমার' নামে একটি গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, যার আলোকে বান্দরবান ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ম্রো ভাষা শিক্ষা কোর্স (অক্ষরজ্ঞান) পরিচালনা করছে। ২০০৫ সাল থেকে গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র ম্রো ভাষা শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করে। গণস্বাস্থ্য কেন্দ্র বান্দরবান জেলার সাতটি উপজেলায় মোট ৩৫টি গ্রামে গণপাঠশালা নামে ম্রো ভাষায় স্কুল পরিচালনা করে। ম্রো শিশুরা এ গণপাঠশালাগুলোতে শিশু শ্রেণি থেকে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত মাতৃভাষায় পড়ালেখার সুযোগ লাভ করে। প্রায় ১০০০ ম্রো ছেলে-মেয়ে এসব প্রতিষ্ঠানে ম্রো ভাষায় শিক্ষা লাভ করে তাদের প্রাথমিক শিক্ষার বুনিয়াদ শক্ত করে। ফলে এ বিদ্যালয়গুলো থেকে পড়াশুনা করে অনেক শিক্ষার্থী দেশের বিভিন্ন সরকারি-বেসরকারি বিদ্যালয়ে ভর্তির সুযোগ লাভ করে। অন্যদিকে ইউএনডিপি-চিএইচটিডিএফ-এর অর্থায়নে 'তৈমু' ২০০৮-০৯ সালে মাল্টি ল্যাঙ্গুয়েজ এডুকেশন-এর মাধ্যমে থানচি উপজেলায় ৫টি ম্রো গ্রামে ম্রো ভাষা বিদ্যালয় পরিচালনা করে। বর্তমানে ম্রোদের উন্নয়ন সংস্থা 'ম্রোচেট' বান্দরবান সদর, রোয়াংছড়ি, থানচি, রুমা ও আলীকদম উপজেলায় ৪৫টি ম্রো গ্রামে ম্রো ভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম পরিচালনা করছে। এ আওতায় ১৫০০ জন ম্রো শিক্ষার্থী মাতৃভাষার মাধ্যমে শিক্ষাগ্রহণের সুযোগ পাচ্ছে (ম্রো, ২০২৪, পৃ. ১১১)।

আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষণার পরবর্তী পর্বে বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা-চর্চার ধারা

চাকমা জাতিসত্তার মাতৃভাষা উদ্যোগ

১৯৯৭ সালে শান্তিচুক্তি সম্পাদন এবং ১৯৯৯ সালে একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস হিসেবে স্বীকৃতিলাভের ঘটনায় পার্বত্য অঞ্চলের জাতিসত্তাগুলোর মধ্যে মাতৃভাষা-চর্চার নতুন উদ্দীপনা দেখা দেয়। এবারেও তরুণ ছাত্রসমাজ এগিয়ে আসে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জগন্নাথ হলে অবস্থানকালে কয়েকজন চাকমা তরুণ ছাত্রযুবক মিলে ২০০০ সালের ১লা জানুয়ারি গঠন করে 'চাকমা সাহিত্য বাহ' বা

'চাকমা সাহিত্য কেন্দ্র'। এর অন্যতম উদ্যোক্তা বাবু দেবপ্রিয় চাকমার নিকট থেকে ব্যক্তিগত সাক্ষাৎকারে প্রাপ্ত তথ্যানুসারে 'বিশ্ব সাহিত্য কেন্দ্র'র আলোকে নবগঠিত সংগঠনটির নামকরণ করা হয়েছে 'চাকমা সাহিত্য বাহ' এবং এর লক্ষ্য-উদ্দেশ্য হচ্ছে:

১. চাকমা ভাষা ও বর্ণমালার উন্নয়ন, সম্প্রসারণ, সংরক্ষণ ও গবেষণা।
২. চাকমা ভাষায় লিখিত কবিতার বই, নাটক, গল্প, উপন্যাস ইত্যাদি মুদ্রণ তথা প্রকাশ করা।
৩. চাকমা লোকসাহিত্য (রূপকথা, কিংবদন্তি, ধাঁধা, পালা, প্রবচন ইত্যাদি) সংগ্রহ, সংরক্ষণ ও প্রকাশ করা।
৪. চাকমা জাতির ইতিহাস ও ঐতিহ্য সংরক্ষণ ও গবেষণা।
৫. চাকমা সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতির নান্দনিক চর্চা এবং বিকাশ ঘটানো।
৬. ভাষা-সাহিত্য, শিল্প ও সংস্কৃতি সম্পর্কিত সংগঠনের সাথে সুসম্পর্ক স্থাপন ও অংশীদারিত্বের ভিত্তিতে কাজ করা।
৭. চাকমা ভাষা, সাহিত্য ও সংস্কৃতি বিকাশের লক্ষ্যে বিভিন্ন সেমিনার, কর্মশালা, পাঠচক্র ও বইমেলার আয়োজন করা।
৮. বিদেশি বা অন্যভাষায় লিখিত বিখ্যাত বই চাকমা ভাষায় এবং চাকমা ভাষার বই বিদেশি বা অন্য ভাষায় অনুবাদ করা।
৯. চাকমা একাডেমি প্রতিষ্ঠা ও চাকমা আর্কাইভ প্রতিষ্ঠা করা।

উপর্যুক্ত উদ্দেশ্যগুলোর মাধ্যমে নিজেদের মাতৃভাষা সম্পর্কে চাকমা তরুণদের গঠনমূলক চিন্তাচেতনার পরিচয় পাওয়া যায়। এ লক্ষ্য-উদ্দেশ্যগুলো বাস্তবায়নে তারা প্রতিশ্রুতিবদ্ধ। 'চাকমা সাহিত্য বাহ'র উদ্যোগে ২০০৪ সাল থেকে চাকমা ভাষা লেখার প্রশিক্ষণ কোর্স শুরু হয়। মোহাম্মদপুরে অবস্থিত ঢাকা ট্রাইবাল হোস্টেলে প্রশিক্ষণ-কোর্সের উদ্‌বোধন করেন তৎকালীন মাননীয় উপমন্ত্রী বাবু মণি স্বপন দেওয়ান এমপি (*ভোরের কাগজ*, ১৮ই সেপ্টেম্বর, ২০০৪)। সংগঠনটি চাকমা ভাষা শেখানোর ক্ষেত্রে নিজস্ব হরফ ব্যবহারের ওপর গুরুত্ব দেয়। কারণ, চাকমা লিপি হচ্ছে চাকমা জনগোষ্ঠীর প্রাচীন ঐতিহ্যের এক উজ্জ্বল স্মারক। তাছাড়া চাকমা ভাষাটি বাংলা বা রোমান হরফে লিখতে গেলে ভাষিক স্বকীয়তার বিচ্যুতি ঘটে। এ কারণে 'চাকমা সাহিত্য বাহ'র প্রথম কর্মসূচি ছিল কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয় তথা শিক্ষিত তরুণদের চাকমা বর্ণমালার ওপর প্রশিক্ষণ প্রদান। 'চাকমা সাহিত্য বাহ' মাতৃভাষা শেখা ও শেখানোর কাজটি সফল করার জন্য বই-সংরক্ষণ, লিখন ও মুদ্রণের দিকেও দৃষ্টি দেয়। সংগঠনের উদ্যোগে খাগড়াছড়িতে একটি পাঠাগার স্থাপিত হয়েছে। এছাড়া ইনজেব চাকমাদের পরিচালিত খাগড়াছড়ির নোয়ারাম সাহিত্য সংসদ অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে চাকমা ভাষা শিখানোর কাজ চালিয়ে যাচ্ছে। এ সংগঠনের উদ্যোগে এ পর্যন্ত ২৪৩টি সেন্টারে ২৫৬টি কোর্স পরিচালনার মাধ্যমে প্রায় ১৫,০০০ প্রশিক্ষণার্থীকে চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা লেখার প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় (চাকমা, ৩০শে জুন, ২০২৪)।

হাতে-কলমে মাতৃভাষা শিক্ষা ও প্রশিক্ষণ প্রদানের পাশাপাশি চাকমা তরুণরা তাদের মাতৃভাষার ডিজিটালাইজেশন ও প্রযুক্তিকীকরণেও বহুদূর এগিয়ে গিয়েছে। প্রতিশ্রুতিশীল চাকমা বর্ণমালা-গবেষক বিভূতি চাকমা ও জ্যোতি চাকমার নিরলস ও অদম্য প্রচেষ্টায় চাকমা বর্ণমালা লেখার 'রিবেং ইউনি' কি-বোর্ড উদ্ভাবিত হয়েছে। তাদের উদ্ভাবিত সফটওয়ার ব্যবহার করে এখন কম্পিউটার এবং স্মার্টফোনে

চাকমা ভাষা লেখা যায়। চাকমা ভাষা গুগলে ব্যবহারের জন্য ইউনেস্কোর অনুমোদনও তারা পেয়েছে। এভাবে চাকমাদের মাতৃভাষা-চর্চায় আধুনিক প্রযুক্তির ছোঁয়া লেগেছে। জ্যোতি চাকমার নিচের বক্তব্য থেকে চাকমা বর্ণমালার ডিজিটালাইজেশন সম্পর্কে তাঁদের ভাবনাগুলো বোঝা যায়:

> চর্চার অভাবে আজ আমাদের ঐতিহ্যবাহী চাকমা বর্ণমালা নিভু নিভুভাবে কোনো রকমে বেঁচে রয়েছে। তবে বর্তমান তথ্য প্রযুক্তির যুগে শুধু বর্ণমালার সাথে পরিচিতি এবং চর্চা থাকলেও সেই বর্ণমালা দীর্ঘদিন টিকিয়ে রাখা সম্ভব নয়। আধুনিক যুগে বর্ণমালাকে নতুন প্রজন্মের কাছে পরিচিত করতে এবং টিকিয়ে রাখার জন্য বর্ণমালাকে আধুনিক প্রযুক্তির সাথে যুক্ত করা প্রয়োজন। নচেৎ তা হারিয়ে যাওয়ার পথে ধাবিত হবে। এ অনুধাবনের পরিপ্রেক্ষিতে আমরা দীর্ঘদিন ধরে চাকমা বর্ণমালার ইউনিকোড ফন্ট তৈরি করার চেষ্টা করছিলাম। ইউনিকোড ফন্ট তৈরি করা গেলে চাকমা বর্ণমালা আধুনিক তথ্যপ্রযুক্তিতে যুক্ত হবে। আজ আমরা নিজেকে গর্বিত বোধ করছি এজন্য যে, আমাদের ঐকান্তিক প্রচেষ্টায় চাকমা বর্ণমালা আজ ইউনিকোডে অন্তর্ভুক্ত হয়েছে (জ্যোতি, ২০১৩, পৃ. ১৪৮)।

আরেকজন অদম্য তরুণ চাকমা মাতৃভাষা প্রেমিক বিভূতি চাকমা সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত আগ্রহ থেকে প্রযুক্তি ব্যবহার করে চাকমা বর্ণমালাগুলোর উন্নয়ন-সাধনে আত্মনিয়োগ করেন। তিনি তাঁর চাকমা বর্ণমালার প্রযুক্তিগত উন্নয়ন কর্মপ্রয়াসকে একটি বইয়ের মাধ্যমে তুলে ধরেছেন। বিভূতি চাকমা ২০১৮ সালে 'প্রযুক্তিতে চাকমা ভাষার উন্নয়ন' শিরোনামে প্রকাশিত গ্রন্থে চাকমা বর্ণমালা কি-বোর্ড বা ইউনিকোড উদ্ভাবন এবং কম্পিউটার ও স্মার্টফোনে তা প্রয়োগের দীর্ঘ ও বহুমুখী প্রক্রিয়া তুলে ধরেন। নিজের বই প্রসঙ্গে তাঁর বক্তব্য হচ্ছে:

> চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা সম্পর্কে সম্যক ধারণা প্রদানসহ এ ভাষাকে তথ্য-প্রযুক্তিতে যুক্ত করার জন্য আমার এ ক্ষুদ্র উদ্যোগ।' মাতৃভাষা সম্পর্কে তাঁর অনভূতি খুবই আবেগমথিত: 'মায়ের ভাষার মত মধুর ভাষা এ পৃথিবীতে আর কোন ভাষা নেই। ভাষাপ্রেমিক মাত্রই তা উপলব্ধি ও অনুধাবন করতে পারবেন। চাকমা আমাদের মায়ের ভাষা ও প্রাণের ভাষা। দুনিয়াতে ভূমিষ্ঠ হওয়ার প্রথম যে ভাষায় মা বলে ডেকেছি। নিজের মাতৃভাষাকে ভুলে যাওয়া আমাদের মোটেও কাম্য নয় (চাকমা, ২০১৮, প্রসঙ্গ কথা)।

এভাবে একুশ শতকের সূচনালগ্নে চাকমা তরুণ প্রজন্ম মাতৃভাষার প্রতীক বর্ণমালার উন্নয়ন ও শিক্ষাদানের লক্ষ্যে একনিষ্ঠভাবে কাজ করে যাচ্ছেন। এটা অবশ্যই আশাব্যঞ্জক। উপযুক্ত পৃষ্ঠপোষকতা, সমর্থন ও সহযোগিতা পেলে এই তরুণ প্রজন্ম মাতৃভাষার উন্নয়নে আরো গুরুত্বপূর্ণ অবদান রাখতে পারবে।

ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা চর্চা

ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা ককবরক। তাদের নিজস্ব হরফ নেই। ২০০০ সাল পর্যন্ত তারা বাংলা হরফে মাতৃভাষা চর্চা করতো। খুশিকৃষ্ণ ত্রিপুরা তাদের মাতৃভাষা-চর্চার পথিকৃৎ। এরপর সুরেন্দ্র লাল ত্রিপুরা ও প্রভাংশু ত্রিপুরা বাংলাভাষায় ত্রিপুরা ইতিহাস ও ঐতিহ্য নিয়ে লেখালেখি করেন। নারীদের মধ্যে শোভারাণী ত্রিপুরা সাহিত্যচর্চায় সুনাম কুড়িয়েছেন। কিন্তু ত্রিপুরা রাজ্যের স্বজাতীয় ত্রিপুরাদের সাথে সঙ্গতি রেখে বাংলাদেশের ত্রিপুরা জনগোষ্ঠীও এখন রোমান হরফে মাতৃভাষা চর্চা করছে। তবে বাংলা হরফেও কেউ

কেউ ভাষা ও সাহিত্য চর্চা করে থাকেন। এ প্রসঙ্গে বহুভাষিক শিক্ষা-গবেষক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার বক্তব্য হলো:

> ২০০০ সালে ভারতে একটি ওয়ার্কশপ হয়, সেখানে বাংলাদেশে থাকা ত্রিপুরাদেরও ডাকা হয়েছিল। আমরা বাংলাদেশের বিভিন্ন অঞ্চলে যে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী আছি, তাদের কিছু মানুষ সেখানে গিয়েছিলাম। সেখান থেকে মূলত আলোচনা করে সিদ্ধান্ত হয়, আমাদের যেহেতু নিজস্ব হরফ নেই, নতুন করে হরফ বানাতে গেলে আমাদের অনেক সময় লাগবে। প্রস্তাব আসে যে বাংলা বা রোমান যে-হরফে আমরা লিখতে পারি, সে-হরফেই আমরা নিজেদের ভাষা লিখবো। তবে আমরা অফিসিয়ালি লিখলে রোমান হরফেই লিখব বলে সিদ্ধান্ত হয়' (বিডি নিউজ ২৪ ডটকম, ১৯ অক্টোবর, ২০২২)।

ব্যক্তিগত উদ্যোগে প্রার্থনা কুমার ত্রিপুরা, মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, জগদীশ রোয়াজা, প্রশান্ত ত্রিপুরা, মুকুল কান্তি ত্রিপুরাসহ অনেকেই ত্রিপুরাদের মাতৃভাষা চর্চা ও উন্নয়নে কাজ করছেন। তারা মাতৃভাষায় ছড়া, কবিতা, গান, নাটক রচনার পাশাপাশি রূপকথাগুলো গ্রন্থিত করার কাজে যুক্ত আছেন। এর মধ্যে ককবরক ভাষার উন্নয়নে মথুরা বিকাশ ত্রিপুরার ভূমিকা বেশ প্রশংসনীয়। তিনি ২০০২ সালে নিজ উদ্যোগে স্বলিখিত প্রথম বই *ককবরক শব্দ ভান্ডার* প্রকাশ করেন। এটি মূলত বাংলা ও ইংরেজি শব্দার্থসহ ককবরক শব্দমালার বই। বইটির উপযোগিতা ও চাহিদা বিবেচনা করে খাগড়াছড়ি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট ২০১১ সালে বর্ধিত সংস্করণ প্রকাশ করে। নিঃসন্দেহে তরুণ লেখকের জন্য এটি একটি বড়ো অনুপ্রেরণাদায়ক ঘটনা। এরপর দ্বিগুণ উৎসাহে তিনি 'জাবারাং কল্যাণ সমিতি'র মাধ্যমে ত্রিপুরাসহ আদিবাসী শিশুদের জন্য মাতৃভাষার উপযোগী বই প্রণয়নের কাজে হাত দেন। ২০০৬ সালে 'জাবারাং কল্যাণ সমিতি' চাকমা, মারমা ও ককবরক (ত্রিপুরা) ভাষায় প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষা কার্যক্রম শুরু করে। 'সেভ দ্য চিলড্রেন'র অর্থায়নে এ কার্যক্রম পরে তৃতীয় শ্রেণি পর্যন্ত সম্প্রসারিত হয়। এর জন্য ২০০৭ সালে মুখরা বিকাশ ত্রিপুরা ককবরক ভাষায় প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় শ্রেণির জন্য পাঠ্যপুস্তক রচনা করেন। কারিতাস বাংলাদেশ-এর প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির আওতায় উক্ত বইগুলো প্রকাশিত হয়। শুধু তাই নয়, মথুরা বিকাশ ত্রিপুরাসহ কিছু মাতৃভাষাপ্রেমী তরুণ তাদের নিজ ভাষা ককবরক প্রমিতকরণ, ককবরক বিষয়ক প্রশিক্ষণ, ককবরকে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ইত্যাদি কাজ সম্পন্ন করার জন্য ২০০৮ সালে 'ককবরক রিসার্চ ইনস্টিটিউট' নামে একটি সংগঠন প্রতিষ্ঠা করেন (ত্রিপুরা, ২৮শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)।

২০১৭ সাল থেকে সরকারি উদ্যোগে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরের পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কাজ শুরু হলে ত্রিপুরাদের ককবরক চর্চায় নবপ্রাণ সঞ্চারিত হয়েছে। মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ডের অধীনে গঠিত ভাষাভিত্তিক লেখক প্যানেলে 'ককবরক ভাষা'র দলনেতা হিসেবে মনোনীত হন। বাংলাদেশ সরকারের আদিবাসী শিশুদের মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা কর্মসূচির জন্য পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন ও উপকরণ তৈরির কাজ সম্পাদন করছেন একদল লেখক, গবেষক ও শিক্ষক। মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, প্রার্থনা কুমার ত্রিপুরা, অলিন্দ্র লাল ত্রিপুরা, প্রশান্ত কুমার ত্রিপুরা, সত্যহা পানজি ও জগদীশ রোয়াজার উন্নয়ন ও অভিযোজনে ২০১৬ সালে মুদ্রিত হয়েছে ককবরক ভাষায় রোমান হরফে রচিত প্রাক-প্রাথমিক শিক্ষার বই 'ANI BIJAP' বা 'আমার বই'। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য, বাংলাদেশ সরকার জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এর আলোকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য পাঠ্যপুস্তকসহ প্রয়োজনীয় শিখনসামগ্রী

উন্নয়নের কার্যক্রম হাতে নেয় ২০১৪ সালে। পাঠ্যপুস্তক বোর্ড চেয়ারম্যান পাঠ্যবইয়ের ভূমিকায় আদিবাসী ভাষাভাষী লেখকদের ভূয়সী প্রশংসা করে লিখেছে:

> স্বাধীন বাংলাদেশের ইতিহাসে এ এক ঐতিহাসিক ঘটনা। ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর শিশুরা যেন শিখন-শেখানো প্রক্রিয়ার ভিতর দিয়ে তাদের নিজস্ব ইতিহাস, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি ও জীবনাচরণের প্রতিটি বিষয়ের সাথে পরিচিত হতে পারে এবং গর্ববোধ করতে পারে– প্রণীত পাঠ্যপুস্তকগুলোতে তার পর্যাপ্ত ব্যবস্থা রাখা হয়েছে। এই কাজটি সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন করার জন্য স্ব স্ব ভাষাভাষী জনগোষ্ঠীর শিক্ষক ও পণ্ডিতজনদের নিয়ে উন্নয়ন ও অভিযোজনের কাজটি সম্পন্ন করা হয়েছে। যে শ্রম, মেধা ও নিষ্ঠাসহকারে তারা এই মহৎ উদ্যোগটি সম্পন্ন করেছেন, তার তুলনা চলে না।

মারমাদের মাতৃভাষা চর্চার অগ্রগতি

মারমাদের নিজস্ব হরফ আছে। তারাও মাতৃভাষা চর্চা করছে। স্মরণাতীতকাল থেকে তাদের মধ্যে ক্যাং বা বিহার-ভিত্তিক মারমা বর্ণমালা চর্চার চল ছিল। তবে আগে তাদের মাতৃভাষাভিত্তিক কোনো সংগঠন গড়ে ওঠেনি। 'বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল' মারমা ভাষা ও বর্ণমালা শিক্ষার গুরুত্ব নিয়ে সামাজিক সচেতনতা সৃষ্টির চেষ্টা করে থাকে। একুশ শতকের শুরুতে সংগঠনের উদ্যোগে বান্দরবান সদরের উজানি পাড়ায় মারমা শিক্ষার্থীদের জন্য মারমা ভাষা ও বর্ণমালা প্রশিক্ষণের উদ্যোগ গ্রহণ করা হয়। কিন্তু শিক্ষার্থীর সংখ্যা ক্রমশ হ্রাস পাওয়ায় উদ্যোগটি আর অগ্রসর হয়নি। মারমা বুদ্ধিজীবীদের মতে, চর্চার অভাবে মারমা ভাষা ও বর্ণমালা এখনো বিপন্নতার বিপদ কাঠিয়ে উঠতে পারেনি। আশার কথা হলো, বিভিন্ন বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থার কল্যাণে মারমা ভাষা-শিক্ষার একটি ক্ষীণ ধারা বহমান আছে। ২০০২ সালে বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব থিয়েটার আর্টস (বিটা) মারমা শিশুদের মারমা ভাষা ও বর্ণমালার সাথে সম্পৃক্ত করার লক্ষ্যে শিশুদের উপযোগী করে একটি বর্ণমালা-পরিচিতি প্রকাশ করে। এটি ছিল প্রাক-প্রাথমিক শিশুদের উপযোগী পাঠ্যবই (মারমা, ২০১১, পৃ. ৮-১৬)। এ পুস্তিকায় মারমা শব্দভান্ডারের পাশাপাশি বাংলা শব্দার্থও রাখা হয়েছে। কিন্তু শিখন-শেখানো কার্যক্রম পরিচালনা করতে গিয়ে উচ্চারণ বিভ্রাট ধরা পড়ে। এমন বাস্তবতায় ২০০৫ সালে কারিতাস-আইসিডিপি-সিএইচটি প্রকল্পের আওতায় 'সবার জন্য শিক্ষা' নীতি এবং সহস্রাব্দ উন্নয়ন লক্ষ্যমাত্রা বাস্তবায়নের লক্ষ্যে আদিবাসী শিশুদের নিজস্ব মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের বিষয়টি বেশ গুরুত্বসহকারে বিবেচিত হয়। এ লক্ষ্যে কারিতাস মারমা, চাকমা ও ত্রিপুরা ভাষায় পাঠ্যবই প্রকাশ করেছে এবং ৩০টি শিক্ষাকেন্দ্রে সম্প্রদায়ভিত্তিক পাঠদান কার্যক্রম পরিচালনা শুরু করেছে। এ কর্মসূচির আওতায় মারমা শিশুদের জন্য প্রাক-প্রাথমিক থেকে ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই প্রকাশ করা হয় (মারমা, ২০১১, পৃ. ৮-১৬)। এ পুস্তকগুলো আধুনিক ভাষা-শিক্ষার পদ্ধতি ও কৌশল অবলম্বন করে প্রণীত হওয়ায় এবং বিষয়বস্তুতে মারমাদের সংস্কৃতি ও ইতিহাস, ছড়া, গল্প, কবিতা অন্তর্ভুক্ত হওয়ায় মানসম্মত বলে বিবেচিত হয় এবং মারমা সমাজেও গ্রহণযোগ্যতা লাভ করে। একইসময় উন্নয়ন সংস্থা সিসিডিপি এবং জাতীয় পর্যায়ের এক এনজিও যথাক্রমে ২০০৫ ও ২০০৬ সালে মারমা শিশুদের মাতৃভাষা শিক্ষাদানের উদ্দেশ্যে পাঠ্যবই প্রকাশ করে। অতঃপর ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ কর্তৃক সেভ দ্য চিলড্রেন ইউকে ও এসআইএল (সিল)-এর সহযোগিতায় পার্বত্যাঞ্চলের মারমা শিশুদের জন্য মারমা হরফে ২০০৯ সাল থেকে পরীক্ষামূলকভাবে প্রাক-প্রাথমিক পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন করা হয়। ইউএনডিপি-সিএইচটিডিএফ পরিচালিত ১০০টি মারমা শিশু শিক্ষাকেন্দ্রে উক্ত পাঠ্যবই সরবরাহ ও পাঠদানের ব্যবস্থা হয় (মারমা, ২০১১, পৃ. ১৬)। উক্ত স্কুলগুলো বর্তমানে পার্বত্য জেলা পরিষদের

তত্ত্বাবধানে পরিচালিত হচ্ছে। এরপরেই গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর জন্য প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক স্তরে মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের কর্মসূচি গ্রহণ করে। মারমা জনগোষ্ঠীও এর অন্তর্ভুক্ত হয়। এনসিটিবির নির্দেশনায় গঠিত হয় মারমা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক রচনার লেখকদল। তিন পার্বত্য জেলা থেকেই মারমা ভাষায় দক্ষ লেখকবৃন্দ এ বিশাল কর্মযজ্ঞের সঙ্গে যুক্ত হন। খাগড়াছড়ি থেকে ডা. অংক্যজাই মারমা, হ্লাসিংথোয়াই মারমা, থোয়াইউ মগ, রাঙ্গামাটি থেকে উ উইনমং জলি (জলি মং), বান্দরবান থেকে উচিমং মারমাসহ শৈফোচিং মারমা, মংখ্যইচিং মারমা প্রমুখ। তাদের মেধা, দক্ষতা ও নিষ্ঠায় জাতীয় শিক্ষাক্রম ও পাঠ্যপুস্তক বোর্ড থেকে 'আমার বই', 'এসো লিখতে শিখি' ও নানা গল্পের বই মুদ্রিত হয়েছে।

সরকারি, বেসরকারি প্রতিষ্ঠানের পাশাপাশি শিক্ষিত তরুণ মারমারাও আপন ভাষা সংরক্ষণ, চর্চা ও শিক্ষাদান সম্পর্কে সচেতন হয়েছে। তরুণ প্রজন্মের মারমাদের মাতৃভাষা বিষয়ক ভাবনা খুবই চিত্তাকর্ষক এবং আশাপ্রদ। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞানের শিক্ষার্থী খুব প্রাঞ্জল ভাষায় মাতৃভাষা-চর্চার গুরুত্ব তুলে ধরেছেন। তাঁর মতে:

> মা, মাতৃভাষা ও মাতৃভূমি মানুষের চির শ্রদ্ধার বস্তু। বাংলাদেশ আমাদের মাতৃভূমি আর স্রাইমা (মারমা) আমাদের মাতৃভাষা। মায়ের সাথে আমাদের যেমন নাড়ির যোগ, ভাষার সঙ্গে তেমনি প্রাণের যোগ। স্রাইমা ভাষা আমাদের ঐতিহ্যের বাহন ও চেতনার ধারক। এ ভাষাতে আমরা প্রথম কথা শিখি, লিখন শিখি, গান করি, সর্বোপরি ভাবের আদান-প্রদান করি। এই ভাষার প্রতিটি শব্দই আমাদের প্রিয় (স্রাসাজাই, ২০১১, পৃ. ৩৪)।

মাতৃভাষার লেখ্যরূপ নিয়ে সচেতন ও মাতৃভাষাপ্রেমী মারমা তরুণ সমাজ এগিয়ে আসলে মারমা ভাষা ধীরে ধীরে বিকশিত হবে। তরুণদের মধ্যে বিভিন্ন লিটন ম্যাগাজিন, ধর্মীয় অনুষ্ঠানের স্মরণিকা ও স্মারকগ্রন্থে এখনো মারমা অক্ষরে প্রবন্ধ, কবিতা, গান, গল্প রচনার চেষ্টা ও উৎসাহ দেখা যায়। অন্যদিকে মারমা ভাষা ও বর্ণমালাকে আধুনিক প্রযুক্তির মাধ্যমে শিক্ষাদানের ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন থোয়াইউ মগ। তিনি খাগড়াছড়ির একজন ফ্রিল্যান্সার ও গ্রাফিক্স ডিজাইনার। থোয়াইউ ২০১৬ সালে 'আমার মারমা স্কুল' নামে মারমা বর্ণমালা শেখার অ্যানিমেশন ও শিশুতোষ গল্পের বই তৈরি করে কার্টুনের মাধ্যমে মারমা ভাষা শিক্ষার ব্যবস্থা করেছেন। তিনি লিখন পদ্ধতিকে আরো সহজ করে শেখার ব্যবস্থা করায় মারমা শিশুরা ব্যাপক আগ্রহ ও উৎসাহ নিয়ে পড়ছে আমার মারমা স্কুলে (চ্যানেল আই, ২০২৪)। এর মধ্য দিয়ে মারমা মাতৃভাষা অধ্যয়ন ও লিখন ডিজিটাল প্রযুক্তির যুগে প্রবেশ করেছে।

বমদের মাতৃভাষা ও বর্ণমালা চর্চা

বর্তমান বান্দরবান পার্বত্য জেলার রুমা, থানচি, রোয়াংছড়ি এবং বান্দরবান সদর থানা, রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার পাঁচটি উপজেলায় ৭০টি গ্রামে বমরা বসবাস করে। বম সোশ্যাল কাউন্সিল, বাংলাদেশ-এর উদ্যোগে ১৯৯৮ সালে পরিচালিত জরিপ অনুসারে বম জনসংখ্যা ৯৫০০। ২০২২ সালের আদমশুমারি রিপোর্ট অনুযায়ী বম জনসংখ্যা ১৩, ১৯৩ জন। বম জনগোষ্ঠীর শতভাগ খ্রিষ্টান। বমদেরও নিজস্ব মাতৃভাষা আছে। কিন্তু খ্রিষ্টান মিশনারিদের আগমনের আগ পর্যন্ত বম, পাংখোয়া, লুসাই তথা মিজো বা জোদের ভাষায় কোনো বর্ণমালা ছিল না। রেভারেন্ড জে এইচ লোরেইন এবং রেভারেন্ড টি ডব্লিউ স্যাভিজ খ্রিষ্টান মিশনারিদ্বয় মিজোরামের আইজলে আসেন ১৮৯৪ খ্রিষ্টাব্দে। তারা রোমান স্ক্রিপ্ট অনুসরণে বর্ণমালা

প্রবর্তন করেন। তা দিয়ে বাইবেলের অংশ, ধর্মীয় শিক্ষার পুস্তিকা, অভিধান ইত্যাদি বের করেন। ১৯১৮ সালের দিকে পার্বত্য চট্টগ্রামের বম পাংখোয়ারা খ্রিষ্টান ধর্ম গ্রহণ শুরু করে। তখন থেকে তারা রোমান বর্ণমালার অনুকরণে প্রণীত বর্ণমালার ব্যবহার শুরু করে। বমরা এ হরফ দিয়ে নিজস্ব ভাষায় পবিত্র বাইবেল অনুবাদ করে। বাইবেল ছাড়াও ধর্মীয় সংগীত, বাইবেলের ব্যাখ্যাসহ ধর্মীয় পুস্তিকা এবং অন্য বেশ কয়েকটি বই-পুস্তক বম ভাষায় রচিত হয়। বম ছাত্র সংগঠন 'বম স্টুডেন্টস অ্যাসোসিয়েশন' বম ভাষায় *মেনরিহয়* নামে বার্ষিক ম্যাগাজিন প্রকাশ করে। বর্ণমালা পরিচিতি প্রাথমিক বই (Bawm Primer) পারিবারিক, সামাজিক উদ্যোগে অথবা গির্জার উদ্যোগে পড়ানো হয়। এভাবে বমদের মধ্যে মাতৃভাষা চেতনা পোক্ত হয় এবং মাতৃভাষায় স্বাক্ষরতার হার শতকরা আশি ভাগে উন্নীত হয়। তারা চিঠিপত্র, লেনদেন, হিসাবপত্র, সভাসমিতির কার্য-বিবরণী, নথিপত্র তথা সার্বিক সামাজিক তথ্য আদান-প্রদান বম ভাষায় সম্পাদন করে (সাহু, ২০০৪, পৃ. ১৬-২৪)। সম্প্রতি বম সম্প্রদায়ের মধ্যে কেএনএফ-এর কার্যক্রমকে কেন্দ্র করে ব্যাপক অস্থিরতা তৈরি হয়েছে। ফলে তাদের মাতৃভাষার সাম্প্রতিক অগ্রগতির তথ্য সংগ্রহ করা সম্ভব হয়নি।

খিয়াংদের মাতৃভাষা চর্চা

পার্বত্য চট্টগ্রামের খুবই সংখ্যাল্প একটি নৃ-গোষ্ঠী হলো খিয়াং। বর্তমানে রাঙ্গামাটি ও বান্দরবান জেলায় তাদের জনসংখ্যা সাড়ে তিন হাজার। কিন্তু তারাও বহুযুগ ধরে পার্বত্য অঞ্চলে অন্যান্য নৃ-গোষ্ঠীর সাথে বসবাস করে আসছে। খিয়াংরা সংখ্যায়ও কম, আবার বিভিন্নভাবে পশ্চাৎপদ অবস্থায় রয়েছে। কিন্তু দেশের নাগরিক এবং মানুষ হিসেবে নিজস্ব ভাষা, সংস্কৃতি ও ঐতিহ্য নিয়ে বেঁচে থাকার ও বিকশিত হওয়ার অধিকার তাদের আছে। খিয়াংরা মনে করে মাতৃভাষা হচ্ছে সৃষ্টিকর্তার মূল্যবান দান। তাদের মাতৃভাষা কুকি-চীন পরিবারভুক্ত। এজন্য বোধ হয় পার্শ্ববর্তী দেশ মায়ানমারে খিয়াংরা অশো-চীন বা লাইতু-চীন নামে পরিচিত। তবে মাতৃভাষা থাকলেও তাদের নিজস্ব ঐতিহ্যগত হরফ বা বর্ণমালা নেই। তারাও রোমান স্ক্রিপ্ট ব্যবহার করে। খিয়াং ভাষায় প্রারম্ভিক ভাষা-শিক্ষার উদ্দেশ্যে কয়েকজন লেখক এগিয়ে আসেন। তারা হলেন আর টি মাউয়ি ছাকছেউক, ইভান ডলিয়াং, ইভান সইলাহ, উপা সাইমন এবং উপা সাজেই। ১৯৯৯ সালে ' Khyang Primer' শিরোনামে বইটি প্রকাশ করে খ্রিষ্টিয়ান ফেলোশিপ অব বাংলাদেশ। কিন্তু বম ও লুসাই ভাষার আদলে লিখিত হওয়ায় খিয়াংদের মধ্যে এটি সহজপাঠ্য হয়ে ওঠেনি। পরে সচেতন খিয়াং ব্যক্তিরা এটি সংশোধনের উদ্যোগ নেন। এ কাজে যুক্ত ছিলেন পাস্টর অংসাউ মংচ খিয়াং, থয়সাপ্রু খিয়াং, বাবু অং সা খিয়াং, বাবু রবার্ট বাদল খিয়াং ও বাবু শিমশোন খিয়াং। এ প্রসঙ্গে থয়সাপ্রু খিয়াং নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করে লিখেছেন:

> খিয়াং বর্ণমালা বিষয়ে যেহেতু কোনো সুরাহা হচ্ছে না, তাই আমি চিন্তা করলাম, নিজেদের বর্ণমালা বিষয়ে একটা সমাধানে আসা প্রয়োজন। তাই আমি নিজে ব্যক্তিগতভাবে বিষয়টি সমাধানের উদ্যোগ গ্রহণ করি। ... বিগত ৯-১১ অক্টোবর ২০০৭ ইং তারিখ বান্দরবান জেলার রোয়াংছড়ি উপজেলার খামতাং পাড়াতে খিয়াং অ্যালফ্যাবেট নিয়ে ৩ দিনব্যাপী আলোচনা ও মতবিনিময় সভা অনুষ্ঠিত হয়। সেখানকার খামতাং পাড়া ও ক্যয়কপালাং পাড়ার সর্বস্তরের মানুষ অতি উৎসাহের সাথে এসে খিয়াং ভাষার বর্ণমালা নিয়ে আলোচনায় অংশগ্রহণ করেন। সেই তিনদিনে আমরা *খিয়াং প্রাইমার* বইটির অর্ধেকের মতো সংশোধন করে ফেলি। পরবর্তী ২০০৮ সালে ফেব্রুয়ারি মাসে বাকি বইটির অংশ সংশোধনের জন্য পুনরায় খামতাং পাড়াতে যাই। তখন

আমরা ৫-৬ দিনের মধ্যে বইটি পুরোপুরি সংশোধন করে ফেলি (থয়সাপ্রু খিয়াং, ২০২৩, পৃ. ২৩-৩৫)।

অতঃপর সৌভাগ্যক্রমে ২০০৮ সালে ইউএনডিপির আর্থিক সহায়তায় তিন পার্বত্য জেলার স্থানীয় উন্নয়ন সংস্থা সাস, তৈমু ও জাবারাং-এর উদ্যোগে ৭টি ভাষায় মাল্টিলিঙ্গুয়াল এডুকেশন প্রোগ্রাম প্রকল্প গৃহীত হয় এবং তাতে খিয়াং ভাষাও অন্তর্ভুক্ত হয়। কিন্তু অন্তরায় যেন পিছু ছাড়ে না। খিয়াংদের মধ্যেও হরফ ও বর্ণমালা নিয়ে মতানৈক্য সৃষ্টি হয়। মূলত বান্দরবানের ঘুংঘুরু-পাড়ার লাইতু গোত্রের খিয়াং, ক্যাসামং খিয়াং নিজের উদ্ভাবিত বর্ণমালা ব্যবহারের প্রস্তাব করলে এ মতানৈক্যর সূত্রপাত ঘটে। তবু কোংতু খিয়াংরা পূর্বের মতো রোমান বর্ণমালা দিয়েই ইউএনডিপির বহুভাষা শিক্ষা প্রকল্পের কাজ এগিয়ে নিতে বদ্ধপরিকর হন এবং 'খিয়াং ভাষা কমিটি' গঠন করে উক্ত কমিটির মাধ্যমে শিশুদের পাঠ্য-উপযোগী পিপি-১-এর জন্য নিজস্ব রোমান হরফ ব্যবহার করে শিক্ষা-উপকরণ তৈরি করা হয়েছে। পরবর্তীকালে খিয়াং ভাষা কমিটির মাধ্যমে পুনরায় পিপি-২ পাঠ্য-উপযোগী থিম বা বিষয়বস্তু অনুযায়ী পাঠ্যবই তৈরিও সম্পন্ন করা হয়। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলার রাজস্থলী উপজেলায় খিয়াং মাতৃভাষার মাধ্যমে পরিচালিত হতে থাকে এমএলই স্কুল যেখানে খিয়াংভাষী শিক্ষক নিয়োগ দেওয়া হয়। ইউএনডিপির প্রকল্পের মেয়াদ শেষ হলে মাতৃভাষা স্কুলগুলি বন্ধ হয়ে যায়। ফলে খিয়াংদের মাতৃভাষা-চর্চাও স্তিমিত হয়ে বর্তমানে বিপন্ন অবস্থায় উপনীত হয়েছে। অবিলম্বে সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা না পেলে এবং সমগ্র খিয়াং জনগোষ্ঠী হরফ নিয়ে মতানৈক্য নিরসন করে ভাষা রক্ষায় এগিয়ে না এলে খিয়াং ভাষার বিপন্নাবস্থা থেকে সুরক্ষা অনিশ্চিত (থয়সাপ্রু খিয়াং, ২০২৩, পৃ. ২৩-৩৫)। তবে খিয়াং ভাষাকে বিপন্নাবস্থা থেকে সুরক্ষিত রাখার ক্ষেত্রে কিছুটা আশার আলো উদ্ভাসিত হয়েছে ২০১৭ সালে খিয়াংদের মাতৃভাষার হিয়ো বর্ণমালা ও ২০২৩ সালে হিয়ো বর্ণমালার ফন্ট ও কি-বোর্ড উদ্ভাবনের মধ্য দিয়ে। গত বছর ২০২৩ সালের ২৩শে সেপ্টেম্বর বান্দরবানে একটি আড়ম্বরপূর্ণ অনুষ্ঠানে খিয়াংদের মাতৃভাষা হিয়ো বর্ণমালার ফন্ট ও কি-বোর্ড জনসমক্ষে উদ্‌বোধন করা হয়। এ ঐতিহাসিক উদ্‌বোধনের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন চিংসাউ খিয়াং, চিংহ্লাউ খিয়াং, অংসাউ খিয়াং এবং হ্লাক্রয় খিয়াং। তাঁদের মতে, খিয়াং বর্ণমালা খিয়াং জনগোষ্ঠীর ভাষা, কৃষ্টি, সংস্কৃতি ও মূল্যবোধকে ধারণ ও লালন করার উপযোগী করে করা হয়েছে। পাঁচজন মাতৃভাষাপ্রেমিক খিয়াং তরুণের নিরলস গবেষণার ফসল এ হিয়ো বর্ণমালা ফন্ট ও কি-বোর্ড। এ উদ্ভাবনের প্রক্রিয়ায় প্রযুক্তিগত সহায়তায় ছিল ফন্ট ও কি-বোর্ড প্রবর্তক প্রতিষ্ঠান ফিল-এর বিশেষজ্ঞবৃন্দ। তাঁরা হলেন মৃদুল সাংমা, সমর মাইকেল সরেন, বিভাষ দেওয়ান প্রমুখ (*প্রথম আলো*, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৩)।

চাক, খুমি, লুসাই ও পাংখোয়াদের মাতৃভাষা-চর্চা

এ জাতিসত্তাগুলোর জনসংখ্যা খুবই কম। সব মিলিয়ে ৫ হাজারের কম। তাদের পৃথক পৃথক মাতৃভাষা আছে, কিন্তু একটিরও নিজস্ব বর্ণমালা নেই। তিব্বতি-বর্মণভুক্ত চাকভাষা ছাড়া অন্য ৩টি ভাষা কুকি-চীন দলভুক্ত। ভাষা-গবেষকদের মতে, এ ভাষাগুলি সম্পূর্ণ পরস্পর পৃথক ভাষা নয়, বরং আন্তঃসম্পৃক্ত ভাষা। লুসাইরা মিজোরামেও আছে, তাদেরকে মিজো বলা হয়। পার্বত্য চট্টগ্রামের বম ও পাংখোয়াদের ভাষায় লুসাই ভাষার প্রভাব আছে (মনিরুজ্জামান, ২০০৬, পৃ. ৪৫)। লুসাইদের ব্যবহৃত বর্ণমালা পাংখোয়ারা ব্যবহার করে। পাংখোয়া গবেষক শাওন ফরিদ মিজো বা লুসাই ও পাংখোয়া ভাষার শব্দ-গঠন, বাক্য-বিন্যাস, প্রবাদ-প্রবচন, ধাঁধা, লোক-কাহিনি ইত্যাদিতে মিল পেয়েছেন। তাঁর মতে, ''দিনে দিনে পাংখোয়া ভাষা মিজো ভাষার সাথে মিশ্রিত হয়েছে। মিজো বা লুসাই ভাষা একদিকে পাংখোয়া শব্দভাণ্ডারকে সমৃদ্ধ

করেছে, অন্যদিকে তাদের সংস্কৃতির অনেক উপকরণ বিলুপ্ত ও প্রায়-বিলুপ্ত– জীবনধারা পরিবর্তনের কারণে অনেক আদি শব্দ হারিয়ে যাওয়ার পথে'' (ফরিদ, ২০০৬, পৃ. ৪৭)। একইভাবে বম ও পাংখোয়া ভাষার সাথে লুসাই ভাষার মধ্যকার মিল প্রায় ৭০ শতাংশ (জনি লুসাই, ২০০৭, পৃ. ১৯৯)। উল্লেখ্য, ১৯৯৪ সালে লন্ডন ব্যাপ্টিস্ট মিশনের পাদ্রি লুরিয়ান এবং সেভিজ মিজোরামে লুসাইদের প্রথমে খ্রিষ্টধর্মে দীক্ষিত করেন। পাদ্রি লুরিয়ান লুসাই অভিধান লেখার জন্য লুসাই ভাষার উপযোগী করে রোমান হরফ তৈরি করেন। বর্তমানে পাংখোয়ারা সেটাই ব্যবহার করছে (পাংখো, জুমজার্নাল, প্রবেশ ১১ই সেপ্টেম্বর, ২০২৪)। শুধু তাই নয়, পাংখোয়াদের বর্ণপরিচয় শুরু হয় লুসাই ভাষায় রোমান হরফে লিখিত 'Zirtan Bu' শিরোনামের বাল্যশিক্ষার বই দিয়ে (ফরিদ, ২০০৬, পৃ. ১৮২)। আবার খিয়াং ভাষার সাথেও লুসাই ভাষার কিছু কিছু সাদৃশ্য আছে (খিয়াং, ২০০৭)। খ্রিষ্ট-ধর্মাবলম্বী খুমীরা রোমান লিপি ব্যবহার করে। তারা ২৫টি রোমান লিপি নিজেদের উচ্চারণ অনুযায়ী ব্যবহার করে। তবে এ হার মোট জনগোষ্ঠীর শতকরা ২৫ ভাগের বেশি নয় (লেলুং খুমী, ২০১৫, পৃ. ১২১-১৪৪)। চাক জনগোষ্ঠী রোমান হরফে লিখন-কার্য সমাধা করে। চাকদের ভাষায় প্রায় ৬০-৬৫% বর্মি ও আরাকানি শব্দের মিশ্রণ ঘটেছে। পূর্বে চাকরা বৌদ্ধ মন্দিরে বার্মিজ বর্ণমালা শিখত এবং ভাষা-লিখনের কাজ বর্মি বর্ণে করতো। কিন্তু একসময় সেটাও বন্ধ হয়ে যায়। বর্তমানে চাক ভাষায় বর্ণমালা তৈরির প্রচেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছেন মং মং চাক। তিনি ইতোমধ্যে চাকদের কথ্য-ভাষার উচ্চারণ অনুযায়ী ১১টি স্বরবর্ণ ও ৩৪টি ব্যঞ্জনবর্ণ তৈরি করেছেন। পাশাপাশি ই-কার এবং উ-কারের উচ্চারণ তৈরি করেছেন। গণনা-কাজের জন্য সংখ্যাও তৈরি করেছেন, যা চাক সমাজে বেশ আগ্রহ ও আলোড়ন সৃষ্টি করেছে। চাক জনগোষ্ঠীর ধারণা, তাদের মাতৃভাষা নিজস্ব বর্ণমালায় লিখিত আকারে সংরক্ষণ করতে না পারলে আগামীতে বর্তমান কথ্য-ভাষার বিলুপ্তি ঘটবে এবং জাতি হিসেবে তাদের অস্তিত্বও সংকটের মুখে পড়বে (চাক ও চাক, ২০১৫, পৃ. ১৬৬-২০১)। আশঙ্কার কথা হচ্ছে, এ চারটি ভাষাই এখন বিপন্ন-ভাষার তালিকাভুক্ত। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট কর্তৃক ২০১৮ সালে পরিচালিত জরিপে দেশের যে ১৫টি বিপন্ন ভাষা শনাক্ত হয়েছে, তার মধ্যে চাক, খুমি, খিয়াং ও লুসাই ভাষাও অন্তর্ভুক্ত আছে।

ভাষা ও বর্ণমালার সামাজিক প্রয়োগ

পার্বত্য চট্টগ্রামের বিভিন্ন জাতিসত্তার স্ব স্ব পারিবারিক ও সামাজিক পরিমণ্ডলে মাতৃভাষায় যোগাযোগ, ভাবের আদান-প্রদান বা কথোপকথন চলে। যদিও প্রভাবশালী ভাষাগোষ্ঠীর সাথে মেলামেশা, বাংলা ও ইংরেজি মাধ্যম স্কুলে পড়ালেখা, স্মার্টফোন ও আকাশ সংস্কৃতির প্রভাব প্রভৃতির কারণে তারা মাতৃভাষার কথ্যরূপের কিছু শব্দ কম ব্যবহার করে তদস্থলে বাংলা বা ইংরেজি শব্দের প্রয়োগ করছে। আশার কথা হচ্ছে, নিজেদের মাতৃভাষা-চর্চায় চাকমা ও মারমাদের মধ্যে বাংলালিপির পরিবর্তে নিজস্ব লিপি ব্যবহার ধীরে ধীরে বাড়ছে। পাঠ্যপুস্তক এবং সাহিত্যচর্চা ছাড়াও বিভিন্ন ধর্মীয় ও সামাজিক অনুষ্ঠানের ব্যানারে, বিয়ের নিমন্ত্রণপত্রে, তোরণের পোস্টারে, ফেসবুক আইডি ও টিশার্টের ডিজাইনে চাকমা ও মারমা বর্ণমালার ব্যবহার বেড়েছে। বিভিন্ন সংগঠন, প্রতিষ্ঠান ও অনুষ্ঠানের স্মরণিকা, পরিচিতি-পুস্তিকায় বাংলার পাশাপাশি চাকমা অক্ষরের উপস্থিতি বেশ লক্ষণীয়। চাকমা রাজা ব্যারিস্টার দেবাশীষ রায়ও চাকমা লিপির ব্যবহার প্রসারের কথা বলেছেন। তাঁর মতে, ''আমার দপ্তরে আমি বিভিন্ন ক্ষেত্রে চাকমা লিপি ব্যবহার করি। পার্বত্য চট্টগ্রামের গ্রামাঞ্চলেও চাকমা লিপির ব্যবহার ধীর গতিতে হলেও বেড়ে চলেছে'' (রায়, ২০১৫, পৃ. ৩০)। একইভাবে ত্রিপুরা জনগোষ্ঠী ককবরক ভাষার লেখ্যরূপে বঙ্গলিপির পরিবর্তে রোমান

লিপিকেই বেশি প্রাধান্য দিচ্ছে। বাংলাদেশের জাতীয় গুরুত্বপূর্ণ কিছু গ্রন্থ অনুবাদেও আদিবাসী মাতৃভাষার লেখকেরা সক্ষমতা প্রমাণ করেছেন।

বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটগুলোর মাতৃভাষা উন্নয়ন কার্যক্রম

রাঙ্গামাটি, বান্দরবান এবং খাগড়াছড়ি– এ তিন পার্বত্য জেলায় ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট আছে। পার্বত্য অঞ্চলের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর ইতিহাস, সামাজিক ও সাংস্কৃতিক ঐতিহ্য তথা ভাষা, সাহিত্য, সংগীত, নৃত্য, কারুশিল্প, ধর্ম, আচার-অনুষ্ঠান, রীতিনীতি, প্রথা, সংস্কার ইত্যাদি সম্পর্কিত তথ্য-উপাত্ত সংগ্রহ ও সংরক্ষণ, গবেষণা ও উন্নয়ন, প্রশিক্ষণ ও প্রদর্শন এ প্রতিষ্ঠানগুলোর কার্যাবলির অন্তর্ভুক্ত (ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক প্রতিষ্ঠান আইন, ২০১০)। তিনটি সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট স্ব স্ব জেলায় অবস্থিত জাতিসত্তাগুলোর পৃথক পৃথক মাতৃভাষার সাক্ষরতা প্রদানে বিভিন্ন-মেয়াদি প্রশিক্ষণ পরিচালনা করে। প্রশিক্ষণার্থী হিসেবে প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্কুলের শিক্ষক, কলেজ-বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থী এবং বিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা অংশগ্রহণ করেন। এছাড়া আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস উপলক্ষ্যে স্ব স্ব মাতৃভাষা ও বর্ণমালায় রচনা প্রতিযোগিতা, কবিতা আবৃত্তিসহ বিভিন্ন অনুষ্ঠানের আয়োজন হয়। বান্দরবান সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট প্রতিবছর স্কুল, কলেজ ও বিশ্ববিদ্যালয় এবং সমপর্যায়ের শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানের আদিবাসী শিক্ষার্থীদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় লিখতে, পড়তে ও বলতে পারার দক্ষতা বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তিনটি আদিবাসী ভাষায়– মারমা, বম ও ম্রো– সাহিত্য-প্রতিযোগিতার আয়োজন করে। এভাবে সীমিত পর্যায়ে হলেও বিভিন্ন জাতিসত্তার সদস্যরা সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের মাধ্যমে আয়োজিত এ সমস্ত কর্মসূচিতে শরিক হয়ে নিজস্ব সংস্কৃতির ও ভাষা-সাহিত্য চর্চার মাধ্যমে জাতিগত স্বকীয়তা বজায় রাখার সুযোগ পাচ্ছে (উ চ নু, ২০০৭, পৃ. ১৪৫-১৫১)। রাঙ্গামাটি পার্বত্য জেলা পরিষদের নিজস্ব উদ্যোগে রাঙ্গামাটির বিভিন্ন নৃ-গোষ্ঠীর ভাষার অভিধান প্রণীত হয়েছে, যা মাতৃভাষা অধ্যয়নে সহায়ক হবে।

মাতৃভাষা গবেষণা, উন্নয়ন ও বিস্তার এবং শিক্ষাদানে অবদানের জন্য রাষ্ট্রীয় স্বীকৃতি

পার্বত্য অঞ্চলে বহুভাষাভিত্তিক শিক্ষাদান কাজে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি স্বরূপ ত্রিপুরা সম্প্রদায়ের ভাষা গবেষক মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা প্রথম আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা পদকে (২০২১) ভূষিত হন। তাঁর পদকপ্রাপ্তি নিঃসন্দেহে বিভিন্ন জাতিসত্তার মাতৃভাষা-গবেষকের জন্য অনুপ্রেরণাদায়ক। ২০২৪ সালে চাকমা ভাষায় নাট্যসাহিত্যে গুরুত্বপূর্ণ ও মৌলিক অবদানের জন্য মৃত্তিকা চাকমা বাংলা একাডেমি সাহিত্য পুরস্কার লাভ করেন। এভাবে বিভিন্ন জাতিসত্তার লেখক, গবেষক ও সাহিত্যিকদের স্ব স্ব মাতৃভাষায় রচিত গবেষণা ও সাহিত্যকর্মগুলো জাতীয়ভাবে মূল্যায়ন পাচ্ছে।

ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পাঠ্যবই প্রণয়ন ও পাঠদান

জাতীয় শিক্ষানীতি ২০১০-এ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের জন্য তাদের মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন সংক্রান্ত নির্দেশনার আলোকে বাংলাদেশ সরকার ২০১৭ শিক্ষাবর্ষ থেকে ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর শিশুদের নিজস্ব ভাষায় শিক্ষাদানের লক্ষ্যে পাঠ্যপুস্তক প্রণয়নের সিদ্ধান্ত গ্রহণ করে। গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকারের এ উদ্যোগটি ভাষার দিক থেকে অন্তর্ভুক্তিমূলক এবং আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের দর্শনের সাথেও সঙ্গতিপূর্ণ। প্রথম ধাপে সারা বাংলাদেশের ৫টি আদিবাসী ভাষার মধ্যে পার্বত্য চট্টগ্রামের তিনটি আদিবাসী তথা নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষাকে বাছাই করা হয়। সেগুলো হলো চাকমা, মারমা ও ত্রিপুরাদের ককবরক

ভাষা। তারই আলোকে এনসিটিবি ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর ২০১৬ সাল থেকে ২০২৪ সাল পর্যন্ত ৮টি শিখন-দক্ষতা সম্বলিত প্রাক-প্রাথমিকের বই এবং ক্রমান্বয়ে প্রাথমিক পর্যায়ের ৩য় শ্রেণি পর্যন্ত পাঠ্যবই ও শিক্ষাসামগ্রী মুদ্রণ ও বিতরণ সম্পন্ন করেছে। পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন, মুদ্রণ ও বিতরণের কাজ সুচারুভাবে সম্পন্ন হলেও পাঠদানের ক্ষেত্রে নানা সমস্যা দেখা দেয়– একই শ্রেণিতে একাধিক বা বহু মাতৃভাষাভাষী শিক্ষার্থীর উপস্থিতি এবং তদনুসারে সমসংখ্যক ভাষায় পারদর্শী শিক্ষকের স্বল্পতা, শিক্ষকদের জন্য পর্যাপ্ত ও ধারাবাহিক প্রশিক্ষণের ব্যবস্থা না থাকা ইত্যাদি। এছাড়াও আছে দৈনন্দিন শ্রেণি-কার্যক্রমের তালিকায় মাতৃভাষায় প্রণীত পাঠ্যবইগুলো পাঠদানের পিরিয়ড বা সময় বরাদ্দ না থাকা, ধারাবাহিক, সামষ্টিক বা বার্ষিক মূল্যায়ন বিষয়ে সুস্পষ্ট নির্দেশনার অভাব, বাস্তবায়নকারী দপ্তর বা সংস্থাগুলোর মধ্যে সমন্বয়হীনতা ইত্যাদি সমস্যা। মারমা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক লেখক-দলের সদস্য অংক্যজাইয়ের মতে, মারমাদের মাতৃভাষায় সাক্ষরতা এখনো মারমা বৌদ্ধভিক্ষু ও বয়স্কদের মধ্যে বেশি যা পরম্পরাগতভাবে হয়ে আসছে। কিন্তু মারমা ভাষায় রচিত এনসিটিবির পাঠ্যবইগুলো এবং শিক্ষা-উপকরণগুলোর সুফল এখনো প্রাথমিক স্কুলের শিশুরা পাচ্ছে না। এর প্রধান কারণ শিক্ষকদের স্ব স্ব মাতৃভাষার অক্ষরে সাক্ষরজ্ঞান না থাকা এবং পাঠদান-পদ্ধতির উপর অপর্যাপ্ত প্রশিক্ষণ। প্রণীত পাঠ্যপুস্তকের বিষয়বস্তু শেখানোর জন্য মাতৃভাষায় পারদর্শী শিক্ষকের অভাব প্রায় সাধারণ সমস্যা। যারা মাতৃভাষায় প্রশিক্ষণ লাভ করেন সেসব শিক্ষকেরাও মাতৃভাষা শেখানোর ব্যাপারে উদাসীন (চাকমা, ২৮শে এপ্রিল, ২০২৪)। বান্দরবানের মারমা ভাষাবিদ উচিমং মারমার অভিমত হলো:

> একই শ্রেণিতে বাংলা, মারমা, চাকমা, তঞ্চঙ্গ্যা, ম্রো, ত্রিপুরা এরকম মিশ্র ভাষার শিক্ষার্থীর উপস্থিতি থাকায় শিক্ষকেরা শুধু একটি নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পাঠদানে স্বাচ্ছন্দ্যবোধ করেন না। এ সমস্যা সমাধান নিয়ে বহুভাষা-বিশেষজ্ঞদের আরো গবেষণা ও চিন্তাভাবনা করা প্রয়োজন। তিনি আরও মনে করেন, প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে ক্ষুদ্র নৃগোষ্ঠীর মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যগুলো পাঠদানের ব্যাপারে সুস্পষ্ট নির্দেশনা ও তদারকি দরকার। অন্যথায় এ মহৎ উদ্যোগের সুফল যেমন পাওয়া যাবে না, তেমনি পুস্তক-রচয়িতাদের মেধা, শ্রম, সময় এবং সরকারের বিপুল অর্থের অপচয় হবে মাত্র (মারমা, ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪)।

প্রাথমিক শিক্ষা পার্বত্য জেলাপরিষদগুলোর নিকট হস্তান্তরিত বিভাগ হওয়ায় মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের ব্যাপারে তাদেরও নিবিড় পর্যবেক্ষণ দরকার বলে মনে করেন লেখক ও শিক্ষক আর্যমিত্র চাকমা। এসব পর্যবেক্ষণ থেকে স্পষ্ট হয়, মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের কাজটিতে দায়িত্বপ্রাপ্ত বা সংশ্লিষ্ট পক্ষগুলোর মধ্যে মনিটরিং ও সমন্বয়ে ঘাটতি রয়ে গেছে। এ প্রসঙ্গে রাঙ্গামাটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউটের গবেষণা কর্মকর্তা ও চাকমা ভাষা ও বর্ণমালা গবেষক শুভ্রজ্যোতি চাকমাও মাতৃভাষা শিক্ষাদানের হালহাকিকত নিয়ে হতাশা ব্যক্ত করেছেন। তাঁর মতে:

> আমরা প্রায়ই শুনে থাকি মাতৃভাষার বইগুলো পড়ানোর জন্য এখনো উপযুক্ত শিক্ষক তৈরি হয়নি। এমনকি প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর থেকে এ বিষয়ে সুনির্দিষ্ট কোন নির্দেশনা নেই। মাতৃভাষার বই পড়ানোর বিষয়ে অধিদপ্তর প্রদত্ত রুটিনে উল্লেখ নেই। বিদ্যালয়ভেদে যে যার মতো বইগুলো দায়সারাভাবে পড়াচ্ছেন। এই যদি বাস্তবতা হয়, তাহলে আমরা অবশ্যই হতাশ হবো (*যুগান্তর*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)।

অন্যদিকে আর্থিক প্রণোদনার অভাব এবং স্থায়ী শিক্ষক ও প্রশিক্ষকের অভাবের কারণে মাতৃভাষায় সাক্ষরতা প্রদানে যুক্ত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনগুলোর কার্যক্রম তিন পার্বত্য জেলায় সমভাবে সক্রিয় হতে পারছে না। এছাড়া কোনো আদিবাসী ভাষাতেই শিক্ষিত পাঠকসমাজ গড়ে ওঠেনি। কোনো জনগোষ্ঠীর বর্ণমালা ও শব্দগুলোতে উচ্চারণ, বানানরীতি, ব্যাকরণ নিয়ে সর্বজনস্বীকৃত নিয়ম-রীতি প্রণয়ন করা যায়নি। খিয়াংদের মধ্যে এখনো বর্ণমালা বাছাই নিয়ে মতদ্বৈধতা বিদ্যমান। কিন্তু এটা ঠিক, সরকারি অর্থ-ব্যয়ে প্রাক-প্রাথমিক ও প্রাথমিক পর্যায়ে পার্বত্য চট্টগ্রামের যে তিনটি ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর ভাষায় শিক্ষা-কার্যক্রম শুরু হয়েছে, সেগুলোর সাফল্যই অন্য ভাষাভাষী নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষা-চর্চায় উৎসাহ জোগাবে। তাছাড়া মাতৃভাষা-চর্চার সঙ্গে জীবন-জীবিকা বা অর্থনৈতিক মূল্য যুক্ত না হলে মাতৃভাষা-শিক্ষা আকর্ষণীয় হবে না। দ্রুত সমস্যা চিহ্নিত করে এ মহৎ উদ্যোগটিকে সাফল্যমণ্ডিত করতে সংশ্লিষ্ট সকলের দায়িত্বশীল ভূমিকা প্রত্যাশিত। প্রকৃতপক্ষে ভাষা-শিক্ষার কাজটি কোনো একক কাজ নয়। এটি একটি বহুমুখী এবং নিরন্তর প্রক্রিয়া। শিক্ষার্থী, শিক্ষক, অভিভাবক, বিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ, শিক্ষাপ্রশাসন, জেলা পরিষদ ও প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তরসহ সংশ্লিষ্ট সকলকে যদি শিশুদেরকে মাতৃভাষায় শিক্ষাদানের সুদূরপ্রসারী উপকারের কথা বোঝানো না যায়, তাহলে মাতৃভাষা-চর্চা ও শিক্ষাদান বাধাগ্রস্ত হবে। বস্তুত সকলের সম্মিলিত প্রচেষ্টাই কেবল মাতৃভাষা শিক্ষাদান কর্মসূচিকে সফল করতে পারে।

উপসংহার

উপরের আলোচনায় এটা স্পষ্ট হয়েছে যে, বাংলাদেশ স্বাধীন হওয়ার পর থেকে পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলো সীমিত পরিসরে হলেও তাদের স্ব স্ব মাতৃভাষা চর্চা, উন্নয়ন ও সংরক্ষণের অব্যাহত প্রয়াস চালিয়েছে। এ প্রয়াস ছিল ব্যক্তিগত, সামাজিক ও সাংগঠনিক। রাষ্ট্রীয় ভাষানীতি ও আঞ্চলিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি প্রতিকূল থাকায় তাদের মাতৃভাষা-চর্চায় গতি ও সমন্বয়ের অভাব প্রতীয়মান হয়েছে। কিন্তু ১৯৯৭ সালে পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তির মধ্য দিয়ে এসব রাজনৈতিক প্রতিবন্ধকতা অনেকাংশে অপসৃত হয় এবং চুক্তিতে মাতৃভাষায় শিক্ষা-সংক্রান্ত বিধান রাখায় মাতৃভাষা-চর্চার আইনি ও প্রাতিষ্ঠানিক ভিত্তি তৈরি হয়। চুক্তিসৃষ্ট প্রতিষ্ঠানগুলোর আইনে মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষা বিষয়ে স্পষ্ট বিধান থাকায় মাতৃভাষা-চর্চার পরিসর সৃষ্টি হয়। এর দু'বছরের মাথায় ১৯৯৯ সালে ইউনেস্কো কর্তৃক একুশে ফেব্রুয়ারি আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ঘোষিত হলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা-চর্চায় নতুন সম্ভাবনা তৈরি হয়। এর ফলে বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থাগুলো পার্বত্য এলাকার আদিবাসীদের মাতৃভাষায় শিক্ষা কার্যক্রম গ্রহণ করে। এর ধারাবাহিকতায় বাংলাদেশ সরকারের শিক্ষা ও ভাষা-নীতিতে ইতিবাচক পরিবর্তন আসে। ইউনেস্কোর স্বীকৃতির সাথে সঙ্গতি রেখে ঢাকায় আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট প্রতিষ্ঠা করা হলে এবং ২০১০ সালে জাতীয় শিক্ষানীতিতেও আদিবাসীদের মাতৃভাষা শিক্ষার প্রয়োজনীয়তা নীতিগতভাবে স্বীকৃত হলে পার্বত্য অঞ্চলের জাতিসত্তাগুলো মাতৃভাষা-চর্চায় বেশকিছু নীতিগত সহায়তা লাভ করে। বাংলাদেশ সরকার মাতৃভাষা-চর্চা প্রসঙ্গে নতুন নীতি ও কার্যক্রম গ্রহণ করে। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট স্থাপিত হওয়ায় মাতৃভাষা গবেষণার প্রাতিষ্ঠানিকীকরণ ঘটে। একইভাবে বাংলাদেশ সরকার বাংলাসহ দেশের অন্য নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা শিক্ষাদান, গবেষণা ও উন্নয়নে অন্তর্ভুক্তিমূলক নীতি গ্রহণ করে। বিশ্ব-সংস্থায় মাতৃভাষা দিবস ঘোষণা, একুশের চেতনার বিশ্বায়ন, বাংলাদেশ সরকারের ইতিবাচক উদ্যোগ প্রভৃতি ঘটনা ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-চর্চায় নবচেতনার সঞ্চার করে। বিশেষত ২০১৪ সাল থেকে সরকারিভাবে ৫টি নৃ-গোষ্ঠীর মাতৃভাষায় পাঠ্যপুস্তক-প্রণয়নের কর্মসূচির ফলে নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষা-

শিক্ষা ও চর্চা আনুষ্ঠানিক শিক্ষার অন্তর্ভুক্ত হয়। তবে একথা বলা অত্যুক্তি হবে না যে, পার্বত্য চট্টগ্রাম চুক্তি ছিল পার্বত্য চট্টগ্রামের ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষা-চর্চার ধারায় একটি বড়ো টার্নিং পয়েন্ট। চুক্তির পর দেশের জাতীয় ও স্থানীয় বেসরকারি উন্নয়ন সংস্থা এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ের দাতা সংস্থা ও উন্নয়ন সংস্থাগুলোর আর্থিক সহায়তা কর্মসূচি পার্বত্য এলাকার নৃ-গোষ্ঠীগুলোর মাতৃভাষায় প্রাথমিক শিক্ষায় তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছে। অংশত এসব সংস্থার কর্মসূচির আলোকে এবং কিছু কিছু ক্ষেত্রে উৎসাহী তরুণদের প্রচেষ্টায় মাতৃভাষা-চর্চার পরিসর বৃদ্ধি পেয়েছে। ম্রোদের মাতৃভাষা চেতনা ও বর্ণমালা উদ্ভাবনের প্রয়াস সত্যি প্রশংসনীয়। একইভাবে চাকমা তরুণদের স্বেচ্ছায় গড়ে তোলা মাতৃভাষা চর্চার সংগঠন– 'চাঙমা বাহিত্য বাহ' ও 'নোয়ারাম সাহিত্য সংসদ'– অন্যদের জন্য প্রেরণাদায়ক দৃষ্টান্ত। তাদের বেশকিছু ভাষাভিত্তিক সংগঠন মাতৃভাষায় সাক্ষরতা প্রদানের জন্য ধারাবাহিক প্রচেষ্টা অব্যাহত রেখেছে। মাতৃভাষা-চর্চায় আরেকটি বড়ো অগ্রগতির প্রতীক হলো ভাষা ও বর্ণমালা উন্নয়নে প্রযুক্তির প্রয়োগ। স্বেচ্ছাব্রতী তরুণদের প্রচেষ্টায় চাকমা, মারমা ও ম্রোদের বর্ণমালা লেখার কি-বোর্ড উদ্ভাবন করা সম্ভব হয়েছে, যা পাঠ্যবই লিখন ও মুদ্রণের জন্য অত্যাবশ্যক ছিল।

এছাড়া কিছু অন্তর্নিহিত প্রতিবন্ধকতার কথাও গবেষণায় উঠে এসেছে। যেমন, সরকারের মাতৃভাষায় রচিত পাঠ্যপুস্তকগুলো পাঠদানে সন্তোষজনক অগ্রগতি হয়নি। সকল শিক্ষককে মাতৃভাষা বা বহুভাষায় পাঠদান-পদ্ধতির উপর প্রশিক্ষণ প্রদান করা যায়নি। অধিকাংশ ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর নিজস্ব বর্ণমালা না থাকা এবং হরফ নির্বাচন নিয়ে তাদের সম্প্রদায়ের মধ্যকার জটিলতা ও মতানৈক্য ছিল মাতৃভাষা-চর্চার পথে অন্যতম বড়ো বাধা। এছাড়া ভাষা, ব্যাকরণ, বানানরীতি, শব্দভান্ডার, ধ্বনি ও উচ্চারণ প্রভৃতির সমস্যা ছিল। এসব কাটিয়ে উঠতে নিরন্তর চর্চা প্রয়োজন। আরো প্রয়োজন আদিবাসীদের নিজস্ব ভাষাচর্চার প্রতি সামাজিক সচেতনতা ও উদ্যোগ। সর্বোপরি সরকারি পৃষ্ঠপোষকতা অব্যাহত থাকলে এবং ক্রমান্বয়ে প্রসারিত হলে ক্ষুদ্র জাতিসত্তাগুলোর মাতৃভাষায় শিক্ষাও অদূর ভবিষ্যতে একটি নির্দিষ্ট মানে উন্নীত হবে।

তথ্যসূত্র

আপেং (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন ২০১০)। রাঙ্গামাটি: জাক।

আহ্‌মদ, সালাহ্‌উদ্দীন। (২০১৬)। *ইতিহাসের সন্ধানে*। ঢাকা: সাহিত্য প্রকাশ।

কবির, মো. এনামুল। (২০১৯)। *সচিত্র বাংলাদেশ* (দেশের উন্নয়ন কর্মকাণ্ড এবং ইতিহাস-ঐতিহ্য ও সংস্কৃতি বিষয়ক পত্রিকা) ঢাকা: চলচ্চিত্র ও প্রকাশনা অধিদপ্তর।

কাওয়াং (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন ২০০৪)। রাঙ্গামাটি: জাক।

কামাল, মেসবাহ; ইসলাম, জাহিদুল; চাকমা, সুগত। (২০০৭)। *বাংলাদেশ সাংস্কৃতিক সমীক্ষামালা-৫: আদিবাসী জনগোষ্ঠী*। ঢাকা: বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি।

কেদাকতুক (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন ২০১২)। রাঙ্গামাটি: জাক।

গণপ্রজাতন্ত্রী বাংলাদেশ সরকার, সংস্কৃতি বিষয়ক মন্ত্রণালয়। (২০২৪)। *একুশে পদক ২০২৪: পদকপ্রাপ্ত কৃতীজনদের সংক্ষিপ্ত পরিচিতি*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

চাকমা, বিভূতি। (২০১৮)। *প্রযুক্তিতে চাকমা ভাষার উন্নয়ন*। রাঙ্গামাটি: লেখক কর্তৃক প্রকাশিত।

চাকমা, মঙ্গল কুমার ও অন্যান্য। (২০১৫)। *বাংলাদেশের আদিবাসী: এথনোগ্রাফিয় গবেষণা*, প্রথম খণ্ড। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

চাকমা, শুভ্রজ্যোতি। (২০১৬)। 'চাকমা বর্ণমালার ব্যবহার: অতীত ও বর্তমান' *দ্বিতীয় পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন স্মারক সংকলন*। রাঙ্গামাটি: পার্বত্য চট্টগ্রাম আদিবাসী লেখক ফোরাম ।

চিটাগং হিল ট্র্যাক্টস রাইটার্স ইউনিয়ন, পার্বত্য চট্টগ্রাম। *চতুর্থ পার্বত্য চট্টগ্রাম লেখক সম্মেলন-২০২৩ স্মারক সংকলন*।

চাকমা, সুখেশ্বর সম্পাদিত। (২০২১)। 'জাক'র ৪০ বর্ষপূর্তি সংকলন-২০২১'। রাঙ্গামাটি: জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)।

চাকমা, রনেল (সম্পা.)। (২০০৩) / *আমাঙ* (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন ২০০৩)। রাঙ্গামাটি: জাক।

চাকমা, অম্লান (সম্পা.)। *লাম্প্রা* (বৈসুক-সাংগ্রাই-বিঝু সংকলন ২০০০)। রাঙ্গামাটি: জাক।

চাকমা, জ্যোতি। *(২০১৩)*। 'চাকমা বর্ণমালার ইউনিকোড ফন্ট তৈরি প্রসঙ্গে কিছু কথা' *সাংগ্রাই*। রাঙ্গামাটি: ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠীর সাংস্কৃতিক ইনস্টিটিউট।

চাক, মংমং ও চাক চিংহ্লাম। 'চাক'। চাকমা, মঙ্গল কুমার ও অন্যান্য (সম্পা.) (২০১৫)। *বাংলাদেশের আদিবাসী*। এথনোগ্রাফিয় গবেষণা প্রথম খণ্ড। ঢাকা: উৎস প্রকাশন।

চৌধুরী, মংসানু; জেন, উ ক্য। (২০১৮)। *মারমা: ইতিহাস ও সংস্কৃতি*। খাগড়াছড়ি: মারমা উন্নয়ন সংসদ।

জুম ঈসথেটিকস কাউন্সিল (জাক)। (২০০৫)। 'জাক'র ২৫ বর্ষ পূর্তি সংকলন'। রাঙ্গামাটি: জাক।

ত্রিপুরা, প্রশান্ত। (২০১৫)। *বহুজাতির বাংলাদেশ*। ঢাকা: সংবেদ।

পাইং আমুঙ, মাহা সাংগ্রাই সংখ্যা, ২০১৮। খাগড়াছড়ি: মারমা উন্নয়ন সংসদ।

বিশ্বাস, অশোক। (২০০৮)। *বাংলা ভাষায় ভোটবর্মী ভাষার প্রভাব*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

মারমা, মিথোয়াইচিং সম্পা.। (২০১১)। *চেদনা*। বাংলাদেশ মারমা স্টুডেন্টস কাউন্সিল। কেন্দ্রীয় কমিটি, চট্টগ্রাম।

ম্রো, সিং ইয়ং। (২০১৯)। *ম্রো জনগোষ্ঠীর জীবন ও সংস্কৃতি*। বান্দরবান: বান্দরবান পার্বত্য জেলা পরিষদ।

রায়, চাকমা রাজা দেবাশীষ। 'বাংলা হরফে চাকমা ভাষা উচ্চারণের সমস্যা ও তার সমাধান' কীর্তি নিশান চাকমা (সম্পা.) (২০১৫)। *মোনঘরের ৪০ বর্ষপূর্তি উদ্‌যাপন উপলক্ষে প্রকাশিত স্মারক গ্রন্থ*। রাঙ্গামাটি: মোনঘর প্রকাশন।

সিকদার, সৌরভ। (২০১১)। *বাংলাদেশের আদিবাসী ভাষা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি।

সাহু, জির কুং। (২০০৪)। 'বোম উপজাতির সংক্ষিপ্ত পরিচিতি' *কাওয়াং*। রাঙ্গামাটি: জাক।

Akanda, Safar Ali. (2013). *Language Movement and The Making of Bangladesh.* Dhaka: The University Press Ltd.

পত্রিকা

কালের কণ্ঠ, ২২শে জুন, ২০২৪।

'খেয়াং বর্ণমালার ফন্ট ও কি-বোর্ড উদ্বোধন'। *প্রথম আলো*, ২৪শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪।

ত্রিপুরা, মথুরা বিকাশ। 'ভাষা নিয়ে মথুরার স্বপ্নযাত্রা' *যুগান্তর*, ২৩শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪।

সাক্ষাৎকার প্রদানকারী ব্যক্তিদের পরিচিতি

দেবপ্রিয় চাকমা, লেখক, ভাষা গবেষক ও সাবেক সভাপতি, চাঙমা সাহিত্য বাহ্, নিউজিল্যান্ড, খাগড়াছড়ি। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ৯ ও ১০ই এপ্রিল, ২০২৪ (মেসেঞ্জার কলের মাধ্যমে)।

মুকুল কান্তি ত্রিপুরা, ত্রিপুরা ভাষা গবেষক ও প্রভাষক, রাঙামাটি পাবলিক কলেজ। সাক্ষাৎকার গ্রহণ: ২৬শে এপ্রিল, ২০২৪ (মেসেঞ্জার কলে)।

মথুরা বিকাশ ত্রিপুরা, ভাষা গবেষক, লেখক ও নির্বাহী পরিচালক, জাবারাং কল্যাণ সমিতি, ২৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪, স্থান: গবেষকের চট্টগ্রামস্থ বাসা)

বিনয় কুমার চাকমা, প্রাথমিক শিক্ষক ও চাকমা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণেতা, কল্যাণপুর, রাঙ্গামাটি। (মোবাইল কলের মাধ্যমে)।

ইনজেব চাকমা, নোয়ারাম সাহিত্য সংসদ, দীঘিনালা, খাগড়াছড়ি। ৩০শে জুন, ২০২৪ (মেসেঞ্জার কলের মাধ্যমে)

উচিমং মারমা, মারমা ভাষাবিদ, বান্দরবান সদর, মারমাভাষায় পাঠ্যবই প্রণয়ন কমিটির যাচাই ও মূল্যায়নকারী, তারিখ: ২৩শে সেপ্টেম্বর (মোবাইলের মাধ্যমে)

অংক্যজাই মারমা, মহালছড়ি, মারমা ভাষায় পাঠ্যপুস্তক প্রণয়ন দলের সদস্য। তারিখ: ২৩শে সেপ্টেম্বর, ২০২৪। মোবাইলের মাধ্যমে।

চা-শ্রমিকের মাতৃভাষা

দীপংকর মোহান্ত
আশফাক হোসেন

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookDeepnkar

ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি ১৮২৩-২৪ সালে সিলেট-আসামের পর্বতবেষ্টিত ঘন জঙ্গলের টিলায় চা-গাছের সন্ধান পেয়ে ১৮৩৬ সালের মধ্যে পুরো আসাম, জৈন্তা, কাছাড় প্রভৃতি জনবিরল বনাঞ্চল ছলে-বলে ও কৌশলে নিজেদের আইনি অধিকারে নিয়ে যায়। প্রারম্ভিক লগ্নে চা-আবাদ পর্বে শ্রীহট্ট-আসামে লোকসংখ্যা ছিল খুব অল্প। তবু ঔপনিবেশিক শক্তি স্থানীয় শ্রমিক কিংবা গিরিপথের গহিনে থাকা কোনো মানুষকে অধিক লোভ দেখিয়েও চা-শ্রমের কাজে নিয়োগ করতে পারেনি। চা আবিষ্কারের সময় বণিক ইস্ট ইন্ডিয়া কোম্পানি দেখেছে স্থানীয় নীল চাষিদের দ্রোহী মানসিকতার রগরগে অবস্থা– যা নীল চাষাবাদের জন্য অনিশ্চিত ভবিষ্যতের অশনি সংকেত দেয়। অর্থাৎ নীল চাষের পড়ন্ত বেলায় কোম্পানির নিকট চা-ই ছিল একমাত্র রপ্তানিযোগ্য আয়– যে কারণে তারা ভূমি লিজ আইন সহজ করে চা-আবাদে প্রচুর অর্থ লগ্নি করতে থাকে। এমনকি স্থানীয় শ্রমিকের অভাবে তারা চীন থেকে চা-আবাদে দক্ষ শ্রমিক সংগ্রহ করে চা শিল্পের সূচনা-লগ্নে সলতে পাকানোর কাজ অব্যাহত রাখে। এই শিল্পকে গতিশীল করতে অচিরেই গড়ে ওঠে 'আসাম টি কোম্পানি' বা 'আসাম কোম্পানি' (১৮৩৯)। কিন্তু ১৮৬০ সালের আগে চা-শিল্প খুব একটা বাজারমুখী হতে পারেনি। ১৮৬৬ সালে ভারত থেকে ৪% চা বিদেশে রপ্তানি করা সম্ভব হয়েছিল (তখন চীনের রপ্তানি ছিল ৯৬%)।

যদিও সিলেট-আসামের পাহাড়ে চা-আবাদের জন্য অঢেল জমি সহজ শর্তে বন্দোবস্ত নেওয়া হয়। কিন্তু নব্য গড়া এই শিল্পে মূল উৎপাদক শক্তি শ্রমিকের জোগান ছিল অল্প। ঔপনিবেশিকরা শ্রমিক সংকট কাটানো বা শ্রমিক সংগ্রহের জন্য তখন বিকল্প চিন্তা করতে থাকে। ফলে তাদের শকুনি চোখ পড়েছিল ভারতের দরিদ্র ও দুর্ভিক্ষ-পীড়িত অঞ্চলের নিরন্ন মানুষের দিকে। যাদের নিশ্চিত কোনো খাওয়া-খাদ্যের সংস্থান ছিল না। তারা জীবন-যুদ্ধের এমন পর্যায়ে পৌঁছেছিল যে, গাছ থেকে পয়সা পড়ে– এমন বিশ্বাসে চিরতরে ঘর ছাড়তে হয়েছে।

উত্তর-পূর্ব টিলা-ভূমে বৈচিত্র্যময় ভাষিক জনগোষ্ঠীর আগমন

অবশেষে ১৮৪১ সালে বিহারের ছোট নাগপুর অঞ্চল থেকে প্রলোভন দেখিয়ে কিছু লোক সংগ্রহ করা হয়েছিল। মূলত তারাই ছিল আসামের দিকে পা রাখা প্রথম শ্রমিকের চালান। দালালরা এই লোকদের একটি নৌকায় তোলে আসামের দিকে জল-পথে রওয়ানা দেয়। কিন্তু দুর্ভাগ্য যে, প্রথম চালানের সকল হতভাগ্য লোকজন আসাম পৌঁছার আগেই রাস্তায় বিভিন্ন রোগে মারা যায় (ফুকন, ১৯৮৪, পৃ. ৪)। তারপরও চা-করদের শ্রমিক সংগ্রহের প্রচেষ্টা থেমে থাকেনি। ১৮৬০ ঔপনিবেশিক সরকারের সহায়তায় চা-বাগানের জন্য শ্রমিক সংগ্রহকারী হিসেবে শক্ত ও ধুরন্ধর প্রকৃতির 'আড়কাটি'দের (শ্রমিক সংগ্রহের দালাল) মাধ্যমে

তৎকালীন বিহার (রাঁচি, হাজারিবাগ, সাঁওতাল পরগণা, ডুমকা, গয়া, প্রভৃতি), উড়িষ্যা (ময়ূরভঞ্জ, গঞ্জাম, সম্বলপুর, চাইবাসা প্রভৃতি), মাদ্রাজ, মধ্যপ্রদেশ (ঝাড়খণ্ড, ছত্রিশগড়, রায়পুর, রামপুরহাট, জব্বলপুর প্রভৃতি), নেপাল, গারো পাহাড়, পশ্চিমবঙ্গ, উত্তরপ্রদেশ, অন্ধ্রপ্রদেশ প্রভৃতি অঞ্চলের হাজার হাজার শ্রমিককে প্রলোভন দেখিয়ে শ্বাপদসংকুল পাহাড়ে নিয়ে আসা হয়।

'আড়কাটিয়া'রা অভাবী মানুষের কাছে গিয়ে মিথ্যা গল্প জোড়ে বলতো– আসামের জঙ্গলে টাকার গাছ আছে। 'গাছ হেলাঙ্গেনেছে/হেংলানেছে– পয়সা মিলেগা' অর্থাৎ আসামে গাছে ঝাড়া দিলে বা হেলান করলে পয়সা পড়ে। পাহাড়ে কোনো কাজ নেই। সেখানে পয়সা পাবে, আর খাবে। কৃষিকাজে অভ্যস্থ সহজ-সরল মানুষগুলো জানতো না যে তারা কোথায় এবং কী কাজে যাচ্ছে। অথচ সিলেট-আসামের পাহাড়ে একবার আসার পর 'গিরমিট' প্রথায় তারা হয়ে যেত 'চিরকালের শ্রমদাস'। কখনো স্বদেশমুখী হওয়ার সুযোগ ছিল না।

নিঃস্ব ও অসহায় শ্রমিকরা সিলেটের পাহাড়ে যখন পৌঁছে, তখন তাদের শরীরে ছিল সামান্য একটুকরো কাপড়। এই যা সম্বল। কিন্তু তাদের সাথে ছিল নিজস্ব সংস্কৃতি, ভাষা এবং বিশ্বাসবোধ। চতুর ঔপনিবেশিক সরকার চা-বাগানের ভেতর শ্রমিক-বস্তি গড়ে তোলার সময় অনেক চিন্তা ভাবনায় আগতদের ভাষা-সংস্কৃতি ও জাত এবং স্থানভিত্তিক বস্তি/পাড়া বসায়। অর্থাৎ একই ভাষাভাষী লোকজন যেন মনে করে একই পাড়ায় রয়েছে। চা শ্রমিকদের সিলেট অঞ্চলে আসা ১৯২৫-৩০ সালের মধ্যে সীমিত হয়ে আসে। দেশ ভাগের সময় কিছু শ্রমিক ভারতে চলে যাওয়ার কারণে কয়েকটি বাগানে নতুন করে কুমিল্লা ও নোয়াখালী অঞ্চলের মুসলিম সমাজের শ্রমিক প্রবেশ করতে দেখা যায়। পরে তারাও নিজেদের আঞ্চলিক ভাষাকে পুরো রক্ষা করতে পারেনি। এখন তারা সংমিশ্রিত উচ্চারণে কথা বলে।

চা বাগানে বৈচিত্র্যময় ভাষার-হাট

বর্তমান বাংলাদেশে চা বাগানের সংখ্যা ১৬৮/৬৯ (খাগড়াছড়ির অঞ্চলে নতুন প্রকল্প সহ); ২০২০ সালে ছিল ১৫৯টি। ১৯৭০ সালে ১৫০টি (মূলত ব্রিটিশ আমলে গড়া) হাল আমলে দিনাজপুর-পঞ্চগড় এবং খাগড়াছড়িতে চা উৎপাদনের চেষ্টা চলছে। নবগঠিত চা বাগানে মূলধারার শ্রমিকসহ বাঙালি শ্রমিকদের প্রবেশ লক্ষণীয়। দেশের শতবর্ষী চা বাগানগুলোতে গোটা ভারতের বিভিন্ন জায়গা থেকে শতশত জাত-পাত, ভাষা ও সংস্কৃতির লোকরা এসে থিতু হয়েছিল। ফলে সবুজবরণ চা বাগানের বস্তি এলাকায় বৈচিত্র্যময় ভাষায় দোলা দোল খায়। চা বাগানে বসবাসরত চা শ্রমিকরা প্রাত্যহিক জীবনে নিজেদের পরিবার ও সমাজের মধ্যে পূর্বপুরুষ থেকে প্রাপ্ত মাতৃভাষা ব্যবহার করতো– যেমন: ওড়িয়া ভাষা, সাদ্রী ভাষা, বাংলী (পুরুলিয়া ও মানভূমের বাংলা) ভাষা, সাঁওতালি ভাষা, ভোজপুরি ভাষা, কুরুখ ভাষা, কুড়মালি ভাষা, খাড়িয়া, তেলেগু ভাষা, তামিল ভাষা, মুণ্ডারি ভাষা, সৌরি ভাষা ইত্যাদি। ফিলিপ গাইনের 'চা শ্রমিকের কথা' বইয়ে ১৫৯টি চা বাগানে ১৮টি ভাষার নাম উল্লেখ করেছেন। যথা: জংলি, সাদরি, ওড়িয়া, ভোজপুরি, সান্তালি, মান্দি, তেলেগু, নেপালি, বিলাসপুরি, মণিপুরি, মুড়া, বিহারি, খাসি, আসামি, ককবরক, মারমা, মগ ও বাংলা। তবে চা বাগানে মণিপুরি ও ককবরক ভাষীর সংখ্যা অতি অল্প।

গবেষক ভার্জিনিয়াস সামাচা-জনগোষ্ঠীকে ভাষা ভিত্তিক প্রধানত তিনটি ভাগে ভাগ করেছেন (ভার্জনিয়াস, ১৯৯৬, পৃ. ১৬)। যথা– ১. **কোলীয় ভাষাভাষী গোষ্ঠী–** (সাঁতাল, মুণ্ডা, খরিয়া, হো ও কুর্ক প্রভৃতি); ২. **দ্রাবিড়ীয় ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী** (ওরাওঁ, কোন্দ, গোন্দ ও মালপাহাড়ি প্রভৃতি); ৩. **আর্য ভাষাভাষী জনগোষ্ঠী**

(উড়িয়া, বাঙালি অর্থাৎ পশ্চিমবঙ্গের, হিন্দি ভাষী প্রভৃতি)। ১৯৯৫ সালে বাংলাদেশের চা-শ্রমিকদের নিয়ন্ত্রণকারী সংগঠন 'বাংলাদেশ চা-শ্রমিক ইউনিয়ন'– সকল চা-জনগোষ্ঠীর ভাষাকে মোটামুটি সাতটি ভাগে ভাগ করেন (এ ব্যাপারে সেমিনার করেছিল)– ১. **বাংলী** (পশ্চিমবঙ্গের পুরুলিয়া, মানভূম এবং বিহারের সীমান্তবর্তী বাংলা ভাষিক অঞ্চল থেকে আগত শ্রমিকদের ভাষা। তারা 'মানভূম বাংলা/ উপবাংলা/'মানভূম ডায়লেক্ট'ও বলেন); ২. **সাদ্রী/সাদরি** (যা 'নাগপুরী ভাষা' নামেও পরিচিতি পায়। বিহার, উড়িষ্যা, ঝাড়খণ্ড থেকে আগত শ্রমিকদের মধ্যে এ ভাষা প্রচলিত। উরাং, সাঁওতাল, মুণ্ডা, বিহারি (মুসলমান ও হিন্দু চা শ্রমিক) প্রভৃতি সমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত); ৩. **তেলেগু** (মাদ্রাজ থেকে আগত– অলমিক ও নাইডু প্রভৃতি সমাজ কর্তৃক ব্যবহৃত); ৪. **উৎকল বা উড়িয়া** (উড়িষ্যা থেকে যারা আগত এবং আদি উড়িয়া ভাষায় কথা বলে); ৫. **ভোজপুরি**–ইন্দো-ইউরোপীয় ভাষা পরিবার। যা চা-জনসম্প্রদায়ের কাছে 'দেশওয়ালী'ভাষা নামেও পরিচিত। বিহারের কিছু অংশ এবং উত্তরপ্রদেশের শ্রমিকরা 'বাংলা ও হিন্দি' সংমিশ্রণে যে নতুন ভাষায় কথা বলে– তারা 'ভোজপুরিভাষী'। যা সাধারণের কাছে 'দেশওয়ালী ভাষা' নামে খ্যাত; ৬. **নেপালি** (নেপাল থেকে আগতদের ভাষা); ৭. **গারো** (গারো পাহাড় থেকে যারা এসেছে– আচিক ভাষা)। যদিও উপর্যুক্ত বিভাজন কোনো ভাষাতাত্ত্বিক জরিপের ভিত্তিতে বিভাজন করা হয়নি– তবুও চা জনগোষ্ঠীর ভাষিক পরিচয় জানার জন্য সহায়ক বলে ধারণা করা হয়। চা বাগানে আরেকটি উপভোগ্য বিষয় যে, দেশওয়ালি বা 'ভোজপুরিভাষাভাষী'রা আবার 'বাংলী ভাষী'কে (মানভূম/পুরুলিয়ার বাংলা) বলে থাকে 'জংলী ভাষা'; অর্থাৎ পাহাড় অঞ্চলে তাদের বসতি ছিল। চা বাগানে 'জংলী ভাষা' শব্দটির ব্যবহার বেশ প্রাচীন। কেন 'জংলী ভাষা' বলা হলো তা গবেষণা-সাপেক্ষ। বলা যায় চা বাগানে রয়েছে ভাষা বৈচিত্র্যের হাট। কিন্তু এই বিষয়ে গবেষণা খুব কম। অনেক শ্রমিক টাইটেল পরবর্তন করেছেন। প্রায় সবাই বাংলা সংমিশ্রণে নতুন ভাষা/ বিকৃত বাংলার জন্ম দিয়েও মনের ভাব যেমন প্রকাশ করছে– তেমনি অন্যজন গ্রহণও করছেন। এত ভাষাভাষী একত্রে থাকার পরও তাদের মধ্যে এই বিষয়ে কোনো কিছু চিন্তা করতে দেখা যায় না। সহস্রাব্দের সূচনায় দীর্ঘ সময় নিয়ে (১৯৯৬-২০০০) লেখক চিন্তায় প্রাচীন পদ্ধতিতে একটি ক্ষেত্র-সমীক্ষা চালিয়ে চা-জনগোষ্ঠীর ভাষিক চিত্র তৈরির যে চেষ্টা করেছিলেন– সেটা নিচে দেওয়া হলো–

বিভিন্ন পদবিধারী চা শ্রমিকদের ভাষা পরিচিতি (অসম্পূর্ণ তালিকা)

উনিশ শতকের গড়ে ওঠা যে-কোনো চা বাগানের দিকে লক্ষ করলে দেখা যায় যে, প্রতিটি চা বাগানে শতাধিক জাতপাতের লোকজনের বসবাস ছিল এবং তাদের প্রত্যেকের নিজস্ব ভাষা ও সংস্কৃতি বিদ্যমান থাকে। কিন্তু চা জনগোষ্ঠীর কোনো ভাষাভিত্তিক জরিপ কখনো হয়নি। তাছাড়া– চা বাগানের জায়গার মধ্যে বসবাসরত মোট জনগোষ্ঠী, কাজে নিয়োজিত শ্রমিক সংখ্যা, চা বাগানের চৌহদ্দির বাইরে বসবাসরত চা শ্রমিকদের পরবর্তী প্রজন্ম সংখ্যা এবং ভাষাভিত্তিক ভাষিক জনগোষ্ঠীর কোনো বিজ্ঞানভিত্তিক পরিসংখ্যানও নেই। তাই ধারণা পাওয়ার জন্য 'উপাধিভিত্তিক' ভাষার নমুনা দেওয়া হলো–

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
০১.	গোয়ালা	গোপালন ও দুধ, দই বিক্রয় করা	উত্তর প্রদেশ, বিহার	ভোজপুরি/ হিন্দি
০২.	যাদব	গোপালন ও দুধ, দই বিক্রয় করা	"	"

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
০৩.	আহির	গোপালন ও দুধ, দই বিক্রয় করা	”	”
০৪.	চৌহান	লবণ তৈরি	উত্তর প্রদেশ, বিহার	ভোজপুরি
০৫.	নুনিয়া	লবণ তৈরি	”	ভোজপুরি
০৬.	পান তাঁতি	বস্ত্রবয়ন	উড়িষ্যা	উড়িয়া
০৭.	তাঁতি	বস্ত্রবয়ন	উড়িষ্যা	উড়িয়া
০৮.	সিং ভূমিজ	কৃষিকাজ	বিহার, পশ্চিমবঙ্গ	বাংলা, হিন্দি
০৯.	ভূমিজ	কৃষিকাজ	বিহার, পশ্চিমবঙ্গ	বাংলা, হিন্দি
১০.	রুহিদাস	চামড়ার কাজ	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
১১.	রবিদাস	চামড়ার কাজ	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
১২.	দেশওয়ারা	ডোমজাতীয়	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
১৩.	করি	ডোমজাতীয়	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
১৪.	শতনামী	চামড়ার কাজ	বিহার	হিন্দি
১৫.	গড়	বিবাহাদি অনুষ্ঠানে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশন	বিহার, উত্তর প্রদেশ	হিন্দি/ ভোজপুরি
১৬.	রাজগড়	”	”	”
১৭.	গুড়	”	”	”
১৮.	বাউরি	সূতার কাজ	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
১৯.	শঙ্কর বাউরি	”	”	”
২০.	মুন্ডা	শিকার	বিহার	সাদরি হিন্দি, বাংলা মানভূম, মুন্ডারি
২১.	কৌম্পাউন্ড মুন্ডা	পশুপালন	পশ্চিমবঙ্গ	”
২২.	মালকি মুন্ডা	”	”	”

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
২৩.	পাথর মুন্ডা	”	”	”
২৪.	মুড়া	”	”	”
২৫.	কন্দ	বাঁশ/বেতের কাজ	উড়িষ্যা	উড়িয়া
২৬.	হাজারা	কৃষি	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	ভোজপুরি
২৭.	কৈরি	কৃষি/শাকসবজি বিক্রি	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
২৮.	শিং	কৃষিকাজ	”	”
২৯.	পান্ডে	পুরোহিত	উত্তর প্রদেশ	”
৩০.	চৌবে	পৌরহিত্য	বিহার, উত্তর প্রদেশ	হিন্দি/ ভোজপুরি
৩১.	ত্রিপাঠী	”	”	”
৩২.	চতুর্বেদী	”	”	”
৩৩.	মিশ্র	পৌরহিত্য	বিহার, উত্তর প্রদেশ	হিন্দি/ ভোজপুরি
৩৪.	বর্মা	স্বর্ণকার	”	”
৩৫.	সোনার	স্বর্ণকার	”	”
৩৬.	রাজভর	পশুপালন	”	”
৩৭.	টাটের	কাসার জিনিসপত্র তৈরি	উত্তর প্রদেশ	হিন্দি [সংমিশ্রিত]
৩৮.	কানু	রকমারি খাবার তৈরি	উত্তর প্রদেশ	হিন্দি ”
৩৯.	কংকর	বিবাহাদিতে খাবার পরিবেশন	উত্তর প্রদেশ	হিন্দি ”
৪০.	পানিকা	পানি দেওয়া	বিহার	মিশ্র হিন্দি
৪১.	কাহার	পালকি বহন	বিহার, উড়িষ্যা	হিন্দি, উড়িয়া
৪২.	চাষা	দা, কাঁচি তৈরি করা	পশ্চিমবঙ্গ	বাংলা [মানভূম]
৪৩.	পাশি	কৃষিকাজ	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
৪৪.	লোহার	লোহার কাজ	উত্তর প্রদেশ	হিন্দি/ ভোজপুরি

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
৪৫.	কালোয়ার	ব্যবসা	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ দেশওয়ালি
৪৬.	সাঁওতাল/সন্তাল	শিকার, পশুপালন	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	সাঁওতালি
৪৭.	নায়েক	বাদক (বাদ্যকর)	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	সাদরি
৪৮.	প্রধান	বিচার কাজ	উড়িষ্যা, বিহার	উড়িয়া, হিন্দি [মিশ্র]
৪৯.	শর্মা	পৌরহিত্য	উত্তর প্রদেশ, বিহার	হিন্দি/ ভোজপুরি
৫০.	নাইডু		মাদ্রাজ (তামিলনাড়ু)	তামিল
৫১.	খয়রা	-	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৫২.	মান্না	চুলকাটা	বিহার	ভোজপুরি
৫৩.	প্রজাপতি	পুতুল তৈরি করা	উত্তর প্রদেশ	”
৫৪.	প্যাটেল	ব্যবসা	গুজরাট	-
৫৫.	চৌরাশিয়া	পাহারাদার	নেপাল	নেপালি
৫৬.	ভুইয়া	পশুপালন, কৃষি	বিহার	ভোজপুরি
৫৭.	বিন	কৃষি	উত্তর প্রদেশ, বিহার	ভোজপুরি
৫৮.	ঘাসি	বাদ্যকর, কারুকাজ	বিহার	সাদরি
৫৯.	বাগতি	এালি	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৬০.	রাউতিয়া	কৃষি	পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা, বিহার	সাদরি
৬১.	সিং রাউতিয়া	কৃষি	”	”
৬২.	মাল	বাদ্যকর	উত্তর প্রদেশ, বিহার	সাদরি [অন্য ভাষাও চলে]
৬৩.	রাজবংশী	-	বিহার	-
৬৪.	বেনবংশী	বাজনা	বিহার	ভোজপুরি
৬৫.	শুক্লবৈদ্য	ধোপা	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	মানভূমি বাংলা

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
৬৬.	রজক	ধোপা	”	”
৬৭.	বুনারজি	কৃষি	উড়িষ্যা	উড়িয়া/মানভূম বাংলা
৬৮.	মাহারা	এালি	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৬৯.	উরাং	শিকার	বিহার	সাদরি
৭০.	দুধবংশী	-	বিহার	”
৭১.	হাজাম	ক্ষৌরকর্ম	বিহার, উত্তরপ্রদেশ	ভোজপুরি
৭২.	ঘাটোয়ার/ ঘাটোয়াল	-	বিহার, পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৭৩.	শীল	ক্ষৌরকর্ম	পশ্চিমবঙ্গ	”
৭৪.	কৈবর্ত	মাছের ব্যবসা	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৭৫.	থাপা	-	নেপাল	নেপালি
৭৬.	বাহাদুর	-	”	”
৭৭.	কৈরালা	-	নেপাল	নেপালি
৭৮.	পট্টনায়েক		উড়িষ্যা	উড়িয়া
৭৯.	ভোক্ত/ ভক্তা		পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৮০.	মঞ্জু/গঞ্জু		পশ্চিমবঙ্গ	” ”
৮১.	খেড়োয়ার		পশ্চিমবঙ্গ	” ”
৮২.	খাড়িয়া	শিকার	মধ্যপ্রদেশ	খাড়িয়া ভাষা
৮৩.	মাড়িয়া	শিকার	বিহার	এক অংশ খাড়িয়া, উড়িয়া
৮৪.	ভর	চর্মকার	বিহার	সাদরি
৮৫.	দোসাদ		উত্তরপ্রদেশ	দেশওয়ালি
৮৬.	তেওয়ারী	পৌরহিত্য	অন্ধপ্রদেশ	”
৮৭.	অলমিক		অন্ধ্রপ্রদেশ	তামিল/তেলেগু

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
৮৮.	মাহাতো কুর্মি [সাদ্রি কুর্মি]	কৃষি	অন্ধ্রপ্রদেশ	মানভূম বাংলা
৮৯.	রেলি	-	বিহার	দেশওয়ালি
৯০.	রিকিয়াসন	-	বিহার, পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
৯১.	তংলা	-	উড়িষ্যা, গারো পাহাড়	গারো/উড়িয়া [সামান্য]
৯২.	ছত্রী	-	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	মানভূম বাংলা
৯৩.	রাজভর	-	বিহার	উড়িয়া, মানভূম বাংলা
৯৪.	পায়েক	-	উড়িষ্যা	দেশওয়ালী
৯৫.	মাহালী	-	পশ্চিমবঙ্গ, উড়িষ্যা	সাদ্রি, মানভূম বাংলা
৯৬.	গাড়েড়ি	পশুপালন	উত্তরপ্রদেশ, বিহার	ভোজপুরি
৯৭.	ক্ষত্রি		উড়িষ্যা	উড়িয়া
৯৮.	মহান্তি		উড়িষ্যা	”
৯৯.	বাড়ৈ		বিহার	দেশওয়ালি
১০০.	মৃধা		বিহার, পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা, অন্যান্য
১০১.	শবর	শিকার	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	” ”
১০২.	বাড়াইক/বড়াইক/চিড় বড়াইক/ভূমিজ	কাপড় ব্যবসা	বিহার	মানভূম বাংলা
১০৩.	সিং বাড়াইক	”	বিহার	”
১০৪.	মালহা	নৌকা চালানো	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	মানভূম বাংলা
১০৫.	চিনিম	-	গাড়ো পাহাড়	গারো
১০৬.	তুরি	ঢোলবাজনা	ছোটনাগপুর	মানভূম বাংলা
১০৭.	কুভার	-	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	মানভূম বাংলা
১০৮.	মোদি, মুদি	কৃষি	বিহার	খাড়িয়া

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
১০৯.	হাড়ি	কৃষি, পরিচ্ছন্নতা করা	উড়িষ্যা	উড়িয়া
১১০.	খদাল	-	উড়িষ্যা	উড়িয়া
১১১.	সোরি	-	উড়িষ্যা	সৌরী
১১২.	তেলেঙ্গা	-	মধ্যপ্রদেশ	মানভূম বাংলা
১১৩.	তুলিয়া	বাঁশ ও বেতের কাজ	পশ্চিমবঙ্গ, বিহার	মানভূম বাংলা
১১৪.	পাথরমুড়া/ মুণ্ডা/পাত্র	পাহাড়ি কৃষি	বিহার, সাওতাল পরগণা, ছত্রিশ গড়	সাদ্রি
১১৫.	তেলি	তেল তৈরি	বিহার	দেশওয়ালি (বর্তমানে পাল টাইটেল লেখে)
১১৬.	দুবে	পৌরহিত্য	উত্তর প্রদেশ	ভোজপুরি
১১৭.	কুর্মি	কৃষি	উত্তর প্রদেশ	ভোজপুরি
১১৮.	গৌণ্ড/ গৌড়/গন্ধ/রাজগন্ধ	কৃষি/ শিকার	মধ্যপ্রদেশ	দেশওয়ালি/ মানভূম বাংলা
১১৯.	মাঝি/ দেও মাঝি	কৃষি	সাওতাল পরগণা, উড়িষ্যা, বিহার	সাদ্রি/সাওতাল, মানভূম বাংলা
১২০.	দেশোয়ারা	চর্ম দিয়ে বাদ্যযন্ত্র	উত্তর প্রদেশ	দেশওয়ালি
১২১.	পালি	-		
১২২.	রাজপুত	-	দক্ষিণ ভারত	-
১২৩.	মহেশ্বরী	-	-	-
১২৪.	ভগৎ	-	মধ্যপ্রদেশ	মানভূম বাংলা
১২৫.	রিকমুণি/রিমণ	-	উড়িষ্যা	উড়িয়া
১২৬.	কালিন্দি	-	উড়িষ্যা, বিহার	মানভূম বাংলা, উড়িয়া
১২৭.	পানুয়া	-	-	-
১২৮.	গোস্বামী	-	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
১২৯.	বাগতি/বাস্তি/বাগদি	কৃষি, চর্মপেশা	পুরুলিয়া	মানভূম বাংলা

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
১৩০.	রাও	-	-	-
১৩১.	জেসুয়ারা/ দেশোয়ারা	-	উত্তরপ্রদেশ	দেশওয়ালি/ ভোজপুরি
১৩২.	তন্তুবায়	-	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
১৩৩.	বৈদ্য	ধোবা	”	মানভূম বাংলা
১৩৪.	কোয়েরা	-	-	-
১৩৫.	পাত	-	-	-
১৩৭.	মাদ্রাজি	-	মাদ্রাজ	তেলেগু
১৩৮.	সাধু	-	পুরুলিয়া	মানভূম বাংলা
১৩৯.	পান	-	উড়িয়া	উড়িয়া
১৪০.	পরধান	-	উত্তরপ্রদেশ	ভোজপুরি
১৪১.	নাগেসিয়া	বাজনা বাজানো	মধ্য প্রদেশ, বিহার	ভোজপুরি
১৪২.	ঝরা	কৃষি	পশ্চিমবঙ্গের পাহাড়ি এলাকায়	মানভূম বাংলা, সংমিশ্রণ
১৪৩.	শীল	ক্ষৌরকর্ম	উত্তরপ্রদেশ	দেশওয়ালি/ ভোজপুরি
১৪৪.	তাহা/চাষা/তশা	কৃষি	উড়িষ্যা	উড়িয়া
১৪৫.	চাষা (বাংলার)	”	পশ্চিমবঙ্গ	মানভূম বাংলা
১৪৬.	ত্রিপুরি	কৃষি জুম	ত্রিপুরার পাহাড়	ককবরক/ত্রিপুরি
১৪৭.	পাইনকা	-	ছত্রিশগত	পাইনকা, মানভূম
১৪৮.	বাঙালি	কৃষি	বাংলাদেশের বিভিন্ন জেলা	১৯৪৭ সালের পর থেকে বাঙালিরা (তার মধ্যে মুসলিম সংখ্যা অধিক) চা বাগানে কাজ করতে দেখা গেছে। পঞ্চগড়-দিনাজপুর

নং	পদবি	আদি পেশা	মূল প্রদেশ	নিজস্ব ভাষা
				এলাকার নবগঠিত চা বাগানে বাঙালি শ্রমিকদের সংখ্যা কম নয়।

(তালিকাটি মৌলভীবাজার জেলার পুরাতন চা বাগানের বয়স্ক পুরুষ, সর্দার, পঞ্চায়েত, স্ব-স্ব সমাজপতি ও ইউনিয়ন প্রতিনিধিদের সাথে আলোচনাক্রমে তৈরি করা হয়েছে। এর বাইরে আরো কিছু পদবিধারীদের ভাষা রয়েছে)

চা শ্রমিকদের শিকড়ের ভাষা যখন সংমিশ্রিত উচ্চাণের পথ ধরে

এক একটি চা-বাগানে রয়েছে হরেক রকম ধর্ম, সংস্কৃতি ও বিশ্বাস। অনেক বাগানে মুসলমান রয়েছেন। কিন্তু কোথাও সংঘাত নেই। নানা ধর্ম, উপধর্ম, প্রকৃতি পূজারি, সর্বপ্রাণবাদী, বিভিন্ন লোকায়ত দর্শনের, সমাজের, জাতির (নানা গোষ্ঠী ও উপশাখা), আদিবাসী/নৃ-গোষ্ঠীর (উপশাখা) বহুসংখ্যক লোকজন রয়েছে যে, তাদের ভাষা বিচার করা খুব কঠিন হয়ে পড়ে। বর্তমানে বাংলাদেশে অবস্থিত চা বাগানগুলোতে অনুমানিক ১৮৬০–১৯৩০ সালে ভারতের নানা স্থান থেকে শ্রমিকরা আসতে থাকে। যে শ্রমিকরা একদিন সিলেট-আসামের জঙ্গলে এসেছিল– অতঃপর 'আইনী প্যাচ', 'গিরমিট' (চুক্তি) প্রথা, অর্থের অভাব, বাড়ির পথ ভুলে যাওয়া, রাস্তা বদলে যাওয়া, ঠিকানা না থাকা, আড়কাটির পরিবর্তন ইত্যাদির কারণে; সেই শ্রমিকদের কোনো অংশ-ই কখনো মাতৃভূমিতে ফিরে যেতে পারেনি। অর্থাৎ পাহাড়ি-ব্যূহের মধ্যে থিতু হওয়া চা শ্রমিকদের এখন প্রায় পঞ্চম প্রজন্ম অতিক্রম করছে (আগমন ১৮৬০ সাল থেকে হিসেবে করে প্রতি ৩০ বছরে এক প্রজন্ম-কাল ধরা হয়েছে। তবে চা বাগানে ২০/২৫ বছরে এক প্রজন্ম ধরা-ই সংগত)। সুদীর্ঘকাল থেকে চা শ্রমিকরা নিজের জন্মস্থান/শিকড়ের কৃষ্টি-সংস্কৃতি এবং ভাষা থেকে বিচ্ছিন্ন থাকায়– আদি শব্দ/ভাষা/বর্ণের আদিরূপ/কথ্যরূপ থেকে তারা বহু দূরে সরে গিয়ে সংমিশ্রিত-ঢং মিশিয়ে কথার রূপ দেওয়ার চেষ্টা করেন।

যে কিছু ভাষার হরফ ছিল– সেগুলোর লেখ্যরূপও অনেকে জানেন না। কারণ চর্চার দীর্ঘকালের স্থবিরতা, অশিক্ষা ও হরফ-অনভিজ্ঞ ও জোগানের অভাবে অনেক ভাষিক জনগোষ্ঠী তাদের ভাষা-সংস্কৃতির নিজস্বতা হারিয়েছে। আরেকটি বিষয় লক্ষণীয় যে, নানাকারণে– বিশেষত চা বাগানের আইনে বহিষ্কৃত পুরাতন শ্রমিক এবং যারা স্বেচ্ছায় কাজ ছেড়ে দিয়েছিল; কিংবা চুক্তির মেয়াদ শেষ হয়েছিল– তারা পিতৃপুরুষের জন্মভিটায় ফিরতে না পেরে বাগানের পাশেই সরকারি জায়গায় বসতি গড়ে তোলে। এই জনগোষ্ঠী বাঙালি সমাজের সাথে সম্পর্ক রাখতে গিয়ে 'ভাঙা-ভাঙা বাংলা' আয়ত্ত করে। বিশেষত সিলেট ও শ্রীমঙ্গল শহরের পাশে এরূপ কিছু 'এক্স লেবারদের কলোনি' দৃষ্টিগোচর হয় (আগে শহর বর্তমানের মতো সম্প্রসারিত ছিল না)।

চা জনগোষ্ঠীর ভাষা-সংকট

দেশ-ভাগের আগে সুরমাভ্যালি এবং ব্রহ্মপুত্রভ্যালি, আসামভ্যালির চা শ্রমিকদের মধ্যে ভাষাগত (অধিকাংশ বিবাহসূত্রে) কিছুটা যোগাযোগ রক্ষা করার সুযোগ ছিল। বিভিন্ন কায়দায়/ছলনায় তাদের আশপাশের বিভিন্ন

বাগানে যেতে পারতো– অর্থাৎ স্থানান্তরিত হতো। কিন্তু ভারত-পাকিস্তান ভিসা আইন চালু হওয়ার পর সে সুযোগ তাদের হাতছাড়া হয়। অর্থাৎ বাংলাদেশের শ্রমিকরা আর ওপারে যেতে পারনি (ভারতে)। ঔপনিবেশিক আইনের জাঁতাকলে চা শ্রমিকরা সেকালে শিক্ষার মধু পান করতে পারেনি। অশিক্ষার অভাবে চা শ্রমিকদের মধ্যে তাদের মাতৃভাষায় ছিটেফোঁটাও সাহিত্য রচনা করতে পারেনি। মোদ্দাকথা, গহিন নির্জনে থাকা চা-বস্তিগুলোর সাথে স্থানীয় বাঙালি সমাজের (আইনগত কারণে) কার্যত যোগাযোগের সুযোগ ছিল না। প্রতি সপ্তাহে একটা নির্দিষ্ট সময়ে বাগানিরা তাদের বাগানের পাশের বাজারে (যাকে 'লেনের বাজার'/ 'গন্তিরবাজার'/ 'তলব বারের বাজার' বলা হতো) আসতো। ফলে ব্রিটিশ আমল গড়িয়ে পাকিস্তানের মধ্য সময় পর্যন্ত চা শ্রমিকদের ওপর স্থানীয় বাংলা ভাষার প্রভাব কম পড়েছে। বিশেষত সত্তরের নির্বাচনের সময় থেকে চা বাগানগুলোতে বাঙালিরা অবাদে প্রবেশের সুযোগ পায়। ফলে চা জনগোষ্ঠী ও স্থানীয় বাঙালির সাথে দৈনন্দিন লেনদেন, রাষ্ট্রীয় আইন-কানুন, লেখাপড়ার সংযোগে তারা বৃহত্তর জনগোষ্ঠী অর্থাৎ বাংলা ভাষাকে তাদের মনোজগতে ঠাঁই দিচ্ছেন নিজস্ব কায়দায়। ওদিকে আবার তাদের নিজস্ব মাতৃভাষা হারিয়ে যাচ্ছে। ফলে চা জনগোষ্ঠীর অনেক ভাষা অতি বিপন্ন ভাষায় ঠাঁই নিচ্ছে। সবচেয়ে মহাবিপন্ন অবস্থায় রয়েছে– 'সোরা/সৌরা ভাষা' (একসময়ের অস্ট্রো-এশিয়াটিক ভাষা, যারা অন্ধ্রপ্রদেশ, তামিলনাড়ু ও বিহার থেকে এসেছিলেন– তাদের একাংশ সৌরী ভাষায় কথা বলতেন)। কারো মতে মুণ্ডারা সৌরী ভাষায় কথা বলেন। এই ভাষার বর্ণমালা আছে।

বর্তমানে খাড়িয়া মহাবিপন্ন একটি ভাষা। খাড়িয়া সমাজের লোকেরা এই ভাষায় কথা বলে। যাদের আদি নিবাস হলো ছোটনাগপুর, রোহতাসগড়, অযোধ্যার পাহাড়ি অঞ্চল। সাংবাদিক আফরোজ আহমদ বাংলাদেশের প্রেক্ষিতে ক্ষেত্র সমীক্ষা করে দেখিয়েছেন যে, মূল 'খাড়িয়া ভাষা'য় কথা বলার মতো এখন বাংলাদেশে মাত্র দুই বোন জীবিত রয়েছেন (তারা শ্রীমঙ্গল বর্মাছড়া চা বাগানে থাকেন; আদিনিবাস ভারতের ঝাড়খণ্ড, বাংলাদেশে লোক সংখ্যা প্রায় ৬০০০ জন। নিজস্ব বর্ণমালা নেই; তবে মিশনারিরা রোমান হরফে লেখার পথ করে দিয়েছে)। বাংলাদেশের খাড়িয়ারা এখন বাংলায় কথা বলছে।

অন্যদিকে উরাং/ওরাওঁ জনগোষ্ঠীর ভাষার নাম 'কুরুখ ভাষা'– যা দ্রাবিড় ভাষা পরিবারের অন্তর্ভুক্ত। এই ভাষাও এখন বিপন্ন হতে চলেছে। 'কুরুখ ভাষা'র লিপি 'তুলং সিকি' থাকলেও বাংলাদেশে এ লিপির ব্যবহার নাই। অনুসারী উরাংদের নবপ্রজন্ম সংমিশ্রিত বাংলায় কথা বলে। এই ভাষার ওপর কাজ করেছেন গবেষক দীপংকর শীল। তিনি মনে করেন, শিশুদের কুরুখ বর্ণমালা শেখানো দরকার। তিনি এই ব্যাপারে উদ্যোগী ভূমিকা নিয়েছেন। আমাদের দৃষ্টিতে একুশ শতকে এসে চা বাগানে সবচেয়ে বিপন্নভাষা হলো– **১. খাড়িয়া ভাষা; ২. সৌরী ভাষা; ৩. ছত্তিসগড়ী (পাইনকা সমাজের ভাষা); ৫. মুণ্ডারি; ৬. কুরুখ ভাষা**। অন্যান্য ভাষাগুলোর মধ্যে বাংলা ভাষার শব্দ ও উচ্চারণ অনুপ্রবেশ ঘটছে। বিশেষত প্রতিটি চা বাগানে একটি করে প্রাইমারি বিদ্যালয় স্থাপনের নীতিমালার আলোকে গড়ে তোলা প্রাইমারির বইগুলো বাংলা ভাষায় পড়তে হয়। আশার কথা যে, বর্তমান সরকার মৌলভীবাজার জেলার চা অধ্যুষিত অঞ্চলে প্রায় ৩৪টি সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপন করেছেন। মৌলভীবাজার জেলার কমলগঞ্জ উপজেলার কয়েকটি চা বাগনে বিপন্ন কুরুখ ভাষার অবস্থা (ক্ষেত্র গবেষণা করে পরিসংখ্যান তৈরি করেছেন গবেষক দীপংকর শীল) নিম্নে দেওয়া হলো–

সারণি-১

জনতাত্ত্বিক বণ্টন ও ভাষিক পরিস্থিতি [কুরুখ ভাষা]

মির্তিঙ্গা চা বাগান

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পরিবার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা	ভাষা
১.	হালকিটিলা	৫৪	২৬৮	কুরুখ
২.	পাথরটিলা	৪৭	২০৭	কুরুখ
৩.	বড়লাইন	২২	১০৯	সাদরি + কুরুখ (মিশ্রভাষা)
৪.	সরইবাড়ি	৪১	১৬১	কুরুখ
৫.	করাতি টিলা	৫	৩৪	কুরুখ
৬.	ফাঁড়ি	১১৯	৬০৯	কুরুখ
৭.	পশ্চিম কালাছড়া	২৯	১৪২	কুরুখ
৮.	চাউতলি	২	৯	কুরুখ+মিশ্র
৯.	৯ নম্বর কালাছড়া	২৫	১৩২	কুরুখ + সাদরি
১০.	২২ নম্বর	১৮	৮১	কুরুখ
১১.	বোমবোতল	৩	১৮	সাদরি+মিশ্র
১২.	আমড়াকোণা	৩	২৫	কুরুখ+সাদরি
	মোট	৩৬৮	১৭৯৫	১৩ শতাংশ মিশ্রভাষা

সারণি-১ মির্তিঙ্গা চা বাগানে মোট উরাং পরিবার সংখ্যা ৩৬৮টি, মোট লোকসংখ্যা ১,৭৯৫ জন। প্রায় ৯২ শতাংশ লোক কুরুখ ভাষায় কথা বলেন। বাকি ৮ শতাংশ লোকের ভাষায় সাদরি ও কুরুখের মিশ্রণ ঘটেছে।

সারণি- ২

ভাষিক পরিস্থিতি [কুরুখ]

দেওড়াছড়া চা বাগান

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পরিবার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা	ভাষা
১.	বামনবিল	৮০	৩৭০	৭০টি পরিবার কুরুখ এবং ১০টি পরিবার মিশ্র ভাষায় কথা বলে।
২.	ঘুংগিবিল	৫৪	২৭৩	৪০টি পরিবার কুরুখ এবং ১৪টি পরিবার সাদরি ভাষায় কথা বলে।
৩.	৬ নম্বর	৫২	২৩৩	কুরুখ
৪.	৭ নং	২৪	১১২	কুরুখ
৫.	১০ নম্বর	৪	২৪	কুরুখ
৬.	১৩ নম্বর	২	১০	কুরুখ

৭.	রাঁচিটিলা	৯	৩৫	সাদরি
৮.	বাজারটিলা	৫	১৭	সাদরি
৯.	আলীনগর টিলা	১	৬	সাদরি
	মোট	২৩১	১০৮০	

সারণি-২: দেওড়াছড়া চা বাগানে ২৩১টি পরিবারে মোট জনসংখ্যা ১০৮০ জন। এরমধ্যে প্রায় ১০ শতাংশ পরিবারের লোক কুরুখ, সাদরি ও বাগানি বাংলা তথা মিশ্রভাষায় কথা বলেন।

সারণি-৩

ভাষিক পরিস্থিতি (কুরুখ)

আলীনগর চা বাগান

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পরিবার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা	ভাষা
১.	আলীনগর	৮	৩৯	মিশ্রভাষা
২.	সুনছড়া	১৭	১০০	মিশ্রভাষা
৩.	কামারছড়া	২০	১১১	সাদরি (কুরুখ ১ জন)
	মোট	৪৫	২৫০	

সারণি-৩: মোট ৪৫টি পরিবার এবং জনসংখ্যা ২৫০ জন। এখানে কুরুখ ভাষার ব্যবহার নেই। বৈবাহিক সূত্রে কুরুখভাষী ১ জন মহিলা আছেন। কুরুখ ভাষা ব্যবহার করতে পারেন না।

সারণি-৪

ভাষিক পরিস্থিতি (কুরুখ)

বাগিছড়া চা বাগান

ক্রমিক নং	গ্রামের নাম	পরিবার সংখ্যা	মোট লোকসংখ্যা	ভাষা
১.	বাগিছড়া চা বাগান	২	১৩	মিশ্র

সারণি-৪: বাগিছড়া চা বাগানে ২টি পরিবার আছে এবং এখানে লোকসংখ্যা ১৩ জন। এদের ভাষা মিশ্র। কুরুখ ভাষার ব্যবহার নেই।

চারটি চা বাগানের পরিসংখ্যান থেকে প্রতীয়মান হয় যে, কুরুখ ভাষা ক্রমেই হারিয়ে যাচ্ছে এবং মিশ্ররূপ ধারণ করছে। বিপন্ন কুরুখ ভাষা নিয়ে উদ্‌বিগ্ন হয়ে গবেষক দীপংকর শীল কুরুখ বর্ণমালা দিয়ে সমাজের শিশুদের শেখানোর চেষ্টা করছেন।

চা বাগানে বাংলা ভাষার প্রভাব

ভাষা গবেষক ড. শ্যামলকান্তি দত্ত ও দীপংকর শীল মনে করেন যে, চা শ্রমিকরা বাস্তবতার কারণে দ্রুত তাদের মাতৃভাষা হারিয়ে বাংলাভাষার দিকে ঝুঁকছে। ঘরে-বাইরে সংমিশ্রিত বাংলায় মনের ভাব প্রকাশ করছে। ফলে তাদের উচ্চারণ যথার্থ বাংলা উচ্চারণ না হয়ে ভিন্নমাত্রায় উচ্চারিত হচ্ছে– যা চা বাগানে 'বাংলী' নামে নতুন 'ভাষা-শব্দ' জন্ম নিয়েছে। ড. মো আশ্রাফুল করিমও বর্তমানে চা শ্রমিকদের মধ্যে প্রচলিত বাংলা ধ্বনিতাত্ত্বিক বিশ্লেষণ করেছেন। প্রবন্ধকার লক্ষ করেছেন যে, সিলেট অঞ্চলের হাট-বাজার ও গ্রামাঞ্চলের কাছে যে-সকল চা বাগানের অবস্থান রয়েছে– সে বাগানের শ্রমিকরা 'বাংলী'র সাথে সিলেটী শব্দের ব্যবহার ও উচ্চারণ করার প্রবণতা রয়েছে।

চা বাগানে নানা ভাষা ও সংস্কৃতির মিশ্রণে বাংলা ভাষার একটি বিশেষ রূপ সৃষ্টি হয়েছে যাকে 'বাগানি বাংলা' হিসেবে অনায়াসে চিহ্নিত করা যায়। বিভিন্ন ভাষাভাষীর বাচনিক বৈশিষ্ট্য, কণ্ঠস্বরের উঠানামা, শব্দ ও বাক্যস্থিত শ্বাসাঘাত, নিজ নিজ মাতৃভাষা থেকে ধার করা শব্দের সাবলীল প্রয়োগ 'বাগানি বাংলা'কে ভিন্ন মাত্রার বৈশিষ্ট্য দান করেছে। বাংলা ভাষায় না-বাচক ক্রিয়াবিশেষণ সাধারণত বাক্যের শেষে ব্যবহৃত হয়; কিন্তু চা জনগোষ্ঠীর মুখে না-বাচক ক্রিয়া বিশেষণটি সমাপিকা ক্রিয়ার আগেই ব্যবহৃত হতে দেখা যায়। যেমন: 'তোর বৌদিরা তো এমন সোয়াদ তরকারি **নাই বানাইতে পারে** রে!' অথবা, 'আজ বাজারে **নাই যাব**।' খবর **নেই পাঁলো** (খবর পাইনি)। তাছাড়া প্রত্যেক ভাষাভাষী তার মাতৃভাষার অনুকরণে বাংলা ভাষা ব্যবহার করে। সাদরি যাদের মাতৃভাষা তারা বাংলা কথাবার্তায় অনায়াসেই সাদরি রূপ ব্যবহার করে। যেমন: বিশেষ্য পদের ব্যবহার: ভাটু (ভগ্নীপতি), লেড়কা (ছেলে), আংলি (আঙ্গুল), আঁইখ (চোখ) ইত্যাদি।

বিশেষণ পদের ব্যবহার: সাফা (পরিষ্কার), বেজান (অনেক), বাগানিয়া আদমি (বাগানি লোক), আচ্চা আদমি (ভালো লোক), একঠো, দুইঠো, তিনঠো ইত্যাদি।
বিশেষণের দ্বিত্বপ্রয়োগ: ছোটে ছোটে ঘর, বহুত বহুত আদমি।
সম্বন্ধ পদের ব্যবহার: উকের ভাই (তার ভাই), মাটিকের ঘইলা (মাটির কলস)।
অসমাপিকা ক্রিয়ার ব্যবহার: দেইখকে (দেখে), যায়কে (যেয়ে), খাবে হলে (খেয়ে), কাটেকলে (কেঁটে), রহেকলে (থেকে) ইত্যাদি।

কুরুখ যাদের মাতৃভাষা, তাদের মুখের ব্যবহৃত বাংলার কিছু নমুনা এখানে দেওয়া হলো। বাংলা রূপমূলের সাথে কুরুখ প্রত্যয় যুক্ত হয়ে এক ধরনের মিশ্র শব্দ সৃষ্টি হয়েছে। যেমন, যেতনা-তেতনা (যখন-তখন), বাড়য়ালি (বাড়ে), একাবারি (একেবারে), মেশাবানার (মিশিয়ে দিত), বাহরি (বাইরে), ভিতরি (ভিতরে), স্বাপেনা (স্বপন)।

বাগানি বাংলায় কতিপয় ধ্বনি পরিবর্তনের নমুনা: গিয়েলিল (গিয়েছিল), দাউ (দা), কাঁটাই দিলাম (কেঁটে দিলাম), আই গেল (এসে গেল), হিয়ানে (এখানে), উঠাই গেল (উঠে গেল), ছাতি তাইক করে মার (ছাতি তাক করে মার), হামি (আমি), বান্দরা (বান্দর), গাধহা (গাধা), লিল (নীল), লাটখানা (লটকা), কওন (কোন), কতি সময় (কত সময়), কিনো (কেন), কেহু (কেউ), ছট (ছোটো) ইত্যাদি।

প্রত্যেক চা বাগানে সমানহারে ভাষিক জনগোষ্ঠী বসবাস করে না; ভাষিক সম্প্রদায়ে অনেক তারতম্য থাকে। চা বাগানের বৈচিত্র্যময় ভাষাকে বাঁচাতে হলে বাণিজ্য মন্ত্রণালয়, শ্রম মন্ত্রণালয়, সংস্কৃতি মন্ত্রণালয়,

ইউনিসেফ, আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউট, চা বোর্ড, বাগান কর্তৃপক্ষ এবং সম্প্রদায়গত সমাজপতি নিয়ে সকলের মাতৃভাষা রক্ষার্থে প্রথমেই সকল ভাষিক জনগোষ্ঠীর মাতৃভাষার ওপর বিজ্ঞানসম্মত সমীক্ষা চালাতে হবে। পাশাপাশি চা-জনগোষ্ঠীর জন্য পৃথক-পৃথক মাতৃভাষায় পাঠ্যবই তৈরি করা যেমন অবশ্যক; তেমনি প্রতিটি বাগানের বস্তিতে/পাড়ায় স্যাটেলাইট ভাষা স্কুল প্রচলন করা জরুরি। তাছাড়া চা-জনগোষ্ঠীর ভাষা গবেষণার পথ উন্মুক্ত করতে হবে।

তথ্যসূত্র

আহমেদ, আফরোজ (৪ঠা এপ্রিল, ২০২৪)। 'সংকটে চা জনগোষ্ঠীর ভাষা ও সংস্কৃতি'। *বণিকবার্তা*।

করিম, মো. আশ্রাফুল। 'সিলেটের চা শ্রমিকদের ভাষা: একটি ধ্বনিতাত্ত্বিক সমীক্ষণ'। *The Dhaka University Journal of Linguistics;* vol-2 No-4. August 2010.

কাসেম, আবুল (২০১০)। *চা শিল্পের ইতিহাস*। ঢাকা: গতিধারা।

গাইন, ফিলিফ (২০২২)। *চা শ্রমিকের কথা* (সম্পাদিত)। ঢাকা: সেড।

দেশোয়ারা, মিন্টু (একুশ ফেব্রুয়ারি, ২০২২)। 'হারিয়ে যাচ্ছে সৌরা ভাষা'। *ডেইলি স্টার*।

ফুকন, উমানন্দ (১৯৮৪)। *দি এক্স টি গার্ডেন লোবার পপুলেশনইন আসাম*। নিউদিল্লি।

মোহান্ত, রসময় (২০০৮)। *বাংলাদেশের চা শিল্প ও শ্রম*। শ্রীমঙ্গল: মুদ্রণবিদ কম্পিউটার।

শীল, দীপংকর (২০২২)। *উরাং জনগোষ্ঠীর কুরুখ ভাষা পরিচয় ও অভিধান*। কমলগঞ্জ: শিল্পকলা একাডেমি।

সনজয়, পার্থ। (১৯শে ফেব্রুয়ারি, ২০২৪)। 'চা শ্রমিকদের সৌরা ভাষা এখন বিলুপ্তির পথে'। *একাত্তর টিভি*।

সামা, ভার্জনিয়াস (১৯৯৬)। 'কন্ডিসন অব টি এস্টেট লেবারার্স ইন আসাম' শীর্ষক প্রবন্ধ। সরিৎ কে ভৌমিক সম্পাদিত (যৌথ) *টি প্লেন্টেটশন লেবার ইন ইন্ডিয়া* গ্রন্থ। নিউ দিল্লি।

Hossain, Ashfaque (2023). *Colonial Globalization and its Effect on South Asia*. London/New York: Routledge.

কৃতজ্ঞতা

চিত্তরঞ্জন রাজবংশি, প্রভাষক, গোয়াইনঘাট সরকারি কলেজ, গোয়াইনঘাট, সিলেট।

দীপংকর শীল, প্রভাষক, কমলগঞ্জ সরকারি গণমহাবিদ্যালয়।

রাজেন্দ্র বুনারজি, চা শ্রমিক নেতা, কালিঘাট রোড়, শ্রীমঙ্গল, মৌলভীবাজার।

ড. শ্যামলকান্তি দত্ত, অধ্যাপক, চট্টগ্রাম ইউরিয়া ফার্টিলাইজার কলেজ, চট্টগ্রাম।

Dhaka as Capital of Bangla Speaking State: Historical Perspective

Professor Dr. Sharif Uddin Ahmed

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookSharif

Dhaka As Capital of Bangla speaking State: Historical Perspective

The evolution of Dhaka into a megacity and the capital of a Bengali-speaking state is a remarkable phenomenon, especially considering its humble origin. Understanding how this transformation occurred is the central theme of this article earlier presented at the International Seminar held in Dhaka titled 'The Language Movement and the Emergence of a Bangla-speaking State'.

What would be the Lingua Franca of a Capital City of a State depends much not only upon the native language of the region from which it rises as its capital but also its political, social, and cultural history and some other related matters.

As we have just mentioned, the lingua franca of a capital city is shaped not only by the native language of the region but also by its intricate political, social, and cultural history. Several factors contribute to this evolution, including migration patterns, political evolution and socio-economic developments. In the context of Dhaka, the capital of Bangladesh, these elements have played significant roles in the emergence of Bangla as the national language. Bangladesh is home to a rich tapestry of languages, comprising 44 indigenous languages, including 17 Tibeto-Burman, 10 Indo-Aryan, 7 Austroasiatic, and 2 Dravidian languages. This linguistic diversity highlights the country's complex ethnolinguistic landscape, reflecting the historical amalgamation of different communities and cultures over centuries (Van Schendel, 2009, pp. 32-33). The rise of Bangla as the predominant language in Dhaka is particularly notable, especially given the region's colonial past and its associated linguistic influences.

The establishment of Bangla as the official language was significantly influenced by the Bengali Language Movement of the 1950s, which underscored the cultural and emotional significance of the language. This movement played a pivotal role in shaping the linguistic identity of the nation,

leading to the recognition of Bangla as the state language. Furthermore, the British colonial rulers introduced English as the administrative and educational language, adding another layer to the linguistic dynamics of the region. Despite these external influences, the resilience of Bangla and its adoption as the national language in post-independence Bangladesh underscores the deep-rooted cultural identity associated with it. So, changing Dhaka into a city where Bangla is spoken is not just about population shifts; it shows the larger historical events and cultural claims, highlighting how the Bengali Language Movement and various language and culture influences have shaped the city's language scene. Dhaka is characterised by its vast rivers and water bodies, situated on the last bluff of higher ground in a predominantly low-lying country. This strategic location offered safety and attracted a diverse population, including peasants and various other professionals, for many centuries. During the early medieval period, Muslim rulers and ordinary Muslims began to inhabit the area. However, their presence did not immediately elevate Dhaka's significance. The diversity of the inhabitants did influence the local lingua franca, though not substantially, as the population primarily spoke Bangla and other regional languages.

This gradual process continued until the Mughal era, when an influx of people from different backgrounds, including Muslim rulers and officials, began settling in and around what is now known as Old Dhaka. The major transformation began under the rule of Mughal Emperor Akbar the Great (1556-1605), who aimed to expand his empire eastward. One of his prominent generals, Raja Man Singh, initiated the colonization of the area, marking the beginning of a new historical chapter for Dhaka. Despite these developments, no single language emerged as dominant; instead, a variety of languages and dialects were spoken.

The turning point came during the reign of Emperor Jahangir (1605-1627), who pursued the expansion of the Mughal Empire into the eastern and northeastern parts of South Asia. He dispatched General Islam Khan, with an army of 30,000 to 40,000 soldiers also cavalry and Navy to complete this mission (Taifoor, 1952, 1956). The strategic advantages of Dhaka made it the ideal center for operations and the new capital of Mughal Bengal. The arrival of a large army and administrative staff not only increased the city's importance but also influenced its linguistic landscape. Persian was the official

language, while a blend of Hindi, Urdu, Persian, and Arabic became the common medium of communication among the diverse inhabitants Yet, the choice of Dhaka as the capital of this newly acquired territory was not immediate. It was a strategic decision that required careful consideration. Nonetheless, Dhaka emerged as the focal point of Mughal power in the region, marking the beginning of its ascent as a significant urban center. (Taifoor, 1952, p. 51 provides further insights into the people and events of this era).

As noted previously, Dhaka's strategic location positioned it favorably for launching conquests in the eastern or northeastern regions of South Asia. Consequently, Islam Khan naturally selected Dhaka as both his operational headquarters and the new capital of Mughal Bengal.

The arrival of a substantial army not only elevated Dhaka's importance but also transformed its linguistic landscape. Initially lacking a dominant lingua franca due to its sparse population and limited significance, the need for a common language intensified with the influx of ruling elites, administrators, merchants, suppliers, and various service providers.

In the early days, as has been already noted, Dhaka did not have a dominant lingua franca, as the population was sparse and the region lacked political, economic, and social significance. However, the influx of various groups, including ruling classes, administrative elites, merchants, food suppliers, arms dealers, service providers, and political leaders, created a necessity for a common language of communication. During the medieval period, particularly under the Mughal rule, Persian (Farsi) was the official language though spoken practically by the higher echelon of government of the ruling class, while the majority of soldiers and petty officials spoke Urdu, a blend of Hindi, Urdu, Persian, and Arabic. This linguistic development stemmed from the gradual Middle Eastern influence in the region (Eaton, 1996).

Despite a sizable portion of Dhaka's populace speaking various Bengali dialects and other languages, Farsi and Urdu emerged as the dominant tongues, revered for their association with secular prestige. Farsi, serving as the official language and favored by the aristocracy, epitomized sophistication and elite status.

Meanwhile, in the surrounding countryside, encompassing Subah Bangla, Bengali dialects thrived as integral components of the evolving Bangla language. This cultural milieu in Dhaka marked a pivotal juncture, with Urdu, originating as the language of military encampments, usurping Farsi's position to become the city's primary language.

Moreover, Urdu's ascendancy transcended its military origins, evolving into a refined medium for intellectual discourse and standard communication across the subcontinent by this period.

Thus, almost overnight, Dhaka found itself steeped in Urdu language and culture, despite Farsi (Persian) maintaining its status as the official language and the preferred tongue of the ruling and upper classes. This dominance permeated every aspect of the city's life, evident in its cuisine, attire, etiquette, and musical traditions.

For close to a century, Dhaka thrived as the capital of an expanding Mughal Eastern Empire, which encompassed vast territories. The resulting wealth generated by the region naturally manifested in physical expansion, infrastructure development, educational and cultural advancements, and culinary innovations within the city. Dhaka burgeoned into a thriving hub within the renowned Mughal Empire, renowned not only for its governmental functions but also as a key center for international trade, commerce, banking, and notably, the world-famous Muslin Market. Even during the times of adversity, such as when it lost its provincial capital status, Dhaka's annual muslin production remained valued at an impressive 24.50 lakhs of rupees as in 1747; (Karim, 1964, p.88)

At the pinnacle of its existence, Dhaka's provincial administration was overseen by top-tier officials, often members of the imperial family or esteemed military and civil leaders. This ruling elite, predominantly of foreign origin and fluent in Persian, Arabic, or Turkish, rendered Dhaka akin to a foreign enclave. Yet, intriguingly, it was Urdu, commonly known as Hindustani, that emerged not just as a rising but as the de facto lingua franca of the city.

A parallel transformation unfolded in the countryside, where the majority spoke various Bengali dialects. Despite this, the influence of Persian, Arabic,

and Urdu introduced by administrators, military personnel, traders, and bankers began to permeate local communities, albeit to a lesser extent.

An example of Persian cultural influence in Dhaka is evident in the death anniversary celebration of Mirza Nathan's father, as detailed in the 17th-century chronicle The *Baharistan-i-Ghaibi* (Persian: بهارستانغیبی), written by Mirza Nathan, which documents the history of Bengal and Cooch Behar. Professor Ahmad Hassan Dani recounts this event in his book on Dhaka: "Mirza Nathan celebrated the six-monthly feast of his late father, attended by all the Khans. Islam Khan, unable to attend on the day due to illness, visited the next day and offered many excuses. The feast featured a variety of delicious food, drinks, and fruits. Every Qur'an reciter received a pair of shawls, and rose otto was royally sprinkled" (Dani, 1962). Mirza Nathan elaborates on the grand feast: "He invited all the noted officers, including the Subahdar, the Diwan, the Bakhshi, the Qazi, and the Mir 'Adl. All the Khans gathered at Mirza Nathan's house. As it was Friday, Islam Khan attended the congregational prayer, ordering fines for officers absent from prayer. Mirza Nathan took responsibility for the fines, ensuring they stayed. An imperial Farman sent to Islam Khan arrived, brought by Baz Bahadur Qalmaq's son. The Khan left to receive it by boat. Upon his return, the heavily drunk comrades avoided Islam Khan and dispersed. Mirza's servants poured rose water on their dresses and scented the air with ambergris, transforming the wine-smelling room into one with the fragrance of paradise. The festivities continued for seven days and nights" (Dani, 1962, p. 73).

Following, the unfortunate rift between the esteemed Finance Minister, Diwan Murshid Quli Khan, and Prince Subahdar Azim Uddin Shah, Dhaka endured significant hardship when the capital of the thriving Bengal, Bihar, and Orissa province was relocated to Muksudabad. This process, initiated in 1702 and concluded in 1717, resulted in the renaming of the city to Murshidabad in honor of Murshid Quli Khan. Despite these upheavals, Dhaka's linguistic and cultural fabric remained largely unchanged.

The newly appointed Deputy Subadars, or *Naib-Nazims*, of Dhaka were from the same religious, cultural, and social backgrounds as their predecessors. They upheld the established traditions and authority, albeit with diminished political power compared to their counterparts in Murshidabad. Nevertheless,

a close relationship between the two cities persisted, maintaining the continuity of Mughal cultural influence for an extended period.

This continuity persisted until the Battle of Plassey in 1757, which drastically altered the socio-political landscape of India. The conquest by the English East India Company ended the Mughal era and began a new chapter in Indian history. However, changes did not occur overnight, and Mughal governance, education, and culture continued until 1835, when the British made English the official language of the country, significantly impacting Dhaka and Eastern Bengal.

Remarkably, despite these upheavals, Dhaka's public life and urban culture remained largely unchanged. However, the city's economic fortunes plummeted due to the deliberate destruction of its flourishing textile industry, including the renowned muslin, by the British East India Company's detrimental policies. Thousands of industrial workers left Dhaka, seeking livelihoods as farmers in the countryside.

Rajani Palme Dutt eloquently captured the devastation wrought upon Dhaka's once-thriving industrial life by stating that under the 'pax Britannica' 'populous manufacturing towns like Dhaka and Murshidabad were rendered desolate, akin to the devastation caused by war or foreign conquest.' This excerpt underscores the profound impact of British policies on Dhaka's economic landscape, shaping its trajectory into the modern era (Sharif, *Dhaka*, 1986.).

In this backdrop, a notable event was the arrival of a Kashmiri Muslim family in Dhaka in the early 19th century. Initially trying their luck in various parts of the province, one scion eventually settled in Dhaka. This family, known as the Khwaja Family of Dhaka, rose to prominence, becoming the richest and most distinguished family in the city and entire East Bengal. They became close allies of the British rulers and the most influential Urdu-speaking leaders in Dhaka and, subsequently, East Bengal and East Pakistan, eventually earning the title of Nawab. Khwaja Abdul Ghani of this family received for the first time the title of the Nawab of Dhaka from the English.

In Dhaka, different varieties of Urdu were spoken, incorporating many Bengali words. One well-known variety was spoken by a group of Urdu-speaking people who arrived in Dhaka in the 18th century, known as the Khushbash or

Sukhbas (Taifoor, 1956, p. 53). Thus, in pre-independence Dhaka, Urdu was a dominant medium of communication, and its presence was significantly felt in this historic city.

Arrival of Khusbash People and Kuttis

According to S.M. Taifoor, a group of Urdu-speaking people arrived in Dhaka in the 17th century from northern India in the company of the 'umera' (nobility) and came to be known as the Khusbash or Sukhbas. Though their Urdu had a slightly different accent compared to the refined Urdu of the upcountry, they considered themselves a more respectable group of Urdu speakers (Taifoor, 1956, p. 53). Their presence significantly strengthened the Urdu vocabulary in Dhaka, making it a dominant language and cultural segment of the city.

Simultaneously, various Bengali dialects also contributed to the linguistic landscape of Dhaka. A notable dialect that became part of Dhaka's linguistic culture is the popular 'Kutti' dialect. Following the devastating famines in Bengal in the late 1760s and 1770s, a group of laborers migrated from the countryside and settled in the canal zones of the city (Dulai River or Khal) to seek livelihoods. According to Taifoor, they were descendants of aboriginal tribes whose primary occupations were husking paddy and chipping off brick concrete for the buildings of the zamindars who settled in Dhaka (Taifoor, 1956, p. 52). As husking is known in informal Bangla as 'kutna', they came to be known as Kuttis, meaning those who husk paddy. Taifoor observes that the Kuttis of Dhaka spoke a peculiar Bengali jargon that made them a source of humor among other Bengalis, who were considered to have a more refined way of speaking (Taifoor, 1956, p. 52). Nonetheless, the Kuttis were known for their humor, and the Kutti dialect eventually became a popular and humorous part of Dhaka's linguistic culture, persisting despite educational advancements gradually phasing it out.

As the East India Company began its serious trade efforts from Dhaka, they communicated with local administrative heads and officials in Urdu-Hindustani and other languages when necessary. This trend continued even after the British became rulers, maintaining communication with locals in Urdu and English. The Khwaja family, who developed close ties with the English, conversed in both English and Urdu. The Khwajas continued to communicate with the local populace in Urdu, solidifying their status as the

premier family of the city and promoting the use of Urdu over indigenous Bengali. By the end of the 19th century, Bengali had not developed in Dhaka as significantly as in Kolkata. Consequently, the political, administrative, and commercial language in Dhaka remained dominated by Urdu for a considerable time, even up to the birth of Bangladesh. By then, however, standard Bangla had made significant progress in Dhaka, contrasting with the mofussil headquarters and countryside of East Bengal.

GROWTH OF BANGLA IN DHAKA

The English East India Company's rule brought revolutionary changes to India, significantly impacting Dhaka and the development of modern Bangla culture in the city especially through the adoption of English as the official language as well as the medium of education. In 1835, the Company replaced Persian with English as the official language of the government and introduced an English education policy. This policy led to the gradual integration of the English language into the country and a new educational system that produced an educated Bengali populace. Dhaka benefited significantly from this policy, particularly in terms of English education and the rise of middle-class culture. The boys of Dhaka, including those from the Urdu-speaking Khwaja family, began learning English, which expanded their horizons and facilitated communication with English officials.

Simultaneously, an incredible development of the Bengali language began, especially in Kolkata, which also influenced Dhaka. Although not to the same extent as Kolkata, Dhaka saw the rise of Western cultural influences and the cultivation of English. Literary societies, Bangla storybooks, novels, and newspapers began to emerge, transforming Dhaka into a center for Bengali language cultivation. However, Dhaka's rise as a Bengali cultural hub was not as prominent as Kolkata's, and the city remained under the influence of the Urdu-speaking gentry, particularly the Khwaja family.

The establishment of Dhaka University marked a significant turning point in the growth of the Bangla language, literature, and Bengali culture in the city and throughout East Bengal. Despite the dominance of Urdu-speaking elites, Dhaka started to develop its own cultural identity.

After the creation of Pakistan, Dhaka played a pivotal role in the struggle to make Bangla one of the state languages of Pakistan, facing strong opposition

from the new rulers. This struggle catalyzed Dhaka's emergence as a center for modern Bengali literature and culture for the entire Bengali population of East Bengal. The transformation of Dhaka into the nucleus of Bangla culture and civilization immediately after Pakistan's creation was a remarkable development.

Pre-Pakistan Period

During the discussions and debates surrounding the independence of India and the creation of two separate countries, India and Pakistan, the issue of the state language for the new Muslim-majority country was highly contentious. Urdu emerged as a prominent candidate, especially as top leaders like Muhammad Ali Jinnah and Liaquat Ali Khan unequivocally endorsed it. They argued that Urdu, being a sophisticated language closely associated with Islam and Arabic, was a natural choice for the state language of Pakistan, which was envisioned as a homeland for Muslims. This stance was adopted with little room for further debate, as Jinnah and Liaquat Ali Khan were keen on swiftly establishing Urdu's dominance.

On August 14, 1947, Pakistan gained independence, comprising two geographically and culturally distinct regions separated by a thousand miles. Shortly after, Jinnah proclaimed Urdu as the state language of Pakistan, efforts to promote Urdu quickly followed. Urdu being introduced in money order forms and postal stamps, signaling the impending removal of English from official documents. Fazlur Rahman, the central education minister, particularly spearheaded initiatives to confirm Urdu's position as the sole state language.

In Dhaka, the capital of East Bengal (the eastern region of Pakistan), there was initially no strong opposition to this decision. The first Chief Minister of East Bengal, Khwaja Nazimuddin, whose family language was Urdu, supported the elevation of Urdu. His family, including his great-grandfather Nawab Khwaja Abdul Ghani, had long been proponents of Urdu culture in Dhaka.

The Partition of India also led to significant demographic changes, with thousands of Urdu-speaking refugees *(Muhajirs*) migrating to East Bengal. Many settled in Dhaka, bolstering the city's Urdu-speaking population. This influx further complicated the linguistic landscape, as these new residents often supported Urdu over Bangla as the state language and sometimes opposed the Bangla Language Movement.

Despite these challenges, Dhaka emerged as a crucial center for the Bangla Language Movement during the Pakistan period, ultimately becoming the capital of independent Bangladesh. The University of Dhaka and its students played the pivotal roles in this transformation. Established in 1921, the university had a storied history of resistance against British colonial rule. After the creation of Pakistan, the university became a hotbed of activism, with students and teachers championing the cause of Bangla as a state language, culminating in the historic Language Movement.

On September 1, 1947, merely two weeks after Pakistan's independence, a group of students and faculty members founded a society named *Tamaddun Majlis (পাকিস্তান তমদ্দুন মজলিস)*- an Islamic cultural organization in East Bengal. This organization, founded by Professor Abul Kasem of the Department of Physics at Dhaka University, emerged as the vanguard of the historic Language Movement in what is now Bangladesh. Notably, Tamaddun Majlis initially grappled with the linguistic weakness of Dhaka, evident in its inclination towards non-Bengali languages such as Farsi, Arabic, and Urdu, reflecting the city's cultural heritage.

It's worth recalling that even before Pakistan's formal inception on August 14, 1947, the issue of the state language had been effectively decided, with leaders like Jinnah and Liaqat Ali Khan proclaiming Urdu as Pakistan's official language. Two weeks following its establishment, Tamaddun Majlis published a booklet titled *Pakisthaner Rashtra Vasha Bangla na Urdu* (Pakistan's State Language: Bangla or Urdu), sparking a crucial debate. This marked a pivotal moment as Dhaka, despite its historical affinity towards non-Bengali languages, emerged as a staunch advocate for Bangla.

Of particular significance was the presence of Khwaja Nazimuddin, Chief Minister of East Bengal, who staunchly supported Urdu language and tradition, despite Dhaka's newfound fervor for Bengali. This transition underscores Dhaka's journey from a city with a non-Bengali cultural heritage to the capital of a Bengali nation, firmly rooted in the Bangla language.

Our narrative traces back to the founding of Tamaddun Majlis and culminates in Dhaka's ascension as the capital of a sovereign state based on the Bangla language in 1971. In this miraculous evolution, the student communities of Dhaka University, both male and female, played instrumental roles.

It's essential to recognize that the Language Movement marked the first major struggle undertaken by the people of the region following Pakistan's creation, foreshadowing the monumental Liberation War of 1971, born out of subsequent struggles and courageous actions.

As it was established by the top leaders of Pakistan that Urdu would be the State Language, preparations were initiated to actualize this decision, despite its absence in the constitution. Actions were taken to implement this extra-constitutional policy, such as the use of Urdu on postal stamps and money order forms, as has been, previously noted. Furthermore, attempts were made in official discussions to discredit Bangla, with the then Education Minister, Mr. Fazlur Rahman, portraying Bangla as an inferior language and script. In response to these derogatory remarks, Tamaddun Majlish decided to counter such unfounded allegations by establishing an organization to expose the government's malicious intentions. This pioneering organization, named *Rashtrabhasa Sangram Parishad* or State Language Committee of Action, was formed on October 1, 1948. Several prominent figures associated with the Language Movement assumed key roles within this organization. Professor A S M Nurul Haque Bhuiyan of Dhaka University was appointed as its Convenor, while Professor Abul Kasem served as its Treasurer. Professor Kasem played a pivotal role in recruiting young students, faculty members, and other individuals primarily from Dhaka University to join the movement. These responses and initiatives provided the necessary human resources and leadership to start the Language Movement. The active protest and resistance began towards the end of 1947 and the beginning of 1948. The first anti-government meeting regarding the State Language was convened on December 6, 1947, at Dhaka University campus under the auspices of the newly formed *Rashtrabhasa Sangram Parishad*, with Professor Abul Kasem presiding. The primary aim of this protest meeting was to oppose the unilateral decision of the National Education Conference, held in Karachi, to designate Urdu as the sole State Language of Pakistan. Subsequent protest meetings involved the participation of additional organizations and leaders. A significant development occurred when the *Sarbadaliya Sangram Porishod (সর্বদলীয় সংগ্রাম পরিষদ)* or All-Party State Language Action Committee, was formed during a special meeting attended by leading members of various action committees, including Tamaddun Majlish. This pivotal decision was

made in the historic Fazlul Haq Hall of Dhaka University, with Shamsul Alam, a dedicated activist of Tamaddun Majlish, elected as its Convenor.

Tamaddun Majlish was the first and most important organisation in Bangladesh's Language Movement. It garnered support from diverse groups, representing the Bengali population, including both traditional and conservative Muslims, on language and other pertinent issues. Widely regarded as the authentic voice of the Bengali populace, Tamaddun Majlish enjoyed wholehearted support from Muslim elites, students, educators, journalists, writers, and cultural figures. The success of Tamaddun Majlish lay in its adept navigation of the language movement for five years, transforming it into a national cause by rallying people from all walks of life, irrespective of their social or political affiliations. However, the path was fraught with challenges, as the opposition included influential individuals, staunch proponents of Urdu, and other Islamic organizations across Dhaka and the nation. In Dhaka supporters of Urdu also did their most to make Urdu as the National Language. They also organised demonstrations and held meetings to promote Urdu.

Despite these obstacles, protests persisted, spearheaded by Tamaddun Majlish and other student organizations and activists. However, the East Pakistan Government, alongside other adversaries, remained resolute in rejecting the demands. They resorted to stringent measures, deploying police forces, arresting movement supporters, and incarcerating them. Consequently, East Bengal, particularly Dhaka, became a tumultuous and perilous arena marked by unrest and agitation.

In addition to Tamaddun Majlish, numerous other organizations and students from across East Bengal played pivotal roles in the Language Movement, significantly altering the traditional character of Dhaka, which was previously dominated by non-Bengali cultures.

It needs to be noted that among many others Sheikh Mujibur Rahman arrived in Dhaka from Kolkata to pursue studies in law at Dhaka University, where he quickly immersed himself in local politics. As one of the student leaders, Sheikh Mujib played an active role in various pivotal events. For instance, he participated in the Democratic Juba (Youth) League's formation in September 1948, where resolutions supporting Bengali language rights were adopted.

Furthermore, Tamaddun Majlish's *Rashtrabhasha Sangram Parishad Campaign* in 1948, rallying for signatures in favor of Bengali language demands. His leadership extended to drafting a manifesto in December 1947, which outlined 21 demands, prominently featuring language rights, and he was a key signatory to this historic document Returning to our main narrative, East Bengal Chief Minister Khwaja Nazimuddin, a staunch supporter of the Urdu language, initially showed reluctance to engage in discussions regarding the language issue. However, within a year of independence, Dhaka emerged as the epicenter of Bengali nationalism. Despite various efforts, Pro-Urdu Prime Minister of East Bengal, Khwaja Nazimuddin, eventually agreed to engage in dialogue with mainstream leaders and student representatives of the Bangla Language Movement.

On March 15, 1948, a meeting took place between leaders of the All-Party Rastra Bhasha Shangram Parishad and Khwaja Nazimuddin, the Urdu-speaking Chief Minister of East Pakistan. Although Nazimuddin did not immediately support the demand to recognize Bengali as a State language of Pakistan, he acknowledged in writing that the language movement was not instigated by enemies of Pakistan. This resulted in the release of many arrested language demonstrators and the rescinding of some arrest warrants.

Despite prevailing anti-Bengali policies of both the Central and Provincial Governments, these concessions from a non-Bengali Chief Minister were significant. However, whether Nazimuddin was genuinely convinced by the arguments of the pro-Bangla student leaders remains unclear. The imminent visit of Muhammad Ali Jinnah might likely to have influenced Nazimuddin's decision to avoid unrest in Dhaka during Jinnah's visit.

Unfortunately, Jinnah's declaration at a public meeting and later at Dhaka University convocation that Urdu would be the State language of Pakistan undermined Nazimuddin's strategy. Furthermore, political developments following Jinnah's death complicated matters. Khwaja Nazimuddin, the arch-enemy of the Bangla language, was appointed Governor General of Pakistan, reinforcing his stance on the State language.

Dhaka continued to be a stronghold of non-Bangla culture, especially with the influx of non-Bengali refugees and the departure of the Bengali speaking Hindu population during post-Partition. Additionally, the presence of a

significant number of Army personnel from West Pakistan, civil servants, businessmen, and others who favored Urdu further entrenched non-Bangla culture in Dhaka.

Further complicating the political landscape, Prime Minister Liaquat Ali Khan's assassination led to Khwaja Nazimuddin assuming the role of Prime Minister of Pakistan on October 19, 1951.

Shortly after his return from Karachi as the newly appointed Prime Minister of Pakistan, Khwaja Nazimuddin made a crucial announcement at a massive public gathering in Paltan Maidan that Urdu would be the sole State Language of Pakistan, disregarding his previous agreement with Dhaka's students and politicians. This declaration marked a pivotal moment in Pakistan's history and transformed Dhaka into a city poised to become the capital of a Bangla-speaking nation.

Nazimuddin's announcement served as the catalyst for a significant rift in Pakistani society, pitting the pro-Bangla State language advocates against those supporting Urdu as the State Language. This division ultimately contributed to the disintegration of Pakistan.

Recognizing the existential threat to Bangla language and Bengali culture, Bengali students and other groups mobilized to protect their heritage. This mobilization culminated in the tragic events of February 21, 1952, when several students and civilians in Dhaka lost their lives in clashes with the police. The incident reverberated not only within Dhaka and Pakistan but also shocked the global community, highlighting the lengths people were willing to go to defend their mother tongue.

Although the constitution of Pakistan belatedly recognized both Bangla and Urdu as State Languages in 1956, neither language flourished, and East Pakistan faced restrictions under the authoritarian rule of General Ayub Khan. During his dictatorship from 1958 to 1969, Ayub Khan marginalized East Bengal, expressing disdain for its people, culture, and language, which he deemed non-Islamic, as evident in his autobiography *Friends, not Masters* (1967).

On the contrary, a new era was dawning in Bengal determined to alleviate the political and economic hardships endured by Bengalis and restore Bangla, the

language of the masses, to its rightful prominence. This struggle found its epicenter in Dhaka, now the capital of East Pakistan but formerly a bastion of Urdu and Persian culture in Bengal.

However, the battle was far from straightforward, particularly with Ayub's backing by the Pakistani Army, largely comprised of personnel from the West. Furthermore, there were Bengali collaborators and a sizable population of so-called Biharis who migrated to East Bengal post-1947 and harbored strong anti-Bengali sentiments. Amidst this oppression and exploitation, a significant transformation was underway in Dhaka. Once a hub of Islamic and Persian culture, and a city where Urdu prevailed almost as the lingua franca, Dhaka was gradually evolving into a Bengali-centric city with Bangla as its dominant language.

Bengalis across the capital and the nation rallied for liberation. Dhaka, once considered non-Bengali, now fervently supported not only economic liberation but also emerged as the champion of a Bangla-speaking land with a rich history spanning a millennium. This history is distinguished by a deep-rooted commitment to individual freedom, religious tolerance, and a profound love for humanity, cherished by both rulers and the populace alike.

I extend my sincere gratitude to Monirul Islam, my student from North South University, whose invaluable assistance was instrumental in preparing this paper. His dedication and support have greatly contributed to the quality and completion of this work.

References

Ahmed, Sharif Uddin *(various* editions and various dates). *Dhaka - A Study in Urban History and Development 1840- 1885 and 1840-1921,* (Chief Editor) *Dhaka University – History and Heritage*, vol.1 and Vol ii, Dhaka 2021, 2024.

Dani, A. H, (2009). *Dhaka- A Record of Its Changing Fortunes*. Dhaka: ASB Publication.

Dil, A and Dil, Afia (2011). *Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh*. Adorn Books, Bangladesh Edition.

Eaton, Richard M (1996). *The Rise of Islam and the Bengal Frontier.* 1204–1760,

Berkeley, Los Angeles & London: University of California Press.

Karim, Abdul (1964). *Dacca, the Mughal Capital*. *Dhakai Maslin* (The Muslin of Dhaka – A History of Manufacture and Trade of the cotton textiles of Dhaka from the earliest time to c. 1840). Dhaka.

Taifoor, S.M. (1952). *Glimpses of Old Dhaka*. Dhaka.

Taifoor, S.M. (1956). *Glimpses of Old Dhaka* (Revised Edition). Dhaka.

Van Schendel, WA (2009). *History of Bangladesh*. Cambridge University Press.

Dil, Anwar & Dil, Afia (2011). *Bengali Language Movement and Creation of Bangladesh,* Adorn Books, Delhi Edition.

Exploring Earliest Bengali Diaspora and Cultural Penetration to Southeast Asia and Maritime Connectivity (400 BCE-800 CE)

Sharmin Akhtar

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookSharmin

1. Introduction

The territory of Bengal[1] was a prosperous regional entity on the map of the Indian subcontinent in ancient times. Its geographical position, socio-cultural dynamics, and economic activities had a significant impact on both South and Southeast Asia during antiquity. Throughout different epochs, this territory has been known by various names such as Vanga, Bangalah, and Bengal. Situated strategically amidst the colossal Bay of Bengal to the south, Bengal formed an integral part of the Bay of Bengal Interaction Sphere (BIBS).[2] This geographical identity was pivotal in facilitating extensive maritime trade routes, fostering East-West connectivity. Consequently, Bengal emerged as a crucial nexus for cultural exchange between the Indian subcontinent and Southeast Asia on a grand scale. Notably, the heartland of Bengal, centred around the Ganges Valley or Gangaridai, played a central role in shaping its historical and cultural trajectory. The eastern coastal region, recognised as Bengal, assumed particular significance owing to its intermediary position between these two regions. Bengal's historical importance lies in its multifaceted role as a cultural crossroads and a pivotal hub for maritime trade, encapsulating its profound influence on the broader socio-economic and cultural landscape of South and Southeast Asia. Since sailing has historically served as a key mode of transportation across the Bay of Bengal, facilitating communication between the eastern coast of India and Southeast Asia, this maritime connectivity holds significant importance in the socio-economic and cultural history of ancient Bengal, an important region of India. While the 'Age of Sail' conventionally commences around 1450 CE (Gaynor, 2013), earlier epochs witnessed extensive maritime activities, including the navigation of rivers, seas, and oceans, underscoring broader narratives of interaction. Over millennia, a continuous flow of people, ideas, and goods traversed between India and Southeast Asia. A pivotal era from 400 BCE to 800 CE witnessed

profound interconnections between Bengal (Ganges region) and Suvarnabhumi (some ancient regions of Southeast Asia), as attested by various ancient texts such as the *Kathasaritsagara*, *Jataka*, *Arthasastra*, *Periplus of the Erythrean Sea*, and Ptolemy's *Geography*, alongside corroborative archaeological findings. The extensive maritime trade facilitated by Bengali diaspora settlements enabled an affluent cultural amalgamation.

During this period, Southeast Asia was perceived as a geographical extension eastward from Bengal, symbolised by expressions like the sunrise appears from the Ganges. Notably, Ptolemy's accounts (Girini, 1974) from the 3rd to 4th centuries BCE referred to this region as the 'Golden Khersonese', a forested peninsula stretching from mainland Asia towards the East-Indian Archipelago, delineating the Bay of Bengal from the South China Sea (Wheatley, 1961). Geographically, it was depicted as a forested, club-shaped peninsula stretching from the southeastern edge of mainland Asia towards the East-Indian Archipelago, separating the Bay of Bengal from the South China Sea (Wheatley, 1961, p. xvii). This geographical notion played a crucial role in the navigation history of these waters, encompassing realms of cultural, architectural, linguistic, and religious influence. Medieval Tamil inscriptions found in Sumatra and Thailand provide insights into the extensive trade networks involving Indian merchants (Christie, 1998). The concept of 'Indianisation' is pivotal in understanding this historical process, signifying the widespread migration and cultural diffusion from India to ancient Southeast Asia. Bengal played a prominent role in this phenomenon, actively contributing to the commercial and cultural dynamics of the region (Akhtar & Hanizah, 2020). Scholars have characterised this historical phenomenon as a 'look towards the east' policy, emphasising Bengal's leadership role in the globalisation process of ancient India. Bengal not only pioneered but also dominated the commercial sector during this early period, showcasing its enduring influence on regional interactions (Sen & Kayal, 2007). Hence, the objectives of this study are to examine how the Bengali diaspora and cultural concepts served as the driving force to impact the socio-cultural life of Southeast Asia and how Southeast Asia adopted and practised all Bengali cultural norms that were introduced from pre-Indianisation times through maritime connectivity between the two regions. In scholarly discourse, the movement of Indian peoples and cultural elements towards Southeast Asia from Bengal is often referred to as the Indian shift.

This study adopts a historiographic approach, synthesising archaeological findings, classical accounts, and ancient manuscripts, including primary sources. Secondary sources, such as published books and articles, have also been thoroughly reviewed. Data collection involved visits to various archaeological sites, museums, archives, and libraries across Bangladesh, India, and Malaysia. Notably, this research addresses a significant gap in historical scholarship by examining the history of the Bengali diaspora and its cultural influence in Southeast Asia during the period of maritime connectivity from 400 BCE to 800 CE. By integrating diverse sources and conducting fieldwork across multiple countries, the study provides a comprehensive understanding of the intricate networks and exchanges that shaped regional dynamics during this pivotal era.

2. Literature Review

Scholars have extensively studied India's early contacts with Southeast Asia throughout this century, producing numerous articles and books on the subject. Some pioneering literary contributions are essential for understanding the Indian diaspora, Indianization, and the overall connection with India and Southeast Asia. However, the Bengali diaspora and their cultural influence have often been overlooked or superficially portrayed in existing literature.

One seminal work in academia is *The Indianized States of Southeast Asia* by Coedes (1968), which introduced the term 'Indianisation' and explored its chronological and geographical scope, as well as its socio-cultural impact on Southeast Asia. Although Bengal's role in this process was occasionally acknowledged, the specific contributions of the Bengali diaspora and their cultural influence received insufficient attention.

Hall (1966) addressed Southeast Asian history from prehistoric times, yet only briefly mentioned early Indian relations in the initial chapters. Works focusing on Indian colonization by Mookherjee (1912), Hall (1985, 2011), Majumder (1927, 1937, 1944a, 1944b), Sakar (1934), Chhabra (1964), Sastri (1921), and Ray (1995) highlight Indian influence in Southeast Asia, but largely omit the specific contributions of the Bengali diaspora and cultural elements.

Scholars directly engaged with this subject include Chowdhury (1996), Datta (1999), Chakravarti (2002), and Jahan (2006). Their works touch upon maritime trade and cultural linkages, yet fail to adequately explore how the

Bengali diasporic connection and cultural elements from Bengal impacted Southeast Asian socio-cultural life during their apex and the region's receptivity to this process.

Another relevant study is *History of Early Bengal in Regional Perspectives (up to c. 1200 CE)* (Chowdhury & Chakrabarti, 2018), which briefly touches upon Bengal's connections with Southeast Asia in two chapters.

As a result, scholarly depth in elucidating Bengal's nuanced relationship with Southeast Asia was less evident. In such cases, this research identifies a significant gap in the historical relationship, as the connections between the Bengali diaspora and the comprehensive exploration of cultural elements in distant lands, such as Southeast Asia, remain underexplored.

3. Analysis

3.1 Port-to-port connectivity of both regions

Ports, epitomised as essential centres for maritime trade, have played a vital role in facilitating the exchange of goods, ships, and cultural interactions. Kidwai (1992) emphasises ports as pivotal junctions where commodities, people, and cultures converge, bridging maritime and inland transportation networks. Hoyle (1967, p. 7) further defines ports as socio-economic hubs interconnected with hinterlands and global sea routes, forming integral nodes in international trade networks. Moreover, Bengal's historical ports, such as Tamralipti, Chandraketugarh (also known as Gangabandar), and Wari-Bateshwar, played crucial roles during the third to fourth centuries BCE. The literary text *Raghuvamsa* (Kale, 1922, IV, 38) describes Tamralipti, situated on the Kapisa River, as a dronimukha-type seaport (Chandra, 1977, p. 159), strategically located near the confluence of the Rupnarayana River and the Bay of Bengal (Cunningham, 1871, p. 425). Ancient Indian literary sources frequently reference early maritime interactions between Bengal and regions such as Suvarnabhumi or Suvarnadvipa, which corresponds to present-day Southeast Asia; however, scholarly attention to this subject has been sporadic. Within the Indian Ocean Region (IOR), the Bay of Bengal plays a critical role in facilitating maritime movements that link the Indian Ocean and the Pacific Ocean. This strategic nexus of South and Southeast Asian regions, encompassing the Malacca Strait, Java Sea, and South China Sea, has

historically been vital for economic exchange and geographic connectivity (Gamege, 2017).

In Southeast Asia, seven major ports or *Pattana* emerged as essential hubs based on their frequency of connectivity, geographical significant, and periods of peak maritime activity during the Maurya and Post-Maurya periods (321 BCE - 320 CE), the Gupta Period (320-550 CE), and Post-Gupta Period (550-750 CE). During the Maurya and post-Maurya periods, ports such as Oc-Eo, Mahakataha or old Kedah, Takkola (Chu-li), Ban Don Ta Phet (BDTP), and Khao Sam Kaeo (KSK)[3] maintained regular maritime connections with Bengal. In the Gupta period, ports such as Kataha (or old Kedah) on the Malay Peninsula, Takkola (Siam), Oc-Eo (Funan), Ko-Ying (Sunda Valley, Sumatra), and in the post-Gupta period, Kataha, Oc-Eo, and Srivijaya were prominent in facilitating trade and religious propagation with ancient Bengal. These ports are selected from three main geographical sub-regions of Southeast Asia: Indo-China (Funan), represented by Oc-Eo; Siam-Malay Peninsula, represented by old Kedah, Takkola, Ban Don Ta Phet, and Khao Sam Kaeo; and Sumatra, represented by Ko-Ying and Srivijaya. They are noted for their discovery of Bengal-origin artefacts and frequent mentions in ancient texts, highlighting their role in East-West maritime connectivity. Therefore, it can be stated that the historical ports of Bengal and Southeast Asia play a crucial role in maritime history, exemplifying the dynamic exchanges in trade, cultural diffusion, and religious interactions that characterised ancient interactions between these regions.

3.2 Craftsmen and merchant's movement

The maritime connectivity between Bengal and Southeast Asia enabled significant interactions, mainly driven by Bengali merchant groups, religious emissaries, craftsmen, and other travellers. These exchanges played a critical role in transmitting Bengali cultural norms across distant lands, particularly through extensive trade networks. From ancient times, Bengal's merchants were instrumental in forging commercial links with Southeast Asia, drawn by the region's wealth in gold and tin, as chronicled in Greek, Latin, and Indian historical texts. Known as the 'Golden Chersonese' in Western literature and 'Suvarnabhumi' in Indian texts, Southeast Asia held an allure for Bengal's traders, who sought to expand their economic horizons. Archaeological evidence, including artefacts of Bengali origin, supports early contact between

Bengal and Southeast Asia, underscoring the economic motivations that underpinned these maritime ventures. The activities of these merchants are attested from as early as the second century BCE, evidenced by inscribed seals found in Chandraketugarh and various Southeast Asian sites. Historical records and B.N. Mukherjee's seminal study in 1990 further elucidate the close ties between Bengal and Southeast Asia during this period, particularly, the involvement of Yue-Chi merchants, originally from China but settled in Bengal (Vanga region), in significant trade activities with Funan and Ko-Ying, contributing further to Bengal's role in Southeast Asian commerce.

Literary sources such as *Kathasaritsagar*, compiled by Tawney in 1924, offer invaluable insights into the movements and commercial voyages of Bengali merchants to Southeast Asia. These accounts depict an extensive network of maritime voyages spanning the coastal areas of the Bay of Bengal and the South China Sea. During the Gupta period, one prominent figure, Guhasena, emerged from these narratives as a leading merchant of Tamralipti, who established thriving business operations in the ancient Malay port city of Kedah. At that time, marked by the flourishing of Brahmanism, Tamralipti emerged as the foremost port among Northern Indian ports, further solidifying Bengal's pivotal role in maritime trade. Wealthy Bengali traders, such as the Guhosenas, wielded substantial influence in Southeast Asian societies, with Guhosena himself attaining a position of leadership within the local trading community in Kedah. His success and prestige were such that visitors from afar travelled covertly to Tamralipti to witness firsthand the opulence and social standing of Guhosena and his wife, Devasmita. This anecdote highlights the profound impact of Bengal's traders on Southeast Asian commerce and society during the fifth century CE.

Archaeological findings provide additional evidence of Bengali maritime activity, such as the fragmented stone inscription of Bengali Mahanavika Buddhagupta, who voyaged from Tamralipti to the Malay Peninsula. This inscription, along with quotations from *Sagarmati-pariprccha*, discovered by Dr. Wales in the Bujang Valley, Wellesley province, dating to the sixth century CE, further corroborates the enduring maritime connections between Bengal and Southeast Asia. Thus, Bengal merchants were distributed throughout several market towns in the Southeast Asian region during the Gupta period, engaging in regular maritime trade activities. Hence, the historical records,

literary sources, and archaeological evidence collectively affirm the robust and enduring maritime ties between Bengal and Southeast Asia, driven by commerce, cultural exchange, and the entrepreneurial spirit of Bengali merchants across centuries.

3. 3 Bengali diaspora

Bengali merchants and other communities had a significant influence on Southeast Asian trade, aided by extended settlement, which accelerated Bengali migration and cultural integration. This phenomenon is supported by source analysis, which highlights three key areas where such interactions took place.

3.3.1 Bengali Diaspora to Siam-Malay Zone

The first area of significance is the Siam-Malay Peninsula, comprising the central region of Suvarnabhumi or Suvarnadvipa in Southeast Asia, which was historically connected with the Indian subcontinent. Traders and adventurers from various parts of India, notably the Gangetic Valley, embarked on voyages to Suvarnabhumi in the third century BCE. Emperor Asoka of the Maurya dynasty furthered these connections by dispatching his missionaries Sona, Uttara and Theras to propagate Buddhism in Suvarnabhumi or the Chryse region (Jermsawatdi, 1977, p. 21). They started their journey from the Bengal port of Tamralipti. Archaeological excavations and scholarly findings indicate that central and southern Thailand, along with the northern Malay Peninsula, constituted the core territories of Suvarnabhumi or Suvarnadvipa. Thai historians mentioned that Nakhon Pathom was the primary destination visited by Asoka's missionaries, establishing it as the capital of Suvarnabhumi during the third century BCE. The archaeological discovery of significant structures such as Phra Pathom Chedi and extensive stupas in this region lends credence to early Indian and Bengali penetration of Southeast Asia. Consequently, this period marked the advent of maritime exploits and seafaring merchants from Bengal as depicted in ancient Buddhist literature (Coedes, 1968, p. 21). This narrative underscores the integral role of Bengali settlement and cultural diffusion in shaping trade networks and regional dynamics in Southeast Asia during antiquity.

3.3.2 Bengali Diaspora to Java-Sumatra Zone

Java, referred to as Javadvipa in ancient Indian texts, maintained significant trade connections with Bengal, particularly in the lucrative spice trade that enriched generations of Indian merchants. This relationship evolved into aspirations for establishing Indian kingdoms in Java during the early Christian Era. The *Arthasastra* of Kautilya, a renowned manual compiled in the fourth century BCE, highlights the allure of Javadvipa, stating that anyone who ventures there never returns empty-handed; those who do return bring wealth capable of sustaining seven generations of their family (Glover I., 2012). Indian merchants and aristocrats in Java seized opportunities to integrate into the royal family through their wealth and intellectual prowess. They offered medicinal cures, protective charms, and amulets, establishing themselves as indispensable figures in the local courtly milieu (Coedes, 1968, p. 22).

Some scholars suggest that language was an obstacle for Indian immigrants, which was not their claim. In that situation, they did not utilize interpreters but used the neighbourhood dialect for simple correspondence. In this way, the Indian immigrants managed the chief's families to make a marital relationship with them (Coedes, 1968, pp. 22-23). Consequently, those individuals were primed to transmit their faith and traditions, as well as social, moral, and religious norms, to their life partners, who were also royal and held a position of honour. As a result, due to the princess's reputation, Indian customs and traditions spread throughout the Southeast Asian region.

3.3.3 Bengali Diaspora to Funan-Champa Zone

The establishment of the first Indian-influenced kingdom in Southeast Asia is attributed to Funan, with its capital, Vyadyapura, referred to as 'the city of hunters' during a specific period. Situated approximately 200 kilometres inland from the sea, Funan's heartland encompassed the lower reaches and delta of the Mekong River, maintaining significant connections with ancient Bengal. The Mekong, often regarded as a derivative of Ma Ganga (Mother Ganga) originating from Bengal, defined Funan's territorial boundaries, stretching across Southern Vietnam, the central Mekong region, a substantial portion of the Menam Valley, and the Malay Peninsula (Mookherji, 1912, p. 75). Cambodian historians recognise Funan as one of the earliest Khmer kingdoms, distinguished by advanced maritime capabilities and extensive engagement in trade. Despite considerable Indian influence, particularly from Bengal and the

Gangetic Valley, Funan retained distinctive indigenous characteristics in its political structures, religious philosophies, and technological practices (Hall, year, p. X). Its economic prosperity relied heavily on maritime commerce, fostering close commercial ties with India. During the reign of Fan-Ch'an, diplomatic channels were established between Bengal and Funan, evidenced by emissaries dispatched to Bengal to facilitate information exchange and bolster trade (Coedes, 1968, p. 43).

Moreover, the relationship between the Bengali people and the Champa is extensively documented in scholarly literature. Present-day Quang Nam, with archaeological sites such as Tra Kieu and Dong Duong, is considered the spiritual centre of Champa (Coedes, 1968, p. 43). Known as Linyi in Mandarin, this region was named after a place in ancient Vietnam, a common practice among colonists who named new territories after familiar places from their homeland. India also had a place named Champa, in Bhagalpur, Bihar, which may have influenced the naming of the region in Vietnam. Similarly, in northwestern Yunnan, the Indian name 'Gandhara' replaced local names, illustrating a broader pattern of cultural imprinting. The Cham people, ancestors of the Cham ethnic group, were influenced by Austronesian cultures from ancient Khmer and Vietnam. The Javanese ethnic group known as 'Jih-nan', after being Indianized, migrated to Champa, contributing to its cultural diversity (Coedes, 1968, p. 43) and founded in 192 CE by local leader Sri Mara (Khu Lein), the Kingdom of Champa coexisted with Funan during its early period (Meyer, 1997, p. 63; Gerini, 1974, p. 564). Historical texts, such as the *Mahajanaka Jataka*, mention voyages between Campa (Bihar) and Suvarnabhumi. Bengal and nearby regions, such as Benares, were pivotal in sea trade along the Bay of Bengal coast. The sea route between Champa (Annam) and India (Ganges of Bengal) was crucial, as evidenced by Chinese records describing diplomatic exchanges between a Champa king and the Ganges king around 240-245 CE (Majumder, 1944, p. 17).

3.4 Bengali Cultural Penetration in Southeast Asia

Bengal's merchants and aristocrats often established prolonged residencies in Southeast Asia to facilitate trade and cultural exchange. The predominant religious affiliation among these travellers was Hinduism, reflecting the dominance of Hindu religious phenomena in Northern India prior to the Kaling War, situated on India's east coast. Between 400 BCE and 300 CE, Bengal's

historical ties with Southeast Asia were predominantly shaped by trade networks and the migration of elites and merchants (Srisuchat,1996). Classical Malay texts trace royal genealogies back to ancient Indian kings, highlighting ancestral links with Kalinga (Andaya & Andaya, 2017, p. 17). Following the Kaling War in the 260s BCE, Buddhism gained prominence due to the patronage and propagation efforts of Maurya Emperor Asoka across Southeast Asia (Smith, 1962, p. 164). The discovery of Knobbed Ware and Rouletted Ware in Southeast Asian burial sites associated with Buddhist rituals underscores the spread of Buddhism in the region during this period.

The spread of Buddhism facilitated the movement of Buddhist religious figures, thereby accelerating the propagation of the religion in Southeast Asia. This period demonstrates that Bengal's trade activities were not limited to specific regions but extended across various territories within Southeast Asia, simultaneously fostering cultural norms and the dissemination of Buddhism (Smith, 1962, p. 164).

A Chinese document mentioned the expansion of Indian merchants in the Funan kingdom that stated, in the fifth century CE, Indian merchants crowded Kunlun country, and around five hundred families of *Hu,* the merchants from India (according to Pillot, the term *Hu* means merchants, to distinguish them from Indian Brahmans. Kunlun people probably represented as old Khmer) along with around two hundred Buddhist and more than a thousand Indian Brahmans. Due to such a summit of Indian merchants and the religious community, Indian culture was introduced into the local society. The Kunlun people started to practice Indian norms and doctrines. Even Indian and Southeast Asian people are mutually linked through marriage relations. In marriage, the local people gave their daughters many of these Brahmans, and they became habituated to reading the sacred books of the heavenly spirits of Brahminical works (Briggs, 1950). Hence, it is not far from the truth that the Bengali trading class and religious persons influenced ancient Khmer and the Malay Peninsula.

Moreover, during the Gupta period, Hinduism gained considerable precedence in Bengal. It was oriented to Brahman's ideas that appeared in the stone inscription. For example, the inscription tablet of Mahanavika Buddhagupta found in Kedah of the Malay Peninsula contained the religious verses of Brahmanical ideas (Nadaranjan, 2011, p. 47). In this way, religious and

cultural norms spread beyond Bengal, in addition to the overseas maritime trade. Therefore, despite being a small part of eastern India, Bengal's religious influence and trade routes played a vital role in the cultural penetration of the Bengali people into the societies of the Southeast Asian region.

However, the maritime trade and religious propagation simultaneously worked from Bengal to Southeast Asia. Tamralipti, Pundranagar, was a rich Buddhist religious centre with a legacy of substantial trading activities. From the fifth to the seventh century, Bengal was renowned for its role as a destination for Chinese pilgrims to religious learning centres, which have frequently been mentioned in the accounts of Fa-Hien, I-Tsing, and Hiuen-Tsang. Many Buddhist viharas were built, and Chinese pilgrims visited for their religious learning. After visiting, they travelled to China via some stations in Southeast Asia, including Java, Kedah, and Srivijaya. By sharing Buddhist rituals and ideas with local people, it can be assumed that Buddhist religious concepts gained popularity in Southeast Asia.

After the highest level of business connection, Buddhist religious architectural concepts became visible in Southeast Asian sites in the eighth to ninth century CE, for which architectural ideas were borrowed from the Buddhist structures of Bengal. In the seventh century, two of the most significant religious architectural buildings in southeast and north Bengal were established with the concept of Buddhist moral ideas and operated as international learning centres; these were Mainamati (Rupban Mura Vihara, Salbon Vihara and Ananda Vihar) and Paharpur (Sompura Buddha Vihara) respectively. Mainamati of Comilla and Paharpur Buddhist Viharas in the Naogaon district of Bangladesh were more prominent and famous for applying cruciform plans. Bengal's prominence started to emerge in the southeastern Samatata-Harikela zone in the seventh century. The cruciform building structure of Rupban Mura Vihara, Salbon Vihara, Ananda Vihara, and Bhoja Vihara (Husain, 1997, pp. 31-40) was established during the first half of the 7th century CE in Mainamati of Southeast Bengal (Bhuiyan, 2018) In the Pala dynasty, the Pala king Dharmapala and his son Devapala built such a structure from 780 CE to 820 CE, with the massive cruciform structure of 111.5 m north-south by 96 m east-west, founded in the centre (Dikshit, 1938, p. 7). It had a big courtyard encircled by a massive rectangular wall with a row of 177 monk's cells opening to a verandah (Herrmann-Pfandt, 2012) The Paharpur Buddhist temple was the prominent one built in the Pala period of Bengal, and the idea

of the same structure was loaned and built-in Borobudur, Java of ancient Southeast Asia. In Southeast Asian countries, a similar conceptual establishment, such as the Salbon Vihara at Mainamati and Paharpur of Bengal, is found in the Ananda Temple at Pagan in Burma, the Candi Kalsan at Prambanan in Central Java, Indonesia. They also plagiarised the 'Sarvatobhadra' (a universal art pattern of ancient India) art style from Bengal in their architecture (Sharmin & Hanizah, 2020). Paharpur and Mainamati had considerably influenced the Candi Sevu in the 8th century (Haque, 1998). In the ninth century, the Borobudur temple in Java was a gigantic structure in Southeast Asia that drew inspiration from the concept of Bengal's religious architecture and flourished immensely.

In this phase, two pivotal inquiries arise: how did Southeast Asian populations adopt these borrowed architectural styles, and who were the masterful artisans responsible for their construction? It is worth noting that Bengal has long been renowned for its craftsmanship. Following the decline of the Indus Valley Civilisation, a second wave of urbanisation emerged, focusing on the Ganga Valley in the Bengal region from the 6th century BCE onwards. By the Mauryan period, this area had developed into a bustling urban centre and a pivotal trade hub within the ancient Indian subcontinent. Artisanal skills became a specialised and crucial element driving this progression.

During this era, Bengal artisans excelled in diverse forms of craftsmanship, including the creation of intricate clay artefacts such as the Northern Black Polished Ware (NBPW) and various religious pottery styles, such as RW and KW. They also thrived in cotton weaving, beadwork, pearl and diamond jewellery making, and ivory craftsmanship, each industry distinguished by its unique characteristics. Additionally, Bengal artisans demonstrated expertise in brick and woodwork, which was exemplified in shipbuilding and architectural endeavours, underscoring their proficiency in early construction techniques. This tradition of skilled craftsmanship extended to the construction of religious architecture during the relevant period. These artisans not only contributed to the architectural landscape of their time but also played a crucial role in the dissemination of architectural styles to Southeast Asia. Through their craftsmanship and expertise, Bengal artisans left an enduring legacy that influenced both regional architectural development and cultural exchanges beyond the subcontinent. In the post-Gupta period, political instability in Bengal catalysed the emergence of distinct regional identities, coinciding with

the second phase of Bengal's urbanisation and the broader third phase of urban development in India. Urban centres developed with unique characteristics, with religious and cultural norms serving as prominent indicators of Bengal's regional dimensions (Kumar, 2005-2006).

Therefore, Bengal's skilled artisans constructed significant religious monasteries such as Mainamati and Paharpur. The architectural concepts from these sites influenced the Sailendra dynasty of Southeast Asia, which adopted and adapted Bengal's architectural styles. Concurrently, Bengal artisans collaborated with craftsmen from Kalinga, Gujarat, and other regions, sharing their expertise, which also influenced artistic developments in Southeast Asia (Chuti Songs, 1996). As a result, numerous temples and stupas in Southeast Asia reflect the architectural ideas and concepts borrowed from Indian architecture, demonstrating a rich cultural exchange during this period. In this connection, Mookherji (1912, p. 103) stated about building outstanding sculptures of the Borobudur temple in Java,

> ...the hand of Bengali artists who worked side-by-side with the people of Kalinga and Gujarat in this building up its early civilisation" and "numerous of the bas-reliefs of that colossal temple reveal the type of ships which the people of lower Bengal built and used in sailing to Ceylon, Java, Sumatra, China and Japan in pursuit of their colonising ambition, commercial interests, and artistic and religious mission...

Hence, Bengal's significant influence on Southeast Asian society stemmed from its extensive maritime trade, which facilitated a substantial cultural influence. Alongside trade, Buddhist religious figures, architects, and various professionals from Bengal travelled to Southeast Asia, contributing to the region's cultural and architectural development (Datta, 1999; Datta, 2000). Between the sixth and eighth centuries, Bengal's maritime trade declined due to internal political instability and natural factors, including changes in river courses. Despite this decline, Southeast Asia adopted religious and architectural concepts from Bengal, influencing its artistic and cultural evolution. The reciprocal trade also enriched economic conditions in both Bengal and Southeast Asia, fostering urban development and the establishment of cultural architectures with contributions from Bengali artists alongside those from Kalinga and Gujarat (Mookherji, 1912, p. 105).

4. Discussion

The Bengali diaspora, particularly traders, preachers, and artisans, along with the Sanskrit language and traditional religious and cultural norms, played integral roles in shaping Southeast Asian society during ancient times. Sanskrit, originating from India, had a significant impact on Southeast Asian socio-cultural life, particularly through its widespread use in Buddhism and the dissemination of religious teachings across the region. This linguistic influence led to the adoption of Sanskrit words into local languages, such as raja (ruler), derhaka (treason), jaya (success), negari (district, country), and *bahasa* (language). The acceptance of these linguistic elements by local populations was recognised and endorsed by the royal chancellery, highlighting the depth of cultural integration between India and Southeast Asia (Andaya & Andaya, 2017).

Indianised states formed during this era significantly shaped the social and cultural fabric of Southeast Asian societies, marking a profound influence on their overall way of life. Consequently, various ancient Southeast Asian territories took Indian names. These are Suvarnadwipa (Malay Peninsula), Balidwipa (Bali), Karpuradwipa (Borneo, land of Camphor), Indradwipa (Mayanmar), Yavawipa (Java), Kataha (Kedah), Srivijaya (Sumatra), Ayudhya (Siam or Thailand). In ancient Indian texts, Ramayana and *Kathasaritsagar* mentioned the Malay Peninsula as Suvarnadwipa. This assimilation, often described as 'osmosis' involved the gradual and unconscious adoption of Indian ideas and knowledge, significantly influencing the region's cultural development (Coedes, 1968, p. 16).

Along with the language infiltration, rulers began to build religious temples using the same architectural concepts as those found in the temple architecture of Paharpur and Mainamati in Bengal, in the second half of the seventh century. In this way, Palembang and Java temples, with identical structures and styles to those of Bengal, such as Chandi Sivu and Borobudur Temple, were constructed. The artwork representations of the nine ships that looked stitched contain a bipod or tripod mast and square sail, as well as the appearance of a bowsprit, a double quarter rudder and a double outrigger in the Borobudur temple, which was undoubtedly a sign of the skillfulness of the Bengali craftsmen in addition of the four most miniature ships those came without outrigger in the artwork of temple, (Pierre-Yves, 1980) Scholars have logically suggested that Srivijayan art was influenced by the Pala art of Bengal,

which dates back to about the ninth century. It may be assumed that the Srivijayan art reflected in the images of Buddha, Avalokitesvara, and others originated from Javanese art, which was likely the work of the Gupta school, representing ideas from Mahayana Buddhism. The region from Srivijaya to Java followed the Gupta art, and the Pala influence was superimposed upon this art from the ninth century (Majumder, 1935) Since the early period, trade connections between Bengal ports and Southeast Asian ports, such as Kaoh-Sam-Kheo, Oc-Eo, Takkola, Kedah, Ko-Ying, and Sundra Island, as well as other regions, have been established, as recent research by Akhtar (2023) has revealed. This study demonstrates that cultural influence was more accessible at the end of the post-Gupta period, or around the start of the ninth century. Devaprasad Ghose mentioned this style as the art developed according to the 'wave theory', followed by India and Indian colonies (Ghose D. , 1934; Ghose D. , 1936). That resulted in the crafting of the Borobudur sculpture by Indian artisans, specifically Bengali and other experts from various parts of India, who were skilled in their native art and crafts. In this way, they illustrated their religious motifs and shipping aspects that represent the maritime trading notions in distant lands like several Southeast Asian regions, and reminded the propagation of Buddhism and maritime trade contact between them.

Hence, it is essential to mention that Bengal's strategic location and its individuality became the driving force behind the 'Indianisation' process. As Bengal is a deltaic region and a resourceful alluvial plain (especially the Ganges Valley) from the ancient period, and the geographical position covered a frontier zone in the Indian geographic entity situated the middle point between India and Southeast Asia, a comparatively short distance for Indian communication from Bengal to ancient Southeast Asian regions was accessible because of the convenient maritime route through the Bay of Bengal, and thriving international transit port Tamralipti was influential at that time, all these factors strongly worked in the process of Bengali diaspora and cultural penetration towards Southeast Asia.

The above-mentioned discussion can be represented through a diagram.

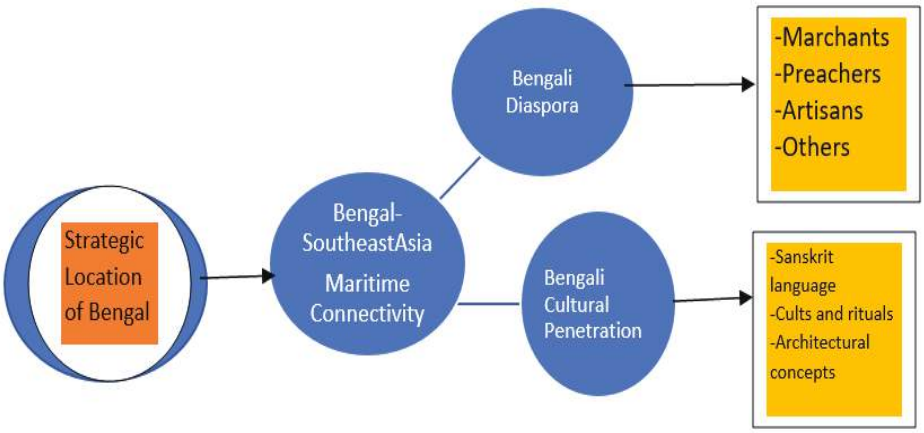

Figure 1: Bengali diaspora and cultural penetration in Southeast Asian regions
Source: Author's observation.

The principal importance of this research lies in its contribution to bridging the existing void concerning the impact of the socio-cultural life of Southeast Asia due to the Bengali diaspora and cultural penetration in ancient times. It has successfully pinpointed the contextual elements that underpin this diasporic process. Furthermore, this study opens up avenues for comprehensive research and exploration, given the potential for uncovering new artefactual and literary evidence through subsequent data analysis.

5. Conclusion

Finally, it should be noted that the Bengali diaspora and cultural penetration into the Southeast Asian region in early times, specifically from 400 BCE to 800 CE, is a significant chapter in the historical study that has impacted both regional socio-cultural lives. The strong Bengali naval force had an international merchant class, with religious preachers and others frequently travelling to this distant land and living there for a long time, which gradually increased the trade connection and then influenced Bengali culture before the Christian era. Later, the political kingship developed in the ancient entities of Southeast Asia, incorporating Indic influences. It was a slow and steady process that led to an organised cultural expansion, rooted in the Indian conception of royalty and characterised by Hindu-Buddhist cults. Indeed, the Southeast Asian region was not reticent in integrating with this development. The region's hospitable environment, liberal trade policies, religious tolerance,

fascination with architectural trends, and open cultural disposition significantly extended this process. Consequently, the indigenous populations and royal administrations of Southeast Asia embraced and effectively integrated this progression.

Notes

1. 'Bengal' refers to the geographical region encompassing present-day Bangladesh and West Bengal, India. Historically, Bengal was a British province from the Muslim conquest in the 13th century until the partition of India in 1947. In ancient times, the region included entities such as Vanga, Samatata, Harikela, Vangala, Gauda, Radha, Pundra, Varendra, and Suhma, which were part of ancient India and varied in their political status, including periods of independence. (See Majumder, R.C. 1971, *History of Ancient Bengal.* p. 1-14 for more details).
2. The term 'Bay of Bengal Interaction Sphere' (BBIS) is a crucial concept in contemporary research on early Indo-Southeast Asian interactions. A new generation of scholars has prominently adopted this term to examine the complex interplay and cultural exchanges that occurred within this region. See more in Gupta S., 2005, Gupta S., 2006, Bellina & Glover, 2004.
3. In the fourth to third century BCE, frequent references were found in *Jataka tales* regarding the connectivity between India and Bengal (specifically Tamralipti and Ganges ports) and Suvarnabhumi or Suvarnadvipa. It is not identified which specific areas had Bengal connectivity with the Southeast Asian part at that time. For this instance, archaeological excavations have yielded authentic evidence (Glover 1990, Glover and Bellina) that Ban Don Ta Phet and Khao Sam Kaeo were important entrepots in Suvarnabhumi at that time, where remains of Bengal origin (semi-precious beads, pottery, and cotton thread) were found. Glover also provided a clue to Bengal's maritime connectivity with these two ancient entrepots of Southeast Asia. On the other hand, the archaeological excavation of Bengal's ancient port Wari-Bateshwar showed that the founding of a high-tin bronze bowl came from Southeast Asia, which was common as BDTP and KSK's remains. However, it is challenging to mention the ancient Indian name for these two ports due to the limitations of sources. Nevertheless, Asoka's envoy came to Suvarnabhumi in the third century BCE for religious propagation, identified as Nakhon Pathom in Siam, and BDTP, KSK near ~~to~~ this region. It may be assumed that

BDTP and KSK, also known as Suvarnabhumi in a broad sense, were named by Indian merchants. It was also significant that *Jataka* frequently mentioned the connectivity with Bengal to Suvarnabhumi, as it was a wealthy zone for commercial purposes. Hence, with the support of *Jataka*, archaeological references indicate that these two ports were connected to Bengal's maritime trading activity prior to the Christian Era.

References

Akhtar, S. (2023). *Bengal's Perspective on Maritime Connectivity with Major Ports in Southeast Asia, 321 BCE-750 CE*. Unpublished thesis, University of Malaya, Department of Southeast Asian Studies. Kuala Lumpur.

Akhtar, S. & Idris, H. (2022). Ancient trade corridor Tamralipti and Bengal's glory (200 BCE–700 CE). *KEMANUSIAAN, the Asian Journal of Humanities*, 29(1): 1–22.

Akhtar, S. & Idris, H. (2020). Tracing early maritime Southeast Asia through archaeological elements and Bengal's contact (400 BCE-800 CE). *JATI-Journal of Southeast Asian Studies, 25*(1), 28–57.

Andaya, B. W., & Andaya, L. Y. (2017). *A History of Malaysia* (3rd ed.). London: Palgrave.

Bhuiyan, M. H. (2018). Mainamati. In A. M. Chowdhury, & R. Chakravarti (Eds.), *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives up to (c. 1200CE)* (Vol. I, pp. 263–280). Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Briggs, L. P. (1950). 'The Khmer Empire and the Malay Peninsula' *The Far Eastern Quarterly*, pp. 256–305.

Chakravarti, R. (2002). Seafaring in the Bengal Coast: The Early Medieval Scenario. In R.

Chakravarti (ed). *Trade and Traders in Early Indian Society*. 160–183. New Delhi: Rajkamal Electric Press.

Chandra, M. (1977). *Trade and Trade Routes in Ancient India.* Delhi: Abhinav Publications.

Chhabra, B. C. (1965). *Expansion of Indo-Aryan culture during Pallava rule*. Delhi: Munshi Ram Manohar Lal.

Chowdhury, A. M. (1996). *Bengal and Southeast Asia: Trade and Cultural Contacts in the Ancient Period*. In Amra Srisuchat (ed.). *Ancient Traders and Cultural Contacts in Southeast Asia*, Bangkok.

Chowdhury, A. M., & Chakrabarti, R. (2018). *History of Bangladesh: Early Bengal in regional Perspectives (Up to c. 1200 CE)* (Vol. I & II). Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Christie, J. W. (1998). The Medieval Tamil-Language Inscriptions in Southeast Asia and China. *Journal of Southeast Asian Studies*. *29*(2), 239–268. Retrieved November 4, 2023, from http://www.jstor.org/stable/20072045

Coedes, G. (1967). *The Indianized States of Southeast Asia.* (W. F. Vella, Trans.) Hawaii: Honolulu.

Cowell, E. (1907). *The Mahajanaka Jataka (no.539), The Jataka or Stories of Buddhists Former Birth -Translated from the Pali by Various Hands* (Vol. VI). E. B. Cowell, W. Rouse, & M. Little (Eds.). Cambridge: Cambridge University Press.

Cunningham, A. (1871). *The Ancient Geography of India* (Vol. I). London: Trubner and Co.

Datta, A. (1999). Bengal and Southeast Asia- Early Trade and Cultural Contacts. *Bengal Art,* 4, 49–60.

Datta, A. (2000). Geographical Location of Ancient Tamralipta Port. *Journal of BengalArt*, 5.

Gamege, R. (2017). Bay of Bengal: What Implications for ASEAN? In *ASEAN and the Indian Ocean: The Key Maritime Links*, Bateman, S, Gamege, R., & Chan, J (eds.). Singapore: S. Rajaratnam School of International Studies.

Gaynor, J. (2013). Ages of Sail, Ocean Basin, and Southeast Asia, *Journal of World History*, 24 (2).

Gerini, G. (1974, 2nd edition). *Research on Ptolemy's Geography of Eastern Asia.* London: Royal Asiatic Society.

Ghose, D. (1934). The Early Art of Srivijaya. *JGIS, I*(I), 31-38.

Ghose, D. (1936). Sources of the Art of Srivijaya. *JGIS, 3*(1), 50-56.

Glover, I. (2012). Recent Archaeological Evidence for Early Maritime Contacts Between India and Southeast Asia. H. P. Ray, Salles, Jean-Francois. *Tradition and Archaeology (Early Maritime Contacts in the Indian Ocean)*, Singapore: Institute of Southeast Asian Studies.

Hall, D. G. (1966). *A History of Southeast Asia.* London: Macmillan.

Hall, K. R. (1985). *Maritime Trade and State Development in Early Southeast Asia*. Honolulu: University of Hawaii Press.

Hall, K. R. (2011). *A History Early Southeast Asia: Maritime Trade Societal Development 100-1500.* Plymouth: Rowman & Littlefield Publishers. Inc.

Haque, E. (1998). Maritime Activities and the Indigenous Traditions of Boat Building in Ancient and Mediaeval Bengal. *Bengal Art*, 5, 243–262.

Herrmann-Pfandt, A. (2012). The Mandala Temples in Paharpur, Mainamati and Vikramsila: A New Interpretation, *Bengal Art*, Vol. 17.

Hoyle, B. S. (1967). *The seaports of East Africa.* Nairobi: East African Publishing House.

Husain, A. B. (1997). *Mainamati-Devaparvata.* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Jahan, S. H. (2006). Excavating Waves and Winds of (Ex) change: A Study of Maritime Trade in Early Bengal, (Oxford: John and Erica Hedges Ltd.

Jermsawatdi, P. (1977). *Thai Art with Indian Influences.* Bihar: Abhinav Publications.

Kale, M. R. (Trans.), (1922). Kalidasa, *The Raghuvamsa of Kalidasa with the commentary Sanjivini) of Mallinatha* (3 ed.), Bombay: Gopal Narayan & Co.

Kangle, R. P. (1963). *Arthasastra,* of Kautilya (English translation). part 11.

Kidwai, A.H. (1992). Conceptual and methodological issues: Ports, port cities and port hinterlands. In *Ports and their hinterlands in India (1700–1950)*. ed. Indu. Banga, 7–43. New Delhi: Manohar Publications.

Kumar, A. (2005-2006). Changing Faces of Gupta and Post-Gupta Towns of Bengal, *Proceedings of the Indian History*. Vol. 66.

Majumder, R. C. (1927). *Ancient Indian Colonies in the Far East, Vol I. Champa*, Lahore: The Punjab Sanskrit Book Depot.

Majumder, R. C. (1937). *Suvarnadvipa, Vol. II, Part 1, Political History*. Dacca: Asoke Kumar.

Majumder, R. C. (1944a). *Hindu Colonies in the Far East.* West Bengal: Firma K. L. Mukhopadhyay.

Majumder, R. C. (1944b). *Kamujadesa or Ancient Hindu Colony in Cambodia*, Madras: University of Madras.

Majumder, R. C. (1971). *History of Ancient Bengal* (First ed.). Calcutta: G. Bharadwaj & Co.

Majumder, R. C.(1935). 'Origin of the art of Srivijaya'. *Journal of the Indian Society of Oriental Art*. Vol. 3 (No.1).

Meyer, M. (1997). *Asia: A Concise History.* Oxford: Rowman & Littlefield.

Mookherjee, R. K. (1912). *Indian Shipping: A History of the Sea-born Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliest Time*. Bombay, Calcutta: Orient Longman.

Mukherjee, B. N. (1990). Kharoshti and Kharoshti-Brahmi Inscriptions in West-Bengal (India). *Indian Museum Bulletin*.

Nadaranjan, V. (2011). *Bujang Valley: The Wonder that was Ancient Kedah.* Kedah: Dato V. Nadaranjan.

Penzer, N. M. (1924). *The Ocean Story being C. H. Tawney's Translation of Somadeva's Katha Sarit Sagar* (Vol. II). London: Chas. j. Sawyer Ltd.

Pierre-Yues, M. (1980). The Southeast Asian Trading Ship: An Historical Approach, *Journal of the Southeast Asian Studies*, Vol. 11(2).

Ray, H. P. (1995). *Winds of Change: Buddhism and the Maritime Links of Early South Asia*, New York: Oxford University Press.

Sastri, N. (1921). 'The Ramayana in Greater India'. *Journal of Oriental Research*, Vol. 6.

Schoff, W. H. (1995). *The Periplus of the Erythrean Sea: Travel and trade in the Indian Ocean by a merchant of the first century.* New Delhi: Munshiram Manoharlal Publisher.

Sen, R. K., & Kayal, J. (2007). India-Bali Economic Trade: The Past and the Future. In K. C. Roy & S. Chatterjee (Eds.), Reading in *World Development: Growth, Development and Poverty Alleviation in the Asia-Pacific* (pp. 15-22). New York: Nova Science Publishers.

Smith, V. A. (1962). *The Early History of India.* London: Oxford University Press.

Srisuchat, A. (1996). Merchants, Merchandise, Markets: archaeological evidence in Thailand Concerning Maritime Trade Interactions between Thailand and other Countries of the 16th century A.D. In A. Srisuchat (Ed.), *Ancient Trade and Cultural Contacts in Southeast Asia* (pp. 237–274). Bangkok: National Cultural Commission.

Vickery, M. (2003-2004). Funan Reviewed: Deconstructing the Ancients. *Bulletin de l'Ecole Francaise d'Extreme-Orient*, 90-91, pp.101-143.

Wheatley, P. (1961). *The Golden Khersonese: Studies in the Historical Geography of the Malay Peninsula Before A.D. 1500.* Kuala Lumpur: University of Malaya.

Wheatley, P. (1964). *Impressions of the Malay Peninsula in Ancient Times.* Singapore: Eastern University Press.

The Cultural and Linguistic Affinity in Defining the Identity of Bengal

Dr. Md. Abdus Samad
Samia Yesmin

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookSamad

Introduction

Language plays a vital role in permeating one's thoughts, mediating the relations with others, and creeping into dreams since "…human knowledge and culture are stored and transmitted in language, which is so ubiquitous that we take it for granted…" (Langacker, 1970, p. 3). So language is the most precious possession a society grows with. It is evident from the long but fragmented history of the Bengali language that it has been helping to nourish the 'Pride and Hope' of the people looking for a national identity on their distinctive cultural and linguistic backdrop. Mother, Mother Tongue, and Motherland–these three concepts are linearly interwoven in the train of Bengali thoughts, leading to the quest for a distinct national identity of the Bengali-speaking population. Defending the language to the people of Bengal always seemed to be remarkably analogous to protecting their land. From this angle, the issue of language has been considered an instrument for fighting the cause of cultural, territorial, and national identity. The spirit of the eastern Bengal people for the Language Movement and the Bangladesh Movement was primarily derived from such a background.

Cultural and Linguistic Affinity of Bengal and its Identity Formation

Bengal has been a geographical entity in epigraphic and literary records since the 11^{th} to 13^{th} century AD (Majumdar, 1943, p. 18). Bengal is a melting pot of races. It, therefore, has a mixed culture. However, her deep-rooted heritage is amply reflected in her architecture, literature, dance, drama, music, painting, and people's lifestyles. She has her Language, Bengali, which boasts a rich literary heritage. The Cultural and linguistic affinity and the representation of nature played a very significant role in defining the identity of the Bengal region. Like many other regions of the world, in the case of Bengal, the cultural

and ecological issues have been 'intertwined' (Sharma, 2012, pp. 146-84). For Bengal, the basis of identification was the territory rather than anything else. By the 16th century, "we find the use of Bengali in literary texts both in the sense of people of Bengal and Bengali-speakers" (Anisuzzaman, 2017, p. 44). Historically, we find the commonality of many poets urge to uphold the prestige of their mother tongue.

The dependence of the people of the region on the monsoonal climate for their crops and livelihood has made them the believers of absolute powers, i.e., the goddesses Kali and Durga, who are regarded as the omnipotent of nature and responsible for their safety and well-being. This is evident in the Bengali Hindu society that the emergence of many gods and goddesses is fundamentally connected to many natural processes manifested in the interaction between people and their ecological ambience. Amongst the most important environmental factors, water is the foremost one that formed the cultural life of the Bengal region, as there is an extensive network of rivers and various other water bodies.

Although the emergence of Islam in the cultural frontier of Bengal "gave rise to a different metaphysical framework for the appropriation of nature, the centrality of water in the popular mind remained unchanged" (Iqbal, 1992, p. 56). A kind of syncretism that symbolised a secular, non-orthodox, and flexible cultural worldview was born with the inter-cultural development where the concept of the gods and goddesses was mixed with the life of the Sufis (Ahmed, 1981). A critical appreciation of nature and its manifestation in Bengal is seen in the writings of Abul Fazl, who sought an ecological understanding of the region of Bengal. Abul Fazl observed the land and landscape of the region and argued that the kings of Bengal used to construct grand *al* (embankment) in the ancient period, and in this connection, the region was known as *Bangalah*.

The cultural identity of modern Bengal is a product of a long process of racial and cultural interactions among various racial and cultural groups that came to the region over the past five thousand years (Huda, 1986, p. 181). Bengali nationalistic feelings found an outlet in the eulogy of the Bengali language through early, medieval, modern, and contemporary linguistic aspects. The language consciousness of the Bengali-speaking people has been a precursor of nationalism in Bangladesh. It may be argued here that while the political,

economic, or social history of a land chronicles accurate and relevant facts and incidents, the history unfolded by the creative writings offers the unrecorded ethos and an account of an abstract psychic voyage towards deciphering the identity of an individual and a nation. The modestly unfolding truth is that an esoteric relationship exists between the Bengali language and the creation of Bangladesh. The history of the emergence of Bangladesh, subsequently described as the Bangladesh Movement, is not only an enumeration of facts, figures, and incidents about socio-political upheavals, but it also emanates from a more extensive and deeper cultural and linguistic base. While the political and social base of the creation of Bangladesh visibly stems from the partition of the Indian subcontinent in 1947, its cultural base, at least, dates back to a period as early as the eighth or the tenth century. *Charyapada*, the first poetic work in Bengali, was composed then.

An element of social awareness has traditionally marked Bangla poetry since its very inception. The awareness subsequently gave birth to major patriotic themes in Bengali poetry. Her poets visualised Bangladesh as an independent political entity far ahead of her politicians and political thinkers. 'Sonar Bangla' or 'Golden Bengal' is essentially a poetic idea, and Rabindranath Tagore wrote his famous poem on 'Sonar Bangla' in 1905 following the partition of Bengal at the time long before the politicians dreamt of Bengal as an independent nation. Although the influence of Rabindranath eventually failed to prevent the second partition of Bengal in 1947, six years after his death, it now seems to have proved strong enough to survive that disastrous event. Twenty-four years after the second partition of Bengal, East Pakistan transformed itself in 1971 into the sovereign republic of Bangladesh. No factor contributed more positively and decisively to this transformation than Bengali Muslim's love of the Bengali language. That love was nourished and reinforced by the Bengali poet's writings (Roy, 1974). Western political thoughts and influences in nineteenth-century Bengal triggered the idea of political nationalism. Cultural nationalism proceeded with political nationalism, which nourished the latter in its course.

The consciousness of racial roots activated the poetic quest for the identity of Bangladesh and grew out of a poetic dream. The region of Bengal is, by and large, a land of poets and poetry. Undoubtedly, the creation of Bangladesh as a sovereign state was possible due to vigorous political movements. Still, the

premise for independence set by linguistic and cultural affairs is essential. Independence was a decisive result of Bengali's nationalistic feelings, which were found to be an outlet in the language in the first place.[1] Bengali, an Indo-European language, remains the most unifying factor in Bengali nationhood. Though the official recognition of Bengali as a literary medium came not before the Muslim conquest of Bengal around the 13th century, the Bengali poets had been eulogising it long since. Even poets writing in Sanskrit uttered words of praise for it. In Sanskrit literature written in the tenth century, the Bengali language is compared with the sacred currents of the Ganges (Huda, 1986).

Bengali is the mother tongue of the inhabitants of Bengal, especially those living in the eastern part of the Bengal region. But much water had flown down the Ganges before Bengali came to be identified as the spoken and written medium of expression of the people living in the eastern part of the Gangetic delta. It is very relevant to note that the geographical identity of the country, Bangladesh, could hardly be defined before the claim of Bengali as a literary medium was established. The greater Bengal, consisting of Bengal, Bihar, Orissa, and Assam, spoke at least three languages: Bengali, Oriya, and Assamese. But for a long time till the 13th century, the literary medium of the region was Sanskrit, as the Brahmin elite did not regard native languages as worthy of scholarly work (Shahidullah, 1985).

After the Muslim conquest of Bengal in the 13th century, the Muslim rulers, especially the Turkish Sultans, began patronising Bengali as their subject's official and literary medium. In doing so, the Sultans found effective ways to counter the influence of Sanskrit, the official language of the ruling class. The famous Bengali poets and writers, i.e., Syed Sultan, Abdul Hakim, and a few other Muslim poets of the medieval period, wrote a lot, eulogising the role of the native tongue in men's lives. Since then, the people speaking Bengali developed a distinct regional identity within a larger administrative territory, Bengal Subah, that does not include Orissa, Bihar, and Assam. So, recognising Bengali as a people's language significantly determined the country's geographical boundaries. Shibnarayan Roy observes,

> It is, however, with the coming of Islam to India and the establishment of the Muslim rule in Bengal in the thirteenth century that Bengali began to develop rapidly, and by the beginning of the 15th century, a standard

> literary Bengali was established which came to be used all Bengal, which gave to the people of the land a definition and identity that have survived the many fluctuations in their political geography and fortune. (Roy, 1974)

Dinesh Chandra Sen reveals that Bengali was an unacknowledged literary medium of ordinary people in the eastern part of Bengal (Sen, 1954). The history of the land is somewhat analogous to the history of language and poetry. It would be apt to conclude that Bangladesh, geographically reckoned as 'frontier land' at the south-eastern side of the Indian subcontinent, was primarily visualised by her poets as an independent habitat of a 'vernal race' well before her politicians and political thinkers imagined it. In this regard, it would be very pertinent to address here that there is a definite difference between the linguistic and poetic affinity in the eastern and western parts of Bengal since the beginning of the 20th century.

The confluence of two large river systems- the Brahmaputra flowing from the northeast and the Ganges from the northwest symbolises the union of two ancient peoples in the heartland of Bengal. Historians agree that the proto-Australians, coming from the northeast, and the Dravidians, a linguistic group from the northwest, formed the original racial-cultural stock of the Bengali people. It was subsequently enriched by the Alpines (an outdated term for ancient West/Central Asian groups (e.g., Turkic, Iranian) that migrated to Bengal, contributing to its ethnic diversity) from the West and, to a lesser extent, by the Vedic Aryans (Proto-Nordics) inhabiting northern India (Ray, 1995, p. 71). The next round of mixing occurred during the five hundred years of Muslim rule, beginning with the Turko-Afghan-Mughal influx in the 13th century, significantly impacting Bengali society. The final round of cultural interaction was the meeting of the East and West under two hundred years of British colonial rule. The interaction was at the level of ideas and institutions profoundly impacting Bengal society's character. The political, economic, and cultural interactions with the West ignited the latent fire of nationalism among the educated Bengali middle class.

Bengal has been blessed with this natural phenomenon, which has helped her people become the most freedom seekers for a long time. Although Bengal was located hundreds of miles from its power centre in Delhi, it was always desirous of independence whenever an opportunity was available. No wonder

the towns and cities of Bengal acquired the name *Bulghakpur* (Rebel City) in the court of Delhi. Bengal lived up to its reputation as a rebellious province during the British Raj.

After two consecutive partitions of the Bengal region, the eastern part was centrifugally driven apart after a bitter, if short, armed struggle for liberation. The Bengalis took the arms because they had been threatened with the danger of being an extinct region. This threat was basically on their identity. Immediately after the emergence of Pakistan, the rulers refused to acknowledge Bengali as a state language. However, 56% of the total population of Pakistan who lived in her eastern wing were Bengali-speaking people. The rulers jeopardize the Bengali language and culture by introducing many strange reforms (i.e., attempting to teach the Arabic alphabet to Bengali). Ironically enough, all these official designs contributed significantly towards converting the Bengali language into a political weapon, and a vigorous movement gained momentum within a couple of years after Pakistan's birth. Being the only nation in the world, the heroic sons of Bengal sacrificed their lives for the cause of their language. A poet of the Bengali language pledges to sacrifice the last drop of his blood to uphold the dignity of his mother tongue:

I've dyed its dress with the blood
From tender breast
As smoke from fired bullets
Weaves its magical veil.
If the sacrifice of lives be ever needed
To uphold the dignity of this tongue
Forty million souls would be ready to bleed
And fulfil its great expectations (Islam, 1983, p. II).

For centuries, the Bengalis have regarded Motherland and Mother Tongue as two sides of the same coin. The essence of the language movement lies in the fact that it converted the peace-loving nation into a rebellious one. Revolt seemed to be the only rescue for them. The logic lies in their very rights to survive as a nation. This militancy guided the language issue into a broader movement for self-reliance, leading to the country's independence. Thus, the language consciousness worked in various ways, inspiring the struggling masses and giving birth to a separate nation and state.

The general ecological condition of the Bengal region, along with varied elements, has played essential roles in perpetuating her separate entity. Foremost, ecology played a vital role in the emergence and consolidation of identity and culture, which the region's people cherish and practice. The geophysical conditions, rivers, climate, and many other ecological factors have regulated the significant historical personality (Alam, 2007, p. 43). The region's geographical location and environmental conditions are most important. Because of its location, Bengal has been subject to migrations and a melting pot of pre-historic cultural regimes from all three regions. The ecological regime, monsoonal climate, and giant water network contributed to developing Bengal's distinctive culture and identity.

The tradition of intermixing among different groups in a historical process played a formative role in the emergence of the Bengali nation (Iqbal, 1992, p. 70). Bengal's inherent tenacity and tenacious vitality endured here as an entity through the historical journey of a thousand years of nature (Ray, 1995, p. 698). Historians of Bengal have emphasised the unique natural environment of Bengal, which is comprised jointly by man and nature, and gave birth to the emergence of an independent and individual identity of Bengal. An expert in Bengal history and geography explains,

> ... its (Bengal) vast level plain with its highland fringes and lowland depressions, water plants and aquatic life as well as variety, colour, and profusion of its flora and fauna- all these and such other features have left some mark in almost every sphere of life and activities of its people; in arts and crafts, architecture and sculptures, pieces of literature and music (Rashid, 1979-81, p. 160).

The idea of Bengalis was incepted and further shaped in the medieval period with the development of the Bangla language and literature, culminating in the British colonial period. Ironically, the prospect of an 'enduring language-centric national development' within the Bengal region failed due to communal politics. Thus, communal politics paved the way to breaking the pan-Bengal language identification, and ultimately, the 'Bengal nation' was divided into two parts with the partition of India. The religion-based middle-class leadership primarily created the Hindu-Muslim antagonism to secure political support on a communal basis. At the same time, it would be pertinent to note that the failure of the national integration between the two wings of

Bengal has a connection with the ecological set-up and the ecological otherness of the land. The region of Bengal which consisted of and culturally engaged by a majority of lower caste Hindus and Muslims, while both upper caste Hindus and Muslims were failed in this regard. This concern could be clarified as follows:

> The alienation of an essential segment of people riparian and the fluid deltaic environment of Bangladesh had sown the seed of divisiveness that eventually culminated in the partition of Bengal. Though Bangla remains the language of the majority in both Bangladesh and West Bengal, how a cultural response to nature, aesthetic imagination, cultural symbols, vocabulary, and economic activities have been expressed remains relatively different, if not conflicting (Rashid, 1979-81, p. 178).

A conscious attempt to identify oneself with their language, culture and homeland surfaced itself in the 19th century and after (Anisuzzaman, 2017, p. 46). Iswarchandra Gupta's expression of love for Bengal and her language, Michael Madhusudan Dutta's eulogy to Bangla language and Bankimchandra Chattopadhyay's scorn for the Bengalis literary expressions give a clear picture of the unity and plurality of the Bengali people. While the British formed a single race, the Bengalis had multiple elements in them. Rabindranath Tagor defined the cultural identity of Bengal in a much clearer form. Tagor says that "Bengalis are Bengalis not because of any artificial lines drawn on a map of their land, they were so because they spoke the same language" (Anisuzzaman, 2017, p. 54). Tagor writes,

> The history of Bengal is a history of divisiveness. The division of East Bengal, West Bengal, Radha, Varendra is not only geographical division-associated with it is also division of the inner self (*antar*), there was no social agreement either. The stream of unity that had flown within all these was the unity of language. That we have been called a Bengali for so long can be explained by the fact that we happen to speak Bengali (Thakur, 1355 (Bengali), p. 391).

The land of Bangladesh has been imagined both as Mother and Beloved, of which the Mother image is unquestionably the stronger one as the idea of cultural nationalism that proceeded that of political nationalism was mainly expressed through it. Language consciousness that began at least in the tenth century took the shape of linguistic nationalism much later and rose to its peak in 1952 with the Language Movement. The spirit of this movement provoked

the people of the land to come out from the narrow religious nationalism propagated by the Pakistani ruling class. Linguistic and cultural nationalism became complementary to each other. This process of evolution amidst structural changes in society and politics eventually made the region's people ready for freedom, fighting in unyielding intrepidity toward independence. Land, ecology, culture, language, and liberation are some of the essential components corresponding to different phases of the history of Bangladesh that were rational in responding to the emergence of a nation-state. The poet expresses his solidarity with the beloved Bengal:

> Life or death will remain in my eyes, and
> the grass of this Bengal in my bosom (Dasgupta, 1376 Bangla, p. 177).

Concluding Remarks

Independence is the dearest of things a civilised man longs for. It is also the most important pre-condition for the harmonious development of an individual and a nation. The history of civilisation is remarkably analogous to man's struggle to emancipate himself from all constraints. Rangalal, an early eighteenth-century Bengali poet, asked, 'Who does not want to live with liberty? Tell me, who?' The Bengalis remember this as a proverb as of now. Interestingly, the notion of independence has undergone dramatic changes in Bengal with the coming and going of various rulers. Finally, independence came to be identified with the idea of achieving a separate homeland for the Bengalis as a whole. Today, independence is synonymous with the very existence of the people in Bangladesh. An eminent historian of Bangladesh opines about the autonomous and individual Bengali national identity as follows.

> The rivers and boatmen move and flow, and the floods come and go, but the spirit of the Bengali man keeps steps in tune with their own words. As they enjoy life in music and mirth, they dance to the tune of nature and present the works of their worlds to show that this is Bengal as built by the people of Bangladesh (Dani, 1997).

In the age of globalization, the Bengali identity faces some challenges of one sort or another, from the processes of alienation and from the impact of Hindi films and television channels. Anisuzzaman says,

> Only the future can tell how will it fare or what turn will it take. I have every hope that its indomitable spirit will overcome the unfavorable ground realities. In future the Bengali identity may come into conflict with other identities of the individual and the collective, but I am certain that it will have no quarrel with the universal human identity (Anisuzzaman, 2017, p. 52).

The historical truth is that the people living in the eastern part of Bengal that forms today's Bangladesh could hardly be brought under total subjugation by any foreign rulers for an indefinite period. The history of Bengal has seen the rise and fall of many royal dynasties and invaders, all coming in waves to rob the land of its legendary riches and treasures. Kings, emperors, and colonialists have come and vanished in turn, but the people are still surviving as a separate nation-state.

Note

1. Here the term 'Bengalee' refers to the people of Bengal, whereas 'Bengali' stands for the language they speak.

References

Ahmed, R. (1981). *The Bengal Muslims 1871-1906: a quest for identity.* Delhi: Oxford University Press.

Alam, A. (2007). Geographical Location and its Influence on the Identity of Bengal . In K. M. Mohsin and Sirajul Islam, *Cultural History, Vol. 4* (p. 43). Asiatic Society of Bangladesh.

Anisuzzaman. (2017). *Cultural Pluralism and other Essays.* Dhaka: Journeyman Books.

Bhuiyan, M. H. (2018). Mainamati. In A. M. Chowdhury, & R. Chakravarti (Eds.), *History of Bangladesh: Early Bengal in Regional Perspectives up to 1200CE* (Vol. I, pp. 263-280). Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Briggs, L. P. (1950). The Khmer Empire and the Malay Peninsula. *The Far Eastern Quarterly, 9*(3), 256-305.

Coedes, G. (1968). *The Indianized State of Southeast Asia.* Honolulu: The University Press Hawaii.

Dani, A. H. (1997). Individuality of Bengal Art. *The Second International Congress of Bengal Art.* Dhaka: National Museum, Bangladesh.

Dasgupta, R. (1376 Bangla). *Jibananda Dasher Kabya Sambhar [Collection of the poems of Jibananda Das, In Bangla].* Dhaka: Khan Brothers and Company.

Dikshit, K. N. (1938). *Excavations at Paharpur,.* New Delhi: ASI.

Ghose, D. (1934). The Early Art of Srivijaya. *JGIS, I*(I), 31-38.

Ghose, D. (1936). Sources the Art of Srivijaya. *JGIS, 3*(1), 50-56.

Haque, E. (1998). Maritime Activities and the Indigenous Traditions of BoatBuilding in Ancient and Mediaeval Bengal. *Bengal Art*, 243-262.

Herrmann-Pfandt, A. (2012). The Mandala Temples in Paharpur, Mainamati and Vikramsila: A New Interpretation. *Bengal Art*, 17, 111-134.

Huda, M. N. (1986). *Flaming flowers: Poet's Response to the Emergence of Bangladesh.* Dhaka: Bangla Academy.

Husain, A. B. (1997). *Mainamati-Devaparvata.* Dhaka: Asiatic Society of Bangladesh.

Iqbal, I. (1992). Bengal/Bangladesh: The State and Environmnet. In S. Islam, *History of Bangladesh, 1704-1971. Volume 3, Social and cultural history* (p. 56).

Islam, M. (1983). *Poems on 21st .* Dhaka: Academy.

Langacker, R. W. (1970). *Language and its Structure: Some Fundamental Linguistic Concept.* New York: Cambridge University Press.

MA Samad and MK Dev. (2014). *History of Bangladesh, 1905-2005.* Dhaka: University Publication.

Majumdar, R. C. (1943). *History of Bengal Vol.I.* Dhaka.

Majumder, R. C. (1935). The Origine of the art Srivijaya. *JISOA, 3, June*, 75-78.

Mookherji, R. K. (1912). *Indian Shipping: A history of the Sea-borne Trade and Maritime Activity of the Indians from the Earliet Times.* London: Logmans, Green and Co.

Nadaranjan, V. (2011). *Bujang Valley: The Wonder that was Ancient Kedah.* Kedah: Dato V. Nadaranjan.

Pierre-Yves, M. (1980). The Southeast Asian Trading Ship: An Historical Approach. *Journal of the Southeast Asian Studies*, 11(2), 253-69.

Rashid, H. (1979-81). The Geographical Background to the History and Archaeology of South-East Bengal. *Journal of Asiatic Society of Bangladesh, Vol.XXIV-VI*, 160.

Ray, N. R. (1995). *Bangalir Itihas (In Bangla).* Kolkata: Dey Publishing.

Roy, S. (1974). *I Have Seen Bengal's Face.* Kolkata.

Sen, D. C. (1954). *History of Bangla language and Literature.* Calcutta: University of Calcutta.

Shahidullah, M. (1985). 'Amader Bhasha Samasya' (in Bangla) [Our Language Problems] Ekhushey February (in Bangla) [February 21] . In H. H. Rahman. Dhaka: Puthipatra Prakashani.

Sharma, M. (2012). *Green and Saffron: Hindu Nationalism and Indian Environmental Politics.* New Delh: Permanent Black.

Thakur, R. (1355 (Bengali)). *Rabindra racanavali* (Vol. XXVI). Kolkata, India.

The Shifting from Bengali Nationalism to Bangladeshi Nationalism- A Political Analysis

Eshrad A. Aeka

DOI: https://doi.org/10.69862/carass2025LMBookErhad

Introduction

According to Partha Chatterjee (1991), this sense of nationalism, community and belonging is an imaginary creation. It is actually created by the elites to unite the common people with an intention to use them for the growth of capitalist society. On the contrary, the Marxists critics explain nationalism as an ideology that occurred from the conflict of classes (Brown, 1998). They agreed that nationalism basically emerged with a view to construct a class-less society. Yet, my paper is intended to analyze the formation of Bengali and Bangladeshi nationalism and their shifting with the swap of political regimes in Bangladesh. Initially, it will be qualitative research. However, the concept of Bangladeshi nationalism is a politically constructed concept which was formulated after 1975 by former president Ziaur Rahman with a view to separate the Bangladeshi people from the West Bengal People and establish a separate identity for them. But my argument is emphasizing religious identity instead of cultural identity of Bangladeshi citizens before formulating the new nationalism concept. Also, through the establishment of Bangladeshi nationalism in this territory, he aims to gain political popularity among people and make his regime longer.

Literature Review

Basically, the concept of nation state became popular after the second- world-war when people started to realize that there is no divine power within kinship and church authority. Therefore, the image of the nation is remade as the community of social justice (Brown, 1998). Nationalism as a discourse that does not have particular definition and theories. However, Benedict Anderson (1983) defines a nation as an imagined political community which is inherently limited and sovereign. After the era of kinship and religious authority, people started to look for a new identity, which was the time the concepts of democracy, nation, nationalism and democratic government became popular.

Meanwhile, Ernest Gellner (1983) makes a critical point by claiming that nationalism is not the awakening of nations to self-consciousness rather it invents nations 'where they do not exist'. Now, if we consider Bangladesh's liberation war history, the idea of Bengali nationalism or Bangladeshi nationalism emerged prior to the birth of Bangladesh. We have also seen at the beginning of the 1952 language movement, a map was used to drawn in the middle of the flag because during that time, there was no particular border or territorial identity for Bangladesh. But the people were fighting for an undisputed land identity within limited border. So, with an intention to inform others about the existence of Bangladesh territory, the map was drawn in the middle of the flag. The nationalists believe that once a group has defined itself as a nation, they have a 'natural right' to create a territory urgently to live and govern in. But there was no state named Bangladesh existed, so the ideology of Bengali nationalism was applied to unite the people. This ideology derives from the language and cultural identity which gives them a sense of unique and unified existence during the liberation war in 1971. Also, this Bengali nationalist identity helped to separate the Bengali people from the Urdu speaking West Pakistani people.

Again, Gellner (1983) views politics and nationalism as a unified unit. But in the same year, Anderson (1983) argued that Nation, nationality, nationalism all have proved notoriously difficult to define. His claim also supports Hugh Seton-Watson idea as he proclaims that no 'scientific definition' of the nation can be drawn; yet the phenomenon has existed and exists. Suddenly, with no exact definition, the ideology of nationalism, nation and nationality became popular because it has given a new sense of identity for people. Though if we see deeply, our sense of identity is arbitrary. For instance, before 1947 Pak-India partition, we were known as Indian. Then after the partition we became (East) Pakistanis. Finally, after the victory in the 1971 liberation war, we are recognized as Bangladeshi people. Although, this national identity is also uncertain because if more divisions occurred or with the major shifting of political regime, this identity can be possibly changed or reformed.

Historically, the first division for Bangladesh occurred in 1905 based on two nation theory when the rulers decided that there will be two separate nations Pakistan and Hindustan. Mohammad Ali Jinnah proposed this idea which was dismissed in 1909. Again, in 1947, after the British left Indian sub- continent,

two separate nations emerged named Pakistan and India, created based on their religious identity. During the time of partition, many people were forced to leave their country and moved to the new state because of their religion. Besides, many people were forced to change their religion ex. 'Ranamama' from Urvashi Butalia's book *The Other Side of Silence*, who accepted Islam to live in Pakistan (pp.17). Also, during our liberation war, many Hindu families left the country and moved to India only to save their lives because the Pakistani military often attacked only the Hindu community with an objective to make East Pakistan a state of Muslims.

According to Eric Hobsbawm (1990), the idea of nationalism is a myth. Since there is no proper definition of this term, political parties have the chance to change and reform this concept following their will. Also, oftentimes religion plays a significant role in defining nationalism. Therefore, the West Pakistan rulers took this opportunity to create Pakistan as a Muslim state after the 1947 partition. They decided that Pakistan would be a Muslim country containing a Pakistani nationalist perspective which believes that its one and only state language should be Urdu. It is true that the elites and political parties of a democratic state frequently reconstruct the nationalist ideology for their own benefit. For example, there was no state religion philosophy at the beginning of the constitution in 1972. Later, Islam was announced as the state religion of Bangladesh to satisfy the majority of Muslims by former president Ershad in 1985. On the contrary inclusion Bangladeshi nationalism in the constitution to provide a unique and separate identity for the people living in this territory. This is one of the ways religion and political power together construct the new nationalism concept in the post 1975 era.

On the contrary, Swarupa Gupta (2007) argues that the idea of nationhood emerged from the sense of collectivity and also influenced by past ideas like samaj, jati and desh. But I argue, the imagined identity of nationhood was developed to minimize the categories like race, ethnicity, caste, religion, language and more and bring the people under one roof. It is important to remember that a Muslim influenced ideology often predominates in our state. After the Awami League was left out by the military government in 1975, their secular and social policies were legally replaced by religious and capitalist views. Besides, language unity of Bangladeshis is frequently overlapped by the religious identity. As a result, the Muslims were getting more priority in both social and political discourses compared to others. However, Michael

Hechter (2000) argues that 'ethnic solidarity' will be seen in people belonging to 'inferior culture and economy'. During the Pakistani regime, the Bengali people were considered as inferior and were highly dominated as well as discriminated in economy, politics and cultural discourses. Iftekhar Ahmed Chowdhury (2009) states that 3 billion dollars received from the United States as foreign aid, was spent in the development of western wing of Pakistan only. But East Pakistan did not receive any single penny from the aid. Swarupa Gupta (2007) also claims that after being colonized by British and then Pakistani rulers, the Bengalis fell into solidarity and 'a sense of self-consciousness and alienation' developed among people. Now, they started to believe that they can run over their own nation state. Therefore, they demanded for a free state with freedom of speech and after a bloody liberation war, we got our own nation. After creating the new state, the political conflict over national identity began within a few years. Unfortunately, the overlapping and problem with national identity still exists in our country after 53 years of independence because of political instability.

It basically started when Mr. Ziaur Rahman came to power, "he consolidated the growing religious sentiments to secure and expand his support base" (Chowdhury, 2009). He introduced the concept of Bangladeshi nationalism in order to project the distinctiveness of Bangladeshis to the globe. Conversely, the original Constitution of Bangladesh was secular in content. But, after Sheikh Mujibur Rahman was assassinated in 1975, Secularism was strategically removed from the Constitution in 1977 by the Fifth amendment. Moreover, Islam was declared as the state religion in 1988 by Hossain Muhammad Ershad. His government also decided to follow in the footstep of former President Ziaur Rahman. The late Bangladeshi scholar Muhammad Ghulam Kabir (2016) argued he 'successfully changed the image of Bangladesh from a liberal Muslim country to an Islamic country'. He strategically pushes the secular identity of the nation towards Islamic views by including 'Bismillahir Rahmanir Rahim' at the beginning of the constitution to convince the Muslims. On the contrary, Kabir (2016) points out that secularism is a hazy and misunderstood concept in Bangladesh. The Bengali term for it is dharma mirapekshata, or 'religious neutrality is often misunderstood with the concept of atheism or dhormohinota.' Thus, Lintner (1992) argues the word secularism has a different semantic meaning in Bangladesh than the meaning in the West. I added, this misconception of

meaning between secularism and atheism is politically constructed. As the father of the nation Sheikh Mujibur Rahman, states - "Secularism does not mean the absence of religion. Hindus will observe their religion; Muslims will observe their own; Christians and Buddhists will observe their religions. No one will be allowed to interfere in other's religions" (Islam, 2016). He also discouraged the political use of religion in this territory because Bangladesh has already suffered a lot because of unethical use of religion by the British and Pakistani rulers. Abul Kashem Fazlul Haq (2016) remarks, the abuse of religion in politics is the fundamental reason that causes conflict between religion and politics in Bangladesh. But the people are stuck between Muslim nationalistic Bangladeshi identity and the more secular, religiously and culturally pluralist Bengali identity (Islam, 2016).

However, it is commonly believed that there should be an identity beyond race, religion, gender, creed, ethnicity, caste and color which will unite people together. Therefore, the concept of nationalism and national community emerged to unite people for political, historical and social reasons (Khan, 2013). The Republic of Bangladesh has also seen two models of nationalism: i.e. Bengali nationalism, introduced during the liberation war and Bangladeshi nationalism, was introduced by the 1975 military government. Mohsin (2018) argues that in both instances, the minority people have been 'marginalized and alienated'. I added, the overlapping two nationalist identities produce sick political competition between parties. No matter what logic they provide, practically both doctrines are populist in nature because they believe in excluding people (like minorities, ethnic groups) from the mainstream society.

Yet in our context, the debate between Bengali nationalism and Bangladeshi nationalism is still going on. I argue, the Bangladeshi version of nationalism creates a rift in the community to build up a homogenous state based on geographical borders. That is the power of politics that can unite or divide a nation subjected to simple ideologies like nationalism, language, culture, race, color and many more. For example, Bengali nationalism helps to unify people for the freedom of Bangladesh. Lintner (1992) argues that the ideology of Bengali nationalism introduced by Awami League, was based on the language movement not religious identity. On the contrary, Bangladeshi nationalism is highly exclusionary that is created to outmatch the already established Bengali nationalism ideology.

Furthermore, Khan (2013) in his paper 'The Rift within an Imagined Community: Understanding Nationalism(S) in Bangladesh' argues that, "Bengali nationalism is a natural manifestation while Bangladeshi nationalism is an imposed one". But my research opposes this claim and states that there is no natural token of nationalism. Both Bengali and Bangladeshi nationalism are constructed concepts. Moreover, the idea to Bangladeshi nationalism influence the people of Bangladesh to come into a consensus that they are Bangladeshis and they have their separate identity along with their own nation. He wants the people to take part in building their own nation. Franda (1981) in her article 'Ziaur Rahman and Bangladeshi Nationalism' claims that introducing the concept of Bangladeshi nationalism but it is not perfectly defined yet. For his decision, the idea of Bengali nationalism immediately shifted to Bangladeshi nationalism and added to the constitution through the 5th amendment. People also liked the concept of Bangladeshi nationalism because it seems this ideology is giving them a more individual and unique identity and promoting Bangladeshi nationalism which was based on territorial attachment of Bangladeshis. Moreover, the ideology of Bangladeshi nationalism seems more appropriate at that time because it suits the Bangladeshis most and distinguishes them from the west- Bengal people of India.

We find the collision between Bengali nationalism and Bangladeshi nationalism still exists in our state. As we see, when Awami League holds the power, they talk about Bengali nationalism. But when BNP (Bangladesh National Party) came into rule, they eventually shifted the ideology into Bangladeshi nationalism. Now, the fundamental question is, who are the victims of this conflict? The mass people are the victims of this discord. They do not get any economic, social or political benefit from the two nationalism identities. But taking it as a survival strategy, the Bangladeshi people actually learn to go with the flow.

On the contrary, the concept of digital nationalism added a new dimension to the nationalism discussion. The rapid growth of digital media and social platforms create an influential unreal world where online spaces allow people who identify with the same national identity to connect, exchange information, participate in discussions and celebrate shared values and cultural traits. While print media once served as the primary medium for shaping national consciousness among mass. However, today's social media platforms fulfill a similar role by cultivating a sense of shared national dialogue. These digital

interactions amplify national sentiment by circulating shared stories, common ideals, and coordinated digital movements. For instance, in our 2024 student movement, Facebook and other social platforms played a huge role to unify students and common people and finally they succeeded brought down the 15 years regime of the former government.

No matter whether it is Bengali nationalism or Bangladeshi nationalism, but nationalist critic Eric Hobsbawm (1992) claims that the whole idea of nationalism is very complex and has no clear definition. Then George Orwell raises this question: which discourse is appropriate for nationalism? Whether history, political science, ethnography, geography or as an individual discourse. Like cultural studies, it is very difficult to establish nationalism as a separate discourse because it has no separate theory or clear definition to discuss. Now, one of the basic conditions of establishing a discourse is, it should have definition and certain theories to discuss. Yet, we read nationalism by keeping it under other discourses' lenses; ex. history, globalization, politics, economy and others. Yet the strength of national identity derived from the belief that state elites would be the agents of equitable development. Brown (1998) claims that psychological needs of individuals in search of an imagined kinship community are able to replicate the security of the family. The idea of nationalism is very much relevant to create an imagined connection among unknown people. Because we are living in the same country, means we all are Bangladeshis. No matter what the political parties say, whether it is Bengali or Bangladeshi nationalism, but we all are parts of the same nation. Still, the instrumentalization of religion and political parties are highly responsible for the unnecessary dispute of Bengali and Bangladeshi nationalism in our country.

Research Questions:

1. To what extent political parties are responsible for the emergence of Bangladeshi nationalism in our context?

2. How is religion politically instrumentalized to replace the concept of Bengali Nationalism from the Bangladesh territory and why?

Theoretical Framework

For the theoretical framework of this study, I am applying religious nationalism, secular nationalism, Gellner's theory of nationalism and nationalism and populism theory to analyze the implementation of Bangladeshi nationalism in our context. Basically, the theory of religious nationalism refers to the interdependence of nationalism to a dominated religious belief, dogma or affiliation and religion can be implemented in politics in two ways; 1. politicization of religion and 2. the influence of religion on politics. The ideology of religious nationalism can also be used against the idea of secular nationalism. On the other hand, secularism is a political ideology intended to erase the influence of religion from public and social life. Predominantly, a secular nation is a state that does not have any official religion and treat all its citizens equally. At the beginning, Bangladesh was proceeding to become a secular nation and stressing to language and cultural identity of people. Therefore, the first president of independent Bangladesh Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman decided to go with the concept of Bengali nationalism. But later on, this concept of secularism is misinterpreted with atheism and Bangladesh is gradually shifted to a Muslim- dominated country.

Nevertheless, Gellner (1983) defines nationalism as primarily a political principle which views politics and a nation as corresponding and analogous unit. He believes that nationalism strives for one culture or ethnicity under one roof or state. While establishing his ideology, he criticized a number of pre-established theories like naturality theory which considers nationalism as a natural, neutral, self- evident and self- governing ideology. Also, he criticized Elie Kedourie's idealist argument that state nationalism is not related to industrialization.

However, the populism theory is different. This theory prioritizes the division between the common people and the elites and is fundamentally exclusionary. Henceforth, critics view populist discourse on a vertical and nationalist discourse on a horizontal axis.

Data Collection

For this paper, I have selected three primary texts ex. 'Nations and Nationalism' by Eric Hobsbawm, 'Imagined Communities' by Benedict Anderson, *The Other Side of Silence* by Urvashi Butalia, *The Emergence of*

Nationalism in Bangladesh by Nehal Karim and other secondary resources, journals and articles to strength my claim. Basically, the intention of my research is to show how the nationalist identity of Bangladeshi citizens has been transformed by the parties to sustain their political power.

Rationale of the paper

This paper is intended to show the shifting of Bengali nationalism into Bangladeshi nationalism in Bangladesh through a political lens. It will also analyze how Bangladeshi political leaders overlap the idea of a secular nation with atheism for political benefits and prioritizes religious identity instead of cultural and language identity to create a clear distinction with the Indian West Bengal People. Moreover, along with the historical reasons, it will also analyze if the mass people is really benefited because of this shifting of national identity.

Critical Analysis

Hossain &Khan (2006) argues that the analysis of nationalism in Bangladesh enforces the idea that nationalism or national consciousness are politically determined concepts. Obviously, the conflict between Bengali nationalism and Bangladeshi nationalism proves that the political groups used to define nationalism from their own point of view. Ultimately, the mass people become the victims of this dispute. They often fall in identity crisis in spite of living in a sovereign country. On the contrary, nationalist theorists argue that a nation is the only rightful source of political power, although they ignore the consequences of misusing political power by the parties within a nation. Nehal Karim (1992) in his book argues that Bangladesh is struggling in political context to construct a definite nationalist identity for people because of boundless interruption of religion and inter-party philosophical conflict.

Meanwhile, Benedict Anderson (1983) viewed the nation as an imagined political community. He depicts a nation as a socially constructed community. But Partha Chatterjee (1994) opposes his idea by saying Anderson's idea is influenced by European concepts of nationalism. But India, Pakistan and Bangladesh are divided based on religion, language and culture diversity. Though he recently argued that the European convention of nationalism assists to shape the sub- continent Indian cultural discourse; Yet Ghosh (2015) recognized a gap between theory and practice of cultural nationalism in India.

She insisted with an example, becoming a Bhodrolok/ gentleman (wearing suit, tie, pant) is a European ideology imposed on Indian culture. It was introduced as a formal and necessary attitude in India. But the Indian people are originally psychic in nature. Therefore, a crisis occurs between the inner selves and outer selves among the sub- continent people to maintain a formal and spiritual life at the same time. In my point of view, they adjust to capitalist ideology and become materialistic with time. Thus, the conflict between inner and outer selves become blurred.

Benedict Anderson's (1983) concept of the 'imagined community' also suggested that digital platforms and social media offer new opportunities for shaping and reinforcing national identity. This is called digital nationalism as an evaluated concept because digital platforms like Facebook, Instagram, YouTube and others help craft and spread national narratives, symbols, and shared experiences and develop sense of national belonging. The netizens can give their opinions, provide digital voting and take part in nation development and constructive decision making. Historically, during the 18th and 19th centuries, the fusion of capitalism and print media brought a kind of nationalism that unified people across different social classes and encouraged them to work together and even make personal sacrifices for a common reason. According to Anderson's argument, in today's digital age, the government can use social media to control the dissemination of information, push forward specific national narratives, and rally support. At the same time, ordinary users can use these platforms to show national pride, participate in nation-building activities, or challenge an official decision. For example, through social media majority of Indians and their celebrities are showing support to 'Operation Sindoor' mission directed in Pakistan by Indian army. Though human activists, peace institutions and critics are criticizing the mission saying it will destroy the political peace in South Asia and it will also cause destruction of national identity of border people. The Bangladeshi citizens are also showing concern about their nation security. That is how digital media is impacting national decisions and giving people opportunities to speak up and put their opinions.

Florian Schneider (2021) theory of 'networked nationalism' explores how online interactions and the circulation of digital narratives shape national identities. It states that social media, search engines, and online forums work as tools for spreading nationalist ideologies, which is often done in behalf of

government and political party. Social networking also helps uniting people under a national agenda. Through participation in nationalist virtual communities, sharing posts, images, storytelling, and digital activism, individuals help to strengthen national consciousness online. Schneider also explains that digital platforms also play a key role in influencing and controlling national sentiment. For instance, our former government stayed in power for 15 years where social media plays a crucial role in spreading positive political news, big project announcement, development news to influence the users and gaining support for their political party

At the same time, digital platforms give individuals and communities space to question dominant narratives and promote alternative ideas of national identity. Through this, now internet users can speak for minority rights, question's national identity and its relevance, talks about rights of citizens, easy access to information and raise voice for proper help system and cyber security. Beside this, social media algorithms also contribute by creating echo chambers—digital environments that primarily expose users to views they already agree with. This can intensify nationalist sentiments and give rise to online communities centered on national pride (Sunstein, 2009). As a result, digital storytelling now becomes essential to building national narratives. Thus, governments and institutions utilize digital platforms to craft and disseminate stories about the nation's history, culture, and achievements. Through official websites and crafted contents, states try to shape citizens' perceptions and reinforce collective identity (Heang, 2024). For instance, our older government use official government websites, verified pages for their political campaigns and they highly use the concept of nation development and advancement as their political party's constructive achievement and exaggerating the information that their party leader and members are working hard for the benefit of people and development of nation infrastructure. Dhaka Metro Rail, Padma bridge, Dhaka Elevated Expressway were major projects of their advertisement. But they ignore the fact that most of the heavy projects are constructed in the capital city. The other divisions may have some development projects but districts, unions, villages are still left behind in construction, education, transportation and communication. So, according to governance and development perspective, their idea of development was not inclusive.

More broadly, national identity serves deeply personal and social functions for individuals within a community. National identity also provides individuals and social classes with a sense of belonging. This shared identity offers a powerful way for people to define themselves and understand their place in society through a collective narrative of 'who we are' (Anderson, 1983). Through shared values, symbols, and traditions—such as flags, currency, anthems, uniforms, monuments, and ceremonies; sense of collective identity and emotional connection. Have been injected in people's minds.

On the contrary, Anderson's interpretation reinforces the distinction between 'us' and 'them' where individuals view their community as separate from others (Anderson, 1983). Ethnicity and nationality are political constructions that support the idea of imagined communities. Even when people never meet, they share a mental image of belonging to the same nation. In digital spaces, where physical borders do not exist, this 'we' versus 'them' binary must be reinforced through language and interaction (Smith, 2020). As people increasingly identify as part of a national collective, the internet's structure—such as domain name systems, algorithmic biases, and national digital ecosystems—helps maintain and normalize these forms of nationalism.

However, nationalist policies can have serious consequences for minority groups, often leading to exclusion, discrimination, or even violence. Minority groups may face systematic exclusion in areas such as employment, housing, and education. In extreme cases, their fundamental freedoms like speech, religion, and cultural practice can be severely curtailed by nationalist governments that favor the interests of the majority. Nationalist ideologies tend to prioritize a dominant cultural identity, which can result in policies that marginalize those seen as outsiders. Research shows how such ideologies influence areas like citizenship law, language use, cultural expression, and minority rights.

Over the past several years, the growing influence of Islamism in Bangladesh has sporadically drawn attention from both regional and international analysts. The nationwide bomb attacks on 17 August 2005, when more than 450 bombs were detonated in under an hour by two banned Islamist militant groups. It was terrifying and also demonstrated the organizational strength and operational capability of these groups. In the following months, the country also witnessed four suicide bombings carried out by Jamaat-ul-Mujahideen Bangladesh (JMB

– the Assembly of Holy Warriors) and the Jagrata Muslim Janata Bangladesh (JMJB – the Awakened Muslim Masses of Bangladesh), resulted at least 30 dead and injured over 150 others. The victims of those attacks included members of the judiciary, law enforcement, and the press. After these violent events, the government is forced to formally recognize the presence of a domestic militant network and initiate a crackdown on these groups. By March 2006, security forces had arrested seven top leaders and hundreds of members associated with these militant outfits. The judicial process moved quickly, and by August 2006, a number of trials had concluded with convictions. In several cases, local courts sentenced 28 leaders to death, and by September 2006, the Supreme Court upheld the death sentences of seven of them. The executions of six militant leaders were carried out on 29 March 2007. So far, the Bangladeshi government has banned four of these organizations: Sahadat-i-Al-Hiqma (banned in February 2003), JMB and JMJB (banned in February 2005), and Harkat-ul-Jihad-al-Islam Bangladesh (HuJiB, banned in October 2005) (Riaz, 2010). Despite the confusion Bengali and Bangladeshi nationalism identity, this concept of Islamism enforces religious identity over language, culture and nation. The growth of Islamism concept not only connected to attacks or violence but it enforces Islamic laws to establish while set aside the secular views of nationalism. Truly, religion Islam talks and works for peace, but the misinterpretation of Islamic views causes violence and conflict among people and groups.

Nevertheless, several incidents have raised concerns about the diminishing secular character of the Bangladeshi state. In 2017, changes to school textbooks that removed secular content and the removal of a sculpture from the Supreme Court premises sparked debates among secular advocates. Critics questioned whether Bangladesh was evolving into a theological state, similar to Pakistan, or increasingly identifying as an Islamic country. These fears were amplified by a 2014 statement from Prime Minister Sheikh Hasina indicating that Bangladesh's administration could be guided by the Medina Charter—an Islamic constitution aiming to establish peace and unity under Quranic and Sunnah principles. The study by Abdul Wohab (2021) argues that religion and secularism have coexisted in Bangladesh in a unique syncretic tradition. Religion has long been embedded in the country's culture, compelling political parties to incorporate religious symbols into their platforms. Wohab commends that Bangladesh practices a form of secularism distinct from

Western models, allowing public religious expression while maintaining a degree of state-religion separation.

Nationalist ideologies have historically fueled violence and conflict, often targeting minority communities. Bangladesh has repeatedly drawn international criticism for its treatment of minority groups. A notable example occurred in October 2021 during Durga Puja, when at least 801 of the 32,000 makeshift temples were attacked (Al Jazeera, 2021). Between 2013 and 2021, Bangladesh witnessed over 3,600 attacks on religious minorities (bdnews24.com, 2021). On October 23, 2021, Bangladeshi female activists protested in Dhaka against a wave of violence targeting the Hindu community, including assaults on temples, shops, and homes (Sony Ramany/NurPhoto via Reuters). These attacks involved the arson and vandalism of 559 houses and at least 1,678 temples, idols, and places of worship. The violence was reportedly triggered by the placement of the Quran on the knee of a Hindu deity, Hanuman (bdnews24.com, 2021). Investigations suggest that these attacks were not religiously motivated, but driven by political and economic forces. Some allege that anti-government groups orchestrated the violence to destabilize the ruling administration (Panday, 2021). Conversely, others argue that the government has exploited such unrest to suppress opposition voices.

Additionally, in the 15th Amendment to the Constitution in 2011, the government officially labeled indigenous communities as ‘tribes’ ‘minor races’ and ‘ethnic sects and communities’ (Dhamai, 2014). The Small Ethnic Groups Cultural Institution Act 2010 refers to indigenous peoples in Bangladesh using the term ‘khudro nrigoshthhi’ (small ethnic groups). Historically, Bangladesh’s national identity was ‘Bangali’ but in 1977, under military rule, this was amended to ‘Bangladeshi.’ Later, the Supreme Court declared that while citizens would be identified as ‘Bangladeshis’ the people as a nation would be considered ‘Bangalee’ a classification formalized in Article 6.2 of the Fifteenth Amendment (2011). This classification effectively allows the state to impose a Bengali identity on ethnic minorities, overriding their distinct cultural and ethnic identities. In response to international attention on indigenous issues, including several UN Permanent Forum on Indigenous Issues (UNPFII) reports in 2011, the Bangladesh government rejected the term ‘indigenous’ asserting that no such people exist in the country (The Daily Star, 2011). Despite global recognition, the government continues to avoid acknowledging

indigenous status and instead uses reductive and outdated terms (Dhamai, 2014).

Once Bangladesh was a part of the same undivided India and then a subordinate state of Pakistan. Later, it became an independent and sovereign state in 1971 through a decisive battle of 9 months. Then the people of Bangladesh got a separate territory with an individual national identity. But I found, religion has a large influence while demonstrating this identity. Previously, it was decided Bangladesh would be a socialist- democratic country where the majority of people would be known as Bengali Muslims. But the fourth amendment of the constitution has changed the pre- decided structure and Bangladesh became a capitalist country with one party government system and it eventually dropped the idea of parliamentary democracy (Akbar, 2007). As a result, the nationality and national identity of the Bangladeshi people is also changed and they are recognized as Bangladeshi Muslims.

Basically, the first partition of the Indian subcontinent occurred based on the two-nation theory (which claimed that Hindus and Muslims were two different nations based on religion) in 1905. Though the decision was dismissed in 1909. On the one hand, this partition proposal of former Pakistani Governor General Mohammad Ali Zinnah increased animosity between two states' people and on the other hand, it affected the security of the minorities within the states (Mohsin, 2015). Moreover, it developed a religious conflict between two states' people and they started to believe themselves higher than the other religious group. From this point, the concept of religious nationalism grabs an important place in the Indian sub- content. Religious nationalism is a theory where the concept of nationalism and national identity will be highly influenced by a particular religion and community. In Bangladesh, Islam takes this place and influences the concept of Bangladeshi nationalism instead of Bengali nationalism. In Bangladeshi nationalism, religious and territorial identity gets more priority than cultural identity (Khan 316). Now, the majority of people will be known as Bangladeshi Muslims instead of Bengali Muslim. Although when Awami League got the power in 2009, they brought back the concepts of secularism and Bengali nationalism in the constitution. They tried to prioritize cultural identity instead of religious recognition in defining nationalism. Yet, a secular nation with less or no political influence of religion can't be created.

Nevertheless, we can't deny the influence of religion during the 1947 Pakistan-India partition. Urvashi Butalia brings the subjective experiences of 1947 partition in her book *The Other Side of Silence* after she realized that the partition was something more than a political division (6). I found, she introduces a new way to look at the already existed history and know the unknown. After the announcement of partition in 1947, many people were forced to leave their nation and shifted to a new state crossing the border. 'Ranamama' was such a victim of partition who later accepted Islam to live in Pakistan with her wife and daughters (pp. 30). Yet he belonged to a Hindu family first, but after her siblings left for India, he was left alone with his mother to take care of his grandfather' property. Like 'Ranamama', lots of people decided to change their religion as a part of survival strategy. Butalia (2014) argues that the mainstream history of partition is highly political. Her success is, she brings real- life subjective experiences of people who saw the partition which was literally ignored by the mainstream history. Because of the partition, the need for a new national identity has emerged. That time, we were part of Pakistan and were known as Bengali people who are fond of eating fish and rice whereas the Pakistani people prefers roti in their dinner. Yet after the independence of 1971, the new conflict over nationalism; whether it should be Bengali or Bangladeshi nationalism occurred in our context. During the post 1975 era, we are recognized as Bangladeshi Muslim instead of Bengali Muslim.

However, history can be a way to view nationalism from a different point of view. Swarupa Gupta (2006) argues that history can be a site for rethinking about 'jati' and brings that collective sense of people into light. We are known as Bengali Muslims community observing the political history of Awami League. Meanwhile, BNP defined our collective identity as Bangladeshi Muslims. Thus, the definition of 'jati' and collective identity has changed with time. Our identity has been transformed as Bangladeshi people from the Bengali community. The Awami League wants us to be recognized from our cultural perspective but the BNP tries to identify us based on our religion and territorial distinctiveness. Therefore, with the collective identity, the nationalism concept has also been shifted.

Meanwhile, the Rohingya crisis is deeply intertwined with nationalist sentiments particularly in Myanmar and within the Rakhine region. Bangladesh is a Muslim majority country whereas the opposite is seen in

Myanmar. Buddhist nationalism fueled by a long-standing animosity toward the Muslim minority in Myanmar. This animosity is also exacerbated by the Myanmar government's denial of Rohingya citizenship and the framing of them as illegal immigrants. Bangladesh has also played a prominent role in addressing the humanitarian fallout from the Rohingya crisis, which stems from systematic persecution in Myanmar. The Muslim Rohingyas become a huge burden for Bangladesh to bear. Solutions to this displacement crisis include diplomatic pressure on Myanmar to halt human rights abuses and efforts to ensure safe repatriation of refugees. However, these must be accompanied by psychological and social support for both the Rohingya and host communities in Bangladesh, who have borne the brunt of the refugee influx. According to Md. Ashraful Islam (2024), addressing the crisis requires a multi-dimensional, sustained, and collaborative global response. Also, legal, humanitarian, and diplomatic strategies must converge to ensure the well-being and protection of the displaced population. Continued international cooperation is essential to achieve durable solutions and improve the future of affected communities (Islam, 2024).

The Role of Religion Islam in the Construction of National Identity in Bangladesh

Keeping aside the cultural identity, religion Islam is widely used in Bangladeshi political discourse to control people by the political parties. But with an intention to create a secular nation, Sheikh Mujibur Rahman banned the activities of Religious parties (ie. Jamaat -e- Islami, Nizam-e- Islami) in 1972. Moreover, many other leaders agreed for separating religion and politics to build up a secular nation where every citizen (from different religious background) will get the equal rights (Maniruzzaman, 2015). Secularism theory supports the idea of nation with no state religion where every citizen will get the equal opportunity and right to live. No religious community will get extra priority in social, political, cultural and individual discourse. Bangabandhu Sheikh Mujibur Rahman clearly stated that secularism does not mean the absence of religion rather all segments of people should be able to perform their religion without any interference (Islam, 2018). The objective of this ideology is, nobody will attack others for their religious beliefs or trying to his or her views or them. Another concern was, nobody should get the chance to use religion as a political weapon. (Islam, 2018). But later on, the concept of secularism is misinterpreted with atheism. Beside this, the Bengali

cultural identity is overlapped by the Bangladeshi national identity. As a result, people become more convinced with the Bangladeshi nationalism ideology instead of the already established Bengali nationalism concept.
Fundamentally, the ideology of Bengali nationalism emerged because of colonial attitude of Pakistan towards Bengali people after the 1947 partition. This concept was mainly influenced by language and cultural unity. It is interesting to note that it was during this period that various political slogans expressing Bengali nationalist sentiments became extremely popular. For example, slogans like Joy Bangla (Victory to Bangla), Amar desh, tomar desh/Bangladesh Bangladesh (Your home and mine is Bangladesh), Ekti Bangalir Jibon (every single letter of the Bangla alphabet epitomizes the life of a Bengali), Jago Jago Bangalee Jago (Wake up, Bengalis), "Bir Bangalee Astro Dhoro Bangladesh Swadhin Koro (Take up arms, heroic Bangalis/bring independence to Bangladesh) and more (Anisuzman, 2016). Plus, the growth of national consciousness among the Bengali Muslims helps them to get a separate identity and a sovereign nation. Chowdhury (2009) agrees that their past experience plays an important role in shaping the pattern of external behavior even in contemporary times. For example, Bangladeshi people learned to respect their language as well as their country. Moreover, a sense of self- dignity and self- right turn up in them.

However, the introduction of Bangladeshi nationalism to separate the Bangladeshis from the West Bengal people. Mahmud Hasan Khan (2013) argues that Bengali nationalism was a natural concept whereas Bangladeshi nationalism was imposed. But I argue that both the nationalism concepts are politically constructed. Because both political groups have separate objectives behind introducing these ideologies. They both are populist in nature because the both abstractions ignore the minority of people living in the territory. Absar (2014) proclaimed that Bangladeshi nationalism derived from its predominant Muslim heritage and tradition the former president used religion Islam as an excuse to promote the Bangladesh nationalist ideology. However, the inclusion of ‘Bismillahir Rahmanir Rahim’ in the beginning of the constitution and the announcement of Islam as state religion of Bangladesh made the grounds for a new nationalist identity. As people started to believe that Bangladesh is a Muslim country and they need a different identity as citizens of Bangladesh so that people won’t confuse them with the West Bengal people. Also, if they are identified as Bangladeshi Muslims, their religious identity will

also be recognized around the world. Although this kind of thinking is indirectly implemented by the ruling party in the heads with an objective to maximize the mass support for the legal shifting of nationalism ideology. Because if they had decided it within the parliament only, the opposition party and the people might blame them as autocratic rulers. However, Bangladesh is known as a democratic country by birth. Also, autocracy is constitutionally banned and the government must be democratic. Therefore, the ruling party used media, religion Islam and the clever inducement of a distinct identity from the Indian community as great weapons to manipulate the mass in behalf of Bangladesh nationalism.

Still, the false dichotomy between Bengali and Bangladeshi constructed by the ruling elites exists in the current Bangladesh. Bengali language and culture are integral parts of independent Bangladesh. This study argues that neither people nor the state become benefited because of two different nationalism concepts rather it only creates confusion. How? We are constitutionally known as Bengali people but in our legal documents i.e. passport, birth certificate, we are recognized as Bangladeshi people. Ironically, this confusion does not bring any good result, economic development or effective consequences for us. To my understanding, the Bangladeshi nationalism concept has been brought for political competition and the sake of a lengthy regime. In a democratic framework, if the people are satisfied with the decisions of the government, the regime will definitely sustain and people always ask for something new from the politicians. If we democratically choose a party, what they will get us? The introduction of a new nationalism concept has been proved an effective decision by the Zia government to convince the masses.

Findings and Discussion

This paper found that Bangladeshis are moderate Muslims and the replacing of Bengali nationalism with Bangladeshi nationalism is a political construction to convince the common people because the military government tried so hard to sustain their regime longer. They even do not hesitate to abuse the religion for the sake of their regime. Their goal was to introduce something new to the people so that they became satisfied with the ruling party and not to dare to question their legitimacy. However, the concept of Bengali nationalism is connected with culture and the idea of Bangladeshi nationalism is enforcing the territorial identity. Although the political parties didn't hesitate to use

national identity and its confusion for their benefit. But they do not bother about the benefit of people. Like nationalism, nation, national identity is also a constructed ideology. If there is no nationalism, still we are Bangladeshi citizens. Therefore, nationalism is not the fundamental concept but the false dichotomy created with Bangladeshi and Bengali nationalism to confuse the mass. To forsake from the conflict of Bengali and Bangladeshi nationalism, Awami League had an opportunity to remove 'Bismillahir Rahmanir Rahim' from the constitution to make it secular and a constitution for all believers. But the government decided to stick with it.

Conclusion

To conclude, my paper agrees that using religion and religious beliefs to manipulate common people is not acceptable at all. The forceful sifting of Bengali nationalism to Bangladeshi nationalism as an ideology and legalizing it with no time, can also be questioned. From a democratic- secular nation, Bangladesh is consciously transformed into a Bengali- Muslim country within a few years of independence because of active religious policies of the political groups in power. Political parties and their internal conflicts are highly responsible for this shifting of nationalist ideology. Not only that, religion is used as an instrument to influence the masses to accept the new ideology and recognize themselves as Bangladeshi Muslim community and district themselves from the Indian Bengali Hindu community. But West- Bengal and Bangladesh people speak in Bengali but the influential logic behind this shifting is- Bangladeshi people will be recognized for their state. After the territorial identity overlapping, the fundamental principle of Bengali nationalism in the constitution and the Bangladeshi national identity become two separate concepts. Previously, Bengali nationalism and national identity were the same. There was a match between the constitutional principle and practical identity. Although the new nationalism concept prioritizes land identity instead of language recognition. When the 1952 language movement occurred, it was for Bengali nationalism and identity but the former military government announced that since the ethnic minority people live in this land but their mother tongue is different, so the national identity should be considered Bangladeshi, not Bengali. In this way, those indigenous and ethnic people can also be incorporated. But the reality haunts, because the Bangladeshi nationalism identity still can't ensure equal rights for those ethnic- minority people. They are bearing the Bangladeshi national identity

but are often discriminated against in diverse situations and having rights. Thus, the shifting of Bengali nationalism to Bangladeshi nationalism is merely a political construction, bringing no major changes to our nation.

References

Absar, N. (2014). 'Muslim Identity, Bengali Nationalism: An Analysis on Nationalism in Bangladesh'. *Academic Journal of Interdisciplinary Studies*. *https://doi.org/10.5901/ajis.2014.v3n1p439*

Anderson, B. (1983). *Imagined Communities: Reflections on the Origin and Spread of Nationalism*. Verso.

Brown, D. (1998). 'Why is the Nation-State so Vulnerable to Ethnic Nationalism?Nations and Nationalism'. 4(1), 1–15. *https://doi.org/10.1111/j.1354- 5078.1998.00001.x*

Chaudhury, D. R. (2020). 'The Resilience of Secularism in Bangladesh'. *Indian Foreign Affairs Journal*, 15(3), 254–258. *https://www.jstor.org/stable/48630186*

Chowdhury, I. A. (2009). *The Roots of Bangladeshi National Identity: Their Impact on State Behavior*. 63.

Das, T. K., Bhattacharyya, R., & Sarma, P. K. (2020). 'Revisiting geographies of nationalism and national identity in Bangladesh'. *GeoJournal*. *https://doi.org/10.1007/s10708-020-10305-1*

Franda, M. (1981). 'Ziaur Rahman and Bangladeshi Nationalism'. *Economic and Political Weekly*, 16(10/12), 357–380. *http://www.jstor.org/stable/4369609*

Gellner, E. (1983). *Nations and Nationalism*. Cornell University Press.

Gopal Balakrishnan, Richard, B., & Verso. (2012). *Mapping the nation*. Verso.

Liah Greenfeld. (1992). *Nationalism: five roads to modernity*. Harvard University Press.

Gupta, S. (2007). 'Samaj, Jati and Desh'. *Studies in History*, 23(2), 177–203. *https://doi.org/10.1177/025764300602300201*

Hobsbawm, E. J. (1992). *Nations and Nationalism since 1780: Programme, Myth, Reality*. Cambridge University Press.

Hossain, I., & Khan, M.H. (2006). 'The Rift Within an Imagined Community: Understanding Nationalism(s) in Bangladesh'. *Asian Journal of Social Science*, 34, 324-339.

Islam, MD. D. (2016). 'Religion and Politics: Bangladesh Perspective' [Review of Religion and Politics: Bangladesh Perspective]. *International Journal of Management and Humanities*, 2(4), 1–5.

Islam, M. M. (2018). 'Secularism in Bangladesh: An Unfinished Revolution'. *South Asia Research*, 38(1), 20-39. *https://doi.org/10.1177/0262728017745383*

Karim, N. (1992). *The Emergence of Nationalism in Bangladesh*.

Sheikh, M. Z. H., & Ahmed, Z. S. (2019). 'Military, authoritarianism and islam: A comparative analysis of bangladesh and pakistan'. *Politics and Religion*, 13(2), 1–28. *https://doi.org/10.1017/s1755048319000440*

Toor, S. (2009). 'Containing East Bengal'. *Cultural Dynamics*, 21(2), 185–210. *https://doi.org/10.1177/0921374008105070*

Urvashi, B. (2014). *The other side of silence voices from the partition of India*. New Delhi: [U.A.] Penguin Books.

শহিদুল হাসান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি প্রাক-আধুনিক বঙ্গের ভূ-রাজনৈতিক ইতিহাস, সমাজ-সংস্কৃতি, অর্থনীতি, মুদ্রা ও শিলালিপি নিয়ে গবেষণা করেন। তাঁর পিএইচডি গবেষণার শিরোনাম ছিল 'Making and Re-making on Geo-political History of Bengal (c. 1200–1800 CE)'। ২০০৯ সালে তিনি এই বিভাগে প্রভাষক হিসেবে যোগ দেন এবং ২০২৩ সালে সহযোগী অধ্যাপক পদে উন্নীত হন। তিনি সুলতানি আমলের বাংলা পাণ্ডুলিপি ও ফারসি লিপিতে রচিত গ্রন্থ নিয়ে কাজ করছেন, যার মধ্যে রয়েছে *ফাতিমার সুরতনামা*, *কাশেমের লড়াই* ও *নিকাহ মঙ্গল*। তাঁর গবেষণাকর্ম ইতিহাসচর্চায় নতুন দিগন্ত উন্মোচন করছে।

মোহাম্মদ আজম ২৩শে আগস্ট, ১৯৭৫ সালে নোয়াখালীর হাতিয়ায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বাংলা বিভাগে এমএ এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে অধ্যাপক হিসাবে কর্মরত। তাঁর পিএইচডি গবেষণার বিষয় 'বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও বি-উপনিবেশায়ন'। এছাড়া তিনি প্রবন্ধ ও সমালোচনা লিখে থাকেন। আগ্রহের বিষয় সাহিত্য, নন্দনতত্ত্ব, ইতিহাস, রাজনীতি ও সংস্কৃতি অধ্যয়ন। অনুবাদ করেছেন গুরুত্বপূর্ণ কিছু তাত্ত্বিক রচনা। প্রকাশিত গ্রন্থ: *বাংলা ভাষার উপনিবেশায়ন ও রবীন্দ্রনাথ*, *বাংলা ও প্রমিত বাংলা সমাচার*, *কবি ও কবিতার সন্ধানে*, *হুমায়ূন আহমেদ: পাঠপদ্ধতি ও তাৎপর্য*, *বিষয় সিনেমা: তিনটি অনূদিত প্রবন্ধ*, *সাংস্কৃতিক রাজনীতি ও বাংলাদেশ*, *মিখাইল বাখতিন: যাপিত জীবন ভাষা ও উপন্যাস*, *চিন্তার মুসিবত: তালাল আসাদের বাতচিত*, *সাংস্কৃতিক পুঁজি ও নতুন বাংলাদেশ*। সম্পাদনা করছেন চিন্তামূলক প্রবন্ধের কাগজ *তত্ত্বতালাশ*। তিনি এ গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক।

রাফাত আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগে শিক্ষকতা করেন। 'বাংলাদেশের উপন্যাসে সাতচল্লিশের রাজনীতি' বিষয়ে তিনি পিএইচডি করেছেন। বাংলাদেশের সাহিত্যের নব্যইতিহাসবাদী পাঠ এবং সাহিত্যে আর্থরাজনৈতিক ও সাংস্কৃতিক বাস্তবতার অনুন্ধান তাঁর প্রধান আগ্রহের বিষয় ও গবেষণাক্ষেত্র। রাফাত আলম বাংলা ভাষায় সৃজনশীল ও মননশীল গদ্যচর্চা করেন। *রবীন্দ্রসৃজনে বাংলাদেশ* (আদর্শ, ২০২০) ও *বাংলাদেশ পাঠ: সাহিত্যিক ও সাংস্কৃতিক ক্রিয়াশীলতার অনুষঙ্গে* (ইউপিএল, ২০২৫) তাঁর উল্লেখযোগ্য প্রবন্ধের বই। তিনি বেশ কিছু বই সম্পাদনা করেছেন। এছাড়া তিনি উল্লেখযোগ্য সংখ্যক গবেষণাগ্রন্থের ভাষাশৈলী সম্পাদক হিসেবে কাজ করেছেন। ড. রাফাত গবেষণা-প্রবন্ধ ক্যাটাগরিতে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের 'কলা অনুষদ ডিন্‌স অ্যাওয়ার্ড ২০২২' পেয়েছেন।

রঙিলী বিশ্বাস একজন দ্বিভাষিক লেখক এবং গায়ক। গল্প-উপন্যাস লিখছেন বহুদিন ধরে। ২০০৫-এ তাঁর প্রথম উপন্যাস *হেপাজতে নিখোঁজ জাহাঙ্গীর* (দে'জ পাবলিশিং') প্রকাশিত হয়। ২০১৫ সালে 'বাংলা আকাদেমি শান্তি সাহা স্মারক' পুরস্কার পায় এই বইটি। ২০০৫ সালে 'কথা' পুরস্কারে সম্মানিত হয় তাঁর গল্প 'তাল-হেতালের বয়াত'। ২০১৬ সালে প্রকাশিত হয় তাঁর প্রথম গল্পগ্রন্থ *গণশুনানির পরে*। তাঁর সম্পাদিত বই-এর সংখ্যা তিন। 'আইসল্যান্ড রাইটার্স রিট্রিট' (২০২৩)-এ নমিনেশন-প্রাপ্ত এবং 'কান সেরাত রাইটার্স রেসিডেন্সি' (স্পেন, ২০১৭)-পুরস্কারপ্রাপ্ত রঙিলীর সাম্প্রতিকতম প্রকাশনা: গুস্তাভ ফ্লোবের-এর জীবন ও ঊনবিংশ শতাব্দীর ফরাসি সাহিত্যভিত্তিক উপন্যাস *দ্য সারক্রস গ্রাস*।

তিন দশকাধিক কাল রঙিলী বিভিন্ন পত্র-পত্রিকায় এবং সংবাদপত্রে গল্প, উপন্যাস, কবিতা, ট্র্যাভালোগ, গ্রন্থ-সমালোচনা, স্মৃতি-আখ্যান, ক্রিয়েটিভ নন-ফিকশন প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন বাংলা ও ইংরেজি দু'ভাষাতেই। তার মধ্যে রয়েছে (বাংলায়) 'পরিচয়', 'পৃথিবী একটি গ্রামের নাম', 'পরের ট্রাম','বারোমাস', 'অনুষ্টুপ', 'দিশা সাহিত্য', 'প্রতিবেশ সাহিত্য', 'The Telegraph', 'Plum Tree Tavern', 'Danse Macabre', 'Setu', 'Ariel Chart', 'Down in the Dirt', 'Café Dissensus', 'Raiot', 'thespace.ink', 'Mad in India (Tendance Floue Editions)', 'Humanities Underground', 'Yawp Journal', 'RIC Journal', 'The Antonym', 'Jadavpur Journal of Comparative Literature', 'Wion'| পেশায় অর্থনীতিবিদ রঙিলী রাজনৈতিক, সরকারি এবং উন্নয়ন অর্থনীতি নিয়ে দেশ-বিদেশের গুরুত্বপূর্ণ জার্নাল এবং বইতে প্রকাশ করেছেন বেশ কিছু গবেষণাপত্র। দেশ-বিদেশের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ অনুষ্ঠানে রঙিলী গান গেয়েছেন এবং প্রকাশ করেছেন বেশ কয়েকটি গানের অ্যালবাম।

এম আবদুল আলীম ইতিহাস ও ঐতিহ্যসন্ধানী গবেষক। বাংলা ভাষা ও সাহিত্যে স্নাতক (সম্মান), স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে। বিসিএস শিক্ষা ক্যাডারের কর্মকর্তা হিসেবে ঢাকা কলেজসহ দেশের ঐতিহ্যবাহী কলেজসমূহে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। এই বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের প্রতিষ্ঠাকালীন চেয়ারম্যান এবং মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছেন। তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থসংখ্যা চল্লিশটি। উল্লেখযোগ্য গ্রন্থগুলো হলো : *ভাষা আন্দোলন কোষ*, *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলন জেলাভিত্তিক ইতিহাস*, *ভাষা আন্দোলনের জানা-অজানা ইতিহাস*, *ভাষা আন্দোলনে কংগ্রেস*, *ভাষা আন্দোলনে নিম্নবর্গ ও অন্যান্য প্রসঙ্গ*, *বঙ্গবন্ধু ও ভাষা আন্দোলন*, *ভাষা আন্দোলনে মওলানা ভাসানী*, *ভাষা আন্দোলনে তাজউদ্দীন আহমদ*, *ভাষা আন্দোলনে আবদুল গাফফার চৌধুরী*, *আওয়ামী লীগ ও ভাষা আন্দোলন*, *রাষ্ট্রভাষা আন্দোলনে ছাত্রলীগের ভূমিকা* প্রভৃতি।

দেশি-বিদেশি জার্নালে তাঁর প্রকাশিত প্রবন্ধসংখ্যা পঞ্চাশোধিক। আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা ইনস্টিটিউটের ফেলো হিসেবে ভাষা আন্দোলন নিয়ে গবেষণা করেছেন। গবেষণার স্বীকৃতি-স্বরূপ কালি ও কলম তরুণ কবি ও লেখক পুরস্কারসহ নানা পুরস্কার ও সম্মাননা লাভ করেছেন। তাঁর জন্ম ১৯৭৬ সালের ১ ডিসেম্বর, জন্মস্থান পাবনার সাঁথিয়া উপজেলার গৌরীগ্রাম।

শান্তা পত্রনবীশ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শিক্ষকতায় নিয়োজিত। একই বিভাগ থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর শেষে 'বাংলাদেশের সাংস্কৃতিক আন্দোলনে নারী: ১৯৫২-৭১' শীর্ষক গবেষণা অভিসন্দর্ভের জন্য এমফিল ডিগ্রি অর্জন করেছেন। তিনি নারীর ইতিহাস, সাংস্কৃতিক জাগরণ এবং মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে অনুসন্ধিৎসু। এ সকল বিষয়ে স্বীকৃত জার্নালে তার বেশ কিছু গবেষণা-প্রবন্ধ এবং গ্রন্থ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি বিভিন্ন বিদ্বৎসভার সঙ্গে যুক্ত।

মিলটন কুমার দেব ইতিহাস বিষয়ে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর সম্পন্ন করেছেন। এরপর ইউজিসি ফেলোশিপ নিয়ে পিএইচডি সম্পন্ন করে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করছেন। পাশাপাশি অতিথি শিক্ষক হিসেবে তিনি ব্র্যাক বিশ্ববিদ্যালয়, ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, ইবাইস বিশ্ববিদ্যালয়, ইউনিভার্সিটি অব এশিয়া প্যাসিফিকসহ নানা বিশ্ববিদ্যালয়ে অধ্যাপনা করেছেন। গবেষণা, পাঠদান ও

নিঃস্বার্থ সেবাদান তাঁর চিন্তা, আনন্দ ও উদ্যমের উৎস। বর্তমানে তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রতিষ্ঠিত বিবেকানন্দ ইতিহাস ফান্ড-এর মুখ্য সমন্বয়ক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। এছাড়া ড. দেব বিভিন্ন সামাজিক, সাংস্কৃতিক ও মূল্যবোধভিত্তিক শিক্ষা কার্যক্রমের সাথে সক্রিয়ভাবে যুক্ত। নিম্নবর্গের ইতিহাস, সশস্ত্র প্রতিরোধ আন্দোলন, কৃষক অসন্তোষ, ঔপনিবেশিক শাসনামলের অর্থনীতি, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ও বিবেকানন্দ ভাবান্দোলন তার অনুধ্যান ও গবেষণার কেন্দ্রীয় বিষয়। তাঁর একক ও যুগ্মভাবে লিখিত এবং সম্পাদিত গ্রন্থ সংখ্যা ১৪টি। এছাড়া দেশি-বিদেশি জার্নালে অসংখ্য গবেষণা-প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। *রমেশচন্দ্র মজুমদার: জীবন ও সৃজন*, *ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়: বাংলাদেশের বাতিঘর*, *বিবেকানন্দ: আলোর পথযাত্রী* তাঁর উল্লেখযোগ্য গবেষণা-গ্রন্থ।

শামীম আরা জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা বিভাগের অধ্যাপক। তিনি এই বিষয়ে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেছেন। দীর্ঘদিন ধরে বাংলা ভাষা, সাহিত্য, ঐতিহ্য, সংস্কৃতি বিষয়ে তিনি শিক্ষকতা ও গবেষণা করছেন। বাংলা সংস্কৃতির গভীর অন্তর্দৃষ্টি এবং ভাষার বিবর্তন ও আধুনিক প্রয়োগ নিয়ে তিনি কাজ করে আসছেন।

চাঁদ সুলতানা কাওসার বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতক (২০০৩) স্নাতকোত্তর (২০০৪), এমফিল (২০১৩) এবং পিএইচডি (২০২১) ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র ঢাকা শহরের অর্থনৈতিক, চিকিৎসা ও প্রতিষ্ঠানিক ইতিহাস। তাঁর প্রকাশিত গবেষণাপত্রের মধ্যে রয়েছে *ঢাকা মেডিকেল কলেজের ইতিহাস*, *চিকিৎসাজ্ঞান ও প্রতিষ্ঠান গঠনের পটভূমি* এবং *শিক্ষক লাউঞ্জের ঐতিহাসিক গুরুত্ব*। তিনি গবেষণা ও শিক্ষায় অঙ্গীকারবদ্ধ একজন নিষ্ঠাবান শিক্ষক।

শাওন আকন্দ (জ. ১৯৭৬, কুষ্টিয়া) মূলত চিত্রশিল্পী ও গবেষক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের চারুকলা অনুষদে পড়ালেখা করেছেন। প্রাক-ঔপনিবেশিক জ্ঞান ও শিল্পকলা বিষয়ে আগ্রহী। বাউল সাধুসঙ্গের ধারণা থেকে অনুপ্রাণিত হয়ে *ক্র্যাক ইন্টারন্যাশনাল আর্ট ক্যাম্প* প্রতিষ্ঠা করেছেন কুষ্টিয়ায় ২০০৭ সালে। এছাড়া, ২০১৬ সালে কুষ্টিয়ায় গবেষণা কেন্দ্র ও সংগ্রহশালা *অশ্রু আর্কাইভ* প্রতিষ্ঠা করেছেন। ঢাকার ঐতিহ্যবাহী ও সমকালীন শিল্পকেন্দ্র–*যথাশিল্প*-এর সহ-প্রতিষ্ঠাতা। উল্লেখযোগ্য প্রকাশনা: *Descriptive Catalogue of Folk Art in the Bangladesh National Museum*, *বাংলাদেশের তাঁতশিল্প*, *বাংলাদেশের লোকশিল্পের রূপরেখা*, *ধামরাই জনপদের কাঁসা-পিতলশিল্প*। তিনি ফ্রান্স থেকে ২০২০ সালে 'এফিল্ড ফেলোশিপ' লাভ করেছেন। অন্যান্য স্বীকৃতি: প্রথম আলো বর্ষসেরা বই ১৪২৪, গণেশ হালুই বেঙ্গল গবেষণা বৃত্তি ২০২৩।

ফারহানা আজিজ ১৯৮৭ সালে কক্সবাজার জেলার চকরিয়া উপজেলার ভেওলা মানিকচর গ্রামে জন্মগ্রহণ করেন। তিনি কৃতিত্বের সাথে ২০০৩ সালে এসএসসি এবং ২০০৫ সালে এইচএসসি পাশ করেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে তিনি স্নাতক এবং স্নাতকোত্তর উভয় পরীক্ষায় ১ম স্থান লাভ করেন। ২০১৭ সালে তিনি একই বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে প্রভাষক পদে যোগাদান করেন। ইতোমধ্যে বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় জার্নাল অব্ আর্টস অ্যান্ড হিউম্যানিটিজ, আরকাইভস অব বাংলাদেশ হিসট্রি ট্রাস্ট, বঙ্গীয় ইতিহাস সমিতি কলকাতা, পশ্চিমবঙ্গ আঞ্চলিক ইতিহাস ও লোকসংস্কৃতি চর্চা কেন্দ্র থেকে তার প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়। এছাড়া বেশ কিছু প্রবন্ধ প্রকাশের জন্য বিভিন্ন জার্নালে গৃহীত হয়েছে।

২০২৪ সালে তিনি চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় থেকে 'বাংলাদেশের স্বাধিকার আন্দোলনে চট্টগ্রামের সংবাদপত্র (১৯৪৮-১৯৭১)' শীর্ষক শিরোনামে এমফিল ডিগ্রি লাভ করেন। বর্তমানে তিনি একই বিভাগে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন।

মো. মোফিজুর রহমান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের মাস কমিউনিকেশন অ্যান্ড জার্নালিজম বিভাগে অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে সাংবাদিকতা ও গণযোগাযোগে স্নাতক (১৯৯৩) ও স্নাতকোত্তর (১৯৯৪) ডিগ্রি অর্জন করেন; ২০০৪ সালে ডেনমার্কের ইউরোপিয়ান ফিল্ম কলেজ থেকে ফিল্ম ও টেলিভিশনে পোস্ট গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা, ২০০৬ সালে নেদারল্যান্ডসের ইন্টারন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব সোশ্যাল স্টাডিজ থেকে উইমেন, জেন্ডার অ্যান্ড ডেভেলপমেন্টে বিশেষায়িত ডেভেলপমেন্ট স্টাডিজে মাস্টার্স এবং সর্বশেষে ২০১৮ সালে নরওয়ের ইউনিভার্সিটি অব বার্গেন থেকে মিডিয়া স্টাডিজে পিএইচ.ডি. ডিগ্রি অর্জন করেন। উন্নয়ন যোগাযোগ, জলবায়ু সাংবাদিকতা, জেন্ডার ও গণমাধ্যম এবং সাংবাদিকতার নৈতিকতা তাঁর গবেষণার মূল ক্ষেত্র। তিনি *Negotiating Journalism: Core Values and Cultural Diversities* (Nordicom, 2017) এবং *Gonomadhom o Jonosomaj* (Srabon, 2002) গ্রন্থের সহ-সম্পাদক। তাঁর গবেষণা প্রকাশিত হয়েছে *South Asia Research, Journal of Applied Journalism and Media Studies*, এবং *The Journal of Development Communication*-এর মতো আন্তর্জাতিক জার্নালে। গণমাধ্যম কীভাবে সমাজে মত ও নীতি গঠন করে, তা বিশ্লেষণের মাধ্যমে তিনি নৈতিক, অন্তর্ভুক্তিমূলক ও দায়িত্বশীল সাংবাদিকতা বিকাশে অবদান রেখে চলেছেন।

মোছাঃ নাসরিন আক্তার আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশ (এআইইউবি)-এর মিডিয়া এন্ড ম্যাস কমিউনিকেশন বিভাগে সহকারী অধ্যাপক হিসেবে কর্মরত আছেন। তাঁর গবেষণার বিষয় সমাজ, গণমাধ্যম এবং প্রযুক্তি। তিনি আট বছরেরও বেশি সময় ধরে সাংবাদিকতা, যোগাযোগ ও মিডিয়া স্টাডিজ পড়াচ্ছেন। ভবিষ্যৎ সাংবাদিক ও মিডিয়া পেশাজীবীদের দক্ষ করে তুলতে তিনি নিবেদিত। তাঁর গবেষণার মূল আগ্রহ প্রযুক্তি, সমাজ ও গণমাধ্যমের আন্তঃসম্পর্ক। ইন্টারন্যাশনাল জার্নাল অব সোশাল কমিউনিকেশন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান পত্রিকাসহ বিভিন্ন জার্নালে তার গবেষণা নিবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। তিনি *AMCR* (International Association for Media and Communication Research), *APPRA* (Asia-Pacific Peace Research Association) এবং *BELTA* (Bangladesh English Language Teachers Association)-সহ জাতীয় ও আন্তর্জাতিক বিভিন্ন সম্মেলনে গবেষণা-নিবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

সানজিদা মুস্তাফিজ বাংলাদেশের ভোলা জেলায় জন্মগ্রহণ করেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ হতে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর পর্যায়ে মেধা তালিকায় প্রথম স্থান অর্জন করেন। বর্তমানে তিনি বাংলাদেশ উন্মুক্ত বিশ্ববিদ্যালয়ের সামাজিক বিজ্ঞান, মানবিক ও ভাষা স্কুলে ইতিহাস বিষয়ে সহকারী অধ্যাপক পদে কর্মরত আছেন। গবেষণায় তার আগ্রহের বিষয় আইনের ইতিহাস। রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ক্ষেত্রে ঐতিহাসিক প্রেক্ষাপটে আইন কিভাবে প্রভাব বিস্তার করে এবং পরিবর্তনে সহায়ক ভূমিকা পালন করে তা খুঁজে বের করাই তার গবেষণার উদ্দেশ্য। ইতোমধ্যে তার আইনের ইতিহাস সংশ্লিষ্ট প্রায় ২০টি গবেষণা-প্রবন্ধ বিভিন্ন স্বনামধন্য জার্নালে প্রকাশিত হয়েছে। তাছাড়া ইতিহাস বিষয়ে পাঠ্য তার রচিত তিনটি গ্রন্থ রয়েছে।

ফোরকান আহমেদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের প্রভাষক। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে ২০১৮ সালে অনার্স ও ২০১৯ সালে মাস্টার্স ডিগ্রি অর্জন করেন। 'ঔপনিবেশিক ও পোস্ট-কোলোনিয়াল বাংলা ভাষা ও সংস্কৃতি' (*Bangladesh Historical Studies*, 2024), 'ঔপনিবেশিক বাংলার বাবু শ্রেণি' (*Itihas Samiti* পত্রিকা, ২০২৪) ও 'ফারায়েজি আন্দোলন' (*Bangladesh Historical Studies*, 2023) ইত্যাদি লেখা প্রকাশিত হয়েছে।

সুস্মিতা রানী দাস ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ইতিহাসে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জন করেছেন। বর্তমানে নোয়াখালী বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের ইতিহাস চর্চায় তাঁর আগ্রহ। গণহত্যা নিয়ে তাঁর দু'টি বই প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া গণহত্যা, শহিদ বুদ্ধিজীবী, মুক্তিযুদ্ধে নারীর অংশগ্রহণ ও স্থানীয় ইতিহাস নিয়ে তার বেশ কয়েকটি গবেষণা প্রবন্ধ রয়েছে।

আনন্দ বিকাশ চাকমা বর্তমানে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনায় নিয়োজিত আছেন। ২০১৯ সালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগ থেকে অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেনের তত্ত্বাবধানে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। তাঁর প্রথম গবেষণা প্রবন্ধ *বাংলাদেশ এশিয়াটিক সোসাইটি পত্রিকা*র হীরক জয়ন্তী সংখ্যায় ২০১১ সালে প্রকাশিত হয়। এরপর বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি পত্রিকা, পাকিস্তান হিস্টোরিক্যাল সোসাইটি পত্রিকা, পশ্চিমবঙ্গের বঙ্গীয় *ইতিহাস সমিতি পত্রিকা*, চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের *সমাজবিজ্ঞান অনুষদ পত্রিকা*সহ বিভিন্ন গবেষণা পত্রিকায় প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। ২০২১ সালে তাঁর প্রথম গবেষণা গ্রন্থ *কার্পাসমহল থেকে শান্তিচুক্তি: পার্বত্য চট্টগ্রামে রাষ্ট্রীয় নীতির ইতিহাস* শিরোনামে দি ইউনির্ভার্সিটি প্রেস থেকে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের অধ্যাপক ড. আশফাক হোসেনের (বর্তমানে বিভাগীয় সভাপতি ও কারাসের পরিচালক) সাথে কো-অথর হিসেবে অর্থাৎ যৌথভাবে লিখিত দুটি বুক চ্যাপ্টার যথাক্রমে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের শতবর্ষ পূর্তি উপলক্ষে প্রকাশিত *শতবর্ষে ইতিহাস বিভাগ: অতীতের আলোয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* ভারতের আসাম বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক সজল নাগ কর্তৃক সম্পাদনায় লন্ডনস্থ বিশ্বখ্যাত প্রকাশনা সংস্থা রাউটলেজ থেকে প্রকাশিত হয়েছে ২০২৩ সালে। ড. আনন্দ বিকাশ চাকমা গবেষণাসূত্রে দেশ-বিদেশের বিভিন্ন বিদ্বৎসমাজ ও গবেষণা প্রতিষ্ঠানের সাথে যুক্ত আছেন। তিনি বাংলাদেশ *এশিয়াটিক সোসাইটি*, *বাংলাদেশ ইতিহাস সমিতি* ও ভারতের *পশ্চিমবঙ্গ ইতিহাস সংসদ*-এর আজীবন সদস্য। গবেষণা-প্রবন্ধ ছাড়াও তাঁর বহু মননশীল লেখা বিভিন্ন লিটন ম্যাগাজিন, সাময়িকী, স্মরণিকা ও স্মারক গ্রন্থে প্রকাশিত হয়েছে।

দীপঙ্কর মোহন্ত একজন কবি, অনুবাদক, প্রবন্ধকার ও গবেষক। তাঁর গবেষণায় ইতিহাস, রাজনীতি, সংস্কৃতি ও দর্শনের আন্তঃসম্পর্ক গভীরভাবে প্রতিফলিত হয়। কবিতা, প্রবন্ধ ও সাহিত্যে তাঁর উল্লেখযোগ্য উপস্থিতি রয়েছে। তাঁর লেখায় ভাষার সৌন্দর্য, দৃষ্টিভঙ্গির তীক্ষ্ণতা ও বিশ্লেষণের মননশীলতা একত্রে ধরা পড়ে। তিনি সাহিত্যকে রাজনৈতিক এবং নৈতিক সংলাপের ক্ষেত্র হিসেবে চিন্তা করেন। পেশায় তিনি একজন শিক্ষা প্রশাসক এবং বর্তমানে সুনামগঞ্জ পি.টি.আই-এর সুপারিনটেনডেন্ট হিসেবে কর্মরত।

আশফাক হোসেন যুক্তরাজ্যের নটিংহাম বিশ্ববিদ্যালয়ে 'ঔপনিবেশিক বিশ্বায়ন' বিষয়ে পিএইচডি করেছেন। *Modern Asian Studies* এবং London School of Economics থেকে প্রকাশিত *Journal of Global History*-তে তাঁর প্রবন্ধ প্রকাশিত হয়েছে। এ পর্যন্ত তাঁর প্রকাশিত গ্রন্থের সংখ্যা বারো; গবেষণা-প্রবন্ধের সংখ্যা শতাধিক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে প্রকাশিত *The University of Dhaka And The Making and Shaping of Bangladesh* (২০২১) এবং *শতবর্ষে ইতিহাস বিভাগ: অতীতের আলোয় বর্তমান ও ভবিষ্যৎ* (২০২২) গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক তিনি। তাঁর লেখা গ্রন্থ *Colonial Globalization and Its Effects on South Asia: Eastern Bengal, Sylhet and Assam, 1874-1971* (২০২২) বিশ্বখ্যাত Routledge/Taylor & Francis Group কর্তৃক লন্ডন ও নিউইয়র্ক থেকে একযোগে প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া Monohor (India) এবং Routledge (New York) থেকে যৌথভাবে প্রকাশিত *The Mughals and the North-East* (২০২৩) গ্রন্থে তাঁর লেখা একটি অধ্যায় সংযুক্ত হয়েছে। সম্প্রতি (২০২৪) CARASS থেকে তাঁর যৌথ সম্পাদনায় *মুক্তিযুদ্ধে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্মচারী* শীর্ষক গ্রন্থটি প্রকাশিত হয়েছে। গবেষণার স্বীকৃতিস্বরূপ তিনি ইউজিসি'র রাষ্ট্রপতি স্বর্ণপদক (২০১৫) ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রদত্ত বিচারপতি ইব্রাহীম স্বর্ণপদক (২০১৪) লাভ করেন। বর্তমানে (২০২৫) তিনি উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (CARASS)-এর পরিচালক এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগের চেয়ারম্যান হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তিনি এ গ্রন্থের অন্যতম সম্পাদক।

শরীফ উদ্দিন আহমেদ দীর্ঘদিন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় এবং নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ইতিহাস বিভাগে অধ্যাপনা করেছেন। বর্তমানে তিনি অবসরপ্রাপ্ত। ইতিহাসবিদ ও গবেষক হিসেবে তিনি বাংলাদেশের নগর-ইতিহাস এবং প্রাতিষ্ঠানিক ইতিহাস চর্চায় নতুন নতুন দিগন্তের উন্মোচন করেছেন এবং এই ক্ষেত্রগুলোতে তাৎপর্যপূর্ণ অবদান রেখেছেন। তিনি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে এমএ ডিগ্রি অর্জন করেন, পরবর্তীতে অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয় থেকে বি লিট (স্নাতকোত্তর) এবং লন্ডন বিশ্ববিদ্যালয়ের স্কুল অব ওরিয়েন্টাল অ্যান্ড আফ্রিকান স্টাডিজ (SOAS) থেকে পিএইচডি ডিগ্রি সম্পন্ন করেন। তাঁর পিএইচডি অভিসন্দর্ভ 'Dhaka: A Study in Urban History and Development' শিরোনামে যুক্তরাজ্য ও যুক্তরাষ্ট্রে একই সঙ্গে প্রকাশিত হয়। ঢাকাকে কেন্দ্র করে তাঁর সম্পাদিত উনিশটি গ্রন্থ বাংলাদেশ *এশিয়াটিক সোসাইটি* কর্তৃক প্রকাশিত হয়েছে। এছাড়া, তাঁর রচিত *Mitford Hospital and Dhaka Medical School* গ্রন্থটি ইউনিভার্সিটি গ্রান্টস কমিশন (UGC) পুরস্কার লাভ করে। বর্তমানে অধ্যাপক শরীফ উদ্দিন আহমেদ আত্মজীবনী লিখছেন।

শারমীন আখতার প্রাচীন সামুদ্রিক ইতিহাসের একজন বিশেষজ্ঞ। তিনি ২০০৭ সাল থেকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইতিহাস বিভাগে শিক্ষক হিসেবে দায়িত্ব পালন করছেন। তাঁর গবেষণা ভারত মহাসাগরীয় সংযোগ, বাণিজ্যিক যোগাযোগ, বাংলা ও দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার মধ্যে সাংস্কৃতিক মিথস্ক্রিয়ার সাথে সম্পর্কিত। তাঁর রচিত দু'টি গ্রন্থ রয়েছে। এছাড়া দেশীয় এবং আন্তর্জাতিক উভয় ক্ষেত্রেই পিয়ার-রিভিউড একাডেমিক জার্নালে তিনি প্রবন্ধ প্রকাশ করেছেন, যার মধ্যে স্কোপাস এবং আইএসআই তালিকাভুক্ত জার্নালও রয়েছে। মালয় বিশ্ববিদ্যালয় থেকে পিএইচডি অর্জনকারী ড. আখতার প্রাচীন বাংলার সামাজিক-সাংস্কৃতিক ইতিহাস, প্রাচীন সামুদ্রিক সংযোগ এবং অর্থনৈতিক বিনিময়ের জটিল বিষয়গুলো অন্বেষণ করার জন্য প্রত্নতাত্ত্বিক ও অন্যান্য উৎসগুলো একীভূত করেন এবং প্রাচীন ইতিহাসের উপর তাঁর বিস্তৃত আন্ত-আঞ্চলিক দৃষ্টিভঙ্গি তুলে ধরেন।

ইশরাদ আহমেদ বর্তমানে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্তি ও সংঘর্ষ অধ্যয়ন বিভাগে প্রফেশনাল মাস্টার্স কোর্সে অধ্যয়নরত। পাশাপাশি তিনি একটি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ইংরেজি ভাষার শিক্ষক হিসেবে নিয়োজিত আছেন। তাঁর গবেষণাগত আগ্রহ রাষ্ট্রতত্ত্ব, জাতীয়তাবাদ, স্বাদেশিকতা এবং রাজনৈতিক অধ্যয়নের আন্তর্বিভাগীয় ক্ষেত্রে বিস্তৃত। তিনি উচ্চতর শিক্ষা গ্রহণের মাধ্যমে অ্যাকাডেমিক গবেষণায় সক্রিয়ভাবে যুক্ত হওয়ার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছেন। তাঁর ভবিষ্যৎ লক্ষ্য হলো গবেষণা ও প্রায়োগিক জ্ঞানের সমন্বয়ের মাধ্যমে বাংলাদেশের টেকসই ও অন্তর্ভুক্তিমূলক উন্নয়ন প্রক্রিয়ায় অবদান রাখা। তিনি বিশ্বাস করেন যে, জ্ঞানচর্চা ও শিক্ষার মাধ্যমে নীতিনির্ধারণ ও সমাজ রূপান্তরের ক্ষেত্রে একটি কার্যকর ভূমিকা পালন করা সম্ভব।

ড. মোঃ আব্দুস সামাদ জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ইতিহাসের সহযোগী অধ্যাপক। তাঁর গবেষণা আগ্রহের বিষয় হচ্ছে পরিবেশগত, রাজনৈতিক ও সামাজিক ইতিহাস। দেশী ও বিদেশী পিয়ার রিভিউড জার্নালে তার ত্রিশের অধিক প্রবন্ধ ও একাধিক বই প্রকাশিত হয়েছে। ড. সামাদ বর্তমানে ইংল্যান্ডের ম্যানচেস্টার বিশ্ববিদ্যালয়ে `Landscape, Environment and the People: Ecological Spoils of the Bengal-divide' শীর্ষক প্রকল্পে Co-Principal Investigator হিসেবে কাজ করছেন।

সামিয়া ইয়াসমীন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হতে বাংলা সাহিত্যে বিএ (সম্মান) ও এমএ ডিগ্রি শেষ করার পর নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয় হতে History and Asian Studies-এ দ্বিতীয় মাস্টার্স করেন। তিনি সাম্প্রতি জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে এমফিল থিসিস জমা করেছেন এবং বর্তমানে নর্থ সাউথ বিশ্ববিদ্যালয়ে গবেষণা সহযোগী হিসেবে কর্মরত আছেন। সামিয়া ইতোমধ্যে একাধিক গবেষণা প্রবন্ধ প্রকাশ ও আন্তর্জাতিক সম্মেলনে প্রবন্ধ উপস্থাপন করেছেন।

নির্ঘণ্ট

৬ দফা ১৮৮, ১৯১
১৪৪ ধারা ৯৩, ১০৮, ১০৯, ১১২, ১২৮, ১৩৭, ১৩৮, ১৩৯, ১৪০, ১৪১, ১৪২
১৯৪৮ ৩৮, ৪৭, ৪৮, ৯১, ৯২, ৯৩, ৯৪, ৯৭, ৯৯, ১০০, ১০১, ১০৫, ১১৩, ১২৮, ১৮৪
১৯৫২ ৩২, ৪৭, ৪৮, ৫৬, ৫৯, ৬৫, ৬৮, ৯২, ৯৯, ১০৬, ১৩৬, ১৪২, ১৫৯, ২০৬
অসাম্প্রদায়িক ৫৭, ১৯২, ২৩৭, ২৪৬, ২৪৭, ২৪৯, ২৫০, ২৫৮, ২৫৯, ২৬১, ২৭৯
আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবস ৬৩, ৬৪, ১৬৬, ১৮৬, ২১৫, ২১৬, ২৩৭, ২৪৬, ২৭৯, ২৮৩, ২৮৭
আতাউর রহমান খান ৪৮, ৫০, ৫৫, ১৫১, ২৩৮
আবদুল করিম সাহিত্যবিশারদ ২, ৮, ১০, ২২, ২৫
আবদুল গাফফার চৌধুরী ১৩৮, ৩৯৬
আব্দুল মতিন ১০৮, ১৭৬, ১৭৮, ২৪১
আব্দুস সালাম ২২২, ২৮৬
আবুল হাশিম ৫০, ৯২, ৯৫
আবুল মনসুর আহমদ ৯২, ১৬০, ২৫৫
আবুল কাসেম ফজলুল হক ৬৪
আবুল বরকত ৭১, ৮১, ১৬৪, ১৭৫, ২৩৮, ২৪১,২৫৩
আরবি-ফারসি হরফ ১, ৮
আরেক ফাল্গুন (উপন্যাস) ৩১, ৩২, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪৩, ১৬২
আলতাফ মাহমুদ ৬২
অলি আহাদ ৫০, ৯২, ১৪২, ১৬২, ১৭১, ১৭৪, ২৫০, ২৫২, ২৬৯, ২৭২, ২৭৩
ইউনেস্কো ১৬৬, ২৩৭, ২৪৬, ২৭৯, ২৮০, ২৮৬, ২৮৭, ২৮৮, ৩০৩
ইত্তেফাক ৪৮, ৪৯, ৫৫, ১৬২, ১৯০, ২১৯, ২২০
ইতিহাস ০১, ০৮, ১০, ২২, ৩১, ৪৮, ৫৭, ৮৯, ১০০, ১৩৫, ১৩৬
ইসলাম ০১, ০৮, ৩৮, ২৭২, ২৭৯
উর্দু ১০, ১০৫, ১২৪, ১৬০, ১৬১, ১৭০, ২০১, ২০২, ২০৪, ২০৬, ২১৫
উত্তরাধিকার ১৩৫, ১৩৬, ১৫৮, ২১৭, ২৩০, ২৪২, ২৪৫, ২৯১
একুশে ফেব্রুয়ারি ৩২, ৪৫, ৪৭, ৪৮, ৪৯, ৫১, ৫৫, ৫৬, ৫৮, ১১৬, ১২৪, ১৮৬
একুশের গান ৪৭, ৫৮, ৬২, ৬৩
ঔপনিবেশিকতা IV
কবর (নাটক) ০১, ৩২, ৩৩, ৩৪, ৩৬, ৩৮, ৪০, ৪২, ৪৪, ৫৬, ৬৪, ১৬৫, ১৭৭
কমিউনিস্ট পার্টি ৭৩, ৯২, ৯৬, ৯৭, ৯৯, ২৬১, ২৭২
কারবালা ০১

কৈবর্ত বিদ্রোহ ২৫১
কৃষক-শ্রমিক ৮৯, ২০৬, ২৪১
ক্ষুদ্র জাতিসত্তা ২৮০
ক্ষুদ্র নৃ-গোষ্ঠী ৮৯, ৯৯, ২৯৫
খাজা নাজিমুদ্দিন ১৭২, ২১৬, ২৩৬, ২৫৬
গণ আজাদী লীগ ৯২, ২০২
গণতন্ত্রী পার্টি ২৬১
গণপরিষদ ৫০, ১০১, ১১৭, ২০৩, ২১১, ২৫৩
গাজীউল হক ৪৯, ৫০, ৬৩, ১৩৬, ১৩৮, ১৪২, ১৭৪
চট্টগ্রাম ০৮, ১০, ১২, ১৭, ২০, ৯৬, ১১৬, ১৩৬, ২০২, ২০৭, ২১২, ২৮৩, ২৮৭
চারুশিল্পী ১৮২, ১৯০, ১৯৯
চা-শ্রমিক ৯৫, ৩০৯
জগন্নাথ কলেজ ৫১, ১০৮, ১৪৯, ১৫৩, ১৫৪, ১৫৭, ১৬০, ১৭২
জহির রায়হান ৩২, ৩৬, ৩৮, ৪৩, ১৬১, ১৬৬
জাতীয়তাবাদ ৪৮, ১৪৪, ১৪৯, ১৯৮, ২৩৫, ২৭৯
জারি গান ২২, ৭৯
ঝালকাঠি ১২৭, ১২৮
টাঙ্গাইল ১১২
ড. মুহম্মদ শহীদুল্লাহ্ ১৫৯, ২০১
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ০১, ১২, ৯২, ৯৩, ১০৯, ১৩৫, ১৪০, ১৪৪, ১৫৬, ২১৬
ঢাকা মেডিকেল কলেজ ৯৪, ১৬০, ১৭০, ১৭৩, ১৭৬, ২৩৮
তমদ্দুন মজলিস ৯২, ৯৩, ৯৯, ১৪৩, ১৬৩, ১৭২, ১৭৮, ২০২, ২১১, ২৬১
তাজউদ্দিন আহমদ ১৪২
দৈনিক আজাদ ৪৮, ৫১, ৫৫, ১২০, ১৫৯, ১৭৬, ১৮৭, ২০১, ২২২
দৈনিক ইত্তেহাদ ২০১, ২১৯, ২৩৫
দৈনিক পূর্ব পাকিস্তান ২৪২
ধর্মঘট ৪৯, ৬৩, ৯২, ৯৩, ৯৬, ৯৯, ১০১, ১০৬, ১০৭, ১১১, ১১২, ১১৫, ২১০
ধীরেন্দ্রনাথ দত্ত ৯৭, ১০৬, ১৪৪, ১৬০, ১৭১, ২১৫, ২৩৬, ২৪২, ২৬১, ২৬৯
নিম্নবর্গ ৮৯, ১০০
নুরুল আমিন ১২৪, ১৮৫, ২২০
নেত্রকোনা ৮০
পশ্চিম পাকিস্তান ১৬৯, ১৮১, ২১৫
পার্বত্য চট্টগ্রাম ২৭৩, ২৮৫, ২৮৯, ৩০৩

পুথি ০১, ০২, ০৩, ০৮, ০৯, ১০, ১২, ১৯, ২০, ২১, ২২, ২৩, ২৪, ২৫
পুঁজিবাদ ২১৮
প্রভাতফেরি ৪৭, ২২৩
প্রান্তিক জনগোষ্ঠী ৮৯, ৯৪, ৯৭
ফারসি ০১, ০২, ০৩, ০৭, ০৮, ০৯, ১০, ১১, ১২, ১৬, ২০
বঙ্গবন্ধু শেখ মুজিবুর রহমান ১৬০, ১৬২, ১৯৫
বদরুদ্দীন উমর ৪৮, ৬৭, ৯৩, ১৩৪, ১৪১, ১৪২, ২৩৪, ২৩৫, ২৫০, ২৫২, ২৭২
আবুল বরকত ৭১, ৮১, ১৬৪, ১৭৫, ১৯১, ২৩৮, ২৪১, ২৪৩, ২৫৩
বামপন্থা ৩৮, ৪৪
ভারতবর্ষ ২১৫, ২৫৬
ভাষা আন্দোলন ৩১, ৩২, ৪৩, ৪৪, ৪৮, ৪৯, ৫৫, ৫৬, ৫৭, ৬৮, ৮৯
মওলানা ভাসানী ৫০, ২০২, ২০৩, ২৩৯, ৩৯৬
মুক্তিযুদ্ধ ৫৭, ১৯৫, ১৯৬, ১৯৭, ১৯৮, ১৯৯, ২৫২, ৩৯৬
মুনীর চৌধুরী ৩২, ৩৮, ৩৯, ৪২, ৬৪, ১৪৫, ১৬২, ১৬৫
মুসলিম লীগ ৫০, ৭৬, ৯২, ৯৪, ৯৬, ৯৮, ১০২, ১১২, ১৩৭, ২০৬, ২৩৫
মোহাম্মদ আলী জিন্নাহ ৯৩, ১৪০, ১৭১, ২০২, ২০৩, ২০৬, ২১৬, ১৪৯, ২৫২, ২৬০
যুক্তফ্রন্ট ৪৩, ৬০, ৬৪, ৬৫, ২৪১, ২৪৩, ২৬১
যুবলীগ ৯২, ৯৬, ৯৯, ১৩৬, ১৪০, ১৪৩, ২০২
রফিকউদ্দিন আহমদ ১৬৪
রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর ২৫১
রাষ্ট্রভাষা ৩৭, ৪৫, ৪৭, ৪৯, ৫৬, ৯২, ৯৯, ১০৫, ১১৪, ২১১, ২৫২
লিয়াকত আলী খান ৯১, ১০৬, ২০২, ২৩৫, ২৫২
শহিদ দিবস ৪৮, ৪৯, ১২৫, ২১২, ২৩৭
শহিদ মিনার ৫১, ৫৬, ৫৮, ৯৬, ১১৩, ১৬৩, ১৭৮, ১৮৬, ১৯২
শহীদুল্লা কায়সার ২৬৫, ২৬৬, ২৬৭, ২৬৮, ২৭০, ২৭১, ২৭৩
সেমেটিক লিপি ২১
সর্বদলীয় রাষ্ট্রভাষা সংগ্রাম পরিষদ ৯৩, ৯৯, ১০৭, ১০৮, ১৩৫, ১৩৭, ১৪৩, ১৭৭
সিরাজুল ইসলাম চৌধুরী ২৫০
সিলেট ৯৬, ১০৫, ১১৫, ২৫৮, ৩০৭, ৩০৮, ৩১৭, ৩২১
সংবাদপত্র ২০২, ২১২, ২১৫, ২১৬, ২২৩, ২৩৪, ৩৯৮
হাসান হাফিজুর রহমান ৫৮, ৫৯, ৬০, ৬৮, ৯০, ১৮৬, ২৩৫
হেমাঙ্গ বিশ্বাস ৬১, ৬৭, ৭২, ৭৩, ৭৪, ৭৭, ৮১, ৮২, ৮৪

Benedict Anderson 373 , 380, 381, 382
Architecture 350, 351, 352, 361, 367
Ayub Khan 336
Bangla Language 326, 330, 332, 333, 335, 368
Bangladeshi Nationalism 373, 374, 375, 377, 378, 390
Bay of Bengal 339, 340, 344, 347, 357
Bengali Diaspora 339, 340, 341, 342, 345, 351
Bengali Nationalism 375, 377, 378, 380, 387, 389, 390, 391, 392
BNP (Bangladesh Nationalist Party) 378, 388
British Colonial Rule 324, 332, 365
Buddhism 345, 348, 352, 353
Capital City 323, 383
Champa 346, 347
Constitution 333, 336, 375, 376, 378, 385, 386, 387, 390, 392
Cultural Identity 324, 330, 362, 368, 373, 380, 384, 387, 389
Cultural Penetration 339, 347, 349, 353, 354
Dhaka 323, 324, 325, 326, 329, 333, 337, 386, 400
Digital Nationalism 378, 382
Ecology 367, 369
Funan 343, 344, 346, 347, 348
Ernest Gellner 374, 380
Hinduism 347, 348
Eric Hobsbawm 375, 379, 380
Imagined Community 378, 382
Indianisation 340, 341, 353
Islam 331, 362, 364, 375, 376, 387, 389, 390, 391
Islam Khan 324, 325, 327
Jahangir (Emperor) 324
Muhammad Ali Jinnah 331, 335
Khwaja Family 328, 329, 330
Kuttis 229
Language Movement 323, 324, 332, 333, 334, 335, 361, 366, 374, 392
Lingua Franca 323, 324, 337
Maritime Connectivity 339, 340, 341, 343
Mirza Nathan 327

Mughal Empire 324, 326
Nationalism 335, 362, 363, 365, 368, 373, 374, 381, 385, 387, 390
Paharpur 349, 350, 351
Persian (Farsi) 22, 324, 325, 330
Politics 334, 367, 369, 374, 377, 380
Populism 380
Rabindranath Tagore 363
Religion 348, 367, 375, 377, 379, 380, 381, 384, 386, 392
Secularism 376, 377, 380, 385, 387, 389
Sonar Bangla (Golden Bengal) 363
Southeast Asia 339, 340, 341, 342, 343, 344, 345, 349, 353
Srivijaya 343, 349, 352, 353
Tamaddun Majlis 332, 333, 334, 335
Tamralipti 342, 344, 349, 353, 355
Urdu 279, 325, 326, 328, 329, 332, 335, 375
Ziaur Rahman 373, 376, 378

বাংলাদেশের ভাষা মানচিত্র

ভাষা আন্দোলন এবং বিশ্বে বাংলাভাষী স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব

Language Movement and the Emergence of a Bangla-Speaking State in the World

A Multidisciplinary International Conference

April 29-30, 2024

Nabab Nawab Ali Chowdhury Senate Bhaban, University of Dhaka

Center for Advanced Research in Arts and Social Sciences (CARASS)
University of Dhaka

উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষণা কেন্দ্র (CARASS), ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আয়োজিত প্রথম আন্তর্জাতিক সম্মেলন 'ভাষা আন্দোলন এবং বিশ্বে বাংলাভাষী স্বাধীন-সার্বভৌম রাষ্ট্রের আবির্ভাব'-এর বিবরণীর প্রচ্ছদ

সম্মেলন আয়োজক কমিটির মিটিং

উদ্বোধনী সভায় উচ্চতর মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান গবেষেণা কেন্দ্র (CARASS)-এর পরিচালক অধ্যাপক আশফাক হোসেনের স্বাগত বক্তব্য

উদ্বোধনী সভার মূল প্রবন্ধ পাঠ অধ্যাপক ড. জন উইলসন, বিভাগীয় প্রধান, ইতিহাস বিভাগ, কিংস কলেজ, লন্ডন

উদ্বোধনী সভার দর্শকদের একাংশ

Center for Advanced Research in Arts and Social Sciences (CARASS)
University of Dhaka

Keynote Paper
A Multidisciplinary International Conference
Center for Advanced Research in Arts and Social Sciences (CARASS)

A Multidisciplinary International Conference

প্যানেল আলোচনা

প্রবন্ধ উপস্থাপনা

আলোচনায় দর্শক-শ্রোতার অংশগ্রহণ

দর্শক-শ্রোতার প্রশ্ন বাছাই করছেন সভার মডারেটর

অতিথিকে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন CARASS-এর পরিচালক অধ্যাপক আশফাক হোসেন

সাংস্কৃতিক সন্ধ্যা: রঙিলী বিশ্বাস ও তাঁর সহশিল্পীবৃন্দ

অতিথিদের হাতে শুভেচ্ছা স্মারক তুলে দিচ্ছেন CARASS-এর পরিচালক অধ্যাপক আশফাক হোসেন

চা শ্রমিকের ভাষা বিষয়ক গবেষণার জন্য শ্রীমঙ্গল আর্কাইভস্ পরিদর্শন

স্বেচ্ছাসেবক দলের একাংশ